আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রচনাবলী



আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

—দু'শো টাকা—

সম্পাদনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন — অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রণ — ন্যাশনাল হাফটোন

ASHUTOSH MUKHOPADHYAY RACHANAVALI VOL XII

An anthology of collection of complete works Vol XII by Ashutosh Mukherjee. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd. 10 Shyamacharan Dey Street, Calcutta 700 073

Price Rs. 200/-

ISBN : 81-7293-532-3

শব্দগ্রন্থন : লেজার ইম্প্রেশন

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

১। পূর্বভাষণ

জাঁর হিসেবে নভেলের যে বিশিষ্টতা রয়ে গেছে তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই : না লেখকের না সমালোচকের না পাঠকসমাজের। নভেলের পাশাপাশি 'ফিকশন' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়, অনেক সময় একই অর্থে। এক্ষেত্রেও অনেকেই জানেন না যে এই দু'টি শব্দ সমার্থক নয়। বস্তুত, জাঁর হিসেবে নভেল কী, তা স্পষ্টত না-জানার ফলে আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় একটা দুরপনেয় ফাঁক ও ফাঁকি থেকে গেছে।

বলাই বাহুল্য—নভেলের মডেল বা আদর্শ আমরা পেয়েছি ইংরেজি সাহিত্যের কাছ থেকে অর্থাৎ ইংরেজি নভেলের বা ফিকশনের মাধ্যমে। এই ঐতিহ্য আমাদের সাহিত্যে ছিল না। জাঁর হিসেবে, সুতরাং, নভেলের আলোচনায় ইংরেজি নভেল এবং নভেল সংক্রান্ত আলোচনার দ্বারস্থ হতেই হয়। এক্ষেত্রে, ফরসটারের নামটাই সাধারণত প্রায় সর্বত্র উচ্চারিত হয়ে থাকে। আশ্চর্য এই যে নভেল সম্পর্কে একটি সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা যিনি করেছেন—সেই শ্রীমতী মারিয়ম এ্যালিটের নাম ক্বচিৎ শোনা যায়। তিনি তাঁর 'নভেলিস্টস্ অন দি নভেল' গ্রন্থে নভেলের বিভিন্ন দিক ও সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন প্রখ্যাত নভেলিস্টদের অভিমতগুলি একত্রিত ক'রে। অবিশ্যি, তার সঙ্গে ঐসব অভিমতের ভিত্তিতে নিজের অভিমতও ব্যক্ত করেছেন তিনি। এইসব আলোচনার সমাস করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই যে নভেল এমন একটি জাঁর যার একটি বিশিষ্ট চরিত্র আছে। সেই চারিত্রিক বিশিষ্টতা না জানা থাকলে নভেল-সংক্রান্ত যে-কোন আলোচনা শূন্যগর্ভ অর্থহীন হ'তে বাধ্য।

এবং, নভেলের চারিত্রিক বিশিষ্টতার প্রথম ও শেষ কথা হ'ল—নভেলের ভিত্তি হবে বাস্তবমুখীন জীবন যেখানে কল্পনা ও কাল্পনিকতার ছিটেফোঁটা থাকবে না। এখানেই ফিকশনের সঙ্গে নভেলের মৌলিক পার্থক্য। ফিকশনে কল্পনা বা কাল্পনিকতাধর্মী জীবনের ছবি তুলে ধরা যেতে পারে, কিন্তু নভেলের জগৎ কোন কাল্পনিক জগতের বা জীবনের ছবি কদাচ নয়। তাকে সম্পূর্ণরূপে জীবনমুখীন ও বাস্তবধর্মী রূপে গড়ে তুলতে হবে। এই প্রসঙ্গে এ্যান্টনি ট্রলোপের বক্তব্য এই যে, নভেলে যাদের কথা বলা হবে তাদের হ'তে হবে এক একটি জীবন মানুষ, যেন লেখক তাদের সঙ্গে কথা বলছেন, তিনি তাদের সবাইকে দেখেছেন এবং জানেন : "এটা এমনি যে আমি আমার চরিত্রদের সঙ্গে বাস করতাম।" এ্যান্টনি ট্রলোপ এইভাবেই তাঁর কথাটা ব্যক্ত করেছেন। এই হচ্ছে জাঁর হিসেবে নভেলের মৌলিক লক্ষণ।

ডি এইচ লরেন্স বলেছেন নভেল হচ্ছে জীবনের উজ্জ্বল গ্রন্থ—'দি ব্রাইট বুক অফ লাইফ'। তাঁর মতে একজন নভেলিস্ট দার্শনিক ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক এমনকি একজন সাধু ব্যক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ, কারণ একমাত্র নভেলিস্টই মানবজীবনের সামগ্রিক পরিচয় পেয়ে থাকেন—'দি হোল হগ'। নভেল সম্পর্কে লরেন্সের কথাটার খেই ধ'রে প্রশ্ন করা

যায় : নভেলের কাছ থেকে আমরা কী চাইব ? ফরসটার বলেছেন—নভেলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে তার গল্পাংশ বা কাহিনী। এর উল্টো কথা বলেছেন গুস্তভ ফ্লবেয়ার। তাঁর মতে নভেলে কোন গল্প না-থাকাটাই তার সবচেয়ে ভালো গুণ। টমাস হার্ডির কথাটা এইরকমই—নভেলের গল্পাংশ একটা যান্ত্রিক গঠন ছাড়া আর কিছু নয়। আবার, গল্পাংশের প্রয়োজন মেনে নিয়েও রাসেল মিটফোর্ড দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে ঐ গল্পাংশকে কোনরকম প্লট বা ছকে গাঁথা চলবে না। কারণ, নভেলের কাহিনী আসলে বাস্তব জীবনের পুনর্গঠন ও একত্র সন্নিবেশ ছাড়া আর কিছু নয়।

এইসব আলোচনা থেকে যা বেরিয়ে আছে তা হচ্ছে এই যে নভেলকে হয়ে উঠতে হবে সর্বতোভাবে জীবনমুখী ও বাস্তবধর্মী এবং সেইটেই হবে লেখকের একমাত্র অম্বিষ্ট। ভার্জিনিয়া উলফ বলেছেন—লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে চরিত্রসৃষ্টি ও প্রকাশ, কোন তত্ত্বকথা বা নীতিকথা প্রচার নয়। ওয়ালটার স্কট স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই ব'লে যে —একজন নভেলিস্ট হচ্ছেন মানবহৃদয়ের দক্ষ পরীক্ষক। প্রসঙ্গত, রিচার্ড কাম্বারল্যাণ্ডের অভিমত এই যে তিনি কখনো নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টি করতে চান না যেহেতু তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তেমন কোন মানুষ দেখেননি যাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত বলা চলে। জর্জ সাণ্ডের একটি চিঠিতে ফ্লবেয়ারকে লিখেছেন—"আমি দেখতে চাই মানুষ যা' তা'ই। সে ভালোও নয়, খারাপও নয়।"

এইভাবেই, টুকরো টুকরো ভাবে জার হিসেবে নভেলের চরিত্র নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা যাঁরা নিজে নভেলিস্ট। স্বভাবতই, সেই কারণেই তাঁদের মতামতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে মিল বা অমিল যাই থাক না কেন, মোদ্দা কথাটা এই যে, নভেল সাহিত্যের এমন এক ফসল যার উৎস বাস্তব জীবন এবং জীবন যেমন তাকে ঠিক সেইভাবে চিত্রিত করাই হবে লেখকের একমাত্র কর্তব্য আর কিছু নয়।

ধান ভানতে শিবের গীতের মতো শোনালেও অনেকটা বাধ্য হয়েই নভেলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা প্রাথমিক আলোচনা সেরে নিতে হল, কেননা, দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি—এতাবৎ কাল বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে নভেল নিয়ে যেসব আলোচনা হয়েছে তা অনেকাংশে জোলো ও বিভ্রান্তিকর। মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে—নভেল ও ফিকশন সমগোত্রীয় রচনা নয়।

আরো-একটা কারণ আছে উপরোক্ত আলোচনাটি তুলে ধরার। এর পরে, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের যে দুটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি, আমার মনে হয়েছে, তার পিছনে একটি সুস্পষ্ট পারসপেকটিভ্ থাকা দরকার, নইলে আলোচনাটা দানা বাঁধবে না অথবা যথার্থ মূল্যায়ন হয়ে উঠবে না। সেই কারণেই সমর্থনকারী এমন একটি সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক আলোচনা সেরে নিতে হ'ল। নিরুপায় হয়ে।

২। বাংলা কথাসাহিত্যের পশ্চাৎপট

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা কথাসাহিত্যের যে আদল গ'ড়ে উঠেছিল তা' আসলে ফিক্শনের মডেল, নভেলের নয়। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের হাত ধ'রে পরবর্তীকালে যা বিকাশ লাভ করেছে তা মূলত বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত মডেলেরই অনুসরণ-লব্ধ উৎসার।

তবু, তারই মধ্যে, শরৎচন্দ্রের কোন কোন রচনায় নভেলের উপাদান রয়ে গেছে। তাঁর পরে, তারাশঙ্করের মধ্যে নভেলিস্ট-সুলভ গুণাবলী অনেক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বাংলা কথাসাহিত্য কদাচিৎ ফিকশনের পথ ছাড়তে পেরেছে। শুধু তার সপক্ষে একটা কথা বলা চলে—বাংলা কথাসাহিত্য আর কিছু না পারুক গল্প ও চরিত্রের বিচিত্র সমাবেশে ওজনে ভারী হয়েছে। এইটেই একমাত্র সান্ত্বনা।

এহেন বাংলা কথাসাহিত্য যখন পঞ্চাশের কোঠায় পৌঁছোল বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনার দেউড়ি পার হয়ে অথবা পিছনে ফেলে, তখন দেখা গেল একসঙ্গে এক ঝাঁক তরুণ লেখক কলম ধরেছেন। এঁরা তখন আগের আমলের রাস্তা ছেড়ে নতুন নতুন পথের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এঁদের অনেকের দৃষ্টি গেল, সমাজজীবনের আনাচে কানাচে : মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজে এঁদের বিচরণ সেদিন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তার সঙ্গে ছিল বিষয়বস্তু আঙ্গিক ও রূপকল্পের নিত্য নতুন পরীক্ষা। বস্তুত, এইভাবে এঁরা সমবেতভাবে একসঙ্গে বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই সময় বা পর্বটিকে বাংলা কথাসাহিত্যের স্বর্ণযুগ বললে অত্যুক্তি হয় না, একসঙ্গে অসংখ্য লেখকের নিয়মিত রচনায় বাংলা কথাসাহিত্যে সেদিন যেন বান ডেকেছিল।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব এই জোয়ারের স্রোতেই। তিনি এই পর্বের লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম লেখক যাঁর রচনায় এই পর্বের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায়।

৩। শতরূপে দেখা / 'রমণীর অনমিত মহিমা।'

এবার বর্তমান দ্বাদশ খণ্ডে সংকলিত 'শত রূপে দেখা' গ্রন্থটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

গ্রন্থটি শুরু হয়েছে বসন্ত ঘোষালকে কেন্দ্র ক'রে। তিনি করণ গ্রামের প্রাচীন ঘোষাল বংশের বংশধর, বর্তমানে কৃতী খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়র—যিনি ট্রেনে চলেছেন তাঁর জন্মভূমি করণ গ্রামের উদ্দেশে, কলকাতা থেকে। ট্রেনে করণ গ্রামে যেতে লাগে আড়াই ঘণ্টা, করণ নদীয়ার কৃষ্ণনগর চাকদার সন্নিহিত একটি গ্রাম। যেভাবে শুরু, সেইভাবেই বসন্ত ঘোষালের আত্ম-রোমন্থনের ভিতর দিয়ে গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। বসন্ত ঘোষাল তাঁর পরলোকগত দাদুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন করণকে অন্যতম আদর্শ গ্রামের তালিকায় স্থান ক'রে দিয়ে। এই দুটি প্রান্তের মাঝখানে মূল কাহিনী অতীতায়ন (Flash back) টেকনিকে বিবৃত হয়েছে।

'শত রূপে দেখা' প্রকৃতপক্ষে করণ নামক একটি গ্রামের গ্রাম্য-সমাজের কাহিনী। এবং এই কাহিনী গড়ে উঠেছে এই গ্রামের দুটি পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে। এর একটি হল ধনী দত্ত পরিবার ও অন্যটি হ'ল বনেদী ঘোষাল পরিবার। এই দুটি পরিবারের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাতকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে। একদিকে আছেন দত্ত পরিবারের কর্তা মহেশ্বর দত্ত, তাঁর ছেলে রাধানাথ এবং রাধানাথের স্ত্রী গ্রন্থটির নায়িকা চণ্ডী বা চণ্ডী বৌ, অন্যদিকে ঘোষাল পরিবারের মদনমোহন ঘোষাল, সংক্ষেপে মদন। এদের পাশাপাশি এক ঝাঁক পার্শ্ব বা গৌণ চরিত্রকেও দেখতে পাচ্ছি, যথাক্রমে—

ছিরে পাগলা, মুনকে ভটচাজ, নয়নচাঁদ ও ফকিরচাদ। শাশুড়ী, প্রসন্নময়ী, ষষ্ঠীচরণ, পালোয়ান ও ক্ষমাযোগিনী।

আলোচ্য গ্রন্থটি একটি বিশুদ্ধ প্রেমের উপাখ্যান হিসেবে গণ্য হ'তে পারে। কিন্তু, মূল এই কাহিনীর বৃত্তের মধ্যে ঘটনাপ্রবাহকে জীবনমুখীন বা বাস্তবধর্মী করবার তাগিদেই সম্ভবত বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপ, রেলপথে করণ গ্রামের সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে।

লেখক বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গেই এই গ্রন্থে পশ্চিম বাংলার একটি গ্রাম্যজীবনধারা তথা গ্রাম্যজীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। ধনী দত্ত পরিবারের সঙ্গে বনেদী ঘোষাল পরিবারের রেষারেষিকে কেন্দ্র ক'রে করণ গ্রামের সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত। চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা, পূজা-পার্বণ থেকে শুরু ক'রে গ্রাম্যজীবনের আরো অনেক খুঁটিনাটি চিত্র বেশ নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। এইসব দৃশ্য পড়তে পড়তে প্রায় আবশ্যিকভাবেই তারাশঙ্করের রচনাশৈলীর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু, কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লেকক স্বকীয়তায় ফিরতে পেরেছেন।

একথা ঠিক যে 'শত রূপে দেখা' একটি গ্রাম্যজীবনের চালচিত্র। কিন্তু লেখকের সামনে কি কোন মডেল বা আদর্শ রয়ে গেছে? একটু মনোযোগী হ'লেই বোঝা যায় —লেখক চণ্ডী বৌকে সামনে রেখে তার দু'পাশে দুটি পুরুষ চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছেন —যথাক্রমে চণ্ডীর স্বামী রাধানাথ এবং তার প্রেমিক মদনমোহন। এই মডেল, আমার ধারণা, বৈষ্ণব কাব্যের রাধা-আয়ান-কৃষের আদলে গঠিত। এদিক থেকে বিচার করলে আলোচ্য গ্রন্থ গভীরতর অর্থে চিরন্তন নরনারীর প্রেমের আলেখ্য বই আর কিছু নয়।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থের নায়িকা চণ্ডী বৌ শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্রই নয়, চণ্ডী হয়ে উঠেছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র। দেখতে দেখতে কিশোরী বালিকা চণ্ডী হয়েছে দত্তবাড়ির গৃহবধূ, তার পরে ক্রমে ক্রমে যুবতী রূপসী রমণীর অসামান্য রূপে সে তার জীবনের অনেকগুলি বছর কাটিয়েছে দত্ত পরিবারে। রাধানাথের মতো লম্পট নিষ্ঠুর স্বামীকে সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারেনি, প্রকৃত স্বামীর আসনে বসাতে পারেনি। অন্তরের অবরুদ্ধ কষ্ট সে নিঃশব্দে সহ্য করেছে। তথাপি, তার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তাতে ঢাকা পড়েনি, বরং গ্রামের লোকের সশ্রদ্ধ বিস্ময় অর্জন করেছে। এরই মধ্যে তার অজ্ঞাতসারেই হয়ত বা মদন ঘোষাল তার নিভৃত হৃদয়ে দাগ কেটেছে—যার পরিণতিতে দেখি বৈধব্যের খোলস এক মুহূর্তে সরিয়ে ফেলে সে মদনের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে তার নারীত্বকে চরিতার্থ করেছে—মাতৃত্ব লাভের যে অসহায় আকৃতি তাকে বারংবার আচ্ছন্ন করেছিল স্বামী রাধানাথের ক্লীবতার বলি হিসেবে, অবশেষে মদনকে পেয়ে সেই বাসনা মিটেছে।

একটু আগেই ইঙ্গিতে বলেছি যে এই গ্রন্থের কাহিনীটি যেভাবে বিবৃত হয়েছে —তার পিছনে স্পষ্টতই একটি মডেল নিহিত আছে। রাধা-আয়ান-কৃষ্ণের ইতিবৃত্তটি যেন নব রূপে নব কলেবরে লেখক আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন। বৈষ্ণব উপাখ্যানের শ্রীরাধা হয়েছে চণ্ডী, কৃষ্ণ হয়েছে মদনমোহন এবং আয়ানের ছাঁচে গড়া রাধানাথ। আয়ানের সঙ্গে রাধানাথের মিল রয়েছে এক জায়গায়—দু'জনেই স্ত্রীগর্ভে সন্তানের জন্ম দিতে অসমর্থ। তাই, যেমন শ্রীরাধার মধ্যে দেখি, স্বামীর এই অযোগ্যতাই শেষ পর্যন্ত আস্তে আস্তে চণ্ডীকে টেনে নিয়ে গেছে প্রেমিক মদনমোহনের দিকে এবং অবশেষে

তার কাছে আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়ে চণ্ডীর বিড়ম্বিত জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে।

তথাপি, প্রায় একই ছাঁচে গড়া হলেও, চণ্ডীকে কি আমরা এক পরিপূর্ণ কিন্তু চিরন্তন নারীসত্তার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না? সে অসামান্য সুন্দরী, কিন্তু তারই সেই রূপের আড়ালে যে ব্যক্তিত্ব নিহিত, সেই ব্যক্তিত্ব যেন তার রূপকে শত রূপে রূপায়িত করেছে। লেখক এমন একটি চরিত্রসৃষ্টির ভিতর দিয়ে দেখিয়েছেন নারীরূপের পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতার একটি সুন্দর চিত্র। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এমন একটি নারীরূপের চিত্রনে বারংবার একটি শব্দের তুলি বুলিয়ে গেছেন লেখক—সেই শব্দটি হল 'রূপ'। চণ্ডীকে রূপ থেকে রূপান্তরে পৌঁছে দেওয়াটাই যেন লেখকের ঐকান্তিক অভিপ্রায়। এবং এখানেই গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা।

৪। নগর পারে রূপনগর / 'নগরের জঠর থেকে...'

বর্তমান সংকলনের অপর গ্রন্থ 'নগর পারে রূপনগর'-এর তৃতীয় পর্বটি পড়তে হবে পূর্বাপরতাসূত্রে অর্থাৎ আগের দুটি সংকলনে প্রকাশিত দুটি পর্বের সঙ্গে মিলিয়ে। আলোচ্য গ্রন্থের এই তৃতীয় পর্ব, যার শুরু ৩৫ অধ্যায়ে এবং শেষ ৪৮ অধ্যায়ে, প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটির শেষ অংশ অর্থাৎ এই পর্বে পৌঁছে 'নগর পারে রূপনগর'-এর সমাপ্তি ঘটেছে।

পূর্বাপরতাসূত্রে পাঠক যদি আলোচ্য গ্রন্থটি পড়তে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করবেন—এই পর্বে আগের দুটি পর্বের ঘটনাবলীর আভাস, বিশেষত মুখ্য চরিত্রগুলির উপস্থিতি স্বভাবতই রয়ে গেছে। কালীনাথ শিবেশ্বর বিভাস গৌরবিমল সদাদাদার পাশাপাশি জ্যোতিরাণী মৈত্রেয়ী বা মিত্রা, মেঘনা, হেলেন, জোন্স প্রভৃতি চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে এই পর্বের কাহিনীবৃত্তের মধ্যে। এই সব চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশেষভাবে দুটি চরিত্র—সিতু (সাত্যকি) ও শমী ; প্রকৃত অর্থে এরা দুজনে হয়ে উঠেছে নায়ক-নায়িকা, শেষের দিকে এরা অনেকটা অংশ জুড়ে আছে এবং এদের ভিতর দিয়েই কাহিনীর পরিণতি ঘটেছে। সর্বোপরি, স্বভাবতই আগের গল্পাংশকে এই পর্বে টেনে আনা হয়েছে এবং সেই সূত্রেই চরিত্রমালা ও ঘটনাবর্ত উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করে পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে।

এই পর্বটির মধ্যে যে কাহিনী গ্রথিত, তার বিস্তার মোটামুটি ১৯৫২ থেকে ১৯৬৫ সালের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ সময়ের দিক থেকে পনের বছরের মতো একটি সময়সীমাকে এই পর্বের ঘটনাবর্তের ফ্রেমে বেঁধে রাখা হয়েছে। জ্যোতিরাণীর সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল শিবেশ্বরের সঙ্গে। ১৯৬৫ সালে তার মৃত্যু হয়েছে যখন তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তার মৃত্যু হয়েছে দুরারোগ্য ব্রেস্ট ক্যানসারে এবং তার দ্বিতীয় স্বামী লেখক বিভাস দত্তের মৃত্যু হয়েছে তার মৃত্যুর আগে। শিবেশ্বরের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পরে জ্যোতিরানী অনেকটা বাধ্য হয়েই বিভাসকে বিয়ে করেছিল যার স্থায়িত্ব পাঁচ-ছ বছর মাত্র। জ্যোতিরাণীর এই দ্বিতীয় বিবাহের প্রভাব অবিশ্যি ক্ষণিক। অন্যদিকে, যাকে কেন্দ্র করে জ্যোতি-শিবেশ্বরের বিবাহবিচ্ছেদ, সেই মৈত্রেয়ী বা মিত্রার আকস্মিক মৃত্যু এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মৃত্যুমথিত এইসব ঘটনা সম্ভবত শিবেশ্বরের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিবেশ্বর এইসব মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে বেঁচে রইলেন। ইত্যবসরে দেখা গেল জ্যোতি-শিবেশ পুত্র সাত্যকি বা সিতু কৈশোর অতিক্রম

করে যুবক হয়ে উঠেছে। শমীকে কেন্দ্র ক'রে সিতুর উচ্ছৃংখল জীবনের কাহিনী এই পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অবিশ্যি, অনেকটা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'-এর মতো তাদের মিলন হয়েছে এবং তারও পরে রূপনগরের স্বপ্নমগ্ন সিতুর অন্তর্ধানের ভিতর দিয়ে গ্রন্থটি শেষ হয়েছে। আর, মহাভারতের শকুনির মতো কালীনাথ এইসব ঘটনার সাক্ষী হয়ে স্মৃতির বোঝা বহন ক'রে বেঁচে রইলেন।

এই গ্রন্থকেও জীবনমুখীন ও বাস্তবধর্মী করবার জন্যে ১৯৫২ থেকে ১৯৬৫ অর্থাৎ স্বাধীনতাপরবর্তী পশ্চিম বাংলার পনেরো বছরের ঘটনাপ্রবাহের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই পর্বের কাহিনীকে বৃহত্তর জীবনধারার মধ্যে উপস্থাপিত ক'রে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার সঙ্গে সমকালের একটা সূক্ষ্ম সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বাহান্ন সালের ট্রামের একপয়সা ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বামপন্থীদের ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী আন্দোলন, চুয়ান্ন সালের শিক্ষক-আন্দোলন, ষাট সালের আসামে 'বাঙ্গাল খেদাও' আন্দোলন। পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি সালের পাকিস্তান-চীন আক্রমণ, ইত্যাদি সমকালীন কিছু ঘটনা লেখক প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক কালের এইসব ঘটনার জালে জড়িয়ে এই গ্রন্থের কাহিনীকে এইভাবেই একটা বাস্তবধর্মী বিশ্বাসযোগ্যতা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং এইভাবেই, 'নগর পারে রূপনগর' গ্রন্থের বিশাল ক্যানভাসে বিংশ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ জীবনধারাকে গেঁথে রেখে লেখক আমাদের সময়ের একটি যুগচিত্র রচনা করেছেন।

অবিশ্যি, এই পর্বের সমগ্র কাহিনী আবর্তিত হয়েছে জ্যোতিরাণীকে কেন্দ্র ক'রে। বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে লেখক জ্যোতিরাণীকে ডাকযোগে পাঠানো কালীনাথের কালো মলাটের ডায়েরীর পাঠ উদ্ধৃত ক'রে গ্রন্থটির সূচনা করেছেন। এর ভিতর দিয়ে পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর জের টানা হয়েছে। এই ডায়েরী পড়তে পড়তে জ্যোতিরাণী তার চারপাশের জীবনধারার মাঝখানে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। তার অন্তরের দ্বন্দ্ব সংঘাত যন্ত্রণা বিশ্লেষণ করতে করতে এক ব্যক্তিত্বময়ী নারীহৃদয়ের আকৃতিকে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। অন্যদিকে তাকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য চরিত্রের আনাগোনা সাধিত হয়েছে। বস্তুত, জ্যোতিরাণীই এই পর্বের কেন্দ্রীয় ও মুখ্য চরিত্র। তবে শেষের দিকে, তেতাল্লিশ অধ্যায় থেকে আটচল্লিশ অধ্যায় পর্যন্ত অংশে সিতু প্রাধান্য পেয়েছে, তাকে দেখানো হয়েছে অন্য-এক রূপে। যে সিতু একদা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, যে একদিন শমীকে তার ভোগের সামগ্রী ক'রে চরম সর্বনাশের পথে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি, আকস্মিক আঘাতের ভিতর দিয়ে সেই সিতুর জীবনে যে পরিবর্তন এল, তার ফলে তার মধ্যে এক বিচিত্র মেটামরফসিস্ দেখা গেল। তার ফলে তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপে পাওয়া গেল হরিদ্বারে—যেখানে সে নতুন এক জীবনের স্বাদ পেয়েছে। অবশেষে সে শমীকে পেয়েছে, ভোগে নয়—স্ত্রীর মহিমায়, প্রেমে ও মমতায়। এই সিতুই এক সময় তার মায়ের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্যে প্রভুজীধামের প্রতিষ্ঠায় নিজেকে সমর্পণ করেছে—যেখানে সে নগর অতিক্রম ক'রে রূপনগরের স্বপ্ন দেখেছে।

গ্রন্থের শেষ অংশে লেখক স্পষ্টত 'নগর পারে রূপনগরের' আইডিয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন। 'নগর' সভ্যতার ভোগসর্বস্ব ব্যভিচার লোভ লোলুপতা অতিক্রম করে মানুষ একদিন রূপনগরের মহৎ জীবনের অধিকারী হবে, এমন একটি ইঙ্গিত দিয়ে লেখক

তাঁর এক নব জীবনাদর্শকে এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন —"একদিন রূপনগরের মশাল হাতে নিয়ে বেরুবে যারা।—আরো আসছে, আরো আসবে।" বুঝতে অসুবিধে হয় না—আমাদের সময়ের অবক্ষয়ী সমাজের সামনে এমনি এক বিশ্বাসনিষ্ঠ জীবনায়নকে তুলে ধরাই ছিল লেখকের অম্বিষ্ট। গ্রন্থটি পরিশেষে এমনি এক স্বপ্নাবিষ্ট আবহ সৃষ্টি করে সমাপ্ত হয়েছে।

৫। পর্যালোচনা

আমাদের সময়ে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে বিশ্ব-কথাসাহিত্যের যে দ্রুত বিকাশ ঘটেছে তা' যেকোন অর্থেই বিস্ময়কর। বিশ্ব-মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে মানবসভ্যতা ও জীবন যতই জটিল আকার ধারণ করেছে, জীবনের মূল্যবোধ যেভাবে বদলে গেছে—তার সঙ্গে তাল রেখে, অথবা, ঠিকমতো বলতে গেলে—তাকে যথাযথ রূপে রূপ দেবার তাগিদে আমাদের কথাসাহিত্যিকরা নিত্য নতুন আঙ্গিক ও রূপকল্পের উদ্ভাবন ঘটিয়ে চলেছেন, যদিচ নব নব বিষয়বস্তুর অন্বেষণেও তাঁদের অনীহা দেখা যায়নি। এমন একটি সাহিত্য-পরিমণ্ডলের মুখোমুখি হয়ে ইংরেজ ও য়ুরোপীয় লেখকদের রচনার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়বে। এবং, এক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি নাম আবশ্যিকভাবেই উঠে আসবে। এই তালিকায় বিশেষভাবে স্থান পাবে জেমস্ জয়েস, ফ্রানৎস কাফকা, জন গলসওয়ার্দি ও জাঁ পল সার্ত্রের নাম। এঁদের রচনার বিষয়বস্তুই শুধু নয়, রচনাশৈলী আঙ্গিক ও রূপকলার বিচারে সামগ্রিকভাবে তা যে বিশ্বকথাসাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, এঁদের রচনার রিক্‌থ বাংলা কথাসাহিত্যও অর্জন করেছে।

তবু যেন বিশেষভাবে জন গলসওয়ার্দির রচনার প্রভাব আমাদের কথাসাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আমাদের সামনে টলস্টয়ের 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস', রোমা রোঁলার 'জাঁ ক্রিসতফ' (ইংরেজি অনুবাদে 'জন ক্রিস্টোফার')-এর মতো মহাকাব্যধর্মী রচনার দৃষ্টান্ত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কোন রচনায়, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'য় অথবা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-র মধ্যে একটা বিশালতা আছে যা' আমরা নভেলের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি। তবু যেন মনে হয়—একালের লেখকসমাজকে এরা কেউই তেমন করে প্রভাবিত বা উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি যেমন পেরেছেন গলসওয়ার্দি।

বলতে বলতে, চকিতে, প্রসঙ্গত একবার ইংরেজি কথাসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। ইংরেজি কথাসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় জন গলসওয়ার্দি ও এ্যান্টনি ট্রলোপ এক নতুনত্ব এনেছিলেন। এঁরা দু'জনেই সমসাময়কি উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজকে তাঁদের রচনার উপজীব্য করেছিলেন। ট্রলোপের সঙ্গে গলসওয়ার্দির তফাৎ শুধু মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, নচেৎ দু'জনেই বিশাল ক্যানভাসে সমাজজীবনের, বিশেষত উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের শ্রেণীচরিত্র তাঁদের রচনায় তুলে ধরেছেন। এদিক থেকে, গলসওয়ার্দির 'দি ফরসাইট সাগা'র কথা অনিবার্যভাবেই উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এই নভেলের মডেলেই যে তারাশঙ্করের 'কীতিহাটের কড়চা' লিখিত, তা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। কিন্তু, শুধু তারাশঙ্করই নন, আমার ধারণা, তাঁর সঙ্গে অন্যান্য বাঙালী লেখকও ঐ মডেলে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কেও এমন একটি মন্তব্য করা চলে।

গলসওয়ার্দি তাঁর উপরোক্ত নভেলে এক বিশাল ক্যানভাস ব্যবহার করেছেন। নভেলের রূপকল্পের বিচারে তা অনেকটা গথিক স্থাপত্যের মতো একটি সুদৃঢ় ফ্রেমে বাঁধানো একটি পরিবারের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত। এই নভেলে গলসওয়ার্দি যে আদর্শ তুলে ধরেছেন, তা' হ'ল—সৌন্দর্যের সঙ্গে অধিকারের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব। আইরিন সেই সৌন্দর্য এবং তার স্বামী সোমেস ফরসাইট অধিকারের প্রতীক। মূলত এই সৌন্দর্য ও অধিকারের ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বের চিত্রটি তুলে ধরাই ঐ নভেলের অম্বিষ্ট। তার জন্যে যে বিশাল আয়োজন ও সমারোহ করা হয়েছে বিস্তৃত এক জীবনায়নের রূপায়নে, তার একমাত্র তুলনা হ'তে পারে মাইকেলেঞ্জোলের চিত্রকলা।

হাতের কাছে তেমন সমর্থনযোগ্য তথ্য না থাকা সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই, এই সংকলনের দুটি গ্রন্থই প্রকৃতপক্ষে গলসওয়ার্দির মডেলে রচিত। গলসওয়ার্দি অতীতায়ন পদ্ধতিতে বর্তমানের পারিপার্শ্বিকতায় অতীতের ঘটনাবলী বিবৃত করেছেন এবং তার ভিতর দিয়ে একটি যুগকে গেঁথে রেখেছেন 'দি ফরসাইট সাগা'য়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও তেমনি একই ভঙ্গীতে আলোচিত দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তদুপরি, গলসওয়ার্দি যেমন সৌন্দর্য ও অধিকারকে তাঁর রচনার লক্ষ্যবস্তু ও জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর দুটি গ্রন্থেই এর অনুসরণ করেছেন। বস্তুত, 'শত রূপে দেখা'র চণ্ডী ও রাধানাথ সেই ছাঁচেই গড়া। এখানে স্পষ্টত আইরিন ও ফরসাইটের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একইভাবে 'নগর পারে রূপনগর'-এ জ্যোতিরাণী ও শিবেশের চরিত্র গড়ে উঠেছে—এখানেও সেই সৌন্দর্য ও অধিকারের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব এবং তার পরিণতি দেখানো হয়েছে। তফাৎ শুধু এই—গলসওয়ার্দি সোমেস ফরসাইটের প্রতি তাঁর সমর্থন গোপন করেননি, অন্যদিকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় অবশ্যই চণ্ডী ও জ্যোতিরাণীর প্রতি তাঁর গভীরতম সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

৬। উত্তরভাষণ

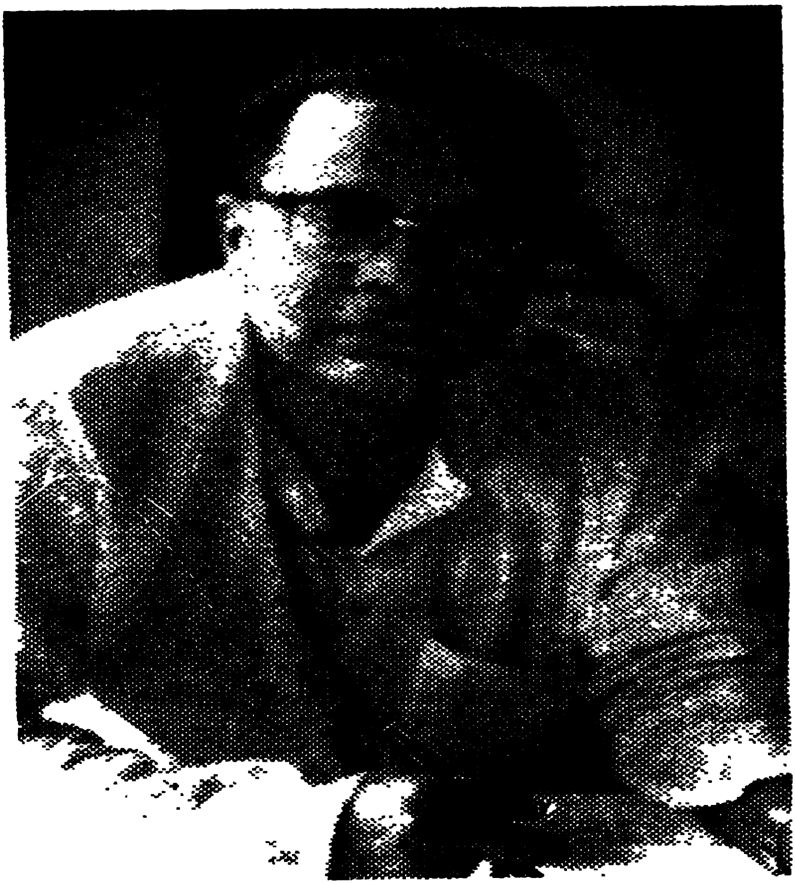
এই সংকলনের গ্রন্থ দু'টির নামকরণের দিকে লক্ষ্য রাখলে একটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দুটি গ্রন্থেই 'রূপ' শব্দটি ব্যবহৃত। লেখক বারংবার এই শব্দটি ব্যবহার করে গেছেন। লক্ষণীয় এই যে, দুই নায়িকা—চণ্ডী ও জ্যোতিরাণী, দুজনেই অসামান্যা সুন্দরী। এই দুটি চরিত্রের সৌন্দর্যে অবগাহন করে লেখ রমণী ও নারী রূপের পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে তার আলোকে নিজেকে অভিষিক্ত করেছেন। গ্রীকদের কাছে সৌন্দর্য ছিল জীবনের ঐকান্তিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা। কথাসাহিত্যিক হিসেবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তেমনি এক সৌন্দর্য খুঁজেছেন নারীর মধ্যে, এবং এই সৌন্দর্যের মধ্যে নারীজীবনের চরিতার্থতা তুলে ধরেছেন। তারই উৎসার এই দুটি গ্রন্থের নায়িকাদের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। শুধু এইজন্যেই তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
রচনাবলী
দ্বাদশ খণ্ড

শতরূপে দেখা



'...আমার আর কিছুই মনে নেই দাদুভাই! ওই বয়সে বেশি কি আর মনে থাকতে পারে বলো। আমার যা-কিছু দেখা, পাঁচজনের চোখ দিয়ে দেখেছি, তাদের কান দিয়ে শুনেছি, মন দিয়ে অনুভব করেছি। এই দেখা শোনা আর অনুভব করা আমাকে এমন করে টানে কেন সেটা অবশ্য আশ্চর্য। যাক, এ তো অনেক শুনেছ।

'যা বলছিলাম, নিজের চোখে দেখে মনে রাখার মধ্যে ওই একখানা মুখই আমার মনে আছে। এই দেখাটুকু আমার নিজস্ব, এই মনে রাখাটুকুও। এটুকুর জন্য আর কারো চোখ কান মনের শরণ নিতে হয় নি। আমি ওই ছ'বছর বয়সে সে মুখ দেখেছি দাদুভাই, মনে হয় সেই মুখ আর কেউ দেখে নি। সে-মুখ ভোলবার নয়। চুপি চুপি বলি, তোমার বউয়ের ওপর আমার দুর্বলতা আছে যদিও, কিন্তু যার কথা বলছি তার মত দ্বিতীয় একখানা মুখ এত বয়সেও আর চোখে পড়ল না। কত কাল, কত যুগ তো হয়ে গেল, তবু ওই মুখের বয়েস বাড়ল না। ঠিক তেমনি তাজা, আর তেমনি সুন্দর। চোখ বুজে যত দেখি ততো সুন্দর লাগে।

'...হাঁ, তার আর এক রূপও চেষ্টা করলে মনে করতে পারি। সেও সুন্দর বটে। কিন্তু সে-মুখ বিসর্জনের মুখ। তাই শেষের সেই ছবি আমি মন থেকে ছেঁটে সরিয়ে দিয়েছি। সেটা যে এক দুঃস্বপ্নের ছবি! দুঃস্বপ্ন কে মনে করে রাখতে চায় বলো। আমি শুধু ওই আগের রূপ লালন করেছি, পালন করেছি। তার সেই রূপই তো তুমি ফেরাবে কথা দিয়েছ। আত্মজন মরে গেলে লোকে পিণ্ডি দেয়, তর্পণ করে। দাদুভাই, আমার সেই বিচিত্র মায়ের তর্পণ আজও হল না। তোমাব ভিতর দিয়ে আমি শুধু সেই তর্পণের তোড়জোড় করে গেলাম। তুমিও যদি শেষ করতে না পারো তোমার ছেলেকে ভার দিয়ে যেও। মোট কথা, সেই রূপের বংশ আর রূপ ফলাবে, রূপ ফেরাবে—তখন মা যা ঘোষণা করেছিল তাই সত্যি হবে। সত্যি হবে যে, করণের পাপ আমার মায়ের পাপ নয়। সত্যি হবে যে, উল্টে আমার মায়ের পুণ্যে করণের পাপ মুছবে একদিন।

'দাদুভাই, এযাবৎ লক্ষ কথার বুনটে মুড়ে আমার সেই রূপবতী মা-কে তোমার চোখের সামনে হাজির করতে চেষ্টা করেছি। তুমি কখনো হেসেছ, কখনো ভেবেছ দাদুটা পাগল। কিন্তু দেখতে যে পাও নি, জানি। আমার বিশ্বাস একদিন পাবে। যে-দিন মনে হবে করণের আকাশে হাসি লেগেই আছে, যেদিন মনে হবে করণের গাছে পাতায় মাটিতে বাতাসে প্রাণের খেলার জোয়ার নেমেছে, যেদিন দেখবে করণে আর শুকনো কিছু নেই—বন-জঙ্গল খাল-বিল, পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ি সব আবার জীবন্ত নতুন হয়ে উঠেছে, আব, যেদিন দেখবে করণের মানুষগুলোর চোখে মুখে কারণে অকারণে খুশির আলো ঠিকরে পড়ছে—আর, করণের এত রূপ দেখে যেদিন তোমার চোখে পলক পড়বে না—তখনই জেনো, আমাব মা ফিরেছে, আমার সেই রূপসী মাকেই দেখছ তুমি।

'আর, এ যখন দেখবে, তখনই দেখবে আমার মা-ও তোমার দিকে চেয়ে হাসছে মিটিমিটি।'...

ট্রেনটা ঢিমেতালে চলেছে। এ-পথে লোকাল ট্রেনগুলো এভাবেই বুড়ী ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোয়। কলকাতা থেকে আড়াই ঘণ্টার রাস্তা মাত্র। কিন্তু তাতেই ক্লান্তি এসে যায়। এ-সব গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসের খদ্দের হয়ই না বড়। কামরাটাতে হাত পা ছড়িয়ে বসন্ত ঘোষাল একা চলেছেন। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর গাড়িতে উঠেছেন। ঝিমুনি আসছিল। কি মনে পড়তে ঝিমুনি কেটে গেল। হাত-ব্যাগ খুলে একটা মোটা খাম বার করলেন। তার ভিতরে চিঠি একটা। তাঁরই চিঠি। দাদুর লেখা। সন্তর্পণে ভাঁজ খুলে পড়লেন চিঠিখানা।

একুশ বছর আগের লেখা চিঠি।

এই চিঠি পড়ার জন্য চিঠি খোলার দরকার ছিল না। হয়ত হাজার বার পড়া হয়ে গেছে। প্রতি ছত্র প্রতি শব্দ জানা। তবু খোলেন কেন? খোলেন কারণ, এর মধ্যে একজনের একখানা মুখ ভেসে ওঠে। একখানি বৃদ্ধ-শিশুর মুখ। আর চিঠির কথাগুলো তখন তাঁরই জলজ্যান্ত কথা হয়ে ওঠে। বসন্তবাবু যেন কান পেতে তাই আস্বাদন করেন।

পড়া হতে খোলা চিঠিটা পাশেই পড়ে থাকল। আজও এইসব উক্তি দাদুর পাগলামিই ভাবেন তিনি। দাদা লিখবেন কেন, বসন্ত চাটুজ্জে নিজেই কতদিন বলেছেন, দাদু, তুমি একটা আস্ত পাগল। যা বলেন নি তা মনে মনে বলেছেন বরাবরই। বলেছেন, তুমি এক অদ্ভুত মন-ছোঁয়া পাগল দাদু।

এখনো সেই অনুক্ত কথাই হাসি হয়ে লেগে আছে বসন্তবাবুর ঠোঁটের ফাঁকে।

আর এও জানেন, দাদুর সেই পাগলামি আর এতদিনে তাঁকেও বেশ ভালো রকমে ভর করেছে।

রূপসী মা বলতে দাদু কোনো দেশ বা কোনো রূপকের উপাসক নন্! সেই মা বলতে তাঁর মা-ই। রক্তমাংসের মা। যে মা-কে মাত্র ছ'বছর বয়সে তিনি হারিয়েছেন। কিন্তু দুনিয়ায় এই একজনের কাছেই সেই রমণীর মাতৃপরিচয়। একলব্য গুরুর অগোচরে গুরুপূজা করেছিলেন। দাদু গোটা জীবন মায়ের অগোচরে মাতৃপূজা করেছেন। সেই মায়ের রূপ কেউ দেখে নি, যারা দেখেছে রমণীর রূপ দেখেছে। যে-রূপ শতেক আলো জ্বালে আবার শতেক মশাল জ্বালে, সেই রূপ। বছরের পর বছর ধরে লোকের মুখে শুনে শুনে, মুন্‌কে বুড়ো আর প্রসন্ন বুড়ীকে স্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ফাঁক পেলেই করণে এসে এসে, আর সব শেষে নিজের কল্পনা দিয়ে বুনে বুনে মায়ের ভিতরের আর বাইরের একটা পরিপূর্ণ রূপ তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। ঐ-ই তাঁর একমাত্র নেশা ছিল। ঠাট্টা করলে হেসে বলতেন, মায়ের আসল রূপ কে দেখে নি দাদুভাই, গোটা করণ যখন প্রাণের আনন্দে ভরপুর হয়ে হাসবে তোমার দিকে চেয়ে—তখন টের পাবে মায়ের আসল রূপটি কেমন। সেই রূপ দেখলে তোমার কি অবস্থা হয় কে জানে। মা যে জোর গলায় বলে গেছে এই রূপে ফিরবে, সেই রূপে তাকে ফেরাতে হবে।

ফেরাতে হবে, ফেরাতে হবে, ফেরাতে হবে...। শুধু এই কথাগুলোই কত সময় দাদুকে বিড়বিড় করে বলতে শুনেছেন বসন্তবাবু ঠিক নেই।

একুশ বছর বয়স পর্যন্ত দাদুর সঙ্গে এই পথে এই ট্রেনে করে কতবার বসন্ত ঘোষাল করণে এসেছেন হিসেব নেই। তখন আসতেন অবশ্য থার্ড ক্লাসে। ফাঁক

পেলেই অথবা দু'দিন কলেজ ছুটি থাকলেই দাদু তাঁকেও ধরে নিয়ে আসতেন। অনেক সময় অত্যাচারের মতো লাগত সেটা। কিন্তু আপত্তি করলেই দাদু বড় মুষড়ে পড়তেন। তাঁর প্রাণের জোয়ারেই যেন টান ধবে যেত। তাই মুখ বুজে আসতে হত। দাদু তাঁকে করণেব ঘরবাড়ি দেখাতেন, বনজঙ্গল গাছগাছড়া দেখাতেন, নদীনালা দীঘি দেখাতেন, পূজাপার্বণ উৎসব গানবাজনার জায়গাগুলো দেখাতেন, আব গল্প করতেন কোন্‌টা কি ছিল বা কেমন ছিল। বসন্তবাবুর তখন মনে হত, বুড়ো এক মরা অতীতের ভরা রূপেব মধ্যে বাস করছেন। যে রূপ, যে অতীত তিনি নিজেও দেখেন নি—সংগ্রহ কবেছেন।

বসন্তবাবু অনেক সময় বিরক্ত হতেন আবার অনেক সময় হাসিও পেত। দাদু নিজেই গল্প করতেন, করণের মানুষদের পাগলামির খ্যাতি ছিল। তিনি বুড়োর দিকে চেয়ে চেয়ে সেই পাগলামি দেখতেন।

ঘড়ি দেখলেন বসন্তবাবু। আরো ঘণ্টা দেড়েকের পথ। চিঠিটা খামে পুবে হাত-ব্যাগে রাখলেন। পিছনে মাথা রেখে চোখ বুজলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন আগের আর এক দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। বসন্তবাবুব এই বাহান্ন বছরের জীবনে সে বড আশ্চর্য ঘটনা।

একুশ বছব আগের কথা। তখন একত্রিশ বছর বয়স তাঁর। তিনি তখন দ্বিতীয় দফা বিদেশে। দেশ থেকে এঞ্জিনিয়াবিং পাস করে বেরিয়ে প্রথম উচ্চশিক্ষার পর্ব ইংলণ্ডে শেষ হয়েছে। বড় কোম্পানির বড চাকরি নিয়ে কলকাতায় দু'বছর দাদুর কাছে ছিলেন তারপর। শেষে ওই কোম্পানিই আবো বাড়তি অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাদের কৃতী এঞ্জিনিয়ারকে জার্মানীতে পাঠিয়েছে। এখানেও দেড় বছর কেটেছে, আরো এক বছব থাকার কথা।

এমনি এক দিনে ভাবী এক অদ্ভুত কাণ্ড। জার্মানীর কোনো নামকরা হোটেলের দোতলার একটা সুইটে থাকেন তিনি। হঠাৎ দেখলেন, খবর নেই, বার্তা নেই, দরজা ঠেলে দাদু ঘবে ঢুকলেন। দেখা মাত্র বসন্তবাবু আকাশ থেকে পড়লেন—দাদু তুমি! কি আশ্চর্য!

দাদু তাঁর দিকে চেয়ে হাসছেন মিটি মিটি। বললেন, এলাম তোকে একবার দেখতে, কতকাল দেখিনি বল্ তো! তা তোর যে একেবারে দেশে ফেরার নাম নেই দেখি!

বসন্তবাবু আনন্দে আত্মহাবা একেবারে। দাদুর তখন সাতাশি বছর বয়েস। এই বয়েসে দাদু কি করে এলো, কি করে আসতে পারল এটা একবারও মনে হল না তাঁর—দাদুকে দেখেই আনন্দ ধরে না। দাদুকে নিয়ে কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বলে উঠলেন, তুমি সত্যিই এখানে এসে গেলে আমাকে দেখতে, বলো কি দাদু!

হ্যাঁ রে, বয়েস হয়ে গেল, এরপর দেখা হবে কি হবে না ঠিক কি।

সে কি দাদু, তুমি যে বলেছিলে অনেক জ্বালাবে, শ' না পুরিয়ে নড়ছ না!

সে তো আমার কথা, উপরঅলা সে কথা শুনবে তার কি মানে। তা হ্যাঁ রে দাদুভাই, তোর সঙ্গে এতকাল ধরে যে কথা চলছে সব মনে আছে তো? আবার ভুলে যাবি না তো? তুই কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছিলি...

বসন্তবাবুও বলেছেন, তোমার দেখছি সত্যি ভীমরতি ধরেছে দাদু, তুমি আমাকেও অবিশ্বাস করছ?

না রে না, অবিশ্বাস নয়, তোকে অবিশ্বাস করলে আমার আর থাকল কি। যাক নিশ্চিন্ত। এবার আমি যাই তা হলে?

বসন্তবাবুও কিছু খেয়াল করলেন না, কলকাতা থেকে জার্মানীতে এসেছেন তাও কেমন আর মনে থাকল না। বললেন, হ্যাঁ দাদু এসো, তুমি এলে বড় ভালো লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত বিছানায় উঠে বসোছলেন তিনি। তখনো ভালো করে ভোর হয় নি। কোথায় দাদু কোথায় কে। জার্মানীর দোতলার সুইটে তিনি একা। ঘুমুচ্ছিলেন। স্বপ্ন দেখেছেন।

সেই সকাল থেকে মনটা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। দু দফায় দীর্ঘকাল সাগর-পারে কাটানোর ফলে তাঁর মনে কুসংস্কারের ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। তবু।

দুপুর না গড়াতেই এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম এলো। সেটা খোলার আগেই তিনি বুঝেছিলেন ওটা কি সংবাদ বহন করে আনছে।

দাদু নেই।

জার্মানীতে অবস্থানের মিয়াদ ছেঁটে দিয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনি দেশে রওনা হয়েছেন। ফিরছেন হাওযাই জাহাজে। কেন যে তাঁর অত ফেরার তাড়া তিনি নিজেও জানেন না। শুধু মনে হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার। দাদুর হাতে টাকাকড়ি মন্দ ছিল না এককালে। তিনি বলতেন সে-সব তাঁর সেই করণের মায়ের কল্যাণে। ব্যবসায় খাটিয়ে তিনি কিছু বাড়িয়েছিলেন এই পর্যন্ত। কিন্তু তার আর অবশেষ কিছু ছিল না। কলেজ-জীবন শুরু হওয়ার পর থেকে পড়াশুনার জন্যে বসন্তবাবুর আর টাকাকড়ি কিছু দরকার হয় নি সত্য। বরাবর প্রথম হয়েছেন, বরাবর বৃত্তি পেয়েছেন। কিন্তু দাদুর মায়ের সেই টাকায় তাদের খাওয়া-পরা চলেছে। তাঁকে সচেতন রাখার জন্যেই হয়ত দাদু মাঝে মাঝে বলতেন শুধু আমি কেন, আমার মায়ের কাছে তুইও ঋণী, বুঝলি?

বসন্তবাবু হাসতেন। একবার ফস করে বলে বসেছিলেন, তোমার মায়ের স্বভাব-চরিত্র ভালো ছিল তো দাদু, অত টাকা ঠাকরোন পেলেন কোথায়?

এ-সব কথায় দাদুর রাগ হত না। হেসে চোখ রাঙাতেন, ভালো না হলে তুই এরকম হলি কি করে রে ব্যাটা, ফজলি গাছে গাব ফলে?

না, টাকাকড়ি বিষয়-আশয় কিছুই আর ছিল না, সেজন্য বসন্তবাবুর ফেরার তাড়া নয়। তবু কেবলই থেকে থেকে মনে হয়েছে তাঁর ফেরা দরকার, দাদু যেন তাঁর জন্য কিছু রেখে গেছেন—দু' হাত পেতে সেটা নেওয়া দরকার।

হাওয়াই জাহাজে বসেও ঘুরে ফিরে শুধু দাদুর কথাই মনে হয়েছে তাঁর। কত কথা ঠিক নেই। সে-সব অতি তুচ্ছ কথাও যেন দাদুর স্পর্শ হয়ে তাঁর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়েছে। দু-দুবার বিলেত জার্মানী ঘোরা সাহেব মানুষ তিনি, বড় এঞ্জিনিয়ার, বয়েস মাত্র একত্রিশ—সাতাশি বছরের বুড়ো দাদু মরেছে বলে তাঁর চোখে জল দেখলে যাত্রীরা অবাক হবে। চোখের জল তিনি ঠেকিয়েছেন। কিন্তু একত্রিশ বছরের এঞ্জিনিয়ার এগারো বছরের ছেলেমানুষের মতই মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করেছেন, দাদু, তোমার কথা আমি ভুলব না। তোমাকে যে কথা দিয়েছি সে কথা আমি রাখব। তুমি যা চেয়েছ একদিন তাই হবে দাদু। তোমাদের করণের মুখ তোমার মায়ের মুখ হবে।

করণের বুকে তোমার মা হাসবে।

কিন্তু একুশ বছর আগের সেই প্রতিজ্ঞা বসন্তবাবু খুব স্বাভাবিক ভাবেই ভুলতে বসেছিলেন।

ভোলা ঠিক নয়। মনের গোচরে হোক অগোচরে হোক, কোনো নিভৃতে সেটা ছিলই। মাঝেসাঝে উঁকিঝুঁকি দিত। বসন্তবাবু ভাবতেন সময় এলে আর সুযোগ এলে হবে। কিন্তু হবে হবে করতে করতে কোথা দিয়ে একটানা এতগুলো বছর কেটে গেছে। নিভৃতের ইচ্ছেটা ক্রমে দূরে সরেছে।

দেশে ফেরার পর সম্পদের মধ্যে স্ত্রী তাঁর হাতে দাদুর ওই চিঠিখানা দিয়েছিলেন। আর নিজে তিনি দাদুর সারা জীবনের সংগ্রহ একরাশ লেখা কাগজ-পত্র সযত্নে গুছিয়ে তুলে রেখেছিলেন। গোড়ায় গোড়ায় সেগুলো নামিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতেন। তারপর কাজের ব্যস্ততায় সে অবকাশও হত না।

কর্মজগৎ বছরের পর বছর ধরে প্রশস্ততর হয়েছে বসন্তবাবুর। কোম্পানির চাকরি ছেড়ে কেন্দ্রীয় সরকারেব ডাকে সাড়া দিতে হয়েছে। তাদের বড় বড় পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হযেছেন। এখানেও নাম হয়েছে, যশ হয়েছে, প্রতিপত্তি বেড়েছে। এঞ্জিনিয়ারিং-এর এক বিশাল বিভাগের তিনি কর্ণধার।

সেই ব্যস্ততার মধ্যে দাদুর মুখখানাও ক্রমে মুছে যাচ্ছিল।

বছর কয়েক আগে এক সামান্য উপলক্ষে সেই মুখখানা হঠাৎ বড় অদ্ভুত স্পষ্ট হয়ে উঠল। বসন্তবাবুর ছেলে ভালো পাস করেছে, এখন এঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, না জেনারাল লাইনে এগোবে ঠিক করতে না পেরে খুঁত খুঁত করছিল। স্ত্রীর মুখে সে-কথা শুনে কি যেন হল, হঠাৎ নিজের একটা গালে বার দুই হাত বোলালেন বসন্তবাবু' আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতির একটা বাঁধ যেন ভেঙে গেল। আর, সেই দিনটা চোখের সামনে দেখলেন।

...আই-এসসি ভালো ভাবে পাস করেছেন তিনিও। স্কলারশিপ পেয়েছেন। এঞ্জিনিয়ারিং পড়া ঠিক, পরীক্ষার ফল বেরুবার অনেক আগে থেকেই। সেটা দাদুর নির্দেশ। কিন্তু তাঁর নিজের ঝোঁক ডাক্তারি পড়বেন, ডাক্তার হবেন। এঞ্জিনিয়ারিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে মেডিক্যাল কলেজেও আবেদন করে রেখেছিলেন। সেখানেও হবেই জানা কথা। পরীক্ষার ফল বেরুতেই দাদু খুশীতে আটখানা। এই খুশীর মুখেই মনের বাসনাটা জানানো যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল বসন্তবাবুর। বলেছিলেন, দাদু, এঞ্জিনিয়াবিং না পড়ে যদি মেডিক্যাল কলেজে পড়ি?

দাদুর মুখখানা হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। একটু চুপ করে থেকে বলেছেন, না, এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে—তাই পড়োগে।

বসন্তবাবু বলেছিলেন, ব্যবস্থা মেডিক্যাল কলেজেও হয়ে আছে, আমার মনে হয় এই লাইনে আমি বেশি ভালো করব।

তারপরই বিষম বিস্ময়। বুড়োর রোগা হাতের একটা হৃষ্টপুষ্ট চড় ঠাস করে

তাঁর গালে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত আর্তনাদ, এইটুকু বয়েস থেকে তোকে আমি কি বলে এসেছি, কি ঢুকিয়ে এসেছি তোর কানে?

বসন্তবাবু হতভম্ব। একটু বাদে দাদুও। জীবনে ক'টা দিন হাত তুলেছেন নাতির গায়ে এক আঙুলে গোনা যায় হয়ত। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না বুড়োর, দাদুভাই, আজকে এই আনন্দের দিনে তোকে মারলাম, তোর লেগেছে, তোর গালে দাগ পড়ে গেছে—

তাঁর সেই কান্না দেখে বসন্তবাবু শেষে হেসে সারা। বলেছেন, দাদু, করণের এত পাগলের গল্প শুনেছি, কিন্তু তুমি করণের সেরা পাগল। আর কক্ষনো তোমাকে কষ্ট দেব না, আমি এঞ্জিনিয়ারই হব।

নিজের ছেলেকে ডেকে বসন্তবাবু শুধু বলেছেন, তুমি এঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, আর কিছু ভেবে কাজ নেই।

...এরপর দিনকয়েক যেন নিজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করেছেন তিনি। ...এখনো সময় হয়নি। সময় হবে, সুযোগ আসবে। যা করার তখন ঠিক করবেন। দাদুর কথা তিনি ভোলেন নি। নিজের বাবাকে বসন্তবাবু চোখেও দেখেন নি। তাঁর জন্মের দুমাস আগে বাবা মারা যান। অতবড় শোকও দাদু ভুলতে পেরেছিলেন তাঁকে পেয়ে। আবার কিছু আশার সম্বল পেয়ে। বাবা নাকি দাদুর কথায় কান দিতেন না, দাদুর ব্যথা বুঝতেন না। বাবা বেঁচে থাকলে বসন্তবাবুকেও তাঁর ইচ্ছেমতই চলতে হত কিনা কে জানে। আর কে জানে, দাদুর ইচ্ছে পূরণ হবে বলেই বাবা অমন অসময়ে গেছেন কিনা। আট ন'বছর বয়সে মা-কেও হারিয়েছিলেন বসন্তবাবু। তার পর থেকে ওই দাদুই মা-বাবা, দাদুই সব। তিনি না থাকলে কোথায় ভেসে যেতেন ঠিক নেই।

এই দাদুকে ভুলতে পারেন তিনি? নিজের প্রতিশ্রুতি ভুলতে পাবেন? নিজেকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছেন বসন্তবাবু, সময় আসুক, সুযোগ আসুক। এখন কি-ই বা করতে পারেন তিনি?

আবার দিন গেছে। কাজের ভিড়ে সঙ্কল্প মনের তলায় অদৃশ্য হয়েছে। বসন্তবাবু পঞ্চাশে পা দিয়েছেন।

ঠিক দু'বছর আগের কথা। ভিতরে ভিতরে বসন্তবাবু আবার একটা নাড়াচাড়া খেয়েছেন।

আরো অনেক বড় পদমর্যাদা নিয়ে সপরিবারে বসন্তবাবুর বিদেশে স্থিতি হবার কথাবার্তা চলছে তখন। গেলে দীর্ঘদিনের জন্য যেতে হবে। আমাদের সরকারী চাকাটা এমনই, যোগ্যতার যে সিঁড়ি টপকে ঊর্ধ্বে আরোহণ, সেই কাজের সঙ্গেই সম্পর্ক ঘুচে যায় অনেক সময়। ডাক্তার মিনিস্টার হয়, এঞ্জিনিয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়, বিজ্ঞানী ডাইরেক্টর হয়ে ফাইল সই করে। বসন্তবাবুর কর্মভাগ্যও উন্নতির সেই গোছেরই একটা শিখরের দিকে এগলো। এক আন্তর্জাতিক স্থপতি সংস্থা গড়ে ওঠার তোড়জোড় প্রায় সুসম্পন্ন। ভারতপ্রতিভূর আসনটি তাঁরই পাবার কথা।

এই কথা যখন অনেকটা এগিয়েছে, তখনই আবার এক বিচিত্র পরিবর্তন এলো বসন্তবাবুর মনে। রাত্রিতে হঠাৎ দাদুকে স্বপ্ন দেখলেন আবার। চোখে ব্যথাভরা অনুযোগ।—কি রে ভুলে গেলি? কথা দিয়ে কথা রাখলি না? তোর আর কবে সময় হবে?

ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কাটল সকালটা। নিজের অগোচরের দুর্বলতা ভেবে উড়িয়েও দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভিতরটা খচখচ করে বিঁধতেই থাকল। আর সেইদিনই অফিসের কাজে হাত দিতেই এক বিস্ময়কর যোগাযোগ ঘটল। এমন বিস্ময়কর যে ভাবলেও রহস্য মনে হয়। দেশের কর্ণধারেরা অনেক সময় বড় কথা বলেন, বড় স্বপ্ন দেখেন। বসন্তবাবু সে-সবের কানাকড়িও দাম দেন না, চাকরির খাতিরে যেটুকু মনোযোগ দেওয়া দরকার সেইটুকুই দেন শুধু। কিন্তু আজ ওপরের মহল থেকে একটা ফাইল এসেছে, তাতে সরকারী খরচায় স্বাধীন দেশে জায়গা বেছে গোটাকয়েক মডেল ভিলেজ বা আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা যায় কিনা সেই প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞ মন্তব্য চাওয়া হয়েছে।

বসন্ত ঘোষালের মানসিক পরিবর্তনের সূচনা এই থেকে।

বিদেশের শিক্ষাপুষ্ট বৈজ্ঞানিক মন তাঁর, তবু কেবলই থেকে থেকে মনে হয়েছে এ যেন এক বিধিনির্দিষ্ট ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা অনেক আগে থেকেই ছকা আছে—হয়ত তাঁর জন্ম থেকেই, হয়ত এঞ্জিনিয়ারিং পড়া নিয়ে দাদু যেদিন তাঁর গালে চড় কষিয়ে বসেছিলেন, সেই দিন থেকেই । হয়ত তিনি বা তাঁর দাদু বা করণের সেই সুদূরকালের এক মেয়েও, যা ঘটবে তার লক্ষ মাত্র।

বসন্তবাবু ভাবেন। যতো ভাবেন ততো উদ্দীপনা বোধ করেন। এই সুযোগ থেকে স্বেচ্ছায় সবে দাঁড়ালে আর সুযোগের প্রত্যাশা করা মিথ্যে। তিনি সায় দিলেন। শুধু সায় দিলেন না, সরকারী অনুষ্ঠান যন্ত্রের মধ্যে ফেলে সমারোহে প্রস্তাবটা বড় করে তুলতে লাগলেন। ক্রমে সেটা আকার পেল। অনেক পরিশ্রম করে তিনি প্ল্যান দিলেন, টাকার হিসেব দিলেন, মডেল গ্রাম কোন্ কোন্ জায়গায় হতে পারে তালিকা পেশ করলেন।

বলা বাহুল্য সেই তালিকায় বাংলা দেশের যে একমাত্র গ্রামটি যুক্ত হল, সে করণ।

বহু পরিশ্রমের পর, চাকরি-জীবনের শেষ মর্যাদা দিয়ে লড়াই করার পরে দু'বছরের চেষ্টায় প্ল্যান পাস হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিভূর আসন তিনি প্রত্যাখান করেছেন। এই দু বছরে অনেকবার তাঁকে দিল্লী থেকে বাংলাদেশে ছোটাছুটি করতে হয়েছে। এখানকার সরকারী অনুমোদন সহজেই মিলেছে। কেন্দ্রের খরচায় যদি মডেল ভিলেজ হয় একটা আপত্তির কি আছে? কেউ কেউ অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন, এত জায়গা থাকতে করণ কেন?

করণ কেন, সেটা বসন্তবাবু সহজেই বোঝাতে পেরেছেন। করণের মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ঝড়, বন্যার ইতিহাসই করণের দাবী।

বাংলা দেশের এই মডেল ভিলেজ গড়ার সমস্ত ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন বসন্ত ঘোষাল। তাঁর পিছনে রয়েছে সরকারের শক্তি। কিন্তু তাঁর কেবলই মনে হয়েছে সেটা তুচ্ছ। আসলে তাঁর দাদুর শক্তিই বুঝি কাজ করছে। তাও না, হয়ত বা সত্যিই দাদুর সেই অনন্যা মায়ের ইচ্ছেশক্তিই এই সব কিছুর মূল প্রাণ।

ছোট স্টেশন।

তার চালচুলো নেই। আধুনিক কোনো রূপ নেই। ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি নেই।

কোনো দূরপাল্লার গাড়ি এখানে থামে না। যেগুলো থামে স্টেশন ছুঁতে না ছুঁতে আবার যাবার জন্য ব্যস্ত।

বসন্ত ঘোষাল নামলেন। তাঁর সঙ্গে শুধু বড়সড় হাতব্যাগ একটা। ময়লা গেঞ্জির ওপর তালি দেওয়া কালো কোটপরা টিকিটবাবু সাহেব আগন্তুক দেখেই যেন আর একটু তৎপর হয়ে গেটের সামনে এগিয়ে এলো। ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট হাতে নিয়ে যাত্রীর মুখখানাই মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করল সে। কারণ আছে। নিখুঁত সাহেবী পোশাকের এই লম্বাচওড়া ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীটিকে মাসকয়েক আগেও সে বারকতক করণে যাতায়াত করতে দেখেছে। আসে, দু'পাঁচ ঘন্টা থাকে, আবার চলে যায়—টিকিটবাবুর কৌতূহল স্বাভাবিক। কিন্তু ভরসা করে মুখ ফুটে সে কিছু জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারে না।

তার মুখের দিকে চেয়ে বসন্তবাবু হাসলেন একটু, তারপর এগিয়ে গেলেন: ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস লেগে থাকল। দাদু বলতেন, করণের পুরনো কালের ছেলে-বুড়ো সক্কলে সর্বদা রসে-কৌতুকে ডগমগ করত, আর আগন্তুক দেখলেই যেচে আলাপ করত।

বাইরের একদিকে দূরকালের কয়েকটা জীর্ণ ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে! ঘোড়াগুলো হাড় বার করা, গায়ে শুকনো ঘা। ওগুলোর দিকে চোখ পড়লে গাড়িতে উঠতে মায়া হয়। কিন্তু যাত্রী দেখলেই গাড়োয়ানরা ডাকাডাকি হাঁকাহাকি করবে। ওদের মূর্তিও ঘোড়াগুলির মতই শীর্ণ। বিপরীত দিকে গোটাকতক সাইকেল-রিকশ ঝক-ঝক করছে। সাইকেল রিকশও এখানে খুব বেশি দিন চালু হয় নি। প্রায় সব ক'টাই নতুন। আধুনিক কালের দূত ওগুলো, তাই যেন সামনের ঘোড়ার গাড়ির কাল থেকে কিছু দূরে সরে আছে, আর সগর্বে পুরনো অতীতের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছে। এই বাহনের চালকেরাও অপেক্ষাকৃত কুলীন, তবু ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে রেষারিষি করে এদেরও যাত্রী ডাকতে হয়।

বসন্ত ঘোষাল আজ ঘোড়ার গাড়ি বা সাইকেল-রিকশ কিছুই নিলেন না। ব্যাগ হাতে হেঁটে চললেন।

দূর দিগন্তের দিকে উধাও লাল সুরকি বিছানো আঁকা-বাঁকা পথ। মনে হয়, আদিগন্ত এক প্রান্তরের মাঝে ধুলো-বালি মাখা একটা অতিকায় সাপ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। চারদিকে ধূ-ধূ মাঠ, মাঠে রোদের ঝিলিমিলি লাল রাস্তার আর একটা দিক যেন দূরের এক গহন কালো অরণ্যের ছায়ায় গিয়ে মিশেছে।

ওখানেই চলেছেন বসন্ত ঘোষাল। ওটা অরণ্য নয়। তবে এখন শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যেরই ছায়া পড়েছে বটে। বনাকীর্ণ ওই এলাকা বহুকালের বিস্মৃতির ধুলোয় ঢাকা। ওখানে বহুযুগের এক জনপদের অতিবৃদ্ধ বিদায়ী আত্মা জবুথবু হয়ে বসে আছে।

কাছাকাছি এলেন। সামনে ভবানী কালির মন্দির। দেয়াল খসে পড়েছে, ছাদ ধ্বসে গেছে, বড় বড় জীর্ণ থামগুলি যেন ক্ষতবিক্ষত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মেলে আকাশে আশ্বাস খুঁজছে। একদিন নাকি এই ভবানী কালী ছিলেন করণ গাঁয়ের রক্ষাকর্ত্রী। কিন্তু সেই একদিনের কথা অনেক দূরের কথা। আজ এই ভবানী কালীর অবয়বেও কালের জরা নেমেছে। আজও এখানে পূজো হয়, কিন্তু সেটা সেইকালের পূজো

নয়, নিয়মের পূজো।

দাওয়ার ওপর শতছিন্ন সুতির কোট গায়ে সেই মাঝবয়সী লোকটাকে এবারেও দেখলেন বসন্তবাবু। আগেও একবার এখানেই দেখেছিলেন, কথা বলেছিলেন। বসন্তবাবু বলেন নি, লোকটাই এগিয়ে এসেছিল। এবারেও এলো। কিন্তু চিনতে পারল না। দিনেদুপুরেই বেশ মদ খেয়েছে বোঝা যায়। পকেটে অ্যালুমিনিয়ামের তোবড়ানো গেলাসের খানিকটা বেরিয়ে আছে। দু'চোখ কোটরে, মুখে অজস্র হিজিবিজি রেখা। এই পরিবেশে যেন এই মূর্তিই মানায়। গেলবারে লোকটা বলেছিল, কালীর দোরে বসে মহাকালের পায়ের শব্দ শোনে সে, আর কালীকে গান শোনায়, 'করণে কারণ মেলে না একি অঘটন ঘটালি কালী।'

এবারে অপ্রকৃতিস্থ কুব্জ দেহটা টান করে তাঁকে দেখল একটু। বললে, করণে সাহেব-সুবো আসতে লেগেছে, কি ব্যাপার! কি দেখবেন, গ্রাম? এই করণ গাঁ? তাহলে আমাকে দেখুন—আমিই করণ গ্রাম। সঙ্গে সঙ্গে কি মনে হতে হেসে উঠল, বলল, আমার যেটা যৌবনকাল সেটাই করণের একেবারে মরাকাল—এই করণ গাঁ তাহলে কি? নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে সারা তারপর।

বসন্তবাবু পাশ কাটালেন। এই করণের কি যে আশা ভাবতে গেলে তাঁরও ভেতরটা দমে যায়। দাদুর সঙ্গে যখন আসতেন তখনো বোধ হয় অতটা খারাপ লাগেনি তাঁর। যে চকমিলানো দালানের ধ্বংসচূর্ণের স্তূপের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি সেটা দত্তপাড়ার দত্তবাড়ি। সামনের দিকটায় কতগুলো পাম গাছ আর সুপারি গাছ মাথা উঁচিয়ে আছে এখনো। ভালো করে দেখলে পুষ্পোদ্যানের চিহ্নও চোখে পড়ে। এগুলোর ওধারে লাটা গাছের গভীর জঙ্গলের মধ্যে সেকালের এক দর্পোদ্ধত স্মৃতির প্রেত ঐ নাটদালান আর ওই চণ্ডীমণ্ডপ আর ওই বসতবাড়ি। ভাঙা ইঁটের গায়ে পুরু শেওলার আস্তরণ। আজ ওটা আলাদ-গোখরোর আস্তানা। পিছনের দিকে কাজলদীঘি নামটা আছে, দীঘির প্রাণ নেই। বাতাস বইছে। সেটা দীর্ঘশ্বাসের মত লাগছে কানে। একদিন অনেক অপচয়ের স্রোত বয়েছে এখান দিয়ে।

বসন্তবাবু হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন একটু। এই দালানের সঙ্গে কোন কালের কি একটা যোগ যেন উঁকিঝুঁকি দিতে চাইছে। তাঁর ঘোষাল পদবীটার উপর যেন টান পড়ছে। বিচার করতে বসলে ঘোষাল দত্ত হবে, কি দত্ত ঘোষাল হবে—এই জীর্ণ দালান যেন সেই সংশয় নিয়ে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন তিনি পাশের দক্ষিণপাড়ার দিকে। শিগগীরই ওই দত্তবাড়ির আর কোন স্মৃতির ছিটেফোঁটাও থাকবে না, এ তিনি আগেই স্থির করে রেখেছিলেন।

ঘোষালবাড়ির অবস্থাও একই রকম। কিন্তু এখানে এলে অন্যরকম লাগে। এখানকার ধ্বংসাবশেষ টানে তাঁকে। এটা কাঠের দালান। সামনেই কাঠের চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের গায়ে সেকালের শিল্পীদের বহু স্মৃতি। কাঠের দেয়ালে কাঠের দরজায় খিলানে রামায়ণ, মহাভারতের অসংখ্য লীলা খোদাই করা। আশ্চর্য, আজও এগুলোর রং একেবারে নিষ্প্রভ হয় নি। গন্ধমাদনের সঙ্গে এই হনুমান-মূর্তি একটা হাত উঁচিয়ে এই দালানের পড়ো ছাদটাকেও যেন ধারণ করে আছে। দালানের ওধারটা আর জামাইকোঠার দিকটা জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে।

এই ঘোষালবাড়ির সঙ্গে যেন একটা মানসিক যোগ অনুভব করলেন বসন্ত ঘোষাল।

যদিও এখান দিয়েও অনেক অপচয়ের ধারা বয়েছে। কিন্তু অনেক ভালোর সঙ্গে মন্দ মিশে একটা জীবনের স্রোতই বইত এখান দিয়ে। এই বাড়িটা যেন পুরুষ আর পুরুষকারের অস্তিত্ব রেখেছে।

অন্যমনস্কের মত এদিক-ওদিক আরো খানিক ঘুরলেন তিনি। বহুদূরে চূর্ণির খাদ। শুকনো ড্রেনের মত পড়ে আছে। একদিন প্রাণবতী নদী ছিল ওই চূর্ণি, গঙ্গার সঙ্গে যোগ ছিল। বড় বড় বাণিজ্যতরীও নাকি যাতায়াত করত। কালীপূজো আর দুর্গাপূজোয় কয়েক হাজার প্রতিমা বিসর্জন হত ওখানে। আজ এখানকার মানুষের সংখ্যাও অত নয়। গঙ্গার শুকনো পরিত্যক্ত খাল এখনো অনেক চোখে পড়ে। তবে এগুলো এখন আপনা থেকেই ভরাট হয়ে এসেছে। দাদুর মুখে এই সব নাম শুনেছেন? বারমেসে খাল, ডাকাতে খাল, ধামার খাল, চখার বিল।

ঘুরতে ঘুরতে ঘোষালবাড়ির সামনেই দক্ষিণপাড়ার তেমাথার রাস্তাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন বসন্ত ঘোষাল। দাদু এই জায়গাটার সম্বন্ধে অনেক গল্প করতেন মনে পড়ল। আশেপাশে এইখানেই কোথাও বারোয়ারীতলা ছিল দক্ষিণপাড়ার। গাঁয়ের লোকের বড় আড্ডা ছিল এই জায়গায়। এখান দিয়েই সমস্ত প্রতিমা চূর্ণির দিকে যেত। আবার বর্ষায় সব ক'টা গঙ্গার খাল উপচে উঠে যখন গাঁয়ের তিন দিক জমিয়ে দিত, তখন আবার আর এক রূপ এই তেমাথার।

চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন বসন্তবাবু।...এবারে গিয়ে দাদুর সেই সব লেখা-জোখা নথি-পত্র নিয়ে আসতে হবে। নিয়ে এলে বোধ হয় যাকে তিনি ফেরাবেন তাকে ভালো করে চেনার সুবিধে হবে। ঘড়ি দেখলেন। ফেরার সময় হল। আবার আসতে হবে। অনেকবারই আসতে হবে। তার পর থাকতেও হবে এখানে কতদিন ঠিক নেই।

অতীতের পাষাণ যাদুকরের মত এখানেও যেন কোন্ এক জরার যাদুকর একদিনের এক ভরা প্রকৃতির মধ্যে জরা নামিয়ে দিয়েছে। সেই অতীতকে দেখতে হলে জরা সরাতে হবে।

সরাতে পারলে, এই যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, এই তেমাথার এলাকাই অতীত যৌবন-স্পর্শে সজাগ মুখর হয়ে উঠতে পারে। জরা সরানোর কাজ এখান থেকেই শুরু হতে পারে।

এইখান থেকে, আর এখানকার এই পা-ডোবানো জলকাদার রাস্তা ধরে বহু লোকের উৎসুক চোখের সামনে দিয়ে যেদিন এক চেনা পালকি চলেছিল দত্তবাড়ির দিকে—সেই দিন থেকে।

॥ ২ ॥

কাদের বাড়ির পালকি সকলে জানে। চলল কোথায় তাও জানে। কিন্তু কোন্ গন্তব্যস্থল থেকে ফিরল লোকগুলোর চোখের তারায় সেই কৌতূহল ঝিলিক দিয়ে উঠল।

দত্তবাড়ির পালকি। পালকিতেও এত সাজের বাহার আর কার? লাল মখমলে ঢাকা পালকি, চারদিকে গোলাপের পাপড়ি মেলে আছে। দেখলে মনে হবে চার জোয়ান মাল্লা অতিকায় একটা টকটকে লাল গোলাপ বয়ে নিয়ে চলেছে। তাদের পিছনে পাকা বাঁশের লাঠি কাঁধে দুটো হিন্দুস্থানী পালোয়ান চলেছে গোঁফে তা দিতে দিতে।

দত্তবাড়ির পালকি দত্তবাড়িতে ফিরে চলল।

কিন্তু কোথা থেকে ফিরল পালকি? পালকিতে কে আছে?

কে আছে পালকিতে সেটাও সহজ অনুমানের ব্যাপার। বুড়ী মা ন'মাসে ছ'মাসে ক্বচিৎ কখনো পালকি চড়ে গঙ্গার খালে ডুব দিতে যান। ওটা এখনো গঙ্গার খাল নামেই চলছে বটে, কিন্তু করণ থেকে গঙ্গা বিদায় হয়েছে শতেক বছর আগে। তবু বর্ষার জল এলে প্রাচীনারা ওটার সঙ্গে গঙ্গার যোগ স্মরণ করে ওতেই গোটাকতক ডুব দিয়ে পুণ্যি করেন। যাই হোকে এই বিকেল-ঘেঁষা মধ্যাহ্ন চানের সময় নয়। তাছাড়া বুড়ী মায়ের চানের পালকি আলাদা। পালকিসুদ্ধু জলে চুবিয়ে আনতে হয় বলে সেটা নিতান্ত সাদামাটা গোছের। আর ক্বচিৎ কোনো উপলক্ষে এই সাজের পালকিতে চাপলেও তাঁর পিছনে পাকা লাঠি কাঁধে দু'জন পালোয়ান রাখার দরকার হয় না।

অতএব ওই রক্তগোলাপ পালকির মধ্যে যে আছে সে ওই দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ ছাড়া আর কেউ নয়। চণ্ডীবউ যখন বেরোয় তখনই শুধু ওই সব ক'টা জোয়ান মাল্লা একত্র হয়, আর লাঠি কাঁধে ওই পালোয়ানেরা পিছনে থাকে।

দত্তবাড়ির চণ্ডীবউকে নিয়ে গোটা করণ গাঁয়ে একটা কৌতূহল দানা পাকিয়ে উঠেছে। সেই কৌতূহল আজ বিশেষ করেই সকলের চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে কারণ এর আগে ছিরে পাগলার মুখে একটা রটনা শোনা গিয়েছিল। শোনা গিয়েছিল সাধুদর্শনে যাবে দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ। বুড়ো কর্তার হুকুম অমান্যি করতে না পেরে আগেও নাকি যেতে হয়েছিল একবার। সেবারে ছেলে-বউ দুজনকেই পাঠিয়েছিলেন তিনি। এই দ্বিতীয় দফায় বউ একাই ঘুরে এলো। রোগের তাড়নায় বুড়ো শ্বশুর শয্যায় মিশছে দিনকে দিন। তাঁর সময় ঘনিয়েছে। ফলে ছেলের সময় ফিরেছে। ফিরছে। তার প্রতাপ বাড়ছে। কিন্তু বউ হাজার হলেও বউ। শ্বশুব হুকুম করেছে যখন না গিয়ে করে কি। হরবোলা শ্রীনাথ অর্থাৎ ছিরে পাগলা দত্তবাড়ির ছেলে-বউয়ের প্রথমবারের সাধুদর্শনে যাবার সম্ভাবনাও আগেই ঘোষণা করেছিল। সত্যি সত্যি তারা গিয়েছিল কিনা তার চাক্ষুষ প্রমাণ অবশ্য কেউ দিতে পারে নি। কিন্তু গিয়েছিল যে, সেই রটনা এখন বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। অতএব ছিরে পাগলার এই দ্বিতীয় দফা ঘোষণায় অনেকেই উৎসুক হয়ে উঠেছিল। কৌতুক বোধ করেছিল।

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছে ছিরে পাগলাকে, কী হে হাতী-পঞ্চানন দত্তবাড়ীর চণ্ডী ঠাকরোন সত্যি তাহলে সাধুদর্শনে যাবেন বলছ? কবে যাবেন গো?

শ্রীনাথ ভট্ট বা ছিরে পাগলের আর এক নাম হাতী-পঞ্চানন। মুখ দিয়ে আর গলা দিয়ে হরেকরকম বোল বার করতে পারে হরবোলা শ্রীনাথ। পশু-পাখির ডাক অনুকরণে সিদ্ধকণ্ঠ সে। তবু এরই মধ্যে তার হাতীর ডাকের তুলনা নেই। অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠার মত করেই হাতীর ডাক ডেকে উঠতে পারে সে। মানুষ কেন, ওই

ডাক ডেকে সত্যিকারের হাতী ঠকিয়েছে সে অনেকবার। আর বারইয়ারীর নবমীর মোষ বলিতেও শেষ অনুষ্ঠান বলতে গেলে ওই শ্রীনাথেরই। মোষের পিঠে চেপে আচমকা বাতাস কাঁপানো বৃংহিত নিনাদে মোষকে একেবারে নিশ্চল করে না ফেললে বলি হয় না। মোষ ভাবে তার পিঠে হাতী উঠেছে।

গাঁয়ের রসিকজনেরা তাই তার গুণের সমাদর জানিয়েছেন হাতী-পঞ্চানন উপাধি দিয়ে।

এ-সব প্রশ্ন শুনলেই শ্রীনাথ ছিরে পাগলা হয়ে পড়ে। এই পাগলামির ফলেই গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সকলের অন্তরঙ্গ দোসর সে। শ্রীনাথ গম্ভীর মুখে জবাব দিয়েছে, গেলেই জানতে পাবে। তা পরের বাড়ির বউয়ের চলনের পিছনে আড়ি পাততে চাও নাকি গো কত্তা, চরিত্তি সামলাও।

জিজ্ঞাসা যারা করে তারাও সকলেই এক-একটি রস্নভাণ্ডবিশেষ। তাদের গায়ে লাগে না, তারা হাসে। রসের খোরাক পেলে তাদের বয়সেরও বাছ বিচার নেই—ছেলে বুড়ো জোয়ান সব সমানবয়সী তখন। বরং বয়েস যাদের বেশি, তারা রসিক আরো বেশি। যে যত রসিক তার ততো কদর। করণের রসের খ্যাতি নদীয়ার রাজা-মহারাজারও শুনতেন। সেই রসের ঐতিহ্যে করণ এখনও টইটুম্বুর।

চণ্ডীবউ কোন্ সাধু দর্শনে গিয়েছিল একবার বা এবারেও কার কাছে যাবে সেটা সকলেরই জানা। অনেকেই ঠাট্টা করে বলে, সাধুর মত সাধু একজনই আছে করণে। এই সাধুটির মাহাত্ম্য শোনে নি এমন কেউ নেই। কিন্তু এই মাহাত্ম্য নিয়ে হাসি ঠাট্টা টিকাটিপ্পনীই বেশি হয়। ঠাট্টা-ঠিসারা বামুনেরাই বেশি করে। তারা ছড়া কাটে, গান বানায়। বামুনদের প্রভাব ছাড়িয়ে কোনো রকম ভক্তি বিশ্বাসপুষ্ট হয়ে ওঠা এখানে খুব সহজ নয়। করণের আসল প্রতাপ বামুনদের। সর্বসাকুল্যে গাঁয়ের ষাট হাজার লোকের মধ্যে অর্ধেকই ব্রাহ্মণ। অন্য জাত-বর্ণ মিলিয়ে বাকি অর্ধেক।

কিন্তু তবু গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তের এই এক সাধুর গুণকীর্তি ক্রমশই প্রচার পাচ্ছে। মাঝে মাঝে এক একটা অলৌকিক ঘটনা শোনা যাচ্ছে তাকে কেন্দ্র করে। কোথায় কার দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়েছে সেই খবর, কার দুর্নিবার বিপদ কাটিয়ে দিয়েছে সেই খবর। কিছুদিন আগে এক ব্যাপার নিয়ে তো রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। করণের সব থেকে বড় পীঠস্থান দক্ষিণ-পশ্চিমে উলুখড়ের বিশাল প্রান্তর ছাড়িয়ে উলুবনের বটমূলে প্রতিষ্ঠিত শিলাময়ী মহাচণ্ডীর থান। সেই থানের জাগ্রতা শিলারূপিণী মহাচণ্ডী এতকাল নাকি দাক্ষিণাস্যা ছিলেন। হঠাৎ এক প্রভাতে দেখা গেল দেবী পশ্চিমাস্যা হয়ে আছেন। দলে দলে কাতারে কাতারে লোক ছুটল মহাচণ্ডীতলায়। শিলাময়ী দেবীর দাক্ষিণাস্যা বা পশ্চিমাস্যা হওয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ চোখে পড়ল না কারো। কিন্তু পূজারীরা যখন এই বিস্ময় ঘোষণা করেছেন তখন আর অবিশ্বাসের আছে কি? তাজ্জব কাণ্ডই তো বটে তা হলে।

এমন হল কেন? দেবীর কি ইচ্ছে?

হঠাৎ একটা সমাধান যেন মিলল হাতের কাছে। ওই সাধুর বাস তো পশ্চিমে—এই ঘটনার সঙ্গে তাঁর যোগ অবশ্যম্ভাবী। কেউ বললে সাধুর মাহাত্ম্যের জোরে ঘটেছে এই ব্যাপার, দেবী প্রসন্ন হয়ে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। কেউ বা বলে, সব ভাঁওতা। যা ঘটেছে তা তার মাহাত্ম্যে ঘটে নি, ঘটেছে তার কারসাজিতে। ব্যাটা

নিজেই কখন উলুবনে গিয়ে চুপি চুপি দেবীর মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

অতএব দলে দলে লোক চলল সাধুর কাছে। কেউ কৌতূহলে, কেউ বা কৈফিয়ৎ তলব করতে।

সাধুর কুটীরে তখন ঢোল বাজছে। বাজাচ্ছে ফকিরচাঁদ। ঢোল বাজানোয় সুনাম আছে ফকিরচাঁদের। সাধুর প্রধান চেলা বলতে সে-ই। সাধুর যে জাত, তারও তাই। সাধুর প্রতি বা তার ভক্তদের প্রতি গাঁয়ের লোকের অবজ্ঞা আর বিদ্রূপের আসল কারণ এই জাতের কারণ।

সাধুকে দেখলে কিন্তু সাধু ভাবার কোনো কারণ নেই। খালি গা, পরনে পরিষ্কার খাটো ধুতি, চোখে তারের তার জড়ানো কাঁচ লাগিয়ে কাঁথা সেলাই করছে দাওয়ায় বসে আর গুন গুন করে গান করছে,

মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।

যারা এসেছিল তারা থমকালো হঠাৎ। সাধুর মুখখানা সৌম্য যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তার মুখের মৃদু হাসি দেখে মনে হয়েছিল, এই গানের লক্ষ্যও যেন যারা এলো তারাই—এই আগন্তুকের দল।

কৈফিয়তের জোরালো সুরটা আপনিই নেমে গিয়েছিল কেমন করে। তবু কথা হল। সব শুনে সাধু হাসল। বলল, মা-কেই যদি মানেন বাবুমশায়রা তাহলে আর দক্ষিণ-পশ্চিম কি, সর্বদিকেই বিরাজ করছেন তিনি।

আগন্তুকরা থমকালো। বলল, কিন্তু শিলার দিক বদল হল কি করে?

আবারও সেই হাসি দেখল তাবা, যে হাসি দেখলে কঠিন হওয়া শক্ত হয়। জবাব পেল, শিলারই তো দিকবদল হয় গো বাবুমশায়রা, যারা শিলা ভাবে তারা করে দিলেই হয়। ধর্মের মধ্যেও এখন মজা ঢুকেছে যে গো, বে-সামাল মজা।

এর দিনকয়েক পরেই একটা গুজব শোনা গেছে, নেশার ঘোরে গুটিকয়েক ছোকরা নাকি দেবীব কাছে মনেব কথা নিবেদন করতে গিয়েছিল। পাছে মা না শোনে সেই জন্য মদের ঝোঁকে বটমূল সংস্থিতা শিলারূপিণীকে নাড়াচাড়া করে সজাগ করতে চেষ্টা করে মনের বাসনা জানিয়েছে।

শুনে যারা গিয়েছিল সাধুর কাছে তারা সচকিত। ওই সাধুও যে বে-সামাল মজার কথা বলেছিল! নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে কানাকানি করেছে তারা। সেটা আবার পাঁচকান হয়েছে। ফলে, মুখে প্রকাশ না করলেও সাধুর মাহাত্ম্যের দিকটাই ওজনে ভারী হয়েছে।

কিছুদিন আগে আর একটা চাঞ্চল্যকর খবর শুনেছে সকলে। হৃদয় অঘোরী আর ক্ষমাযোগিনীকে নাকি দেখা গেছে ওই সাধুর দাওয়ায় বসে তার সঙ্গে কথাবার্তা কইতে। তন্ত্রসাধক আর তন্ত্রসাধিকা ওই দুই ভ্রাতা-ভগ্নীকে না চেনে বা না সমীহ করে করণে হেন লোক নেই। অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় তাদের মস্ত পৈতৃক বাড়ি—অঘোরীনিবাস। ওই বাড়ি প্রসঙ্গে বহুকালের বহু রোমাঞ্চকর স্মৃতি তখনো সজীব। মহা তন্ত্রসাধক ছিলেন নাকি ওদের পিতৃপুরুষ। বাড়িতে সাধন-স্থানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। সেই আসনে বসে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেই মহাতান্ত্রিক। সাধনকোঠার চার কোণে চারটে পূর্ণাবয়ব চণ্ডালের মৃতদেহ দাঁড়ানো অবস্থায় প্রোথিত ছিল। হোমকুণ্ডের

চার কোণেও চারটি আর মাঝে আর একটি সেই রকম শবদেহ ছিল। শ্মশান থেকে নরমুণ্ড কুড়িয়ে এনে সেগুলি সিঁদুর লাগিয়ে মন্ত্রপূত করে সব কটার মুখ একদিক করে সাজিয়ে রাখতেন তিনি। সকালে উঠে যে মুণ্ডটা নড়েছে সেটা রেখে বাকিগুলো ফেলে দিতেন। তাঁরই বংশধর এই হৃদয়অঘোরী আর ক্ষমাযোগিনী। এরাও নামকরা তন্ত্রসাধক এবং তন্ত্রসাধিকা। বাড়িতে নাকি এখনো নরমুণ্ডের ছড়াছড়ি। সকলেই জানে নরমুণ্ডের সারি করে এরা যোগসাধনা করে। দুধ আর গঙ্গাজল দিলে ওই মড়ার মাথার খুলিগুলো হাসে। হৃদয় অঘোরীর হৃদয় আছে কি নেই এখানকার অতি রসিকজনেরা সেটা পরখ করতে যায় না। আর আরো সমীহ করে ক্ষমাযোগিনীকে। সে সুশ্রী, বয়েস পঁয়তিরিশের মধ্যে, কিন্তু একেবারে তরুণীর মত দেখায়। তার কপালে তেল-সিঁদূরের চওড়া কক্ষা, পরণে গেরুয়া, হাতে ত্রিশূল, তেলবর্জিত লালচে খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো। ভক্তি যত না করে, এই দুই ভাই-বোনকে গাঁয়ের লোকে ভয় করে তার অনেকগুণ বেশি।

আর এরাই কিনা যেচে গেছে সাধুর বাড়িতে। বসেছে। কথাবার্তা কয়েছে। সত্যিই কি ব্যাপার রে বাবা তাহলে ওই সাধুর।

গোপনে অনেকে ব্যাপার বুঝতে গেছে তার কাছে। আরো বেশি যায় অসুখ-বিসুখ হলে। অনেকের অনেক গোপন ব্যাধিও সারিয়েছে সাধু, এমন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু মানীরা প্রকাশ্যে কেউই এই যোগাযোগ করে না। বরং তার প্রসঙ্গে এক-একটা খবর জুড়িয়ে এলেই আবার টীকাটিপ্পনী রঙ্গরসে মাতে তারা।

তা বলে দত্তবাড়ির বউ যাবে ওই সাধুর কাছে? হাজার হোক লোকটা কি? জাতি কি? কিছুকাল আগেও এখানকার বুড়োরা তাকে কোন্ জাতধর্ম পালন করতে দেখেছে?

জাতে এবং পেশায় সাধুটি চর্মকার। শিষ্য ফকিরচাঁদ যা সেও তাই। সাধুর নাম নয়নচাঁদ।

লোক অবশ্য ভালো। জাত-পেশা নিয়ে ছিল যখন তখনো ভালই ছিল। আর তখনো তার টোটকা ওষুধের নাম ছিল। আর সেই সঙ্গে ধর্মের দিকেও ঝোঁক ছিল। দেবদেবী মানত না, শুধু নিতা-পুরুষের কথা বলত। আউলচাঁদের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোক সে—আর সর্বরকমের কদাচার বর্জিতও বটে। কিন্তু তা বলে ওই লোকের একেবারে সাধু নাম বরদাস্ত করা সম্ভব কি করে? আর এই লোকের বাড়ি বয়ে দেখা করতে যায় কিনা দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ?

তার কি ব্যাধি? স্বামী-ব্যাধি না আর কিছু?

ব্যাধি যে কি, সেটা আবিষ্কার করেছে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর চোখের মণি, ঘোষালবাড়ির কুশাগ্রবুদ্ধি মদনমোহন ঘোষাল। তার বংশ-গৌরব, তার সাহস, আর তার দিলদরিয়া মেজাজের জন্য এই দক্ষিণপাড়ার সব থেকে বড় গোষ্ঠীর প্রধান মাতব্বর সে। তার সমবয়সী বা বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয়জনেরা তাকে মানে। সাতাশ বছরের মদন ঘোষাল চাতুর্যে প্রবীণ। তার বুদ্ধির প্রতি সকলের প্রগাঢ় আস্থা।

দত্তবাড়ির বউয়ের সাধুদর্শনে যাওয়ার ব্যাখ্যা সে-ই দিয়েছে। গম্ভীর মুখে বলেছে, যাওয়ার দরকার যে। সাধুসন্তের দয়ার ফল মিললেও মিলতে পারে। বংশরক্ষা কি চারটিখানি কথা নাকি।

মৌচাকে ঢিল। দত্তবাড়ির রাধানাথ দত্তর বউকে নিয়ে এ-রকম রসিকতা একমাত্র মদন ঘোষালই করতে পারে। এত বুকের পাটা আর কার? কিন্তু একবার আড় ভাঙতে সকলে হৈ-হৈ করে উঠেছিল। তেমনি গম্ভীর মুখে মদনমোহন ঘোষাল আবার বলেছে, রসিকতা নয়। সত্যি। খোঁজ নিয়ে দেখো।

নতুন উদ্দীপনায় সচকিত সকলে। দত্তবাড়ির অনেক নিগূঢ় গোপন খবরও কেমন করে যেন মদন ঘোষালের কানে এসে যায়। সে প্রমাণ অনেকবার মিলেছে। সাধুর কাছে যাবে দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ ছেলের আশায়? ...ওই সাধুর কাছে, একেবারে তার বাড়িতে? চৌদ্দ বছরে বিয়ে হয়েছে চণ্ডীবউয়ের, বিয়ে হয়েছে তাও আট বছরের ওপর হতে চলল—বছর তেইশ হবে তাহলে এখন বউয়ের বয়স—ছেলেপুলে হয় নি, আর হবে এমন আশাও নেই?

ঠিক ঠিক ঠিক—হতেই তো পারে, বুড়ো দত্তর বংশধর না থাকার খেদের কথা কে না শুনেছে! মরতে বসেও বুড়োর এই দুঃখ ঘোচে না—ছেলেটার ছেলেপুলে হল না, বংশরক্ষা হবে কেমন করে? তাহলে এই ব্যাপার! আর এই জন্যে কিনা ওই সাধুর কাছে—!

চাপা রসিকতা এরপর আর চাপা থাকল না খুব। ক্রমশ স্থূল হয়ে শেষে দত্তবাড়ির চণ্ডীবউয়ের কানেই পৌঁছল সেটা। সেই সঙ্গে যে নাম পৌঁছল তাও ওই ঘোষালবাড়ির মদনমোহন ঘোষালেরই নাম। সাহস করে এই কানাঘুষায় কেউ নিজের নাম জড়ায় না, সব কিছু মদনমোহনের নামে চালানোই নিরাপদ।

পালঙ্কে বসে নিজের মনেই ভ্রূকুটি করল চণ্ডীবউ। তার সুন্দর মুখ রাঙা হল, কানের ডগা পর্যন্ত সেই রাগের আভাস ছড়াল। এ-বাড়ির খবর যেমন অন্যত্র পৌঁছয়, বাইরের খবরও তেমনি চণ্ডীবউয়ের কানে আসে। করণের সকল খবরই রাখে সে।

এবারে যাবার সময় পালকিটা পুরু ত্রিপলে ঢেকে যেতে হয়েছিল বৃদ্ধা শাশুড়ীর নির্দেশে। কেউ না টের পায়। লাঠি কাঁধে দারোয়ানদেরও পৃথক পৃথক যেতে বলে দিয়েছিলেন তিনি। আর যেতে বলেছিলেন, পিছনের ঘোরা রাস্তা ধরে।

কিন্তু ফেরার সময় চণ্ডীবউয়ের নির্দেশে দক্ষিণপাড়ার তেমাথার সদর দিয়েই ফিরছিল পালকি বেহারারা। সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। শুকনো তেমাথা তখন জলে থৈ-থৈ করছে। রাস্তার ধারে ধারে বহু লোক ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে গেছে। এই রকমই হয়। প্রচুর মাছ ওঠে।

পাল্লার পরদা ফাঁক করে দূর থেকে দৃশ্যটা দেখল চণ্ডীবউ। তারপর আদেশ করল, ত্রিপলের সাদা ঢাকনা সরিয়ে ফেলতে।

মখমলছাওয়া লাল পাল্‌কি ঝক্‌মক করে উঠল।

যারা দেখল ছিপ ভুলে তারা একেবারে ঘুরে বসল। কিন্তু বেশির ভাগই মাছ ধরার নেশায় তন্ময় তখনো।

হঠাৎ ঘোড়ার তীক্ষ্ণ হ্রেষারবে সকলের মাছ ধরার তন্ময়তা খান খান। আর সঙ্গে সঙ্গে ভুঁড়িতে একটা বড়সড় কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে ছিপ হাতে চিৎপাত হয়ে উল্টে পড়ল মুন্‌কে ভট্‌চায, অন্যথায় হারু ভট্‌চায। প্রাণের আনন্দে ওই রকম

ঘোড়ার ডাক ডেকে উঠেছে হরবোলা ছিরে পাগলা, সঙ্গে সঙ্গে মুনকে ভট্চাযের ভুঁড়িতে সেই রামগুঁতো। পালকিটা দেখামাত্র আবেগ সামলানো সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

মুখব্যাদান করে সকলেই এরপর রক্তগোলাপ পালকি দেখতে লাগল।

দেখতে পেল না যেটা সেটা আর এক দৃশ্য। পালকির ভিতরে বসে ঠোঁট কামড়ে হাসছে চণ্ডীবউ। শ্রীনাথের হ্রেষারব তারও কানে গেছে।

ঝকঝকে লাল পাল্‌কি থেকেও চণ্ডীবউয়ের হাসি-কামড়ানো ধারালো মুখখানা ঝকমক করছে অনেক বেশি।

দালানের সামনে মস্ত ফটক দিয়ে পালকি ঢুকল। ঢোকার আগে ভিতরের আরোহিণী পালকির ওপর আবার সাদা ত্রিপল ফেলে দিতে বলবে ভাবছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল না। শাশুড়ীর দেখার সম্ভাবনা কম। তিনি অন্দরমহলেই থাকেন। তাছাড়া তাঁর চোখের জ্যোতি কমেছে। দূরে চোখ চলে না। দেখলেও সব সময় সব কিছু ঠাওর করতে পারেন না। দৈবাৎ তাঁর দেখে ফেলার সম্ভাবনার কথা মনে হতেই চণ্ডীবউ সাদা ত্রিপল ফেলতে আরো বলল না। দেখলে দেখবে। দিনকে-দিন তাঁদের আদেশ অমান্য করার ঝোঁক বাড়ছে। তা'ছাড়া বার বার এই করতে গেলে পালকি বেহারাগুলো আর দরোয়ান দুটোই বা কি ভাববে।

' দালানের সামনে মস্ত বাগান। এমন বাড়ি আর এমন বাগান করণে আর একটিও নেই। চারদিকে নারকেল-সুপারিব সাবি। তার এধারে ওধারে পাম গাছ। মাঝে রাস্তা। রাস্তাটা ফটক থেকে বাড়ির সিঁড়িতে গিয়ে মিশেছে। রাস্তার দু'পাশে ফুলের বাগান। দত্তবাড়ির বাগানে যত ফুল ফোটে ততো আর কোথাও নয়।

সামনের বারান্দাটা চাঁদোয়ার মত ঘোরানো। সামনের সিঁড়ির বাঁয়েব সরু রাস্তা ধরলে বারান্দা সংলগ্ন আর একটি সিঁড়ি। এদিক দিয়ে সোজা অন্দরমহলের পথ।

চণ্ডীবউ পালকি থেকে নামার আগে মাথাব ঘোমটা টেনে দিল। পালকি দেখে দু'তিনজন দাসদাসী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। কারো দিকে না তাকিয়ে চণ্ডীবউ অন্দরের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল। ভিতরের বারান্দা ধরে খানিকটা এগোলে দোতলার সিঁড়ি। ওপরে উঠল। ঘোমটার ভিতর দিয়ে নিচের বাসিন্দাদের কয়েক জোড়া চোখের দৃষ্টি ঠিকই অনুভব করল। তারা কর্তার আশ্রিত।

দোতলায় উঠে ডানদিকটা শ্বশুরের এলাকা। বাঁ দিকটা নিজের। মাথার ঘোমটা ফেলে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবল একবার। কেউ নেই। তেমনি দ্রুতপায়ে বাঁয়ের দিক ধরে চলল। সামনের বড় ঘর পেরিয়ে পিছনের ঘরটাতে সে থাকে। এপাশে ওপাশে আরো কয়েকটা ঘর আছে। সেগুলোও তারই দখলে। সে-সব ঘর শৌখিন আসবাবপত্রে ঠাসা। থাকার কেউ নেই।

দু'ঘরের মাঝের দরজার কাছে মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে ছিল প্রসন্নময়ী। তার কর্ত্রী বেরিয়ে যেতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিল। ঘুম ভেঙেছে, আড় ভাঙে নি। বেলা কত হয়েছে ঠাওর করতে পারে নি। বউমণি এরই মধ্যে ফিরবে ভাবে নি। নইলে এভাবে বসে থাকত না। আদুড় গা। কাঁধ থেকে সরে বুকের কাপড় অনেকটা খসে গেছে। কর্ত্রী আচমকা ঘরে ঢুকতে ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে কাপড়

সামলানো আরো দায় হল।

চণ্ডীবউ আড়চোখে তাকে শুধু দেখল একবার। একটা কথাও না বলে পাশ কাটিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকল। বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরটা কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে তার। সর্বদাই তাই হয়। কারণে অকারণে ভিতরের উষ্মা কখন যে মাথায় ভাঙবে সেই ভয়ে প্রসন্নময়ী তটস্থ। অথচ এই ঠাকরোণটির কাছেই সে প্রশ্রয় পায় সব থেকে বেশি। এই একজন সহায় না থাকলে এ-বাড়িতে তার ঠাঁই হত না। তাকে কেউ সুচক্ষে দেখে না।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ওদিকের ঘরে গিয়ে জামা পরে আসতে ছুটল প্রসন্নময়ী। তার মোটাসোটা শরীরে জামা সয় না। বিশেষ করে গরমে। ঠাকরোনটির আপত্তি না হলে গরম কালটা বাড়িতে অন্তত গায়ের জামা ছাড়াই স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারত সে। কারো পোড়া চোখের পরোয়া করে না। কিন্তু তার খাস কর্ত্রীর আপত্তি। একটার জায়গায় পাঁচটা জামা শেলাই করে নেবার টাকা দেবে, আর বলবে, ফের ও-রকম দেখি তো দেব দূর করে তাড়িয়ে।

বউমণির খাস পরিচারিকা বলতেও সে, দোসর বলতেও সে। বয়সে পাঁচ-ছ বছরের বড়, বছর ঊনত্রিশ হবে বয়েস। কায়েতের মেয়ে, গরীব ঘরের বউ। বিধবা হবার পর অবস্থাবিপাকে এই দত্তবাড়ির আশ্রিতা। বউমণির সহচরী বলে অন্যান্য দাসী-চাকরেরা মুখ উঁচিয়ে কথা বলে না তার সঙ্গে, আর শুধু বুড়ী মা ছাড়া বাড়ির অন্য কেউ কোনরকম ফাইফরমাশ করে না তাকে।

নিজের ঘরে ঢুকে গায়েব চাদরটা খুলে দূর থেকেই ছুঁড়ে ফেলল চণ্ডীবউ। কোথায় গিয়ে পড়ল সেটা চেয়েও দেখল না। বাইরে থেকে ফিরলে প্রথমে হাত-মুখ ধোয়ার রীতি। তাও হল না। পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসে থাকল দু'পাঁচ মিনিট। প্রসন্নময়ী ফিরে এসে চাদরটা ভাঁজ করে আলনায় গুছিয়ে রাখছে দেখেও দেখল না। মুখে কঠিন রেখা পড়ে আছে গোটাকতক, ভিতরটা জ্বালা-জ্বালা করছে কেমন।

সাহস করে এবারে প্রসন্নময়ী এগিয়ে এলো। ভাবগতিক তেমন সুবিধের লাগছে না। বউমণির সারাক্ষণেব মুখ তার মুখস্থ। কখন কোন্ মেজাজে আছে দেখলেই আঁচ করতে পারে। চুপ করে থাকলে এই মেজাজ অনেক সময় আবো তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। বলল, এরই মধ্যে হয়ে গেল বউমণি, গেলে আর ফিরলে তো—

দৃষ্টি ফিরল। যা ভাবছিল তাতে ছেদ পড়ল। বউমণি এবারে তাকেই দেখল একটু—তোর অসুবিধে হল? ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল?

এরকম শুনে প্রসন্নর দু'কান অভ্যস্ত। বউমণির নিরাপদ গোছের একটু মেজাজ সহ্য করলে আখেরে লাভ বই লোকসান হয় না। এক পশলা বর্ষালে খানিকক্ষণ বেশ ঠাণ্ডা থাকে। এদিক থেকে সে উপকারই করে বউমণির। লক্ষণ খারাপ দেখলে অনেক সময় সে সেধে বকুনি খাবার তাল খোঁজে। গনগনে ভাবটা কাটিয়ে দিতে পারলে বউমণির মত মেয়ে হয় না। তখন তার বড় অপরাধও চোখে পড়ে না। এই জানাপথেই এগলো প্রসন্ন। হেসে বলল, কি যে বলো ঠিক নেই, ঘুম আর আজকাল সহজে আসতে চায় না। তা ছাড়া তুমি বেরিয়েছ—কখন ফেরো কখন ফেরো মনের তলায় লেগেই আছে, চোখে-পাতায় আর ভালো করে এক করা গেল না।

প্রসন্নময়ী বচনপটু! এ কথাতেই বউমণি সব থেকে বেশি রেগে উঠবে জানা কথা। তার ঘরেই ওর শোবার ব্যবস্থা ছিল আগে। দাদামণি ইদানীং মাসে ক'রাত দোতলায় পা ফেলে হাতে গোনা যায়। বড় ঘর, প্রসন্নময়ী মেঝেয় পুরু বিছানা ফেলে দিব্বি ঘুমুতো। কিন্তু এ সুখ বেশি দিন টেকে নি। বউমণি সকালে উঠে ক'দিন বকাবকি করেছে। তার নাকডাকার জ্বালায় নাকি কান ঝালাপালা। তারপর একদিন মাঝরাতে ঘুম থেকে তুলে সোজা অন্য ঘরে বিদায় করেছে তাকে। এখন ওধারের একটা খুপরি ঘরে দরজা বন্ধ করে শুতে হয়। ঘুমের অসুবিধে তাতেও হয় না অবশ্য। তবে গরম লাগে। এই খোলামেলা ঘরে ঘুমিয়ে সুখ ছিল।

চণ্ডীবউয়ের চোখে সাদার ভাগ কমতে লাগল। গলাও চড়ল একটু। —চোখে-পাতায় এক করা গেল না? দরজার পরদা-তোলা, ঘর-দোর উদম-খোলা, যেভাবে ছিলি তোর লজ্জা করে না কথা বলতে?

অতএব লজ্জা পেতে হল। তবু শমে নামাতে হলে আরো একটু চড়াইয়ে ওঠানো দরকার। বলল, গরম লাগে যে, ঘুমুব না ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েই পড়লাম কখন। এ সময় এদিকে আর কে আসছে—

—কে আসছে? কে আসছে না আসছে তুই দেখেছিস চোখ চেয়ে? আরো রেগে উঠতে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সংযত করল হঠাৎ। গলার স্বর চড়ল না বটে, কিন্তু সুর কঠিন। একটু থেমে বলল, আজ হবে'খন তোর, দাদাবাবু সেই থেকে নিচে বসে আছে, ঘরে ঢুকতে পারছে না।

যথার্থই বিষম হকচকিয়ে গেল প্রসন্নময়ী। দু'আঙুল জিব কাটল প্রথম। তারপর ঘাবড়েই গেল। এমন দুর্বিপাকের সম্ভাবনা সে কল্পনাও করতে পারে না। অস্ফুট একটা স্বর নির্গত হল গলা দিয়ে, দাদাবাবু...!

তেমনি কঠিন মুখ করে ওর ভীতত্রস্ত দৃষ্টি এড়াতে চেষ্টা করল চণ্ডীবউ। কিন্তু পারা গেল না। দেখার মতই মূর্তি হয়েছে প্রসন্নর। ওকে হঠাৎ মনের মত জব্দ করতে পারার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় হাসি এসেই গেল শেষ পর্যন্ত।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল প্রসন্নর। বউমণির এমনি অনিশ্চিত মেজাজই বটে। তবু মনে মনে একটু বিস্ময় বোধ না করে পারল না। কথার ছিরিছারা আজকাল এইরকমই হয়েছে বউমণির, মুখ দিনকে-দিন আলগা হচ্ছে। কিন্তু তা বলে দাদাবাবুর নাম করে এ-রকম রঙ্গ কখনো করে না। উল্টে ওই এক নামের সঙ্গেই তার রঙ্গের কোনো সম্পর্ক নেই যেন।

প্রসন্নও হেসে ফেলল।—এক-এক সময় কি যে কাণ্ড তুমি করো বউমণি, আমার একেবারে কাঁপুনি ধরে গেছল যে গো!

চণ্ডীবউ পালঙ্ক ছেড়ে নেমে দাঁড়াল। হাসি-চাপা মুখেই কোপ প্রকাশ করল, ছাই ধরেছিল তোর, তোর চরিত্র আমি জানি না? যা দূর হ' এখান থেকে!

নিজের চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামায় না প্রসন্নময়ী, দূর হওয়ারও ইচ্ছে ছিল না। তবু হাসিমুখে প্রস্থানই করল আপাতত। ধাপে ধাপে যে-রকম উন্নতি হচ্ছে বউমণির তাতেই খুশি।

দুই-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চণ্ডীবউ ভেবে নিল কি করা যেতে পারে। সে ফিরেছে খবর পেলেই শাশুড়ী দৌড়ে আসবে। খবর এতক্ষণে পেয়েই গেছে হয়ত। শাশুড়ী

আসার আগে তারই যাওয়া উচিত। ঘরে একলা পেলে সতের রকম জেরা করতে বসে যাবেন। সেই সম্ভাবনার কথা মনে হতেই মুখে রুক্ষ ছায়া নামার উপক্রম আবার।

ঘর ছেড়ে বেরুতে গিয়েও বেরুনো হল না। শ্বশুরের ঘরেও ডাক পড়তে পারে। পারে কেন পড়বেই। না পড়লেও নিজে থেকেই যেতে হবে। না গেলে মুখ ভার হবে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পাঁচ কথা শোনাবেন। বাড়ির সকলেই নাকি তাঁর চোখ বোজার প্রতীক্ষায় আছে। পানের থেকে চুন খসলে এই অনুযোগ সকলকে শুনতে হয়। শাশুড়ীকেও।

দেয়াল-জোড়া বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চণ্ডীবউ নিজেকেই দেখল একটু। ...শ্বশুরের সময় ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু চোখে এখনো শ্যেনদৃষ্টি। টাকা-কড়ির হিসেব এখন আর করতে পারেন না, কিন্তু মানের চুল-চেরা হিসেব এখনো সর্বদাই করছেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মান খোয়া যায়। দত্তবাড়ির বউ গেছল বাইরে, কেউ না কেউ তাকে দেখেইছে—তা সে সাধুই হোক আর ফকিরই হোক। কেমন দেখেছে, কাছে যাওয়ামাত্র শ্বশুর তার দিকে চেয়ে সেটাই আগে দেখে নেবেন।

দেরাজ খুলে মোটা মোটা দুটো গয়না বার করে হাতে পরল চণ্ডীবউ। গলায়ও ঝকমকে আর একটা বাড়তি হার পরে নিল। দুহাতের দু আঙুলে দুটো আঙটি ছিল, আরো দুটো করে চার আঙুলে চারটে উঠল।

আয়নায় দেখল। এবারে যাওয়া যেতে পারে বোধ হয়।

কিন্তু না। আরো কিছু সম্ভাব্য সমস্যার সমাধান করে নিয়ে যাওয়া ভালো। আয়নায় নিজের দিকে চেয়ে ভুরু-কুঁচকে ভাবল একটু। তারপর সিঁদূরের কৌটো নিয়ে এসে আয়নার দেখে দেখে বেশ খানিকটা সিঁদূর কপালে আর সিঁথিতে লেপে দিল। অপটু হাতে কপালে আর সিঁথিতে কেউ একগাদা সিঁদূর থেবড়ে দিলে যেমন হয়। অনেক প্রশ্নের জবাব শাশুড়ী এই সিঁদূর থেকেই পেয়ে যাবেন।

ঠোঁটের কোণে হাসিব রেখা ফুটে উঠেছিল। আয়নার ছায়া পড়ল । দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রসন্নময়ী সবিস্ময়ে তার সজ্জাবিন্যাস দেখছে। আয়নার ভিতর দিয়েই চণ্ডীবউ সকোপে তাকালো তার দিকে।—হাঁ করে কি দেখছিস?

প্রসন্নময়ী বিস্ময় প্রকাশ করল, বাইরে থেকে ঘুরে এসে সাজতে বসলে কি গো! তা'ছাড়া সিঁদূর দিয়ে এ আবার কি রকম সাজ!

গম্ভীর মুখে ফিরল চণ্ডীবউ। সিঁদূর-কৌটা যথাস্থানে রেখে তার মুখোমুখি হল। ছদ্ম ঝাঁজে বলে উঠল, সব তো খেয়ে বসে আছিস, সিদূঁর কি জানিস তুই কি বুঝবি?

পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। ঠোঁটের ফাঁকে আবার সেই চাপা হাসি খেলা করছে। আর, সেইখানেই দাঁড়িয়ে প্রসন্নময়ী পিছন থেকে দেখছে তাকে। সিঁদূর কি জিনিস না বুঝুক, রূপ কি জিনিস বুঝছে। ভাবছে প্রসন্নময়ী, বড় অস্থির রূপ। ক্ষণে ক্ষণে বদলায়।

কর্তাই আগে দেখলেন। শাশুড়ীও সেখানেই বসে। কিন্তু একটু দূরের সব কিছুই তিনি ঝাপসা দেখেন। শ্বশুরের ক্ষীণ কণ্ঠ দরজা পর্যন্ত পৌঁছল কোনরকমে।—এসো, মা-লক্ষ্মী এসো।

খুব আস্তে, চলনে মা-লক্ষ্মীর শ্রী ফুটিয়ে চণ্ডীবউ ঘরে ঢুকল। কপালে চার আঙুল ঘোমটা। আরো অনেক বড় ঘোমটা দেওয়ার রীতি। কিন্তু ঘোমটায় ঢাকা থাকলে মা-লক্ষ্মীর মুখ দেখে শ্বশুরের চোখ জুড়োবে কি করে? মন ঠাণ্ডা থাকলে মা-লক্ষ্মীর মুখ দেখে সর্বদাই শ্বশুরের চোখ জুড়োয়। অতএব বাড়ির মধ্যে বড় ঘোমটার পাট উঠেছে।

শয্যায় মিশে আছে বড়সড় দেহের একটা কাঠামো। কতকগুলো হাড় জোড়া লেগে আছে। আর একটা বুকের পাঁজর—হাপরের মত উঠছে নামছে। আর একটা মাথা—এদিকে দুটো চোখই সর্বস্ব। জীবনের বাকি শিখাটুকু যেন এই দুটো চোখের ভিতরেই জ্বলছে। দীর্ঘকাল মেহ-রোগে ভুগছেন। করণের সব থেকে নামজাদা কবিরাজ বইপত্র ঘেঁটে রোগের একটা ইংরেজী নাম ঘোষণা করে গেছেন—ডায়বেটিস। শাশুড়ী আর পরিচারিকাদের মুখে মুখে সেটা ডাবটেসায় দাঁড়িয়েছে। ডাবটেসা ছাড়া আনুষঙ্গিক আরো পাঁচরকম উপসর্গ আছে।

ক'বছর আগেও এই একজনের অনেক প্রতাপ দেখেছে সকলে। চণ্ডীবউও দেখেছে। সে-কথা মনে হলে অনেক ক্ষোভ অনেক যাতনা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দুঃখই হয় চণ্ডীবউয়ের।

পায়ে পায়ে শ্বশুরের পায়ের দিকে এগিয়ে এলো চণ্ডীবউ। অর্থাৎ প্রণাম করবে। খবর শোনার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন বৃদ্ধ মহেশ্বর দত্ত। বউকে প্রণামোন্মুখী দেখে মুখে আশার আলো লাগল। চেষ্টা করে অল্প একটু ঘাড় তুললেন তিনি। শুয়ে প্রণাম নিতে নেই। বউ প্রণাম করে উঠতে সাদরে ডাকলেন, বসো মা-লক্ষ্মী বসো—দেখা হয়েছে তো?

প্রণাম যখন, দেখা নিশ্চয় হয়েছে— আর আশাও আছে। কিন্তু মা-লক্ষ্মী ততক্ষণে ভক্তিভরে শাশুড়ীকে প্রণাম করছে বলে অপেক্ষা করতে হল। একজনকে প্রণাম করলে সামনের সকল গুরুজনকেই করতে হয়।

শাশুড়ী আশীবাদ করলেন, বেঁচে থাকো মা, ধনেপুত্রে সাবিত্রীতুল্যা হও।

বিরক্তিতে ঘোমটার তলায় চণ্ডীবউ আবার ভ্রূকুটি করে উঠেছিল প্রায়। পুত্রবতী না হওয়ার দরুন তার ওপর শাশুড়ীর ক্ষোভই সব থেকে বেশি। শ্বশুরের বাধা না থাকলে এতদিনে আরো দু'চারটে বিয়ে দিয়ে ফেলতেন ছেলের। এই প্রস্তাবে শ্বশুর বরাবরই আশ্চর্যরকম বাধা দিয়ে এসেছেন। চণ্ডীবউয়ের ধারণা, তার প্রতি দরদে নয়, শ্বশুর কেন বাধা দিয়েছেন তাও সে জানে। ওদিকে শ্বশুরের মত না পেয়ে শাশুড়ী অনেক দিন তিরিক্ষি মেজাজে ছেলেরই মন ঘোরাতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, কর্তাকে নিজেই বল্ না তুই, চিরটা কাল ওই বাঁজা বউ নিয়ে ঘর করবি?

তার সামনাসামনি বলেন নি অবশ্য, কিন্তু দাস-দাসী বা প্রসন্নর মুখ দিয়ে কথাটা একাধিকবার কানে এসেছে চণ্ডীবউয়ের। আর বছর কতক আগেও এ নিয়ে শাশুড়ী কম হেনস্থা করেন নি তার, অনেক শেকড়বাকড় পরিয়েছেন, অনেক শেকড়বাকড় লতাপাতা বেটে খাইয়েছেন, আর অনেক পীরস্থানে মাথা কুটিয়ে ছেড়েছেন।

শ্বশুর উৎসুক।—বসো মা-লক্ষ্মী, নয়নচাঁদের সঙ্গে—ইয়ে সাধুজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে তো?

আগে নয়নচাঁদই বলতেন, তাই ওই নামই আগে মুখে এসে যায়। মহেশ্বর দত্তর থেকে বয়েসেও ছোট সাধুজী, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছেন। আর তখন থেকেই নাকি তার সাত্ত্বিক ভাব লক্ষ্য করে আসছেন তিনি। আসলে বরাবরই নয়নচাঁদকে বড় পছন্দ ছিল তাঁর—পুরোদস্তুর সাধু হওয়ার আগেও সে অনেকবার তাঁর অনেক রোগ সারিয়েছে। এই রোগটাই যা সারল না। তা যমে থাবা বসালে আর সারবে কি করে! সারবার হলে নয়নচাঁদ ঠিক আসত, ভালো করে চেষ্টা অন্তত করা যেত। কিন্তু তাকে আনাই গেল না।

ঘরের বউয়ের সমস্যা জানিয়েও তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মহেশ্বর দত্ত। কিন্তু লোক মারফৎ নয়নচাঁদ সবিনয়ে জবাব দিয়েছে, নিত্যপুরুষের সে দীন সেবক, এসব উদ্দেশ্য নিয়ে আর কোথাও তার যাওয়া সম্ভব নয়।

শুনে শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়েছে মহেশ্বর দত্তর। সত্যিকারের সাধুই হয়েছে নয়নচাঁদ, নইলে এমন হয় না। টাকা চাইলে তো তিনি পাঁচশ হাজার দু হাজারও অনায়াসেই দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু টাকাও চায় না এমন লোক তো তিনি করণে আর দেখেন নি।

চণ্ডীবউ অল্প করে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ দেখা হয়েছে। শাশুড়ী চোখের ঝাপসা কাটিয়ে দেখতে চেষ্টা করছেন তাকে। মহেশ্বব দত্তর ওঠার শক্তি নেই, আগ্রহই বাড়ছে। শুধু।—বললেন কিছু? বুড়ো ছেলের কাছে আবার লজ্জা কি! কী বললেন?

আপনার ওযুধ পাঠিয়ে দেবেন।

আমার ওযুধ! মহেশ্বব দত্ত হতভম্ব কয়েক মুহূর্ত। রোগপাণ্ডুর মুখে খুশির দোলা লাগল তারপর। —ও, আমার ওযুধও আদায় করে ছেড়েছ বুঝি —দেখেছ, মা-লক্ষ্মীর কাণ্ড দেখেছ! কি ছেলেমানুষ, আমার আর কে কি করবে, ডাক পড়েইছে!

মুখে যা-ই বলুন, পরম পরিতুষ্ট তিনি।—আব কি বললেন?

এই দ্বিধাটুকু লজ্জা ভাবছেন শ্বশুর, কিন্তু মাথা নিচু করে চণ্ডীবউ বিরক্তি গোপন করছে। শাশুড়ীর জেরায় পড়বে ভেবেছিল চণ্ডীবউ, কিন্তু রোগে ভুগে শ্বশুরেরই জ্ঞানগম্যি যেতে বসেছে। মাথা তুলতে গিয়ে পিছনে শাড়িতে টান লেগেই মাথার ঘোমটাটা খসে গেল যেন। সঙ্গে সঙ্গে সিঁথি আর কপালের দগদগে সিঁদূরের চাপড়া স্পষ্ট হল। মাথার কাপড়টা আবার তুলে দেবার উপক্রম করতেই বাধা পড়ল। —দেখি, দেখি! থাক্ মা-লক্ষ্মী ঘোমটা থাক্, বা-বা-বা! কই গো, মা-লক্ষ্মীকে দেখো, ভালো করে দেখো আগে—সাক্ষাৎ ইন্দ্রাণী যে গো। সাধু আশীর্বাদ করলেন বুঝি, অ্যাঁ?

ঘোমটা তুলতে না পেরে মাথা নিচু করল চণ্ডীবউ। শাশুড়ী ঘোমটা সত্ত্বেও বউয়ের দিকে চেয়ে ঝাপসা লাল-মত কি যেন দেখছিলেন এতক্ষণ। ঠিক ঠাওর করতে পারছিলেন না। একজনের হঠাৎ এই উচ্ছ্বাস দেখে শিয়রের কাছে থেকে উঠে বউয়ের কাছে এলেন। চিবুক ধরে মুখখানা তুলে সামনের দিকে ঝুঁকলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আশায় তাঁরও ছানিপড়া চোখ চক চক করে উঠল।

সাধুজী আশীর্বাদ করেছেন নিশ্চয়, তাঁর দয়া হয়েছে নিশ্চয়, নইলে কপালে সিঁথিতে এত সিঁদূর কেন?

কে একজন ঘরে ঢুকল। কবিরাজের ওযুধ বা অন্য কিছু এনেছে হয়ত। তার

সাড়া পেয়েই শাশুড়ী নিজে হাতে তাড়াতাড়ি লম্বা ঘোমটা টেনে দিলেন বউয়ের মাথায়। এমন সৌভাগ্য-সম্ভাবনার ওপর আর কারো চোখ লাগতে দিতে চান না। ব্যস্ত মুখে বললেন, থাক্ মা,এখন ঘরে যাও তুমি, হাতমুখ ধুয়ে খাওগে যাও, সেই কখন খেয়েছ।

চণ্ডীবউ উঠল। হাসি আসছেই মুখে। বড় ঘোমটা থাকায় নিরাপদ। অতি সুলক্ষণার মত ধীরে ধীরে দরজার বাইরে এলো। তারপর হ্যাঁচকা টানে চার ভাগের তিন ভাগ ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে দ্রুত পা ফেলে নিজের ঘরের দিকে চলল।

মাঝে বড়সড় একটা চাঁদোয়া বারান্দা। এই বারান্দার শেষ মাথায় এলো যখন চণ্ডীবউ আর হাসছে না। ভিতরে ভিতরে জ্বলছে। সিঁদুরমাখা মুখখানা গনগনে দেখাচ্ছে। বাইরে যারা তাকে নিয়ে কানাকানি করে হাসাহাসি করে, যারা তার লাল পাল্‌কি দেখে ঘুরে বসে, যারা ঘোড়ার ডাক ডাকে —তাদের চোখের ওপর দিয়ে নিজের দাপটে চলার মধ্যে এক ধরনের আত্মতুষ্টি আছে। এটা খেলাও বটে, আত্মরক্ষাও বটে। কিন্তু ঘরের ব্যাপার অন্য রকম। যাতনার মধ্যেও এখানে মন আশ্রয় খোঁজে শান্তি খোঁজে। এখানেও যদি এমনি যুঝতে হয়, তাহলে ক্ষতর ওপর উল্টে আঁচড় পড়ে।

শ্বশুরের ঘর থেকে বেরুবার সময় চণ্ডীবউ যে হাসি চাপতে পারে নি, সেটা অন্য কারণে। ঠিক যেমনটি হতে পারে ভেবে এ-রকম সাজসজ্জা করে আসা, শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল বলে। ওই হাসি নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা আর কৌশল তারিফ করার মতই! কিন্তু এ কৌশলের সঙ্গে হৃদয় মিশবে কি করে? এই ছলচাতুরীর বিপরীত মাশুল তো একটা আছেই। যে ফাঁকটা ভরাট করে এলো ভাবে সেটাই ফিরে আবার দ্বিগুণ ব্যঙ্গ করে ওঠে। গ্রাস করে, পীড়ন করে। ঘরের মানুষদের এই অবুঝপনাই তখন সব থেকে নির্মম মনে হয়।

প্রসন্নময়ী জলখাবার সাজিয়ে বসে আছে। ত্রুটিটা যেন এইখানেই। চণ্ডীবউ খাবারের থালাটা দেখলে একটু। ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল, তুই কি শেষ খাওয়া খাওয়াচ্ছিস্ নাকি আমাকে?

বালাই ষাট! খাওয়া বা খাওয়ানোর ব্যাপারে প্রসন্নময়ী উদার। খাওয়ার দিকে চোখ গেল তো বউমণি অমনি হাত গোটালো। কিন্তু খেয়াল না করে গল্প করতে করতে খেলে দিব্বি খেতে পারে। এ-কথা সে-কথা বলে ছোট ছেলেমেয়ের মতই ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়াতে হয় তাকে। বলল, না খাও না খাবে, মুখহাত ধুয়ে এসো আগে, সেই থেকে বসে আছি—

চণ্ডীবউ দেয়ালজোড়া আয়নাটার সামনেই দাঁড়ালো আবার। গম্ভীর। কপালের সিঁদূর কুৎসিত লাগছে এখন। ভারী গয়নাগুলো গা থেকে খুলে টেবিলের ওপরেই ফেলে রাখল। সেগুলির জ্যোতি শুধু প্রসন্নময়ীর দু'চোখেই এসে ঠিকরলো।

চোখেমুখে জল দিয়ে আবার ঘরে ফিরতে সময় লাগল একটু। কান পর্যন্ত গরম হয়ে আছে। তপ্ত কপাল থেকে একগাদা সিঁদূরগোলা জল পড়ছে। সিঁথির দিকটা অমনি থাকল, কাল মাথাটাও ঘষতে হবে।

খেতে বসে থালার দিকে চেয়ে আবার সেই বিরক্তি।—তোকে যে বললাম কানে যায় না—তুই তুলবি কিছু না আমি উঠে যাব?

প্রসন্নময়ী সেই বাঁধা বুলিই আওড়ালো। —তুমি যা পার খাও না, পড়ে থাকলে বেশি হবে নাকি! অর্থাৎ পড়ে যদি থাকেই তো সে আছে।

দু'জনেই এরপর চুপচাপ খানিক। থালা টেনে নিয়ে চণ্ডীবউ এটা ওটা ভাঙছে, কিছু মুখেও দিচ্ছে। হাত যত দ্রুত নড়ছে, মুখ ততো নয়। তাড়াতাড়ি এই পর্ব সেরে থালাসুদ্ধু ওকে বিদায় করার ইচ্ছে। কিন্তু খেতে চেষ্টা করে উল্টে বিরক্তি আরো বাড়ছে।

মনে মনে অনেকক্ষণ ধরেই একটা কৌতূহল চেপে আছে প্রসন্নময়ী। রয়েসয়ে এই প্রসঙ্গেরই অবতারণা করল সে। গলা একটু খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, গেছলে যে, কি হল গো বউমণি?

থালার ওপর হাত থেমে গেল। মুখ তুলে চণ্ডীবউ তার চোখে চোখ রাখল।—কোথায় গেছলাম?

ওই যে গো, সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা বলছি....কিছু আশাটাশা দিলে?

চণ্ডীবউয়ের ইচ্ছে হল জলখাবারের থালাটা তুলে ওর মুখে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু ইচ্ছেটা মুখে প্রকাশ পেল না। দেখছে। —সেখানে গেছলাম তোকে কে বলল?

এই নাও, বাড়িতে থাকি কে আবার বলবে.

বাড়িতে থাকে বলেই প্রসন্ন জানে। বাড়িতে আর যারা থাকে তারাও জানে। তাই বাইরের লোকও জানে। জানে যে চণ্ডীবউয়ের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বাড়ির সব কথা হাওয়ায় ভাসে।

আলাপ ঠিকমত এগোচ্ছে না দেখে প্রসন্নময়ী অন্য রাস্তা ধরল। নিজেকে একটা সংশয়ের তটে এনে দাঁড় করালো যেন। বলল, কি জানি বাপু ওই সন্ন্যিসী-টন্নিসি কতটা পারে, আগেও তো একবার গেছলে তেনার কাছে, সেই কবেকার কথা—কি বা হল!

আব একবারের সাধু-সন্নিধানে যাওয়ার প্রসঙ্গে চণ্ডীবউ কৌতুক বোধ করল হঠাৎ। এই একটা জানার ব্যাপারে ওদের কিছু ভুল হয়েছে। আগের বারের ব্যাপারটা মনে পড়তে অন্যমনস্ক হল একটু। হাত নড়ল, নিজের অগোচরে মুখে খাবার উঠতে লাগল।

....আগের বার বলতে অনেক দিন আগের কথা। কর্তার হুকুম, ছেলে-বউ দু'জনকেই যেতে হবে সাধুর কাছে। তারা যাচ্ছে সাধুর কাছে সেই খবরও পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর রোগের তখনো এতটা বাড়াবাড়ি হয় নি। তাই হুকুমের জোরও এর থেকে অনেক বেশি ছিল। বিরক্ত মুখে ছেলে এসে বাপের হুকুম জানিয়েছে। তারপর প্রস্তাব করেছে, বলছেন এত করে একবার ঘুরেই আসা যাক চলো, নইলে তো আবার অগ্নিশর্মা হয়ে উঠবেন একেবারে!

তার মুখের দিকে চেয়ে সেদিনও কৌতুক বোধ করেছিল চণ্ডীবউ। গেলে ফল হতেও পারে বলছ?

কে জানে কি হতে পারে! তাছাড়া কার কি গুণ আছে কে জানে?

তাই তো! কে জানে কার কি গুণ...অন্যের গুণের ওপরেই নির্ভর করা যাক তাহলে। চলো।

সঙ্গে সঙ্গে রাগে মুখ কালো রাধানাথের। ঘরের বউয়ের মুখে এরকম উক্তি

কানে বেঁধে বলে নয়, এর পিছনে বিদিকিচ্ছিরি কিছু একটা খোঁচা আছে। রাধানাথ চোখ গরম করে তাকিয়েছিল। কিন্তু বউ হাসছে। তার গরম চোখের ধার ধারে না। রাধানাথ নিরুপায়। মেয়ে সে এই বয়সে অনেক দেখেছে, কিন্তু রাগ তার এই বউয়ের ওপরেই সব থেকে বেশি। সময় সময় তার দুঃসাহস দেখে ক্রূরতায় ওই দেহ আর ওই মুখ ফালা ফালা করে ফেলতে সাধ যায়। কিন্তু নিজের বাপের এক বিচিত্র ধারণায় একেবারে গোড়ায় যে শাসন অচল হয়েছে, ইচ্ছে থাকলেও সেটা এখন আর সচল করে তুলতে পারে না। উল্টে দুর্বল বোধ করে নিজেকে। সেই দুর্বলতার সঙ্গে দম্ভ মিশে নিষ্ফল ক্রূরতাই শুধু বাড়ে আরো।

দু'জনেই একসঙ্গে বেরিয়েছিল সেবারে। চণ্ডীবউ পাল্কিতে, রাধানাথ পায়ে হেঁটে। ফিরেছে আগে-পরে। চণ্ডীবউ আগে, রাধানাথ রাত্রিতে। শাশুড়ী সেবারও উন্মুখ আগ্রহে খবর নিতে এসেছিলেন বউয়ের কাছে। বউ বলেছে, সে কিছু জানে না, তার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি।

রাত্রিতে বাপের ঘরে ডাক পড়েছিল ছেলের। তিনিও খবর জিজ্ঞাসা করেছেন। আমতা আমতা করে ছেলে বলেছে, এ-সম্বন্ধে সাধুজী কোনরকম কথাবার্তা কইতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তারপর ঘরে ফিরে বউকে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি কি বলেছ?

কিছু না।

কিছুই না?

না।

নিশ্চিন্ত হয়ে বাবাকে কিভাবে ভাঁওতা দেওয়া গেল হাসি মুখে সেই ফিরিস্তি দিয়েছে ছেলে।

সেবার কেউ তারা নয়নচাঁদ সাধুব কাছে যায় নি। রাধানাথও না, চণ্ডীবউও না।

তবে সেদিকে এগিয়েছিল বটে। কিছু পথ যাবার পরেই রাধানাথের সঙ্কল্প পিছপা হয়েছে। তার মত স্বভাবের লোক সাধুসন্তদের এড়িয়েই চলতে চায়। আলো দেখলে অনেক কীট যেমন গর্ত খোঁজে, তেমনি। ওই সাধুর সম্পর্কে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। আয়নার মতই ওরা সব দেখতে পায় নাকি। কে জানে গিয়ে আবার কি ফ্যাসাদ ঘটে, কোন্ দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে!

একটা নির্জন জায়গা দেখে সে পাল্কি থামিয়েছিল। সপ্রতিভ মুখে বলেছিল, দেখো, ওসব সাধু-টাধুর কাছে যাওয়া আমার দ্বারা হবে না—এত সব বুজরুকি। বাবার যেমন, যত সব অন্ধ বিশ্বাস—

মুখের দিকে তাকাতেই ভিতরের কাপুরুষ মূর্তিটা চোখে পড়েছিল চণ্ডীবউয়ের। একটা কথাই তার মুখে এসেছিল। ....তা'হলে?

তুমি এদিকেই একটু বেড়িয়ে-টেরিয়ে বাড়ি ফেরো, আমি পরে যা হোক কিছু বলে দেব'খন—কে আর জানছে!

না, কেউ জানবে না ঠিকই। পালকিবাহকদের কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। চণ্ডীবউয়ের নিজেরও যে একটুও যাবার তাগিদ ছিল তা নয়। কিন্তু তবু এই কাপুরুষতা দেখেই ভিতর বিষিয়েছিল তার। জবাব দিয়েছে, সেই ভালো, তুমি তোমার ওই

ইয়ারমহলেই গিয়ে ভেড়ো না হয়, সেখানে তোমার জন্য বোতল নিয়ে অপেক্ষা করছে সকলে—জোর পাবে।

চাপা রাগে রাধানাথ গরগর করে উঠেছে, যাবই তো, কার বাপের পরোয়া করি!

সদর্পে পা ফেলে চলে গেছে। আর ঘৃণায় বিদ্বেষে চণ্ডীবউয়ের দু'চোখ জ্বলছে।

সামনে ষষ্ঠীতলা। সেই দিকেই পাল্‌কি নিয়ে যেতে আদেশ করেছিল সে।

না, গেলবারে চণ্ডীবউ নয়নচাঁদ সাধুর কাছে যায় নি। গেছে ষষ্ঠীতলার ডাকসাইটে পালোয়ান ষষ্ঠীচরণের বাড়িতে। আর খুশিতে আনন্দে ষষ্ঠীচরণ হাতে যেন চাঁদ পেয়েছিল একেবারে।

করণের লোকেরা ষষ্ঠীচরণকে বলে কলির ভীম। বিশটা তল্লাট খুঁজলেও তার মত পালোয়ান মিলবে না। লোক গুজব রটিয়েছে, ব্রহ্মদত্যির সঙ্গে লড়াই করেই নাকি এমন পালোয়ান বনেছে ষষ্ঠীচরণ। এই সেদিনও গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করেছে ষষ্ঠীচরণ। খুশি হয়ে চণ্ডীবউ এক ঝুড়ি সরের ঘিয়ের বীরখণ্ডী পাঠিয়েছিল তাকে।

বাইরে থেকে কে এক মস্ত পালোয়ান এসেছিল। ষষ্ঠীচরণের নামডাক শুনে তার সঙ্গে লড়াইয়ের অভিলাষ! ষষ্ঠীচরণ তখন প্রকাণ্ড বটগাছের ডাল নুইয়ে ধরে ছাগলকে পাতা খাওয়াচ্ছিল, আর সাগরেদদের সঙ্গে গল্প করছিল। আগন্তুক পালোয়ান নিজের পরিচয় দিয়ে ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা জানালো। চোখের ইশারায় সাগরেদদেব নিরস্ত করে ষষ্ঠীচরণ ভালো মুখ করে বলল, ষষ্ঠীচরণ তার গুরু, এখনই তাকে ডেকে দিচ্ছে, তবে মহামান্য পালোয়ানজী যদি বটের শাখাটা ততক্ষণ একটু ধরে থাকেন, খুব ভালো হয়।

আগন্তুক পালোয়ান হাত বাড়ালো, ষষ্ঠীচরণ তার হাতে বটের শাখা ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকাণ্ড ডাল ধনুকের ছিলার মতো শূন্যে লাফিয়ে উঠল, আর নবাগত পালোয়নাজী দশহাত ছিটকে মাটিতে চিৎপাত। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালো সে, হাঁ করে শিষ্যকে দেখছে। শিষ্য যদি এমন, তবে তার গুরু কেমন! কোনো অছিলায় পরে দেখা করবে জানিয়ে পালোয়ানজীর পত্রপাঠ বিদায়।

এই ষষ্ঠীচরণের কাছেই একসময় কুস্তি শিখত রাধানাথ দত্ত। আর তারও আগে থেকে দত্তবাড়ির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। কিন্তু দত্তবাড়ির চণ্ডীবউয়ের সঙ্গে ষষ্ঠীচরণের অন্য সম্পর্ক। মা-ছেলের সম্পর্ক। ষণ্ডাকৃতি লোকটা যখন মা-মা করে চণ্ডীবউকে, শিশুর মা-ডাকের মতই শোনায় সেটা।

এই নিখাদ সম্পর্কের পিছনে ছোট একটু ইতিহাস আছে।

বছর কয়েক আগে একবার ভয়ানক বিপদে পড়েছিল ষষ্ঠীচবণ। রমণী-ঘটিত কি এক ব্যাপারে পাশের গাঁয়ের একটা দুশ্চরিত্র লোককে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল সে। সেই শাসানির খবর অনেকেই জানত। তা সেই লোকটা সত্যিই খুন হয়ে বসল একদিন। ষষ্ঠীচরণ খবর পেল সেপাই নিয়ে এক লালমুখো দারোগা আসছে তার বাড়িতে তাকে হাতকড়া পরাতে।

শোনামাত্র সাত বছরের মেয়ের হাত ধরে দত্তবাড়ির দিকেই ছুটল ষষ্ঠীচরণ। কিন্তু বুড়ো কর্তা অর্থাৎ মহেশ্বর দত্ত তখন আবার গিন্নী আর সাঙ্গো-পাঙ্গ নিয়ে কলকাতার কালীঘাটে তীর্থ করতে গেছেন। তখনও রেল হয়নি, নৌকো আর গরুর

গাড়ি ভরসা—অতএব দীর্ঘদিনের ব্যাপার। রাধানাথ পর্যন্ত বাড়ি নেই, সকালের আড্ডায় বেরিয়েছে কোথায়।

নিরুপায় ষষ্ঠীচরণ এসে চণ্ডীবউয়ের কাছেই ভেঙে পড়ল। পালোয়ান হলেও সত্যিই ঘাবড়ে গেছে তখন। বলেছে, মা রক্ষা করো, ধরলে আমার ঠিক ফাঁসি হবে, এই মেয়ে অনাথা হবে। সব শুনে চণ্ডীবউ জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি সত্যি খুন করেছ কিনা বলো?

মেয়ের মাথায় হাত রেখে দিব্বি কেটেছে ষষ্ঠীচরণ। রাগের মুখে পেলে হয়ত খুন করত। কিন্তু খুন সে করে নি।

চণ্ডীবউ তাকে অভয় দিয়েছে, কিন্তু কি করবে নিজেও জানে না।

খোঁজ করে করে সেই লালমুখো দারোগা দলবলসহ এই বাড়িতেই উপস্থিত। চণ্ডীবউ তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে। তারপর সকলে অবাক হয়ে দেখেছে, মাথার ঘোমটা একেবারে খাটো করে চণ্ডীবউ সেই বিদেশী দারোগার সামনে উপস্থিত।

সার্জেন্ট সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

চণ্ডীবউয়ের বক্তব্য তাকে আর একজন বুঝিয়ে দিয়েছে। সে যা বলেছে তার সাদা অর্থ, ভিনগাঁ থেকে এসে ওই দুশ্চরিত্র লোকটা মেয়েদের অপমান করত বলে তারই আদেশে ষষ্ঠীচরণ তাকে একবার শাসিয়ে দিয়েছিল মাত্র। এর বেশি আর কিছুই করেনি। উপরন্তু বাড়িতে একটা উৎসব আসছে বলে ক'দিন ধবে দিবারাত্র এই বাড়িতেই আছে ষষ্ঠীচরণ, এক ঘন্টার জন্যেও বাইরে বা কোথাও যায় নি।

ততক্ষণে বাইরে খবরটা রটে যেতে দলে দলে লোক এসেছে দত্তবাড়িতে। রাধানাথও হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এস দেখে, সার্জেন্ট হাঁ করে চণ্ডীবউয়ের মুখের দিকে চেয়েই দোভাষীর কাছ থেকে তার বক্তব্য বুঝে নিচ্ছে। কি দেখল আর কি বুঝল সার্জেন্ট সে-ই জানে। চণ্ডীবউয়ের কাছে সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেই সে বিদায় হল।

করণের লোক এরপর পঞ্চমুখে চণ্ডীবউয়ের প্রশংসা করেছে, আবার নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলগা রসিকতাও করেছে। দিশী রূপসী দেখে লালমুখোর মুন্ডু কতটা ঘুরেছে সেই রসিকতা। যাই হোক, সেই থেকেই চণ্ডীবউ পালোয়ান ষষ্ঠীচরণের মা। ষষ্ঠীচরণ বলে, মা আমার সাক্ষাৎ দশভূজা, দশ হাত বার করে সন্তানকে রক্ষা করে।

এই মাকে হঠাৎ নিজের বাড়িতে দেখে ষষ্ঠীচরণ আনন্দে আটখানা। আগে অবশ্য আরো বারকয়েক এসেছে ওর বাড়িতে। ষষ্ঠীচরণের মেয়ের অসুখের সময়েও না এসে পারে নি। কিন্তু সেদিনের আসাটা একেবারে অপ্রত্যাশিত।

সাদরে তাকে আপ্যায়ন করে ঘরে এনে বসিয়েছে ষষ্ঠীচরণ। তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, মা এমন হঠাৎ যে?

চণ্ডীবউ সাদাসিধে জবাব দিয়েছে, ছেলেকে একবার দেখতে ইচ্ছে করল।

খুশি হলেও ষষ্ঠীচরণ বিশ্বাস করে নি।—কিন্তু তোমাদের তো মা আজ নয়নচাঁদ ঠাকুরের কাছে যাওয়ার কথা ছিল শুনেছি!

ষষ্ঠীচরণও শুনেছে তাহলে! করণে কারো কিছু শুনতে বাকি থাকে না।

ঈষৎ গম্ভীর জবাব দিয়েছে, কোথায় এলাম দেখতেই তো পাচ্ছ।

ষষ্ঠীচরণ হেসে মাথা নেড়েছিল, তাই তো বটে। তারপর জিজ্ঞাসা করেছে, ছেলের ওপর মায়ের কি হুকুম বলো?

অর্থাৎ একেবারেই বিনা কারণেই এসেছে এটা সে ভাবতে পারছে না। হঠাৎ কি মনে হতে চণ্ডীবউ বলেছিল, আচ্ছা, এখানকার এই সব আখড়া-টাখড়াগুলো ভেঙে দিতে পারো?

ষষ্ঠীচরণ অবাক। আখড়া বলতে বারইয়ারিগুলোর কথা বলছে বুঝতে পারছে। হেসে জবাব দিয়েছিল, মায়ের হুকুম হলে সবই পারি, কোন্‌টা ভাঙতে হবে বলো, চষে দিয়ে আসি।

ঝোঁকের মাথায়ই বলেছিল চণ্ডীবউ কথাটা। সামলে নিতে হয়েছে। —থাক, তোমাকে আর চষতে যেতে হবে না, এমনিই বলছিলাম।

নয়নচাঁদ সাধুর কাছে সেবারে যায় নি বটে চণ্ডীবউ। কিন্তু এবারে গেছে। বড় জোর মিনিট পাঁচ-সাত ছিল সেখানে। দারোয়ান আর পাল্‌কি-বেহারা বাইরেই ছিল। সে ভিতরে গেছে। একা। অবশ্য ভিতরে লোক ছিল, সাধুর ইঙ্গিতে তারা সরে গেছে।

সাধু সসম্মানে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, নিজের হাতে তার বসার আসন পেতে দিয়েছে, সবিনয়ে গৃহকর্তার কুশল জিজ্ঞাসা করেছে, আর এরই ফাঁকে ফাঁকে তার মুখের দিকে চেয়ে কি লক্ষ্য করেছে। এই যোগাযোগের হেতু জানে, কিন্তু কি যে বলবে তাই বোধ হয় ভেবে পাচ্ছিল না।

চণ্ডীবউ সমস্যার সমাধান করে দিল, স্পষ্ট মৃদু কণ্ঠে নিবেদন করল, ঠাকুর অর্থাৎ শ্বশুরের দেহ দিন দিন বিকল হতে চলেছে, তিনি যদি অনুগ্রহ করে কিছু ব্যবস্থা করেন।

যেন এই জন্যই তার আসা। সাধু মাথা নাড়ল। চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিল।

কাজ শেষ। চণ্ডীবউ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। সাধুর কাছে এও খুব প্রত্যাশিত নয়। তার মুখে কৌতুকের উন্মেষ দেখা গেল।

বিনীত শ্রদ্ধা জানিয়ে চণ্ডীবউর বেরিয়ে এলো। প্রসন্ন হাসিতে সাধুর মুখখানা ভরাট।

পাল্‌কি চলল। চণ্ডীবউ নির্দেশে সদর দিয়েই চলল। তার নির্দেশে পাল্‌কির সাদা ত্রিপলের ঢাকনাও সরে গেল। পরদার ফাঁক দিয়ে দক্ষিণ পাড়ার তেমাথার রাস্তায় মাছধরার হিড়িক লক্ষ্য করেই এই দ্বিতীয় আদেশ।

তারপর সকলের চোখের ওপর দিয়ে, সকলের চোখে লালের ঘোর লাগিয়ে, রক্তগোলাপ পাল্‌কিতে দুলে দুলে রাজেন্দ্রাণীর মতই ঘরে ফিরেছে দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ।

॥ ৩ ॥

ছিরে পাগলার জ্বালায় মাছ ধরা মাথায় উঠল সকলের।

কিন্তু এ-জ্বালা লাগে ভালো। জ্বালা ভোগ করতে অনেকে হাসিমুখে ছিপ ফেলে

উঠে এলো। লাল পাল্‌কি অদৃশ্য হতে গাছের যে লম্বা গুঁড়িটায় বসে মাছ ধরছিল সে, সেটার ওপরেই সটান শুয়ে পড়েছে। নধর দেহ একটু ভারসাম্য খোয়ালেই গুঁড়িটার এধার বা ওধারে গড়িয়ে রাস্তার জল-কাদায় পড়বে সে। কিন্তু পড়বে না যে তাও সবাই জানে। সেই গুঁড়িতে শুয়ে মাথা-কাটা বলির পাঁঠার মত হাত-পা ছুঁড়ছে সে। আবার দুচোখ কপালে তুলে শিবনেত্র হয়ে যাচ্ছে এক-একবার। আর মাঝে মাঝে গলা দিয়ে একএকটা বিচিত্র শব্দ বার করছে।

অর্থাৎ, ওই লাল পাল্‌কির লালের ঘায়ে দেহ থেকে প্রাণটি তার খাঁচাছাড়া হবার অবস্থা। হাসছে সকলেই। হাসছে না কেবল মুন্‌কে ভট্‌চায বা হারু ভট্‌চায। গোমড়া মুখ করে ক্রুদ্ধ চোখে সে ছিরে পাগলার কাণ্ড দেখছে। সে হাসতে পারছে না তার অনেক কারণ। প্রধাণ কারণ, ভুঁড়িতে ছিরে পালগার আচমকা কনুইয়ের ধাক্কাটা এখনো টনটন করছে। হাতের কাছে পেলেই ও তাঁর দেহটার ওপর এই রকম হামলা করে। এটা যেন ওর রসিকতার বস্তু। দ্বিতীয় কারণ, ছিপে ভালোই মাছ উঠছিল। এই রসিকতার থেকে মুন্‌কে ভটচাযের রসময় রস অনেক বেশি টসটসিয়ে উঠেছিল খানিক আগে। এক গুঁতোর চোটে তার দফা সেরে দিলে ও। মুন্‌কে ভটচায নাম সে মণের ওজনে খাইয়ে বলে। তার মত খাইয়ে গোটা করণে আর নেই। এই খাওয়ার মহড়া দেবার জন্য অনেক দূর দূর গ্রাম থেকেও তাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাওয়া হয়। আর, করণে কারো বাড়িতে ভোজন-কর্মের ব্যাপার থাকলে তাকে নেমন্তন্ন করারও প্রয়োজন নেই। সেবারে করণের এই মুন্‌কে শান্তিপুরের আর এক মুন্‌কেকে খাওয়ার কমপিটিশনে হারিয়ে গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করেছিল। সব ক'টা বারইয়ারির পাণ্ডারা তখন তার সম্মানার্থে এক ফতোয়া জারি করেছিল। করণের যে-কোনো বাড়ির ভোজন-উৎসবে মুন্‌কে ভটচাযের নেমন্তন্ন ধরা-বাঁধা থাকবে। বারইয়ারির মাতব্বরদের বিধান গাঁয়ের কোনো গৃহস্থই অমান্য করে না। আর কাছে বা দূরের অনেক ধনীগৃহ থেকে এই গুণের ফলেই মাসিক বৃত্তি পেয়ে থাকে সে।

কিন্তু খাওয়া দেখিয়ে উদর সংস্থান যার পেশা তার ভাগ্য সর্বদাই খুব ভালো বলা চলে না। এমন খাইয়েকে বারো মাস তিরিশ দিন কে শখ করে খাওয়াবে? ফলে যে-দিনটা তাকে নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে হয়—সেটাই তাব পক্ষে টানের দিন। মাসের মধ্যে এমন টানের দিন তো গোটাকতকই আসে। এই টানের দিন সামলানোর ধকলে পঁয়তিরিশ বছর পর্যন্ত বেচারার বিয়ে করাই হল না। অথচ বিয়ে করার ইচ্ছে নেই এমন নয়। কিন্তু রোজগার বলতে তো মাসোহারার ওই ক'টি টাকা, আর ভরসা বলতে লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন। বিয়ে করলে নিজে কি খাবে, বউকে কি খাওয়াবে আর ছেলেপুলে হলে তাদের মুখেই বা কি দেবে? অতএব বিয়ে যে করে নি সেটা মুন্‌কে ভটচাযের এক ধরনের আত্মত্যাগ—হতে-পারত-এমন-বউ-ছেলের প্রতি তার অপরিসীম অনুকম্পা। যাই হোক, আজও মুন্‌কে ভটচাযের ওমনি টানের দিনই গেছে একটা। ফলে বর্ষায় ছিপে একটা করে মাছ উঠছিল না তো যেন মরুভূমির ওপর এক পশলা করে জল নামছিল। এ অবস্থায় এমন রসিকতা কার ভালো লাগে!

রসিকতা বরদাস্ত করতে না পারার তৃতীয় কারণ, যাকে উপলক্ষ্য করে ছিরে

এই কাণ্ড করছে, সেই রমণীটিকে মুন্‌কে ভট্‌চায শুধু সমীহই করে না, বিলক্ষণ ভয়ও করে। সে যদি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে কে কি বলল বা কে কি করল, দফা শেষ তাহলে। ঠাকরোনটি অনায়াসেই তা পারে। ওই বাড়ির ওই বউ বিরূপ হলে তার সমূহ ক্ষতি। এদের জ্বালায় এই ক্ষতির ত্রাস তার লেগেই আছে। বিশেষ টানের দিনগুলোতে ওই বাড়িটাই বড় ভরসা তার। প্রসন্নময়ী অবশ্য গঞ্জনা দেয়, আবার তার কর্ত্রীর আদেশে ফলার সাজিয়েও দেয়। ভট্‌চাযের ধারণা কর্ত্রীর হুকুম না পেলেও দিত। কিন্তু ঠাকরোন সত্যি বিরূপ হলে তখন কি আর দেবে! তা ছাড়া, ছিরের মত অমন সত্যিকারের দাপাদাপি সে-ও যে কোন মেয়েমানুষের জন্য একটু আধটু করে না, তাও নয়। করে। করে ওই প্রসন্নময়ীর জন্যেই। চণ্ডীবউয়ের চাঁদ বাটা রূপ বটে, কিন্তু তাকে নিয়ে ঠাট্টার ছলেও কিছু কল্পনা করার বুকের পাটা ভট্‌চাযের নেই। কল্পনা যেটুকু করে প্রসন্নময়ীকে নিয়েই করে। ভট্‌চাযের এই জ্বালা টের পেয়ে ছিরে একবার তাকে গ্রাম-শেষের আমতলার সেই তেনাদের একজনের ডেরায় নিয়ে গিয়েছিল। ওই যারা দেহ্ ভাড়া খাটায়। ঘরে বসে সেই মেয়েমানুষটা তখন আবার হুঁকো টানছিল ফড়ফড় করে। তাদের দেখে তাড়াতাড়ি হুঁকো সরিয়ে কলাবতীটি হয়ে অভ্যর্থনা করেছিল। দেখেই কেমন গা ঘিন-ঘিন করছিল ভট্‌চাযের। নতুন বয়েসের কালে এমন আরো দু'পাঁচজনের ঘরে যে সে একেবারে না এসেছে এমন নয়—তখন এত খারাপ লাগে নি। সে বহুকালের কথা। কিন্তু ভারী বয়সে আসা সেই প্রথম আর সেই শেষ। পরদিন কতবার যে ভট্‌চায পুকুরে ডুব দিয়েছে ঠিক নেই। কিন্তু তাতেও ঘিন-ঘিন ভাবটা যায় না। এক অজ্ঞাত ভয়ে এরপর ক'দিন দত্তবাড়িতেও আসতে পারে নি, প্রসন্নময়ীর সঙ্গেও দেখা হয় নি। যাই হোক, প্রসন্নময়ীকে দেখলে তার কিন্তু একটুও সে-রকম খারাপ লাগে না। গা ঘিন-ঘিন করা দূরে থাক, দেখলেই কাছে যেতে ইচ্ছে করে। দু'দিন তাকে না দেখলে পেটে খিদে থাকলে যেমন হয়, তেমনি একটা অস্বস্তি কোথায় যেন লেগেই থাকে। এই এক কারণেও ওই দত্তবাড়িতে তার নৈমিত্তিক যাতায়াত। প্রসন্নময়ী অবশ্য তাকে দেখলেই মুখঝামটা দেয়, গালাগাল করে, অকথা-কুকথা বলে, এমন কি বেশি রাগলে ঝাঁটাও দেখায়। ভদ্র গৃহস্থ-ঘরের বিধবা সে, সেই দেমাকের কথা শুনিয়ে তার ওই ড্যাবডেবে দু'চোখ গেলে দেবে বলে যখন তখন শাসায়। কিন্তু এ-সবও ভট্‌চাষের ভালো লাগে, মিষ্টি লাগে, আর ফাঁকে-ফাঁকে প্রসন্নময়ী একটু-আধটু রঙ্গরস যখন করে, বা চুপি চুপি তার সঙ্গে কোথাও পাঁচালি যাত্রাগান শুনতে যায়, তখন তো ভট্‌চাযের একেবারে অনির্বচনীয় লাগে তাকে।

অতএব এই দত্তবাড়ির মানুষ বিরূপ হলে তার যে কত ক্ষতি সেটা এরা বুঝবে কি করে? আর ছিরের এই রসিকতাই বা মুন্‌কে ভট্‌চাযের ভালো লাগে কি করে? যে ঘোড়ার ডাক ডেকে উঠেছিল তারই পিলে চমকে গিয়েছিল—সে কি আর ওই চণ্ডীবউয়ের কানে যেতে বাকি! সে তো কানে তুলো গুঁজে পাল্‌কিতে চেপে যাচ্ছিল না!

ছিরে বা শ্রীনাথ ভট্ট আর মুন্‌কে বা মুন্‌কে ভট্‌চায—দুজনে অন্তরঙ্গ দোসর। একজনকে ছেড়ে আর একজনের চলে না। গাঁয়ের রত্ন দুজনেই। একজন হরবোলা

আর একজন ভোজনরসিক। অথচ গুণী বন্ধুর প্রতি একটুও যদি দরদ থাকত ছিরের, একটুও যদি ভাবত।

কিন্তু মাছ ধরার নেশা ছেড়ে যারা মজা দেখতে বা মজায় জমতে উঠে এসেছে, তারা কেউ মুন্‌কে ভট্‌চাযের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। মাছ ধরা থেকেও অনেক বড় রসের খোরাক পেয়ে তারা উঠে এসেছে। চোখে কিছু না দেখেও আর নতুন করে কানে কিছু না শুনেও এই এক রমণীয় প্রসঙ্গ তুলে অলস দিনের অনেকটাই সরস করে তুলতে পারে তারা। আর এ তো স্বচক্ষে দেখা লাল পাল্‌কি।

লাল পাল্‌কির ওই আরেহিনীকেও স্বচক্ষে দুই-একবার অন্তত সকলেই দেখেছে। সুযোগ সন্ধানে থেকে এর বেশিও দেখেছে কেউ কেউ। কিন্তু দেখাটা যেন কারোরই সম্পূর্ণ হয় নি। ঘোমটার ফাঁকে দেখা, চোখের নিমেষে দেখা—সে আর কতটুকু দেখা? আর সরাসরি চোখের সামনে দেখাটাই বা কতটুকু দেখা? রূপ? রূপ দেখাটাই তো সব দেখা নয়। রূপসী কি সাত রাজ্যে আর নেই কেউ? করণে নেই। রূপই বটে, তবে সে শুধু বাইরের রূপ নয়। আরো অনেক রূপ। যত কথা শোনা যায় চণ্ডীবউয়ের সম্পর্কে—ততো রকমের রূপ তার। এই এত রূপের কে আর কতটা দেখেছে? লাল পাল্‌কিতে না গিয়ে এতগুলো লোকের চোখের ওপর দিয়ে সটান হেঁটেও যদি বাড়ি ফিরত চণ্ডীবউ, তাহলেও তারা এমনি হাঁ করেই চেয়ে থাকত বটে, কিন্তু কেউ আকাশ থেকে পড়ত না।

এ ধরনের তাজ্জব রসের খোরাক গাঁয়ের মধ্যে ওই এক চণ্ডীবউকে যোগাতে পারে। এই পারা শুধু ওই এক রমণীর দ্বারাই সম্ভব। এই সর্বসম্ভবার সঠিক রূপটি তারা মনে ধরে রাখবে কি করে?

কিন্তু আজ আর কোনো জল্পনা-কল্পনা নয়, কোনো সংশয়ে হাবুডুবু খাওয়াও নয়। যেমন শুনেছিল তেমনি হয়েছে। লাল পাল্‌কি সকলের চোখের ওপর দিয়ে চলে গেছে। ওই লাল পাল্‌কি কোথায় গেছল কে আর না জানে।

কেন গেছল তাও জানে।

রসের আসল উৎস এই শেষের জানাটুকুই। এর তুলনায় বর্ষার মাছও নীরস।

গাছের গুঁড়ির ওপর ছিরে পাগলা উঠে বসেছে। দেখা পেয়েও পেল না বলে ভক্ত যেমন কৃষ্ণবিরহে অবসন্ন হয়ে বসে থাকে তেমনি বসে আছে। আর গলা দিয়ে এক-একবার এক-এক রকমের বিরহ তাপজনিত শব্দ বার করছে। তারপর হঠাৎ ডুকরেই উঠল একেবারে,—

ওরে তোরা লাল পাল্‌কির কথা বল্‌
আমার ধ্যানে লাল জ্ঞানে লাল,
সব যে রে লালে লাল,
আমারে এ কি লালের কালে খেলো বল্‌!
আমি আর কোনো কথা শুনব না রে,
তোরা শুধু লাল পাল্‌কির কথা বল্‌,
বল্‌ বল্‌ বল্‌।

হরি হরি বোলো—হরি হরি বোলো! অল্পবয়স্করা হরিধ্বনি দিয়ে উঠল, প্রবীণরা হাসতে লাগল।

ঘাড় ফেরাতে মুনকে ভট্চাযের বিরস মুখখানার ওপর চোখ আটকালো ছিরে পাগলার। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে দুই বাহু বাড়িয়ে জাপটে ধরল তাকে। তার পরেই আবার সেই আর্তনাদ :

সখা রে, একবার ওই লাল পাল্‌কির কথা বল্,
আমার কেমন করে কাটে এই দণ্ড?
ওই লাল দেখে আমি যে হয়ে গেলাম রে
ক্ষ্যাপা এক ষণ্ড।
আমি পাগল ছিলাম, ভালো ছিলাম,
এখন যে ক্ষেপে গেলাম, ক্ষেপে গেলাম রে....

আবার একপ্রস্থ আহা-উহু, আর একপ্রস্থ হরিধ্বনি, তারপর আর একপ্রস্থ হাসাহাসি।

তেমাথার পথমঞ্চের এই নাটক উচ্চগ্রামে তুলে দিয়ে বেরসিকের মত ভট্চাযকে ছেড়ে হঠাৎ হন হন করে একদিকে হাঁটা দিল শ্রীনাথ। কিছু মনে পড়েছে। খবরটা এবার আগে যার কানে পৌঁছে দেওয়া দরকার সে অনুপস্থিত এখানে। ঘোষালবাড়ির মদনমোহন ঘোষাল, বয়সে শ্রীনাথের ছোট। কিন্তু শ্রীনাথের তার কাছে অনুগতর ভূমিকা। শুধু শ্রীনাথের কেন, অনেকেরই। মনে পড়লে তেমাথার ওই রসভাণ্ডদের অনেকেই আগে খবরটা দেবার জন্য ঘোষালবাড়ির দিকে ছুটত।

নাটমন্দিরের ভিতর দিয়ে অন্দরের দিকে যেতে যেতে শ্রীনাথ হাঁক দিল, ঘোষাল আছে, বলি মোহন কই গো, ও মদনমোহন—

নাটমন্দিরের সামনে বা পিছনে কোনো একদিকে থাকার কথা ঘোষালের। অবকাশ সময় এদিকটাতেই থাকে। এই পড়তি দশায় ভিতরের কাঠের দালানের কতদিকে ভাঙন ধরেছে ঠিক নেই। কিন্তু ঘোষালের সেজন্যে একটুও উদ্‌বেগ নেই। উদ্‌বেগ নাটমন্দিরের কোথাও কিছু হলেই। তখন জলের মত পয়সা খরচ করবে। এই গেলবার ভালো একটা ধানীজমি বেচে দিয়ে নাটমন্দির সংস্কার করিয়েছে। এককালে বিদেশ থেকেও লোক আসত ঘোষালবাড়ির নাটমন্দিরের শিল্পকারু দেখতে। এই ঐতিহ্যের প্রতি মদন ঘোষালের মায়া খুব। রামায়ণ আর মহাভারত—এই দুই মহাকাব্য যেন সজীব হয়ে আছে এখানে। কোথায় একটু রং চটল, কোন্ চিত্রের সংস্কার দরকার, এসব দিকে খরদৃষ্টি তার।

কিন্তু আজ সে অন্দরের দিকেই ছিল। ডাক শুনে এগিয়ে এলো। দোহারা ঢ্যাঙা মূর্তি, খালি গা, ধপধপে পৈতে ঝুলছে। গায়ের রং পরিষ্কার নয়, কিন্তু মুখখানা কমনীয়। টিকলো নাক, টানা চোখ। বিগত ঐশ্বর্য আর নেই বটে, কিন্তু এই চেহারার মধ্যে তার স্পর্শ আছে।

তাকে দেখেই গলার সুর পালটে শ্রীনাথ কল্পিত শ্রোতার উদ্দেশে বলে উঠল,—

কহিল যমদেব, অন্য বর মাগ বরাঙ্গনে,
পতি বিনা যাহা চাহ পাইবে সুলক্ষণে।
করজোড়ে কৃতান্তে নমি সাবিত্রী যাচে শতপুত্র বর,
অমনি 'তথাস্তু' কহি যমরাজার হইল সঙ্কট সুন্দর।
বর লভি প্রণমিয়া বিধুমুখি কহে হৃষ্ট বচনে,
পতি বিনা শতপুত্র সতী পাইবে কেমনে?

এত বড় উচ্ছ্বাসও পদ্মপাতার জলের মত যেন একদিকে গড়িয়ে পড়ল। নির্লিপ্ত মুখে কাছে এসে মদন ঘোষাল জিজ্ঞাসা করল, কি খবর?

দেখে এলাম, সেই লাল পাল্‌কি দেখে এলাম। ঢঙ বাদ দিয়ে খবরটাই ব্যক্ত করল।—সত্যি সক্কলে দেখলাম আমরা, সেইখানেই গেছল!

মদন ঘোষাল সাদাসিধে জবাব দিল, জানি।

এমন নিরুত্তাপ অভিব্যক্তি আশা করে নি শ্রীনাথ। তার আগে কে আবার এই খবর দিয়ে গেল ভেবে পেল না। ওই নিস্পৃহ মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন খটকা লাগছে তার। জিজ্ঞাসা করল, আর কি জানো, বর মিলেছে? সতী-সাবিত্রীর পুত্রলাভ হবে?

কাঠের দেয়ালে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ চিত্রটার দিকে চোখ রেখে তেমনি নিরুত্তাপ গলায় মদন ঘোষাল জবাব দিল, সেজন্য যায় নি। শ্বশুরের ব্যামো ছাড়ছে না বলে ওষুধের তাগিদ দিতে গেছল।

এবারে শ্রীনাথ হাঁ। উচ্ছ্বাসের চূড়া থেকে একেবারে গদ্যাকারের মাটিতে আছাড় খেয়েছে। তবে সেই সঙ্গে যেন ঘোষালের মুখেই দেখার মত কিছুর সন্ধানও পেয়েছে।

মদন ঘোষালের মুখে এক ধরনের নির্লিপ্ত গাম্ভীর্য ভিন্ন দেখার আর কিছু ছিল না। তবু সেই গাম্ভীর্যের ছায়া সরিয়ে সরিয়েই ছিরে পাগলা দেখতে চেষ্টা করছিল কিছু। কাঠের দেয়ালে রঙ-করা অর্জুনের লক্ষ্যভেদ চিত্র থেকে দৃষ্টি সরে নি মদন ঘোষালের। ওটাতে কিছু গলদ চোখে পড়েছে যেন। এদিকে বোকা-বোকা গাম্ভীর্যে এই মুখের দিকে চেয়ে কিছু একটা লক্ষ্যভেদের চেষ্টায় আছে ছিরে পাগলা। সেও কিছু গলদ ধরার তালে আছে।

করণের এক সুনাম আছে, রসের গন্ধ পেলে করণের মানুষ গঙ্গামাটিও উপ্‌ড়ে তোলে। রসের সন্ধান পেলে তারা কাউকে ছাড়ে না। দক্ষিণপাড়ার জমজমাট বারইয়ারির মুকুটমণি মদনমোহন ঘোষালকে নিয়েও অনেক দিন ধরে রসের একটা চাপা স্রোত বইছে গোষ্ঠীর মাতব্বব রসিকজনের মনের তলায়। অন্তরঙ্গ নিভৃতে নিজেদের মধ্যে ঠারে-ঠোরে আভাসে-ইঙ্গিতে ইদানীং প্রায়ই তারা তাদের এই কর্ণধারটিকেও টেনে এনে রসের পাক দিয়ে থাকে। অবশ্যই সেটা করে থাকে তার অগোচরে এবং অনুপস্থিতিতে। তারা তাকে ভালবাসে। দু'দিনের অদর্শনে চোখে অন্ধকার দেখে। মদন ঘোষালের বচন মোহন বচন, কেষ্ট বচন। এই বচন না শুনলে কোনো ব্যবস্থা যেন সম্পূর্ণ হয় না। বারইয়ারিব কাজে-কর্মে উৎসবে-ব্যসনে বা তহবিল পুষ্টির এক-একটা চমকপ্রদ উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে তার সরস মন্তব্য বা ছলচাতুরীর যোগ না ঘটলে সবই নীরস লাগে।

কিছুকাল হল রসিক মহলের সদা দক্ষিণী হাওয়ায় যেন এই নীরসতার টান অনুভব করছে সকলে। ডাকলে এখনো ঘোষাল পো সবেতে আছে। কিন্তু ডাকলে! আগে সে বারইয়ারির রসিক সভায় উপস্থিত থাকুক আর না থাকুক, সকল সরসতার মূলের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল। এখন তাকে ডাকতে হয়। কাছে থাকলেও সময় সময় মনে হয় বুঝি কাছে নেই। এখনো তার কথায় নেচে ওঠে সকলে, কোন রসের ব্যাপারে বুদ্ধি বাতলালে একবাক্যে তারিফ করে ওঠে। কিন্তু পার্ষদরা বোকা কেউ নয়। মূলের সঙ্গে যোগ যে ঢিলে হচ্ছে সে তারা বেশ অনুভব করতে পারে এখন।

এই কিছুদিন আগেও গাঁজার আড্ডায় অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে ছিরে পাগলা হঠাৎ মন্তব্য করেছিল, শ্যামের এখন শ্রীমতীর দশা চলেছে, ভালো চাও তো তোমরা বাপু বাঘিনীর খোঁজে বেরোও!

শ্যামের শ্রীমতীর দশা চলেছে, অর্থাৎ শ্যামবিরহে শ্রীমতীর যেমন প্রাণান্ত দশা হয়, শ্রীমতীবিহনে এখন শ্যামের সেই দশা। শ্যামকে শ্রীমতী বলত নির্লজ্জ কালাবাঘ—তার না আছে দয়ামায়া, না বিচার-বিবেচনা। তাই শ্রীমতীর সদা আতঙ্ক, ওই কালাবাঘের সঙ্গে দেখা হল কি প্রাণটি গেল। কিন্তু রাধানুগামিনীরা হতবুদ্ধি, ওই নির্দয় কালাবাঘকে যে আবার না দেখলেও প্রাণটি গেল সখীর। দেখলেও মরণ, না দেখলেও মরণ। অতএব তারা বিবেচনা করল, কালাবাঘ বিহনে বেঁচে মরার থেকে ওই কালাবাঘের হাতেই মরে বাঁচা ভালো। কিন্তু শ্যামের যদি শ্রীমতীর দশা হয়, তাহলে? তাহলে আর বাঘিনী খোঁজা ছাড়া উপায় কি! বাঘিনী বিরহে না মরে তার হাতেই মরে বাঁচুক।

গাঁজার আসরে আবার ছিরে পাগলাও কল্কে পায় না। সেখানে বাদশার আসন সহায় ভট্টর। ছেলেবেলা থেকে একাগ্র নিষ্ঠায় গাঁজা ভাঙ আফিম চরসের বহু জটিল তথ্য নিয়ে গবেষণা করে এখন তিনি সর্বজনসম্মানিত গাঁজাখোর। সকলে বলে তাঁর গায়ে মশা-মাছিটা পর্যন্ত বসে না। সুতরাং কলেরায় বা ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু তাঁর কপালে নেই। সাপে কামড়ালে পর্যন্ত সাপ পটল তুলবে কি ভট্ট, অনুরাগীরা তা নিয়েও গবেষণা করে অনেক সময়। সহায় ভট্টর দুঃখ, পুজো-পার্বণে বিলাসে-ব্যসনে প্রতিমার ভালো-মন্দ নিয়ে লড়াই বাধে, হাউই আতস নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়, কবি-তরজা নিয়ে রেষারেষি বাধে, মোষের লড়াই হাতির লড়াই হয়, ধর্মের ষাঁড়ের মত শুধু পেট বোঝাই করে বাজী জেতে মুন্‌কে আর কাকের ডাক বকের ডাক হাতির ডাক ডেকে পুরস্কার পায় হাতি পঞ্চানন ছিরে পাগলা, অথচ তাঁর এত বড় গুণের কদর করার মত রসিক নেই এই রসের দেশেও। সকলে শুধু মুখেই তারিফ করে, ট্যাঁকের আধলা খসাবার নাম নেই কারো।

তবু এরই মধ্যে যে লোকের প্রসঙ্গে ছিরে পাগলা চিন্তিত, সেই লোক অর্থাৎ মদনমোহন ঘোষাল তাঁরও প্রিয়পাত্র। গুণের কদর তবু সে-ই করেছিল সেবারে। রূপোয় বাঁধানো এক পেল্লায় কল্কে উপহার দিয়েছিল তাঁকে। ভট্টগৃহে সেটা দর্শনীয় সামগ্রী হিসেবে শোভা পাচ্ছে। সাতাশ ছিলিম ওড়াবার পর শেষের পাঁচ ছিলিম গাঁজা ভাঙ আফিম চরস সব মিলিয়ে একটা কিছু করে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। সেই পাঁচ কল্কে নিঃশেষ করার পর কি আব এমন হয়েছিল? বাড়ি ফিরে নিজের গৃহিণীকে ছেলের বউ ভ্রমে বউমা সম্বোধন করেছিলেন, আর তারপরেও সাক্ষাৎ শ্বশুরকে সামনে দেখেও সে ঘোমটায় মুখ ঢাকল না দেখে ক্রুদ্ধ খেদে আবার গাঁজার আখড়ায় ফিরে এসেছিলেন। এর বেশি কিছু হয় নি। তাঁর সঙ্গী একজন ভক্তের মুখে আসল ব্যাপারটা শোনার পর রূপো-বাঁধানো বিরাট কল্কে উপহার দিয়ে তাঁকে একটু ঘটা করেই সম্মান দেখিয়েছিল মদন ঘোষাল।

অতএব ছিরে পাগলার মুখে সমস্যার কথা শুনে তাঁর ঢুলু ঢুলু চোখে চিন্তার ছায়া নেমেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু শ্রীমতীর না হয় কালাবাঘ পছন্দ, শ্যামের কি কালাবাঘিনী পছন্দ হবে।

গাঁজার ধোঁয়ায় ছিরে পাগলার মাথা পরিষ্কার হয়ে আসছিল, মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছে, না, রয়েল বেঙ্গল টাইগারণী ছাড়া আর কিছু পছন্দ হবে না।

টাইগারের স্ত্রী-বচন জানা নেই বলে ব্যাকরণ অশুদ্ধ রাখে নি ছিরে পাগলা।

কিন্তু এখন মনে মনে সকলেরই বেশ একটা খটকা লেগেছে, যেন-তেন রয়েল বেঙ্গল টাইগারণীর হাতে প্রাণ সঁপে দিতে রাজী নয় বোধ হয় তাদের শ্যামশ্রী মদন ঘোষাল। এই সাতাশ বছর বয়েস পর্যন্ত বিয়েই করল না, সেটাই একটা মস্ত খটকা লাগার মত ব্যাপার। চড়ে বেড়াও যেখানে খুশি, কিন্তু ঘরে পুষবে না একটাও, এ আবার কেমন মতি?

শ্যামের তাদের মতিগতি বরাবরই বিচিত্র বড়।

বয়েসকালে রমণীবিরহিত জীবন-যাত্রার তেমন নজির নেই এই করণে। আর এখানে বয়েসকালটাও ঠিক বছরের গোনাগুনতি হিসেব ধরে এগোয় না কারো জীবনে। বয়েস এখানে জায়গার গুণে বাড়ে, হাওয়া অনুযায়ী বাড়ে। বারো বছরের ছেলের চটুল রসিকতা বিয়াল্লিশ বছরের কোনো প্রৌঢ়ের কানে গেলে তিনি থমকে দাঁড়াবেন—কথাটা ঠিক হল কিনা বা যথাযোগ্য রসোত্তীর্ণ হল কিনা বিশ্লেষণ করে দেখবেন। তারপর হয় পিঠ চাপড়ে তারিফ করবেন নয়তো কাছে ডেকে শুধরে দেবেন—কথাটা আরো মজাদার কি করে হতে পারত সে-সম্বন্ধে একটু জ্ঞানদান করে যাবেন। মোট কথা, বয়সটাকে কালের আগে আগে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার উৎসাহ বা উদ্দীপনা যোগানোর লোকের অভাব কখনো হয় না। এটা কর্তব্যেরই অঙ্গ প্রায়। এর সঙ্গে স্থানের মানমর্যাদা আর গৌরব যুক্ত। সেই কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে করণের মানুষেরা রসিকতা উপস্থিত-বুদ্ধি আর তির্যক বাক্‌পটুতার সুনাম পেয়ে এসেছে। কত বিগত বৃদ্ধ রাজদরবারে গিয়ে কথার আর বুদ্ধির জাল ফেলে ভাগ্যে ঘড়া তুলে এনেছে। অতএব আজকের কিশোর নবীনরাই তো কালকের মর্যাদার নিশান উড়িয়ে বেড়াবে। তাদের হেলাফেলা করতে আছে? তা এই রসানুশীলন রমণীকে বাদ দিয়ে কতটুকু হতে পারে? অতএব বয়সের আগে জীবন এগোনোটা স্বাভাবিক ধারা এখানকার।

আর, ষোল বছর বয়স না হতে এই ধারায় রীতিমত পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল করণের মদন ঘোষাল। তার জীবনের খরধারা এমন একটা দুর্বোধ্য দিকে বাঁক নেবে, কেউ কল্পনাও করে নি। বরং ছেলেটার ওই বয়সে যে রসিক প্রবরের ঘরে একটু চোখে পড়ার বত যৌবনমুখী কিশোরী আছে, অথবা যে ঘনিষ্ঠ ইয়ারের ঘরে ওই বয়সের ভগ্নী আছে—এই ছেলেটার কথা ভেবে তাদের একটু সামলে-সুমলে চলতে হত। সেই সময় মদন ঘোষালের বয়ঃজ্যেষ্ঠ এক অন্তরঙ্গ বন্ধু তো নিজের বিধবা ভ্রাতৃবধূ আর পনের বছরের বিধবা ভগ্নীকে একেবারে কাশীতে চালান করে দিয়ে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছিল। সেই সময় নৌকাযোগে কাশীতে পাঠানো আর যমের মুখে পাঠানোর মধ্যে তেমন তফাত কিছু ছিল না।

আজকের এই মতিগতির কথা ভাবা দূরে থাক্, রমণীর ব্যাপারে মদন ঘোষাল যে একদিন করণে নব নব উত্তেজনা সৃষ্টির নিয়ামক হবে তাতে সংশয়ের অবকাশ ছিল না কারো। চরিত্রগত ব্যাপারে ভোরের রং দেখে মধ্যাহ্নের রং অনুমান করা যায়।

মদন ঘোষাল নারীজগতে পদার্পণে বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছিল সেই ষোল বছর বয়সেই। ঘোষালবাড়িরই কি এক উৎসব উপলক্ষে ভিন গাঁয়ের এক কীর্তনের দল এসেছিল। সেই দলে ফোঁটা তিলক কাটা রমণীও ছিল জনা দুই। একজন প্রৌঢ়া আর একজন বয়েসকালের হলেও বছর পাঁচ-সাত বড় হবে মদন ঘোষালের থেকে। সেই দ্বিতীয়াটি রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া কিছু তাও নয়। যেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেখানে এসে এসে তাদের দেখাশুনা করে যাওয়ার ভারটা মদনমোহন নিজেই নিয়েছিল। দলবল নিয়ে আসত, বসত, গান শুনত, রসালাপ করত। কিন্তু মাত্র দেড়দিনের ঘনিষ্ঠতার ফাঁকে হৃদয়সাগরে যৌবনের তুফান উপস্থিত মদনমোহনের।

কর্তা-ঘোষাল বেঁচে তখন। উৎসবের দিন সকালে এসে মদনমোহন সেই দুই রমণীকে কর্তার এত্তেলা দিল, তোমাদের মা-মেয়ে দুজনকেই ডাকছেন কর্তামশাই, এক্ষুনি এসো আমার সঙ্গে। তারা তার সঙ্গে তক্ষুনি বেরিয়ে এলো।

দুপুর নাগাদ খবর এলো রমণী দুটি নিখোঁজ হয়ে গেছে কোথায়। ঘোষালবাড়িতে খবর করতে এসে কীর্তনের দলের লোকেরা হাঁ। ঘোষালকর্তা কিছুই জানেন না। দৌড়াদৌড়ি খোঁজাখুঁজি ছোটাছুটি পড়ে গেল চারদিকে। সন্ধ্যার আগে ফাঁক পেয়ে সেই রমণীদুটিই এসে হাজির ঘোষাল বাড়িতে। প্রৌঢ়া হেসে বাঁচে না, আর হেসে সারা তার মেয়েও। ঘোষালকর্তাকে প্রৌঢ়া একেবারে বেয়াই ডেকে বসল, বলল, কেত্তন শুনবেন কি বেয়াই মশাই, আগে ছেলের বিয়ের আসর সাজান। আপনার ছেলে আমার এই মেয়েকে বিয়ে না করে ছাড়বেই না, আমি কথা দিতেও বিশ্বাস করে না, শেষে মেয়েটা ওর প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে গোটাকতক গান শোনাতে তবে বিশ্বাস হল। আর সেই বিশ্বাসের ফাঁক দিয়ে আমরা কোনরকমে গলে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।

তা ঘোষাল-কর্তা এমন ছেলের উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছিলেন বটে সেদিন। পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত খড়ম-পেটা করেছিলেন।

বাপের খড়ম বস্তুটা কি, দু'বছর বাদে আরো একবাব আস্বাদন করতে হয়েছিল মদনমোহনকে। সেটা গোটাগুটি ওই রাধানাথের বিশ্বাসঘাতকতার ফল। চণ্ডীবউয়ের স্বামী রাধানাথ—অবশ্য চণ্ডীবউয়ের তখনো হদিস মেলে নি। আঠের বছর বয়স তখন ছেলের, অনেক ভেবেচিন্তে সে মনের বাসনা ব্যক্ত করে ফেলেছিল। বিয়ে যদি করতে হয় তো অঘোর-নিবাসের ঘোরতান্ত্রিক ওই হৃদয়-অঘোরীর বোন ক্ষমাযোগিনীকেই করবে। ক্ষমাযোগিনীর বয়েস তখন বছর ছাব্বিশ, কম করে আট বছরের বড় বিবাহেচ্ছুক বরটির থেকে। কিন্তু তাতে কি গেল-এলো, চোখ খোলা অবধি তো এক রকমই দেখে আসছে ক্ষমাযোগিনীকে। দেখেছে অবশ্য খুব বেশি নয়, কারণ, সাধারণের সঙ্গে তার যোগ খুবই কম। কিন্তু যে ক'বার দেখেছে, এই বাসনাটাই পুষ্ট হয়ে উঠেছে মদনমোহনের। রূপ বটে—ভয়-ভয় করে এমন রূপ। তার অলঙ্কার, তেলসিঁদুরের কঙ্কা, গেরুয়া বাস, হাতের ত্রিশূল, লালচে খোঁপায় গোঁজা ফুল—এই সব মিলিয়ে রমণীটি যখন বয়েসকালের লোকদের মনেও ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আর রহস্যের উদ্রেক করেছে—মদনমোহনের তরুণ যৌবনে সে তখন প্রেমিকার আসনে বসে গেছে।

সখাদের কেউ ঠাট্টা কিনা বুঝতে চেষ্টা করল, কেউ কানে আঙুল দিল, কেউ-বা

শিউরে উঠল। গাঁয়ের লোকে আর যাকে নিয়ে যে কথাই বলুক, পঞ্চমুণ্ডীর ওই তান্ত্রিক ঘরটাকে সর্বতোভাবে পরিহার করেই চলত। এদিকে পড়ন্ত অবস্থার ঘোষালদের ছেলের অত দাপট কখনোই সহ্য হত না বড় অবস্থার দত্তবাড়ির দুলাল রাধানাথের। সে গোপনে কিছু পয়সা খরচ করল এবং আস্পর্ধার কথাটা কোনরকমে হৃদয় অঘোরীর কানে তোলার ব্যবস্থা করল।

এরপরই গাঁয়ে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সূত্রপাত। যে হৃদয় অঘোরীর মুখের দিকে তাকালে বুকের ভিতরে টিপ টিপ করে, সে নাকি রক্তচক্ষু মেলে শুধু তাকিয়েছিল সংবাদ-জ্ঞাপনকারীর দিকে। তারপর বলেছিল, ওর বাপকে পাঠিয়ে দিস একবার। শুনেছিল ক্ষমাযোগিনীও। তার মুখে ভাব-বিকার দেখা যায় নি কিছু, সে শুধু দুই চক্ষু পুরোপুরি খুলে তাকিয়েছিল, আর তাইতেই দূতের বুকের রক্ত জল হবার দাখিল। সে বলেছিল, বাপকে পাঠাতে হবে না, ওই ছেলেটাকেই একবার পাঠিয়ে দিও।

এখানকার বাতাসেরও কান আছে। খবরটা গরম হতে হতে শেষে ঘোষাল-কর্তার কানেও উঠল। না উঠিয়ে গতি কি, মহাতান্ত্রিক বংশের তেনাদের হুকুম যখন হয়েছে, পালন না করলে কি অঘটন দেখা দেবে ঠিক কি! তাদের সমীহ করে না গাঁয়ে এমন কে আছে? এমন কি ঘোষাল-কর্তাও অস্বস্তিতে মুষড়ে পড়লেন। প্রথম রাগটা বশে আনার জন্য খড়ম দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ছেলেকে পিটলেন। তারপর নিজেই এলেন হৃদয় অঘোরীর বাড়ি। ঘোষালদের বংশানুক্রম দাপট না থাকুক মেজাজ আছে। কিন্তু মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাপার যেখানে, সেখানে তাঁরা মাথা নত করতে আপত্তি করতেন না। হৃদয় অঘোরী বাড়ি ছিল না, অতএব অবোধ নাবালক ছেলের হয়ে ক্ষমাযোগিনীর কাছেই মার্জনা ভিক্ষে করলেন ঘোষাল-কর্তা।

ক্ষমাযোগিনী বলল, আপনাকে তো আসতে বলি নি, ছেলেকে পাঠিয়ে দিন!

যোগিনীর নির্লিপ্ত চাউনি আর স্থিরবাক্য শুনে ঘোষাল-কর্তা মনে মনে ঘাবড়ালেন একটু। পরদিনই ছেলের চুলের মুঠি ধরে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তাকে। তারপর ছেলেকে যোগিনীর পায়ের উপর আছড়ে পড়তে আদেশ দিয়ে নিজে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ছেলে পায়ে পায়ে ভিতরে এলো। একটু যে অস্বস্তি না হচ্ছিল তা নয়। ভিতরে পা দিয়েই মনে হয়েছিল, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে এ-বাড়ির শুধু যে সম্পর্ক নেই তা নয়, বাইরের বাতাসও যেন বন্ধ এখানে।

ক্ষমাযোগিনী আসনে বসে ছিল। ফিরে তাকালো। এক পলক দেখেই বুঝে নিলে কে হতে পারে। আঙুলের ইশারায় সামনের মেঝেটা দেখিয়ে দিল। ঘোষাল-তনয় বসল।

নাম কি?

মদনমোহন।

ক্ষমাযোগিনী আবার চেয়ে দেখল একটু। তারপর মন্তব্য করল, মদনমোহনই তো বটে দেখি। জিজ্ঞাসা করল, অসৎসঙ্গে মিশিস খুব বুঝি?

মদনমোহন মাথা নাড়ল, মেশে না। এবারে একটু বেশি অস্বস্তি বোধ করছে সে। কারণ যোগিনীর এই স্থির ঋজু ভাব, কমনীয় মুখ, আয়ত নেত্র, রুক্ষ জটা—সব মিলিয়ে মূর্তিটি যেন ভালো লাগছে তার। মুখের দিকে চেয়ে সত্যিই এরা ভিতর

দেখতে পায় কিনা কে জানে। তাই প্রাণপণে সে চেষ্টা করছে ভালো যাতে না লাগে।

বিয়ে করার সাধ হয়েছে?

মদন তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল। মনে হল, ওই স্থির চোখে আর ঠোঁটের ফাঁকে একটু যেন প্রসন্নতা উঁকিঝুঁকি দিল।

কেন, ইচ্ছেটা চলে গেল কেন?

বাবার খড়মের পিটুনি খেয়ে।

ক্ষমাযোগিনীর ঠাণ্ডা মুখে যেন রুষ্ট ছায়া পড়ো-পড়ো হল একটু। তোকে মেরেছে?

এই সুযোগ হেলায় হারানোর মত বোকা নয় মদনমোহন। পিঠ আর কাঁধ থেকে ফতুয়া সরিয়ে তক্ষুনি মারের দাগ দেখিয়ে দিল। মারের চিহ্ন সত্যিই মিলায় নি তখনো। মুখের রুষ্ট গাম্ভীর্য স্পষ্টতর হল আরো ক্ষমাযোগিনীর মুখে। ভালো মুখ করে মদনমোহন বলল, আজও চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে বাবাই এখানে নিয়ে এসেছে। বাইরে বসে আছে বাবা। বাড়ি গিয়ে আবার মারবে বোধ হয়।

কিন্তু এবারের প্রতিক্রিয়া বিপরীত। রুষ্ট ভাব গিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে একটা যেন হাসির আভাস উঁকিঝুঁকি দিল। বলল, বেশ করবে।

এদিকে ছেলের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে দুশ্চিন্তায় ঘোষাল-কর্তা ভিতরে চুপি দিলেন। তারপর যে দৃশ্য দেখলেন সেটা অন্তত আশা করেন নি। ছেলে রেকাবি ভরতি ফল আহারে মগ্ন আর অদূরে যোগিনী বসে। ভরসা পেয়ে ঘোষাল-কর্তা পায়ে পায়ে এগোলেন। যোগিনী ফিরল তাঁর দিকে। হঠাৎ এমন রুষ্ট নেত্র দেখবেন বলেও প্রস্তুত ছিলেন না ঘোষাল-কর্তা।

আপনি ওকে মেরেছেন?

বিড়ম্বিত ঘোষাল-কর্তা কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না।

আর কখনো ওর গায়ে হাত তুলবেন না। তার ফল ভালো হবে না।

...এরপর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে মদনমোহন আনন্দে ডগমগ হয়ে গল্প করেছে, বাবার সেই মুখ দেখে আর ক্ষমাযোগিনীর সেই মুখ দেখে আর তার বচন শুনে সত্যি সত্যি ওই রমণীকে বিয়ে করার অভিলাষ যে কতগুণ বেড়ে গিয়েছিল ঠিক নেই। সুযোগ সুবিধে পেলে প্রস্তাবে রাজি আছে কিনা সরাসরি সেটা ক্ষমাযোগিনীকেই যে একবার জিজ্ঞাসা করবে, সেই বাসনাও ব্যক্ত করেছিল বন্ধুদের কাছে। কিন্তু পরে সব দিক ভেবেচিন্তে আর এগনো ঠিক মনে হয় নি তার।

যৌবন ভালো করে পাকাপোক্ত না হতে এরকম যার মতি, ভরাযৌবনে তার সম্পর্কে অনেক উচ্চাশা ছিল অন্তরঙ্গজনের। রমণীর ব্যাপারে এখনো লোকটাকে আদৌ নীরস ভাবে না কেউ, তবু তার ভাবগতিক সম্প্রতি একটু বেখাপ্পা লাগতে শুরু করেছে সকলের চোখে।

পশ্চিম প্রান্তের নয়নচাঁদ সাধুর বাড়ি গিয়েছিল চণ্ডীবউ আর সেখানে গিয়ে সে শুধু শ্বশুরের আরোগ্য প্রার্থনা করে এসেছে—এ খবর মদনমোহন ঘোষাল রাখে, কারণ সে তখন সেখানেই ছিল।

সেইখানে, নয়নচাঁদ সাধুর ঘরে।

হ্যাঁ, প্রত্যক্ষদর্শী আর প্রত্যক্ষশ্রোতা হবার তাড়নায় ঘোষালবাড়ির মদনমোহন সেই দিন, সেই বর্ষাঝরা অপরাহ্ণে নয়নচাঁদ সাধুর দাওয়ায় সশরীরে উপস্থিত ছিল। শুধু করণে নয়, এক রমণী-হৃদয়ের নিভৃতেও একটা বিষম, প্রায়-নিষ্ঠুর চমক লাগাবার লোভ সে কিছুতে সংবরণ করতে পারে নি। এত দিনের এমন মুখরোচক গোপন গুজব সত্য হতে চলেছে। সেই গোপন সত্য এক হ্যাঁচকা টানে প্রকাশের একেবারে সদরে এনে ফেলার রোমাঞ্চ অনুভব করতে চেয়েছিল সে। শুধু তাই নয়, করণের রসিক-মহলে বেশ বড় রকমের আলোড়ন পড়ে যাবে আবার একটা। আনন্দে আটখানা হয়ে প্রিয়জনেরা তাকে মাথায় তুলে নাচবে বোধ করি।

মনে মনে আগে থেকেই সেই মঞ্চ প্রস্তুত করে ফেলেছিল সে। তার খবর সংগ্রহে ভুল হয় নি। হিসেবেও গলদ ছিল না। ঠিক কোন্ সময়ে দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ আসতে পারে নয়নচাঁদ সাধুর বাড়ি, সে সম্বন্ধেও মোটামুটি আঁচ পেয়েছে।

অতএব তার ঘন্টাখানেক আগে সে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল সাধুর বাড়িতে।

নয়নচাঁদ তাকেও সেই ছেলেবেলা থেকেই চেনে, জানে। দত্তবাড়ির মত ঘোষালবাড়িতেও তার যথেষ্ট যাতয়াত ছিল। অবশ্য, সে ওই প্রাক্সাধু জীবনে। আর বুড়ো ঘোষাল-কর্তা মোটামুটি ধর্মভীরু গোছের ছিলেন বলে মনে মনে অন্তত মহেশ্বর দত্তর থেকে তাঁকেই একটু বেশি পছন্দ করত।

নয়নচাঁদ তার নৈমিত্তিক কাজে মগ্ন ছিল। অর্থাৎ গুটিকতক ভক্ত পরিবৃত হয়ে গল্পের ছলে তাদের সদুপদেশ দিচ্ছিল। গল্প বলতে একটাই গল্প তার অনুগতরা ঘুরেফিরে শুনে থাকে। সেই গল্প তাদের কর্তাভজা গোষ্ঠীর কর্ণধার আউলচাঁদের গল্প। নয়নচাঁদ বলছিল, মহাপুরুষরা যখন আসেন তখন বাড়ি ঘর আরাম বিরামের ব্যবস্থা সব ঠিক করে আসেন না গো, বরং ঘন মেঘ ফুঁড়ে চাঁদ বেরুবার মত দুর্যোগের মধ্যে দিয়েই উদয় হতে ভালোবাসেন তাঁরা। কেষ্টঠাকুর কি ইচ্ছে করলে কংসের জেলখানায় দেবকীর গর্ভে ছাড়া আর কারো ঘরে আসতে পারতেন না? নাকি প্রহ্লাদঠাকুর দৈত্যের ঘর ছেড়ে আর কারো ঘর বেছে নিতে পারতেন না? মহাপুরুষের লীলা কে বুঝবে বলো.. আট বছর বয়সে আউলচাঁদ কেন যে মহাদেব বারুইর পানের বরজের ভিতর থেকে বেরুলেন কে জানে? মহাদেব বারুইর ঘর করবেন, সেখানে পালিত হবেন বলেই না—

ভক্তরা শুনছিল আর মাথা নাড়ছিল। যে পর্যায়ের খেটে-খাওয়া মানুষ তারা, অতশত বোঝে না। ভক্তির টানে আসে, সাধুর কথা শুনলেই তাদের কান জুড়োয়। তাই মাথা নাড়ে তারা। নয়নচাঁদ আজ গণ্যিমান্যি সাধু হয়েও তাদের যে একটুও অনাদর করে না সেইটেই বড় কথা।

অদূরে বসে ডিমি-ডিমি ঢোল বাজাচ্ছে ফকিরচাঁদ। কাজকর্ম না থাকলে তার হাত সর্বক্ষণই ঢোলের সঙ্গে লেগে আছে। গুরুর কাছে সর্বদা লোক বসে থাকে আর বকায় সেটা তার খুব পছন্দ নয়। যখন বেশি বিরক্ত হয়, ঢোলের আওয়াজ বাড়ে।

বেড়া ঠেলে আবার একজন কে ঢুকছে দেখে তার ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। কিন্তু পরক্ষণে দুই চক্ষু বিস্ফারিত। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

না, এমন আগন্তুক সে একবারও আশা করে নি।

ঘোষালবাড়ির ছোট ঘোষালঠাকুরই তো বটে।

এ-রকম গণ্যিমান্যি আগন্তুক দেখলে ফকিরচাঁদের বিরাগের বদলে আনন্দ হয়। তার গুরুর মাহাত্ম্য যেন তাতে অনেকগুণ বেড়ে যায়। এই কুটিরে হঠাৎ একদিন হৃদয় আঘোরী আর ক্ষমাযোগিনীর আবির্ভাব হতে সে তো খানিকক্ষণ ভয়ে কাঠ হয়ে ছিল, তারপর ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছিল।

আজও তাকে তটস্থ হয়ে ছুটতে দেখেই সকলে সচকিত হয়ে চোখ ফেরালো। যারা ঘিরে বসে ছিল সাধুকে তারা প্রায় সকলেই চেনে এই আগন্তুকটিকে। অতএব একটু সম্ভ্রমভরেই তারা জায়গা করে দিল, অর্থাৎ সরে দাঁড়াল। ফকিরচাঁদ তাকে আপ্যায়ন করে নিয়ে আসছে।

সদা ঠাণ্ডা মুখ নয়নচাঁদ সাধুর। কিন্তু তার সেই মুখেও বিস্ময়ের দুই একটা আঁচড় পড়ো-পড়ো হল। ফকিরচাঁদ সকলকে সরিয়ে তাকে একেবারে সামনে এনে দাঁড় করালো। তারপর চাটাই আনার কথা মনে হল তার।

মদন ঘোষাল ততক্ষণে সাধুর সামনেই দাওয়ার ওপর বসে পড়েছে।

নয়নচাঁদ জিজ্ঞাসা করল, কি গো ঘোষালঠাকুর, তুমি হঠাৎ এই দীনের কুঁড়েয় সশরীরে হাজির—সব খবর ভালো তো?

ভালো। অনেকদিন তোমাকে দেখব দেখব করছিলাম, সময় আর হয় না। আজ এসেই গেলাম—

নয়নচাঁদ তার মুখের দিকে খানিক চেয়ে রইল শুধু। তারপর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, আমি তোমাদের হুকুমের দাস, হুকুম করো।

ছেলেবেলা থেকে যে লোকটাকে দেখে এসেছে, অথবা দেখেও যাকে ভালো করে দেখে নি কোনদিন, তার সামনে এসে বা তার এই বিনয়-নম্র কথাবার্তা শুনে একটুও অস্বস্তি বোধ করার কথা নয় মদনমোহন ঘোষালের। অথচ ঝোঁকের মাথায় আসার পর কি-রকম যেন লাগছে।...না, ঠিক ঝোঁকের মাথায় আসে নি, আগে থাকতে অনেক খবর নিয়ে অনেক মাথা খাটিয়ে তবে এসেছে। তবু সত্যিই এসে হাজির হওয়াটা যেন ঝোঁকের মাথায় আসার মতই লাগছে এখন!

হাসিমুখেই বলল, তুমি কত আদরের লোক আমাদের এখন, তুমি এ-রকম বলো কেন? তোমার কথা কে না বলে এখন? সত্যি, এমনি তোমাকে দেখতে চলে এলাম।

সাধু সবিনয়ে বলল, বড় ভাগ্যি আমার। তার-জড়ানো কাচের ভিতর দিয়ে একটু নিরীক্ষণ করে দেখল তাকে।—অনেক বড়টি হয়েছ এখন, সেই কবে দেখেছিলাম। তা ভালই করেছ ঠাকুর, যোগ থাকলে তবেই তো দেখা মেলে, যোগ না থাকলে তুমি আসবেই বা কি করে আর দেখাই বা পাব কি করে। আজ যোগ ছিল তাতে আর সন্দ কি...।

সদা সপ্রতিভ মদন ঘোষাল হঠাৎ যেন থতমত খেল একটু। বরাবরই মিষ্টি কথা বলত নয়নচাঁদ। কিন্তু শুধু মিষ্টি কথাই কিনা ঠিক যেন বুঝে উঠছে না। নয়নচাঁদ গল্প করতে লাগল। কর্তা-ঘোষালের গল্প। কত স্নেহ করতেন তার মত অভাজনকে, কত সময় কত উপকার করেছেন। বাড়িঘরের কথাও উঠল। তেমনি

আছে কিনা সব, পূজামণ্ডপ মেরামত করা হয়েছে কিনা, আঁকা মূর্তিগুলি এখনো সেই রকমই উজ্জ্বল আছে কিনা—যেত যখন চোখ জুড়িয়ে যেত। কতকাল দেখা হয় নি, যাবে একদিন, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখবে।

মদন ঘোষাল আন্তরিক আপ্যায়ন জানালো, গেলে আর দূর থেকে দেখবে কেন, ভিতরে এসেই দেখবে—

সাধু জিব কাটল, মাথা নাড়ল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

মদনমোহন বলল, আসলে তুমি যাবেই না, বহু দেব-দেবীর মূর্তিতে তোমাদের ভক্তি থাকা তো নিষেধ।

নয়নচাঁদ এবারে জবাব দিল, নিষেধ কিছুতেই নেই গো ঠাকুর, মন টানলেই হল। আজ তোমার আসার মন হয়েছে, কেউ নিষেধ করলেই কি শুনতে?

মনে মনে আবার একটা হোঁচট খেতে যাচ্ছিল মদনমোহন, নির্বিকার মুখের দিকে চেয়ে আশ্বস্ত হল। হাসিমুখেই বলল, অনেক দিন পরে দেখছি, তুমি কিন্তু অনেক বদলে গেছ।

সাধুর দৃষ্টিটা এবারে তার মুখের ওপর থেমে রইল একটু। কাছ থেকে নয়, যেন অন্যমনস্ক চোখে দূর থেকে দেখছে তাকে। বলল, সেটাই তো নিয়মের কথা, তুমি বালককালে ক্ষমাঠাকুরাণীর বাড়ি দৌড়েছিলে—আজও যদি তেমনি থাকো তো সে কেমন কথা হবে?

মদনমোহন চুপ হঠাৎ। চেয়ে আছে। কোন্ লোকের কাছে এসেছে এই যেন প্রথম উপলব্ধি করল। যে লোক একদিন কৃপার পাত্র ছিল সকলের, সে যে এমন কথা বলতে পারে তার ধারণা ছিল না। কথা অল্পবিস্তর এই করণে সকলেই বলতে পারে। কিন্তু এ যেন সেই কথার দামে কথা-বিকনো উক্তি নয়। এই কথা স্নায়ু নাড়া দেয় না, ভিতরে কোথায় আঁচড় কাটে। যে মদন ঘোষাল দক্ষিণপাড়ার ডাকাবুকো বারোইয়ারীর মাথার মণি, আবাল-বৃদ্ধের কাছে যার মর্যাদা, তাব এই দুরবস্থা যেন তারই মধ্যে বসে আর কেউ দেখছে বসে বসে।

নয়নচাঁদের কথার সুরে এতটুকু অনুযোগ নেই, চাউনিতে লেশমাত্র বীতরাগ নেই, মুখে কোনরকম বিকার নেই। মদন ঘোষালের তবু কেমন মনে হল, তার এই উক্তির মধ্যে কোথায় যেন একটু ভর্ৎসনা মিশে আছে।

মনে হওয়া মাত্র আত্মস্থ হতে চেষ্টা করল সে। এটা তার স্বভাবের অঙ্গ। দুর্বলতা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। দুর্বলতা যদি থাকেও, সেটাকে কাপুরুষতা আখ্যা দিতে প্রবল আপত্তি।... এসেছে, বেশ করেছে। আসার কারণটা নয়নচাঁদ যদি বুঝে থাকে ভালো কথা। তার এই আসার ফলাফল উপভোগ করবে তার অনুরাগীরা, আনন্দে কৌতূহলে আটখানা হবে। তাদের আনন্দের ছিটেফোঁটাও এখানে তো আর ভেসে আসছে না। নয়নচাঁদ যা খুশি বুঝুক।

কথা আর এগুলো না। ফকিরচাঁদের আবারও সচকিত হবার পালা। তাই হল। তারপর বাইরের দিকে চেয়ে দুই চক্ষু স্থির হল তার। কাদের বাড়ির ঢাকা-পালকি এসে থামল সে ওই বাহকদের দেখেই চিনেছে। এবারে আর দরজার দিকে ছুটল না সে, বিমূঢ় মুখে তাকালো তার গুরুর দিকে।

দেখেছে নয়নচাঁদও, যারা এসেছিল তারা কেউ কেউ আগেই চলে গেছে, কেউ

বা তখনো অপেক্ষা করছে। কাউকে বিশেষ করে নয়, প্রায় সকলের উদ্দেশেই নয়নচাঁদ বলল, তোমরা একটু ভিতরের চালায় যাও, একটি মা কথা কইবেন—

তার দৃষ্টিটা তারপর মদন ঘোষালের মুখে এসে আটাকালো একটু। তরপর ফকিরচাঁদকে বলল, ছোট ঘোষালঠাকুরকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাও ফকির, আমি মায়ের সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।

অতএব মদন ঘোষাল গাত্রোত্থান করল। কিন্তু বাইরের দিকে নয়, নয়নচাঁদ ভিতর বলতে যা বোঝালো, সেদিকেই চলল। এ-রকমই হবে আশা করেছিল। করণ, নয়নচাঁদ তার দাওয়ার ছাপরা ঘর ছেড়ে বড় একটা নড়ে না শুনেছিল। সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী নাটকে প্ল্যান মাথায় এসে গেছে তার। খানিকটা সময় ভিতরে অপেক্ষা, এদিকে আলাপ যদি শোনা সম্ভব হয় তো শুনবে। আর তারপর হঠাৎই বেরিয়ে আসবে ভিতর থেকে, নয়নচাঁদকে বলবে, চলি হে আজ, একটু তাড়া আছে।

...চণ্ডীবউ কতটা চমকে উঠবে, আর তার মুখখানা দেখতে কেমন হবে, সেটা ভালো করে দেখার অবকাশ হবে না হয়ত মদন ঘোষালের। কারণ সেভাবে দেখার লোভ সংবরণ করে গম্ভীর মুখে চলে আসাই ভাল হবে তার। সেই চেষ্টাই করবে সে।

ভিতরের ঘরে ফকিরচাঁদ ব্যস্ত হয়ে তার জন্য আসন বিছাল। কিন্তু মাটির ঘরের দেয়াল আর ছাদটাই যেন কৌতূহলের বস্তু হয়ে ওঠল মদন ঘোষালের। ঘুরে ঘুরে দেয়াল দেখতে লাগল আর ছাদ দেখতে লাগল। তার কান-চোখ দুই বাইরের দিকে উন্মুখ।

...ত্রিপলের ঢাকনা সরে গেল। রক্তগোলাপ লাল পাল্‌কি। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে ঠিকই চোখ রেখেছে মদন ঘোষাল। চণ্ডীবউ নামল। ঘোমটা বড় করে টানা। পদক্ষেপ ধীর কিন্তু সঙ্কোচশূন্য। নয়নচাঁদ উঠে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন জানালো তাকে। মদন ঘোষাল চোখ রেখেছে, কান পেতেছে। নয়নচাঁদ সবিনয়ে বলছে, মায়ের পায়ের ছোঁয়ায় দীনের কুটিরের আঁধার ঘুচল, বোসো মা জননী, বোসো।

চণ্ডীবউ বসল। মাথার ঘোমটা সামান্য ছোট হল।

এদিক থেকে দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় বুঝি কান হয়ে উঠেছে মদনমোহনের।

...দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ শ্বশুরের রোগ নিবেদন করল, আরোগ্যের ওষুধ আর আশ্বাস চাইল। তারপর শুধু মদনমোহনকে নয়, নয়নচাঁদকে সুদ্ধ বিস্মিত করে উঠে দাঁড়াল। তেমনি ধীর মন্থর পদক্ষেপে পালকিতে ফিরে গেল আবার।

যাবার সময় ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে মুখের সামান্য একটু অংশ মাত্র দেখেছে মদনমোহন। না, তাও দেখে নি। রমণীর অনমিত মহিমার একটু আভাস শুধু পেয়েছে বুঝি।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মদনমোহন। সে তার উদ্দেশ্য ভুলেছে, সঙ্কল্প ভুলেছে। এদিক-ওদিকে আর যারা ছিল আবার তারা সাধুর কাছে ফিরে গেছে। নয়নচাঁদ কথা বলছে না। তার মুখে প্রসন্ন হাসি।

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মদনমোহন।

পরাজিত শান্ত মদনমোহন।

গোটা করণে একটিমাত্র লোককে ঈর্ষা করে দক্ষিণপাড়ার বারোইয়ারীর কর্ণধার ঘোষালবাড়ির মদনমোহন।

সেই লোক দত্তবাড়ির রাধানাথ দত্ত।

চণ্ডীবউয়ের স্বামী রাধানাথ।

কিন্তু এই ঈর্ষা গোপন। মদনমোহনের অতি প্রিয়জনের কাছেও গোপন।

করণের মানুষ অনেক খবর রাখে। তারা আর যাই করুক গোপনতা বরদাস্ত করে না। গোপনতার পরদা যেখানে যত পুরু, প্রকাশের অকরুণ দৃষ্টি সেখানে ততো তীক্ষ্ণ, সজাগ। দত্তবাড়ির সঙ্গে ঘোষালবাড়ির সম্পর্ক জানেন না করণে হেন মানুষ নেই। দত্তদের অনেক টাকা, অঢেল বিত্ত। সেই টাকা, সেই বিত্ত দিয়ে তারা মর্যাদা কিনেছে। কিনেছে। আর ঘোষালদের বিগত ঐশ্বর্য আর বিত্তের কথা এখন গল্প-কথা। তবু, এই একটানা ভাঁটার দশায়ও তাদের মর্যাদা ক্ষয়-ধরা বনেদী সৌধের মতই দাঁড়িয়ে আছে।

নতুন টাকায় দত্তবাড়ি অনেক মর্যাদা কিনেছে আর কিনছে, কিন্তু এখনো সৌধের মর্যাদা পায় নি।

আর মদন ঘোষালের সঙ্গে রাধানাথ দত্তর তুলনা?

তুলনা কেউ করতে গেলেও সূর্যের সঙ্গে স্তিমিত চন্দ্রের তুলনা কে করে? একের সমুখে অপরের অস্তিত্ব আছে নাকি? নেই বলেই চন্দ্র-বদন রাধানাথ দত্তর অস্তিত্ব ঘোষণার চেষ্টাটা করণের মানুষের কাছে এমন রসের বস্তু। দেশের সর্বশক্তির আধার যুব-শক্তি। এই শক্তির উদ্দীপনা আর প্রেরণা জোয়ারের স্রোতের মত এসে মিশেছে যে গাঙের সঙ্গে সেটা মদন ঘোষালের হৃদয়গঙ্গা। বিত্ত খুইয়ে মদনমোহন করণের চিত্ত লাভ করেছে। আর বিত্ত লাভ করে রাধানাথ দত্ত বিচ্ছিন্নতার গণ্ডিতে আটকে যাচ্ছে।

তবু চাঁদ যদি জ্যোৎস্না বিলোয়, তারও ভক্ত জোটে। রাধানাথের ভক্ত নেই এ-কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। রাধানাথ রৌপ্য-জ্যোৎস্না বিলোয়। এই জ্যোৎস্নার ছটা কম নয়!

কিন্তু সূর্য উঠলে?

এই তফাতটা রাধানাথ বোঝে না বা বুঝতে রাজী নয় বলেই সকলে অহর্নিশি এত মজার খোরাক পায়। শৌর্য বীর্য বিক্রমের তুলনা দিতে হলে তারা সিংহের সঙ্গে মুষিকের তুলনা দেয়। উপস্থিত-বুদ্ধির তুলনা প্রসঙ্গে মানুষের সঙ্গে কোনো গো-সম্পন্ন চতুষ্পদ প্রাণীর চটুল উপমা এসে পড়ে। এহেন মদন ঘোষালের সাম্প্রতিক মতি-গতি হেঁয়ালি-ঘেঁষা হলেও বড় রকমের সংশয়ের কারণ কিছু ঘটে নি।

তাই মদন ঘোষালের সংগোপন অন্তঃপুরের ঈর্ষার চিত্রটি দেখতে পেলে তারা হকচকিয়ে যেত বোধ করি।

করণের লোকেরা সেই চিরাচরিত রেষারেষির রকমফের দেখেছে শুধু। এই রেষারেষি

মদন ঘোষালের সঙ্গে রাধানাথ দত্তর নয়। এর হৃদয়গ্রাহী প্রচ্ছন্ন ধারা বহুদিন ধরে পরিপুষ্ট।

কোনো এককালে রাজ-অনুগ্রহে অস্তিত্ব রক্ষা হয়েছিল এই দুটি পরিবারের পূর্বপুরুষদের। সেই অনুগ্রহের রূপ আর রূপান্তর নিয়েই যত বিতণ্ডা। কালের ধর্ম ক্ষয় করা, কিন্তু এই এক ব্যাপারে তার বিপরীত ধারা।

নদীয়ার কোনো এক বিশিষ্ট রাজার কি কারণে একবার নাকি নবাবের উদ্ধত কোপে নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল। প্রাণের দায়ে দিনের পর দিন তাঁকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। ঘোষাল-বংশের তৎকালীন পূর্বপুরুষের অতি দীন অবস্থা তখন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বিপন্ন রাজাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেবায় আতিথ্যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিলেন। রাজার দুর্যোগ কাটতে তিনি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন সেই পূর্বপুরুষকে। সেই থেকে ঘোষালবংশে কমলার পদার্পণ।

দত্ত-বংশের প্রতি রাজানুগ্রহের চিত্রটা বিপরীত। সেটা মোটামুটি আত্মবিক্রয়ের চিত্র। পেটের দায়ে, সামান্য ক'টা টাকার বিনিময়ে সস্ত্রীক রাজার কাছে আত্মবিক্রয় করেছিলেন এই বংশের কোন্ পূর্বপুরুষ। চির ক্রীতদাসত্ব বরণ করেছিলেন। সেই শিকলের দাগ এতকালেও নিশ্চিহ্ন হয় নি। কবে কোন্ এক যুগে করণের মানুষেরা এই নিয়ে ছড়া কেটেছিল,

রাজার মাথায় বজ্র পড়ে
দীন ঘোষালের বিভূতি ঝরে।
আর, মান বেচে ধান ভানে
দত্ত বণিক বাণিজ্য জানে।।

দত্ত-বংশের পরবর্তী পুরুষেরা সেই শিকলের কালি ধুয়ে মুছে ফেলার জন্য অনেক টাকা ঢেলেছেন। কিন্তু তাতে তার পরমায়ু বেড়েছে বই কমে নি।

ঘোষালদের ঐশ্বর্যে টান ধরেছে ঘোষাল-কর্তার পিতৃদেবের কাল থেকে। আর সেই সময় থেকেই দত্তদের অন্তঃপুরে বাণিজ্যপথে চপলা লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টির সূচনা দেখে গেছে। দাতার ভাণ্ডার ফুরোয় না নাকি। কিন্তু ঘোষাল-কর্তার পিতৃদেবকে দানের বিনিময়ে মর্যাদা সঞ্চয়ের নেশায় পেয়ে বসেছিল। মর্যাদা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন ভুল নেই। সেই দুই স্থির টানা চোখের দিকে তাকালে অনুগ্রহভাজনেরও বুকের ভিতরটা গুরগুর করে উঠত নাকি। আর মহেশ্বর দত্তর পিতৃদেবও তখন সেই দাতার উদ্দেশে দানের টোপ ফেলতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন শোনা যায়।

মদনমোহনের পিতৃদেব ঘোষাল-কর্তাও পিতৃসত্তার অনেকটাই পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর বাইরের স্বভাবটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রাক্তন পুরুষের রেষারেষি তিনি কখনো উচ্চগ্রামে ঘোষণা করেন নি। এমন কি মহেশ্বর দত্তর সঙ্গে নির্লিপ্ত প্রীতির ভাব নিয়েই মিশতেন তিনি। অনুগ্রহভাজনের আয়পয় বাড়লে শুভার্থী মুরুব্বী যেমন প্রীত হয়, অনেকটা সেই গোছের। সরগরম প্ররোচনার মুখেও তাঁর ছিল অদ্ভুত অবজ্ঞা করে যাওয়ার শক্তি। সেই অবজ্ঞা স্থিতধী পুরুষের অবজ্ঞা।

তাঁর সাত্ত্বিকসুলভ ধর্মাচরণ দুর্বলের সম্বল বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন মহেশ্বর দত্ত। প্রসঙ্গত একটা ঘটনার কথা আজও লোকের মুখে মুখে ফেরে। বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে উলুবনে বটমূল-স্থিতা মহাচণ্ডীর থানে ঘোষালদের বলির খ্যাতি

একদা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বাড়ির দুর্গাপূজাতেও অনেক বলি পড়ত, কিন্তু মহাচণ্ডীর থানে বলির তুলনায় সেটা নগণ্য। সেই বলির সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছিল। ঘোষাল-কর্তার সময় বলির সংখ্যা একটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল।

অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মহেশ্বর দত্ত সেবারের বৈশাখী পূর্ণিমায় একটু আড়ম্বর সহকারেই মহাচণ্ডীর প্রীতিসাধন করবেন এ-রকম একটা কানাঘুষা অনেক দিন আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। ঘোষাল-কর্তার শুভার্থীরা তাঁকে জানিয়েছেন, দত্ত-পো এবারে খুব ঘটা করবেন মনে হয়।

ঘোষাল-কর্তা হেসে বলেছেন, ভালো কথা তো।

কিন্তু যে কাণ্ড করণে কেউ কখনো কল্পনা করে নি, তাই হল। মহেশর দত্তর লোকেরা ছোটাছুটি শুরু করে দিল এ-গাঁয়ে সে গাঁয়ে বলি সংগ্রহের চেষ্টায়। কিন্তু মনের মত ছাগ-নন্দনের হঠাৎ এমন প্রকট অভাব কেন সেটা সহসা কেউ বুঝে উঠল না। শত শত বলি হয় বলে অনেকেই অবশ্য আগে থাকতেই পছন্দমত বলি সংগ্রহ করে রাখে। কিন্তু কড়ি ফেললেও মেলে না এমন কখনো হয় নি। যার কাছে ভালো ছাগল আছে তার কাছেই ছুটেছে মহেশ্বর দত্তর লোক। গিয়ে শুনেছে বিক্রি করার উপায় নেই। দাদন নেওয়া হয়ে গেছে।

এত ছাগল কে কিনেছে? কে দাদন দিয়েছে?

তাও অজ্ঞাত থাকল না। কিনেছেন ঘোষাল-কর্তা। তাঁরই লোক অনেক আগে থাকতে দাদন দিয়ে গেছে।

এমন বিভ্রাট কেউ ভাবতেই পারে না। করণের মানুষ হকচকিয়ে গেছে প্রথম। মহাচণ্ডীর থানে বৈশাখী পূর্ণিমায় বলির রক্তগঙ্গা বয় প্রতিবারই। এবারে কি সমুদ্র বইয়ে দেবেন ঘোষাল কর্তা?

এই রোমাঞ্চের মুখেই আবার ধাক্কা। সকলে শুনল, ঘোষালবাড়ির তরফ থেকে যেমন একটিমাত্র বলি হয় প্রতি বছর তেমনি হবে। একটির বেশি বলি হবে না।

তাহলে?

তাহলে যে কি সেটা বুঝতে কারো বাকি থাকল না। রোমাঞ্চ আরো চতুর্গুণ হল কারণ এই রেষারেষির সঙ্গে ধর্মের যোগ। ধর্মাচরণের ব্যাপারে ঘোষাল-কর্তা এ কান্ড করতে পারেন শুনলেও বিশ্বাস হয় না। স্তব্ধ মহেশ্বর দত্ত রাগে কেঁপেছেন দিনকয়েক। এই ঘটনার ফলেই সংগৃহীত কোনো বলিই আর যেন তাঁর পছন্দ হয় না। যেগুলো ঘোষাল-কর্তা দখল করে আছেন সেগুলিই চাই তাঁর।

ঘোষালের আচরণের একটা তাৎপর্য আবিষ্কার করলেন মহেশ্বর দত্ত। করে কিছুটা তুষ্টিলাভ করলেন। ফলাও করে সেটা রটনাও করলেন। তারপর একদিন এলেন ঘোষাল-কর্তার সঙ্গে দেখা করতে। ঘোষাল-কর্তা সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে। চাকরকে হুকুম করলেন নতুন হুঁকোয় অম্বুরী তামাক সাজতে।

মহেশ্বর দত্তও খুশির ভাব দেখালেন কিন্তু আতিথ্যে ভুললেন না। বললেন, লক্ষ্মী বাণিজ্যের খুঁটিতে বাঁধা এ তাহলে তুমিও বুঝেছ ঘোষাল। বড় খুশি হলাম। কিন্তু ভায়া ছাগল দিয়ে শুরু করলে...

হাসিমুখে ঘোষাল জবাব দিলেন, শুরুটা বিনীত হওয়া ভালো।

ভিতরে ভিতরে চিড়বিড় করে উঠলেন মহেশ্বর দত্ত, তবু দরাজ হেসে বললেন, তা বটে তা বটে। ও জীবটা ঠকায় না বড়, সময় বুঝেই পাঁচ গাঁয়ের ছাগল দখল করে বসেছ। এখন কি দরে বেচবে বলো, আমার দরকার কিছু।

ঘোষাল-কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন, খুব দরকার?

হ্যাঁ, ও বেটির জিব তো অল্পে ভেজে না, অনেক দরকার। মা এবার তোমার আমার দুজনার উপরেই সদয়—কি বলো?

মৃদু হেসে ঘোষাল-কর্তা মাথা নাড়লেন।—তাই তো দেখছি। তা যে ক'টা দরকার তোমার নিয়ে যাও।

মহেশ্বর দত্ত প্রীত হয়ে জবাব দিলেন, নিকটজন আত্মতুল্য, আবার কার প্রত্যাশায় বসে থাকবো—দু'চারশ যা সংগ্রহ করেছ সবই পাঠিয়ে দিতে বোলো।

ঘোষাল-কর্তা মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ তাই হবে।

কি দিতে হবে বলো, গিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তেমনি হেসে ঘোষাল-কর্তা বললেন, বাণিজ্য করতে নেমেছি যখন বড় ঘরেই করব—দাম যা নেবার সে ওই বড় জিবওয়ালীর কাছ থেকেই নেব, তুমি সঙ্কটে পড়েছ সঙ্কটমোচন করোগে যাও।

মহেশ্বর দত্তর মুখের হাসি গেল। অম্বুরী তামাক বিস্বাদ ঠেকল মুখে।—তুমি দাম নেবে না?

তোমার মত নিকট আত্মজনের উপকাবের সুযোগ পেলাম, এই তো দাম। এ কি সহজে মেলে!

মহেশ্বর দত্ত ব্যঙ্গ করে উঠলেন, তোমার দানে বলি হবে বলছ?

না হলেও তোমার অকল্যাণ হবে না। আর হলে অমঙ্গলটুকু আমারই হোক। তুমি ব্যবসা ভালো বোঝো—লোকসানের ভয় থাকল না। মা-কে লোভ দেখিয়ে জেতার চেষ্টা করছ শুনে পর্যন্ত আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

আর বাক্যব্যয় না করে মহেশ্বর দত্ত উঠে গেলেন। বেশি বলি নয়, মায়ের থানে বলি সেদিন একটিই দিতে সাধ হয়েছিল তাঁর। কিন্তু সেটা ছাগবলি নয়, নরবলি।

বলা বাহুল্য, টাকার জোরে বলি সেবারেও খুব কম সংগ্রহ করেন নি মহেশ্বর দত্ত। কিন্তু যাই করুন তাঁব মনঃপূত হয় নি। কেবলই মনে হয়েছে ঘোষাল তাঁকে জব্দ করেছে। আরো মনে হয়েছে কারণ, ছাগ ক্রয়ের অভিলাষ নিয়ে তাঁর ঘোষালবাড়িতে পদার্পণ কারো অগোচর ছিল না। জব্দ তিনিই করতে গিয়েছিলেন। বড়ঘরের চারদিকে অনেক জোড়া কান আড়ি পেতে ছিল সেদিন। আর তাঁদের মধ্যে কথাবার্তাও কিছু চুপিসাড়ে হয় নি। তিনি বাড়ি পৌঁছুবার আগেই মদনমোহনের কর্মকুশলতায় এ সাক্ষাৎকারের প্রহসন পাঁচ কান হয়ে পাঁচশ কানে পৌঁছে গেছে।

দেখতে দেখতে সেই কানাকানি একটা সরগরম কৌতুকের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর বাপের নির্বুদ্ধিতায় রাধানাথ শুধু জ্বলেছে আর জ্বলেছে।

কিন্তু পরের বছর মহেশ্বর দত্ত আর এ ভুল করেন নি। অনেক আগে থেকে তিনি ছাগ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন। দ্বিগুণ উৎসাহ আর আড়ম্বরে মায়ের থানে বলিদান সম্পন্ন করেছেন। পরিপোষকবৃন্দ গলা ছেড়ে বাহবা দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু

ভিতরটা কেমন খচ-খচ করেছে মহেশ্বর দত্তর।

কারণ ঠিক সেই বছর থেকেই ঘোষাল কর্তা তাঁদের একটিমাত্র বলিও বন্ধ করে দিয়েছেন।

বহু বলির আড়ম্বরের এটা যেন একটা পাল্টা জবাব। থেকে থেকে এই অনাড়ম্বর জবাবটাই কেমন জোরালো মনে হয়েছে মহেশ্বর দত্তর।

রাধানাথের প্রথম বিয়ে হয়েছিল অপরিণত বয়সে। অনেক ছাঁটাই বাছাই করে বেশ সুন্দরী একটি বালিকা-বধূ ঘরে এনেছিলেন মহেশ্বর দত্ত। তখনো রাধানাথকে ঠিক হিংসে করে নি মদনমোহন। কারণ তখন থেকেই রমণীর ঐ ধরনের অবলা-রূপ পছন্দ নয় তার। কিন্তু বাপের ওপর ক্রমে বিলক্ষণ বিরক্ত হয়ে উঠছিল মদনমোহন। ও-রকম বউ পেয়ে নয়, বিয়েটা করেই রাধানাথ যেন কিছুটা টেক্কা দিয়েছে তার ওপর। বাপের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলে তার জন্যেও একটা তাক-লাগানো বউ সংগ্রহের কাজে উঠে-পড়ে লাগার কথা। কিন্তু বাপের সে-চিন্তা একবারও মাথায় এসেছে বলে মনে হয় নি মদনমোহনের। মা আগেই গত হয়েছেন, তাই বাবাকে সমুচিত তাড়া দেবারও লোকের অভাব।

ক্রমে সেই অভাবটা সে নিজেই পূরণ করার চেষ্টায় ছিল। অন্তরঙ্গ বন্ধুর বিধবা বোনের দিকে নজর দিলে অভিনব কিছু হয় কিনা সেই চিন্তা করেছিল। কিন্তু কিছু সাব্যস্ত করার আগেই সেই বোকা বোন কাশীবাসী হয়ে বসেছে। ষোল বছর বয়সে মা-শুদ্ধ বিশ-বাইশ বছরের ফোঁটা-তিলক কাটা কীর্তনী মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে সকলকে অবাক করে দিতে চেয়েছিল। সেই অভিনবত্বও শেষ পর্যন্ত মাটি হয়েছে মেয়ের মায়ের বিশ্বাসঘাতকতায়। তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে কথা দিয়েও বোষ্টুমী চোখে ধুলো দিয়ে তার বাপের কাছে এসে সব ফাঁস করে বসেছে আর তাকে খড়ম-পিটুনি খাইয়েছে। আর তারপর আঠেরোয় সকলকে সত্যিকারের রোমাঞ্চিত কন্টকিত করে তুলতে চেয়েছিল অঘোরনিবাসিনী ছাব্বিশ বছরের ক্ষমাযোগিনীকে বিয়ে করতে চেয়ে। বিয়ে করার দরকারও হয় নি, শুনেই সকলে অভিভূত হয়েছিল বটে। ভয়ে বিস্ময়ে শিউরে উঠেছিল। অবশ্য অবুঝ বাবার খড়মের অত্যাচারে এই অভিলাষের ফলও আদৌ সুখের হয় নি। শুধু সেই একদিন ক্ষমাযোগিনীর ফলসহযোগে আপ্যায়নটুকু ছাড়া। কিন্তু বিয়ে করতে চেয়ে তখনো একদিনের জন্যেও রাধানাথকে ঈর্ষার পাত্র মনে হয় নি তার।

সে শুধু তখন বাপের নির্লিপ্ততার দরুন নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেবার দিকে মনোযোগী হয়েছিল। আর তাজ্জব হবার মতই কিছু একটা করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল। অন্তত উল্টে রাধানাথের বুকে ঈর্ষার আগুন যে জ্বালাতে চেয়েছিল তাতে কোনো ভুল নেই।

অবশ্য বয়সের আঁচ তখন থেকেই মনটাকে ঝলসাতে শুরু করেছিল বেশ। মেজাজপত্র তাই খুব ভালও থাকত না সব সময়ে। ওদিকে ক্ষমাযোগিনীর দিকে চোখ দেবার পর থেকেই বাবা একটু সচেতন হয়েছিলেন তাও ঠিক। মদনমোহন ঘটকের সঙ্গে একটু-আধটু কথাবার্তা কইতে দেখেছে তাঁকে। কিন্তু খুশি হওয়ার থেকেও সে তখন বিপদ গনেছিল বেশি। বাবার বর্ণ-বৈচিত্র্যের দিকে ঝোঁক কম।

সাদামাটা কোথাও একটা ঠিক করে বসলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে তার। বিবাগী হওয়া ছাড়া তখন আর গতি থাকবে না কিছু।

কিন্তু তার আর দরকার হয় নি। ছেলের মাথায় আকাশ না ভেঙে অথবা তাকে বিবাগী না করে নিজেই তিনি অসময়ে আকাশ-যাত্রা করে বসেছেন।

করণে এটা একটা বড় ঘটনা। কিন্তু এরও কিছুদিন আগে চমকে ওঠার মতই আর একটা ঘটনা ঘটেছিল।

ঘটেছিল মহেশ্বর দত্তর বাড়িতে।

রাত পোহাতে হঠাৎ একদিন দত্তবাড়িতে লোকজনের ছোটাছুটি দেখা গেল। বাড়ির লোকের ছোটাছুটি দেখে বাইরের লোকে ঢুকল। অন্দরমহলে কান্নার রোল। বাড়িতে ঘটা করে কাঁদার মত স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি ছিল না। অথচ একসঙ্গে অনেক গলা মিলিয়ে কাঁদছে।

এ কান্না সকলেই চেনে। কিন্তু কি হয়েছে?

মালতীবউ মারা গেল।

মালতীবউ, অর্থাৎ রাধানাথের প্রথম পক্ষের বউ, মাত্র চারবছর আগে বিয়ে হয়েছিল যার। চার বছর আগে রাধানাথ বালক ছিল আর মালতীবউ নাবালিকা। ইতিমধ্যে রাধানাথের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেহের, মনের, স্বভাবের। প্রাচুর্যের দাক্ষিণ্যে দেহ মজবুত হয়ে উঠেছিল। উনিশে পা না দিতে তেইশ-চব্বিশের মত দেখাতো। বালক বয়েস থেকে দুধ-ঘিয়ের নবনীত দেহ মজবুত করে তোলার তাড়না অনুভব করেছিল জন্ম-বৈরী মদনমোহনের উপর আক্রোশের ফলে। সেই ছেলেবেলায় মদনমোহন তার নধর তনুর উপরে কম হামলা করে নি। ফাঁক পেলেই গা খামছে কোথায় কত মাংস কত মেদ হিসেব করত। রাধানাথের সেটা সব থেকে বেশি অসহ্য মনে হত। ফলে দুজনের লপটা-লপটি, মাটিতে গড়াগড়ি। একটু বাদেই একটা অবধারিত দৃশ্য দেখত সকলে। ছিপছিপে মদনমোহন তাকে চিৎ করে ফেলে বুকের ওপরে চেপে বসেছে।

এই আক্রোশ থেকেই তার ব্যায়ামচর্চা শুরু। ব্যায়ামের গুরু ডাকসাইটে পালোয়ান ষষ্ঠীচরণ। রীতিমত টাকা খরচ করে শক্তি-চর্চায় মেতেছিল সে। ষষ্ঠীচরণ তার শরীরটাকে যেন ভেঙে ভেঙে ঢেলে সাজছিল। দেহের বাঁধুনি এমন কি আকারও বদলে দিয়েছিল। কিন্তু বিত্তের সঙ্গে যে চিত্তের যোগ তাকে সংযত করা বড় সহজ কথা নয়। বিত্তের ঘরে যৌবনের জোয়ার দ্রুত আসে। রাধানাথও এই সময় থেকেই যৌবনের অনেক সরস জটিলতা দ্রুত বুঝতে শুরু করেছিল। ফলে দেহের ওপর মনের প্রভাবও অনায়াসেই প্রগল্ভ হয়ে উঠতে পেরেছিল। দেহ আর মন যুক্ত হলে স্বভাবের বদল হতেই বা বাধা কোথায়? অতএব আঠারো উত্তীর্ণ রাধানাথ তখন পরিপূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু মালতীবউয়ের তখনো ভালো করে বালিকা-দশা ঘোচে নি। বড় জোর কিশোরী বলা চলে। রূপসী না হোক, একটু পুষ্ট গড়ন হলে বেশ সুন্দরীই বলা যেত। বয়েসকালে সকলে রূপবতী বলবে এই আশা করেই তাকে ঘরে আনা হয়েছিল। ঘটা করে বিয়ে হয়েছিল। গাঁ-সুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হয়েছিল। দশ বছরের সেই কচি বউয়ের মুখ দেখে সকলে সুখ্যাতি করেছিল। কিন্তু আড়ালে কোনো

কোনো প্রবীণ অন্যরকম মন্তব্য করেছিল বলেছে বউ সুশ্রীই বটে, তবে বড় করুণ মুখ, দেখলে মনে হয় যেন বেশি দিন বাঁচতে আসে নি।

বিয়ের পর বছর দুই পর্যন্ত নাবালিকা বউ কেঁদেই কাটিয়েছে। তার বাপের বাড়ির অবস্থার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির অবস্থার অনেক ফারাক। এমন ঘরে মেয়ে দিতে পেরে বাপের বাড়ির মানুষেরা অনুগৃহীত। অতএব বাপের বাড়িতে যখন নালিশ গেল তাদের মেয়ে বড় কাঁদে, মেয়ের বরাতে তখন সেখান থেকেও অনুকম্পা জোটে নি। ধীরে ধীরে বউয়ের কান্না থেমেছে বটে, কিন্তু সেই অবোধ কান্না যেন দুই ডাগর চোখের গভীরে আর কচি মুখের আনাচে কানাচে জমাট বেঁধে ছিল।

শাশুড়ী মাঝে মাঝে কোমর বেঁধে বউয়ের শ্রী ফেরানোর দিকে মন দিতেন। তার খাওয়া-দাওয়া-সাজসজ্জার দিকে চোখ ফেরাতেন। সেটা নীরবে করতেন না। সেই সরব বদান্যতার খবর পড়শিনীদের কানে যেত। আর কানে গেলে তারাও ঘরে বসে থাকত না। দত্তবাড়িতে এসে ঘন্টাখানেক ধরে পান চিবিয়ে বউয়ের সামনেই শাশুড়ীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হত। বউ তো একদিন তারাও ছিল। শাশুড়ী বউয়ের সেবা-যত্ন করেছে এমন তো বড় শোনে নি! ভাগ্য, ভাগ্য—এ-ভাগ্য যেদিন বুঝবে, অবুঝ বউ সেদিন শাশুড়ীর পা দুখানা সর্বদা মাথায় করে রাখবে।

কিন্তু অবুঝ বউয়ের বোঝবার অবকাশ আর হল না। প্রবীণদের মন্তব্যের মর্যাদা রেখে সে অসময়ে চোখ বুজল। অথচ সময়কালে তাদের সেই মন্তব্য কারো মনে থাকল না। উল্টে অনেকেরই মনের তলায় একটা বক্র জিজ্ঞাসার আঁচড় পড়ল।

কি হয়েছিল মালতীবউয়ের? তেমন অসুখ-বিসুখের খবর তো কেউ পায় নি! আগের দিনও রাধানাথকে নিরুদ্বেগে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। শাশুড়ীর প্রিয় পড়শিনীরা ক'দিন আগেও তাদের নিয়মিত জটলা সম্পন্ন করে গেছে। বউ তাদের সামনেই ছিল। সেই শুকনো মুখই দেখেছে। শাশুড়ীর বিরাগের ফলে একটু বেশি শুকনোই দেখাচ্ছিল বটে। শাশুড়ী পড়শিনীদের প্রিয়বচনে প্রীত হলেও বউয়ের স্বাস্থ্য বা সৌষ্ঠবের হাল ক্ষমার চোখে দেখতেন না। এত করেও গায়ে-গতরে কিছু লাগছে না এটা দিনকে-দিন তাঁর ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠেছিল; কোন্ রোগ পুষে বসে আছে কে জানে, নইলে এ-রকম হবে কেন? এরপর বংশে যারা আসবে তারাও মায়ের রোগ নিয়ে আসবে কিনা ঠিক কি! জন্ম-রোগী হবে কিনা ঠিক কি!

শাশুড়ী ছিলেন নাকি নামকরা কবিরাজের কন্যা। এ-ধরনের দূরের দুশ্চিন্তাও তাঁর মাথায়ই আসা স্বাভাবিক। আর তাঁর এই বিরূপ আশঙ্কা কখনো গোপন থাকে নি। প্রিয়জনেরা হামেশাই শুনেছে।

তবু একেবারে চোখ বুজতে হলে বুঝতে পারার মতো আরো একটু বেশি কিছু তো হওয়া দরকার! কি হয়েছিল মালতীবউয়ের যে বলা নেই কওয়া নেই ঠাস করে মরেই গেল একেবারে?

বদ্যির উক্তি, অজীর্ণ রোগ থেকে কঠিন চাপা শূলব্যাধি। আরো কারণ, চাপা বউ বলত না কিছু। ফলে বুকের কঠিন ব্যামো, আয়ুর্বেদগত গুটিকতক জটিল বিধি অনুযায়ী হৃদযন্ত্রের আকস্মিক ক্রিয়া বন্ধ। অতএব এ অঘটন শাস্ত্র-বহির্ভূত কিছু নয়।

তবু শোকের বাড়িতে এসে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল অনেকে। আর বেরিয়ে এসে মুখ শেলাই করে বসে থাকল না। মহেশ্বর দত্তর থমথমে মুখ শোকের মুখ বলে মনে হয় নি কারো। ছেলে রাধানাথের হাবভাব আচরণে শোকের থেকে হতবুদ্ধির ভাবটাই যেন বেশি। বাড়িতে একাধিক স্ত্রী-কণ্ঠের কান্না শোনা গেছে। সেই কান্নায় দত্তবাড়ির অনুগত পড়শিনীদের কেউ কেউ গলা মিশিয়েছে বটে, কিন্তু শোক জোরদার হয়েছে রাধানাথের দুই বোনের উপস্থিতিতে। বউয়ের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে ভোরের দিকে—মধ্যরাত্রিতে মৃত্যুযন্ত্রণার ছটফটানি শুরু হয়েছিল নাকি। কিন্তু সাতসকালে শ্বশুরবাড়ি থেকে ওই মেয়েরা এসে হাজির হল কেমন করে? তাদের শ্বশুরবাড়ি তো এখানে নয়! গরুরগাড়িতে কম করে চার সাড়ে চার ঘন্টার পথ—তাও তাগড়াই বলদে টানলে।

স্ত্রীলোকদের মন্তব্যও খুব চাপা থাকেনি। ঘরে ফিরে পুরুষেরাই তা টেনে বার করেছে। বউয়ের জন্য শাশুড়ী আর ননদদের অত শোক একটু বেশি বেশি মনে হয়েছে কারো কারো। মৃতা বউয়ের পা থেকে নাকের তলা পর্যন্ত পুরু চাদরে ঢাকা ছিল। তাতেও কেমন-কেমন দেখা গেছে নাকি, চিরশান্তির কোলে ঘুমিয়েছে মনে হয় নি। অবশ্য বিলাপ করে করে শাশুড়ী জানিয়েছেন, কি অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট করতে করতেই না শেষ ঘুম ঘুমিয়েছে বাছা—এখনো সেই কষ্টের দাগ লেগে আছে।

দত্তবাড়ির বউয়ের দাহকার্য নির্বিঘ্নেই সমাধা হয়েছে বটে, কিন্তু রটনার মুখাগ্নি অত সহজে হয় নি। লোকে বলেছে টাকা থাকলে বদ্যি কেনা যায়, আর মরদেহও ভস্ম করে পঞ্চভূতে লীন করা যায়। মরেছে তো মরেছে—ভাগ্যবানেরই বউ মরে, কেমন করে মরেছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ কি?

তবু এই এক মৃত্যু নিয়ে সেদিন মাথা কেউ বড় কম ঘামায় নি।

করণের মানুষদের মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টাও একটু-আধটু করেছিলেন বইকি মহেশ্বর দত্ত। সেইরকম ঘটা করেই বউয়ের পারলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করিয়েছেন তিনি। ঘটা বলে ঘটা! এই মর্ত্যানুষ্ঠানের প্রতি আত্মার লোক যদি কিছু থেকেই থাকে তো লোকান্তরিতার আর কোনো খেদ থাকার কথা নয়। অনেকে একবাক্যে বললে, খরচ করতে জানে বটে দত্ত-পো। অল্পবয়সী বউ মরলে এত কেউ করে না।

অনেকে বললে, সকলে বললে না। করণের মানুষদের এই বক্র ধাত ভালই জানেন মহেশ্বর দত্ত। তবু এর জন্যে মনে মনে একজনকেই দায়ী করলেন তিনি। ...ঘোষাল-কর্তা। তিনি অনুপস্থিত। তাঁর ছেলেও। পারলৌকিক অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকাটা প্রায় সামাজিক অপরাধের সামিল। না এলে কথা ওঠে। দুর্নাম হয়। ঘোষাল বা ঘোষালের ছেলে না আসার ফলেও কথা উঠল বটে। কিন্তু দুর্নামের বদলে কৌতূহল বড় হয়ে উঠল।

আর, মহেশ্বর দত্তর মনে হল, এত জাঁকজমক সত্ত্বেও শুধু একজনের অনুপস্থিতিতে একটা অকালমৃত্যুর ছায়া সেভাবে ঘোচানো গেল না।

অবশ্য মহেশ্বর দত্ত শুনেছেন এবং নিজেও জানেন ঘোষাল-কর্তা অসুস্থ। নিজেই তিনি আমন্ত্রণ জানাতে গেছলেন। ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য ব্যক্তি হিসেবে ব্রাহ্মণদের ভার গ্রহণের বিনীত অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখনই দেখে এসেছিলেন অসুস্থ। পরে শুনেছিলেন

অসুখ আরো বেড়েছে। কিন্তু মহেশ্বর দত্তর দিক থেকে সেটা অবিশ্বাস করার কারণ ছিল।

কারণ, দায় উদ্ধারের বিনয়ামন্ত্রণ নিয়ে তিনি যখন এসেছিলেন, ক্রিয়াকর্মের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন নি ঘোষাল-কর্তা। মহেশ্বর দত্ত অবশ্য নিজেই বলেছিলেন। তিনি চুপচাপ শুনেছেন। তারপর জিজ্ঞাসা করেছেন, বউটা হঠাৎ মরল কি করে?...কি হয়েছিল?

এতদিন পরে, অর্থাৎ কায়েতের তিরিশ দিনের অশৌচের মধ্যে বিশ-বাইশ দিন বাদে এই প্রশ্ন একটুও সরল মনে হয় নি মহেশ্বর দত্তর। জবাব দিয়েছেন, কবরেজকে সঙ্গে আনলে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারত, অনেক কিছু হয়েছিল—সব মনে থাকে না। ক'বছর ধরেই ভুগছিল...

অতএব ঘোষাল-কর্তার না আসাটা স্বাভাবিকভাবেই সাদা মনে গ্রহণ করতে পারেন নি মহেশ্বর দত্ত। অসুখ একটা অজুহাত ছাড়া কিছু নয়। নিজে আসে নি, একটা খবর পাঠায় নি, ছেলেও পাঠায় নি। যেটুকু বোঝবার এই থেকেই বোঝা গেছে।

মহেশ্বর দত্তর বুঝতে গোটাগুটি ভুল হয় নি সত্যি কথাই। রীতিমত অসুস্থই ছিলেন ঘোষাল-কর্তা, তবু মন টানলে একবারে গিয়ে দাঁড়াতে পারতেন হয়ত। না পারলেও তাঁর অনুপস্থিতি এতটা নীরব নাও হতে পারত। সত্যিই সামাজিকতা রক্ষার এতটুকু তাগিদ অনুভব করেন নি তিনি। কিন্তু তা বলে ছেলেকেও যেতে বাধা দেন নি। সে গেল কি গেল না এ চিন্তাও তাঁর মাথায় আসে নি।

এ-সব ব্যাপারে মদনমোহনের নিজের মাথাই যথেষ্ট উর্বর। বাবাকে নির্লিপ্ত দেখে নিজেও না যাবার সঙ্কল্পটা সে নিজেই করেছে। বাবার অসুখ, তিনি না গেলে কথা নাও উঠতে পারে। অতএব লোকের কথা আর কৌতূহল জোরদার করে তোলার জন্যেই তারও অনুপস্থিত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

এই প্রয়োজন পালনের ফলে পরের ছ'মাস দুই কর্তার মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

সঙ্গী-সাথী নিয়ে মনের আনন্দে মদনমোহন এরই জের টেনে চলছিল। তার দলবল পুষ্ট হয়ে উঠেছে। দক্ষিণপাড়ার নামজাদা বারোইয়ারীর আসরে এখন আর তারা বাইরে থেকে উঁকিঝুঁকি দেয় না। সেখানে তরুণের প্রভাব বাড়ছে। বাড়ছে তারই জন্য। খরচের মুরোদ যার, প্রাধান্যও তার। বাবার অসুস্থতা আর নির্লিপ্ততার দরুন এই সময় থেকেই নিজের হাতে টাকাপয়সা নাড়াচাড়া করার সুযোগ এসেছিল। ফলে দলও ভারী হচ্ছিল। রাধানাথের সঙ্গে দেখা হলেই তার ইঙ্গিতে সকলের শোকের মুখ। বউ মরেছে রাধানাথের, সে শোক যেন ছ'মাসেও কেউ ভুলতে পারছে না। তাকে দেখলেই ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলে, কাপড়ের খুঁট চোখে চেপে ধরে।

তবু গোড়ায় গোড়ায় এ রসিকতার ধার বুঝতে রাধানাথের বেগ পেতে হয়েছিল একটু। বুঝিয়ে দিয়েছিল হরবোলা ছিরে পাগলা।

সমবয়সী না হলেও এই তরুণ দলের সে অন্তরঙ্গ সখা। সমবয়সী মুনুকে ভট্টচাযকে বাদ দিলে এরাই তার যথার্থ দোসর। রাধানাথের সামনে হঠাৎ একদিন সে হু-হু করে কেঁদেই ফেলল। সেই সঙ্গে সকরুণ বিলাপবচন।—ওরে হতভাগীরে, এ তুই কি করে গেলি রে—গেলি যদি একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে গেলি না কেন রে—সোনার

চাঁদের সব সোনা একেবারে কালি করে দিয়ে গেলি যে রে—এ-মুখের দিকে আর যে আমি তাকাতে পারিনে রে—আমার চাঁদের হাতে আর কে মেয়ে দেবে রে, কে মেয়ে দেবে—

অতঃপর রাধানাথ স্পষ্টই বুঝেছে।

অবশ্য ক'দিন বাদেই এ বিলাপের কিছু খেসারত দিতে হয়েছে শ্রীনাথকে। সঙ্গীদের অত্যাচারের কথা রাধানাথ তার মাকে জানিয়েছে। মা আবার কর্তার কাছে তা নিবেদন করেছেন। অচিরে ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করা কত দরকার, চোখের জল ফেলে তারও গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

এর দিনকয়েকের মধ্যে মহেশ্বর দত্তর লোকজনেরা শ্রীনাথকে ধরে এনেছে তাঁর কাছে। ঠাণ্ডা মুখে তিনি কৈফিয়ৎ তলব করেছেন। শ্রীনাথ তক্ষুনি ছিরে পাগলা হয়ে হাপুস নয়নে কেঁদেছে। সেই কান্না আর হৃৎকম্পের ফলে গলা দিয়ে নানান রকম স্বর বেরিয়েছে। বোঝাতে চেষ্টা করেছে, শোক তার যথার্থই হয়েছিল, এই দামাল ছেলের কারসাজিতে শোকটা সকলের কাছে হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কে দামাল ছেলে? কেন, ঘোষাল-কর্তার ছেলে মদনমোহন! অতঃপর নাকে-কানে খত দিয়েছে ছিরে পাগলা, কারো একটা ছেড়ে পাঁচটা বউ মরলেও কস্মিন্‌কালে আর ওভাবে শোক করবে না। আর, ওই ছেলে-ছোকরাদের দলে জীবনে তো আর ভিড়বেই না।

কিন্তু ছাড়া পেয়েই ছুটেছে মদন ঘোষালের কাছে। তার দুর্দশার কথা সপল্লবে বিস্তার করেছে। সব দোষ কার ঘাড়ে চাপিয়ে নিস্তার পেয়েছে তাও গোপন করে নি। জানে, মদনমোহন রাগ করবে না একটুও, উল্টে দুর্বলকে রক্ষা করতে উৎসাহ বোধ করবে।

তাই হয়েছে। রাধানাথের হেনস্থা আরো বেড়েছে। দক্ষিণপাড়া এক রকম বর্জন করতে হয়েছে তাকে। ছিরে পাগলাও অবশ্য অনেক দিন পর্যন্ত দত্তপাড়ার ধারে কাছে ঘেঁষে নি।

এরই মধ্যে একদিন শোনা গেল ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছেন মহেশ্বর দত্ত। বিয়ের দিনও আসন্ন।

কোথায় বিয়ে দিচ্ছেন, কি বৃত্তান্ত কেউ জানে না। না জানার কারণ অবশ্য সহজেই বোঝা গেল। কে লাগান-ভাঙান দেবে ঠিক কি! আগের বউ কি করে মরল, সেই সন্দেহ কানে তুলে দিয়ে এলেই হল

তবু, এতটা গোপন রাখতে পারতেন কিনা মহেশ্বর দত্ত সন্দেহ। কারণ খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙান দেবার একটা রোখ চেপেছিল মদন ঘোষালের। গোপন করা হয়েছিল বলেই রোখ চেপেছিল।

কিন্তু এ নিয়ে মেতে ওঠার অবকাশ আর পেয়ে উঠল না। অসুস্থ ঘোষাল-কর্তা পরপার যাত্রার উদ্যোগ করে বসলেন। অসাধারণ সহ্যশক্তি বলে কতটা অসুস্থ তিনি সঠিক বোঝা যেত না। বোঝা গেল যখন সময় পুরোপুরি ঘনিয়েছে।

রাধানাথের বিয়ের দিন পনের আগে চোখ বুজলেন তিনি।

মদনমোহন অকূলে পড়ল। বাবা কি বা কতখানি তা কখনো ভাবার অবকাশ হয় নি। মারা যাবার পর হঠাৎ বুকের এক অজানা দিকের সন্ধান পেল সে। যে-দিকটা একেবারে খালি হয়ে গেছে।

শোকের বাড়িতে লোক গিসগিস করছে। এরই মধ্যে মদনমোহন দেখল মহেশ্বর দত্ত এসে দাঁড়িয়েছেন। অসুখের এতটা বাড়াবাড়ি জানতেন না। স্তব্ধ মুখ। মৃতের দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন বহুক্ষণ।

শুধু মদনমোহন নয়, অনেকেই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, মহেশ্বর দত্তর চোখে জল।

অনেকক্ষণ বাদে কাছে এসে তিনি শোক-বিমূঢ় মদনমোহনের মাথায় হাত রাখলেন একখানা। বললেন, করণে আর মানুষ থাকল না।

নিজে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে দাহকার্য এবং আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করালেন।

ওদিকে যথাসময়ে নিজের ছেলের বিয়েও নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বিয়েতে ভাঙান দেবার কথা মদনমোহনের একবার মনেও হয় নি।

বিয়েতে সে যায় নি। গুরুদশা, যাবার প্রশ্নও ওঠে নি। কিন্তু ঘরে বসেই রাধানাথের নতুন বউয়ের রূপের প্রশংসা শুনছে। ডাকাসইটে সুন্দরী নাকি। ভিন গাঁয়ের মেয়ে, এ তল্লাটে এমন সুন্দরী আর একটিও নেই। নাম চণ্ডী। মা-দুর্গার মত রূপ। কিন্তু দুর্গার থেকেও চণ্ডী নামেই নাকি মানায় ভালো।

শুধু রূপের নয়, বউয়ের বুদ্ধির প্রশংসাও কানে এসেছে মদনমোহনের। নতুন বউয়ের বুদ্ধির পরখ করার রীতি আছে করণে। সেই সব মেয়েলী পরীক্ষায় চণ্ডীবউ নাকি তাক লাগিয়ে দিয়েছে সকলকে।

এত শুনে তাকে দেখার একটু লোভ হয়েছিল বইকি মদনমোহনের। কিন্তু তখনো একটুও ঈর্ষা করে নি রাধানাথকে। বরং পিতৃবিয়োগের পর মহেশ্বর দত্ত যা করেছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে সেইটুকুই শুধু মনে করে রেখেছে।

মাস পাঁচ-ছয় বাদে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে উলুবনের মহাচণ্ডীর থানে রূপসী বউকে দেখা যাবে আশা করেছিল মদনমোহন। বিয়ের পর প্রথম বছর বড় ঘরের বউকে দিয়ে মায়ের থানে বৈশাখীর মহা উৎসবে ঘটা পরে পুজো দেওয়ানো হয়ে থাকে। সতীর্থদের কাছে মদনমোহন নির্দোষ ঠাট্টাও করেছিল একটু, এবারে তাহলে স্বয়ং চণ্ডী আসছেন চণ্ডীপুজো করতে!

কিন্তু চণ্ডীবউ আসে নি। করণের সেই মহা উৎসবের দিনে বউ ছিল বাপের বাড়িতে। সেদিন তার বাপের বাড়িতেও কিসের উৎসব ছিল নাকি। শোনা গেছে, নতুন-বউ-অন্ত প্রাণ মহেশ্বর দত্ত সকলের অমতে বউয়ের আব্দার রক্ষা করেছেন, এ-হেন দিনেও তাকে বাপের বাড়িতে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। বলেছেন নাকি, মা-চণ্ডীর যেদিন মর্জি হবে সেদিনই মহাচণ্ডীর পুজো হবে, একটা বছরে কি যায় আসে।

অতএব মদনমোহন চণ্ডীবউকে চাক্ষুষ দেখেছিল আরো এক বছর বাদে। ...পরের বৈশাখী পূর্ণিমায়, ওই মহাচণ্ডীর থানে। ততদিনে রূপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গুণের খ্যাতি ছড়িয়েছে চণ্ডীবউয়ের।

যে বিচিত্র পরিস্থিতিতে এই প্রথম দেখা, সেটা কল্পনারও বাইরে ছিল মদনমোহনের। সেই রোমাঞ্চ আর সেই বিস্ময় জীবনে ভোলবার নয়।...অবগুণ্ঠনশূন্য, স্রস্তবসন, জলধারায় সিক্ত মুখ...তার মুখের ওপর অসহায় দুই ভ্রমরচোখের সেই প্রথম উন্মীলন—নিভৃতের কোন্ গভীরে নাড়াচাড়া করে গিয়েছিল মদনমোহন তখনো জানে না।

মদনমোহন জানে না, দত্তবাড়ির রাধানাথ দত্ত সেই দিন থেকেই ঈর্ষার পাত্র তার।

কিন্তু এ আরো পরের কথা।

॥ ৫ ॥

চণ্ডীবউকে ঘরে আনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মহেশ্বর দত্তর। তিনি কৃতিত্বই মনে করেন। গাঁয়ের লোক বউ দেখে মুগ্ধ হয়েছে আর প্রশংসা তাঁকেই করেছে। সে-প্রশংসা তিনি প্রাপ্য ভেবেছেন।

ছেলের বিয়ের জন্য মহেশ্বর-গৃহিণীর তাগিদ দেবার অথবা চোখের জল ফেলার দরকার ছিল না। তাগিদ স্বয়ং কর্তাই দিবারাত্র অনুভব করেছেন। ছেলের বিয়ে আবার দেবেন সেটা স্থির ছিল মালতীবউয়ের দেহ চিতভস্মে বিলীন হবার আগেই। এই বিয়ে সাধারণ আর পাঁচটা বিয়ের মত দিলে চলবে না, এ-কথা তাঁর মনে হয়েছিল লোকের কানাকানিতে—মালতীবউ মরেও সহজে মরছে না দেখে। আর এই চিন্তা অটুট সঙ্কল্পের আকার নিয়েছিল পারলৌকিক ক্রিয়া উপলক্ষে ঘোষাল-কর্তাকে যেদিন আমন্ত্রণ জানাতে গেছলেন সেই দিনই। যেদিন ঘোষাল-কর্তা জিজ্ঞাসা করে বসেছিলেন, বউটা হঠাৎ মরল কি করে হে?

আর, বিয়ের মত বিয়ে দেবার সঙ্কল্প আক্রোশের আকার নিয়েছিল, পারলৌকিক ক্রিয়ায় ঘোষালের অনুপস্থিতির দরুন।

...বিয়ের মাত্র পনের দিন আগে ঘোষাল-কর্তা এভাবে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারেন এ সম্ভাবনা কখনো মাথায় আসে নি।

যাই হোক, মালতীবউ চোখ বোজার পর ছ'মাস ধরেই তলায় তলায় কন্যা খুঁজছিলেন মহেশ্বর দত্ত। গাঁয়ে সন্ধান করেন নি। কারণ, করণে চোখে পড়ার মত কায়েতের ঘরের কোনো মেয়ে থাকলে তিনি খবর পেতেন। তাছাড়া পাঁচ কথা উঠেছে বলেই তিনি এখানকার মেয়ে চান না। পাঁচজনে জানবে, পাঁচ রকমের মন্তব্য হবে, সব থেকে বড় কথা অবাক কেউ হবে না। তাই তলায় তলায় অতি বিশ্বস্ত ঘটক লাগিয়েছিলেন তিনি। মুখ শেলাই করে যারা পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁর ছেলের জন্য কন্যারত্ন খুঁজে বেড়াবে। তাঁর কন্যারত্ন চাই—টাকা চাই না, পয়সা চাই না, যৌতুক চাই না—শুধু কন্যারত্ন চাই। প্রয়োজন হলে তিনি উল্টো খরচ করবেন।

ঘটকেরা একের পর এক প্রস্তাব এনেছে, ফলাও করে কন্যার রূপ-গুণের কথা বলেছে। আইবুড়ো মেয়ের অভাব তো নেই। তাছাড়া একাধিক স্ত্রী বর্তমানেই কত লোকে কত বিয়ে করছে, এ তো বিপত্নীক ছেলেমানুষ ছেলে। কেউ লাগান-ভাঙান না দিলে মনের মত সম্বন্ধ পেতে কোনো বাধাই নেই। ঘটকদের তৎপরতায় তা পাচ্ছিলেনও কিন্তু কোনোটাই মহেশ্বর দত্তর মনের মত হচ্ছিল না। খবর পেলেই চুপচাপ গিয়ে মেয়ে দেখে এসেছেন। কৃতী ব্যবসায়ী মানুষ, জায়গায় জায়গায়—এমন

কি দূরের রাণাঘাটেও তাঁর রোদে শুকানো ইঁট, চুন, কাঠ, রাঙামাটির আড়ত। অবস্থা ফিরলে, দু'একটা পাকা ঘর সকলেই তুলতে চায়। অতএব মহেশ্বর দত্তর পসার দিনে দিনে বাড়ছেই। নৌকো বোঝাই হয়ে কলকাতা থেকেও মাল আসে তাঁর। তাছাড়া কাছে দূরে কাঠের গুদোমই আছে ক'টা। সর্বত্রই তাঁর বিশ্বস্ত লোক আছে, তবু ওই বয়েসে তখন পর্যন্ত নিজেই দেখাশুনা করতেন সব কিছু। নৌকোয় অথবা গরুর গাড়িতে অথবা পালকিতে চেপে হামেশাই তাঁকে বেরুতে হত। এর মধ্যে কখন মেয়ে দেখতে যাচ্ছেন আর কখন কাজে যাচ্ছেন কে টের পাবে?

মেয়ে দেখতে গিয়ে চোখে পড়ার মত মেয়ে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু কাজ দেখতে গিয়ে পেলেন একদিন। সেও দূরে নয়, কাছেরই এক গাঁয়ে। যোগাযোগ বলে একেই, তাঁরই অনুগ্রহভাজন এক কর্মচারীর মেয়ে। যে কর্মচারীকে খুব কৃপার চোখেও দেখতেন না তিনি। মনে মনে বলতেন মাকাল ফল, চেহারা দেখে আর বিনয়বচনে তুষ্ট হয়ে ওখানকার কারবার দেখাশুনার ভার দিয়েছিলেন তাঁর ওপর। কিন্তু কাজে খুশি নন আদৌ। অবশ্য খুশি তিনি কোনো কর্মচারীর ওপরেই নন, নিজের জামাইরাও তাঁর কারবারের সঙ্গে যুক্ত—উঠতে বসতে তাদেরও শ্বশুরের অপ্রসন্ন মুখ দেখতে হয়। আর এই লোকটিকে তো সেদিনও এসে বকাবকি করেছিলেন তিনি।

দুপুরে এই লোকেরই বাইরের চালাঘরে বসে বিশ্রাম করছিলেন মহেশ্বর দত্ত। রোদ পড়লে আবার বেরুবেন। সামনে বিনয়নম্র মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন কর্মচারীটি—শচীন্দ্র সরকার। নিজের হাতে পাথরের গেলাসে ডাব আর ঘোলের সরবত এসে সামনে রেখেছেন। তামাক সেজে দিয়েছেন। কিন্তু মালিকের মুখে তুষ্টির চিহ্নও নেই, গম্ভীর মুখে তামাক টানছেন তিনি। ডাব আর ঘোলের সরবত তেমনি পড়ে আছে।

হঠাৎ সচকিত ঘরের দুজনেই। সামনের বিস্তৃত উঠোন দিয়ে তীরের মত ছুটল একটা বছর দশ-এগারোর হৃষ্টপুষ্ট ছেলে। কিন্তু পিছন থেকে ততোধিক বেগে ছুটে এসে খপ করে তার ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে ফেলে তাকে অচল করল গাছকোমর কাপড় পরা বছর চৌদ্দ-পনেরোর একটি মেয়ে। ধরে ফেলেই ছেলেটার ওপর গুপাগুপ কিল চড়।

ছেলেটা তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। এদিকে মালিকের বিশ্রামে ব্যাঘাত হল দেখে শচীন্দ্র সরকার তাড়াতাড়ি চৌকাঠের কাছে এসে চড়া সুরে ধমকে উঠল, এই ও! ছাড় বলছি!

মেয়েটার অগ্নিমূর্তি তৎক্ষণাৎ। ছাড়া দূরে থাক্, রাগ গিয়ে পড়ল শাসনকর্তার ওপর। ছাড়ব! ওকে আমি খুন করব না আজ! এত সাহস আমাকে কাঁটা-লাঠি দিয়ে মেরে পালায়?

কথা শেষ হবার আগেই ছেলেটার গাল বেড়িয়ে চড় আবার একটা।— বাবা-মার জন্যে তোকে কিছু বলি না বলে, না?

তাল বুঝে ছেলেটার চিৎকার বেতালা হল আরো। রাগে লাল হয়ে ঘরের কর্তা এগিয়ে গেলেন।—ছাড় বলছি শিগ্‌গীর, নইলে আজ তোকে আমি—

ঘরের ভিতরে তামাকের নল সরে গেছে মহেশ্বর দত্তর মুখ থেকে। স্থান কাল ভুলে দৃশ্যটা দেখছেন তিনি। অগ্নিবর্ণা মেয়েটা এবারে স্বয়ং শাসকটির মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে থমকালো হঠাৎ। ঘরের ভদ্রলোকটির সঙ্গেই চোখাচোখি

হয়ে গেল আগে। চেনে বোধ হয়। অথবা জানে ঘরে কে বসে। বাড়ির কর্তার দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিকারের হাত ছেড়ে দুমদাম প্রস্থান করল সে।

শচীন্দ্র সরকার অতিথি-মনিব সকাশে ফিরলেন আবার। বিধাতার যেটুকু কারসাজি তা যে আধাআধি সম্পন্ন হয়ে গেল জানতেন না।

আলবোলার নল মুখে তুলতে ভুলে গেছেন মহেশ্বর দত্ত। —মেয়েটি কে?

অপ্রিয় দৃশ্য দেখে মনিব বিরক্ত হয়েছেন ভেবে সরকার মশাই সঙ্কুচিত। অন্যথায় জবাব যা দিল তা বোধ হয় বলতেন না। আজ্ঞে—মেয়ে বড় অবাধ্য।

বয়েস কত?

চোদ্দ-পনের।

জবাবটা তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলে মেয়ের বাপ থমকালেন। মনিবের মুখের দিকে চেয়ে অনুধাবনযোগ্য কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন যেন। সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠচেতনায় নাড়াচাড়া পড়ল একপ্রস্থ। কিছুদিন আগেই মেয়েকে কেন্দ্র করে যে-ঘটনা ঘটে গেছে, এ কৌতূহলও তারই অনুরূপ আর এক অধ্যায়ের সূচনা কিনা হঠাৎ বুঝে উঠলেন না।

মেয়েটিকে ডাকো তো একটু। যেমন আছে তেমনি নিয়ে এসো।

আত্মস্থ হয়ে অন্দরে ছুটলেন মেয়ের বাবা। ...যদি তাই হয়, তাহলে আগের ঘটনার জন্য আর একটুও খেদ থাকবে না। হলেই বা মনিবটি তাঁর থেকেও পাঁচ-সাত বছরের বড়, এমন অসম্ভব ব্যাপারও যদি সম্ভব হয়, গুষ্টিসুদ্ধ লোকের ভাগ্য। আর এবারেও যদি ওই মেয়ে সঙ্কল্প পণ্ড করে বসে, তাহলে এবারে আর সৎমা নয়, নিজেই তিনি ওই মেয়েকে কেটে দুখানা করবেন।

প্রত্যাশার আচমকা ধাক্কায় এর থেকেও বহুগুণ সুবাঞ্ছিত সম্ভাবনার চিন্তা মনেও এলো না ভদ্রলোকের। বাপ কেন, ঠাকুরদার বয়সী পাত্রের মাথায়ও একাধিকবার টোপর দেখার নজির নতুন কিছু নয়। অতএব প্রায় মোহগ্রস্তের মতই ভদ্রলোক অন্দরে ছুটে এসেছেন এবং মেয়েকে ধরে নিয়ে মনিবসকাশে ফিরেছেন।

মহেশ্বর দত্ত নিরীক্ষণ করে দেখলেন খানিক। সেই দেখার বিস্ময় আর তন্ময়তা এমন স্পষ্ট যে মেয়েও অস্বস্তি বোধ করেছে। ঠোঁটের ফাঁকে প্রসন্ন হাসির আভাস উঁকিঝুঁকি দিয়েছে মহেশ্বর দত্তর, যেন দুর্লভ কিছুই আবিষ্কার করেছেন তিনি। দুরু দুরু বক্ষ মেয়ের বাপ মনিবের মুখের প্রতিটি রেখা গুনছেন।

তোমার নাম কি মা?

মা! মা শুনে কানের পরদায় বড়সড় একটা ধাক্কাই খেয়ে উঠলেন বাপ। চকিত বিভ্রম কাটতেই মনে পড়ল মাস ছয়েক আগে মনিবের একমাত্র ছেলের বউ গত হয়েছে। মনে পড়া মাত্র অব্যক্ত আশায় হৃৎপিণ্ডটা এবারে লাফিয়েই উঠল বোধ করি।

প্রশ্ন শুনে মেয়েও যেন আশ্বস্ত একটু। এবারে ঈষৎ গম্ভীর কৌতূহলে সেও বাপের মনিবকে লক্ষ্য করল একটু।

চণ্ডী।

বাপ অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, ও কি! ভালো নাম বলতে হয়! মনিবের উদ্দেশে বিগলিত হাসি, ওর নাম গৌরী।

মহেশ্বর দত্তর ঠোঁটের ফাঁকে হাসিটুকু সামান্য বিস্তৃত হল। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন তিনি।—গৌরী কেন, চণ্ডী খাসা মানানসই নাম।

মেয়ের বাপ বাক্যহারা হয়ে কাঁধে ঘাড় ঠেকিয়ে সায় দিলেন তৎক্ষণাৎ। অর্থাৎ চণ্ডী খাসা নাম তো বটেই।

দেখি মা-লক্ষ্মী তোমার হাতখানা একটু—

মেয়ে হাত বাড়াবার উপক্রম করতেই বাপ শশব্যস্তে তাড়া দিলেন আবার, এসে প্রণামও করিস নি—প্রণাম কর্, প্রণাম কর্, প্রণাম করে নে আগে!

অতএব প্রথমে প্রণামপর্ব ও পরে হস্তপ্রসারণ।

ওই হাতখানা নয় মা-লক্ষ্মী, বাঁ হাতখানা দাও।

বাঁ হাত দেখার আগে মা-লক্ষ্মীর স্বচ্ছ কৌতুকভরা মুখখানাই আগে পর্যবেক্ষণ করলেন মহেশ্বর দত্ত। তারপর হাতের দিকে মনোনিবেশ করলেন। দেখতে তেমন জানেন না, দুই একটা সুলক্ষণ চেনেন বলে ধারণা। কিন্তু যে লক্ষণ দেখে আগেই চিত্ত প্রসন্ন, সেই দৃষ্টি দিয়ে হাতেও সুলক্ষণ ছাড়া আর কিছু দেখলেন না তিনি।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুখের দিকে তাকালেন আবার, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কিছু। জিজ্ঞাসা করলেন, তা ভাইকে তখন ওভাবে মারলে কেন?

মেয়ের লালচে রঙে লালের আভা ছড়ালো, সেটা লজ্জায় কি ভায়ের ওপর রাগে, ঠিক স্পষ্ট হল না। জবাবের বদলে গভীর কালো টানা দুই চোখ তুলে একবার তাঁর দিকে তাকলো শুধু।

মহেশ্বর দত্ত আবার বললেন, মা-চণ্ডী কি শুধু শুধু কাউকে মারে?

ও আমাকে কাঁটা-ছড়ি দিয়ে পিঠে মেরে পালাচ্ছিল।

ঈষদুষ্ণ জবাব শুনে মহেশ্বর দত্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মেয়ের বাপের দিকে ফিরে বলে উঠলেন, দেখো তো, আর তুমি কিনা উল্টে ওকেই বকলে—কেটে টেটে যায় নি তো!

মেয়ের বাপ অপ্রস্তুত। অনুমতি পেলে এক্ষুনি গিয়ে ছেলেকে দু'ঘা দিয়ে আসেন, এমনি মুখভাব। স্বপক্ষে এ-রকম উক্তি শুনতে মেয়েও বোধ হয় অভ্যস্ত নয়, অতএব গভীর কালো চোখের দৃষ্টি বাপের মনিবের মুখের ওপর প্রসারিত হল আবার।

আচ্ছা চণ্ডী-মা, এবারে ভিতরে যাও তুমি।

মেয়ে প্রস্থান করল। মহেশ্বর দত্তর দু'চোখ, যতক্ষণ দেখা যায় তাকে, অনুসরণ করল। আশায় আর অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় মেয়ের বাপ ঘামছেন।

মহেশ্বর দত্তর এতক্ষণে আবার খেয়াল হল, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে তাঁর অনুগ্রহপ্রত্যাশী আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র। এতক্ষণ মনেও ছিল না। মনে না থাকাটুকুও মেয়ের গুণের দিকে গেল। আর এই প্রথম কর্মচারীটির প্রতি সদয় মনোযোগ দেওয়া দরকার বোধ করলেন তিনি।

তবু সদিচ্ছাটুকু মনেই থাকল, গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ের এখনো বিয়ে দাও নি কেন?

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মুখ শচীন্দ্র সরকারের, আজ্ঞে চেষ্টা করেছিলাম। গরীব মানুষ...সংগতি নেই!

প্রশ্রয়ভরা উষ্ণকণ্ঠে বাধা দিলেন মহেশ্বর দত্ত, মা-চণ্ডী দেখলাম তোমার ঘরে,

আর তোমার সংগতি তো নেই!

সবিনয় সুপটু জবাব মিলল এবারে, আজ্ঞে নিয়তি-নির্বন্ধ না হলে তো কিছু হয় না।...

মহেশ্বর দত্ত মাথা নাড়লেন। কথাটা মনঃপূত হয়েছে। নিয়তি-নির্বন্ধ না হলে...

কিন্তু আগ্রহ বড় বেশি দেখানো হয়ে যাচ্ছে। কুল শীল বংশমর্যাদার পরিচয় সংগ্রহে মন দিলেন তিনি। যা পেলেন তাও খুশির কারণ। ছোট ঘরের মেয়ে কেউ বলবে না, অবস্থার ফেরে পড়েছে, বংশমর্যাদায় খাটো নয়। প্রকাশ্যে গম্ভীর তবু।—মেয়ের ঠিকুজি কোষ্ঠী আছে? নিয়ে এসো—

ঠিকুজি কোষ্ঠী সংগ্রহ করে এবং সেটি কামিজের জেবে পুরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রস্থান করলেন তিনি। খুশিতে আর উদ্দীপনায় মন ভরপুর। যে মেয়ে দেখে এলেন, তার ঠিকুজি মুখেই লেখা। না যদি মেলে কারো সঙ্গে তো সেটা ছেলের দোষ। আর ছেলে যখন নিজেরই, সেই দোষ চাপা দিতে তিনি দ্বিধা করবেন না। ছেলেকে তাঁর থেকে বেশি আর কে চেনে? এই ছেলে বশে রাখার জন্য ঠিক যেন এই চণ্ডীরই ঘরে আসা দরকার।

বাড়ি ফিরে হৈ-চৈ করলেন না বা কারো কাছে কিছু ভাঙলেন না। কুল-পুরোহিতকে ডেকে ছেলে আর মেয়ের কোষ্ঠীর নকল হাতে দিয়ে বললেন, দেখুন তো ছেলের সঙ্গে মেলে কিনা, এই মেয়েটিকেই ঘরে আনার ইচ্ছে—ভালো করে মেলাবেন।

বেশি বলার দরকার নেই, এরপর ঠিকুজি মেলানোর দায় পুরোহিতের। সেই দায় তিনি যথাযথ পালন করলেন। টিকি নেড়ে সাড়ম্বরে কর্তাকে জানালেন, ছেলের জন্যে এতদিনে তিনি ভাগ্যবতীর সন্ধান পেয়েছেন—মেয়ের ভাগ্য গৌরীর ভাগ্যই বটে।

মৃদু হেসে মহেশ্বর দত্ত মাথা নাড়লেন, গৌরীর নয়, চণ্ডীর ভাগ্য।

বিচক্ষণ মানুষ তিনি, এর পরেও চুপচাপই কাটালেন দু'দিন। গৃহিণীকে শুধু জানালেন, ছেলের জন্যে একটি মেয়ে দেখা হয়েছে, মোটামুটি মন্দ নয়, ঠিকুজিও ভালো মিলেছে—অগ্রসর হবেন কিনা ভাবছেন। এভাবে বলার দুটো উদ্দেশ্য। গৃহিণীকেও তিনি অপ্রত্যাশিত কিছু পাওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করতে চান না। রূপ-গুণ বেশি বিস্তার করলে উল্টো ফল হয়, বেশি দেখার জন্য চোখ উঁচিয়ে থাকে। দ্বিতীয় কারণ, তাঁর নিজের মনেই খটকা লেগেছে একটু। চোদ্দ-পনেরো বছরের এমন মেয়ের বিয়ে কেন হয় নি এখনো? বাপ অবশ্য বলেছে সংগতি নেই। কিন্তু এমন রূপসী মেয়েকে পাত্রস্থ করতে খুব একটা সংগতির দরকার হয়, সেটা তিনি এখানো ভাবতে পারেন না। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না এমন মেয়ে কটা চোখে পড়ে?

অতএব বিশেষ অনুগ্রহভাজন দুটি ঘটকের তলব হয়েছে। বলেছেন, সম্বন্ধ তো তোমরা খুব আনলে, এখন আমি এক মেয়ের খবর দিচ্ছি, একটু খোঁজ-টোজ নিয়ে দেখো তো—অন্য সব দিক ভালো হলে মন্দ হবে না বোধ হয়।

কুলপুরোহিতের সঙ্গে এই ঘটকদের মনোভাবের কিছু তফাত হওয়াই স্বাভাবিক। বিয়ে যেখানেই হোক, পুরোহিতের বঞ্চিত হবার ভাবনা নেই। কিন্তু কর্তার সন্ধানী পাত্রী ঘরে এলে ঘটকদের তেমন আর কি লাভ? অতএব ভিতরে ভিতরে গোমড়া

মুখ করেই তারা সন্ধানে রত হল। বউ-মরা ছেলের জন্য মনের মত মেয়ে জোটাতে পারলে তাদের দিন ফেরার কথা।

খোঁজখবর নিয়ে আরো দিন দুই বাদে কর্তার সন্নিধানে এলো তারা। এই বিয়ে নাকচ করার মত রসদ নিয়েই ফিরেছে, সেই চাপা আনন্দ বাইরে প্রকাশ পেল না। দুজনেই একমত হয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়ল, কর্তামশাইয়ের চোখ বটে, কন্যার ওই রূপ না হলে কি আর কর্তামশাইয়ের চোখে পড়ে!

কর্তামশাই ভিতরে ভিতরে উদ্‌গ্রীব, বাইরে নির্লিপ্ত।—তা তো হল, তার পর কি বলো?

একজন খুঁত খুঁত করল, মেয়ের বাপের একেবারে চালচুলো নেই, কর্তারই নিতান্ত সাদামাটা কর্মচারী—তার ওপর ঘরে তৃতীয় পক্ষের বউ, একগাদা ছেলেপুলে...কর্তামশাইয়ের ছেলে রাজার ছেলে...তার কি ওরকম শ্বশুরবাড়ি ....ইত্যাদি।

মহেশ্বর দত্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন, ছেলে তো শ্বশুরঘর করতে যাচ্ছে না, মেয়ে আসছে!

অপরজন সায় দিল, তা বটে তা বটে, রত্ন হলে ছাইগাদা থেকেও রাজঘরে আসে। কিন্তু যা শোনা গেল, ইয়ে মা-লক্ষ্মীটিই একটু চঞ্চলা প্রকৃতির....মানে খুব সুশীলা নয়।

কি রকম?

এই বয়সে ও দিনেদুপুরে পুকুরঘাটে গিয়ে দাপাদাপি করে চান-টান করেন মা-লক্ষ্মী, বিমাতার গঞ্জনা গ্রাহ্য করেন না, আর ফল-টল খেতে ইচ্ছে হলে বাগানে ঢুকে নিজেই ব্যবস্থা করেন।

গাছে ওঠেন এ-কথা আর মুখ ফুটে বলল না, কর্তার বুদ্ধির প্রতি তাদের আস্থা আছে।

একটু থেমে কর্তা আবার মন্তব্য করলেন, ছেলেমানুষ তাতে কি! আর এই জন্যেই বোধ হয় খাসা স্বাস্থ্য! আর কি বলো?

ঘটকেরা অস্বস্তি বোধ করল, চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে ছেলেমানুষ—এমন উক্তি তারা আশা করে নি। যাই হোক, মোক্ষম অস্ত্রটি এখনো তূণচ্যুত করে নি তারা।

মহেশ্বর দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, অমন প্রতিমার মত মেয়ে...এখনো বিয়ে হয় নি কেন?

আজ্ঞে সেই কথাই তো...অতি ঘরণী না পায় ঘর, অতি রূপসী না পায় বর...দেখল তো সবাই ছুটে আসে, তারপর খোঁজ খবর নিয়ে আর এগোয় না।

খুলে বলো! মহেশ্বর দত্তর সহিষ্ণুতা কমে আসছে। ঘটকদের আচরণে একটা আশঙ্কা ভিতরে ভিতরে দানা পাকিয়ে উঠছে।

অতএব আরও খুলেই বলল। আর বলল যা সেটা খুব অবহেলা কবার মত নয়। বস্তুত এই দিক ভেবেই তিনি খোঁজখবর করতে বলেছিলেন।

তাদের সার বক্তব্য, একে একে দু'দুটো বউ মরতে মেয়ের বাপ নিজেই বিয়ের জন্য ব্যস্ত। অতএব সময়ে মেয়ের বিয়ের দিকে গা করে নি। মেয়ে নিজের ইচ্ছেমত বড়ো হয়েছে, যথাযোগ্য শাসনও পায় নি। একটু বড় হয়ে উঠতেই ছেলে-ছোকরাদের

চোখ গেছে তার দিকে। তখনো বাপ নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছে। ফলে মেয়ে পছন্দ হলেও অনেক ছেলের বাপ ভয় পেয়ে সরে গেছে। অনেক ছেলের বাপ অবশ্য সাহস করে নিজে বিয়ে করতে চেয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও কেন হয় নি কে জানে। এত সব শুনেও কর্তার ইচ্ছে জেনে ঘটকরা পিছপা হয় নি, কিন্তু শেষে যা শুনল তাতে খুব আর ভরসা করা যাচ্ছে না।

যথা, মাত্র মাস ছয় আগে এক জায়গায় মেয়ের বিয়ে প্রায় ঠিকই হয়ে গিয়েছিল। বলতে গেলে প্রায় নিখরচায় বিয়ে হতে পারত। কিন্তু পাকা কথাবার্তা যেদিন হবে, সেই দুপুর থেকেই মেয়ে উধাও। সমস্ত জায়গায় তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, পুকুরে জাল ফেলা হল পর্যন্ত, কিন্তু দু'দিনের মধ্যে মেয়ের কেউ পাত্তা পেল না।

তারপর? মহেশ্বর দত্তর চোখের সামনে দিনের আলো কমছে যেন।

তারপর আর কি! মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে দুদিন জঙ্গলে পালিয়ে ছিল। দিনের বেলায়ও দল না বেঁধে কেউ যে জঙ্গলে ঢোকে না, মেয়ে সেখানে দু'রাত কাটিয়েছে এ আর কে বিশ্বাস করবে! মেয়ের বাপও নাকি পাঁচজনকে পাঁচরকম বোঝাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বুঝতে আর লোকের বাকি কি আছে? মেয়ে যত রূপসীই হোক, এরপরই ওই মেয়ের আর ভালো বিয়ে হবে এমন আশা কেউ করে না।

আশা আর মহেশ্বর দত্তও খুব করতে পারছেন না। কিন্তু এত শোনার পরেও একেবারে বাতিল করে দিতে মন চায় না। গাঁয়ের লোককে তিনি ভালোই জানেন, তিলকে তাল তারা করেই থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিলের সংশয়ও তুচ্ছ করার মত নয়।

আচ্ছা তোমরা এসো আজ, এ ব্যাপার নিয়ে পাঁচ কান করার দরকার নেই।

ঘটকেরা ডাইনে বাঁয়ে মাথা দুলিয়ে আজ্ঞা শিরোধার্য করে প্রস্থান করল। মহেশ্বর দত্ত গুম হয়ে বসে রইলেন খানিক। ...মেয়েটির ছুটে এসে ভাইকে ধরা সেই চণ্ডী-মূর্তি, পরে কাছে এসে দাঁড়ানো, চাউনি, কথাবার্তা—সবই চোখের সামনে ভাসতে লাগল। না, এযাবৎ কোনো মেয়ের এমন শক্তিরূপা শ্রী আর দেখেন নি। অন্ধকার ঠেলে আলো করার মত শ্রী আর দীপ্তি। এই শ্রী আর এই দীপ্তির মধ্যে কুৎসিত অন্ধকার কিছু থাকতে পারে এ-রকম সম্ভাবনা কিছুতে যেন মন থেকে সায় পায় না। অথচ আগে এই দিকটা ভেবেই ঘটকদের খোঁজখবর নিতে বলেছিলেন তিনি।

শেষে কি ভেবে মেয়ের বাপ শচীন্দ্র সরকারকেই বাড়িতে ডেকে পাঠালেন তিনি। কাছ থেকে চাকর-বাকর পর্যন্ত সরিয়ে দিয়ে তাঁকে নিয়ে বসলেন।

গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, চাকরি না করলে চলে তোমার?

আজ্ঞে! দুর্বোধ্য বিস্ময়।

প্রশ্নটা আরো একটু প্রাঞ্জল করলেন মহেশ্বর দত্ত।—যে চাকরি করছ সেটা না করলেও সংসার চলে যেতে পারে তোমার?

আশায় আশায় ছুটে এসে হঠাৎ যেন বেখাপ্পা আছাড় গেলেন মেয়ের বাপ। শুকনো জিবে করে শুকনো ঠোঁট ঘষে মাথা নাড়লেন, চলে না।

তোমার মেয়েটি কেমন?

শচীন্দ্র সরকার প্রমাদ গুণলেন। ঘামছেন। ইতস্তত করে বললেন, আজ্ঞে গরীবের মেয়ে, বিয়ে হচ্ছে না...পাঁচজনের চোখ টাটায়, পাঁচকথা বলে। আমি মিথ্যে বলব না, মেয়ে একটু জেদী, কিন্তু ভালো না এ আমার কখনো মনে হয় না।

মনিবের কানে কিছু গিয়ে থাকবে এই আশঙ্কা করেই সব দিক বজায় রেখে জবাব দিয়েছেন।

কিছুদিন আগে তুমি ওই মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলে?

ছেড়ে দিলে শচীন্দ্র সরকার পালিয়ে বাঁচেন।—আজ্ঞে ঠিক করি নি, কথাবার্তা অনেকটা এগিয়েছিল।

হল না কেন?

নিরুপায় শচীন্দ্র সরকার সত্যি জবাবই দিলেন। আমতা আমতা করে বললেন, যার সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছিল তার বয়েস মেয়ের তিনগুণেরও বেশি...মেয়েও ছোট নয়তো,...বিগড়ে গেল।

মেয়ের মুখখানা আবার চোখে ভাসল মহেশ্বর দত্তর, ঈষৎ রুষ্ট স্বরে বললেন, অত বয়স জেনেও এগিয়েছিলে কেন?

আজ্ঞে অভাবের সংসার...

পালিয়ে গিয়ে মেয়ে দু'রাত ছিল কোথায়?

শচীন্দ্র সরকারের মনে হল অপরাধ করে তিনি যেন পুলিসের জেরায় পড়েছেন। অস্ফুট জবাব দিলেন, জঙ্গলে...

জঙ্গলে দু'রাত কেউ থাকতে পারে? তুমি বিশ্বাস করেছ?

হাল ছেড়ে মেয়ের বাপ বিপরীত মাথা নেড়ে ফেললেন। শেষে খড়কুটো ধরার মত করে বলে উঠলেন, বিশ্বাস হয় না বটে, কিন্তু জেদ চাপলে মেয়েটার আর ভয়-ডর কিছু থাকে না...ফিরে আসার পর গঞ্জনা তো কম হয় নি, তবু মুখে কেবল এক কথা জঙ্গলে ছিল...

এরপর জিজ্ঞাসাবাদে ক্ষান্ত দিলেন মহেশ্বর দত্ত। ভাবলেন খানিক চুপচাপ। এই বাক্যালাপের পরেও মন ওই মেয়ের দিকেই ঝুঁকছে। বললেন, কাল-পরশুর মধ্যে আমি মেয়েটিকে আর একবার দেখতে যাব, কিন্তু এ নিয়ে বাড়িতে কারো সঙ্গে একটি কথাও কইবে না। মেয়ের সঙ্গে তো নয়ই, তোমার স্ত্রীর সঙ্গেও না।

মেয়ের বাপ তখনকার মত হাঁপ ফেলে বাঁচলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আবার একটু আশাও উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল।

বুদ্ধিমানের মত শচীন্দ্র সরকার একটা কাজ করলেন। মনিবের কথা রাখলেন। বাড়ি ফিরে কারো কাছে একটি কথাও বললেন না। স্ত্রীকে না, মেয়েকেও না। মেয়েকে পাখি-পড়ার মত করে প্রস্তুত করে রাখারই কথা। মনে মনে সেই রকম চিন্তা নিয়েই বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু সময়ে সুবুদ্ধির উদয় হল। মনিবটি মুখের দিকে তাকালে ভিতর দেখতে পান। কি বলতে কি বলে মেয়েই ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবে ঠিক নেই। দ্বিতীয়, ঘরের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটিকে সমীহ যত করেন, বিশ্বাস ততো করেন না। তিনি জানলে পাঁচকান হবার সম্ভাবনাই বেশি। এ-সব ছাড়াও

মুখ শেলাই করে থাকার আর একটা কারণ আছে। এই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের পিছনে তাঁর কোনো হাত ছিল না, কোনো চিন্তাও ছিল না। অতএব যা ঘটতে পারে সেটাও অদৃষ্টের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত ভাবলেন তিনি। দেখাই যাক কি আছে মেয়েটার অদৃষ্টে। ওপরওলার খেয়াল আর মর্জি ভিন্ন ভাগ্যের এমন অসম্ভব পরিবর্তন সম্ভব নয়।

কতখানি সুবিবেচনার কাজ করেছিলেন, দু'দিন বাদে মনিব ঘরে পা দিতে-না-দিতে তাও অনুভব করেছেন। বেলা দ্বিপ্রহরের নিরিবিলিতেই মনিব এসেছেন। এসেই হুকুম করেছেন, চণ্ডী মা-কে ডাকো।

যেমন ছিল মেয়ে তেমনি ধরে এনেছেন শচীন্দ্র সরকার। তাঁর ব্যস্ততা দেখে মেয়ে ছেড়ে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীও অবাক।

মহেশ্বর দত্ত প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, কি করছিলে মা-চণ্ডী, ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি নয় তো?

মা-চণ্ডী লজ্জা পেল একটু। এই লোকটিকে খুব মন্দ লাগে নি তার। উঠতে বসতে হতচ্ছাড়ী বজ্জাত ইত্যাদি সম্ভাষণ শুনেই কান অভ্যস্ত, এ-রকম জোর গলায় মা-ডাকে প্রসন্ন হবারই কথা। আসতে আসতে বাবার শেখানো মতই কাজ করল। নিজের থেকেই প্রণাম করে উঠল।

মহেশ্বর দত্ত টেনে কাছে বসালেন তাকে। যে গুরু ব্যাপারটা যাচাই করতে এসেছেন, এই মেয়েকে আবার দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার গুরুত্ব যেন অনেকটা হাল্‌কা হয়ে গেছে। শোনা কথার ভিত মিলবে না মনে মনে এই আশাই আবার করলেন তিনি।

বললেন, বুড়ো ছেলে রোদে তেতেপুড়ে এলো, আমার জন্যে কি খাবার তৈরি করে রেখেছ মা-চণ্ডী আগে শুনি।

মা-চণ্ডী বেশ মুশকিলেই পড়ে গেল। অপ্রস্তুত মুখ করে বলল, আপনি আসবেন আমরা তো জানতুম না।

শচীন্দ্র সরকার মনে মনে কোন দেবদেবীর পায়েই প্রণাম ঠুকলেন কি নিজের বুদ্ধির পায়ে, জানেন না। মেয়েটাকে তিনিও যেন নতুন চোখে দেখছেন এই মুহূর্তে।

হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন মহেশ্বর দত্ত।—ঠকে গেলে তো মা-চণ্ডী, ছেলে কি কখনো মায়ের কাছে জানান দিয়ে আসে, যখন খুশি এসে পড়ে।

মেয়েও পুরোপুরি হার মানতে রাজি নয়। সঙ্কোচও আর নেই তেমন, বলল, ঘরে ডাব আছে, আনব?

তক্ষুনি খুশির ভাব দেখালেন মহশ্বের দত্ত, যেন দুর্লভ জিনিসই আছে কিছু। বললেন, তাহলে আর ঠকলে কোথায়, আছেই তো। আচ্ছা আনো—

চোখের নিমেষে চণ্ডী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণে দেখা গেল উঠোনে দাঁড়িয়ে কাটারী দিয়ে অভ্যস্ত হাতে নিজেই ডাব কাটতে লেগে গেছে। মহেশ্বর দত্ত নির্নিমেষে দেখছেন, ভিতরের শঙ্কার ছায়াটা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আবার। এর পরেই কর্তব্যের দিকে এগোতে হবে তাঁকে। হবে বলেই হৃদ্যতার এই সহজ দিকটা বেছে নিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু'হাত ভরে নিয়ে ফিরতে পারবেন কিনা কে জানে।

পাথরের গেলাসে ডাব ঢেলে নিয়ে এলো চণ্ডী। আর বাবার নিছকই দ্রষ্টার

ভূমিকা। ডাব খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললেন মহেশ্বর দত্ত। তারপর মেয়ের বাপের দিকে চেয়ে বললেন, এবারে আমরা মায়ে-ছেলেতে একটু গল্প করব—তুমি যাও দেখি একটু।

মুখে হাসি টেনে দুরু-দুরু বক্ষে প্রস্থান করলেন শচীন্দ্র সরকার। চণ্ডী সকৌতুকে বাপের মুখখানা নিরীক্ষণ করল একবার। এতকাল যেখানে তার অস্তিত্বও ছিল না, সেখানে বাপের মনিব এসে এত খাতির করছে, ভাবতে বেশ মজাই লাগছে।

এবারে দুরূহ কর্তব্যের দিকে অগ্রসর হলেন মহেশ্বর দত্ত। ফস করে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মা-চণ্ডী, ছেলের কাছে তুমি নির্ভয়ে সত্যি কথা বলবে না বানানো কথা বলবে?

দুর্বোধ্য প্রশ্ন শুনে মা-চণ্ডীর চোখে শঙ্কার ছায়া নামল একটু। ঘর থেকে বাপকে সরানোর নিগুঢ় কোনো কারণ আছে বলেই মনে হল এবারে।

তোমার কিচ্ছু ভয় নেই, যা বলব সত্যি জবাব দেবে তো?

ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল। সত্যি জবাব দেবে।

আর অবকাশ না দিয়ে মহেশ্বর দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবা কে একজন বুড়োর সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করেছিল, শুনলাম তুমি বাড়ি থেকেই পালিয়ে গেছলে। সত্যি?

মহেশ্বর দত্তর সন্ধানী দৃষ্টি, হঠাৎ এরকম প্রশ্ন আশা করে নি বোঝা গেল বটে, কিন্তু খুব একটা ভয়ের চিহ্ন দেখলেন না।

সত্যি পালিয়েছিলে?

চণ্ডী মাথা নাড়ল, পালিয়েছিল বটে।

পালাতে গেলে কেন, বাড়িতে বললেই হত ওখানে বিয়ে হবে না!

মা বলেছিল বঁটি দিয়ে কেটে তাহলে দুখানা করে ফেলবে।

জবাব শুনে মহেশ্বর দত্তর হেসে ফেলার উপক্রম। সামলে নিয়ে সদয় মুখ করে বললেন, তাহলে তো ভয়ের কথাই, না পালিয়ে করবে কি! কিন্তু শুনলাম পালিয়ে গিয়ে দুদিনের মধ্যে ফেরো নি, সেই দুদিন ছিলে কোথায়?

যে জবাব অনেককে অনেকবার দিয়েছে সেই জবাবটাই ঠোঁটের ডগায় এসে গেল চণ্ডীর। বলতে যাচ্ছিল সামনের জঙ্গলে। চোখে চোখ পড়তে জবাবটা মুখে আটকে গেল। বলা হল না।

সঙ্কটের মুহূর্ত এই মেয়ের কি নিজের মহেশ্বর দত্ত জানেন না। বোঝানোর মত করেই ঠাণ্ডা গলায় আবার বললেন, তোমার বাবার ধারণা তুমি জঙ্গলে ছিলে। কিন্তু দুটো দিন সত্যিই তো কোনো মেয়ে জঙ্গলে কাটাতে পারে না! পারে? তুমিই বলো, পারে?

নিরুপায় মুখেই মাথা নাড়তে হল। পারে না।

তাহলে ওই দুটো দিন তুমি কোথায় ছিলে?

নিরুত্তর।

বলো। তোমার মুখ থেকে সত্যি কথা শুনব বলেই আমার এতদূরে ছুটে আসা। ওই দুটো দিন কোথায় ছিলে তুমি?

করণে।

আর যাই হোক, এই জবাব আশা করেন নি মহেশ্বর দত্ত। সন্ধানী দৃষ্টি হয়ত বা ঘোরালোই হয়ে উঠল এবারে একটু।—করণে! করণে কোথায় ছিলে তুমি?

অঘোর নিবাসে। ক্ষমাযোগিনীর কাছে।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, ঠিক শুনছেন না বয়েসকালের কানের দোষ তাই যেন বুঝে উঠছেন না মহেশ্বর দত্ত। অথচ, ওই মুখের দিকে চেয়ে মিথ্যে বলছে তাও মনে হয় না।—করণের ক্ষমাযোগিনীকে তুমি জানলে কি করে, আগে চিনতে?

মাথা নাড়ল। চিনত।

এর পর জেরা করে যেটুকু তথ্য অবগত হলেন, তাও বিচিত্র। যে তারিখে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল, তার আগের অমাবস্যার তিথিতে এখানকার কালভৈরবের মন্দিরে ক্ষমাযোগিনী এসেছিল। সকলে তাকে দেখতে ছুটেছিল, চণ্ডীও গেছল। মেয়েরা কেউ তার কাছে যায় নি, সকলে দূর থেকে দেখেছে। কিন্তু চণ্ডীর তাকে খুব ভালো লেগেছিল, তাই সে কাছেই গেছল। তাকে দেখে ক্ষমাযোগিনী আরো কাছে ডেকেছিল, খপ করে হাত ধরে একেবারে কোলে টেনে বসিয়েছিল। ক্ষমাযোগিনী তিনরাত্রি ছিল কালভৈরবের মন্দিরে, সেই তিনদিনে চণ্ডীর সঙ্গেই তার সব থেকে বেশি ভাব হযেছিল। ক্ষমাযোগিনী চলে যাবার পরেও করণে তার বাড়ি যেতে ভয়ানক ইচ্ছে করত। তারপর তার বাবা বিয়ে ঠিক করে ফেলল। বাবা করে নি, মা-ই করেছে। মায়ের বাপের বাড়ির চেনা লোক—এখানে দুই-একদিন এসে তাকে দেখে গেছে। এর আগে ক'বার বিয়ে ভেঙে গেছে, এবারে ভেঙে গেলে মা তাকে দুখানা করে কেটে ফেলবে বলেছিল—তাই বাড়ি থেকে পালিয়েছিল সে। সন্ধ্যা পর্যন্ত জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল ঠিকই। সন্ধ্যে হতে ক্ষিধে পেয়েছিল আর ভয়ও একটু-একটু করছিল। তখন ক্ষমাযোগিনীর কথা মনে হয়েছিল তার। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সাঁঝের আঁধারে গাঁ থেকে বেরিয়ে লোককে জিজ্ঞাসা করে করে হেঁটেই করণে চলে গেছে। করণে পৌঁছে যাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে-অঘোর নিবাস দেখিয়ে দিয়েছে। দু'দিন বাদে লোক দিয়ে ক্ষমাযোগিনীই তাকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছে। কেউ জানতেও পারে নি।

মোটামুটি এই তথ্যটুকু টেনে বার করতে সময় কম লাগে নি। শোনার পরেও মহেশ্বর দত্ত হতভম্বের মত বসেছিলেন খানিকক্ষণ। মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শুনেছেন, আর অবিশ্বাস্য কাহিনীর সবটাই বিশ্বাস করেছেন। তবু সংশয়ের শেষ কাঁটা নির্মূল করার তাড়নায় বললেন, আমিও করণে থাকি জান তো? ক্ষমাযোগিনীকে চিনিও খুব, এখন একবার তার কাছেই যাব ঠিক করেছি।

কিন্তু মেয়েটার মুখে কোনো আশঙ্কার ছায়া পড়া দূরে থাক্, শোনামাত্র উল্টে খুশির আগ্রহ দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করল, আমিও থাকব সঙ্গে? আসার আগে ক্ষমাযোগিনী বলে দিয়েছিল, আবার আসিস!

পাকা মাথা মহেশ্বর দত্ত লজ্জাই পেলেন। দেখছেন চুপচাপ, তাঁর মুখে হাসি, চোখে হাসি। সেই হাসি স-রবে ভাঙল হঠাৎ। হা-হা শব্দে হেসে উঠে বাড়ির লোককে জানান দিলেন, কি নিজের ভিতরে যে মলিনতার ছায়া পড়েছিল দু'দিন ধরে সেটা মুক্ত করলেন তিনিই জানেন। এরকম আচমকা হাসি দেখে মেয়েটা অপ্রতিভ। মহেশ্বর দত্ত গলা ছেড়ে হাঁক দিলেন, কই হে সরকার, এদিকে এসো কথা কই!

ওধারে উদ্‌গ্রীব মুখে অপেক্ষা করছিলেন শুধু শচীন্দ্র সরকার নয়, তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটিও। অমন জাঁদরেল মানুষ কর্মচারীর বাড়ি বয়ে মেয়েকে ডেকে নিয়ে কথা বলে কোন্ উদ্দেশ্যে সেটা তাঁরও মাথায় ঢুকেছে। তারপর এরই মধ্যে ঘরের লোককে খুঁচিয়ে যেটুকু শুনেছেন, তাতেই বিস্ময়ের অবধি নেই।

সরকার আসতে দরাজ গলায় মহেশ্বর দত্ত একদফা অনুযোগ বর্ষণ করলেন, চণ্ডী-মাকে শুধু ঘরেই রেখেছ তোমরা, কিছুই চেনো নি। বাড়ি থেকে পালিয়ে দু'দিন ও কোথায় ছিল এ নিয়ে যারা মাথা ঘামাচ্ছে, তাদের সক্কলকে জানিয়ে দিও তারা যে করণে ক্ষমাযোগিনীর বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসে। মা-চণ্ডী আমার ঘরে যাচ্ছেন, বেয়ানকে বোলো যে ক'দিন না সময় হচ্ছে আমার মা-কে যেন আদর-যত্নে রাখেন। মায়ের অনাদর হলে কিন্তু আমার রাগ হয়ে যায়।

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন।

সেই বিকেলেই অঘোর নিবাসের ক্ষমাযোগিনীর বাড়িতে এলেন মহেশ্বর দত্ত।

ভাবী পুত্রবধূর মুখে যা শুনেছেন তার সত্যি-মিথ্যের যাচাই করার জন্যে নয়। বিশ্বাস তিনি শতকরা একশ ভাগই করেছেন। এসেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আগ্রহ নিয়ে। অঘোর নিবাসে আর কখনো পদার্পণ করেন নি বটে, কিন্তু ক্ষমাযোগিনীকে করণের কারো থেকে কম চেনেন এমন নয়। দূর থেকে দেখেছেনও বারকতক। বিষয়ী লোক হয়ে ওঠার পর থেকে মুখে প্রকাশ করুন আর না করুন, এই এক রমণীর প্রসঙ্গে আর দশজনের মত তাঁরও কৌতূহল ছিল, শ্রদ্ধা ছিল, আবার একটু ভয়ও ছিল। ক্ষমাযোগিনীর প্রিয় পাত্রীকে তিনি ঘরের বউ করে আনতে চলেছেন, এটুকু তাঁকে জানাবার বাসনা কিছুতে দমন করতে পারলেন না। আর ভাগ্যে যদি থাকে, ছেলের বিয়ে উপলক্ষে ক্ষমাযোগিনী যদি তাঁর বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন, সে এক মস্ত লোভনীয় মর্যাদার ব্যাপার হবে। করণের লোক বিস্ময়ে হকচকিয়ে যাবে।

অঘোর নিবাসের সামনে দাঁড়িয়ে কি এক অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন তিনি। যা সকলেই করে থাকে। বাড়িটার চারদিকের থমথমে নীরবতাই অস্বস্তির কারণ বোধ হয়। ফিরে যাবেন কিনা ভাবলেন একবার। পরক্ষণে মনে হল, ছেলের ব্যাপার নিয়ে ঘোষালবাড়ির ঘোষাল-কর্তা ক্ষমাযেগিনীর সঙ্গে দেখা করে গেছলেন একবার। তাঁর বেলায় ছেলে অপরাধ করেছিল, আর তিনি তো এসেছেন সুখবর দিতে, সম্ভব হলে ছেলের বিয়েতে পদধূলি দেবার আমন্ত্রণ জানাতে। তাছাড়া যে মেয়েকে তিনি ঘরের বউ করে আনতে যাচ্ছেন, ভিন গাঁয়ের সেই এক ছোট মেয়ে নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে রাত করে এই বাড়ির ভিতর ঢুকে পরে দু'দিন থেকে গেছে, আর তিনি বুড়ো মানুষটা ঘাবড়াচ্ছেন—ভাবতেও লজ্জা!

অতএব নীরব পুরীতে ঢুকেই পড়লেন।

ক্ষমাযোগিনী তার আসনেই বসে ছিল বটে, তবে জপতপ কিছু করছিল না। আগন্তুক দেখে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালো শুধু। এ বাড়িতে নিজে থেকে লোক আসা নিয়মের ব্যতিক্রম কিছুটা।

· তৃতীয় কেউ নেই এখানে। মাটিতে মাথা রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে উঠলেন মহেশ্বর দত্ত। ক্ষমাযোগিনীর দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর। নীরব জিজ্ঞাসু।

আমি মহেশ্বর দত্ত—দত্তপাড়ায় থাকি।

ফাঁপরে পড়লেন তিনি। যাকে বলা সে চিনল কি চিনল না কিছুই বোঝা গেল না। তেমনি চেয়ে রইল।

মহেশ্বর দত্ত আবার বললেন, বড় আশা নিয়ে ঠাকরোণের চরণ দর্শনে এলাম। ছেলের বিয়ে দিচ্ছি, মেয়েটিকে ঠাকরোণ পছন্দ করেন শুনলাম, তাই ভরসা হল আশীর্বাদ পাব।

যোনীর প্রসারিত নেত্রে এবার যেন কৌতূহলের আভাস দেখলেন একটু। তাই আবার বললেন, ভৈরব গাঁয়ের শচীন সরকারের মেয়ে—মেয়েটির নাম চণ্ডী —কিছু দিন আগে মেয়েটি আপনার কাছে এসে দু'দিন থেকেও গেছে শুনলাম।

মুখের ভাব-পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন মহেশ্বর দত্ত। মনের মত কাউকে মনে পড়লে মুখে যেমন কোমল আভাস ফোটে তেমনি। কিন্তু গম্ভীর পরক্ষণে। স্থির প্রসারিত দু'চোখ তাঁর মুখের ওপরে আটকে রইল খানিক। মুহূর্তে এই দ্বিতীয় পরিবর্তন দেখে মহেশ্বর দত্ত ঘাবড়ে গেলেন।

মাসকতক আগে তোমাব ওই ছেলেরই একটা বউ মরেছে না?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে মহেশ্বর দত্ত ধাক্কা খেলেন একটা। মাথা নাড়লেন। তারপর শুকনো মুখে বললেন, আজ্ঞে একটাই ছেলে অল্পবয়েস তাই..

আগের বউ মরল কেন?

ভিতরে ভিতরে প্রমাদ গুনলেন। যে প্রশ্ন শুনে একদিন ঘোষাল-কর্তার ওপর চটে আগুন হয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন শুনেই হঠাৎ যেন আতঙ্ক ধরল তাঁর। মনে হল, অশুভক্ষণে তিনি এই বাড়িতে পা দিয়েছেন। সেই একই জবাব নির্গত হল মুখ দিয়ে, ভুগছিল অনেকদিন ধরে—প্রাণশক্তিই ছিল না—দু'বছর ধরে চিকিৎসা-পত্র চলছিল...

এই বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?

বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। ঠিক না হযে থাকলে যোগিনী নিষেধ করবে কিনা বুঝলেন না। মাথা নাড়লেন, আজই কথা দিযে এলাম ...

দাপটের মানুষ মহেশ্বর দত্ত এমন সঙ্কটে আর বুঝি পড়েন নি। ক্ষমাযোগিনী চুপ করে রইল একটু। তারপর তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমাদের বউ-ভাগ্য ভালো। মেয়েটা ভালো। তবে মেয়েটার ভাগ্য ভালো কিনা বুঝছি না। আমার কাছে এসেছ কেন?

এসে কি যে ভুল করেছেন, যিনি এসেছেন তিনিই জানেন। এখন যেতে পারলে বাঁচেন। আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, আশীর্বাদ নিতে...

আচ্ছা, এসো। যাকে আনছ তাকে ভালো রেখো। চণ্ডীর কোপে পড়লে ক্ষতি হতে পারে।

মহেশ্বর দত্ত আবার দ্বিগুণ অস্বস্তি বোধ করলেন কেন জানেন না। বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। ভয়ানক রাগ হল তাঁর। কার ওপর রাগ নিজেই ঠাওর করতে পারলেন না। প্রথমেই ভাবলেন বিয়েটা নাকচ করে দেবেন। একটু বাদে সে-চিন্তা পরিহার করলেন। ক্ষমাযোগিনীর সমস্ত প্রতিকূল ইঙ্গিত তাঁদের প্রতি। নইলে মেয়েটার প্রশংসা করেছে, তাঁদের বউ-ভাগ্য ভালো

বলেছে। শুধু এমন ঘরে পড়াটা মেয়েটার দুর্ভাগ্য কিনা সেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। সেই কারণেই মহেশ্বর দত্তর উষ্মা বোধ হয়। তার মন্তব্যে সায় দিয়ে তিনি বিয়ে ভেঙে দিতে যাবেন কেন? ভবিতব্য না হলে এমন মেয়ে তাঁর চোখে পড়ল কেন?

উল্টে যা শুনে এলেন ক্ষমাযোগিনীর মুখে, তাতে তাঁর উৎসাহ দ্বিগুণ হবার কথা। নিজেদের কে খারাপ ভাবতে চায়! কিন্তু মনের তলায় ক্ষমাযোগিনীর একটা কথা খচখচ করতে লাগল।...যাকে আনছ তাকে ভালো রেখো...চণ্ডীর কোপে পড়লে ক্ষতি হতে পারে। চোখের সামনে মেয়েটার মুখখানা ভেসে উঠল। রাগে লাল হয়ে ছুটে গিয়ে ভাইয়ের মাথার চুলের মুঠি ধরে দাঁড়িয়েছিল যখন সেই মুখখানা। হাসতে চেষ্টা করলেন, চণ্ডীই বটে—ওই মূর্তি দেখেই তো তিনি ভুলেছিলেন!

টাকার মানুষ মহেশ্বর দত্তর বাইরে যত প্রতাপ, ভিতরে ভিতরে ঠিক ততটাই দুর্বল। কিন্তু মানুষটা বিচক্ষণ। বাড়ি ফিরে সেই রাতে এ নিয়ে কারো কাছে একটি কথাও বললেন না তিনি। রাতে ঘুম না আসা পর্যন্ত ভাবলেন তিনি। ভাবনার কারণ আছে। ছেলে আর প্রথম বউয়ের কথা তুলে ক্ষমাযোগিনীই তাঁকে ভাবনার দিকে ঠেলেছে। সেই সঙ্গে এবার আসছে যে তাকে ভালো রাখার ভাবনা ভেবেছন—চণ্ডীর কোপের বদলে প্রসন্ন মুখ দেখার তাগিদও অনুভব করেছেন। ক্ষমাযোগিনী মঙ্গল না চাইলে ও-কথা বলত না।

সকালে উঠে বেশ ঠান্ডা মাথায় একটা অভিনব আবহাওয়া রচনা করলেন তিনি। যে আবহাওয়া সেই দিনে উপেক্ষার ব্যাপার নয়, উল্টে রোমাঞ্চ মিশ্রিত বিশ্বাসের মতই কিছু। আর বাড়িতে পা দেবার আগে ভাবীশ্বশুর ওই কাজটি করেছিলেন বলেই বেশ কিছুকাল পর্যন্ত চণ্ডীবউয়ের নিজস্ব সত্তাটি পরিপুষ্ট হতে পেরেছে। এমন কি, ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক রাধানাথ পর্যন্ত এই বউকে ভিতরে ভিতরে একটু সমীহ না করে পারে নি।

সকালের তামাক-পর্ব শেষ করে মহশ্বের দত্ত স্ত্রীকে ডেকে বলেছেন, কাল রাতে বেশ একটা স্বপ্ন দেখলাম—সেদিন যে মেয়েটিকে দেখে এসেছিলাম, সেখানেই রাধার বিয়ে দেব ঠিক করে ফেললাম।

স্বপ্নের সঙ্গে ছেলের বিয়ের কি সম্পর্ক দত্তগৃহিণীর বোঝবার কথা নয়, বুঝলেনও না। তিনি হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

স্বপ্ন দেখলাম মা-চণ্ডীর মত কে আমার ঘরে আসছেন। কে যেন বলল মায়ের যেন কক্ষনো কোনরকম অনাদর অসম্মান না হয় দেখো, মায়ের মুখ থেকে যেন হাসি না সরে। ভোরের দিকে দেখলাম যে মেয়েটিকে সেদিন দেখে এসেছিলাম, বউ হয়ে এসে সেই মেয়ে হাসিমুখে আমার সেবা করছে। তার নামও চণ্ডী।

গৃহিণীকে ঘায়েল করার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। রোমাঞ্চে, আনন্দে বাক্যহারা তিনি। তারপর তক্ষুনি সেই মেয়ের বাড়িতে ঘটক পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

মহেশ্বর দত্ত বললেন, আমি সব ব্যবস্থা করছি। তুমি রাধানাথকে বলে রেখো তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। মেয়েটি সুন্দরী, তার অপছন্দ হবে না।

· স্ত্রীটিকে ভালই জানেন। ছেলেকে কতটা বলবেন, আগ্রহের আতিশয্যে ওই স্বপ্নের ওপর কতটা রঙ চড়াবেন, তাও অনায়াসেই আঁচ করতে পারেন তিনি। উদ্দেশ্যের

প্রথম পর্যায় সম্পন্ন হল। পরেরটুকু ধীরেসুস্থে পরে করবেন।

পরে বলতে খুব বেশি সময় নিলেন না। রোজ সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি ফেরেন, সেদিন একটু রাত করে বাড়ি ফিরলেন। তার খানিক বাদে স্ত্রীর সামনেই রাধানাথকে ডেকে পাঠালেন।

বক্র চোখে ছেলের মুখখানা একবার দেখে নিয়ে গড়গড়ায় টান দিয়ে নিলেন গোটাকতক।—তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে শুনেছ?

সবিনয়ে মাথা নাড়ল। কতখানি শুনেছে সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন মহেশ্বর দত্ত। স্বপ্নের কথা উল্লেখও করলেন না। কিন্তু ভিন্ন পথে সেই রহস্যই ঘন করে তুললেন আরো।—আচার্য ঠাকুরের বাড়ি গেছলুম, তিনিও সব দেখেশুনে বললেন, অতি সুলক্ষণা আর অতি তেজস্বিনী মেয়ে। এমন মেয়ে ঘরে আনতে পারা ভাগ্যের কথা, নামে চণ্ডী রূপে চণ্ডী গুণে চণ্ডী। মোট কথা তোমার মনে রাখা দরকার এ তোমার আগের বউ নয়।

বিয়ের আনন্দ মাথায় ওঠার উপক্রম রাধানাথের। সকালে মায়ের মুখে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনেছে, রাতে এই।

মহেশ্বর দত্ত এবারে নিশ্চিন্ত অনেকটা। ক্ষমাযোগিনীর কথামত চণ্ডীর কোপের সম্ভাবনা গোড়া থেকেই দূর করতে চেষ্টা করেছেন। ছেলের আগের বউ মরার কথা তুলেও যোগিনী উপকারই করেছে। চণ্ডীবউ যে মালতীবউয়ের মত হবে না, সেটা ছেলের তো বটেই, ছেলের মায়ের মনেও গেঁথে দেওয়া দরকার ছিল।

কারণ, মালতীবউ রোগে ভুগছিল বটে, কিন্তু রোগে ভুগে মরে নি।

মালতীবউ মরেছে রোগ-নিরসনের বিষাক্ত মালিশের ওষুধ খেয়ে।

॥ ৬ ॥

বিয়ে হয়ে গেল।

রাধানাথের দ্বিতীয় বিয়েতে ঘটা প্রথম বিয়ের থেকে বেশি ছাড়া কম হল না। বিয়ের খবর আর আমন্ত্রণ গাঁয়ের মানুষদের কাছে খানিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে এসেছে। তাদের ঘোঁট পাকাবার মত বা জল্পনা-কল্পনায় মেতে ওঠার মত সময় দেন নি মহেশ্বর দত্ত। হাতের কাছে প্রথম যে দিন সেই দিনই বিয়ে স্থির করেছেন।

বিয়ের এই চটকের জন্যেও প্রস্তুত ছিল না করণের মানুষ। কারণ তারা শুনেছে ছাপোষা কর্মচারীর ঘরের মেয়ে আনছেন দত্তপো। দেনাপাওনার প্রশ্ন নেই। একজন মনিবের ঘরে মেয়ে দিয়ে কৃতার্থ, আর একজন বউ-মরা ছেলের জন্যে বউ এনে নিশ্চিন্ত। বিয়ের দিনও মহেশ্বর দত্ত বরযাত্রীর ঝাঁক নিয়ে আসেন নি। ছেলের বাছাই-করা জনাকতক বন্ধু আর আত্মীয়-পরিজন নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছেন।

তারপর থেকে মহেশ্বর দত্ত শুধু দেখে যাচ্ছেন, আর পরম তুষ্টিতে মৃদু মৃদু হাসছেন। ছাদনাতলায় বরকর্তার সম্মানিত আসনে বসে আড়চোখে ছেলের শুভদৃষ্টির ব্যাপারটা পর্যন্ত লক্ষ্য করেছেন। মা-চণ্ডীর মুখের ঘোমটা সরিয়ে চিবুক তুলে ধরার

সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখখানা দেখে হেসেই ফেলেছিলেন তিনি। মেয়ের মুখ দেখার পর ছেলের মুখের দিকে কারো চোখ নেই, নইলে হাসিরই ব্যাপার হত। ছেলের দু'চোখে পলকও পড়ে না, নামেও না।

ছেলের ওই হাঁ-করা মূর্তি দেখতেও আপত্তি নেই মহেশ্বর দত্তর। ভাবুক—প্রথম দেখা থেকেই ভাবুক চণ্ডীবউ মালতীবউ নয়। শুধু ছেলের মুখ নয়, মহেশ্বর দত্তর দৃষ্টিটা ঘুরে ঘুরে বরযাত্রীদের সকলের মুখই চড়াও করেছে। পরম তুষ্টিতে সেই মুখগুলিতেও অমনি নির্বাক কারুকার্য দেখেছেন তিনি।

তারপর দত্তবাড়ির উৎসব।

মহেশ্বর দত্তকে কিছুই করতে হয় নি। বরযাত্রী যারা গেছল, বউয়ের রূপের প্রচার তারাই করেছে। করণে এ-হেন রূপসী নেই একথা সকলে একবাক্যে ঘোষণা করেছে। সেই ঘোষণা অতি সহজে চারদিকে ছড়িয়েছে। রমণীর রূপ প্রসঙ্গে উদাসীন, করণে এমন বেরসিক নেই।

সেই রূপের খবর মদনমোহন ঘোষালের কানেও উঠেছে। তার গুরুদশা, ঘরের বার বড় হয় না। এগারো দিনের ক্রিয়াদি হয়ে গেছে। তখনও মহেশ্বর দত্ত এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থেকে দেখাশুনা করে গেছেন। রাধানাথের নতুন বউয়ের রূপের খবরটা শ্রীনাথই প্রথম এনে দিয়েছে তাকে।—দত্তমশাই যে ছেলের জন্য জ্যান্ত অপ্সরা ধরে এনেছেন শুনছি গো মদনমোহন!

বরযাত্রীদের মুখে শোনা বিয়ের পরের দিনের খবর এটা। তখনো চাক্ষুষ দেখে নি শ্রীনাথ।

শুনে স্বভাবসুলভ রসিকতাই করে ফেলেছিল মদন ঘোষাল, সব রূপ দেখে মাত হয়েছে না অপ্সরার নাচ দেখে?

হি-হি করে হেসেছে শ্রীনাথ।—নাচ এখনো দেখে নি, রূপ দেখে উল্টে নাচতে লেগেছে সকলে।

বিয়ে উপলক্ষে দত্তবাড়ির উৎসবে নেমন্তন্ন হয়েছে সকলের। কিন্তু গেলে মাতব্বরটি ক্ষুণ্ণ হবে কিনা তাই বুঝতে এসেছিল শ্রীনাথ।—যাই একবার তাহলে, দেখে আসি কেমন রূপসী, কি বলো?

মদন ঘোষালের স্নায়ু তখনো শোকের তারে বাঁধা। সেই শোকের সময় দত্তমশাই এসে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, এটা ভোলবার নয়। মদনমোহন তক্ষুনি মাথা নেড়েছে, যাবে বইকি, সকলেই যেন যায়, আমার কথা বোলো।

অতএব মদনমোহনের দলবলের সকলেই এসেছে। শ্রীনাথ ছিরে পাগলা হয়ে আসর মাত করেছে। গাঁজার রাজা সহায় ভট্ট সেজেগুজে এসে সভায় বসেছে। সকাল থেকে প্রস্তুত হয়ে মুন্‌কে ভট্চায সাঁঝের আগেই হাজিরা দিয়েছে। এদিকে আহারে বসবার আগে দত্তমশাই বউ দেখিয়েছেন সকলকে। তার ফলাফল অতিরঞ্জিত হয়ে মদন ঘোষালের কানে গেছে। যেমন, খেতে বসেও যে ছিরে পাগলা সর্বত্র আচমকা দু-চারটে কিম্ভূতকিমাকার ডাক ছেড়ে দশজনের হাসির খোরাক যোগায়—এবারে তা করে নি। গেঁজেল সহায় ভট্ট গাঁজা না খেয়েই নাকি সর্বক্ষণ ঝিম মেরে বসে ছিল। আর মুন্‌কে ভটচাযও ক'গণ্ডা লুচি, ক'সের মাংস আর কখানা বীরখণ্ডী উদরস্থ করেছে তার হিসেব রাখতে ভুলে গেছে।

নতুন বউয়ের রূপের প্রচার সব থেকে বেশি হয়েছে ওই মুন্‌কে ভট্‌চাযের মারফৎ। সেটা দু'দিন পরের ব্যাপার। উৎসবের রাত্রিতে খাটা-খাটনি যারা করেছে, তাদের আহার জুতসই হয় নি বলে সেদিন তাদের আলাদা করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন দত্তমশাই। সেই ব্যবস্থায় মুন্‌কেরও নেমন্তন্ন অবধারিত। নতুন বউকে দর্শনীয় ব্যাপারটা দেখাবার ইচ্ছেও স্বাভাবিক। জ্ঞাতিবর্গ আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে এই ভোজ-পর্ব। কর্তার ইচ্ছে অনুযায়ী নতুন বউকেও পরিবেশনে যোগ দিতে হয়েছে।

সকলেই ফুর্তি করে খাচ্ছিল, কিন্তু মুন্‌কে ভট্‌চাযের খাওয়াটা তেমন দর্শনীয় ভাবে জমে উঠচে না। অবশ্য যেটুকু জমেছে তাই দেখেই নতুন বউ ঘেমে উঠেছে। আর সেই খাওয়া দেখে তার গা-ও ঘুলোচ্ছে। কিন্তু আর দশজন এর থেকে অনেক চমকদার খাওয়া দেখে অভ্যস্ত।

মহেশ্বর দত্ত বললেন, কি হে ভট্‌চায, তোমার হল কি? রুচি নেই কেন, মাংসের একটা বালতিই যে খালি হল না এখনো?

কেউ বললে, ভট্‌চাযের পরশুর খাওয়াটাই এখনো ভালো করে তল্ হয় নি বোধ হয়।

কেউবা মন্তব্য করলে, বয়েস তো হচ্ছে, কতকাল আর পারবে?

শেষে মরীয়া হয়েই মুন্‌কে ভট্‌চায বলে বসল, যদি অনুমোদন করেন, একটা নিবেদন করি—

দত্তমশাই উদ্‌গ্রীব তক্ষুনি, বলো বলো—রান্না ভালো হয় নি নাকি?

আজ্ঞে অমৃততুল্য রান্না হয়েছে

তবে? তবে?

সকলের জোড়া জোড়া চোখ মুন্‌কের দিকে ছুটেছে। মুন্‌কের অপরাধী গোছের দৃষ্টি নতুন বউয়ের দিকে। ঢোঁক গিলে ভয়ে ভয়ে মনের কথা ব্যক্ত করল।—মা-লক্ষ্মীকে দয়া করে এখন একটু বিশ্রাম কবতে যেতে বলুন। সকলে মা-কে দেখছে আর খাচ্ছে, ওদের মত আমারও মনোযোগে একটু ব্যাঘাত হচ্ছে হুজুর, খেতে খেতে কেবলই মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ মা-দুগ্‌গা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। খেতে কিন্তু-কিন্তু লাগছে।

চণ্ডীবউ রক্তবর্ণ। অন্য সকলে বিমূঢ় কয়েক মুহূর্তে। তার পরেই কর্তার অট্টহাসিতে সচকিত সকলে। মহেশ্বর দত্তর মত এত খুশি আর কেউ নয়। তাঁর ইঙ্গিতে দত্ত-গৃহিণী বউ নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলেন। চণ্ডীবউ বাঁচল, আর ওদিকে নতুন উদ্যমে আহারে মন দিল মুন্‌কে ভট্‌চায।

কৌতুকের ব্যাপারটা গ্রামসুদ্ধ লোকের জানতে বাকি থাকল না। গত দিনে বন্ধুদের মুখে শুনে যতটা না হোক, এই প্রহসন শোনার পর রাধানাথের বউ দেখার লোভ মদন ঘোষালের সত্যিই হয়েছিল।

এই গেল গোড়ার দিকে চণ্ডীবউয়ের রূপের খ্যাতি। তার বুদ্ধির দিকটাও চাপা থাকল না বেশি দিন। করণের রসিকজনদের কাছে যে গুণের সব থেকে বেশি দাম। নতুন বউয়ের বুদ্ধি যাচাইয়েব রীতি প্রচলিত সব ঘরে। বাড়ির আর প্রতিবেশী দশজন এয়ো মিলে শলা-পরামর্শ করে বউ ঠকাবার ফাঁদ পেতে থাকে। রীতিমত পরীক্ষার ব্যাপার এটা। সেই পরীক্ষা আরো জোরালো হল, কারণ বউয়ের রূপের

ওজন প্রতিবেশিনীদের ছেড়ে রাধানাথের বোনেদের চোখেও একটু বেশিই মাত্রা ছাড়িয়েছে। অতএব এবারে কোমর বেঁধে লাগল সকলে। দত্তগৃহিণী সায় না দিন, বাধাও দিলেন না। কারণ তিনি মা, বউয়ের অত রূপ দেখে আর সেই রূপ নিয়ে এত আড়ম্বর হবার ফলে শুধু তাঁর বুকের তলাতেই এক-একবার একটা অশুভ ছায়া পড়-পড় হয়েছে। অবশ্য পড়ার আগেই সেটা তাড়িয়েছেন তিনি। তবু স্বামীর স্বপ্নের ব্যাপারটা ভুলতে পারেন নি। বউ দেখার পর স্বপ্নের সেই বচন অনেকবার মনে পড়েছে---'এই মুখ থেকে হাসি যেন কখনো না সরে'। কিন্তু মেয়েদের মুখে সত্যিকারের হাসি যে ফোটাতে পারে, সেই নিজের ছেলেটিকেও তো বিলক্ষণ জানেন তিনি। শুভকর্মের দিনও মালতীবউয়ের শুকনো বিষণ্ণ মুখখানা বার বার চোখে ভেসেছে তাঁর। তার মুখে অন্তত হাসি ফুটতে দেখেন নি কখনো। গোচরে হোক বা অগোচরে হোক, স্বামীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত মনে পড়তে আসলে ছেলের জন্যেই আশঙ্কা তাঁব। থেকে থেকে এমনও মনে হয়েছে, বউ এতটা রূপসী না হলেই বা কি এমন হত! অতএব নিজের মেয়ে আর এয়োদের বুদ্ধির পরীক্ষায় নতুন বউ নাজেহাল হলে যেন ভারসাম্য কিছুটা বজায় থাকবে।

ঠকাবার মত দুটো মোক্ষম জালই বিস্তার করা হয়েছিল চণ্ডীবউয়ের সামনে। সেই জাল যে এভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হযে যেতে পারে সেটা মেয়েরা ছেড়ে শাশুড়ীও আশা করেন নি। ওই দুটোর মধ্যে একটাব ওপরে অন্তত প্রগাঢ় আস্থা ছিল সকলের। কিন্তু দুই ব্যাপারেই শুধু মুখ চাওয়া চাওয়ি করা ছাড়া আর কিছু করাব ছিল না তাদের।

মেয়ে আর এয়োদের প্রথম আক্রমণটা অতর্কিত। দ্বিরাগমনের পর বউ বাপের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পরদিনই ননদেরা ভালো মুখ করে এসে সংবাদ দিল, পাড়ার এয়োরা কয়েকজন তোমার রান্না খেতে চেয়েছে, রাঁধতে জানো?

চণ্ডীবউ খুশি মনে ঘাড় দুলিয়েছে, জানে। বাপের বাড়ির বিমাতা তো তাকে এগারো বছর বয়সেই হেঁসেলে ঠেলেছিল। অতএব দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

এয়োরাও ততক্ষণে দল বেঁধে এসে জুটেছে। ননদেরা তাদের সুসংবাদ জানিয়েছে, তোমাদের ভাবনার কারণ নেই, আমাদের বউ রাঁধতে জানে। বউকে বলেছে, হেঁসেলে এসো তাহলে, আমরাই সব গোছগাছ করে দিচ্ছি---বেশী কষ্ট করতে হবে না, দুই-একটা পদ রাঁধো, তারপর সকলে মিলে করে-কম্মে নেব'খন, নইলে বাবা আবার বলবে আগুনের তাতে বউয়ের রূপ গলে গেল!

তাকে বান্নাঘরে নিয়ে এসে কুটনো কুটে বাটনা বেটে সব আয়োজন টায়োজন করতে বলে তারা এয়োদের সঙ্গে একটু গল্প করতে গেল। আয়োজন হতে হতে তারা ফিরে আসছে জানালো। নতুন বউ তখন সামনে কি আছে না আছে দেখতে ব্যস্ত। আছে সবই। ননদেরা সেই ফাঁকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে চুপিসাড়ে এধারের দরজাটা টেনে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল লাগিয়ে চলে গেল।

প্রথম যে সামগ্রীটি তাকে রাঁধতে বলা হয়েছে তার ব্যবস্থা করে চণ্ডীবউ মশলা গুছিয়ে বাটনা বাটতে বসল। কিন্তু জল আনতে গিয়ে দেখে বালতিতে জল নেই, কলসীতে জল নেই, ঘটিতে জল নেই। তার পর জলের খোঁজে বেরুতে গিয়ে প্রথম ধাক্কা খেল। বেরুবার একটাই দরজা, সেই দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। গোটা

ব্যাপারটা স্পষ্ট হতে সময় লাগল না। জল ছাড়া মশলা হবে না, অর্থাৎ গোড়ার আয়োজনই হবে না।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে চণ্ডীবউ ঘরের সামগ্রী সব দেখতে লাগল। দু'চোখ ঘুরে ঘুরে ঘরের আনাচ কানাচ সন্ধানে রত হল। ঘরের এক কোণে রয়েছে গোটা দু'তিন কলাগাছের খোড়। এইবার ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক দিল। সে ক'টা এনে কলার শাঁসের গোছাগুলো আলাদা করে কুটে নিল। তার পর হাতে করে সেগুলো টিপে টিপে জল বার করে বাটনা বাটতে লাগল। আধঘন্টা বাদে ননদেরা আর এয়োরা দরজা খুলে বউ জব্দ করতে এসে নিজেরাই হাঁ। গুরুজন ননদিনীদের দেখে মাথার ঘোমটা আরো চার আঙুল টেনে দিয়ে বউ বলল, মশলাগুলো বাটা হয়ে গেলে রান্না করতে বেশি সময় লাগবে না।

পরের ষড়যন্ত্রে বউ ঠকানোর কৌতুকের থেকে তাকে জব্দ কবার বাসনাই ছিল বেশি। আগের ব্যাপারে বউটার রূপ আছে বুদ্ধি নেই এটুকু বলতে পরলেই ননদেরা খুশি থাকত। সেটুকু হল না বলেই তাদেরও " চাপল। তার ওপর বাবার হাসি দেখে ভিতরে ভিতরে মেয়েদেরও গা জ্বলছে। 'উ ও রকম বুদ্ধির পরিচয় দিতে পেরেছে সেটা যেন তাঁরই কৃতিত্ব। অতএব পাড়ার দুই-একটি বউয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোমর বেঁধে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। কিছুটা নির্দয় দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করল তারা।

পাড়ায় পাঁচালি গান হবে সেই রাত্রিতে। তার থেকেও বড় আকর্ষণ গান গাইবে গান-বিলাস। করণের সব থেকে নামকরা সংগীতজ্ঞ গান-বিলাস। ওটা ভদ্রলোকের উপাধি, ওই নামেই সর্বত্র পরিচিত। আসল নাম বললেই হয়ত কেউ চিনবে না। পাড়ার আসর, অতএব রাধানাথ একজন পাণ্ডা। তার রাতে বাড়ি ফেরার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এই সুযোগটাই তার বোনেরা নির্মমভাবে আঁকড়ে ধরল।

মা-কে জানিয়ে দিল বউকে নিয়ে তারা পাঁচালি আর গান-বিলাসের গান শুনতে যাবে। মায়ের আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। বেশির ভাগ ঘরের মেয়েরাই গিয়ে থাকে, চিকের আড়ালে মেয়েদের আলাদা জায়গা হয়।

দুই বোনের একজনন পিছনের বাগান থেকে চুপি চুপি কিছু শুষনি আর ব্রাহ্মী শাক তুলে আনল। সেগুলো থেঁতলে রস নিঙড়ানো হল। দুটো বস্তুই ঘুমের অনুপান। তার সঙ্গে নিদ্রাসহায়ক আরো কিছু যুক্ত হল। তারপর সেই বস্তু নতুন বউয়ের দুপুরের আহারের সঙ্গে মিশিয়ে তার আহারপর্ব নির্বিঘ্নে মেটানো গেল। বাড়ির গিন্নী মেয়েদের ব্যাপারটা ঠিকই আন্দাজ করলেন, কিন্তু না-বুঝি না-বুঝি করে থাকলেন তিনি। কারণ বুঝলে বিবেকের খাতিরেও তাঁর বাধা দেওয়া উচিত।

দুপুরে পাড়ার দু'টি বউ আর দুই ননদ চণ্ডীবউয়ের ঘরে ঢুকল গল্প করতে। গল্পের বিষয়বস্তু পাঁচালি গান আর গান-বিলাসের গান। খানিকক্ষণের মধ্যেই বউয়ের ঢুলুনি এলো, কিন্তু সেটা সে গোপন করতে চেষ্টা করল। তবু একটি বউ টিপ্পনী কাটল, কি গো, চোখ ছোট হয়ে এসেছে কেন, ঘুম পাচ্ছে নাকি? আমরা যাই তাহলে—

এক ননদ অমনি ফোড়ন দিল, আহা দুধের মেয়ে তো, আমরাই না হয় ওই

বয়সে ছেলের মা হতে গেছি, তা বলে সোনার অঙ্গে কি ধকল সয়! চলো গো, চলো—

চণ্ডীবউ শশব্যস্তে মাথা ঝাঁকালো, তার একটুও ঘুম পাচ্ছে না।

পাচ্ছে না যখন তখন আর বসতে আপত্তি কি! এদিকে শরীরটা ক্রমেই যেন বেশি অবশ লাগছে চণ্ডীবউয়ের। এক ছুতোয় উঠে গিয়ে চোখে-মুখে ভালো করে জলের ঝাপটা দিয়ে মুখ মুছে আবার এসে বসল। বাকি চারজন সেটা বুঝেও বোকা সেজে থাকল।

তারা উঠল যখন বেলা গড়িয়েছে। একটু গড়িয়ে নেবার ফুরসতও আর নেই। যাই হোক, বিকেলে ভালো করে গা ধোয়ার পর তখনকার মত ঝিমুনি ভাবটা গেল। রাত্রের খাওয়া দাওয়াও তাড়াতাড়ি মিটল। অতঃপর আসরে রওনা হবার তাগিদ। চণ্ডীবউয়ের খুব একটা জুত লাগছিল না। কিন্তু ছেলেমানুষ, যাবার লোভ ষোল আনা। তাছাড়া ঘুম পাচ্ছে বলে না যাওয়াটা চারগুণ লজ্জার ব্যাপার। ভালোমত গয়নাগাঁটি পরিয়ে ননদেরা বেশ করে সাজিয়ে টাজিয়ে দিলে বউকে। কত বাড়ির মেয়েরা আসবে, মান-মর্যাদার প্রশ্ন আছে।

বেরুবার আগে এক ননদ বউকে বলল, ঘরে তালা দাও, রাধা তো আজ আর ফিরছে না, যে চোর-ডাকাতের রাজ্য—

দরজার আঙটায় বড় একটা করে তালা ঝোলানই থাকে। চণ্ডীবউ ঘর তালাবন্ধ করে চাবির গোছা পিঠে ফেলল। তারপর খুশিমনে শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করে নীচে নামল। সেই ফাঁকে আর এক ননদ চুপি চুপি এসে দরজার ওই তালার আঙটায় আর একটা বড়সড় তালা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এদিকে পথে নেমেই ননদেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল, বাবার শরীরটা ভালো নয়, বাড়ির ঝিটাকে সুদ্ধু নিয়ে আসা উচিত হল না বোধ হয়। ঝি বলতে তখন চণ্ডীবউয়ের খাস ঝি প্রসন্নময়ী নয়, আর একজন।

অন্য ননদ বলল, জামাই-কোঠায় জামাইরা তো থাকল, দরকার হলে তাদের ডাকবে।

জামাইদের রেখে আসাটাও যে ষড়যন্ত্রের অন্তর্গত সেটা জামাই বেচারারাও জানে না। তাদের থাকতে হুকুম করা হয়েছে বলেই তারা বাড়িতে আছে। শ্বশুরালয়ে জামাইদের সম্মান যত, অন্তরঙ্গ-যোগ ততো নয়। শ্বশুরবাড়ির অন্তঃপুর থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন। বর্ধিষ্ণু পরিবারে তাদের জন্য পৃথক জামাইকোঠা থাকে—সেখানেই অবস্থান তাদের। বউ আসে রাত্রিতে।

পাঁচালি পর্ব শেষ হতে-না-হতে ঘুমের তাড়ায় আর দু'চোখ খুলে রাখতে পারছে না চণ্ডীবউ। বার বার ঢুলুনি আসছে। ননদেরা এক-একবার এক-একজন চিমটি কেটে সজাগ করছে তাকে। বউয়ের ছেলেমানুষি দেখে তারা যেন অপ্রস্তুত হচ্ছে। বার বার লজ্জা পাওয়া সত্ত্বেও চণ্ডীবউয়ের নাজেহাল অবস্থা। শেষে গান-বিলাসের গান শুরু হতে সোজা হয়ে বসাই দায়। এ-রকম লজ্জাকর ঘুমের কবলে চণ্ডীবউ কোনদিন পড়েছে কিনা সন্দেহ। কি যে করবে সে ভেবে পাচ্ছে না!

শেষে চুপি চুপি এক ননদকে বলেই ফেলল, শরীরটা কি রকম যেন লাগছে, বসতে কষ্ট হচ্ছে, ঝিয়ের সঙ্গে বাড়ি চলে যাবে।

জবাবে চাপা গলায় ননদ গজগজ করে উঠল, কিছুই হয় নি, আসলে তোমার ঘুম পেয়েছে, চলো—

ইশারায় অন্য ননদকে ডেকে অপরাধিনী চণ্ডীবউকে নিয়ে ওঠা হল। এই রাতে ঝিয়ের সঙ্গে তো আর নতুন বউকে ছেড়ে দিতে পারে না—বাড়ি দু'তিন মিনিটের পথ তাতে কি! আদরের বউকে ঝিয়ের সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শুনলে বাবা মেয়েদের ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার কববে। অতএব বউকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েই তারা আবার আসরে চলে আসবে। ছেলেমানুষ বাড়িতে ঘুমুলেই তো হত, আসার শখ কেন?

এসব অনুযোগ-অভিযোগ শুনতে শুনতেই চণ্ডীবউ বাড়ি পৌঁছুল। লজ্জার মাথা খাওয়া এমন ঘুম তার কেন পেল ভেবে পাচ্ছে না। সিঁড়ির কাছে তাকে ছেড়ে দিয়ে একজন বক্রঝাঁজে জিজ্ঞাসা করল, এবারে নিজে উঠে যেতে পারবে তো, নাকি বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে আসতে হবে?

চণ্ডীবউ তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, পারবে।

যাও তাহলে, ঘুমোও গে। বাবার শরীর খারাপ, পা-টিপে যেও, খবরদার তার ঘুম যেন না ভাঙে।

উভয়ে প্রস্থান করল। চণ্ডীবউ দোতলায় উঠল।

বারান্দায় ডিম্-করা হারিকেন জ্বলছে। সেটা আর বাড়ানো দরকার বোধ করল না। নিজের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। চাবি দিয়ে দরজার তালা খুলতে গিয়েই বিষম ঝাঁকুনি একটা। সেই মুহূর্তে ঘুম কোথায় ছুটে গেল ঠিক নেই।

দরজায় ডবল তালা ঝুলছে। তার কাছে একটার চাবি।

সেটা খুলল, অন্য তালাটা ধরে নাড়াচাড়া করল। তার পরেই বুঝল কোন ফাঁদে ফেলা হয়েছে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে দুপুর থেকে যেন অমন অস্বাভাবিক ঘুম পেয়েছে, কেনই বা আজই দুপুরে ননদেরা অন্য বাড়ির বউ নিয়ে তার ঘরে গল্প জমাতে এলো—সব জলের মত পরিষ্কার।

কিন্তু চণ্ডীবউ করবে কি এখন!

রাগে গা জ্বলছে। ঘুম মাথায় উঠেছে। অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করল বারকতক। শ্বশুরের দরজায় ঘা দেওয়া বাড়ির বউয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক ব্যাপার। তার ওপর ননদেরা শুনিয়ে রেখে গেছে তিনি অসুস্থ। বারান্দায় পড়ে ঘুমুতে পারে কিন্তু ভোর না হতে ননদেরা এসে নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে—রূপসী বউ সকলের চোখের ওপর বারান্দায় ঘুমলো—এমন হায়াখাকী ঘুম চোখ থেকে বিদায় করে বসে থাকা যেত না!

বার-দুই নিঃশব্দে বারান্দায় পায়চারি করল চণ্ডীবউ। হারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে দেখল, আনাচে-কানাচে কোথাও চাবি ঝোলানো আছে কিনা। নেই।

ক্ষোভে-দুঃখে চণ্ডীবউ দোতলার সিঁড়ির পাশ দিয়ে সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। অদূরে আসর থেকে গানের রেশ কানে আসছে। আবার সেখানেই চলে যাবে কিনা ভাবছে। কিন্তু তাতেও কান ঝালাপালা করে দেবে ননদেরা। কত রকম শোনাবে ঠিক নেই।

হঠাৎ সচকিত হয়ে পিছনে সরে দাঁড়াল তাড়াতাড়ি। ফিস ফিস কথা বলতে

বলতে দুই ননদ ফিরে এসেছে। আসরে যাওয়াটাই ছল। খানিক অপেক্ষা করে ফিরছে। এবারে যে-যার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে। ওপরে উঠবেও না। চণ্ডীবউ সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল খানিক। তাই হল। ওপরে কেউ এলো না।

আবার খানিকক্ষণ বারান্দায় ঘুরে বেড়ালো সে। আবারও ঘুম পাচ্ছে। কি করবে এখন? নীচে জামাই-কোঠায় গিয়ে কড়া নাড়বে? বাড়ির বউয়ের পক্ষে সেটাই সব থেকে বেশি লজ্জার ব্যাপার হবে। কারণ তাদেরও নিশ্চয় শেখানো আছে, বেরিয়ে এসে বলবে ঘরে কেউ নেই—চণ্ডীবউ তো আর বলতে পারবে না, সে-ঘরে ঢুকে দেখবে আছে কি নেই! নিজের চোখে ননদদের ফিরতে দেখেছে বললেও অস্বীকার করলেই হল। পরের দিন আর দেখতে হবে না। রাতদুপুরে নন্দাইয়ের ঘরে এসে কড়া নাড়া! রূপসী বউয়ের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে ঘোঁট পাকাতে বসবে ননদেরা। আর নিজেরাও যদি দরজা খোলে, কক্ষনো স্বীকার করবে না তক্ষুনি ফিরেছে বা বউ তাদের দেখে দরজা ঠেলেছে। বলবে, হঠাৎ ফিরেছে, আর বউ আন্দাজে দরজা ধাক্কা দিয়েছে—ফিরেছে কিনা দেখার জন্যে। যদি না ফিরত তাহলে তো তাদের স্বামীরাই দরজা খুলত। তখন?

তখন বউকে ঘরে টেনে নিয়ে তাকে গিলে খেলেও স্বামীদের অপরাধ হত না বোধ হয়! মোট কথা, রাতদুপুরে জামাই-কোঠার দরজা ধাক্কা দেওয়াটা ঘরের বউয়ের পক্ষে অভাবনীয় ব্যাপার।

কি ভেবে চণ্ডীবউ শ্বশুরের বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল খানিকক্ষণ।

এইখানেই ননদদের ষড়যন্ত্রে ছোট একটু ভুল থেকে গিয়েছিল। প্রথমত, তাদের বাপের শরীর আদৌ খারাপ হয় নি। দ্বিতীয়, তাঁর ঘুম পাতলা। তৃতীয়, বাইরের ও-রকম আসর-টাসরের রাতেই একটু বেশি সজাগ থাকেন তিনি, কারণ এই সব রাতেই বাড়িতে ডাকাত বেশি পড়ে। চণ্ডীবউয়ের মনে পড়েছে, শ্বশুরটি অতিরিক্ত সাবধানী।

ঘরের মধ্যে গলা-খাঁকারির শব্দ কানে আসতেই বউ সচকিত। সরে এসে দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে ভাবল একটু। মতলব মাথায় এলো। হারিকেনটা তুলে আলো বাড়ালো। দ্রুত বারান্দার এমাথা-ওমাথা করে খুঁজল কি। দু'টো ভাঙা ঘটের টুকরো আর একটা কাঠের টুকরো কুড়িয়ে পেল। তাড়াতাড়ি হারিকেনটা আগের মত নিষ্প্রভ করে জায়গামত রাখল।

সামনের উঠোনের ওধারে নীচের রান্নাঘরের টিনের চালা। একটা টুকরো সেই চালার উপর ছুঁড়ে দিল। নিঝুম রাতে বেখাপ্পা শব্দ হল একটু। খানিক অপেক্ষা করে দ্বিতীয় দফায় আরো একটু জোরে ছুঁড়লো। শব্দ এবারে আরও একটু বেশি হল।

তৃতীয়বারের আর দরকার হল না। শ্বশুরের ঘর থেকে খড়মের চাপা শব্দ কানে এলো। তাড়াতাড়ি চণ্ডীবউ হারিকেনটা হাতে তুলে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। মহেশ্বর দত্ত দরজা খুলেই দেখলেন, বউ লণ্ঠনের আলো বাড়াচ্ছে। তিনি এগিয়ে এলেন—

ও তুমি! কখন ফিরলে—কি একটা শব্দ হল না?

নিরুপায় চণ্ডীবউ মাথা নাড়ল একটু। মহেশ্বর দত্ত তার হাত থেকে লণ্ঠন নিয়ে টিনের চালার দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। কিছু চোখে পড়ল না। বললেন, বেড়াল-টেড়াল হবে। তুমি শুয়ে পড়গে যাও, কিছু ভয় নেই, আমি জেগে আছি—

বউ তখনো দাঁড়িয়ে আছে দেখে খটকা লাগল।—কি হল?—ও, ঝি'টা ফেরে নি বুঝি?

চণ্ডীবউ তাড়াতাড়ি বলল, ও এক্ষুনি আসছে—এই এতগুলো গয়না—মা বার করে দিয়েছিলেন—আপনার কাছে থাকলে ভালো হত...

মিথ্যে বলে নি। মেয়েদের তাগিদে শাশুড়ীই বার করে দিয়েছেন। লণ্ঠন তুলে বউয়ের এক-গা গয়না দেখলেন মহেশ্বর দত্ত। মনে মনে গিন্নীর উপর বিরক্ত হলেন আর বউয়ের বিবেচনার প্রশংসা করলেন।

এসো।

সঙ্কোচ-ভরা মুখ করে চণ্ডীবউ অনুসরণ করল তাঁকে। ঘরে শাশুড়ীর নাক ডাকছে, তাঁর আবার ঘুম বেশি। মহেশ্বর দত্ত ভাবলেন একটু, এত গয়না বাইরের দেরাজে রাখা ঠিক হবে না—রাত থাকতে উঠে তিনি আবার হাঁটতে বেরিয়ে যান। চাবির বড় গোছা থেকে একটা চাবি দেখিয়ে বউয়ের হাতে দিয়ে বললেন, ওই তোরঙ্গটাতে রাখো—

বউ বাক্স খুলল। তারপরই শ্বশুরের ঈষৎ-বিস্মিত চোখের ওপর দিয়েই চাবিসুদ্ধু চট্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মহেশ্বর দত্ত স্বাভাবিক যা তাই ভাবলেন। তাঁর চোখের সামনে বসে বউ গা থেকে গয়না খুলতে লজ্জা পাচ্ছে। আর নিজের ঘর থেকে হয়ত আরো কিছু গয়না আনতে যাচ্ছে।

দুর্গা-নাম স্মরণ করে চণ্ডীবউ দ্রুত নিজের ঘরের দরজার তালায় একে একে চাবি চালালো। দ্বিতীয় চাবি শ্বশুরের এই চাবির গোছাতেই থাকা সম্ভব। তাই ছিল। তালা খুলল। থমকালো এক মুহূর্ত। পরক্ষণে দুটো তালা নিয়ে চোখের নিমেষে নীচে নেমে গেল। সোজা জামাই-কোঠার বন্ধ দরজার সামনে। খুব সন্তর্পণে দু'ঘরে দু'টো তালা আটকে দিয়ে প্রায় ছুটেই ওপরে উঠে এলো। পাঁচ মিনিটও লাগল না। বাইরে থেকে জামাই-কোঠা বন্ধ করার জন্য এবারে আর চাবি খুঁজতে হয় নি, একটার চাবি নিজের কাছেই, শ্বশুরের চাবিও অন্য তালাটায় গোঁজাই ছিল।

গয়না তোরঙ্গে রেখে শ্বশুরের চাবির গোছার সঙ্গে নিজের চাবিটাও নীরবে তাঁর হাতে জিম্মা করে দিয়ে তেমনি বিনীত মুখে প্রস্থান করল। নিজের ঘরে এসে ভিতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে একেবারে বিছানায়। ঘুমোবে কি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে চণ্ডীবউ।

পরদিন সকালে হৈ-চৈ ব্যাপার বাড়িতে। জামাই-কোঠার দু'ঘরই বাইরে থেকে তালা-বন্ধ। না পারছে মেয়েরা বেরুতে, না জামাইরা। শাশুড়ী হতভম্ব। কর্তা সকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন, তাঁর পকেটে চাবি। দরজায় তালা কে দিলে!

এদিকে চণ্ডীবউয়ের ঘরের দরজায় ঝি ধাক্কা দিয়ে দিয়ে হয়রান। একে বেশি রাতের ঘুম, তার ওপর ননদদের ঘুমের ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া। চোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসল যখন, বাইরে থেকে দরজা ভাঙার উপক্রম।

মহেশ্বর দত্ত বাইরে থেকে এসে জামাই-কোঠার দরজা খুলে দিয়েছেন তবে মেয়ে-জামাইরা বেরোতে পেরেছে। কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক তিনি। মেয়েরা কেনো কথা বলে না, বাইরে থেকে কি করে ঘরে তালা পড়তে পারে সে সম্বন্ধেও নির্বাক তারা। বাবার চাবি বউয়ের হাতে গেল কি করে বিস্ময়ই কাটে নি মেয়েদের। ওদিকে বাড়ির কর্ত্রীটিও তখন পর্যন্ত রাত্রিতে বউয়ের গয়না রাখার ব্যাপার কিছুই জানেন না। ইতিমধ্যে ঝি ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিয়েছে, নতুন বউয়ের ঘরের দরজা বন্ধ, ডাকাডাকি ধাক্কাধাক্কি করেও সাড়া মিলছে না। কর্তা হন্তদন্ত হয়ে উঠে এলেন, আরও অনেকক্ষণের হাঁকাহাঁকির পর দরজা খুলল।

মহেশ্বর দত্তর মুখ গম্ভীর। জেগে দরজা বন্ধ করে বসেছিল বলেই ধারণা, আবার মুখ দেখে সে-রকমও লাগছে না।

জিজ্ঞাসা করলেন, শরীর খারাপ হয়েছিল?

বউ মাথা নাড়ল। শরীর খারাপ হয় নি।

মহেশ্বর দত্ত নিজের ঘরে চলে গেলেন। সবই গোলমেলে লাগছে। জামাই কোঠায় চাবি কে দিয়েছে সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন, কারণ রাতে বউয়ের চাবি নিয়ে বেরিয়ে যাবার কথাটা মনে পড়েছে। কিন্তু তবু অবিশ্বাস্য লাগছে তাঁর।

মেয়েদের ডেকে জেরা করতে ব্যাপার বোঝা যেতে লাগল। তাদের মুখ দেখেই তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। দুটো মেয়েরই বোবা-মূর্তি। মুখ তুলতেই চায় না, এমন সুবোধ মেয়ে তারা নয়! অতএব তাঁর জেরার মুখে সবই প্রকাশ হয়ে গেল। শাশুড়ী তবু গজগজ করে উঠলেন, কিন্তু রাতদুপুরে তা বলে জামাই-কোঠায় গিয়ে তালা দিয়ে আসবে! চাবি পেল কি করে?

কর্তা গম্ভীর। কিছু না বলে চণ্ডীবউকে ডেকে পাঠালেন। সে আসতে জিজ্ঞাসা করলেন, জামাই-কোঠায় তুমি তাহলে তালা আটকে এসেছিলে?

বউ ভয়ে মাথা নীচু করল।

কাল রাতে তুমিই কিছু ফেলে টিনের চালায় শব্দটা করেছিলে বোধ হয়?

মাথা আরো নীচু।

দরজা খুলছিলে না কেন? জেগে ঘুমুচ্ছিলে?

এবারে চণ্ডীবউ মাথা নাড়ল। মৃদু গলায় বলল, আমার খাবারের সঙ্গে কাল ঘুমের কিছু মেশানো হয়েছিল বোধ হয়...

মহেশ্বর দত্তর বিস্মিত দৃষ্টি মেয়েদের দিকে ঘুরল। কি মেশানো হয়েছিল তাও গোপন থাকল না।

তারপর বউকে যেতে বলে মেয়েদের ওপর রাগতে গিয়ে হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন তিনি। খুশি ধরে না। হাসি থামতেই চায় না। মেয়েদের বললেন, ঠিক হয়েছে, উচিত শিক্ষা হয়েছে তোদের! ওইটুকু মেয়ের সঙ্গে এরকম করতে লজ্জা করে না তোদের? মা আমার সাক্ষাৎ চণ্ডী, কিভাবে কিছু না বলে চাবি বার করে নিয়ে গেল—আমি ভাবলাম একা ঘরে অত গয়না নিয়ে সত্যিই বুঝি ভয় পাচ্ছে! কার সঙ্গে লাগতে গেছিস তোরা—তোদের যে বেচে আবার কিনে নিয়ে আসতে পারে!

তাঁরই মারফৎ দত্তবাড়ির রূপসী বউয়ের বুদ্ধির গল্প প্রথমে পাড়ায় ছড়াল, পরে

দেখতে দেখতে করণের সর্বত্র। করণের মানুষেরা রসের ভক্ত, রসিকতারও। বউ জব্দ করার অনেক প্রহসন জানে তারা, কিন্তু নতুন বউয়ের হাতে উল্টে এভাবে ননদ জব্দ হওয়ার নজির বড় নেই। শুনে ঘোষালবাড়ির মদনমোহন সরস মন্তব্য করল, মূর্খের বুদ্ধিমতী বউ—আমাদের রাধানাথও শেষে মনের দুঃখে বনে গিয়ে কালিদাস না হয়ে বসে হে!

অতটা না হোক, সকলকে বউয়ের বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ দেখে আর সব শুনে তাজ্জব বনেছে রাধানাথও। এ ক'দিন চেয়ে চেয়ে বউয়ের রূপই দেখেছে সে—সেই সঙ্গে এবারে বাড়তি আরো কিছু দেখছে। তার আনন্দ হয়েছে বটে, কিন্তু কোথায় যেন অজ্ঞাত অস্বস্তিও একটু। প্রাপ্যের থেকেও চোখে লাগার মত বহুগুণ বেশি পেয়ে গেলে যেমন লাগে অনেকটা সেই রকম লাগছে।

॥ ৭ ॥

বিয়ের দিনকতকের মধ্যে রাধানাথ অবধারিত ভুলের রাস্তায় পা বাড়িয়েছে।

ভুল একটা নয়, দু'দুটো। এক, নিজেই সে বউয়ের রূপ আর বুদ্ধির প্রতি বেশি সচেতন হয়েছে। দ্বিতীয় ভুল, রূপসী বুদ্ধিমতী বউকে শত্রু চোনাবার আগ্রহে নিজের অগোচরে শত্রুকে বড় করেছে।

দ্বিতীয় ভুলের খেসারত দূরের ব্যাপার।

আপাতত বউয়ের এত রূপ তার চোখ ধাঁধিয়েছে। কিন্তু সেটা সমস্যার কারণ হয় নি। রমণীর রূপ দখলের বস্তু, ভোগের বস্তু—অপরিণত বয়েস থেকেই রাধানাথ এই সত্য সার জেনেছে। এই রূপের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ গোলাপের গায়ে কাঁটার মত। সে কাঁটা দেখে হাত কেউ গোটায় না। সেটুকু থাকলেই বরং দখলের নেশা চড়ে, ভোগের তাড়না বাড়ে। রাধানাথও এই রীতির ব্যতিক্রম কিছু নয়। শুধুই একখানা রূপের ডালি পেলে সে এর থেকে বেশি খুশি হত এমন ভাবলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু নতুন বউয়ের বুদ্ধির চমক যত জোরালো হয়ে উঠল, অদৃশ্য কাঁটার অস্তিত্ব নিয়ে ততখানিই মাথা ঘামিয়ে ফেলল সে। ছন্দপতন ঘটতে লাগল এখান থেকেই।

নতুন বউয়ের হাতে দু'দুবার জব্দ হয়ে বোনেরা অন্তত খুশি হয় নি। আর শেষের জব্দ তো রামজব্দ! তার ওপর বাবার ওই হাসি দেখে আর ওই কথা শুনে গায়ে তাদের জলবিছুটি লেগেছে। অতএব মুখ মচকে তারা রাধানাথকেই এক হাত নিয়েছে। বড় বোন বলেছে, দেখেশুনে বাবা ভালো বউই এনেছে, তোর মত হাঁদারামকে আঁচলে পুরে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াতে পারবে!

ভাইটি যে হাঁদারাম, রাগের জ্বালায় এটা তার নয়া আবিষ্কার। মেজ বোন আবার তার ওপর দিয়ে গেছে। বলেছে, ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে কোন্ দুঃখে, একে খাটের পায়ায় বেঁধে নিজে ঘুরবে!

বলা বাহুল্য দুই বোনের উক্তিই শ্রবণকটু ঠেকেছে। রাধানাথের পুরুষকার কিছুটা আহত হয়েছে।

এর পর মদনমোহনের মন্তব্যও যথাসময়ে কানে এসেছে তার। বন্ধুভাবে শত্রুর মন্তব্য কানে তুলে দেওয়াই করণের রীতি। সে বলেছে, মূর্খের বুদ্ধিমতীর বউ—মনের দুঃখে রাধানাথও শেষে না বনে গিয়ে কালিদাস হয়ে বসে!

কালিদাস হয়ে বসার পরেও বিদুষী ভার্যার প্রতি কালিদাসের মনে কোনো ক্ষোভ ছিল কিনা রাধানাথ তা নিয়ে অবশ্যই মাথা ঘামায় নি। তার মাথা শুধু গরম হয়েছে। আর সেই গরম মাথা মনে মনে আর একজনের একটা মাথা ছিঁড়ে আনতে চেয়েছে। সেটা সম্ভব হয় নি বলেই নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছে। রূপসী নববধূর চোখে নিজেকে শুধু পুরুষ নয়, পুরুষোত্তম প্রতিপন্ন করার তাগিদ অনুভব করেছে। মালতীবউ তাকে দেখলে বলির পশুর মত কাঁপত। এও তো মেয়েই একটা, আপনিই সমীহ করে চলবে।

প্রবল পুরুষের অস্তিত্ব ঘোষণার যে-সব রীতি তার জানা, তার সব কটাই স্থূল। ফলে গোড়া থেকে সেই স্থূল দিকটাই অনাবৃত হয়ে পড়েছে। প্রথম থেকেই সে পুরুষের প্রভুত্বের দাপট বড় করে তুলতে চেয়েছে। বাবার সামান্য কর্মচারীর মেয়ে। রূপের জোরে এই ঘরে এসেছে। অতএব এই রূপের ওপর তার অবাধ অধিকার। অথচ অধিকার-বোধের সবলতা নিজেই সর্বদা বজায় রেখে চলতে পারে নি। না পারার পটভূমিটি প্রয়োজনমত স্বপ্ন-টপ্ন দেখে আর সময়মত তা প্রচার করে মহেশ্বর দত্তই প্রস্তুত করে রেখেছেন। এরই সঙ্গে এমন অপ্রত্যাশিত রূপের ছটা আর বুদ্ধির চমক যুক্ত হয়েছে। এত সব যোগাযোগের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার মত সবল পুরুষ নয় রাধানাথ। ফলে গোটা করণের মানুষ যে রূপসী নববধূটিকে নিয়ে কথা কইতে শুরু করেছে, তার ওপর অধিকার বিস্তারটা নিজের কাছেই সর্বদা অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে রাধানাথের। সেটা সম্পূর্ণ করার তাড়নায় তার আচরণ প্রায়ই ক্রূর হয়ে উঠেছে। আবার পরক্ষণে হয়ত ওই সামগ্রিক প্রভাবজনিত দুর্বলতার দরুন ভিতরে ভিতরে আপসের পথ খুঁজেছে।

দু'নৌকোয় পা দেবার ফলে রাধানাথের পুরুষকারের মুখোশটা খুলে যেতে খুব বেশি সময় লাগে নি।

সহিষ্ণু অবকাশে নিভৃতের যে সম্পর্কটা অনুরাগে পুষ্ট হতে পারে, রাধানাথ সেই ছলা-কলার ধার ধারে না। ফলে গোড়া থেকে এই সম্পর্কটাই নিতান্ত নগ্ন আর যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়েছে পঞ্চদশী চণ্ডীবউয়ের। মুখ বুজে সে যেন একটা অত্যাচার সহ্য করতে চেষ্টা করেছে শুধু।

কিন্তু রাধানাথ মনে মনে উৎফুল্ল। এ যেন তারই পৌরুষের প্রতিক্রিয়া। নিভৃতের এই অধ্যায়ে মালতীবউয়ের সঙ্গে চণ্ডীবউয়ের সে খানিকটা মিল আবিষ্কার করেছে। মালতীবউ ভয়ে কাঠ হয়ে যেত, সাদা হয়ে থাকত সারাক্ষণ। ডাকলে বলির পশুর মত অবাঞ্ছিত শয্যায় নিজেকে উৎসর্গ করত যেন। সেই ভয় দেখে রাধানাথ কোনো দিন খুশি হয় নি। উল্টে তার ফলে ঘর ছেড়ে বাইরের দিকে টান হয়েছিল তার। হাসিমুখে যারা সম্ভোগের উপকরণ সাজাতে পারে তাদের কথা মনে হলে বরং তার ধমনীর রক্ত বেশি চঞ্চল হত। কিন্তু এই একজনের প্রতিক্রিয়া অনুভব করে রাধানাথ আত্মপ্রসাদ লাভ করল। যদিও চণ্ডীবউয়ের ভয়টা মালতীবউয়ের মত নয় আদৌ, সে ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে না বা চোখের ইশারায় নিজেকে নিবেদন করতে

আসে না। তবু গোটা ব্যাপারটার মধ্যে রাধানাথ ভয়ই কল্পনা করেছে। করে খুশি হয়েছে, কারণ চণ্ডীবউ যে মালতীবউ নয় এ সত্যটা তার অন্য সব সময়েই মনে হয়। মালতীবউয়ের দুর্বলতা বা ভয় কল্পনা করতে পারলে তার খুশি হবারই কথা। অতএব, এই রূপসী বউয়ের বেলায় তার দখলের পৌরুষ দ্বিগুণ অনাচারী হতে চেয়েছে।

আর শুরু থেকেই চণ্ডীবউ তাকে এড়াতে চেষ্টা করেছে। এড়াতে চেয়েছিল মালতীবউও, কিন্তু সে চেষ্টা কিছু করে নি। কিন্তু চণ্ডীবউয়ের চেষ্টাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আর এই নিয়েই রাধানাথের স্নায়ু চড়তে লাগল মাঝেসাঝে।

ইয়ার-বক্সীদের সঙ্গে আড্ডা সেরে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই একটু রাত হয় রাধানাথের। ঘরে এসে দেখে বউ ঘুমে অচেতন। সেই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে রাধানাথ দ্বিধা করে নি। কিন্তু চণ্ডীবউয়ের ঘুম ভাঙতেই চায় না। এত ঘুম সত্যি কিনা এক-আধ সময় সেই খটকাও লাগে রাধানাথের। কিন্তু তার পরেও বেশি তাড়না করলে উল্টে মুখঝামটা দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছে নতুন বউ। সেই রাগের ঝাপটায় রাধানাথের পৌরুষ তখনকার মত অন্তত অনেকটাই স্তিমিত।

দিনকয়েক এরকম হতে তার মেজাজ বিগড়ল। তার ওপর পৌরুষ প্রতিষ্ঠার তাগিদ আছেই। সেদিন প্রাক-সন্ধ্যায় সেজেগুজে বেরুবার আগে বউয়ের উদ্দেশে প্রায় স্পষ্টই একটা হুমকি দিল সে। সার মর্ম, এসে যদি দেখে ঘুমিয়ে আছে তাহলে প্রথমেই গায়ে জল ঢালবে, বিছানাপত্র ভেসে যায় যাক, তারপর হেস্তনেস্ত কাণ্ড করবে।

শোনামাত্র পঞ্চদশী নববধূরও মেজাজ চড়ল, বলল, তাহলে আর বেরিয়ে কাজ কি!

সঙ্গে সঙ্গে স্থূল রসিকতার রসদ পেল রাধানাথ। জিজ্ঞাসা করল, এখনই দরজা বন্ধ করব বলছ?

জবাবে চোখ-মুখ কুঁচকে চার আঙুল জিভ বার করে একটা বড়সড় ভেঙচি কেটে উঠল চণ্ডীবউ। তারপর প্রস্থানের উদ্যোগ করল।

এখানেই মালতীবউয়ের সঙ্গে তফাৎ চণ্ডীবউয়ের, রাধানাথ সেটা অনুভব না করে পারে না। তবু রাগ না করতে পারলে মান থাকে না। শাড়ির আঁচলটা ধরে ফেলে থামালো তাকে। গম্ভীর অনুশাসনের সুরে বলল, যা বললাম মনে থাকে যেন।

গট গট করে সে-ই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এই পনের-বিশ দিনের মধ্যে আড্ডায় এসেও রাধানাথ মদ ছোঁয় নি। বন্ধুরা এই নিয়ে পাঁচকথা বলেছে, পাঁচরকম ঠাট্টা করেছে। মন্তব্য করেছে, এই মদ জলো, রাধানাথ এর থেকে ঢের ঢের কড়া মদে ডুবে আছে!

একেবারে মিথ্যে নয়, এই তরল বস্তুটির তৃষ্ণায় পাকাপোক্ত হয়ে ওঠেনি তখনো। কিন্তু সেদিন তার মনে হল, এই ক'দিন মদ না খাওয়ার পিছনে কি যেন একটা সঙ্কোচ কাজ করেছে। তাছাড়া আজ যেন একটু খেতে ইচ্ছে করছে। বন্ধুদের আগ্রহে সামান্য খেল। তার পরেই কেমন অস্বস্তি একটু। প্রথমে এলাচদানা চিবুলো, তারপর মশলা-পান আনিয়ে খেল। অস্বস্তি গিয়ে এবারে আর এক তৃষ্ণা উঁকিঝুঁকি

দিতে লাগল। আসার আগে বউয়ের রাগত মুখের জিভ-ভেঙচানোর দৃশ্যটা ভাবতে যেন ভালো লাগছে বেশ।

ওই ভালো লাগাটুকু একটা তাড়নার মতই শেষ পর্যন্ত বাড়িতে ঠেলে নিয়ে এলো তাকে। রাত কত সঠিক ঠাওর করতে পারল না, তবু তার ধারণা অন্য দিনের থেকে একটু আগেই ফিরেছে। আজ আদেশ অমান্য করবে মনে হয় না। আর করেই যদি, রাধানাথ গায়ে জল না ঢালুক, চোখে-মুখে আচমকা জলের ঝাপটা দিয়ে ঘুম যে ভাঙাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

খাবার ঘরে তার রাতের খাবার ঢাকা থাকে। কোনদিন খায়, কোনদিন খায় না। এ নিয়ে কেউ খোঁজখবর করে না। খাওয়ার ইচ্ছে থাকলে রাধানাথ বাইরে থেকে এসে সোজা খাবার ঘরে ঢোকে। আজও তাই করল। কিন্তু তারপর নিজের ঘরে ঢুকেই বিরক্তিতে দুই ভুরু কুঁচকে গেল তার। পালঙ্কে ধপধপে শূন্য শয্যা।

অর্থাৎ আদেশ অমান্য করে নি বটে, ওদিকের কোনো ঘরে মায়ের কাছে বসে আছে। গায়ের জামাটা ছুঁড়ে ফেলে রাধানাথ শয্যায় বসল।

কিন্তু যার জন্য প্রতীক্ষা তার দেখা নেই। প্রতিটি মুহূর্তের ওপর অসহিষ্ণুতার হাতুড়ি পড়তে লাগল। তারপর একসময় স্পষ্টই বুঝল রাধানাথ, যার জন্য প্রতিক্ষা সে আড়ি করেই আড়ালে সরে আছে। ধৈর্য গেল। হঠাৎ গোঁ ভরে উঠে ঠাস করে দরজা দুটো বন্ধ করে ভিতরের ছিটকিনি তুলে দিল। এবারে সে-ও শিক্ষা দিয়েই ছাড়বে। করুক মা-সুদ্ধু ডাকাডাকি!

এবারে শুয়েপড়েই কান খাড়া রাখল। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে দরজায় মৃদু ঘা পড়বে, তারপর নিরুপায় হয়ে জোরেই দরজায় ধাক্কা দেবে কেউ। কিন্তু রাধানাথ আজ সহজে নরম হবে না। আর দরজা খোলার পরেও এই অবাধ্যতার সমুচিত জবাবই দেবে।

কিন্তু অনেক দিন বাদে বিকেলে যে রসদটুকু পেটে পড়েছে, তার প্রভাবে কখন যে দু'চোখ জুড়ে বসল টের পেল না। রাধানাথ ঘুমিয়েই পড়ল একসময়।

ঘুমটা ভেঙে গেল খুব ভোরে। পাশের দিকে চোখে যেতেই হঠাৎ কেমন বিমূঢ় সে ভালো করে দু'চোখ রগড়ে নিয়ে দেখল সকালই হয়ে গেছে বটে। আর পাশে চণ্ডীবউ গভীর ঘুমে অচেতন তখনো।

কিন্তু তার ঘুমের ঘোর কেটে গেছে। উঠে বসেছে। তারপর নেমে এসে বন্ধ দরজাটা ভালো করে নিরীক্ষণ করেছে। দরজা যেমন বন্ধ করেছিল ভিতর থেকে তেমনি বন্ধই আছে। ঘরের চারদিকে তাকালো ভালো করে। বাইরে থেকে ভিতরে আসার কোনো রাস্তা নেই। তার মাথাটাই ঘুলিয়ে গেল কেমন, ঝুঁকে ঘুমন্ত বউয়ের গায়ে হাত রাখল একবার। জলজ্যান্ত মানুষটাই ঘুমুচ্ছে বটে। হঠাৎ বাবার স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ে গেল তার। কিন্তু দিনের স্পষ্ট আলোয় আজগুবী কিছুই বা ভাবে কি করে সে!

অগত্যা ঘুমন্ত বউকে ঠেলে তুলল।

আচমকা ধাক্কা খেয়ে চণ্ডীবউ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। রাধানাথ ঘুমের প্রথম আচ্ছন্ন ভাব কাটাবারও অবকাশ দিল না তাকে।—রাত্রিতে ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, তুমি ভিতরে ঢুকলে কি করে?

জবাব না দিয়ে মুখের দিকে খানিক চেয়ে রইল চণ্ডীবউ। নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্ক সজাগ হতে লাগল। ঘুম-ভাঙা-চোখে কৌতুক উঁকিঝুঁকি দিল। মুখখানা গম্ভীর। পালঙ্ক থেকে নেমে আলনা থেকে গামছা-কাপড় নিয়ে এধারের দরজা খুলে কলঘরের দিকে চলে গেল সে।

রাধানাথ বিমূঢ় তখনো। কলঘরের দিকের ওই দরজাও রাত্রিতে ভিতর থেকে বন্ধ ছিল স্পষ্ট মনে আছে। মিনিট পনেরের মধ্যেই বউ ফিরে এলো। ভিজা মুখে চাপা হাসি।

তোমাকে কি জিজ্ঞেস করলাম কানে গেছে? দরজা বন্ধ ছিল, রাত্রিতে তুমি ঘরে এলে কি করে?

ঘরে আসব না তো কি সমস্ত রাত বাইরে কাটাব?

আঃ! এলে কি করে?

মন্ত্র পড়ে পাখি হয়ে ওই জানলা দিয়ে ভিতরে চলে এলাম, তারপর ঘরে ঢুকে আবার যে কে সেই—

বলতে বলতে চাপা হাসি আর চেপে রাখা সম্ভব হল না। হাসতে হাসতে মাটিতে বসে পড়ার উপক্রম। তার উচ্ছল হাসিভরা দৃষ্টিটাই রহস্য ফাঁস করার কারণ শেষ পর্যন্ত। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে আবার শয্যার দিকে চোখ গেল রাধানাথের। এবারে কি যেন একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ল। কি? দেখছে। চোখে পড়েও পড়ছে না যেন। শেষে পড়ল। মস্ত চাদরের ওধারটা গদির নীচে গোঁজা, এধারটা পরদার মত মেঝের দিকে এক হাতের উপর ঝুলছে। ঠিক এ-রকমটা থাকে মনে হল না। হঠাৎ এগিয়ে এসে সামনের ঝুলন্ত দিকটা তুলে পালঙ্কের নীচে উঁকি দিল।

উঁচু পালঙ্ক। তকতকে মেঝে। সেখানে একটা মাদুর পাতা, তার ওপর একটা বালিশ। অর্থাৎ রাত্রিতে সে যখন ঘরে ঢুকেছে চণ্ডীবউ তখন এই ঘরেই ছিল—ওইখানেই ছিল। এধারের চাদর ঝুলিয়ে দিয়ে আড়াল করেছে।

হাসি দেখে রাধানাথ দ্বিগুণ রাগবে কি হিড়হিড় করে তাকে টেনে এনে এই সাতসকালে কিছু একটা কাণ্ড করবে ভেবে পেল না! রোষের আড়ালে একটা অসহিষ্ণু অভিলাষ মুখে দাগ কেটে বসতে লাগল। কিন্তু পুরুষের দাপট প্রকাশ পাবার আগেই চট্ করে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল চণ্ডীবউ।

তারপর যতবার দেখা হয়েছে, একজনের চাপা হাসি আর একজনের গোমড়া মুখ। রাধানাথ সেদিন আর দিনের বেলায় টহল দিতে বেরুলো না। দুপুরেও খাওয়া-দাওয়ার পর তাকে ঘরেই দেখা গেল। মতলব বুঝতে দেরি হল না চণ্ডীবউয়ের। তাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার প্রতীক্ষায় আছে। অতএব খাওয়া-দাওয়া সারা হতে শ্বশুরের ঘরে ঢুকে সে তাঁর পদসেবায় মন দিল।

মহেশ্বর দত্ত মনে মনে খুশি। মুখে বললেন, একটু বিশ্রাম করোগে, যাও না!

যাই। কিন্তু চট্ করে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

খানিক বাদে দরজার আড়ালে ঝিয়ের মূর্তি দেখা গেল। তাকেই কিছু বলবে বলে এসে দাঁড়িয়েছে বোঝা গেল। চণ্ডীবউ উঠে এলো। ঝি ফিসফিস করে জানালো, দাদাবাবুর কি দরকার পড়েছে একবার শুনে যেতে বললেন।

কি দরকার পড়তে পারে খুব ভালো করে জানে বলেই চণ্ডীবউয়ের এই আশ্রয়ে আসা। নিরীহ মুখ করে জবাব দিল, বলো গে ঠাকুরের হাত-পা চিবুচ্ছে, তাঁর ঘুমটুকু এলেই আমি যাচ্ছি।

ঠাকুরের ঘুমের তদারক সেরে নিজের ঘরে ফিরল যখন, বেলা গড়িয়েছে। আসলে শ্বশুরের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে নিজেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মহেশ্বর দত্তর পাতলা ঘুম একটু বাদেই ভেঙেছে। পায়ের কাছে ছেলেমানুষ বউকে ঘুমুতে দেখে উল্টে তিনি ব্যস্ত হয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে সাক্ষাৎ মা-জননী ছেলের সেবায় এসে নিজেই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন। তার মাথায় নিজের বালিশ গুঁজে দিয়েছেন। তারপর সস্নেহে গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়েছেন, একটু-আধটু পাখাও করেছেন। আর দোরের আড়াল থেকে রাধানাথ এই দৃশ্যটা দেখে গেছে।

আড়চোখে চণ্ডীবউ মূর্তিখানা দেখল একবার। থমথমে ফাটো-ফাটো মুখ। সামনে দিয়ে ঘুরে গেল দুই-একবার। শেষে কাছে এসে দাঁড়াল।—কি দরকার আছে বলছিলে?

ব্যস, বারুদে আগুনের ছোঁয়া লাগল। উঠে এসে প্রায় তার গায়ের উপরেই দাঁড়াল রাধানাথ।—তুমি চালাকি পেয়েছ?

কেন?

রাগে ফর্সা মুখে কালচে ছোপ পড়েছে একপ্রস্থ।—আমাকে দেখলে তোমার আগেরজন ভয়ে সিঁটকে যেত। তুমি আমার হুকুম অমান্য করো কোন্ সাহসে?

হুমকিটা খট করে কানে লাগল চণ্ডীবউয়ের। আগেরজন অর্থাৎ মালতীবউ। ক'দিন ধরেই তার কেমন মনে হয়েছে, ওই একজনের সম্বন্ধে বাড়িসুদ্ধ সকলে যেন মুখ এঁটে বসে আছে। কেউ নামও উচ্চারণ করে না। ভারী যত্নে আর ভারী সন্তর্পণে তার সকল স্মৃতি মুছে ফেলা হয়েছে যেন। সে যে ছিল এই প্রথম সেটা কানে শোনা গেল। সে-কৌতূহল চেপে আপাতত রাগের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল তাকে।—অমান্য কোথায় করলাম, ঠাকুরের পা টিপে দিচ্ছিলাম, আসি কি করে?

আসি কি করে! রাগে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল রাধানাথের।—পা টিপতে টিপতে নিজে ঘুমে ঢলে পড়লে, আর বাবা বসে তোমাকে হাওয়া-বাতাস করল—শ্বশুরের বিছানায় ঘুম, তোমার লজ্জা করে না কথা বলতে?

শ্বশুর ডেকে দিতে যথার্থই লজ্জা পেয়েছিল চণ্ডীবউ, কিন্তু এই উগ্র মূর্তির সামনে আরো নিরীহ মুখ তার।—বাবার কাছে ঘুমুলে লজ্জা কি!

বউকে কিছুটা সন্ত্রস্ত দেখলেও রাধানাথ এতটা জ্বলে উঠত না হয়ত। থাবার মত দুটো হাত তার দুই কাঁধে রাখল। অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আমি রাগলে খুব বিপদ হতে পারে, বুঝলে?

মেজাজ যে একটু একটু করে আর একজনেরও চড়ছে জানে না।—কি হতে পারে?

চোখের পলকে কিছু একটা ঘটে গেল। আচমকা একটা পতন সামলাতে চেষ্টা করল চণ্ডীবউ। কিন্তু তার আগেই দেহটা একেবারে শূন্যের ওপর উঠে গেছে তার। রাধানাথ দুই হাতে তাকে মাথার ওপর তুলে ধরেছে। বুকের আঁচল খসে গেছে, চুলের বোঝা রাধানাথের চোখ-মুখ ঢেকে দিয়েছে। নিমেষে সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ,

এ-রকম একটা আসুরিক হামলার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে।

দু'হাতে তাকে মাথার ওপর তুলে রেখে মাথা নেড়ে চুল সরিয়ে বউকে দেখতে চেষ্টা করল রাধানাথ। যা দেখল তাতে রাগ পড়ল একটু। শূন্যের ওপর অসহায় রক্তবর্ণ মুখ একখানা। মাটিতে নামালো তাকে। অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে সে। এতটা ওজন ঠাওর করতে পারে নি। বলল, কি হতে পারে এবারে বুঝে নাও, গায়ের জোরখানা দেখে রাখো।

সরোষে আগে শাড়িটাই ঠিক করে নিল চণ্ডীবউ, তারপর মুখের চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে তপ্ত গলায় বলে উঠল, হাতির গায়েও তো খুব জোর, তাতে কি?

পুরুষের বিক্রম দেখাতে পেরে রাধানাথের মেজাজ অনেকখানি ভালো হয়ে গেছে। এতখানি দিশেহারা করতে পারবে বউকে ভাবে নি। ফলে হাতির উপমাও মন্দ লাগল না। জবাব দিল, হাতি ক্ষেপলে সব শর্মা ডরায়।

ইস, ডরায়! আর সে-রকম মাহুত হলে মাথায় ডাঙশ মেরে ক্ষেপামো বার করে দেয়!

শোনামাত্র রাধানাথ থমকালো। রাগ চড়তে লাগল আবার।—কি বললে? তুমি আমার মাথায় ডাঙশ মারবে?

ঘন মেঘের ফাটলে হঠাৎ উচ্ছল আলোর ঝলক হেসে উঠতে দেখেছে কি কখনো রাধানাথ? দেখল। রাগ ঘন হবার মুখে হঠাৎ যেন দুখানা হয়ে গেল সেটা। আচমকা দু'হাতের ওপর শূন্যে ওঠা যেমন কল্পনা করে নি চণ্ডীবউ, তেমনি রোষের ঘনমুহূর্তে আচমকা এই হাসি দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না রাধানাথও। হাসি বাড়তেই লাগল, হাসি সামলাবার চেষ্টায় শাড়ির আঁচল মুখে উঠল।

হাসি থামিয়ে শেষে বলল, ডাঙশ মারতে যাব কেন, আমি মাহুত না তুমি হাতি?

এই চণ্ডীবউয়ের ওপর পুরুষের রাগ আর প্রতাপ কেমন করে খাটাবে রাধানাথ ভেবে পায় না।

॥ ৮ ॥

কথায় আছে শত্রুরূপে রক্ষরাজ রাবণ যত রাম-নাম করেছে আর দানবরাজ হিরণ্যকশিপু যত বিষ্ণু-নাম করেছে, রাম-বিষ্ণুর ভক্তরাও ততো করেছে কিনা সন্দেহ। রাধানাথেরও প্রায় সেই দশা। তার মদন-দমনের চিন্তার নিষ্ঠা ভাবলে শত্রুরূপী ভক্ত বলা চলে তাকেও। ঘোষালবাড়ির মদনমোহনের নামটা চণ্ডীবউয়ের কানে কেউ যদি কৌতূহলের নাম করে তুলে থাকে তো সেটা করেছে রাধানাথ নিজেই। করেছে রূপসী বউয়ের কাছে নিজের শৌর্য-বীর্য জাহির করার তাগিদে। তবু শত্রুর ওপর আক্রোশে ভেজাল নেই আদৌ। দক্ষিণপাড়ার এত বড় বারইয়ারীর হোমরাচোমরা একজন হয়ে উঠেছে সে এখন থেকেই। তার ফলে ওদিকে আড্ডা দেওয়া রাধানাথের প্রায় ঘুচে গেছে। তারও ভক্তের অভাব নেই। ইচ্ছেমত টাকা ছড়াতে পারলে ভক্তের সংখ্যা কত

বাড়তে পারে রাধানাথ সেটা ভালই জানে। কিন্তু তার ইচ্ছের ওপর বাবার ইচ্ছেটা যেন চোখ গরম করেই আছে। হাতে যেটুকু আসে মায়ের দৌলতে আসে। মা যোগান না দিলে জীবন দুর্বহ হত রাধানাথের, যেটুকু প্রতিপত্তি আছে তাও যেত।

বাইরে বেরুলে সে ও ভক্ত পরিবৃত হয়েই থাকে। কিন্তু সেই তুষ্টিটা খুব বড় নয়। তার আড্ডার স্থলকে আর যাই হোক বারইয়ারী কেউ বলবে না। বাপ তার লোকের দালান-কোঠা বানানোর রসদ যুগিয়ে ব্যবসায় লাল, নিজের ছেলের যে এদিকে নিরিবিলিতে আসর জমানোর মত দুটো পাকা ঘর পর্যন্ত নেই কোথাও, সেই খেদের কথা কাকে বলবে? কত জায়গায় কত জমি পড়ে আছে তাদের, এই ব্যাপারের জন্যে অনায়াসে বড়-সড় একটা দালান তুলে সকলকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভক্তদের মাঝে-সাজে সে শুধু আশ্বাসই দিয়ে আসছে, করতে কিছু পারে নি। তাছাড়া বারইয়ারীর মর্যাদাই আলাদা, আর দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারী মর্যাদায় তো করণের স্মৃতির ভাণ্ডার ভরপুর। কত কালের কত চমক-লাগানো ঐতিহ্য ওটার পিছনে। নদীয়ার রস-ভজ-চূড়ামণি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত করণের দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর রসিকের সন্ধান পেলে জামাই-আদরে তাঁর রসসভায় স্থান দিতেন। মহারাজের সভা-আলো-করা মুক্তারামের নাম কি পুরনো হবে কোনদিন! দক্ষিণপাড়ার এই বারইয়ারীর মুক্তা রাম! রসের জোয়ারে স্বয়ং মহারাজকে কতবার নাকানি চোবানি খাইয়েছেন, ঠিক নেই। শুধু মুক্তা রাম কেন, সদগুণে তাঁর ঘরের রূপবতী রমণীটি পর্যন্ত কত বড় সুরসিকা হয়ে উঠেছিলেন, সেই গল্পই বা না জানে কে? ওই বারইয়ারীর অনুরাগীরা চোখ বুজলে এখনো সেই রমণীয় প্রহসন গোচরে দেখতে পায়।...রূপবতী ভার্যার প্রতি মুক্তারামের একটু বিশেষ টান আছে টের পেয়ে তাঁকে জব্দ করার বাসনায় রসিক-রাজা বলতে গেলে কোমরের নীচে আঘাত হানার মতই মতলব ফেঁদেছেন একটা। মুক্তারাম বাড়ি নেই যখন, সেই সময় রাজা তাঁর গৃহিণীর কাছে ভান্ড হাতে দূত পাঠিয়েছেন। দূতের আরজি, মহারাজ একটু মধু চেয়ে পাঠিয়েছেন।

...মহারাজের ধারণা, তিনি মধু চেয়ে পাঠিয়েছেন শুনলেই সরলা রমণী ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দূতের ভান্ড ভরে মধু দিয়ে দেবেন। আর তারপরেই সভার সমস্ত রসিকদের সামনে মুক্তারামকে ভয়ানক জব্দ করবেন তিনি। বলবেন, চাইলে তোমার রূপবতী গৃহিণী মধু বিলিয়ে থাকেন দেখছি! আমি একটুখানি মধু চেয়েছিলাম, তা তিনি ভান্ড ভরেই মধু দিয়েছেন—বড় খুশি হয়েছি।

...কিন্তু রসিকের রসবতীটি যে কেমন মহারাজের ধারণা ছিল না। মুক্তারামের রূপবতী বউ ভাণ্ড-হাতে দূতের মুখে মহারাজার আরজি শুনে ব্যস্ত হবার বদলে অবাক হয়েছেন প্রথম। সুচতুরা রমণীর মনে সন্দেহের আঁচড় পড়েছে পরক্ষণে। অলক্ষ্য ভ্রূকুটি কুটিল হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। নিভৃতের চিত্তে হাসি ঝলসেছে। গোবেচারী মুখ করে অজ্ঞ নিরক্ষর দূতকে জবাব দিয়েছেন, মহারাজাকে গিয়ে বলো, মধু তো ঘরে আর নেই, বাড়ির কর্তা বেরুবার আগে সব খেয়ে শেষ করে চলে গেছে। তবে খুব যদি দরকার থাকে তো চাক ধুয়ে দিতে পারি, জিজ্ঞেস করোগে দেব কিনা।

জব্দ হয়েও খুশি হতে ওই রাজা পারেন। অতঃপর মুক্তারাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মহারাজ, গুল মিষ্টি কি মধু মিষ্টি? বেজার মুখ করে রাজা জবাব

দিয়েছেন, একত্র হলে দুই-ই মিষ্টি!

লোকের মুখে মুখে গল্প আরো প্রসারিত হয়েছে, অনেক রঞ্জিত হয়েছে হয়তো। কিন্তু ঐতিহ্য-পরিপুষ্ট হওয়ারই লক্ষণ তা। এ-হেন দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীতে প্রাধান্য লাভ করবে ঘোষালবাড়ির মদনমোহন, রাধানাথের পক্ষে সেটা বরদাস্ত করা কঠিন। এর পিছনে মদনমোহনের নিজস্ব কোনো গুণ বা কৃতিত্ব আছে ভাবে না সে। বাপ মরেছে, দুটো কাঁচা পয়সা নাড়াচাড়া করছে, তাই কদর। বরাত ফিরলে সে-ও দেখাতে পারত।

বিয়ে করা বউয়ের ওপর নিজের পৌরুষ বিস্তারের ইচ্ছেটা যেমন স্বাভাবিক, নিজের গুণাবলী জাহির করে এমন রূপবতী বুদ্ধিমতী বউকে মুগ্ধ করার বাসনাটাও অস্বাভাবিক নয়। রাধানাথ দুই চেষ্টাই করেছে। কিন্তু প্রথম ইচ্ছেটা গোড়া থেকেই বেশি রকম বাধা পেয়েছে। রাগের মাথায় দু'হাতে অপ্রস্তুত চণ্ডীবউকে এক ঝটকায় একবার মাথার ওপর তুলে ফেলে আছড়ে দেবার ভয় দেখিয়েছিল বটে, কিন্তু ভয় যে সে একটুও পায় নি পরমুহূর্তেই সেটা বিলক্ষণ বুঝেছে। মালতীবউ হলে ওঁয়ে দম-বন্ধ হয়ে মরে যেত বোধ হয়। আর এই বউ উল্টে তাকে হাতি বলেছে আর মাথায় ডাঙশ মেরে শায়েস্তা করার উপমা দিয়েছে! রাধানাথ ও-রকম ভয় দেখাবার চেষ্টা আর দ্বিতীয়বার করে নি। তার কেমন মনে হয়েছে চণ্ডীবউ নেহাৎ অপ্রস্তুত ছিল বলেই পেরেছে, দ্বিতীয়বার পাববে না। তাছাড়া একবার ওই কান্ড করার ফলে পাঁজর দুটোয় যে দু'দিন পর্যন্ত ব্যথা হয়ে ছিল তাও গোপন করতে হয়েছে। এমনিতে তো ছিপছিপে গোছেরই দেখতে, এতটা ধকল হবে ভাবতে পারে নি। প্রভুত্ব বিস্তারের তাগিদে রাগের মাথায় এর পরেও বউকে ধরে দুইএকটা ঝাঁকুনি-টাকুনি যে না দিয়েছে এমন নয়, আর গুরুগম্ভীর অনুশাসনও বাদ যায় নি। কিন্তু তার ফলও এমন হয়েছে এক-একসময় যে রাধানাথ হকচকিয়ে গেছে। আর তখনই বাপের উক্তিটা সব থেকে বেশি অনুভব করেছে—এই বউ মালতীবউ নয়। চণ্ডীবউয়ের সেই আরক্ত চণ্ডীমূর্তি দেখে অনেক সময় ঘাবড়েই গেছে সে, আর বাপের স্বপ্নের কথা মনে পড়েছে। তা ছাড়া রাগের মাথায় কখনো বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেললে বউয়ের সামনেই বাপের ধমক খেতে হয়।

এই সব নানা কারণে শাসনের উগ্রতা আপনা থেকেই অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে রাধানাথের। তার বদলে নিজের গুণাবলী জাহির করে বউকে মুগ্ধ করার ঝোঁক বেড়েছে। নিজেকে একজন উঁচুদরের শিল্পীই ভাবে। নিজের গানের গলাটা একটু ভাঙা-ভাঙা বটে, কিন্তু কলাবতী গানের অর্থাৎ ওস্তাদী গানের একজন মস্ত সমঝদার সে। এ সব গানের আসরে গায়কের সঙ্গে উঁচু আসনে স্থান হয় তার। গায়কের মর্জি হলে দুই এক সময় ধুয়ো ধরায় বা সুর ধরে রাখার সুযোগ পায়। অতএব ঘরে বউয়ের কাছে মস্ত শিল্পী হিসেবে গণ্য হবার দাবি তার আছেই।

কিন্তু গান শোনাবে কি, গাইতে শুরু করলেই বউ হেসে বাঁচে না। রাগ আর বিরক্তিতে আপনা থেকেই গান থেমে যায়। হাসি থামলে অপ্রস্তুত মুখ করে চণ্ডীবউ বলে, কি করব, অত মাথা আর গা ঝাঁকাও কেন, ঠাণ্ডা হয়ে বসে গাইতে পারো না। তাছাড়া এ আবার কি গান, পদ নেই কথা নেই কেবল হা হা—

গানে মুগ্ধ করার আশা গেছে। কিন্তু আরো গুণ আছে রাধানাথের। যাত্রার

আসরেও যথেষ্ট সুনাম তার। পেশাদার পোষা পাঁচালী দল নয়, পূজো পার্বণে বড় ঘর আর ভদ্রঘরের ছেলেরা এক-আধ সময় যাত্রার আয়োজন করে যখন, তখনই তার ডাক পড়ে। অবশ্য এ-ধরনের অনুষ্ঠান কমই হয় খুব, তবু ক'টা ভূমিকার পার্ট যে মুখস্থ রাধানাথের ঠিক নেই। ভীম দুর্যোধন রাবণ কংস স্বয়ং এলেও তাদের পার্ট এমন উদাত্ত শৌর্যে ভরে তুলতে পারত কিনা সন্দেহ।

বউকে একের পর এক পার্ট শুনিয়ে রুদ্ধবিস্ময়ে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করেছে রাধানাথ। কিন্তু গুণের কদর ক'জনে করতে জানে! এ-চেষ্টার ফলেও দীর্ঘনিঃশ্বাসই ফেলতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। পার্টটা জমে উঠতে না উঠতে ভয়ে ভয়ে বউ দূরে সরে দাঁড়াতে বা সরে বসতে গেছে। তারপর আচমকা হাসি। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ার দাখিল। সেই হাসির ধাক্কায় পার্ট ভুলে চোখ রাঙিয়েছে রাধানাথ। কিন্তু চণ্ডীবউয়ের যা জবাবদিহি, যেন দোষটা তারই। চোখ-মুখ মুছতে মুছতে বলবে, বাবা রে বাবা, যে-রকম হাত-পা ছোঁড়ো সামনে থেকে এগোয় কার সাধ্যি, একটা লেগে গেলেই তো হয়েছে। তাছাড়া সামনে শত্রু কেউ নেই, শত্রু-শত্রু করে এত দাপাদাপি করলে হাসি পাবে না?

বউয়ের রাগের উৎসটা বড় কি কৌতুকের, রাধানাথ ঠাওর করতে পারে না। তবু এই দ্বিতীয়টাই কেমন যেন নিরাপদ আর নয়নাভিরাম মনে হয় তার।

এমনি এক প্রসঙ্গেই শত্রুর নামটা প্রকাশ করেছিল প্রথম। বলেছিল, এই করণে আমার সত্যিকারের শত্রু আছে একজন।

বউয়ের দু'চোখ টান।—আমি?

রসিকতা একটু রাধানাথও করেছে।—তোমার মত শত্রু দেখলে সেই শত্রুর চোখ টাটাবে আর রাতের ঘুম ছুটে যাবে।

সে কে?

মদনা। ঘোষালবাড়ির মদন ঘোষাল। করণের মোহনমুরলীধর মদনমোহন ঘোষাল। একদিন যার যম হবে দত্তবাড়ির রাধানাথ দত্ত—এই শর্মা।

শুনে একটু কৌতূহল বোধ করেছিল চণ্ডীবউ। বিয়ের পর করণে এসে নামটা যে একেবারে না শুনেছে এমন নয়। আর তেমন নিন্দাও শোনেনি কারো মুখে। মেয়েমহলে করণের বড় ঘরের আলোচনা প্রসঙ্গেই হয়ত ঘোষালদের নাম শুনেছিল। কিন্তু নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে এই একজনের মুখভাব এ-রকম ক্রূর হয়ে উঠতে অবাকই হয়েছিল।

কেন, সে তোমার কি করেছে?

করবে আবার কি,ওদের চোদ্দগুষ্টি আমাদের চোদ্দগুষ্টির শত্রু। কোন্ আদিকালে আমাদের দুটো মেয়ে-পুরুষ পেটের দায়ে রাজার কাছে নিজেদের বিক্রী করেছিল আর ওদের দাতাকর্ণ আদিপুরুষ সেই রাজাকেই বিপদের সময় সাহায্য করেছিল—এই গল্প চালিয়ে আসছে ওরা। নিজের বুক ঠুকছে রাধানাথ, এই পুরুষের কালে গল্প উল্টোবে ওদের ভিটে-মাটি মায় মোহন মুরলীধরের মাথাটি পর্যন্ত এখানে বিকোবে একদিন দেখে নিও।

দু'চোখ বড় হয়ে উঠেছে চণ্ডীবউয়ের, কিন্তু ওই গল্পটা সত্যি নাকি?

আমি দেখতে গেছি সত্যি না মিথ্যে, বংশের কবে কে ঘি খেয়েছে সেই দেমাকে হাত চাটছে এখনো!

শত্রুর নাম গানের সূত্রপাত সেটা। তার সঙ্গে জব্দ একটা বড়দরের ব্যাপার বলেই বউকে বুঝিয়েছে। কবে কি-ভাবে তাকে জব্দ করেছে, কুস্তিগীর ষষ্ঠীচরণের কোন্ মোক্ষম প্যাঁচে কবে তাকে ধরাশায়ী করেছে, মনের আনন্দে সে সবের রোমাঞ্চকর বিবরণ দিয়ে নিজের পুরুষকারের একটা প্রবল চিত্র তুলে ধরেছে। কল্পনায় মোহন ঘোষালকে ও-রকম জব্দ বা ওইভাবে ধরাশায়ী সে হামেশাই করেছে, তাই মিথ্যে মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। তারপর বউয়ের সঙ্গেই শলা-পরামর্শের উৎসাহ দেখা গেছে তার, শত্রুকে জব্দ করার নতুন ফন্দি ফিকির যদি কিছু বার করা যায়। বউয়ের মগজে বুদ্ধি আছে এটা সেও অবিশ্বাস করে না।

কতই বা চণ্ডীবউয়ের বয়েস তখন, ষোলতেও পা দেয় নি। এই রেষারেষির ব্যাপারে একেবারে যে উৎসাহ বোধ করে নি তা নয়। তবু ঘরের মানুষকে চোখের ওপর দেখছে বলেই মনের তলায় বিপরীত অনুভূতিও উঁকিঝুঁকি দিত। শত্রুকে জব্দ করতে পারার কল্পনায় পৌরুষের বদলে ক্রূরতাই যেন বেশি চোখে পড়ত। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কিছু টাকা দিয়ে বাইরের দুই একটা অচেনা গুন্ডা মদন ঘোষালের পিছনে লাগিয়ে রাখলে কেমন হয়? করণের কোন সাহস পাবে না, কিন্তু বাইরের লোক কে আর চেনে—ঘায়েল করার সুযোগ একদিন-না-একদিন পাবেই।

চণ্ডীবউ শুধু নিষেধ করে নি, ভয়ানক খারাপ লেগেছিল তার। রাধানাথের অনেক আচরণ আর অনেক অভিলাষ এমনি স্থূল মনে হয়েছে। তার রাগ দম্ভ ফূর্তি সবই কেবল অসংযত উচ্চগ্রামে বাঁধা। দুই-একদিন মুখে গন্ধ পেয়ে আর তখনকার হাব-ভাব দেখে জিজ্ঞাসা করেছে, কি খেয়ে আসা হয়েছে? গোড়ার সঙ্কোচ কমে এসেছিল রাধানাথের, বউকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, এর নাম মদ, পয়সাঅলা লোক মাত্রেই খেয়ে থাকে। লোকের কাছে তাতে মানসম্ভ্রম বাড়ে। তাছাড়া ও-জিনিস খেলে পুরুষের মন ভালো থাকে, মেয়েছেলেকে তখন আরো বেশি ভালো লাগে।

মদ জিনিসটা তখনো চণ্ডীবউ চোখে দেখে নি বটে, ওই তরল বস্তুটার তা বলে নামও শোনে নি এমন নয়। আর তার বাপের বাড়ির গাঁয়ে মাতাল দেখে নি তাও নয়। মুখ মচকে তক্ষুনি জিজ্ঞাসা করেছে, তখন ঘরের মেয়েছেলেকে বেশি ভালো লাগে না অন্যের মেয়েছেলেকে?

শুনে এত ফূর্তি হয়েছে রাধানাথের যে দরজা খোলা খেয়াল নেই, বউকে বাহুবন্দিনী করার বাসনায় দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে।

ধেৎ! আর দুটো হাতের ধাক্কায় ধুপ করে বিছানায় বসে পড়তে হয়েছে তাকে। কিন্তু তবু হাসি ধরে না মুখে।

বিচ্ছিরি লেগেছে চণ্ডীবউয়ের। কি ভেবে আবার জিজ্ঞাসা করেছে, ঠাকুরের তো অনেক টাকা, ঠাকুরকে তো এ-সব খেতে দেখি না?

টেনে টেনে রাধানাথ জবাব দিয়েছে, বয়েসকালে কি আর না খেয়েছে, পিপে উড়িয়েছে—এখন তো বাবার ধম্ম-কম্মের সময়, তবু দরজা বন্ধ করে এখনো মাঝে-মধ্যে চলে আমি হলপ করে বলতে পারি। কি মনে হতে হি-হি করে হেসে উঠেছে তারপর, দরজা বন্ধ করবে না তো কি তোমার সামনেই খাবে নাকি। হাসি বেড়েছে, তোমার মত অপ্সরা বউয়ের সামনে ধরা পড়লে লজ্জার কথা না, আমারই তো লজ্জা-লজ্জা করছে!

কথার ছিরি শুনে ছেলেমানুষ চণ্ডীবউও হেসেই ফেলেছিল।

...মতলবটা হঠাৎই মাথায় এসেছিল রাধানাথের। তারপর যত ভেবেছে তেতো জোরালো মনে হয়েছে সেটা। রমণীর রূপ দেখে মুগ্ধ হয় না এমন মানুষ তো করগে দেখেনি সে—কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। মতলবটা তাহলে আগে মাথায় এলো না কেন?

দেরিতে হলেও এসেছে যে, সেই উদ্দীপনায় মশগুল।

...করণে বউয়ের রূপের খ্যাতি যত ছড়িয়েছে বুদ্ধির খ্যাতিও ততো ছড়িয়েছে। দ্বিতীয়টার ফলে প্রথমটার অর্থাৎ রূপের ছটা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। বউয়ের কথা উঠলে বাইরের লোকে কি যে বলে সে তো নিজের কানেই অনেক শুনেছে রাধানাথ। নিজেরই তার কত সময়ে মনে হয়েছে, এই রূপের মধ্যে বুদ্ধির ছটা জ্বলজ্বল করছে।

অথচ এই রূপ আর এই ছটা এখনো একজনই শুধু দেখে নি। মদনমোহন দেখে নি। বিয়েতে আসে নি দেখবে কি করে? শুনেছে বটেই, কিন্তু শোনায় আর দেখায় আকাশ-পাতাল তফাত। চোখে দেখলে কি হবে? কি যে হতে পারে আড়ে আড়ে বউয়ের দিকে চেয়ে তুষ্টি অনুভব করেছে রাধানাথ। হিংসায় একেবারে জ্বলে-পুড়ে মরবে না? এই বউ যদি তার না হয়ে মদনমোহনের হত, আর তাকে গিয়ে দেখতে হত? সেই কল্পনা করে জ্বালাটা প্রত্যক্ষভাবেই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করল। তাহলে চূর্নীর জলে ডুবেই জ্বালা জুড়োতে হত বোধ হয়।

এর পর বাবার অনুপস্থিতিতে বিকেলের দিকে বউ নিয়ে দিন দুই বেড়াতে বেরুল সে। মা-কে একদিন বলল ভবানীকালীর মন্দিরে যাচ্ছে আর একদিন গঙ্গার খালের দিকে। দুই-ই পুণ্যস্থান।

কিন্তু তার ইঙ্গিতে দু'দিনই পালকি চলল দক্ষিণপাড়ার রাস্তা ধরে। আর, একটু বাদেই ডাকা ডাকির ফলে বউকেও পালকি ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলতে হল। চণ্ডীবউ তখনি জেনেছে মন্দির বা গঙ্গার খালটাল নয়, তাকে সঙ্গে করে বেড়াবার ইচ্ছে হয়েছে বলেই মা-কে ওই রকম বলা হয়েছে।

ইচ্ছের বৈচিত্র্যটা প্রথম দিন বোঝে নি চণ্ডীবউ। যেতে আসতে ঘোষাল বাড়ি পড়েছে। রাধানাথই চিনিয়ে দিয়েছে। অনেক শুনেছে বলে আগ্রহে বাড়িটাই দেখেছে চণ্ডীবউ, আর এত শত্রুতা যার সঙ্গে তাকেও একবার দেখার আগ্রহ হয়েছে। কিন্তু সঙ্গের লোক তাকে পালকি থেকে নামিয়ে ওদিকটা ধরে খানিক ঘোরাফেরা করেই বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করল কেন বুঝল না। শুধু মুখ দেখে মনে হল কি যেন চেয়েছিল, হল না।

দ্বিতীয় দিনেও একই ব্যাপার দেখে খটকা লাগল মনে। সেই ঘোষালবাড়ির পথ ধরেই যাওয়া আর বাড়ি ফেরা। পাশের লোকের নির্দেশে মাথার ঘোমটা পর্যন্ত তখন খাটো করতে হয়েছে। আরো অবাক হয়েছে, ওই ঘোষালবাড়ির রাস্তা ধরে আজ বারকয়েক আনাগোনা করা হল। বেড়াবার জায়গা যেন শুধু এই এলাকার এই রাস্তাটুকুই। শেষে মুখে সেই হতাশা আর চাপা বিরক্তি।

বেড়ানোর উদ্দেশ্যটা তখনই তেমন সরল মনে হয় নি চণ্ডীবউয়ের। রাতে ভেবেছেও এই নিয়ে।

দুদিন যেতে আবার বেড়াবার প্রস্তাব আসতেই ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসেছে,

কোথায় যাবে, সেই ঘোষালবাড়ির রাস্তায় তো?

ঢোঁক তুল করে রাধানাথ জিজ্ঞাসা করেছে, তাতে কি?

কি আর! শত্রুকে তোমার বউ দেখাবার ইচ্ছে হয়েছে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এনে যত খুশি দেখাও না, হ্যাংলার মত আমাকে রাস্তায় টেনে বার করা কেন?

ধরা পড়ে হি-হি করে হেসেছে রাধানাথ। মগজে বুদ্ধি আছে স্বীকার করতেই হয়। বলেছে, তাতেই বা কি হয়েছে, রূপ দেখলে তো আর রূপ চুরি হয়ে যাচ্ছে না তোমার, উল্টে ওর কলজেয় ছুরি বসানোর কাজ হবে...রূপের ছুরি। আবার হাসি, দেখলে হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরবে, চলো না—

জবাবে রাগের মাথায় চার আঙুল জিভ বার করে ভেঙচি কেটেছে চণ্ডীবউ, আবার নিজের মনে হেসেছেও একসময়। কিন্তু বেড়াতে আর বেরোয় নি।

বউ দেখানো নয়, রাধানাথের আসল উদ্দেশ্য মদনমোহনের হৃদয়দেশ একটু বিদ্ধ করা এবং তাকে জব্দ করা। সেজন্যে বউকে যেমন তার চোখের সামনে নিয়ে হাজির করতে রাজী, তেমনি একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে বউকে ঘরে কুলুপ এঁটে রেখে দিতেও তার আপত্তি নেই। দিন কয়েকের মধ্যে কানে একটা খবর আসতে হঠাৎ এই বিপরীত ইচ্ছেটাই প্রবল হল রাধানাথের।

খবরটা দিয়েছিল গেঁজেল সহায় ভট্ট। তখনো অত নামডাক হয় নি সহায় ভট্টর অর্থাৎ গাঁজার আসরে 'বাদশা' খেতাব মেলে নি বা বত্রিশ ছিলিমের পর নিজের গৃহিণীকে ছেলের বউ ভাবার মত অতটা উন্নতিও হয় নি। অতএব নেশার যোগানদারের সংখ্যাও তখন কম ছিল। উদার রাধানাথ ছিলিম কতক যোগান দেবার পরেই কৃতজ্ঞতা উপচে পড়েছে তার। মদনমোহন ঘোষালের সর্বশেষ বাসনার খবরটা তর মুখেই শুনেছে।

কথাটা উঠেছে চণ্ডীবউয়ের প্রশংসার সূতো ধরে। নেশা একটু জমে উঠতেই দুগ্‌গা প্রতিমার মত রূপবতী গুণবতী বউকে আশীর্বাদ করেছে সেই যে দেখেছে, মায়ের মূর্তিখানা এখানো চোখে লেগে আছে বলেছে। আর তারপরেই নিজের অজ্ঞাতে সেই বড় খবরটা ব্যক্ত করে ফেলেছে। বলেছে, মা-লক্ষ্মীর এত রূপের কথা আর বুদ্ধির কথা শুনে আমাদের মদনমোহন তো তাকে দেখার জন্য একেবারে অস্থির হয়ে আছে। চোখে তো দেখে নি এখনো শুনেছে শুধু। সামনের বোশেখী পূর্ণিমায় মহাচণ্ডীর থানে দেখতে পাবে সেই আশায় দিন গুণছে। সেদিন বলছিল, মহাচণ্ডীর থানে চণ্ডীবউ দর্শন করে দুই চক্ষু সার্থক করবে।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপরীত মতলব মাথায় এসেছে রাধানাথের। দিন পাঁচেক মাত্র বাকি আর বৈশাখী পূর্ণিমার। মায়ের থানে সেদিন বউয়ের যাওয়া বন্ধ করতে পারলে কেমন হয়? মনে হল, আচ্ছা জব্দ হয় বটে, আশায় ছাই পড়ে! যে উদ্দেশ্যে বউ নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল সেই উদ্দেশ্যেই তাকে ঘরে আটকানোর তাগিদ।

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। বাড়ি ফিরেই যথাস্থানে ঘোষণা করেছে, এবারের বোশেখী পূর্ণিমায় মহাচণ্ডীর থানে তোমার পূজো দিতে যাওয়া হচ্ছে না—আগের দিন থেকেই বাবাকে বলবে ভয়ানক শরীর খারাপ, নড়তে-চড়তে কষ্ট হচ্ছে, আর পরদিন বলবে, ওই ভিড়ের মধ্যে গেলে মরেই যাবে।

শুনে চণ্ডীবউ অবাক, প্রথমবারে নতুন বউয়ের মায়ের থানে পূজো দেওয়া রীতি সেও শুনেছে।—যাওয়া হবে না কেন?

এই কেন শুনলেই রাগ হয়ে যায় রাধানাথের। মালতীবউ মুখ বুজে সর্বদা হুকুম তামিল করত, ভয়ে কোনদিন জিজ্ঞাসা করত না কেন। যে কারণ মাথায় এলো সেটাই বলল প্রথম।—মদন ঘোষাল তার দলবল নিয়ে সেদিন যাবে শুনেছি, আমি থাকব না, একটা অপমান-টপমান করে বসতে পারে।

ইস্! অপমান করবে? ভয় পাওয়া দূরে থাক, বিপরীত মূর্তি।—যাবই। দেখি কি অপমান করে!

ফলে বউয়ের কাছে মনের বাসনা খোলাখুলিই ব্যক্ত করতে হল এবারে। তাকে দেখার জন্যে মদন ঘোষাল কত আগ্রহ নিয়ে দিন গুনছে, তার ওপর বেশ কয়েক প্রস্থ রং চড়ালো। দেখতে না পেলে কত হতাশ হবে আর কত জব্দ হবে কল্পনার সেই চিত্রও মূর্ত করে তুলতে চেষ্টা করল। সেই সঙ্গে উৎসুক আবেদন, এবারের মত ওখানে যাওয়া বন্ধ করতেই হবে।

খোলা কথায় কাজ হল। তাছাড়া, এত শোনার পর চণ্ডীবউ কৌতুকই বোধ করল একটু, ব্যাপরটা ভাবতে মন্দ লাগল না। ভেবে-চিন্তে রায় দিল, আচ্ছা যাব না, কিন্তু ঠাকুরের কাছে মিথ্যে বলতে পারব না।

কি বলবে-না-বলবে সেই দায় রাধানাথের নয়, তার সঙ্কল্প বজায় থাকলেই হল। দু'দিন আগে চণ্ডীবউ শ্বশুরের কাছে নিবেদন করেছে, তার টাকা চাই কিছু, বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বাপের বাড়ি গিয়ে সেখানকার কাল-ভৈরবের মন্দিরে গিয়ে পূজো দেবে, তারপর বাপের বাড়ির সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে পরদিন ফিরবে।

শাশুড়ীর ভয়ানক অমত ছিল, নতুন বউ প্রথম বছর মায়ের থানে না গিয়ে বাপের বাড়ি যাবে ভৈরবের মন্দিরে পূজো দিতে—এ যেন তাজ্জব কথা একটা। কিন্তু শ্বশুরের মতের কাছে তাঁর মত ভেসে গেছে। কাল-ভৈরবের পূজো দিতে যাবে শুনেই মত দিয়েছেন মহেশ্বর দত্ত। তাঁর মনে পড়েছে, ওই মন্দিরের দৌলতেই ক্ষমাযোগিনীর প্রিয়পাত্রী হয়েছে চণ্ডীবউ। তার ফলে বুড়োকে বিয়ে করার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে ক্ষমাযোগিনীর আশ্রয়ে থেকেছে। অতএব চণ্ডীর এই বাড়িতে বউ হয়ে আসাটা কাল-ভৈরবেরই অনুগ্রহ কিনা কে জানে। নয়তো ঠিক এমন দিনেই বউ কাল-ভৈরবের পূজো দিতে যেতে চায় কেন?

টাকাপয়সা দিয়ে ছেলে-বউকে ঘটা করেই পাঠিয়ে দিয়েছেন মহেশ্বর দত্ত।

দিন গেছে মাস গেছে বছর ঘুরেছে।

আবার এসেছে সেই বৈশাখী পূর্ণিমা। এক বছর আগের এই দিনটার কথা মনে করে বসে নেই রাধানাথ বা চণ্ডীবউ। একজনকে সেদিন কতটা জব্দ বা কতটা হতাশ করা গিয়েছিল সেই কৌতূহল দুদিনেই পুরনো হয়ে গেছে রাধানাথের। এক বছরে স্নায়ু আরো কত ব্যাপারে মেতেছে, কত কারণে তেতেছে, রেষারেষির কত ফন্দি-ফিকির এঁটেছে—পুরনো হবারই কথা।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে করণের এই চেহারা চণ্ডীবউ কল্পনাও করে নি। সকালের দিকে যদি মনে পড়েও থাকে, গেল বারে এই দিনটাতে একটা অদেখা লোকের

চোখের আড়াল হবার জন্য বাপের বাড়ি পালিয়েছিল—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা মন থেকে মুছে গেছে। বন্যা যাচ্ছে করণের ভিতর দিয়ে, মানুষের বন্যা। কাছে, দূরের বিশ-পঞ্চাশখানা গাঁ উজাড় করে কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে একই লক্ষ্যের দিকে। করণের লোকরাও ঘরে বসে নেই কেউ—ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ দিশেহারা, মাতোয়ারা।

বিশাল বিস্তৃত উলুবনের মহাচণ্ডী থান লোকারণ্য।

একদা এর পশ্চিম আর দক্ষিণ প্রান্ত ধরে গঙ্গা বইত। যত দূরে চোখ যায়, এখন ধূ-ধূ করছে শুকনো ভরাট জমি। কিন্তু এই এক দিন ওই বিশাল প্রান্তরও জনাকীর্ণ। মেলা বসেছে, সারি সারি পসার নিয়ে বসে গেছে—একদিনের ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড়।

চণ্ডীবউ মহাচণ্ডীর থানে এসেছে বড় দুই ননদের সঙ্গে। তারা বৈশাখী পূর্ণিমার দু'দিন আগেই বাপের বাড়ি চলে আসে। সঙ্গে লোক আরো আছে অবশ্য, তাদের স্বামীরাও আছে, কিন্তু কে কোথায় ছিটকে পড়েছে ঠিক নেই। মেয়েদের পূজো দেওয়া দেখাশুনা কেনা-কাটা শেষ হতে বেলা গড়াবে—তারপর খুঁজে-পেতে সকলকে এক করে বাড়ি ফেরা হবে। তাই আপাতত মেয়ে-পুরুষের একসঙ্গে থাকার তাড়া নেই কিছু। ওদিকে বাড়ির কর্তা মহেশ্বর দত্ত আর তাঁর গৃহিণী খুব ভোরে এসে দর্শন আর পূজো সেরে চলে গেছেন। বাড়ি খালি থাকে বলে এই দিনেই আবার চুরি-ডাকাতির সম্ভাবনা বেশি।

লোকের ভিড়ে মাথা ঝিম-ঝিম করছিল চণ্ডীবউয়ের। মুখ লাল, ঘামে সমস্ত মুখ জব-জব করছে। এত ভিড়ে মাথায় ঘোমটা দেবার তাগিদ নেই এখানে, তার থেকে বেশি তাগিদ গলার গয়না রক্ষা করার—সকলেই তো আর পূণ্যি করতে আসে না। অতএব ননদের নির্দেশে শাড়ির আঁচল গলায় জড়াতে হয়েছে। ফলে পুরুষের অবিরাম জোড়া-জোড়া চোখের ঘায়েও কম অস্বস্তি বোধ করছে না চণ্ডীবউ। যেখান দিয়ে ঘুরছে ফিরছে, সেখানে সেও যেন দর্শনীয়।

হঠাৎ ছোট ননদের কথা কানে যেতে ছোটখাটো একটা ঝাঁকুনিই খেয়ে উঠল চণ্ডীবউ। বড় ননদকে বলছে, ওমা দিদি দেখ্, ঘোষালবাড়ির সেই ছেলেটা আমাদের বউকে ড্যাবড্যাব করে দেখছে কেমন, দেখ্!

শুধু বড় ননদ নয়, দেখল চণ্ডীবউও। আট-দশ হাত দূরে যে তিন-চার জন একদিকেই চেয়ে আছে, তাদেরই একজন হবে। কোন্ একজন, চিনতে এক মুহূর্তও লাগল না। কেন, চণ্ডীবউ নিজেই জানে না। দুটো চোখ সরাসরি ঠিক সেই মুখের ওপরেই আটকেছে, যে লোকটা নির্নিমেষে তার দিকেই চেয়ে আছে।

তাকে টেনে নিয়ে ননদেরা অন্য দিকে চলল। স্বামীর সঙ্গে এত শত্রুতা যার, সম্ভব হলে চণ্ডীবউ আর একবার ফিরে দেখত সেই লোকটাকে।

তার দরকার হল না। দেখা বারকয়েক এমনিতেই হল।

দত্তবাড়ির চণ্ডীবউয়ের রূপের কথা অনেক শুনেছে মদনমোহন, তবু সে যে এই রূপ তা কল্পনাও করে নি। গেল বারে রূপসী বউকে এখানে দেখতে পাবে আশা করেছিল, কিন্তু এক বছরের তফাতে সেই কৌতূহলের ব্যাপারটা তারও মনে ছিল না। পাঁজরে খোঁচা দিয়ে উৎকট চাপা আনন্দে ছিরে পাগলা যখন বলে

উঠল, ওই দেখো গা মদনমোহন, রাধানাথের বউ দেখো, দেখে চক্ষু সার্থক করে নাও—তখনই শুধু পুরনো কৌতূহল একাগ্র হয়েছিল। তারপর যা দেখেছে, স্থান-কাল ভুল হয়ে গেছে তার।

এই ভিড়ে সঙ্গীদের কাটান দিতে চাইলে চোখের নিমেষে সম্ভব তা। মদন ঘোষালের সঙ্গীশূন্য হতে সময় লাগে নি। আর তারপর থেকেই আত্মবিস্মৃত সে।

বারকয়েক ওই একটা লোককে এরপর কাছাকাছি দেখে ঘর্মাক্ত মুখ লাল হয়েছে চণ্ডীবউয়ের, ভুরুর মাঝে বিরক্তির ভাঁজ পড়েছে। নির্লজ্জ বেহায়াই মনে হয়েছে লোকটাকে তার। বড় বড় ঘোর-লাগা চোখ দুটো যেন তার মুখের ওপর আটকে নিয়ে ঘুরছে।

চোখে আর একবার বড় ননদেরও পড়ল। তার হাতে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলে উঠল, নাঃ, জ্বালালে দেখছি ছোঁড়াটা, চোখ দিয়ে যেন গিলছে একেবারে—আঁচল গলায় জড়িয়ে কাজ নেই, মাথায় ঘোমটা তোলো গো বউ!

জ্বালাতনের আর কি বাকি, ধারণা নেই কারো।

এক জায়গায় এসে শরীরের সবগুলো স্নায়ু হঠাৎ যেন একসঙ্গে ঝাঁকুনি খেল চণ্ডীবউয়ের। মাথাটা ঘুরে উঠল। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ও মা গো, এত রক্ত!

রক্তের বন্যাই বয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার বলি হয় এই দিনে এখানে। বলি হয়েছে, হচ্ছে, হবার প্রতীক্ষায় বহু আর্ত পশু দাঁড়িয়ে আছে। রক্ত শুকিয়েছে, জমাট বেঁধেছে, তার ওপর দিয়েই নতুন তরল রক্তের স্রোত চলেছে।

চণ্ডীবউ কাঁপছে থরথর করে, মাথা সোজা রাখতে পারছে না, চোখে অন্ধকার নামছে। রক্ত আর রক্ত, সামনে ডাইনে বাঁয়ে দড়ি-বাঁধা ছাগশিশু, দ্বিখণ্ডিত ছাগ শিশু—আর কেবল রক্ত। চণ্ডীবউয়ের পা থেমে গেছে বলেই অন্যমনস্ক ননদরা এগিয়ে গেছে একটু। হঠাৎ পিছন ফিরে দ্রুত পালাতে চেষ্টা করল চণ্ডীবউ—রক্ত যেন তাড়া করেছে তাকে। পা অবশ, চোখে অন্ধকার, আর রক্ত আব রক্ত।

ওই সামনেই গাছ একটা, অনেকটা ফাঁকাও—কিন্তু গাছের ওই গুঁড়ি পর্যন্ত কি পৌঁছুতে পারবে চণ্ডীবউ?

পারল। কিন্তু তারপরেই পা অবশ, চোখের সামনে আরো অন্ধকার। গাছটা ধরে প্রাণপণে সামলাতে চেষ্টা করল নিজেকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর কি যে হল হুঁশ নেই!

জলের ঝাপটায় চোখ মেলে একসময় তাকালো যখন, চারিদিকে ভিড় জমে গেছে। কি যে হয়েছে হঠাৎ স্মরণ হল না, স্বপ্ন দেখছে কিনা জানে না। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল একবার, গলা দিয়ে অস্ফুট ত্রাসে নির্গত হল, এত রক্ত কেন!

স্থির কয়েক মুহূর্ত। জলের ঝাপটায় এবারে চাউনিটা আর একটু স্পষ্ট। মনে হল মাটিতে শুয়ে আছে বটে, কিন্তু মাথাটা যেন কারো কোলের ওপর আশ্রয় পেয়েছে। মাথায় ঘোমটা নেই... স্রস্ত বসন...জলের ধারায় গলার নীচে পর্যন্ত ভিজে গেছে... এত লোক ঝুঁকে আছে... কি হয়েছে? স্বপ্ন দেখছে এখনো?

দুর্বোধ্য দৃষ্টি তুলে দেখতে চেষ্টা করল। জলের ঝাপটা দিচ্ছে যে, মাথাটা তারই কোলে, তারই নিবিড় কালো প্রসারিত দুটো চোখ ঝুঁকে আছে মুখের ওপর। চোখে

চোখে, চোখের তারায় তারায়, কয়েক মুহূর্তের আত্মবিস্মৃত দৃষ্টি-বিনিময়—পরক্ষণে তড়িৎস্পৃষ্টের মত একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠে বসল চণ্ডীবউ। দ্রুত-চকিতে ভেজা শাড়ির আঁচলটা টেনেটুনে মাথায় তোলার চেষ্টা।

স্বপ্ন নয়, একজনের কোলেই সে মাথা রেখেছে বটে—সেই একজন চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তার জ্ঞান ফিরিয়েছে...ঝুঁকে আছে....স্থির অপলক চেয়ে আছে। চণ্ডীবউ চেনে তাকে। এই মেলায় এসে যাকে চিনেছে সে-ই।

...মদনমোহন।

॥ ৯ ॥

মাথা যদি কারো কাটা গিয়ে থাকে তো একমাত্র রাধানাথেরই গেছে।

ঘটনা ছোট। মহাচণ্ডীর থানে অত ছাগ-বলি আর অত রক্ত দেখে দত্ত বাড়ির চণ্ডীবউ ভিরমি খেয়েছিল। কানা অশথ গাছটা ভালো করে ধরার আগে মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছে দেখে দৌড়ে গিয়ে ঘোষালবাড়ির মদন ঘোষাল তাকে ধরে ফেলেছিল। সময়ে ধরেছিল। কানা অশথের ওধারটা ধরে অবার ঢাল নেমেছে। ওদিকে গড়ালে বিপদ হত। না গড়ালেও ইটের খোয়া আর মাটির ভাঙা খুরি-গেলাসের ছড়াছড়ি ওখানটায়। বেকায়দায় পড়লে গা-হাত-পা কেটে-কুটে তো যেতই। মোট কথা একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে দেখেই দ্বিধার অবকাশ ছিল না, ছুটে গিয়ে ধরে ফেলেছে মদনমোহন। নইলে পারার কথা নয়। মিনিট আট-দশ জ্ঞান ছিল না চণ্ডীবউয়ের। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে মদনমোহনই জ্ঞান ফিরিয়েছে। ততক্ষণে ননদেরা এসে গেছে। মায়ের থানে শেষপ্রণাম জানাতে ভুলে ব্যস্ত হয়ে বউকে নিয়ে তারা বাড়ি চলে এসেছে।

ঘটনার বিচারে মদনমোহনের প্রতি দত্তবাড়ির সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু শুধু বাড়ির কর্তা ছাড়া আর কারো সেটা মনে হয়নি। এমন দিনে বউয়ের সোনার অঙ্গে আঘাত লাগতে পারত মনে হতেই মহেশ্বর দত্ত বিচলিত হয়েছিলেন। মহাচণ্ডীর উদ্দেশে প্রণাম করেছেন আর মনে মনে ঘোষালের ছেলেটার তারিফ করেছেন। বিপদ যেখানে, সেখানে লজ্জাই কি দ্বিধাই বা কি! গাঁয়ের কোন্ বাড়ির এক যুবতী বউ শাড়িতে কেরোসিনের আগুন লেগে পুড়ে মরেছিল। বাড়িতে ছিল কতগুলো বাচ্চা-কাচ্চা আর দুই ভাশুর। তা দাপাদাপি ছুটাছুটি করে বউটা শেষ পর্যন্ত পুড়েই মরল। ভাশুরেরা ব্যস্ত হয়ে হাঁক-ডাক করল আর সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেও শূন্যের মধ্যে শুধু হাত পা ছুঁড়ল। আগুন ভালো করে লাগার আগে শাড়িটা খুলে নিতে পারল না বা কিছু একটা চাপা দিতে পারল না। বয়েস হয়েছে মহেশ্বর দত্তর, রক্তও আগের থেকে ঠাণ্ডা হয়েছে অনেক—সুস্থির চিত্তে গাঁয়ের মানুষের চরিত্র এখন ভালোই বিশ্লেষণ করতে পারেন। হাঁ করে দেখবে, লুকিয়ে দেখবে, ছায়ার মত পিছু নেবে, সুযোগ পেলে ছলছুতোয় ফুঁসলে বার করে নিতেও পিছপা হবে না, কিন্তু সকলের চোখের সামনে দিনে দুপুরে কিছু

একটা বিপদ হতে দেখল কি অমনি বিবেকের দশ হাত দিয়ে চরিত্র আগলে গুণ্ডের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। মহেশ্বর দত্তর ধারণা, থানের শত-সহস্র লোকের মধ্যে ঘোষাল-কর্তার ওই একটা ছেলে ছিল বলেই তাঁর আদরের বউ ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছে। কানা অশথের ঢাল ধরে গড়িয়ে পড়লেও দৌড়ে অনেকেই আসত কিন্তু কেউ ধরত কিনা সন্দেহ।

ঘটনা শুনে দৌড়ে বউকে দেখতে এসেছেন। উঠে বসতে পর্যন্ত না দিয়ে ঘণ্টাখানেক শুইয়ে রেখেছেন তাকে। কোথাও লেগেছে কিনা বার বার জিজ্ঞাসা করেছেন। বলেছেন, চণ্ডী-মা বড় নরম মনে ছিল দেখছি, তাই মন কেঁদেছে। মেয়েদের বকেছেন, ও আর একদিকে চলে গেল তোরা ছিলি কোথায়? ওই ছেলেটা না থাকলে কোন্ বিপদে পড়তে হত ঠিক আছে—

মেয়েরা মুখ-চাওয়া চাওয়ি করল। এই বউয়ের ওপর বাপের পক্ষপাতিত্ব বলতে গেলে বিয়ের আগের থেকেই দেখে আসছে তারা। পরে তো কথাই নেই। তার ওপর দিনে দিনে বাপের এক-এক স্নেহের নিগূঢ় একটা কারণও মায়ের মুখে শুনেছে। রাধার এই বিয়েটার পরেই নাকি সংসারের আয় পয় অনেক বেড়ে গেছে, এক জায়গায় ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার বাপও নাকি এখন দশ হাত বার করে কাজ করছে।

অঘটন কাম্য নয়, তবু ছেলের শত্রু ওই ছেলেটার ওপর একটুও খুশি হতে পারলেন না দত্ত-গিন্নী। মেয়েদের মুখে যা শুনেছেন তাতে অজ্ঞান হবার পরে দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে তাঁর চোখে যেন কাঁটা বিঁধেছে। একগঙ্গা লোকের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে বউ অজ্ঞান হয়েছে আর তার মাথা কোলে নিয়ে ঘোষালের ছেলে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়েছে। অতএব বিরূপতার আঁচটা বউয়ের গায়ে লাগল। কর্তার কান এড়িয়ে তিনি গজগজ করে উঠেছেন, হাজারে হাজারে লোক মায়ের থানে গিস্‌গিস্ করছে, কারো কিছু হল না, বলি দেখে আর রক্ত দেখে এমন ভিরমি যাবার কি হয়েছিল! আর অজ্ঞান হবার জন্য সকলকে ছেড়েছুড়ে কানা অশথের দিকে ছোটারই বা কি দরকার পড়েছিল! কাছে থাকলে তো ওরাই ধরতে পারত—

মুখ ভার করে মা ঘরের বাইরে পা দিতে ছোট ননদ ফোঁস করে উঠল, মায়ের যেমন কথা, কোথায় সাক্ষাৎ মদনমোহন আর কোথায় জটিলা-কুটিলা—অমন ভিরমির মুখে ঝাঁটা, বেশ করেছ বউ, বেশ করেছ তুমি ছুটে পালিয়েছ—আহা, বিনোদিনীর থরথর ভাব দেখে আমার দুই চক্ষু সার্থক হয়েছে। তবে রাধা হাবাটার বরাতে কি যে আছে কে জানে!

শাশুড়ীর অনুযোগ মুখ বুজে শুনেছে, ননদিনীর বিদ্রূপেরও জবাব কিছু দেয় নি চণ্ডীবউ। শরীরের ওপর দিয়ে আর মনের ওপর দিয়ে একটা ধকল গেছে যেন। ক্লান্ত লাগছে, অবশ-অবশ লাগছে শরীরটা। ননদেরা চলে গেলে সত্যি সে চুপচাপ শুয়েই থাকত খানিকক্ষণ। কিন্তু সহজে তারা তাকে অব্যাহতি দেবে না। এবারে জব্দ করার মতই মোক্ষম অস্ত্র একটা হাতে পেয়েছে তারা।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে অস্বাচ্ছন্দ্যটা বোধ করছে চণ্ডীবউ, সেটা শাশুড়ীর অনুযোগের জন্যও না, ননদিনীদের গঞ্জনা শুনেও না। কান-মন সজাগ থাকলে

হয়ত দুঃখ পেত বা বিরক্ত হত। তার মাথার মধ্যে এখনো অনেক কিছু যেন একাকার হয়ে আছে।...ভিড় আর ভিড়, রক্ত আর রক্ত, চণ্ডীবউ ছুটেছিল, পালাতে চেয়েছিল। কোথা থেকে কোথায় পালাতে চেয়েছিল জানে না, গাছটাকে ভালো করে আঁকড়ে ধরার আগেই কি যে হয়ে গেল, তাও না। গাছ মানুষ পায়ের নীচের মাটি সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছিল, আর কোথা থেকে অন্ধকারের ঝাপটা লাগছিল চোখে, আর চোখের মধ্য দিয়ে সেই অন্ধকার ভিতরে ঢুকে সর্বাঙ্গ অবশ করে দিচ্ছিল।...সে পড়ে যাচ্ছিল, কতক্ষণ ধরে শুধু যেন পড়েই যাচ্ছিল, কত উঁচু থেকে কোন্ নিঃসীম অতলে পড়ে যাচ্ছিল ঠিক নেই।

...কিন্তু শেষ মুহূর্তে একবার শুধু মনে হয়েছিল, পড়ে বুঝি গেল না। সেটা আশ্রয় কি আশ্রয়ের লোভের দুর্বার আকৃতি জানে না। তারপর আর কিছুই জানে না।

...চোখ মেলেই একখানা মুখ ঝুঁকে থাকতে দেখেছিল। সেই মুখে আর টানা চোখের গভীরে কি যেন দেখেছিল চণ্ডীবউ। মেলায় এসে যাকে চিনেছিল, আর অত ভিড়ের মধ্যেও যে তার পিছনে পিছনে ঘুরছিল, তার সম্পর্কে সচেতন হওয়া মাত্র বিষম ঝাঁকুনি খেয়েই ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, ভেজা শাড়ির আঁচল টেনেটুনে মাথায় তুলেছিল। কিন্তু সেই চেতনা সক্রিয় হতে সময় লেগেছিল কয়েক মুহূর্ত। তার আগে বিহ্বল দু'চোখ মেলেই চণ্ডীবউ ওই ঝুঁকে-পড়া মুখখানা দেখেছিল, দুর্বোধ্য দৃষ্টিটা তার আয়ত চোখের গভীরে গিয়ে মিলেছিল। সে-মুখে চপলতার চিহ্নমাত্র ছিল না, সেই দুটো চোখ গভীর উদ্বেগে স্থির হয়ে ছিল তার মুখের ওপর।

...চণ্ডীবউ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে কারণ, ওই একখানা মুখ আর ওই দুটো চোখ মনের তলায় কোথায় বসেই আছে। বার বার সে চেষ্টা করছে মুছে দিতে। মুছে যাচ্ছে না। নিজেই আবার অন্যমনস্কের মত দেখছে কখন। পরক্ষণে সচকিত হয়েছে আর অস্বস্তি বোধ করেছে।

সতের বছর মাত্র বয়েস তখন চণ্ডীবউয়ের, নিজের বা আর কারো নিভৃতের জটিলতা বিশ্লেষণে পটু হয়ে ওঠে নি তখনো। যা ঘটে গেল, সব মিলিয়ে তার একটা অস্বস্তিকর ছাপ শুধু ভিতরে কোথায় লেগেই থাকল।

খবরটা রাধানাথ শুনেছে নিজের আড্ডায় বসেই। শুনেছে ছিরে পাগলার মুখে। খবরটা দেবার জন্য সে বাতাস সাঁতরে এসেছে। সেদিনের রেষারেষি সদ্য-বর্তমানের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় নি তখনো। দেখা হলে কথা হত, হাসি-মস্করাও চলত। রেষারেষিটা তখন পর্যন্ত ওদের মুরব্বী মদন ঘোষালের সঙ্গেই শুধু দানা বেঁধে উঠেছিল। ছিরে পাগলার অনুমান মিথ্যে নয়, সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রাধানাথ বিশেষ আনন্দে মশগুল বটে।

বৈশাখী পূর্ণিমার বিশেষ দিন এটা রাধানাথ বা তার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা সেটা অস্বীকার করে নি। বিশেষ দিনে বিশেষ একটু আনন্দের ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। বিকেল হতে-না হতে আসর জমেছিল। আর সন্ধ্যে হতে-না-হতে রাঙা জলের প্রতিক্রিয়ায় একটা নতুন উদ্দীপনার আলো ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতই সকলের বুক উপচে সরব উল্লাসে ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। তাদেরই মধ্যে কে একজন রাধানাথের বহু-ঈপ্সিত

বাসনায় পলতেয় আশার আগুন ছুঁইয়ে গিয়েছিল, বলেছিল, এভাবে আর পারা যায় না, ইচ্ছে করলে নিজের মুরোদে রাধানাথ একাই এই দত্তপাড়ায় নতুন বারোইয়ারীর পত্তন করে ফেলতে পারে। এমন আর কি শক্ত ব্যাপার! বড়সড় একটা আস্তানা চাই আর গোড়ায় হৈ-চৈ জাঁক-জমক করে দুই-একটা উৎসব পার করে দেওয়ার মত টাকা চাই। সে-রকম লোভের টোপ ফেলতে পারলে টাকা শেষে আপনিই আসবে—দরকার হলে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর মত টাকা তারাও তুলবে—গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করবে। শুধু শুরুটা করা যা ব্যাপার—

প্রথম দিকে কেউ সায় দিয়েছে, কেউ বা সায় দেবে-দেবে করেছে। তারপর আসর যত জমেছে উদ্দীপনা তত বেড়েছে। রঙিন বস্তুর প্রতিক্রিয়ায় নিষ্প্রভ সম্ভাবনাটা রঙে-রসে ঝলমলিয়ে উঠেছে। সংশয়ের ঘোমটা খসেছে, মূর্তিমতী রূপ ধরে ঝম-ঝম নূপুরের ধ্বনি তুলে কল্পনাটা সকলের চোখের ওপর দিয়ে মত্ত উল্লাসে নেচে নেচে গেছে।

চোখ লাল করে রাধানাথ বলে উঠেছে, মহেশ্বর দত্তর ছেলে লোকের কাছে হাত পেতে বেড়াবে চাঁদার জন্যে! বারইয়ারী যদি হয়, বালতির থেকে জল ঢালার মত করে সিন্দুক থেকে টাকা ঢালব—এ শর্মা ভিক্ষে করার পাত্র নয়।

তাই তো, তাই তো! সকলেই সকলকে চোখ রাঙিয়েছে প্রায়, দত্তবাড়ির ছেলে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে লোকের দোরে ঘুরবে চাঁদার আশায়—কোন্ দুঃখে, কোন্ দুঃখে গো? হাত ঝাড়লে যার সোনা ঝরে তার আবার টাকার ভাবনা!

চাঁদা আদায়ের প্রস্তাব যার সে-ই আবার গলা চড়িয়েছে, সখী নাচলে সখার অভাব! টাকা ছড়ালে ওই দক্ষিণপাড়ার দল ভেঙে নাগরেরা সব দত্তপাড়ার বারইয়ারীতে এসে গড়াগড়ি খাবে!

সকলে হৈ-হৈ করে সায় দিয়ে উঠেছিল, ঠিক সেইক্ষণে শ্রীনাথ অন্যথায় ছিরে পাগলার আবির্ভাব।

তাকে দেখামাত্র দ্বিগুণ কলরবে আসর মাতোয়ারা। দল ভেঙে দত্তপাড়ার প্রায়-ভূমিষ্ঠ বারইয়ারীতে এসে গড়াগড়ি খাবার মতই মূর্তিমান প্রথম নজির দেখার আনন্দে উল্লাসিত তারা।

রাধানাথ উদার অভ্যর্থনা জানালো তাকে, এসো শ্রীনাথ এসো এসো, পথ ভুলে এসেই যখন পড়েছ—বোসো। তা এই ভরসন্ধ্যায় চাক ছেড়ে মক্ষিকা উদাসী হল, কি ব্যাপার?

ঢোঁক তল করতে গেলেও এ ধরনের পরিবেশে ছিরে পাগলার গলা দিয়ে দুই একটা উদ্ভট শব্দ বেরিয়ে থাকে সচরাচর। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হল। শ্রীনাথ গম্ভীর, আবার ঈষৎ উতলাও। জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখানে ....বউ কেমন আছে?

একটুও কিন্তু না করে রাধানাথ পাল্টা তরল প্রশ্ন নিক্ষেপ করল, কার বউ?

এই পরিবেশে ছিরে পাগলার গাম্ভীর্য আর প্রশ্ন দুই-ই কিছু একটা রসের সঙ্গে যুক্ত এ-রকম সন্দেহ সকলেরই হয়েছিল। দলের মুরুব্বীর পাল্টা রসিকতায় নিশ্চিন্ত হয়ে তারাও সরবে মুখ খুলল, কার বউ হে শ্রীনাথ, কার বউ? বলি কার বউয়ের খবরের আশায় এই পূর্ণিমার সন্ধ্যেয় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি?

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছিরে পাগলা দেখে নিল সকলকে, অর্থাৎ মিলিত কলতান একটু থিতোবার সুযোগ দিল। তারপর তেমনি গুরুগম্ভীর মুখ করে জবাব দিল, রাধানাথের বউয়ের।

সুর-সভায় ছন্দপতনই ঘটল হঠাৎ। এ-রকম রসিকতা যার বউ তার অনুপস্থিতিতে হলেও এতটা থতমথ খেত না কেউ। জোড়া জোড়া পানবিহ্বল চোখ রাধানাথের মুখে এসে বসতে লাগল। এ-রকম বেপরোয়া উক্তি রসিকতার মর্যাদা পেতে পারে কিনা সেই অনিশ্চয়তায় হঠাৎ চুপ সকলে।

সাদা মাথায় থাকলে এইতেই চোখ গরম হত রাধানাথের। নিজে সে বেরসিক নয় আর অন্যের বউ সম্পর্কে তার আগ্রহ বা রসবোধ কৃপণ নয় আদৌ, তা বলে নিজের বউকে, বিশেষ করে চণ্ডীবউকে বারইয়ারী রসের আসরে টানাটানি করাটা বরদাস্ত করতে পারে না সে। কিন্তু সদ্য বর্তমানে—বৈশাখী পূর্ণিমার এই জোৎস্নার বান-ডাকা সন্ধ্যায় সাদা মাথায় বসে নেই রাধানাথ। জঠরের তরল পদার্থের প্রতিক্রিয়া একটু-আধটু শুরু হয়েই গেছে। তাই কোন্ পর্যায়ের রসিকতা এটা সেটাই চট্ করে ঠাওর করে ওঠা গেল না।

ছিরে পাগলার মুখের দিকে চেয়ে বোকার মত হাসতে চেষ্টা করল একটু, তারপর জিজ্ঞাসা করল, চণ্ডীবউয়ের খবর পাবার জন্য ব্যস্ত কেন হে, মা-চণ্ডীর কোপে পড়েছ নাকি?

অন্য সকলেও হেসে উঠি-উঠি করছে, কিন্তু ছিরে পাগলা তার দিকে ফিরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল খানিক। তারপর মুখ খুলল, গোটা গাঁ উতলা আর ওদিকে বউয়ের কি হয়ে গেল তুমি জানোই না এখনো?

নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল রাধানাথ। বুদ্ধির কণাগুলো মগজের যথাস্থানে পাঠাতে চেষ্টা করল আগে। রসিকতাই যদি হয়, এই রসিকতায় টনক নড়েছে একটু। —কার বউ?

বিরক্তি চাপতে না পেরেই যেন গলা দিয়ে একটা বেখাপ্পা শব্দ বার হয়ে গেল ছিরে পাগলার।—তোমার তোমার! আর কার বউয়ের খবর নিতে তোমার কাছে ছুটে আসব?

মাথা আরো একটু খোলসা হল এবারে।—কি হয়েছে?

এই প্রশ্নেরই প্রতীক্ষা, কি হয়েছে তাই বলতেই আসা।

সপল্লবে সমাজের বিস্তারে মগ্ন হল ছিরে পাগলা।...রাধানাথের বোনেদের সঙ্গে মহাচণ্ডীর থানে গেছলেন মা-লক্ষ্মী। আহা, দেখে চোখ জুড়িয়েছে সকলের, স্বয়ং চণ্ডীই বুঝি পা ফেলেছেন মহাচণ্ডীর থানে—উগ্রচণ্ডী নয়, অবলাকোমলা চণ্ডী। কাতারে কাতারে মানুষ, দেখে চক্ষু সার্থক সকলের—কোন্ চণ্ডী দেখে তারা?...কিন্তু কি যে হয়ে গেল তারপর। বলির থানে অত কাটা বলি দেখে আর সেই রক্তের স্রোত দেখে হঠাৎ একে ঠেলে ওকে ফেলে আলুথালু দিশেহারা মা-লক্ষ্মী দে ছুট। এক ছুটে কানা অশথের তলায় এসে একেবারে অজ্ঞান!

অজ্ঞান! নেশা ছুটে এসেছে অনেকের, হায় হায় করে উঠল তারা, একেবারে অজ্ঞান? বলো কি শ্রীনাথ?

হ্যাঁ, প্রথমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অজ্ঞান। বেহতের মত মা-লক্ষ্মী একবার এদিকে

দোলেন একবার ওদিকে—একবার ঢালের দিকে একবার থানের দিকে, এদিকে পড়লে হাত-পা কেটে রক্তগঙ্গা, ওদিকে পড়লে প্রাণসংশয়।

কোন্ দিকে? কোন্ দিকে পড়লেন শেষে?

কোনদিকে না, পড়ার আগেই কোথা থেকে হাওয়া ঠেলে ছুটে এসে আমাদের মদনমোহন তাঁকে ধরে ফেলল—তারপর মা-লক্ষ্মী শুয়ে অজ্ঞান।

উদ্‌গ্রীব শ্রোতারা নিশ্বাস ফেলে বাঁচল, নিশ্বাস শুধু একজনেরই রুদ্ধ হবার উপক্রম। ধরে ফেলার সঙ্গে মদনমোহনের নামটা যুক্ত হওয়ামাত্র কানের ভিতর দিয়ে সেটা যেন মগজ কেটে কেটে বসতে লাগল—কোথায় শুয়ে অজ্ঞান?

ছিরে পাগলার মুখে দার্শনিক গাম্ভীর্য, জবাব দিল, মা-চণ্ডীর দূত হয়ে এসে রক্ষা করেছে মদনমোহন, তার কোলে মাথা রেখে...মা-লক্ষ্মী তো তখন অজ্ঞান শিশু।

নেশা যেটুকু হয়েছিল রাধানাথের দ্রুত ছুটে যাচ্ছে, মাথার দিকে রক্ত উঠছে।

আর প্রশ্ন নাও হতে পারে মনে হতে নিজে থেকেই পরের বর্ণনায় অগ্রসর হয়েছে ছিরে পাগলা।—চোখ জুড়োবার মতই মায়ের খেলা, সে এক দৃশ্য! এদিকে মা-লক্ষ্মী অজ্ঞান, অন্যদিকে সব্ব-আপদ থেকে তাঁকে আগলে মদনমোহনও প্রায় অজ্ঞান, আর আমরা যারা বোবার মত দাঁড়িয়ে দেখছিলাম—তারাও। তা আমাদেরই জ্ঞানটা আগে ফিরল, আর তখন জলের বালতিও এসে গেল। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে দিয়ে মদনমোহনই জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করল। কিন্তু জ্ঞান ফেরার আগে সে কি কম্প মা-লক্ষ্মীর, তড়কা জ্বরের মত সর্ব অঙ্গের থর থর ভূমিকম্প যেন একেবারে—গোপিনীকুলমানিনী মা রাধিকারও অমন কম্প হয়েছিল বলে শুনি নি।

চোখ বুজে মা-লক্ষ্মীর সেই কম্পের দৃশ্যটাই যেন দেখতে লাগল ছিরে পাগলা।

রঙিন বস্তুর রঙ গেছে, গেলাস পড়ে আছে, রাধানাথ উঠে গেছে।

রসিকতাই যদি হয়ে থাকে, ছিরে পাগলার টুঁটি ছিঁড়ে নেবে সে।

কিন্তু রসিকতা যে নয়, বাড়ি ফেরার পথেই তার প্রমাণ পেয়েছে। মাথার ওপর বৈশাখী চাঁদ উপুড় করে জ্যোৎস্না ঢালছে। সেই আলোয় চেনা মানুষের চিনতে ভুল হয় নি তাকে। করণে তাকে না চেনেই বা কে! একে একে তিনজন তাকে মা-লক্ষ্মীর কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করেছে। রাধানাথের তাতেই মনে হল এই এক খবরে করণের বাতাস ভরাট হয়ে গেছে। গোটা গাঁ-সুদ্ধু মানুষ এই নিয়ে জটলা করছে, কানাকানি করছে, হাসাহাসি করছে। রাধানাথ তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

বাড়ি।

সিঁড়ি টপকে সরাসরি নিজের ঘরের দিকে যেতে পারল না রাধানাথ, তার আগেই বোনেদের হাতে ধরা পড়ল। এরই মধ্যে তাকে পাবে আশা করে নি। পেয়ে খুশি। যে-রসদ নিয়ে তারা থানের থেকে ফিরেছে আজ, মহামূল্য বস্তুর মতই দুই বোন সেটা আগলে বসে ছিল। বাবা তো শুনে ওই মন্তব্য করে গেছে, মা-কে অবশ্য যতটা সম্ভব বলা হয়েছে, কিন্তু তাতে আর তৃপ্তি কতটুকু! নিজেদের

মধ্যেও এ নিয়ে অনেকবার মন্তব্য বিনিময় হয়ে গেছে কিন্তু তাতে ব্যাপারটার চটক বেড়েছে বই কমেনি একটুও।

ছোটজনই সিঁড়ি থেকে ফেরালো তাকে, রাধা ফিরলি নাকি, হন্তদন্ত হয়ে চললি কোথায়, তোর বউ খুব ভালো আছে, শোন্, এদিকে আয়—

ওধারের ঘরে বড়র উদ্দেশে গলা চড়ালো সে, ও-দিদি, রাধা ফিরেছে—

রাধানাথ মাঝসিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গেছে। দরজার সামনে বড়দির দেখাও মিলল। কিন্তু বড়দি তার দিকে না তাকিয়ে সহোদরাকেই ফিরে জিজ্ঞাসা করল, সজ্ঞানে না অজ্ঞানে?

জবাবে ছোটদিদি হি-হি করে হাসতে লাগল। এবারে ভাইয়ের দিকে ফিরে বড়দি টিপ্পনীর সুরে বলল, একজনের তো এখনো ভালো করে জ্ঞান ফেরে নি, যে যাচ্ছে তার দিকেই ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে, দেখে তুই না আবার ঠাস করে অজ্ঞান হয়ে পড়িস রাধা—এখন গিয়ে কাজ নেই, এদিকে আয়।

ঘোরালো চোখে দিদিদের দেখে নিয়ে রাধানাথ পায়ে পায়ে নেমে এলো। ছিরে পাঁগলা যা বলেছে তার থেকে কম কিছু শুনবে বলে মনে হল না। ওরাই তো বউয়ের সঙ্গে ছিল সারাক্ষণ, ভালো করে সব না শুনে আগেই সে বোকার মত ঘরের দিকে ছুটছিল কেন?

আদর করে বোনেরা ভাইকে ঘরে এনে বসালো। সে কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বস্তিকর গন্ধ নাকে এসেছে, কিন্তু ওই সামান্য ব্যাপার খেয়ালের মধ্যে আনলে এতক্ষণের দম-বন্ধ-করা প্রতিক্ষাই মাটি। রাত বারোটার সময় ফিরলেও রাধানাকে ওই সিঁড়িতেই ধরা হত যেমন করে হোক।

বড়দি জিজ্ঞাসা করল, থানে আজ কি হয়েছে শুনেছিস?

তার মুখের ওপর সজাগ দৃষ্টি ফেলে রাধানাথ বিড়বিড় করে জবাব দিল, ওরা কি সব বলাবলি করছিল। ...কি হয়েছে?

ছোটদিদির গালে হাত, মা-মা! বলাবলি করবে না—সারাগাঁয়ে এতক্ষণে টি-টি পড়ে গেছে বোধহয়। কি কাণ্ড কি কাণ্ড, এমন আর দেখিও নি কি শুনিও নি।

ভায়েব অসময়ে নেশা-ছোটা রক্ত কত দ্রুত গরম হচ্ছে বোনেদের ধারণা নেই। বড় বোন ঠোঁট বেঁকিয়ে মন্তব্য করল, তোর বউটা একটা হাঁদা একটা ক্যাবলা, রূপসী বউকে কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখিস এবার থেকে, আর বাইরে বের করে কাজ নেই। বউ ঠকাতে গিয়ে জব্দ হবার জ্বালা জুড়চ্ছে বড় বোন, তোর আগের বউটা পর্যন্ত এটার থেকে শক্ত ছিল—বলি আর রক্ত দেখে কেঁপে-কেঁপে অজ্ঞান হয়ে একাকার কাণ্ড! দত্তবাড়ির নাম ডুবিয়েছে, বাবা আবার তাকে মাথায় করে আছে, কথায় কথায় বলে, মা চণ্ডীর যেমন তেজ তেমন রূপ—তেজ নিয়ে তো আজ পালাতে পথ পাইনে আমরা!

জ্যেষ্ঠার এই বলার বিষয়বস্তুই আদৌ পছন্দ হল না কনিষ্ঠার। সে বলে উঠল, তা ছেলেমানুষ, অত ভিড়, অত বলি, অত রক্ত দেখে হঠাৎ ভয়-টয় পেয়ে অজ্ঞান না হয় হয়েইছে—কিন্তু ওই পাজী ছোঁড়াটা কি করল! কি বেহায়া কি বেহায়া, একটু লাজ-লজ্জা পর্যন্ত যদি থাকত! তোর বউকে কানা অশথের দিকে

ছুটতে দেখে আমরা আর গিয়ে সেরে উঠতে পারলাম না, আকাশ থেকে পড়ে দিব্বি গিয়ে ধরে ফেলল, বউ অজ্ঞান হচ্ছে জানাই ছিল যেন। তারপর বলা নেই কওয়া নেই মাথা কোলে নিয়ে বসল যে বসলই—আর নিজের হাতে ঝাপটার কি ঘটা, মাথা মুখ মায় বুক পর্যন্ত ভিজে সারা—কি লজ্জা!

লজ্জার উদ্দীপনায় ভাইকে নিরীক্ষণ করছে দুই বোন। বুকের ভিতরটা আর একপ্রস্থ ছলাৎ করে উঠল রাধানাথের।...মিলছে, ছিরে পাগলার কথা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলছে। আরো কিছু শুনবে? আরো কিছু মিলতে বাকি আছে? রাধানাথ এই তপ্ত মস্তিষ্কে ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছে না। বড় বোন ছোট বোনের একটা ত্রুটি সংশোধন করল যেন, ধরার জন্য ছোঁড়াটা আকাশ থেকে পড়তে যাবে কেন, থানে সারাক্ষণই তো হ্যাংলার মত পিছনে পিছনে ঘুরঘুর করছিল, শেষে অসহ্য হতে আমাদের বউয়ের মাথায় ঘোমটা তুলে দিলাম দেখিস নি? ছায়ার মত ও ঠিক কাছে-কাছেই ছিল, যেই ভিরমি যেতে দেখেছে ওমনি সবার আগে দৌড়ে এসে চেপেচুপে—

অশালীন উক্তিটা আর সম্পূর্ণ করল না বড় বোন।

রাধানাথ কি করবে এখন? একটা ছোরা-টোরা নিয়ে ঘোষালবাড়ির দিকে ছুটবে? কলজেটা ছিঁড়ে নিয়ে আসবে? করণের এত মানুষ থাকতে সবাই বলবে ওই মদন ঘোষালের জন্যেই বেঁচে গেছে দত্তবাড়ির বউ তাতেই সর্বাঙ্গ জল বিছুটি লাগার উপক্রম—তার পর এ যা শুনল, এ তো একেবারে গায়ের ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নেবার মত অসহ্য। মদন ঘোষালের শয়তানী কেউ দেখবে না, সকলে ভালো দেখবে আর বাহবা দেবে। তারপর নিজেদের মধ্যে মুখ টিপে হাসবে আর জটলা করবে আর মনের সুখে যা মুখে আসে তাই মন্তব্য করবে। রাত পোহালে বাইরে মুখ দেখাবে কি করে রাধানাথ?

পায়ে পায়ে দোতলায় নিজের ঘরের সামনে দাঁড়াল। চণ্ডীবউ ওধারের জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কে এলো না এলো সেই হুঁশও নেই।...রাধানাথের শিরায় শিরায় এত আগুন আর কি কখনো জ্বলেছে? নিঃশব্দে দেখে যাচ্ছে সে।...বউকে না, পর পর অনেক দৃশ্য দেখছে। কানা অশথের তলায় কাতারে কাতারে লোকের চোখের ওপর বউয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে অছে মদনমোহন। না, তারও আগে, ভিরমি যাবার আগে—দাঁড়ানো অবস্থাতেই ধরেছে, তারপর মাথা কোলে নিয়ে বসেছে। তার চোখেমুখে নিজের হাতে জলের ঝাপটা দিয়েছে, ছোটদি বলছিল সেই জলে বুক পর্যন্ত ভিজে সারা..আর ছিরে পাগলা বলেছে মদন ঘোষালের কোলে মাথা রেখেই থরথর করে কাঁপছিল বউ।

ঘরে ঢুকে আচমকা এক হ্যাঁচকা টানে ঘুরে চণ্ডীবউ তিন হাত দূরে মুখ থুবড়ে পড়তে যাচ্ছিল। সামলে নিল। ত্রস্ত শাড়ির আঁচল কাঁধে তুলতে তুলতে ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। বিমূঢ়, হতভম্ব সে।

মুখ বিকৃত করে রাধানাথ বল্লে উঠল, ধ্যান হচ্ছে এখনো! কোলে মাথা রেখে শোয়ার সুখ গায়ে লেগে আছে এখনো, কেমন?

তবু আত্মস্থ হতে যেন একটু সময় লাগল চণ্ডীবউয়ের। হঠাৎ এ কাকে দেখছে সে চোখের সামনে ভেবে পাচ্ছে না। বোধশক্তি ফিরছে একটু একটু করে। প্রথমেই

তার মনে হল, যে-বিপদ ঘটতে পারত তার থেকে অনেক বেশি কিছু ঘটলেও এই লোক অনেক বেশি ঠাণ্ডা থাকত, এর থেকে। অনেক সহজে তা সহ্য করতে পারত। ফাঁড়া না কাটলেই এর থেকে অনেক বেশি খুশি হত। দু'দিন বাদে অনায়াসে আবার একটা বিয়ে করে ফেললেই সব চুকে যেত। চণ্ডীবউ চেয়ে আছে।

থাবার মত দুটো হাত তার দুই কাঁধে উঠে এলো, হাঁ করে দেখছ কি? অঙ্গস্পর্শে কাঁপুনি হচ্ছে এখনো? আমি দেব ভালো করে কাঁপিয়ে?

বলতে বলতে ক্ষিপ্ত আক্রোশে দু'কাঁধ ধরে বিষম ঝাঁকুনি দিল গোটাকতক।

মুখের দিকে চেয়ে এ কি দেখছে চণ্ডীবউ! এত কুৎসিত এত বীভৎস এত হিংস্র মানুষ আর বুঝি দেখে নি সে। চোখে কদর্য আগুন, নিঃশ্বাসে কটু গন্ধ।

আবারও একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রাধানাথ বলে উঠল, মা-চণ্ডী—বাবা স্বপ্ন দেখেছে একেবারে চণ্ডী এসে হাজির হয়েছে ঘরে, বলি দেখে ভিরমি যায়, আবার মা-চণ্ডী—লজ্জা করে না?

খুব ধীরে মুখের দিকে রক্ত উঠছে চণ্ডীবউয়ের। দেখছে সেও।—ছাড়ো।

ছাড়ব, ছাড়ব তোমাকে! কেন, কেন তুমি দিদিদের ছেড়ে ছুটেছিলে, অপরের গায়ে ঢলবার জন্যে কেন ছুটেছিলে? যেখানে ছিলে সেখানে অজ্ঞান হওয়া যেত না?

লাল হতে হতে রক্তবর্ণ মুখ এখন চণ্ডীবউয়ের। এক ঝটকায় তাকে ঠেলে দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল প্রথম। আর সঙ্গে সঙ্গে আগুনের একটা ঝাপটা মেরে বসল বুঝি মুখের ওপর।—বেশ করেছি ছুটেছি, বেশ করেছি অজ্ঞান হয়েছি। তুমি পশু, নইলে লজ্জা তোমার হওয়া উচিত ছিল—বুঝলে বুঝলে বুঝলে?

মাথায় খুন চাপছে, তবু রাধানাথ স্তম্ভিত কয়েক মুহূর্ত। তারপর হিসহিস করে বলে উঠল, বাবা মাথায় তুলেছে বলে এত স্পর্ধা এত দেমাক তোমার! এ দেমাক থেঁতলে দেবার কেউ নেই ভেবেছ? আগের একজন ভয়ে সিঁটকে থাকত, জোরে নিশ্বাস ফেলত না...আর তোমার এত সাহস! তুমি—তোমাকে আমি—

রাগে কাঁপছে, কি যে করবে মুখে আসছে না।

আগের একজনের উল্লেখমাত্রে চণ্ডীবউয়ের অদম্য রোষ আর এক প্রতিক্রিয়ায় স্থির হতে থাকল হঠাৎ। এই অকরুণ নিষ্ঠুর আচরণে একটা সুপ্ত জিজ্ঞাসা সমস্ত আবরণ ঠেলে এক মুহূর্তে উদগ্র হয়ে উঠল বুঝি। দেখছে চণ্ডীবউ, তার এই মুহূর্তের দেখাটাই সব যেন।

তোমার আগের বউ কেন মরেছে?

দুর্বার ক্রোধের মুখে রাধানাথ আচমকা ঝাঁকুনি খেলো একটা। হঠাৎ হতচকিত সে।

চোখে-মুখে সমস্ত সত্তায় প্রশ্নটা বেঁধে উঠেছে চণ্ডীবউয়ের। কাছেও এগিয়ে এসেছে একটু। তুমি তো এই...তোমার আগের বউ অসময়ে মরেছে কেন? তার কি হয়েছিল?

রাধানাথ চেয়ে আছে। বিমূঢ়। থানের পশুবলি দেখে এই বউই অজ্ঞান হয়েছিল মনেও থাকল না। কালো দুটো চোখের তারায় স্থির-বিদ্যুৎ দেখছে সে। অমোঘ আকর্ষণে তার ভিতরসুদ্ধ টেনে বার করবে বুঝি।

...কয়েক নিমেষ। ওই চোখের আওতা থেকে এক ঝটকায় নিজেকে উদ্ধার করে দুমদাম পা ফেলে রাধানাথ শুধু ঘর থেকে নয়, বাড়ি ছেড়েই বেরিয়ে গেল আবার।

সকালের একটা নিয়মিত কাজ ঘণ্টাখানেক শাশুড়ীর সঙ্গে থাকা। সুতৎপর আগ্রহে তাঁর পিছনে পিছনে ঘোরা। বড়লোকের বাড়িতে দাসদাসীর অভাব নেই, রসুই বামুনের আলাদা হেঁসেলও আছে। গায়ে-গতরে বউয়ের কাজকর্ম তেমন করতে হয় না। তবু ঘরে বসে থাকলে কথা ওঠে। গরিব হোক বড়লোক হোক বাড়ির বউ ছায়ার মত শাশুড়ীর সঙ্গে লেগে থাকবে, তাঁর চাউনি দেখে কি চান বুঝে নেবে, তাঁর মেজাজের বাতাসে উঠবে বসবে নড়বে চড়বে—এটাই রীতি।

রীতির ব্যতিক্রম চণ্ডীবউ পরদিন করল না। শাশুড়ী চোখ তুলে আপাদ মস্তক একবার দেখে নিলেন শুধু। কেমন আছে-না-আছে জিজ্ঞাসা করলেন না। মাঝেসাঝে শ্বশুরের জন্য নিজেদের হেঁসেলে দুই-এক পদ রাঁধতে বলেন। আজ অবশ্য তা বললেন না। নির্দেশমত চণ্ডীবউ কিছু কুটনো কুটতে লাগল।

মহেশ্বর দত্ত সেখানে এসে দাঁড়ালেন।—আজ আবার এসব নিয়ে বসেছ কেন, শরীর কেমন?

তাঁর সাড়া পেয়ে চণ্ডীবউ হাতের উল্টো দিক করে মাথার কাপড় আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেকখানি মাথা হেলাল। অর্থাৎ ভালো।

কিন্তু শাশুড়ী তাতেও পরিতুষ্ট হতে পারলেন না খুব। তাঁর বিবেচনায় এভাবে এসে খোঁজ নেওয়াটাই বেশি-বেশি। শ্বশুর আড়াল হাবার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, যাও বাছা ঘরে যাও—ওটুকু আমিই করে নিচ্ছি।

চণ্ডীবউ উঠল না, কুটনো কুটতে লাগল। এও এক ধরনের অবাধ্যতাই। শাশুড়ীর গলার স্বর ঝাঁজালো হল একটু।—কি বললাম কথা কানে গেল?

বঁটির ওপর হাত থামল, ঘোমটা আবার একটু খাটো করে চণ্ডীবউ মুখ তুলে তাকাল। তারপর মৃদু জবাব দিল, আমার শরীর বেশ ভালো আছে, ঘরে গিয়ে কি করব?

এই এক ব্যাপার দেখলে ছেলের মত তার মাও অসুবিধেয় পড়ে যান। আগের বউ হলে তিনি ঠোঁট ফাঁক করা মাত্র আড়ষ্ট হাত থেমে যেত। আর কথা বলা দূরের কথা, চোখ তুলে তাকাবার কথা ভাবতেও পারত না। এই বউও বেশির ভাগ সময় চুপ করেই থাকে, কিন্তু কখনো আড়ষ্ট হতে দেখেছেন বলে মনে পড়ে না। আর মুখের দিকে চেয়ে খুব নরম গলায়ও জবাব দেয় যখন—সেটুকুও বড় বেশি স্পষ্ট মনে হয় তাঁর। পরে রাগ হয় বটে, কিন্তু তক্ষুনি কোনো কড়া কথা মুখে যোগায় না।

রাশভারী ভাবটুকু বজায় রাখার জন্য শাশুড়ী অন্যত্র উঠে গেলেন।

মুখে যাই বলুক শরীর সত্যিই ভালো লাগছিল না চণ্ডীবউয়ের। কুটনো শেষ করে ঘরের দিকেই পা বাড়াল।

বেশি রাতে ঘুমিয়েছিল।...রাগে জ্বলতে জ্বলতে মানুষটা আবার ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরেই ভয়ানক অবসন্ন লাগছিল। ভিতরটা শয্যার আশ্রয় চাইছিল। কিন্তু

শোবার অবকাশ যখন পেল তখন আর ঘুম নেই চোখে। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করেছে।

থানের অঘটনের কথা ভাবছিল না আর। পরের অকরুণ ব্যাপারটাই তাকে ধাক্কা দিয়েছিল। সতের বছরের চণ্ডীবউ জটিলতা বিশ্লেষণে পটু না হলেও যে কুৎসিত ছায়াটা টেনে আনা হয়েছিল—সেটা ঠিকই চিনেছে। আর শাসন যে করতে এসেছিল তার ক্রুদ্ধ মুখের ওপর আগের বউয়ের প্রসঙ্গে সেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেই আচমকা বিমূঢ় মূর্তিও লক্ষ্য করেছে। কিছুদিন ধরে যে অস্বস্তি তার নিভৃতের চিন্তার মধ্যে থিতিয়ে ছিল, রাতের শয্যায় বার বার সেটাই ছেঁকে ধরতে চেয়েছে। সেই সঙ্গে একটা সঙ্কল্পের দিকও টেনেছে তাকে। আগের বউয়ের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সঙ্কল্প। অসময়ে কি হয়ে মরল সেই সংশয় ঘোচাবার সঙ্কল্প।

...মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল। পাশের শয্যা খালি। দরজা দুটো যেভাবে ভেজিয়ে রাখা হয়েছিল, তেমনি আছে। আবার সকালে উঠেও তাই দেখেছে। কোথাও যাত্রাগান না থাকলে যত রাতেই হোক বাড়ি ফেরেই। সেই প্রথম ব্যতিক্রম।

কুটানো কোটা সেরে চণ্ডীবউ ঘরে ফিরল. বেলা প্রায় নটা তখন। ঘরে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। ....ফিরেছে। কখন ফিরেছে টের পায়নি। বাপের চোখ এড়ানোর জন্যে খুব সন্তর্পণে ফেরা হয়েছে বলেই ধরে নিল। নইলে টের না পাওয়ার কথা নয়।

পালঙ্কের মাথায় ঠেস দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে আধশোয়া হয়ে পড়ে ছিল রাধানাথ। বউকে দেখেও তেমনিই থাকল। চোখের কোলে কালি। মুখে অতিরিক্ত পানের ছাপ। আর পান-খাওয়া ঠোঁটে শুকনো লাল ছোপ।

একনজর তাকিয়ে ওধারেব দরজা দিয়ে পায়ে পায়ে বাইরের দিকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল চণ্ডীবউ। ঘরের বাতাসে কি যেন অশুচি স্পর্শ একটা। ওই সব খেয়ে অনেক সময়ই তো ঘরে ফেরে আজকাল। কিন্তু অন্য দিন ঠিক এরকম তো লাগে না। আগে দেখলে চণ্ডীবউ তাকে একেবারে চান-টান সেরে পালঙ্কে এসে বসতে বলত কিনা জানে না।

দাঁড়িয়েই ছিল। সামনেই গোটাকয়েক বকুল কাঠ-করবী আর চাঁপা গাছ। তার ওধারে আম-কাঁঠালের। বাড়ির মেয়েছেলেরা যাতে অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরের দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াতে পারে সেজন্যেই এই ব্যবস্থা। প্রাচীরের ওধারের পথের মানুষ দেখতে পাবে না। কিন্তু আঙ্গিনার মধ্যে ঢুকে বাড়ির কাছাকাছি এলে দেখা যায়। তখন সবে দাঁড়ালেই হল।

হঠাৎ সরেই দাঁড়াল চণ্ডীবউ। ছোটখাটো একটা ঝাঁকুনি খেয়েই সরে দাঁড়াল। কারণ আঙ্গিনায় ঢুকেছে কেউ, বাড়ির কাছাকাছি এসেছে কেউ। কিন্তু কখন ঢুকেছে, কখন এসেছে, বিমনা চণ্ডীবউ টের পায় নি।

টের যখন পেল, লোকটা তখন মন্থর গতিতে ওধারের বার-বারন্দার কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু যেদিকে চলেছে, দু'চোখ সেদিকে নয়। এই দিকে। ঠিক এই দিকেই।

ঘোষালবাড়ির মদনমোহন ঘোষাল।

তার আসাটা এত অপ্রত্যাশিত যে স্থান-কাল ভুলে চণ্ডীবউ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। না পারল ঘরে ফিরতে, না কার্নিসের দিকে এগিয়ে যেতে।

একটু বাদে রাধানাথ ঘর ছেড়ে এগিয়ে এল। তার চোখমুখে রাতজাগা ক্লান্তি, অতিরিক্ত মদ খাওয়ার তেলতেলে ছাপ। হঠাৎ নতুন উত্তেজনার খোরাক পেয়ে বউয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোলাটে দৃষ্টি তাজা হয়েছে। এইমাত্র ছোটদিদি প্রায় দৌড়ে এসেই খবর দিয়ে গেল একটা। শোনামাত্র রাধানাথের অবসাদ কেটেছে। বাবার হুকুম শুনে তাজ্জব বনেছে প্রথম। দপ্ করে জ্বলে উঠেছে তারপর। তারপর সেই রাগের মুখেই একটা পিচ্ছিল ক্রুর আনন্দ ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চেয়েছে।

পিছন থেকে বউয়ের মুখের যেটুকু আভাস দেখা গেল তাতেই তার মনে হল বাড়িতে একজনের পদার্পণের সমাচার অজ্ঞাত নয়। ওখানে অতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল যখন, আসতেই দেখেছে হয়ত। মনে হওয়া মাত্র নিরুপায় ক্ষোভের অসংযত উল্লাস দ্বিগুণ বাড়ল।

বলে উঠল, দ্বিতীয় দফা শুভদৃষ্টি হয়ে গেল নাকি? ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন— দৌড়ে নীচে যাও, আবার অজ্ঞান হলেও মাথা কোলে নিয়ে জল-বাতাস করার লোক তো এসে গেছে!

আস্তে আস্তে চণ্ডীবউ তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এই বিদ্রূপ ওষুধের কাজ করল। বিমূঢ় ভাব দ্রুত কেটে আসতে লাগল। ছেলেবেলা থেকে এই স্বভাব, আঘাত পেলে ঝলসে উঠতে সময় লাগে না। দেখছে, দুই চোখের পিচ্ছিল আক্রোশ দেখছে। চণ্ডীবউ আবার কিছু বলবে বলে সময় নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। সন্দেহের যে বিষ মাথায় চেপে বসে আছে গত রাত্রি থেকেই তারই আবার একটা ঝাপটা মেরে দেখবে মুখখানা কেমন হয়। কাল দেখেছিল। আজ আবার দেখার ইচ্ছে। বোঝার ইচ্ছে। তাই দেখে নিচ্ছে। এবার জিজ্ঞেস করবে, জবাব না দিয়ে কাল রাতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল কেন—সমস্ত রাত বাইরে কাটিয়ে এল কেন—তার প্রথম বউ অসময়ে মরে গেল কেন—অসময়ে তো কতই মরে, কিন্তু স্বাভাবিক ব্যাপার হলে সেটা বলতে এমন অসুবিধে হচ্ছে কেন—

ফুরসত পেলে না। কারণ রাধানাথও শুধু ওই কথাগুলো বলবে বলেই শয্যা ছেড়ে এই মুখ করে উঠে আসেনি। সে প্রায় অবিশ্বাস্য একটা খবর দিতে এসেছে। বলে উঠল, আর দাঁড়িয়ে না থেকে নীচে যাও, বাবা ডাকছে! অতিথির ঘরে বাবা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে, বুঝলে? তোমার প্রাণরক্ষা করেছে, আদর-আপ্যায়ন করতে হবে না, অতিথি-সৎকার করতে হবে না! এই বুড়ো বয়সে একা পেরে উঠবে কেন—যাও যাও শীগগির যাও!

চণ্ডীবউ হতভম্ব আবার। যে প্রশ্ন নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল— ভুল হয়ে গেল। অনাত্মীয়ের সামনে বাড়ির বউকে এভাবে ডেকে পাঠানো রীতি নয়। পূজনীয় বৃদ্ধগোছের কেউ এলে যেতে হয়, আধ হাত ঘোমটা টেনে প্রণাম করে আসতে হয়। চণ্ডীবউ বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না। দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর পায়ে পায়ে বারান্দা ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোলো।

বাড়ির কর্তা ডাকলে কারো বাধা দেবারও ক্ষমতা নেই, অমান্য করারও ক্ষমতা নেই। নইলে যে এসেছে, তাকে এভাবে নাগালের মধ্যে পেয়ে মায়ের থানে বউয়ের প্রাণদাতাটির প্রাণ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করার মত আক্রোশ রাধানাথের শিরায় শিরায় ওঠা-নামা করেছে।

মহেশ্বর দত্তর ওপর তাঁর গৃহিণীর অথবা মেয়েদের সেরকম আস্থা থাকলে ঘোষালবাড়ির ছেলের প্রতি তাঁর এই ঘরের ছেলের মত ব্যবহারের একটা অর্থ সুস্পষ্ট হতে পারত। কিন্তু তাদের গোড়ার ধারণাতেই একটা ভুল থেকে গেছে। সকলের বিশ্বাস বাড়ির কর্তাটি তাঁর একমাত্র ছেলের প্রতি সম্পূর্ণ নিস্পৃহ এবং প্রয়োজনে কঠিন। আর রাধানাথের বিশ্বাস বাবা তার প্রতি অকারণে এবং অপ্রয়োজনেও কঠিন। মালতীবউ মারা যাবার পর মহেশ্বর দত্ত এই ধারণাটা সকলের মনে আরো বেশি স্পষ্ট করে তুলেছিলেন।

কিন্তু ভিতরের মানুষটা একমাত্র ছেলের প্রতি স্নেহান্ধ, দুর্বল। বিত্ত যত বাড়ছে একটা দুর্ভাবনা ততো বেশি মাথায় চেপে বসেছে। বয়েসকালে প্রবৃত্তির লাগাম খুব সংযত ছিল না তাঁরও। এই পরিবারের ওপর কমলার প্রসন্ন দৃষ্টি পড়েছিল পৈতৃক ব্যবসার আমল থেকেই। সেই সচ্ছলতার স্রোতে তিনিও অনেক দিকে ভেসেছেন। কিন্তু এ সচ্ছলতার সঙ্গে সে সচ্ছলতার তুলনা হয় না। মুখের দিকে তাকালেই প্রবৃত্তির দিকটা বুঝে নিতে পারেন মহেশ্বর দত্ত। তাঁর ভয় এই সচ্ছলতার স্রোতে ছেলেটা ভাসবে না তাঁর মত—ডুবেই যাবে। ভয়টা অহেতুক নয়, ছেলেব দিকে চেয়ে কোথাও এতটুকু জোরের দিক দেখেন নি তিনি। ছেলের চরিত্র তিনি দর্পণে দেখতে পান। এই কারণেই শুধু রূপ নয়, চণ্ডীবউয়ের তেজের দিকটার আরো বেশি ভক্ত তিনি। তাঁর আশা এই তেজস্বিনী বউই ঘর সামলাতে পারবে। সম্প্রতি গৃহিণী অবশ্য তাঁর মনে সংশয়ের ছায়া ফেলেছেন একটা। বউয়ের ছেলেপুলে হওয়ার লক্ষণ নেই কেন? বংশে নতুন মানুষ না এলে তো সব দিকই গেল। কথাটা সত্যি, এই অঢেল বিত্ত কোনো বংশধরের ভোগে আসবে না ভাবলেও সব শূন্য মনে হয় মহেশ্বর দত্তর। কিন্তু এই দুশ্চিন্তা তিনি মন থেকেই ছেঁটেই দিয়েছেন। সতের বছর মাত্র বয়েস বউয়ের, এখনই ভাবনার কি আছে—ঠিকই হবে। অনেক বামুনঘরের বয়স্কা মেয়ের বিয়ের পাঁচ-সাত-দশ বছর বাদেও ছেলেপুলে হয়েছে এরকম নজির তাঁর জানা আছে।

আপাতত আসল ভাবনাটা তাঁর ছেলেকে নিয়ে। যে ছেলের প্রতি ভিতরে তিনি স্নেহে অন্ধ, অথচ বাইরে নির্লিপ্ত, প্রায় কঠিন। তারই পাশাপাশি আর একটা ছেলেকে দেখে আসছেন তিনি। ঘোষালবাড়ির এই ছেলেটাকে। মদনমোহন। তার দিকে তাকালেই একটা চবিত্রের হদিস পান। সত্তার একটা জোরের দিক দেখেন। ওই ছেলে একদিন মোহগ্রস্থ সংকল্পে বাপের আনা কীর্তনী দলের মা-মেয়েকে সরিয়েছিল, আর যে-রমণীর নাম শুনলে করণের অতিবড় রসিকও বেফাঁস জিব নাড়তে ডরায়—অঘোর নিবাসের ওই ক্ষমাযোগিনীকে বিয়ে করার বাসনা ব্যক্ত করেছিল, তাও জানেন। করণের বাতাসে কথা ছড়ায়, না জানার না শোনার কারণ নেই। কিন্তু ওসবের মধ্যেও ছেলেটার পুরুষকার দেখেছিলেন মহেশ্বর দত্ত, পুরুষের অভিলাষ দেখেছিলেন। ওর বাপ মুখ শুকিয়ে অঘোর নিবাসে ছুটেছিল শুনে আনন্দ হয়েছিল বটে, কিন্তু ছেলেটাকে একেবারে হেয় করে দেখা সম্ভব হয়নি।

বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মানুষ মহেশ্বর দত্ত। দিনে দিনে তাঁর বুদ্ধির ধার বেড়েছে, বিচক্ষণতা বেড়েছে। বাতাস টেনে করণের হাল বুঝতে পারেন, ভবিষ্যৎ অনুমান করতে পারেন। ঘোষালের এই ছেলেটা এখনই অনেকের আনুগত্যের সামনের সারির

দিকে এগিয়েছে। কালে-দিনে ছেলেটা যে করণের মাথা হয়ে উঠবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই ওর বাপও হতে পারত, ধর্মে-কর্মে মতি ঘুরে গেল বলে সকলের শ্রদ্ধা কুড়িয়েই কাল কাটিয়েছে। কিন্তু তার ছেলেটা অন্যরকম হতে পারে। অন্যরকম হবে বলেই ধারণা। তাঁর অবর্তমানে তখন এই ছেলেটার পাশে নিজের ছেলের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। শুধু তাই নয়, টাকার দেমাকে নির্বোধ ছেলে শত্রুতা করতে গিয়ে বিপদ টেনে আনবে কিনা তাও বলা যায় না। ঘোষাল বংশের ধর্মের মতি যেমন জানেন, গোঁয়ার্তুমতির গল্পও তেমনি জানেন। ওই কর্তাঘোষালের বাপই তো গাঁয়ের লোকের গা কাঁটা দেবার মত কাণ্ড করেছিলেন একবার। তাঁর গোয়ালের গরু বাঘে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। দুটো তীরন্দাজ আর নিজে একটা টাঙ্গি নিয়ে সাতদিন বন-বাদাড়ে ঘুরেছেন তারপর। বিষাক্ত তীরে আহত ক্ষিপ্ত বাঘকে কুপিয়ে শেষ করেছিলেন তিনি। কারো কথা শোনেন নি। বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—সাত মাস শয্যাশায়ী ছিলেন তারপর।

সেই মানুষকে তো স্বচক্ষে দেখেছেন মহেশ্বর দত্ত। পিতৃপুরুষের রেষারেষি সত্ত্বেও ওই মানুষের সামনাসামনি ঘেঁষতেন না। মাঝবয়সে দানের নেশায় পেয়ে বসেছিল তাকে। নানা অছিলায় অনেক বাজে লোকেও আসত তখন তাঁর কাছে। তখনো অন্তস্তলবিদারী সেই দুটো টানা-চোখের গভীর দৃষ্টি ভোলবার নয়। সব বুঝেও যে তিনি দান করেছেন, অনুগৃহীতকে সেটা ওই এক চাউনিতেই বুঝিয়ে দিতেন।

মহেশ্বর দত্তর কেমন ধারণা, ঘোষাল-কর্তার এই ছেলেটাও ঠাকুরদার ধারা পেয়েছে। ওর ধমনীতে তাঁর রক্তই বেশি বইছে। ছেলেটার স্বচ্ছ টানা দুই চোখের দিকে তাকালে সে কথা আরো বেশি মনে হয় তাঁর। মদনমোহনের বাপের সঙ্গে রেষারেষি তিনিও কম করেন নি। কিন্তু ঘোষাল-কর্তা হঠাৎ মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা আমূল পরিবর্তন অনুভব করেছেন। চিরমৌন মৃতের দিকে চেয়ে চেয়ে মৃত্যুর এক অনাবিল বৃহৎ রূপ দেখেছিলেন তিনি। তাঁর চোখে জল এসেছিল। সকলের বিস্মিত চোখের সামনেই এই ছেলেটার মাথায় হাত রেখে তিনি বলেছিলেন, করণে আর মানুষ থাকল না।

মৃত্যুর কোন্ দাক্ষিণ্য তিনি অনুভব করেছিলেন নিজেও ভালো জানেন না বোধ হয়। সেই থেকেই পরিবর্তন। মানুষটা যে শেষ পর্যন্ত জিতেই গেল এ আর নিজের কাছেও অস্বীকার করতে চেষ্টা করলেন না।

আর সেই থেকেই নিজের স্বার্থের দিকে চোখ ঘুরেছে মহেশ্বর দত্তর। বংশগত রেষারেষি ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছেন। চেয়েছেন বলেই নিজের আব ছেলের দুর্বলতা আরো বেশি চোখে পড়েছে। সেই সঙ্গে ছেলের জন্য তাঁর ভয় বেড়েছে, দুশ্চিন্তা বেড়েছে। কেবলই মনে হয়েছে তাঁর অবর্তমানে এ বিত্ত থাকবে না, তার থেকেও অনেক বড় দুর্যোগ ঘনাতে পারে।

ঘোষাল-কর্তার মৃত্যুর সেই অনুভূতি প্রবণতা কেটে এসেছে। এখন বাস্তব স্বার্থটাই বড় হয়ে উঠেছে। ছেলেকে আগলে রাখার স্বার্থ। এই স্বার্থের দিকে চেয়েই নিজের সামান্য কর্মচারীর মেয়েকে সাগ্রহে ঘরে এনে তুলেছেন। আর এই স্বার্থের দিকে চেয়েই আজ ঘোষাল-কর্তার ছেলের সঙ্গে আপনজনের মত ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ঘোষালবাড়ির ছেলে আর যাই হোক, বেইমানি করবে না এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূল।

যদি একে কাছে টানতে পারেন, অনেক দুর্ভাবনার লাঘব হবে। ছেলেটা বেকার বসে আছে এখন, আপনজনের মত কাছে টেনে কারবার দেখাশুনার ভারও যদি কিছু চাপাতে পারেন—সর্বদিকেই নিশ্চিন্ত তাহলে। বিত্ত রক্ষা হবে। আর নিজের ছেলের ভবিষ্যৎও সুনির্বিঘ্ন হবে। অন্য কর্মচারীর তিন গুণ টাকা দিলেও কর্মচারী হয়ে আসবে না জানেন। মর্যাদার অনুষ্ঠানটাই বড় করে তুলতে হবে। কি করা যায় তা পরে ভাববেন। তাঁর বড় আদরের বউকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে শোনার পর থেকেই আসল স্বার্থের চিন্তাটা তাঁর মাথায় ঘোরাফেরা করছে। প্রকারান্তে অদূরভবিষ্যতে নিজের ছেলের নির্ভরযোগ্য বশ্যতার আওতায় এনে বেঁধে ফেলতে চান যাকে, তারই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বাড়িতে।

মহেশ্বর দত্ত খুশি হবেন না তো কে হবে!

শুধু ছেলের বউ নয়, বাড়ির গৃহিণীরও ডাক পড়েছিল। মদনমোহনকে সদর-বৈঠকখানায় বসানো হয় নি। অন্দরেও বসার ঘর আছে। মহেশ্বর দত্ত হাত ধরে তাকে বাইরে থেকে ভিতরের ঘরে এনে বসিয়েছিলেন।

আধ-হাতের ওপর ঘোমটা টেনে চণ্ডীবউ শাশুড়ীর পিছনে এসে দাঁড়াল। মহেশ্বর দত্ত সাদরে কাছে ডাকলেন তাকে।—এস মা-লক্ষ্মী এস, মদন তো ঘরের ছেলে, লজ্জা কি!

নিরুপায় চণ্ডীবউ শ্বশুর আর শাশুড়ীর মাঝখানে এগিয়ে এল। ঘরের ছেলের সামনে তাকেও শ্বশুরের পাশে ওই গদি-ফরাসেই বসার জন্য ডাকা হল কিনা বুঝতে পারছে না। লম্বা ঘোমটা সত্ত্বেও তার যেটুকু দেখার দেখতে পাচ্ছে। শ্বশুরের দিকে মুখ করে গদি-ফরাসের কোণের দিকে ঘরের ছেলে সুবোধ ছেলের মতই বসে আছে। এদিকে মেঝের একটু জায়গা মুছে ঘরের তৈরি ভালো আসন পাতা হয়েছে। পাথরের গেলাসে ডাবের জল আর বড় পাথরের থালা ভরতি ফল আর মিষ্টি। চণ্ডীবউয়ের পদার্পণের আগেই ঘরের ছেলের আপ্যায়নের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। ইচ্ছেয় হোক আর অনিচ্ছেয় হোক ব্যবস্থা শাশুড়ীকেই করতে হয়েছে।

কিন্তু শ্বশুরের কাছ থেকে যে নির্দেশ এল সেটার জন্য প্রস্তুত ছিল না চণ্ডীবউ। তিনি বললেন, প্রণাম কর—তুমি কেমন আছ খবর নিতে এসেছে।

ব্রাহ্মণসন্তান, প্রণাম করতে বলা বা প্রণাম করা দুই-ই স্বাভাবিক। কিন্তু মাঝের একটা দিনে যা ঘটে গেছে, পায়ে সঙ্কোচের বেড়ি চণ্ডীবউয়ের। মায়ের থানে ওই শেষের ব্যাপার তো পরের ব্যাপার। তার আগে এই একজন যে ছায়ার মত অনুসরণ করছিল সে তো সত্যি। আর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে-মুখ দেখেছিল, তাতে আর যাই হোক, খবর নেবার মত উদ্বেগের ছায়া কিন্তু চোখে পড়ে নি। তাছাড়া আজ এক বছরের ওপর হয়ে গেল, ঘরের লোক যেভাবে শত্রু চিনিয়েছে আর শত্রুতার বহু-প্রসঙ্গ বিস্তার করেছে—অনুভূতির রাজ্যে তারও প্রভাব আছেই। সঙ্কোচ সেই কারণেও।

যত সঙ্কোচই হোক, শ্বশুরের নির্দেশ অমান্য করারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু খবর নিতে যে এসেছে, প্রণাম-পর্ব থেকে অব্যাহতি সে-ই দিল। দ্বিধান্বিত পায়ে আস্তে আস্তে তার দিকে ফেরামাত্র শশব্যস্তে গদি-ফরাস ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল

সে। না না, প্রণাম আবার কি, প্রণাম লাগবে না। তারপর প্রণামের হাত থেকে নিজের পা দুটো রক্ষা করার জন্যেই যেন তাড়াতাড়ি জলযোগের আসনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল।

মহেশ্বর দত্ত হাসতে লাগলেন, বললেন, বামুনের ছেলে তুমি, তার ওপর মা-চণ্ডী করুণা করে তোমার হাত দিয়েই আমার চণ্ডীমায়ের ফাঁড়া কাটিয়েছেন, প্রণাম করতে না দিয়ে ওকেই বঞ্চিত করলে তুমি।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে আসনে একখানা হাসিমুখই দেখেছে চণ্ডীবউ। সপ্রতিভ মুখে আহারে মন দিয়েছে। কিন্তু এই সপ্রতিভ ভাবটুকুও কেমন চঞ্চল মনে হয়েছে তার। আহারের মনোযোগও অকৃত্রিম লাগছে না। ঘরে শ্বশুর আছেন, শাশুড়ী আছেন। কিন্তু তাঁরা না থাকলে বুঝি ওই ভাসা-ভাসা টানা দুই চোখ এই লম্বা ঘোমটার ওপর দিয়েই তার দিকে এসে আটকাত। কাল যেমন দেখেছিল। দুর্বোধ্য কোন্ অতল-গভীর থেকে দেখার অমন স্থিরচিত্রও আর দেখেনি। মায়ের থানের সেই দৃশ্য মনে পড়া মাত্র গা সিরসির করে উঠল। সপ্রতিভ আহার-রত মানুষটার সেই অভিলাষের চাঞ্চল্য অনুভব করেছে চণ্ডীবউ। শ্বশুর বা শাশুড়ীর যে-কোন একজনের একটু ইঙ্গিত পেলেই সে এখান থেকে প্রস্থান করে বাঁচে।

সে-রকম নির্দেশ বা ইঙ্গিত পেল না। বামুনের ছেলের সাদর অভ্যর্থনার নির্দেশ পেয়েই যত্ন করে হয়ত জলযোগের ব্যবস্থা করেছেন শাশুড়ী। কিন্তু তাঁর দিকে একনজর তাকিয়ে মুখ বিরসই মনে হল চণ্ডীবউয়ের। দুই মেয়ে তাদের মায়ের কাছে গতকালের ঘটনার অনেকরকম ব্যাখ্যা যে করেছে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। বাড়ির বউ ইচ্ছে করে ভিরমি গেছে এ কথা না বললেও যে-লোক ছুটে এসে বউয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসেছিল, আর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে গলার নীচে পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে, তার সম্পর্কে অন্তত সদয় কথা একটাও বলে নি। উল্টে তার মন্দ মতলব নিয়েই আলোচনা করেছে। ভাইয়ের কানও যে ওই বোনেরাই বিষিয়েছে তাতেও একটু সন্দেহ নেই।

ছেলের শত্রু ঘোষালের ছেলে কালকের ওই ব্যাপারের পর উতলা হয়ে আজ কুশল-সংবাদ নেবার জন্যেই বাড়ি বয়ে এসেছে এ বিশ্বাস শাশুড়ীর যে নেই সেটা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু বিশ্বাস চণ্ডীবউ নিজেই কি করতে পারছে? সবই কেমন অদ্ভুত লাগছে তার। প্রায় দেড় বছর ধরে যাদের সঙ্গে বংশগত বিরোধের গল্প শুনে আসছে, যার প্রতি এ বাড়ির ছেলের আক্রোশের শেষ নেই— বাইরের গুণ্ডা লাগিয়ে অঘটন ঘটানোর ব্যবস্থা করতেও আপত্তি নেই এমন আক্রোশ—মায়ের থানে তার সঙ্গে কালকের এই যোগাযোগটাই অবিশ্বাস্য রকমের বিচিত্র। কিন্তু সেই লোকই কেমন আছে খবর নেবার জন্য বাড়িতে এসে হাজির আর তার প্রতি বাড়ির কর্তার এই আদর-অভ্যর্থনা। শ্বশুর অবশ্য কালও প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু চণ্ডীবউয়ের সব থেকে বেশি অবাক লাগছে তাকে এখানে ডেকে পাঠানোর দরুন। সে যে ভালো আছে মুখে বললেই তো হত, ডেকে এনে প্রণাম করতে বলার মত এতখানি কৃতজ্ঞতা দেখানোর দরকার ছিল কেন সেটা যেন চণ্ডীবউ নিজেও এখন অনুভব করছে না।

মহেশ্বর দত্ত বিগত দিনের ঘটনার মধ্যেই ফিরলেন আবার। বছরে যেখানে এতবড়

উৎসব হয়, গাঁয়ের লোকের উচিত সেখানকার ব্যবস্থা-ট্যাবস্থাগুলো আর একটু ভালো করা। ভিড়ের চাপেই তো কত লোক ওই ঢালে গড়িয়ে খুন-জখম হতে পারে। চণ্ডী-মা বলি আর রক্ত দেখে অজ্ঞান হয়েছিল বলে একটুও অখুশি নন তিনি। বললেন, সবই মায়ের খেলা, জগতের মা একদিকে ভয়ঙ্করী আর একদিকে কত মমতাময়ী তাই দেখালেন বোধ হয়, নইলে চণ্ডী-মা তো তাঁর অজ্ঞান হবার মত মেয়ে নয়। অতএব মহামায়ার কি ইচ্ছে তিনিই জানেন।

আর বললেন, বিপদ দেখে মদন বাবাজী যে ছুটে গেছে তা শুনে তিনি একটুও অবাক হন নি। কারণ, উপস্থিত যখন ছিল সে ছাড়া আর কে যাবে। বাপের ধারাই পেয়েছে। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশ্নসূচক মন্তব্য করলেন, ওর বাবার সেই এক মাল্লার কচি মেয়েকে রক্ষা করার জন্য চূর্ণির্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা মনে আছে তোমার? মনে পড়তে সোৎসাহে আহার-রত অতিথির দিকে ফিরলেন তিনি, তুমিও বোধ হয় জানো না, তোমার বাবার বয়েস তখন তোমার থেকেও কম, আমরা চূর্ণিতে মাছ ধরছিলাম। হঠাৎ বান এল। দূরে নিরিবিলি দিকে এক মাল্লার ছোট মেয়ে মনের আনন্দে ডুবিয়ে চান করছিল কেউ লক্ষ্যই করে নি। হঠাৎ গেল-গেল শুনে আমরা হতভম্ব, কি হল ভালো করে বোঝার আগেই দেখি তোমার বাবা তীরের মত খানিক ছুটে গিয়ে সেই বানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেয়েটা বাঁচল, কিন্তু তখন যা অবস্থা আমরা ভাবলাম দুজনেই গেল।

কাহিনীর তাৎপর্য, মায়ের থানে সেই বাপের ছেলে বিপদ দেখে ছুটে এসেছে সে আর বেশি কথা কি। ঘোষাল-কর্তার ছেলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও দত্তবাড়ির বউয়ের অঘটন যদি ঘটেই যেত কিছু, তাহলেই বরং অবাক হতেন তিনি।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে আহার-রত মূর্তিখানা আর একবার দেখে নিল চণ্ডীবউ। মুখ দেখে মনে হল বাপের অমন বীরত্বের কাহিনী শোনাই আছে।

বউ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মহেশ্বর দত্তর এতক্ষণে খেয়াল হল যেন। বললেন, যাও মা, তুমি ভিতরে যাও, ঠাকুর যে-হাত দিয়ে তোমার ফাঁড়া কাটিয়েছেন সে-ই বাড়ি বয়ে এসেছে তুমি কেমন আছ খবর নিতে—এ কি কম ভাগ্য নাকি, বিপদ দেখলে যাবা ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা সকলেরই পরম আত্মীয়—তাদের সামনে লজ্জা কি! ...কিন্তু রাধাটা সকালেই কোথায় আবার টই-টই করে বেড়াচ্ছে, মদন এল, থাকলে দুটো কথাবার্তা কইতে পারত। আচ্ছা, তুমি যাও—।

চণ্ডীবউ গম্ভীর শাশুড়ীর পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির দিকে রওনা হল। ওধারে দুই ননদের মুখে কৌতুক উপ্চে পড়ছে। বাইরে এসে চণ্ডীবউ ঘোমটা খাটো করতে গিয়েও তাদের দেখে সবটা করল না। সিঁড়ি ধরে সটান উপরে উঠে এল। ইশারার বড় ননদ তাকে ডেকেছিল ঠিকই লক্ষ্য করেছে। ইশারায় কারণ, এধার ওধার থেকে জ্ঞাতিবর্গরাও কেউ কেউ মুখ বাড়িয়ে আছে। এ-বাড়িতে ওই আগন্তুক বড় বেশি অপ্রত্যাশিত। ঘোমটার আড়াল নিয়ে বড় ননদের ইশারা উপেক্ষা করল, ডাকলেও দাঁড়াত কিনা সন্দেহ।

শ্বশুর যার খোঁজ করছিলেন, অর্থাৎ ছেলে যে বাড়িতেই আছে সেটা ওখানে বলা সম্ভব নয়। দোতলার বারান্দায় তার সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ। চণ্ডীবউয়ের মাথা থেকে ঘোমটা সরে গেছে।

রাত-জাগা চোখ-মুখ রাগে আরো বেশি তেল-তেলে দেখাচ্ছে। কাছে এসে দাঁত কড়মড় করে বলল, বাবার মাথা খারাপ হয়েছে, মাথাটা একেবারে গেছে! তোমার ভাগ্য ভালো যে তার কথা শুনে সত্যিই বোকার মত প্রণাম করে ওঠো নি। আশ্চর্য, কি জন্যে এসেছে জেনেও —

প্রায় গতরাতের মতই চণ্ডীবউ চেয়ে দেখল একটু। নীচের ঘরের দরজার ওপারে আড়ি শুধু ননদেরাই পাতে নি তক্ষুনি বুঝে নিল। শ্বশুর খোঁজ করছে কানে যেতেই হয়ত পালিয়ে এসেছে। বলল, বাধা না দিলে প্রণাম তো করতেই হত, করলে তুমি কি করতে?

মুখ বিকৃত করে রাধানাথ বলে উঠল, কি করতাম সেটা তখন বুঝতে, মজা দেখিয়ে ছাড়তাম —

থমকাল হঠাৎ, চোখে কুটিল নিরীক্ষণের ছায়া পড়ল, আরো সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, কেন, তোমারও পায়ের ধুলো নেবার সাধ হয়েছিল নাকি?

তখন হয় নি, এখন হচ্ছে। চণ্ডীবউয়ের গলার স্বর চাপা কিন্তু নরম নয় একটুও। —তুমি মজা দেখিয়ে ছাড়তে জানলে জোর করেই প্রণাম করতাম।

ঘরের দিকে পা বাড়াল। সরোষে রাধানাথ পথ আগলে দাঁড়াল আবার।—কি বললে? তুমি আমাকে পরোয়া কর না, কেমন? কিন্তু জেনে রেখো তোমার মাথা কোলে নিয়ে বসে উপকার করার জন্যে ওই হারামজাদার মাথাটা আস্ত থাকবে কিনা ঠিক নেই, আর বজ্জাতি করে ওর বাড়িতে আসার এই আস্পর্ধার জবাবও আমি দেব—বুঝলে?

বোঝবার জন্য চণ্ডীবউ বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। বলল, সে সুযোগ তো এক্ষুণি পেতে পার, পালিয়ে এলে কেন? ঠাকুর তো খোঁজ করছিলেন, নীচে যাও না!

ক্রুদ্ধ রাধানাথ দাঁড়িয়েই রইল।

নিজের ঘরের দিকে চলল চণ্ডীবউ। বয়েসটা যেন তার রাতারাতি সতের ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

॥ ১০ ॥

ননদিনীরা চলে গেল।

মহাচণ্ডীর থানের অত বড় ব্যাপারটাও জুড়িয়ে গেল যখন ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা আর কোন্ আনন্দে বসে থাকবে? পরদিন বউয়ের খবর নিতে এলো মদনমোহন, তাও যেন সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার একটা। বাবা খুশি, মা চুপ, ভাই গুম, বউ নির্বিকার। এমন কাণ্ড হয়ে গেল অথচ বাড়িতে সেরকম জটলার আসর পর্যন্ত বসল না একটা। ননদিনীদের নীরস লাগারই কথা।

অতএব বাপের ওপর দোষারোপ করতে করতে তারা শ্বশুরবাড়ি ফিরল। যাবার আগে পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাকে শুনিয়ে গেল, বউ রূপসী বলেই বাবার অত প্রশয় দেওয়া ভালো নয়। তাঁর আস্‌কারা পেয়ে এরই মধ্যে বউয়ের হাব-ভাব বদলেছে। অর্থাৎ বউয়ের দেমাক বেড়েছে, দাপট বেড়েছে।

এদিকে চেষ্টা করেও শ্বাশুড়ী এসব খুঁত আবিষ্কার করতে পারেন না। কিন্তু অনুভব করেন। কিছু একটা চাপা ক্ষোভে ছেলেটা মুখ কালি করেই আছে। তার চিৎকার চেঁচামেচি রাগারাগি কানে এলে এর থেকে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করতেন। তাও আসে না বলেই তাঁর চোখেও বউয়ের নীরব দাপট বড় হয়ে উঠছে। বউয়ের গলার আওয়াজ শোনা যায় না অথচ তার প্রতিপত্তি যেন দিনে দিনে বাড়ছে।

প্রতিপত্তির সাক্ষাৎ নজির এ বাড়িতে প্রসন্নময়ীর অবস্থান।

অন্তঃপুরের ব্যবস্থায় কোনো পাকা গৃহিণী বাড়ির কর্তার হস্তক্ষেপও পছন্দ করেন না। সেখানে সেদিনের পরের বাড়ির মেয়ে এসে কারো অনুমতি না নিয়ে রক্ত-মাংসের একটা মানুষকে ঘরে এনে তুলবে সেটা বরদাস্ত করা কঠিন। সেই মানুষ ভালো মেয়েমানুষ হলেও বউকে শিক্ষা দেবার জন্যে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার ইচ্ছেটা স্বাভাবিক। ভালোছেড়ে প্রসন্নময়ী ঘর-খেদানো মেয়েমানুষ। চরিত্রে দাগ না পড়লে হাজার লাথি-ঝাঁটা খেয়েও স্বামীর ভিটে কামড়ে পড়ে থাকে না কোন্ বিধবা? ভাসুরপোরা তাড়াতে চাইলেই কোমর বেঁধে কোঁদল করে বেরিয়ে আসে কে? আর ভাসুরপোরাই বা খামকা এক বিধবাকে ঘর থেকে তাড়াবে কেন? বামুন-কায়েত বাড়ির বিধবা তো ধম্মের বলি। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে পর্যন্ত দাঁতে কুটো দিয়ে পরের সংসারের যাঁতায় হাড়-মাস বিসর্জন দিয়ে থাকে। অষ্টপ্রহর তাকে ধরে কাটতে পারে কুটতে পারে, নিজের সংসারের ক্ষতি করে একেবারে তাকে বাড়ি থেকে তাড়ায় কে?

প্রসন্নময়ীর দিকে একনজর তাকিয়েই তার চরিত্রের ওপর দাগ আবিষ্কার করেছিলেন দত্ত-গৃহিণী। দাগ তার বয়েসে, দাগ তার আঁট-সাঁট স্বাস্থ্যে, দাগ বৈধব্যে—সব ছাপিয়ে উঠেছে ঘর-ছাড়ার দাগ। কিন্তু নিজের আবিষ্কারের ওপর নির্ভর করেন নি দত্ত-গৃহিণী। বাড়ি ফেরার ঘন্টাখানেকের মধ্যে দাসদাসীদের কানাঘুষোতেও তাঁর কান বিষিয়েছে। দাগ দগ্‌দগে হয়ে উঠেছে।

তিনি বাড়ি ছিলেন না। স্বল্প দিবানিদ্রার পর একটু পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বউকেও সঙ্গে নিতে পারতেন। ইচ্ছে করেই নেন নি। মেয়েরা চলে যাবার পর মন খুলে দুটো কথা বলা বা খোলাখুলি দুটো কথা শোনার বাসনায় একাই বেরিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে বউ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। বেরিয়ে এই রত্ন সংগ্রহ করে এনেছে।

মাঝের প্রহসনটুকুও দত্ত-গৃহিণীর অজ্ঞাত।

চণ্ডীবউয়ের বাড়ি থেকে বেরোনোর কোনো সঙ্কল্প বা কোনোরকম উদ্দেশ্য ছিল না। একজনকে দেখেই বেরুনোর ঝোঁক মাথায় চেপেছিল।

রাধানাথকে।

বউকে শিক্ষা দেবার জন্যেই পর পর কয়েক রাত সে বাড়ি ফেরে নি। বাড়া ভাত ঢাকা পড়ে না থাকলেই সে ফিরল কি ফিরল না বাবা-মায়ের টের পাবার কথা নয়। তা চাকরকে বলে রাখলেই সানন্দে সে ওই বাড়া ভাত আর পঞ্চব্যঞ্জনের সঙ্গতি করে থাকে। মা-কে পরোয়া করে না, বাপের অলক্ষ্যে ফিরতে হয়। কোন্ সময়ে ফিরলে বাপের সামনে পড়ার আশঙ্কা নেই তাও সে জানে।

আপাতত এই দুনিয়াটার ওপরেই রাগ রাধানাথের। সব থেকে বেশি রাগ বউয়ের ওপর। কারণ বউ তার রাগ-বিরাগের ধার ধারে না, উল্টে তার পুরুষকার খর্ব

করে। করুক না করুক, রাধানাথের সেই রকমই মনে হয়। তার বাপের এত টাকাকড়ি সত্ত্বেও করণের অনুরাগীর সংখ্যা যে মদন ঘোষালেরই বেশি, নিজের কাছে অন্তত এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই অনুরাগের বাতাস পাছে বউয়ের গায়েও লাগে সেই আশঙ্কা অসহ্য। আশঙ্কার কারণ ঘটেছে। মদন ঘোষালের পাখা গজিয়েছে। তার উদ্দেশ্য রাধানাথের কাছে একেবারে স্পষ্ট। এত সাহস তার যে হাজার হাজার লোকের সামনে বউয়ের মাথা কোলে নিয়ে বসে, জল ছিটোবার ছলে বউয়ের গলা-বুক ভিজিয়ে দেয়। অত আস্পর্ধা যে তারপরেও বাড়িতে আসে বউ কেমন আছে খোঁজ নিতে। বাবার না হয় বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই, বয়েসকালে প্রবৃত্তি কাকে বলে ভুলতে বসেছে— কিন্তু বউ কেন মদন ঘোষালের ছল-চাতুরী বুঝতে পারে না? বোঝাতে গেলে উল্টে তাকেই অপমান করতে চায় কেন? মদন ঘোষালের পাখা এবারে দুমড়ে ভাঙা দরকার, তার এত আস্পর্ধার চরম শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত রাধানাথ ঠাণ্ডা হতে পারছে না। কিন্তু বউয়ের তাতে সায় নেই কেন?

মহাচণ্ডীর থানের ব্যাপারটা নিয়ে করণের আকাশে-বাতাসে টি-টি পড়ে যাবে ভেবেছিল। ঠিক সেরকম যে হয়নি তার অনেক কারণ ভাবছে রাধানাথ। প্রথমত সামনাসামনি কেউ ঠাট্টা-ঠিশারা করতে এলে ধড় থেকে তার মুণ্ডুটাই ছিঁড়ে আনবে রাধানাথ, তার আচরণে সেই হাব-ভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে। দ্বিতীয় কারণ, টি-টি পড়বে যাকে নিয়ে সে দত্তবাড়ির বউ—মহেশ্বর দত্তর ছেলের বউ। লোকে সেই কারণেও বাইরে অন্তত মুখ সেলাই করে আছে।

কিন্তু রাধানাথের বদ্ধ ধারণা, ভিতরে ভিতরে সকলেই হাসছে, চুপিসাড়ে জটলা করছে। ঘটনার নায়ক মদনমোহন আর নায়িকা দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ বলেই কেউ চুপ করে বসে নেই। সকলের ভিতরে ভিতরে একটা চাপা রসের স্রোত বইছে ভাবছে সে। তাই ভালো মুখ করে কেউ বউয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেও মাথায় রক্ত ওঠে তার। সেদিন এক প্রণম্য বৃদ্ধকে ওই কুশল প্রশ্নের জবাবে খেঁকিয়ে উঠেছিল। বলেছিল, শ্বাস উঠেছে, ঘাটে নেবার সময় হয়েছে, আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো দিয়ে আসুন —

বউয়েব ওপর আক্রোশের পাশাপাশি আর এক ব্যর্থতার যাতনাও বুকের ওপর চেপে বসেছে। রাঙা জলের নেশায় সেই বৈশাখী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় চিরযৌবনা অপ্সরার মত যে স্বপ্নটা চোখের ওপর দিয়ে নেচে ফিরেছিল, তার ঘোর এখনো কাটেনি। সঙ্গী-সাথীদের তরল প্ররোচনায় সাদা চোখেও সেটা এখন মূর্তিমতী অভিলাষের আকারে বুকের তলায় নাচতে লেগেছে।

দত্তপাড়ায় পৃথক বারইয়ারী স্থাপনের স্বপ্ন। যে বারইয়ারী মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ালে দক্ষিণপাড়ার দল ভেঙে নাগরেরা সব সেখানে এসে গড়াগড়ি খাবে তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই কারো। আবেগের জোয়ারে হাবু-ডুবু খেতে খেতে সকলে দেখবে করণে এমন অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের মুরোদ রাখে যে সে দত্তকুল-তিলক রাধানাথ দত্ত ভিন্ন আর কেউ নয়।

স্বপ্নের অপ্সরাকে বাস্তবের আলিঙ্গনে টেনে আনার আসর প্রস্তুত। অভাব শুধু তার প্রাপ্যটুকু মেটাবার মত কাঁচা রসদের। রূপোর চাকতির।

বিপাকে পড়লে মানুষ ছোট আশাকে বড় করে বুকে বাঁধে। রাধানাথ বিপাকে

পড়েছে বই কি। এই উদ্দীপনার মুখে স্থূল টাকার অভাবে স্বপ্নোবশী বিমুখ হলে ইয়ারবক্‌শীদের কাছে রাধানাথের মান-ইজ্জৎ ধুলোয় লুটোবে। শুধু তাই নয়, রাধানাথের বুকের ভিতরটাও মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করবে। আর কবণের আকাশে-বাতাসে তখন শুধু মদনমোহনের বাঁশির বিষ ছড়াবে। ভাবলেও নিজের হাড়পাঁজর দুমড়ে ভাঙতে ইচ্ছে করে রাধানাথের। অতএব নিজের তাগিদে আশার ক্ষীণ আলো হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে। আর তখনি বার বার নিজের ঘরেব বউয়ের দিকে চোখ গেছে তার। কেবলই মনে হয়েছে সমস্যার সমাধান ওখান থেকে হলেও হতে পারত। তাব অভিলাষের সঙ্গে চণ্ডীবউয়ের সক্রিয় অভিলাষ যুক্ত হলে আশাব ক্ষীণ আলোটা জোরালো করে তোলা যেত। কিন্তু তা যেন হবার নয়।

বউকে শিক্ষা দেবার জন্যেই নয় শুধু, এত সব তাপ আর পরিতাপের ধকল দূর করার জন্যও তরল বিস্মৃতির রসদ খোঁজার দরকার হয়েছিল রাধানাথের। সঙ্গী-সাথীরা সময়ে রসদের সন্ধান দিয়েছে। গাঁয়েব দক্ষিণপ্রান্তেব আমবাগানের নীচে মাত্র দিনকয়েকের জন্য নাকি ডেবা বেঁধেছে কুসুমবাঈ। গোটাকতক অস্থায়ী কুটির বারো মাসই দেখা যায় সেখানে। উৎসবে মেলায় পার্বণে কুটিবের সংখ্যা বাড়ে। স্থানাভাবে তখন দু-পাঁচজন নাম-করা বাববিলাসিনীও আশ্রয় নেয় সেখানে। অন্যথায় জায়গাটা নিম্নশ্রেণীর বারবনিতাদের আবাস। বন্ধুবা জানালো কুসুমবাঈ এ অসময়ে সেখানে ডেরা বেঁধেছে নিছক বিশ্রামেব তাগিদে। নইলে ভিন্‌ গাঁয়ে তার দর আছে, কদরও আছে। রাধানাথের মত নাগর পেলে সে ফেবাবে না আশা করা যায়।

ফেরায় নি। প্রথম দর্শনে বাধানাথেব ববং মুখ ফেবাতে ইচ্ছে করেছিল। বন্ধুদেব উক্তিতে আতিশয্য কিছু ছিল, তা বলে নবাগত দেহজীবিনী কুৎসিতও নয়। তবু। তাকে দেখামাত্র নিজের ঘবের একখানা মুখ প্রবৃত্তিব আচ্ছন্নতা ঠেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তফাত এত বেশি যে সেটাই ধাক্কাব মত। নইলে আগে তো, বিশেষ কবে মালতীবউ মাবা যাবাব পব, বাতেব শূন্য শয্যাব শোক ভোলাব তাগিদে রাতের পব রাত তাকে এই বিস্মৃতির পথে ছুটে আসতে হযেছে। রুগ্না মালতীবউ বেঁচে থাকতেও আসতে হয়েছে। চণ্ডীবউ আসাব পব থেকেই যা দীর্ঘচ্ছেদ পড়েছিল।

যাইহোক, অস্বস্তি কাটতে সময়ও লাগে নি তেমন। সুবা-যোগে প্রায় সকল রমণীই দেখতে দেখতে সুরবালা হয়ে ওঠে। সঙ্গী-সাথীদেব চোখের ইশারায় তাই হল। কুসুমবাঈয়ের বং-ঢং-এ তাপ ভোলাব মতই বৈচিত্র্যেব সন্ধান পেল বাধানাথ।

কিন্তু এদিকে সত্যিই বড় দ্রুত বযেস বাড়ছে চণ্ডীবউযের। যা আগে দেখত না তাই দেখতে শিখছে। যা ভাবত না তাই ভাবতে শিখছে। সমস্ত বাত বাইবে কাটিয়ে ঘবেব লোক চোবের মত ঘবে ফেবামাত্র দু' চোখ তার মুখেব ওপর সজাগ হয়। চণ্ডীবউয়েব কেন যেন কাছে আসতে ইচ্ছে করে না, স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে ইচ্ছে করে। কথা বলতেও ভালো লাগে না। মনে হয়, মানুষটা একেবাবে স্নান সেরে ঘবে ঢুকলে ভালো হত।

পনের দিনের মধ্যে অনেক রাত বাইবে কাটানোব ফলে দৃষ্টি ক্রমে তির্যক হয়ে উঠছে চণ্ডীবউয়ের।

সেদিন দুপুরে শাশুড়ী পাড়া বেড়াতে বেরুনোর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে রাধানাথ ঘরে ঢুকে সটান শয্যায় আশ্রয় নিল। চণ্ডীবউ শুয়ে ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসল। তার পরেই গা-টা ঘিনঘিন করে উঠল কেমন।

বিরূপতার আভাস পাওয়ামাত্র রাধানাথের মেজাজ রুক্ষ।—দেখছ কি? খুব অসহ্য লাগছে?

জবাব না দিয়ে চণ্ডীবউ আরো একটু দেখলই শুধু। তারপর জিজ্ঞাসা করল চান করবে?

রাধানাথ মাথা নাড়ল প্রথম। চান করবে না। তারপর খরখরে প্রশ্ন নিক্ষেপ করল, কেন, তোমার ঘেন্না করছে?

এবারে চণ্ডীবউও মাথা নাড়তে পারলে নাড়ত। তা না করে জিজ্ঞাসা করল, খাওয়ার দরকার আছে?

খেয়ে এসেছি।

কাল সন্ধ্যা থেকে এ পর্যন্ত কোথায় ছিলে?

বউয়ের চাউনি আর কথাবার্তা ঘোরালো ঠেকছে রাধানাথের কানে। বুঝে যদি থাকে কিছু তো বুঝুক। হেলাফেলা করার ফল টের পাক। তরল জবাব দিল, তোমার এই ঘর ছাড়াও এ শর্মার রাত কাটানোর জায়গা আছে, বুঝলে?

চণ্ডীবউ বুঝতে চেষ্টা করছে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝছে না। বলল, জায়গা আছে সে তো ক-রাত ধরেই দেখতে পাচ্ছি—সে জায়গাটা কোথায়? কেমন জায়গা?

এত পষ্টাপষ্টি জিজ্ঞাসাবাদের ফলে মজাই লাগছে রাধানাথের। জবাব দিল, তা এখান থেকে মাইল চার-পাঁচ দূরে, আর বেশ ভালো জায়গা। সেখানে তোমার মত কেউ শোকের দিকে ঠেলে দেয় না—শোক ভোলায়।

চণ্ডীবউ চেয়ে আছে। বুঝতে পারা আর না পারার মধ্যে পাতলা পরদা দুলছে যেন একটা।—তোমার কি শোক?

আমার? তপ্ত চোখে নড়েচড়ে বালিশে ঠেস দিল রাধানাথ।—আমার শোক তুমি—তুমি। বুঝলে?

আমি কি করেছি?

কি করেছ? দুপুরের বিরহ শয্যায় শুয়ে কাকে ভাবছিলে—মদনমোহনকে? ও পাজী নচ্ছারটাকে শাস্তি দিতে এত আপত্তি কেন তোমার?

সে-ই বা কি করেছে?

রাধানাথ সটান উঠে বসল।—কিছুই করে নি, কোলে মাথা নিয়ে বসে জলের ঝাপটায় তোমার বুক ভিজিয়েছে, আর কিছুই করে নি। আর তুমিও কিছুই করো নি—স্পর্শসুখে থরথর করে কেঁপেছ শুধু—আর কিছুই না। যা করছি কেবল আমি! কোথায় রাত কাটাই সে-খোঁজ কেন? পাশে থাকলে ঘরের আলো নিভিয়ে মদনমোহন পাশে আছে ভাবতে সুবিধে হয়?

এই শ্লেষ আর উক্তি বুঝতেও সময় লাগল একটু চণ্ডীবউয়ের। বুঝল যখন, সমস্ত মুখে রক্ত উঠছে। শয্যা ছেড়ে নেমে দাঁড়ালো আস্তে আস্তে। তারপর মুখের ওপর সরাসরি চাবুকের ঘা বসালো যেন একটা, তুমি ইতর!

কি? কি বললে?

বললাম, তুমি ইতর ইতর ইতর।

দ্বিগুণ ঝাপটা মেরে আগুনের ফুলকির মত বেরিয়ে গেল চণ্ডীবউ।

রাগে কাঁপতে লাগল রাধানাথ। শুধুই রাগ হলে সেও হেস্তনেস্ত করতে পারত

কিছু, ভালো হাতে শিক্ষা দিতে পারত। কিন্তু রাগ সেরকম চড়তে না চড়তে কি এক অজ্ঞাত ভয়ও উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। রূপসী বউয়ের এক-একসময় যে মূর্তি দেখে তাতে নিজেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়।

চণ্ডীবউয়ের ভিতর জ্বলছে। শোক ভুলতে কোথায় গিয়ে রাত কাটায় সেটা আর অস্পষ্ট নয় খুব। এক ধরনের মেয়েছেলের কথা তার শোনা আছে। পুরুষ মানুষদের ধরে ধরে তারা নরকে টানে। সমস্ত শরীরটা রী-রী করতে লাগল চণ্ডীবউয়ের। রাতে ওই বিছানায় গা ঠেকাতে পারবে কিনা সন্দেহ। ওই নরক-মাড়ানো মূর্তিই দেখছে বটে কদিন ধরে। ওইজন্যেই ঘরে ঢোকা মাত্র এত খারাপ লাগে তার। আর সেই মানুষের মুখে কিনা এমন কুৎসিত কথা। কত যে কুৎসিত সেটা ক্রমে আরো বেশি অনুভব করছে। বাইরে এসেও রাগে কাঁপছে। খানিকক্ষণের জন্য অন্তত এই বাড়ির বাতাস থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারলে ভালো লাগত।

মনে হওয়া মাত্র ঘরের মানুষের চোখের সামনে দিয়ে বেরুনোর তাগিদটা তেতে উঠতে লাগল। কিন্তু যাবে কোথায়? পাড়ার গুটিকতক বউয়ের সঙ্গে ভাব-সাব হয়েছে। সে কোথাও বড় যায় না, তারাই আসে। কিন্তু এখন তাদের সঙ্গও ভালো লাগবে না।

এই রাগের মুখেই হঠাৎ একটা সঙ্কল্প মাথায় এলো তার। যাবার জায়গা আছে একটা। অনেকদিনই সেখানে যাবার কথা মনে হয়েছে, কিন্তু মুখ ফুটে কখনো বাসনাটা ব্যক্ত করে উঠতে পারে নি।

শাশুড়ী বাড়ি নেই। ভালই হয়েছে। ঘোমটা টেনে চণ্ডীবউ শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়াল।

কি গো মা-চণ্ডী, চাই কিছু?

অস্ফুট স্বরে মা-চণ্ডী বলল, একবার অঘোর নিবাসে যাব।

মহেশ্বর দত্ত ঘোমটার আড়ালে বউয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না ভালো। কিন্তু গলার স্বর ভার-ভার লাগল। যে জায়গায় যাবে শুনলেন তাতেও স্বস্তি বোধ করলেন না খুব। দ্বিধাগ্রস্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে হঠাৎ...ক্ষমাযোগিনী ডেকেছেন নাকি?

চণ্ডীবউ মাথা নাড়ল। ডাকে নি।

সঙ্গে আর কে যাবে, রাধা যাবে?

চণ্ডীবউ আবারও মাথা নাড়ল, অর্থাৎ একাই যাবে সে।

হঠাৎ এরকম ইচ্ছের কারণ বুঝলেন না মহেশ্বর দত্ত, কিন্তু এসব ব্যাপারে বাধা দেবার সাহসও নেই তাঁর। দারোয়ান ডেকে পাল্কি সাজাবার আদেশ দিলেন তক্ষুনি। পুরনো পাল্কি-বাহকরা বিশ্বস্ত সকলেই।

ঘোমটা খসিয়ে চণ্ডীবউ ঘরে ঢুকল। গন্‌গনে মুখ। রাধানাথের চোখের সামনেই বাইরে বেরুনোর উদ্যোগ সম্পূর্ণ হল। নীরব পর্যবেক্ষণ সম্ভব হল না শেষ পর্যন্ত। রাধানাথ জিজ্ঞাসা করল, সেজেগুজে চললে কোথায় শুনি?

চণ্ডীবউ সোজা তাকালো তার দিকে, জবাব দিল, যাবার মত আমারও জায়গা আছে দুই একটা—

মুখে প্রগল্‌ভ কুটিল রেখা পড়তে লাগল রাধানাথের।—শোক ভোলার জায়গা?

হ্যাঁ। যাচ্ছি অঘোর নিবাসে ক্ষমাযোগিনীর কাছে। তুমি যাবে সঙ্গে?

শুধু শ্বশুরের নয়, ওই এক নামে ছেলের তপ্তমুখে দ্বিগুন অস্বস্তির ছায়া পড়তে দেখল চণ্ডীবউ।

বেরিয়ে গেল। পাল্কিতে উঠল। লাল পাল্কি চলল।

পাল্কিতে বসে উল্টে নিজেরই অস্বস্তি এখন। এই মেজাজে হঠাৎ ক্ষমাযোগিনীর কাছে যাবার সঙ্কল্পটা মাথায় চেপে বসল কেন জানে না।

বিস্তৃত আঙিনা পেরিয়ে পাল্কি অঘোর নিবাসের বাড়ির দোরে দাঁড়াল।

চণ্ডীবউ বেরিয়ে এলো। সেই স্তব্ধ পরিবেশ। সকলের গা ছমছম করে এখানে এলে। চণ্ডীবউয়ের তা করে না। তার মনের তলায় শুধু একটু ভালো-লাগার স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

ভিতরের দিকে কয়েক পা বাড়িয়েই চমকে চণ্ডীবউ দাঁড়িয়ে গেল। স্তব্ধতা চিরে তপ্ত শলাকার মত কণ্ঠস্বর কানের পর্দায় বিঁধল।

দূর হ' দূর হ' দূর হ'—কালামুখী লজ্জার মাথা খেয়ে আবার তুই এসেছিস এখানে! আবার আমার উঠোন মাড়িয়েছিস!

সঙ্গে সঙ্গে বড়সড় একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট চন্দন কাঠের টুকরো ছিটকে তার পায়ের কাছে এসে পড়ল। ওধার থেকে ছুঁড়ে মেরেছে কেউ।

ক্ষমাযোগিনী। তারই গলা। চণ্ডীবউ হতভম্ব।

সামনের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করতে দেখে ওধারের দেয়ালের কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে। এক বিধবা মেয়ে, বছর বাইশ-তেইশ হবে বয়েস।

বিস্ময় সত্ত্বেও চণ্ডীবউ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ঘাবড়েই গিয়েছিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো। বিধবা মেয়েলোকটিকে দেখল এক পলক। থম্‌থমে মুখ, চোখে জল চিকচিক করছে।

ক্ষমাযোগিনীর তপ্ত রসনা আর নিক্ষিপ্ত চন্দন কাঠের লক্ষ্য সে-ই।

প্রসন্নময়ী।

॥ ১১ ॥

চণ্ডীবউ না পারে এগোতে না পারে দাঁড়াতে।

অঘোর নিবাসের ভাই-বোনকে গাঁয়ের লোক বিলক্ষণ ভয় করে, সমীহ করে, সেটা বিয়ের পর বেশ ভালো করেই টের পেয়েছে। ভাইয়ের থেকেও ভয় বোনটিকে বেশি করে লোকে, তাও জানে। মেজাজী শ্বশুর পর্যন্ত এই একজনের নাম শুনলে চুপ। কিন্তু চণ্ডীবউ ক্ষমাযোগিনীর রুদ্রমূর্তি কখনো দেখে নি। উল্টে বাড়ি থেকে পালিয়ে কত বড় অপরাধ সত্ত্বেও তার স্নেহ আর প্রশ্রয় পেয়েছিল সেটা বোঝার মত বুদ্ধি বিবেচনা এই দু বছরে আরো বেড়েছে। ফলে চণ্ডীবউয়ের কাছে ক্ষমাযোগিনীর ক্ষমার মূর্তিটাই আসল রূপ। তার ধারণা খারাপ লোকের কাছেই ক্ষমাযোগিনীর কড়া মেজাজ। আর ধারণা, গাঁয়ের লোক এমন কি শ্বশুরও ওই কড়া মেজাজের খবরই রাখে শুধু আসল রূপ দেখে নি।

কিন্তু এই বয়েসের একটা মেয়েকে স্বকর্ণে এইভাবে গালাগাল করতে শুনে আর কাঠ ছুঁড়ে মারতে দেখে হকচকিয়ে গেছে। এগিয়ে যেতে সঙ্কোচ, আবার দাঁড়িয়ে চোখের সামনে এই হেনস্থাই বা দেখে কেমন করে।

ওদিকে চন্দন কাঠ ছুঁড়ে মেরেও ক্ষমাযোগিনীর আগুন-ঝরা রাগ কমে নি একটুও। কুকুর-বেড়ালের মত দূর দূর করে কাঠ ছুঁড়ে মারা হল যাকে সে যে দাঁড়িয়েই আছে চোখে না দেখেও টের পেল বোধ হয়। আবার এক পশলা গলানো শিসে কানে ঢুকল যেন চণ্ডীবউয়ের।—এখনো দাঁড়িয়ে আছিস তুই! বজ্জাত, ভাতারখাগী কানে কথা যায় না তোর! গেলি এখান থেকে? আসন ছেড়ে যদি উঠতে হয় আমাকে তোর সব্ব অঙ্গের রস আমি ঝেঁটিয়ে নামাবো বলে দিলাম।

হাজার রাগলেও এই রকম বচন বেরুতে পারে ক্ষমাযোগিনীর মুখ দিয়ে চণ্ডীবউ তাও কল্পনা করতে পারে না। কানের ডগা তারই লাল হয়ে ওঠার দাখিল। তবু, বয়েস মাত্র সতের, কৌতূহল স্বাভাবিক। দেওয়ালের কোণ ঘেঁষা মেয়েলোকটিকে আর একবার না দেখে পারল না। ভিকিরি-টিকিরি তো নয়ই, একেবারে ছোটঘরের মেয়েছেলের মতও লাগছে না। পরনের থান-সেমিজ মোটামুটি ফর্সা, খোলা চুল বিধবার মত ছাঁটা নয়, একটু মোটার ওপর দিব্বি আঁট-সাঁট গড়ন। কালোর দিক ঘেঁষা হলেও কুরূপ নয়। চণ্ডীবউয়ের আরো কৌতূহল এই জন্য যে এরকম জ্বালামুখী তাড়া খেলে প্রাণ নিয়ে পালানোর কথা। চণ্ডীবউয়ের নিজের বুকের ভেতরটাই টিপ টিপ করছে। কিন্তু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে যে তার নড়ার লক্ষণ নেই। মুখে সেরকম ত্রাসের ছাপও পড়ে নি। চোখে জল চিকচিক করছে শুধু। চণ্ডীবউকে সেও দেখে নিল একবার। যা চলছিল তাতে বাধা পড়ল বা পড়বে ভেবেই যেন মুখে বিরক্তির ছায়া।

মাটি থেকে চন্দন কাঠের টুকরোটা কুড়িয়ে নিয়ে চণ্ডীবউ সামনের দিকে এগোলো। তারপর ডাইনে ঘুরলে ক্ষমাযোগিনীর মূর্তিখানা দেখতে পাবে। বাপের বাড়িতে সৎমায়ের দীর্ঘদিনের গঞ্জনার ফলে হোক বা যে কারণেই হোক, মুখ বুজে কাউকে গালমন্দ খেতে দেখলে চণ্ডীবউয়ের সহানুভূতি তার দিকে ঘেঁষে। অপরাধের গুরুত্ব ভাবার দিকে মন থাকে না। এই বয়সের এক বিধবাকে মুখ বুজে এরকম তাড়না সহ্য করতে দেখে সেই গোছেরই হল ব্যাপারটা। তাছাড়া ভিতরে ভিতরে একটু ধাক্কাও খেয়েছে চণ্ডীবউ। আর পাঁচটা অতি গ্রাম্য ঘরের কুঁদুলে মেয়ের মত ক্ষমাযোগিনীর অশ্রাব্য গালাগাল বড় বেশি শ্রুতিকটু ঠেকেছে।

রাগের মুখেই ক্ষমাযোগিনী শিরদাঁড়া সোজা করে জপে মন দেবার তোড়জোড় করছিল। বাধা পড়তে সরোষে ঘাড় ফেরাল। যাকে আশা করেছিল তার বদলে এই একজনকে দেখে দৃষ্টিটা থমকালো একটু। রাগে তেতে আছে বলেই হোক, দু'বছর বাদে বিয়ের পর এই প্রথম দেখার দরুন হোক, বুঝতেও সময় লাগল কয়েক নিমেষ। দু'বছর আগে যে নিরাভরণা কিশোরী মেয়েটা বাড়ি থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তার সঙ্গে দত্তবাড়ির চণ্ডীবউয়ের অনেক তফাত। ক্ষমাযোগিনীর সামনে যে দাঁড়িয়ে তার পরনে সোনার জরি-বুটির শাড়ি, গায়ে মখমলের জামা, হাতে কানে গলায় গয়নার আলো ঠিকরে পড়ছে, মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁথিতে সিঁদুর।

এটা বাইরের সাজ, যে এলো তার নিজস্ব একটা রূপ আছে যা ক্ষমাযোগিনী ভোলে নি। চিনতে সময় লাগল না। তবু ঠাণ্ডা দু'চোখ মুখের ওপর বসিয়ে রেখে দেখতেই লাগল। একটু আগের অগ্নিক্ষরা রুষ্ট ভাব গেল বটে কিন্তু সে রকম প্রসন্নতা উপচে উঠল না।

ও, তুই...

এরকম অভ্যর্থনাও আশা করে নি চণ্ডীবউ। অনেক দিন আসবে আসবে করে আজ ঝোঁকের মাথায়ই বেরিয়ে পড়েছিল বটে। কিন্তু আসার সময়ে পথে বেশ লজ্জা-লজ্জা করছিল আর ভালও লাগছিল। ক্ষমাযোগিনী তাকে দেখামাত্র ঠাট্টা-ঠিশারা করে উঠবে ভেবেছিল। এসে পা দিতে না দিতে ভালো-লাগার তাল কেটেছে। আর সামনে এসে দাঁড়ানোর পরেও ক্ষমাযোগিনী যেন শুধু দুটো চোখ দিয়েই দেখে নিল তাকে, আর কোনরকম তাপের স্পর্শ পেল না। অবশ্য কয়েক মুহূর্ত আগে কানে যে মেজাজের ঝাপটা এসে লেগেছে, আশামাত্র সেই মুখে হাসি দেখবে তাও আশা করে নি।

চন্দন কাঠটা রেখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আগে প্রণাম সারল চণ্ডীবউ। তারপর বলল, ওটা তা হলে আমাকে ছোঁড়ো নি—-

তার মুখের ওপর থেকে চোখ সরে নি ক্ষমাযোগিনীর। রাগত স্বরেই বলল, তোকে ছুঁড়ব কেন, ওই কালামুখী নেই ওখানে?

আছে বললে বিপদ হতে পারে, নেই বললেও সত্যি বলা হবে না। কিছুই না বলে চণ্ডীবউ অল্প অল্প হাসতে লাগল।

ওই আসনটা পেতে বোস্।

যে মুখ করে বলল, যেন তারও কোনো একটা বিচারের সময় উপস্থিত। চণ্ডীবউ আদেশ পালন করল। বসল।

একলা এসেছিস?

আর কে আসবে?

কেন, আর কেউ নেই তোর?

তুমি গাল পাড়ো আর কাঠ ছুঁড়ে মারো সকলেই জানে বোধ হয়, আসতে ডরায়।

এবারেও নরম মুখ দেখল না চণ্ডীবউ। দু'চোখ তার সর্ব অঙ্গে বুলিয়ে নিচ্ছে। চাউনি কেমন ধার-ধার। চেহারা দু'বছরের মধ্যে একটুও বদলায় নি। তবু শিরদাঁড়া অত সোজা করে বসার দরুন হোক বা চুলগুলো মাথার ওপর অত টেনে চূড়ো করে বাঁধার দরুন হোক, চেহারার মধ্যে যে চাপা লালিত্য দেখেছিল চণ্ডীবউ, তা যেন কমেছে।

নিরীক্ষণ-পর্বের মধ্যেই ক্ষমাযোগিনী বলল, মস্ত ঘরে পড়েছিস সেই দেমাকে এ রাস্তা মনে পড়েনি বুঝি এতদিন?

ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মতই হেসে পাল্টা জবাব দিল, তুমিও তো একবার ডাকো নি।

আজ কে ডেকেছে? আজ আসতে গেলি কেন, গোল বেধেছে?

চণ্ডীবউ অবাক। সত্যিই যেন কিছু হয়েছে, আর ক্ষমাযোগিনীর দু'চোখ দিয়ে তা টেনে বার করতে চায়।—গোল আবার কি বাধবে?

চুপ আবার খানিক।—বোশেখী পূর্ণিমায় মায়ের থানে যেয়ে অজ্ঞান হয়েছিলি?

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটা সপ্তদশী চণ্ডীবউয়ের ভিতরটা অজ্ঞাত কারণেই নাড়া খেল একপ্রস্থ।—অত বলি আর রক্ত দেখে মাথা ঘুরে গেছল। তোমাকে কে বলল?

কে বলল সেটা ব্যাখ্যা করার বাসনা নেই ক্ষমাযোগিনীর। ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনেছিল এ-বাড়ির দ্বিতীয় বাসিন্দার কাছে—হৃদয় অঘোরী সে-সময় মায়ের থানেই বসেছিল। সে না বললেও ক্ষমাযোগিনীর ঠিকই কানে আসত। এ বাড়িতে লোক কম এলেও গাঁয়ের কথা কানে আসেই। ভক্ত আছে দু-চারজন যারা বিপাকে পড়লে আসে, আবার তন্ত্রোপদেশ শুনতেও আসে। মাসের প্রতি অমাবস্যায় মুন্‌কে ভট্‌চাযের আহারের রসদ জোটে এখান থেকে। দত্তবাড়ির সঙ্গে মুন্‌কের ঘন ঘন আহার মেলার মত ঘনিষ্ঠতা হয় নি তখনো। অমাবস্যায় হৃদয় অঘোরীর একটা করে বলি বাঁধা। তার বা ক্ষমাযোগিনীর সামনে এলে মুন্‌কে ভট্‌চায কাঁপে থরোথরো, কিন্তু বলির প্রসাদ নেবার জন্য না এসেও পারে না। অতএব ক্ষমাযোগিনী ঘটনার সারটুকুই শোনে নি শুধু, করণের বাতাসের গুণে কথাও কিছু কানে এসেছে।

দু'চোখ মুখের ওপর ফেলে রেখে বলল, বলি রক্ত দেখে তোর মাথা ঘুরেছিল, আর তোকে সেখানে দেখে কার মাথা ঘুরেছিল?

নিমেষে সমস্ত মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল চণ্ডীবউয়ের। এই এক ব্যাপার নিয়ে অনেক অপ্রিয় তাড়না সহ্য করতে হয়েছে, অনেক নীচতা দেখতে হয়েছে। কিন্তু এখানে এসে মুখের ওপর সরাসরি এই চাবুক পড়তে পারে কল্পনাও করে নি। চাবুকই তো। এজন্যেই ক্ষমাযোগিনী তখন থেকে এভাবে দেখছে তাকে, আর এজন্যেই দু' বছর বাদে দেখা হওয়া সত্ত্বেও বিরস মুখ। আর একটু আগে জিজ্ঞাসাও করছিল—কিছু গোল বাধিয়ে এসেছে কিনা।

রাগ সামলে বলল, সেদিন আমার কত বড় একটা ফাঁড়া কেটেছে জানো?

তিক্ত মুখ করে ক্ষমাযোগিনী বলে উঠল, ফাঁড়া কেটেছে না জোড়া লেগেছে দ্যাখ্‌ এখন, ঢালে গড়িয়ে না পড়ে তুই ওর গায়ে ঢলে পড়তে গেলি কেন? ঢালে গড়িয়ে পড়লে কি হত, খুব প্রাণের মায়া রূপের মায়া তোর, কেমন? ফাঁড়া কেটেছে বলে শ্বশুরকে দিয়ে ডাকিয়ে নেমন্তন্ন করে খাওয়া এখন?

চণ্ডীবউ স্তম্ভিত। বাড়িতে একজনের ঈর্ষা আর নীচতা দেখে তার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করছিল। ননদিনীদের কুরুচির ঠাট্টায় গা জ্বলেছিল। কিন্তু ক্ষমাযোগিনীর এই ভর্ৎসনায় দুর্বার রোষে তার সত্তাসুদ্ধু কেঁপে উঠল যেন। মনে হল, দেয়ালের ওধারে ওই বয়সের বিধবা মেয়েলোকটাকে যে কাঠ ছুঁড়ে মারা হয়েছিল আর যত বিচ্ছিরি গালাগাল করেছিল—এই কটূক্তিও সেই গোছেরই কিছু একটা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াতে গেল চণ্ডীবউ, শুধু চোখ নয়, গলা দিয়েও আগুন ছুটল যেন, তোমরা সক্কলে খারাপ, খুব খারাপ, খুব খারাপ, খুব খারাপ।

বোস্‌।

কেন বসব? তোমার এখানে আর এক মুহূর্ত থাকব না, তোমার কাছে আর কক্ষনো আসব না!

রোষদৃপ্তা চণ্ডীর মতই এক ঝটকায় আট-দশ হাত চলে গেল। তারপরেই থমকে দাঁড়াল। দেয়ালের আড়ালে বিধবা মেয়েটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। এদিকের স্ফুলিঙ্গ কানে এসেছে বলেই বিমূঢ় সে।

ছেলেমানুষ চণ্ডীবউ রাগের চোটে ছেলেমানুষের মতই কাণ্ড করে বসল একটা। দেয়ালের আড়ালে চলে এলো সেও, ভিতরে শুনিয়ে অর্থাৎ গলা চড়িয়ে মেয়েলোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, এই! তুমি কে? তোমার কি হয়েছে?

জবাব পেল না, ফ্যালফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে আছে।

কালা নাকি! কুকুর-বিড়ালের মত তোমাকে দূর দূর করে তাড়াচ্ছিল কেন? তুমি কি করেছ?

বিস্ময়ে হাবুডুবু খেয়ে ওঠার পর জবাব দেবার ফুরসৎ মিলল না, তার আগে দেয়ালের ওধার থেকে আদেশ শোনা গেল, পেসন্ন, ওকে এখানে নিয়ে আয়।

মেয়েছেলেটাকে দেয়াল ছেড়ে সচকিত হতে দেখা গেল এবার। আর অত রাগের মুখেও চণ্ডীবউয়ের মনে হল, এরপর যেতে চেষ্টা করলে এই মেয়েলোকটাই হয়ত আগলে নিয়ে আসবে তাকে। জ্বলতে জ্বলতে নিজেই ফিরল আবার, না বসে আসনটার ওপর দু পা রেখে ক্ষমাযোগিনীর মুখ ঝলসে দিতে চাইল।

ক্ষমাযোগিনীর নির্লিপ্ত মুখ, নির্লিপ্ত চাউনি। চুপচাপ দেখল কয়েক পলক। দৃষ্টিটা তাকে ছেড়ে পাশ ঘেঁষে পিছনের কারো দিকে পড়ল। বলল, লজ্জা নেই, গলা বাড়িয়ে মুখ দেখাচ্ছিস আবার?...চুপ করে আছিস কেন, কি হয়েছে, কি করেছিস—বল্?

চণ্ডীবউ পিছন ফিরে তাকালো একবার। দেয়ালের ওধারে মেয়েলোকটার আধখানা দেখা যাচ্ছে। সরোষে সামনের দিকেই ফিরল আবার। কিন্তু ক্ষমাযোগিনীর মুখ অত ঝাঁ-ঝাঁ করছে না এখন, গলার স্বরও আগের থেকে ঠাণ্ডা। বলল, নাম প্রসন্নময়ী, স্বভাব-চরিত্তির ভালো না বলে এই নিয়ে তিনতিনবার ভাসুরপোরা বাড়ি থেকে তাড়ালো।

বয়েস মাত্র সতের না হলে বা এতটা রাগ না হলে চণ্ডীবউয়ের একটু খটকা লাগতে পারত। এই পরিস্থিতিতে প্রসন্নময়ী প্রসঙ্গ খুব স্বাভাবিক নাও লাগতে পারত। কিন্তু এ মুহূর্তে এরকম কিছুই শুনতে চেয়েছিল চণ্ডীবউ, বলে উঠল, ও এই-জন্যে তুমিও ওকে দূর দূর করে তাড়াচ্ছিলে! সমুচিত প্রতিশোধ নেবার আক্রোশে প্রসন্নময়ীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে, বলল, ঠিক আছে, আমিও ভালো না—থাকার জায়গা না থাকে তো ইচ্ছে করলে আমার কাছে এসে থাকতে পারো তুমি—বুঝলে?

প্রসন্নর মুখে কথা নেই। বিস্ময়ের কূল-কিনারা পাচ্ছিল না এতক্ষণ, এই শেষের কথায় সম্বিৎ ফিরল যেন, বোবামুখে আশার আলো লাগল।

এদিক থেকে ক্ষমাযোগিনীর ঠাণ্ডা প্রশ্ন শোনা গেল, এ কে, চিনিস?

প্রসন্ন অনেকখানি ঘাড় কাত করল। চেনে।

—বজ্জাতের শিরোমণি, তুই আর না চিনবি কেন, যা এখান থেকে, ওদিকে সর্—

প্রসন্নময়ী দেয়ালের ওধারে গা-ঢাকা দিল। দত্তবাড়ির চণ্ডীবউকে সে দেখামাত্রই চিনেছিল। তার সঙ্কটের মুখে এই পদার্পণে ভাগ্যের চাকা ঘোরা সম্ভব সেটা ভাবতে পারে নি। আশায় আগ্রহে সে মুখ আড়াল করল শুধু, সরে যেতে পারল না।

ক্ষমাযোগিনী তেমনি নির্লিপ্ত গম্ভীর, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যেত মুখের টান-ধরা ঝাঁজালো ভাবটা কমেছে। চাউনিও ধার নয় আগের মত, উল্টে কৌতুকের আভাস

যাতে উঁকিঝুঁকি না দেয় সেই চেষ্টা।—বলে যে বসলি, ও হতভাগী তোকে আর ছাড়বে এর পর? এক্ষুনি তো পিছু পিছু তোদের বাড়ি গিয়ে উঠবে।

চণ্ডীবউ ভেবে-চিন্তে অচেনা একটা মেয়েলোককে আশ্রয় দেবার কথা বলে নি, আর এখনো ভাবার মত মেজাজ নয়। জবাব দেবারও ইচ্ছে নেই, আপাতত এখান থেকে প্রস্থান করতেই চায় সে।

—বোস্।...তোর শ্বশুর-শাশুড়ীর আপত্তি না হয় তো নিয়ে যা, একটা শক্ত ঠাঁই জুটলে তো হাড় জুড়োয় আমার। হঠাৎ থেমে ধমকেই উঠল যেন, বসতে বললাম কানে গেল?

অনুশাসন অমান্য করার জন্যেই এখনো দুপদাপ পা ফেলে চলে যাওয়ার ইচ্ছে। পারা গেল না। গনগনে মুখ করেই বসল।

হাত তুলে মাথার চুলের চুড়ো ঠিক করতে গিয়ে টেনে সেটা খুলে ফেলল ক্ষমাযোগিনী। তারপর চুল নামিয়ে তার মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বারকয়েক তাকালো এদিকে।—তোর চণ্ডী নাম কে রেখেছিল?

—তোমারই বা ক্ষমা নাম কে রেখেছিল?

চুলের ফাঁকে আঙুল থেমে গেল ক্ষমাযোগিনীর। সামনে কেউ এলে তার ভয়চকিত সন্ত্রস্ত ভাব দেখেই অভ্যস্ত। ঠোঁটের ডগায় হাসি এসেই গেল। বলল, দুজনেরই নাম ঠিক আছে। তা তোর অত রাগের কি হল?

মেজাজ চণ্ডীবউয়েরও শমে নামছে, কিন্তু সেটা বুঝতে দিতে আপত্তি। চুল ছেড়ে দেবার পর ক্ষমাযোগিনীর নরম-নরম দেখাচ্ছে, কথাবার্তার এই সুরও ভালই লাগছে। জবাব দিল, তুমিই বা রেগে গিয়ে ওরকম যাচ্ছেতাই বললে কেন আমাকে?

ক্ষমাযোগিনী বলল, রাগ আসলে হয়েছিল ওই ছোঁড়াটার ওপর।

অর্থাৎ ঘোষালবাড়ির মদনমোহনের ওপর। কিন্তু এই রাগও সমর্থন করতে পারলনা চণ্ডীবউ। এক শ্বশুর বাদে বাড়ির আর সকলেরও এই রাগই দেখেছে। বলেই ফেলল, সেই বা কি অন্যায়টা করেছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুর্ঘটনা হতে দেখলে ভালো হত?

দুর্বোধ্য জবাব শুনল চণ্ডীবউ।—অন্যায় করে নি বলেই আরো বেশি রাগ হয়েছে। কিন্তু রাগের বদলে তার মুখে হাসি দেখা গেল। আর তারপর যা শুনল দু চোখ বিস্ফারিত চণ্ডীবউয়ের। ক্ষমাযোগিনী বলল, ছোঁড়াটার দুরন্ত সাহস, আরো পাঁচ বছর আগে আমাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল।

চণ্ডীবউ ঠাট্টা ভাবল, মুখ লাল করে বলে উঠল, যাঃ।

ক্ষমাযোগিনী চোখ পাকালো, যা কেন, বয়সে মাত্র আট-ন বছরের বড় হব ছোঁড়াটার থেকে, তবু মনে ধরেছে যখন কি করবে? তোর ওই হিংসুটে বরটাই তো ওর গোপন ইচ্ছে ফাঁস করে দিয়ে বাপের কাছে মার খাওয়ালে। তবু ডেকে পাঠাতে বাছা এসেছিল। বলল, বাপের খড়মের পিটুনি খেয়ে বিয়ে করার ইচ্ছেটা চলে গেছে।

খানিক আগের অপ্রিয় পরিস্থিতি ভুলে চণ্ডীবউ খিল খিল করে হেসে উঠল।

মেঠো পথ পেরিয়ে পাল্কি বাড়ির দিকে ফিরে চলেছে। সঙ্গে যে আবার একটা

সমস্যা জুটিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরছে চণ্ডীবউ, তাও খেয়াল নেই খুব। পাল্‌কির পিছনে পিছনে প্রসন্নময়ী আসছে। আসার আগে ক্ষমাযোগিনী তাকে শেষবারের মত শাসিয়ে দিয়েছে, ফের যদি অনাচারের কথা কানে আসে আর যেখানে যাচ্ছে সেখানকার আশ্রয়ও যদি খুইয়ে আস তাহলে কেটেকুটে এই বাড়ির কোথাও পুঁতে রাখা হবে—ওই কালামুখ আর সূয্যির আলো দেখবে না।

অস্বস্তি নিয়েই পাল্‌কিতে উঠেছিল চণ্ডীবউ, কিন্তু দু মিনিটের মধ্যেই তার কথা ভুলেছে। ঘোষালবাড়ির ওই ছেলের ক্ষমাযোগিনীকে বিয়ে করার সাধ হয়েছিল—কথাটা যতবার মনে পড়েছে ততবার হেসেছে। তারপর এসে নিজের মুখে নাকি বলেছে বাপের খড়মের পিটুনি খেয়ে বিয়ের সাধ মিটে গেছে। হাসির ফাঁকে ফাঁকে কি যেন একটা অস্বস্তিও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বয়েস সতের হলেও অনেক রকমের ঝাপটা খেয়ে মনের বয়েস তার বেড়েইছে।...মহাচণ্ডীর থানে গিয়ে বলি দেখে যে অজ্ঞান হয়েছিল আর ঘোষালবাড়ির ছেলে এসে দুর্ঘটনার হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছে জেনে গোড়ায় ক্ষমাযোগিনী সতি সত্যি রেগে গেছল কেন? অথচ ওই লোকেটাকে সে যে মনে মনে অপছন্দ করে না সে তো বেশ বোঝা গেছে। বাড়ির একজনের সম্পর্কে পরে যা দু-চার কথা জিজ্ঞাসা করেছে তাতে বরং একটুও টান দেখে নি। কিন্তু ওই ব্যাপারে সত্যি সত্যি রেগে গেছল কেন?

কেন তাও যেন একটু একটু বুঝতে পারছে চণ্ডীবউ। অজ্ঞান হবার আগে-পরের ঘটনাগুলো চোখে ভাসছে। নির্লজ্জের মতই পিছনে পিছনে ঘুরছিল, তার চোখের আওতা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া শক্ত হচ্ছিল পর্যন্ত। তখন শুধু ননদিনীরা কেন, তারও কম রাগ হয় নি। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেছে, সে না হয় ধরা গেল ভালো কাজই করেছে—কিন্তু পরদিন বাড়ি এসে হাজির হল কোন্ সাহসে? ঠাকুর অর্থাৎ শ্বশুর যাই ভাবুক, খবর নেবার জন্য যে আসে নি, চণ্ডীবউ তা ঠিকই বুঝতে পারছে। দুরন্ত সাহসই বটে।

সচকিত হয়ে কিছু যেন ভিতর থেকে উপড়ে ফেলে সোজা হয়ে বসল। পাল্‌কির ভিতরেও মুখ লাল হয়েছে। দুরন্ত সাহস ভাবার ফাঁকে বিমনা হয়েছিল। চোখের সামনে আর একটা চিত্র জুড়ে বসছিল। সেটা থানের ভিড়ে নির্লজ্জের মত পিছনে ঘোরার চিত্রও নয়, পরদিন বাড়িতে আসার দুঃসাহসেরও নয়। অন্য কিছু।...জলের ঝাপটায় চোখ মুখ গলা বুকের কাছটা ভিজে গেছে—চোখ তাকানোর পরেও সে হুঁশ ছিল না। তার চেতনা সক্রিয় হতে সময় লেগেছিল। তার আগে বিহ্বল দু চোখ মেলে চণ্ডীবউ একখানা ঝুঁকেপড়া মুখ দেখেছিল...সে মুখে চপলতার চিহ্নমাত্র ছিল না...য়ত গভীর দুই চোখ উদ্বেগে তার মুখের ওপর স্থির হয়ে ছিল...চণ্ডীবউয়ের দুর্বোধ্য দৃষ্টিটা দুটো কালো চোখের গভীরে গিয়ে মিলেছিল।

সচকিত হয়ে সেই চিত্রটাই মুছে দিয়ে অন্য কথা ভাবতে চেষ্টা করল চণ্ডীবউ।...সঙ্গে আবার এক ফ্যাসাদ জুটিয়ে নিয়ে চলল, বলা নেই কওয়া নেই হুট করে একটা মেয়েলোককে বাড়িতে নিয়ে আসার ফলে শাশুড়ী আবার কি বলবে, সেই ভাবনা ধরল। রাগের ঝোঁকে যা বলে ফেলেছিল চক্ষুলজ্জায় সেটা আর ফেরাতে পারে নি। তাছাড়া, সত্যি কেমন মেয়েলোক কে জানে? ক্ষমাযোগিনী তো যাচ্ছেতাই বলে গালাগাল করছিল। তবে সত্যি সত্যি খারাপ মেয়েছেলে হলে তার ওপর

ক্ষমাযোগিনীর টান থাকত না বোধ হয়, আর বলা হয়েছে বলেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে পাঠিয়ে দিত না।

খারাপ মেয়েছেলের কথাটা মনে হওয়া মাত্র আবার মনে পড়ল কি! খারাপ মেয়েছেলে সে কোনদিন চোখে দেখে নি, আর বাড়ির একজন ভালো জায়গায় রাত কাটিয়ে আসে না সেও আজই শুনেছে। তাই সংশয়ে পড়ে প্রসন্নকেই আর একবার ভালো করে দেখে নেওয়ার লোভ হল তার। যেন দেখলে বুঝতে পারবে ভালো কি খারাপ।

পাল্কির পাশের লাল মখমলের ঢাকনা সরিয়ে চণ্ডীবউ মুখ বাড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। পাল্কি চলেছে কদমসারির রাস্তা দিয়ে। বাড়ি দূরে নয় খুব। সামনে, হাত বিশেক দূরে একটা কদম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে মদনমোহন। একলা। এদিকেই নিস্পলক চেয়ে আছে।

পাল্কি আরো তিন কদম এগিয়ে গেছে। বিষম চমকে উঠে শশব্যস্তে ঢাকনা টেনে দিল চণ্ডবউ।

॥ ১২ ॥

বাড়ি ফেরার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত প্রসন্নময়ীর কথা মনেও ছিল না।

শাশুড়ী পাড়া-বেড়ানো শেষ করে তখনো ফেরে নি দেখে স্বস্তি, ননদিনীরা চলে গেছে মনে হতেও। আর ঘরের একজন আবার বেরিয়ে পড়েছে দেখেও স্বস্তি। কিন্তু এতগুলো স্বস্তিব কারণ সত্ত্বেও চণ্ডীবউয়ের মনের তলায় অস্বস্তির বোঝা একটা। বাইরের সাজও বদলায় নিন, পালঙ্কে বসে আছে। বাইরে হতভম্ব, ভিতরটা ধরফড় করছে এখনো।

সাঁতার না-জানা মানুষকে হ্যাঁচকা টানে হঠাৎ ডুবজলে এনে ফেললে যেমন হয়, সেইরকম অবস্থা হয়েছিল চণ্ডীবউয়ের। কদমসারির নীচে দাঁড়িয়ে একজন গভীর দুটো কালো চোখের হ্যাঁচকা টানে অতর্কিত ওই কাণ্ড করেছে। চণ্ডীবউ সেই চোখের আওতা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ডাঙায় আবার ফিরতে পেরেছে বটে, কিন্তু ধড়ফড়ানি কমে নি।

সতের বছর বয়সের চেতনার ওপরকার পবদাটা সম্পূর্ণ সরেছে বুঝি! কদিন ধরে যা দেখছে আর বুঝছে এখন তার সব কিছু পরিণত আকার নিচ্ছে। নিজের দেহসত্তার সম্পর্কে সচেতন বছর তিনেক আগে থেকেই। বাপের বয়সী লোক তাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপেছিল কেন বুঝতে চেষ্টা করে বোঝা গেছল। বাপের ওই ভিটে থেকে শ্বশুরের এই প্রাসাদে এসে ওঠা গেছে কোন্ বস্তুর কদরে তাও অজানা ছিল না। আর, রূপ সম্পর্কে সব থেকে বেশি সচেতন হয়েছিল এই দেহ নিয়ে ঘরে একজনের দুর্বার নেশার মত যত কাণ্ডকারখানা দেখে।

কিন্তু দেহের নিভৃতে নিজের পরিণত রমণী-সত্তার এই রূপটা তখনো অনেকখানি

অচেনা ছিল, অস্পষ্ট ছিল। পুরুষের লোভ জানা ছিল, কিন্তু অন্তস্তলের সঙ্গোপন জটিলতার এদিকটা এত স্পষ্ট করে আগে দেখতে শেখে নি।...ক্ষমাযেগিনী সরোষে জিজ্ঞাসা করেছিল, রক্ত দেখে তোর মাথা ঘুরেছিল আর তোকে দেখে কার মাথা ঘুরেছিল?...ফাঁড়া কাটার কথা বলতেও তেতো গলায় বলে উঠেছিল, ফাঁড়া কেটেছে না জোড়া লেগেছে দেখ্ এখন...

কটূক্তির হীন ইঙ্গিতে চণ্ডীবউ জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু ইঙ্গিতের পরিপূর্ণ রূপটা তখনো সত্তার এই গোচরে আসে নি।...থানের ভিড়ে অপরের বউয়ের পিছনে ঘুরে রূপ গেলা আর তার মাথা কোলে নিয়ে বসে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টায় সেই তন্ময়-গভীর দৃষ্টিপাতের যত তফাৎ, পরদিন বাড়ি বয়ে এসে খবর নেওয়ার সঙ্গে কদমসারির নীচে দাঁড়িয়ে আজকের এই নিবিড় প্রতিক্ষারও তেমনি তফাৎ যেন। একটাতে চোখের ধাক্কা অপরটাতে মনের, একটাতে স্থূল বিস্ময়ের ধাক্কা অপরটাতে অলক্ষ্য জটিলতা আবিষ্কারের।

ঘরের পালঙ্কে বসে উপলব্ধির এই অস্বস্তির মধ্যে ডুবে ছিল চণ্ডীবউ। প্রসন্নময়ীর অস্তিত্ব মনে ছিল না।

কিন্তু প্রসন্নময়ীর নিজের তা ভোলার উপায় নেই। অস্তিত্ব নিয়েই যত বিড়ম্বনা তার। দত্তবাড়ির তাজ্জব মেজাজের রূপসী বউয়ের ভাবগতিক দেখে একটু ভয়-ভয়ই করছিল তার। অঘোর নিবাসের ঠাকরোনটিকে যে রকম ঝাঁঝিয়ে এলো, তাজ্জব মেজাজ বলবে না তো কি? অমন বুকের পাটা জগতে কারো আছে তাই জানত না। সেই মূর্তিখানাও ভোলবার নয়। রূপ যেন তখন একেবারে চনচনে উনুনের আঁচে পড়ে গনগন করে জ্বলছিল। খানিক আগের অবাক কাণ্ডখানাও যে প্রসন্নময়ীর চোখে পড়ে নি এমন নয়। কদমসারির নীচে ঘোষালবাড়ির মদন ঠাকুরের দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারখানা। সেখানে এসে দত্তবাড়ির বউ পাল্কির লাল ঢাকনা সরিয়ে মুখ বাড়ালো, ঠাকুরকে দেখে অসাড় হয়ে গেল কয়েক দণ্ড, তারপর ভূত দেখার মত করে ভিতরে সেঁধিয়ে গেল আর ঢাকনা টেনে দিল। মহাচণ্ডীর থানে মাথা কোলে নিয়ে বসে জ্ঞান ফেরানোর খবরটা প্রসন্নময়ীর কেন, গাঁয়ের কোনো কালা বোবারও অগোচরে ছিল কিনা সন্দেহ। প্রসন্নময়ী তো রসের খবর একটু-আধটু রেখেই থাকে। রাখে বলেই যত গেরো। তা চণ্ডীবউকে সে বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই একবার দেখেছিল। ননদিনীদের সঙ্গে গানবাজনার আসরে দেখেছিল। ডাকসাইটে রূপসী শুনে দেখার লোভও ছিল। রূপের কথা বিশেষ করে শুনেছিল মুনকের মুখে। মুন্কে ছিল তার বে-আক্কেলে সোয়ামীর খাতিরের মানুষ। সোয়ামীর কথা মনে হলেই প্রসন্ন মনে মনে আগে বে-আক্কেলে বলে গাল পেড়ে নেয়। তার প্রধান কারণ, মাঝবয়সে প্রথম বউ খেয়ে সোমত্ত বয়সের এই মেয়েকে ঘরে এনে কটা বছর না যেতে কথা নেই বার্তা নেই টুপ করে যেন জীবনের বোঁটা ছিঁড়ে খসে পড়ল। দ্বিতীয় কারণ, গেলই যদি, যাবার আগে দ্বিতীয় পক্ষের অমন সোহাগের বউয়ের দিকে তাকিয়ে ঘর-বাড়ি জমি-জমার একটা ব্যবস্থা পর্যন্ত করে গেল না। চরিত্তিহীন ওই ডাকাত ভাশুরপো দুটোর জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে গেল। রাতে-ঘুমিয়ে একদিন ওই সোয়ামীকে স্বপ্ন দেখেছিল প্রসন্নময়ী, ঘুমের মধ্যে হাপুস নয়নে কেঁদেও ছিল। কিন্তু সকালে উঠেই পিত্তি জ্বলেছে, আর ঝাঁটা হাতে নিতে ইচ্ছে করেছে।

মুন্‌কের থেকে তার সোয়ামী বয়সে অনেক বড় হলেও তাকে খাতির করার কারণ ছিল। প্রসন্নর বাপের কানে গুজ গুজ করে ওই দোজবরের সঙ্গে তার বিয়েটা মুন্‌কেই ঘটিয়েছিল। বেঁচে থাকতে সেই 'কেতজ্ঞতা' ভোলে নি। সোয়ামী ছিল ক্ষমা ঠাকরোনের বেজায় ভক্ত। ফাঁক-ফুরসৎ পেলেই পোষা বেড়ালের মত অঘোর নিবাসে এসে বসে থাকত, কাজ-কর্ম করে দিত, আর কোনো যাগ-যজ্ঞির ব্যাপার থাকলে প্রসন্নময়ীকে এসেও খাটাখাটনি করতে হত। ওখানে মুন্‌কের বলির পাঁঠার মুণ্ডু পাওয়ার ব্যবস্থা সোয়ামীই করে দিয়েছিল। সে মরে যেতে গোড়ার দিকে অন্তত ওই পেটুক বামুন প্রসন্নময়ীর দু'চক্ষুর বিষ হয়ে উঠেছিল। বলির পাঁঠার মুণ্ডু নিতে আসত যখন প্রসন্ন অনেকদিন আগে তার মুণ্ডু না চিবিয়ে পাঁঠার মুণ্ডু নিয়ে ফিরতে দেয় নি। সময়ে অনেক সয়। এখন সয়েই গেছে। ওই পেটুক বামুনের মুরুব্বি এখন সে-ই, মুখের কথা খসালে হুকুম তামিল করতে ছোটে। আর ঝাঁটা হাতে নিলেও রা কাটে না।

তা দত্তবাড়ির তাক-লাগানো রূপের কথা সে-ই বলেছিল। বলেছিল, সাক্ষাৎ তেলোত্তমা জগজ্জননীর রূপ। প্রসন্ন মনে মনে হেসে বাঁচে নি, মুখে তেড়ে এসেছিল, বুদ্ধির ঢেঁকি হাড়-হাবাতে পেটুক বামুন কোথাকারের—সগ্যের নত্তকী তেলোত্তমার রূপ আর জগজ্জননীর রূপ এক হল!

আর উপমার মধ্যে না গিয়ে মুন্‌কে বলেছিল, নতুন বউয়ের এত রূপ যে সামনে এসে পরিবেশন করছিল যখন অমন ভোজের দ্রব্যের দিকেও ভালো করে মন দেওয়া যাচ্ছিল না—কর্তাকে বলে কয়ে তাকে সরিয়ে দিতে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে উদরপূর্তি করা গেছল।

গান-বাজনার আসরে ননদিনীদের সঙ্গে নতুন বউকে দেখে মনে মনে প্রসন্নময়ীকে স্বীকার করতে হয়েছিল পেটুক বামুন বাড়িয়ে বলে নি। দু বছর বাদে ওই রূপ এখন আরো তাক-লাগার মত হয়েছে। দেখলে একসঙ্গে ভয় করে আর ভক্তি হয়—এমন। জ্ঞান থাক্ আর না থাক্, আর মায়ের থানে যত লোকই গিসগিস করুক, এই রূপ কোলে নিয়ে বসার ফলে মদন ঠাকুরের মুণ্ডু না ঘুরে থাকলে তাকে ঠাকুরই বলবে প্রসন্ন, মানুষ বলবে না। আর পাল্‌কি চলার রাস্তার কদমসারির নীচে ওই সময়ে দাঁড়িয়ে থাকাটাও যে রাস্তার শোভা দর্শনের জন্যে নয় তাও হলপ করেই বলতে পারে। পুরুষমানুষের চোখের নেশা ধরতে পারবে না এমন চোখ তার নয়। স্বাভাবিক সময় হলে এই এক ব্যাপার নিয়েই ভিতর থেকে কত রসের খোরাক পেত ঠিক নেই। কিন্তু নিজেরই শিরে সংক্রান্তি এখন। রসে মাতার মন নয় একটুও।

অন্দরের দোরে পাল্‌কি থেকে নেমে রূপসী বউ সটান ওপরে চলে গেল। তাকে বসতে বলল না, দাঁড়াতে বলল না, সঙ্গে আসতে বলল না—একটা কথাও বলল না। প্রসন্ন এখন করে কি! ওদিকে বাড়ির দাসী-চাকরগুলো যেন সঙ দেখতে দাঁড়িয়ে গেল একে একে। আর আড়ালে গিয়ে ফুসফুস গুজগুজ করতে লাগল। ব্যবস্থা নিজেরই পাকা করার তাগিদ প্রসন্নময়ীর। দুই এক কথায় তাদের বুঝিয়ে দিল, মা-লক্ষ্মী বউমণি তাকে নিয়ে এসেছে, তারই 'সেব্যকম্মে' বহাল হয়ে গেছে সে—অতএব অত অবাক হবার বা কানাকানি করার কিছু নেই, এখন থেকে

এ-বাড়িতেই থাকবে সে। অবশ্য এই জোর ব্যক্ত করার আগে কর্ত্রী ঠাকরোন যে বাড়ি নেই সেটা জেনে নিয়েছিল। ভিতরে ভিতরে দুর্ভাবনা শুধু তাঁকে নিয়েই। ছেলেমানুষ বউয়ের ব্যবস্থা বাড়ির আসল গিন্নী মেনে নেবে কিনা সে-সন্দেহ আছেই। দুর্ভাবনা ঘুচলে দাসী-চাকরেরা পরে একটু মান্যিগণ্যি যাতে করে সেই কাজটুকুই আগে করে রাখল।

ওদিকে বাড়িতে পা দিতে না দিতে সমাচার কানে আসতে দত্ত-গৃহিণী আগুন একেবারে। বলা নেই কওয়া নেই বউ তার খুশিমত নিজের খাস-ঝি বহাল করে ফেলল এত সাহস বরদাস্ত করার মানুষ নন তিনি। কাজটা তাঁর কর্তৃত্বে হাতে পড়ার মতই অসহ্য। তার ওপর ঘর-খেদানো একটা মেয়েমানুষকে আনা হয়েছে যার স্বাভাব-চরিত্র নিয়ে গাঁয়ের লোকে পাঁচকান করে—বাড়ির বয়স্কা ঝি দুটোর মুখে এই আভাস পেয়ে তো সোনায় সোহাগা। জ্বলতে জ্বলতে ওপরে উঠে এলেন তিনি।

প্রসন্নময়ী তখন বউয়ের ঘরের সামনের বারান্দায় কার্নিসে ঠেস দিয়ে ভালো মুখ করে বসে ছিল। কর্ত্রী ঠাকরোনকে দেখামাত্র শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে পুণ্যি করার আশায় এক পা দু পা এগোতে থাকল। কিন্তু পৌঁছুনো গেল না। কর্ত্রী ঠাকরোন তার মুখখানা বেশ করে দগ্ধে দিয়ে ওধারের ঘরের আড়ালে চলে গেলেন। প্রসন্নর বুক দুরু দুরু—নীচে থেকেই দাসদাসীরা কর্ত্রীর কান বিষনোর কাজটি সেরে দিয়েছে বোঝা গেল। এদিকে যার সঙ্গে যার ভরসায় আসা তিনিও সেই ঘরের ভিতরে সেঁধিয়েছেন আর মুখও দেখা গেল না। এখন প্রসন্নময়ী করে কি? ঘাড় ধরে কেউ যদি তাকে নীচে নামিয়ে বাড়ির বার করে দেয় তাহলেই বা করার কি আছে? গিন্নীর মুখের ভাবখানা তো সেই রকমই দেখল।

ওদিকে তপ্তমুখে দত্ত-গৃহিণী সোজা কর্তার কাছে উপস্থিত। গিন্নীর তাপের কারণ বুঝতে সময় লাগল। রাগ যে তাঁর আদরের বউয়ের ওপর এটুকু অবশ্য শুরু থেকেই বোঝা গেল। আসকারা দিয়ে বউকে এমন মাথায় তোলা হয়েছে যে এখন আর কাউকে মানুষ বলে গেরাহ্যি করে না। তার এত সাহস যে বাইরে থেকে নিজেই মেয়েমানুষ বহাল করে অন্দরে এনে তোলে! এমন মেয়ে-মানুষ যাকে নিয়ে গাঁয়ে ঢি-ঢি!

পরের দু-চার কথায় ব্যাপার বোধগম্য হল মহেশ্বর দত্তর। বাইরে বেরিয়ে বউ কারো অনুমতি না নিয়ে নিজের জন্যে একটি পরিচারিকা সংগ্রহ করে এনেছে যার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে গাঁয়ের লোকে পাঁচকথা বলে।

গাঁয়ের লোকের কথায় খুব কান দেবার মানুষ নন মহেশ্বর দত্ত। বয়েসকালের অনাথা বিধবাকে নিয়েই যদি পাঁচকথা না কইল তবে কথা হবে কাকে নিয়ে! তবে বাঁকা রাস্তায় চলার মেয়েছেলেও যে গাঁয়ে আছে এও ঠিক। কিন্তু গৃহিণীর এত রাগের আসল কারণটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না তিনি। কর্ত্রীকে না জানিয়ে একজনকে একেবারে বহাল করে নিয়ে আসাটা। বউয়ের এ কাজ তিনিও অনুমোদন করতে পারলেন না। এনেছে যখন, তার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে সন্দেহ খুব করেন না, জেনেই এনেছে নিশ্চয়। কিন্তু এভাবে আনাটাই ঠিক হয় নি।

অতএব বিচারের মুখ করেই বউকে ঘরে ডেকে পাঠালেন তিনি।

ঠাকুর ডাকছেন শুনে সম্বিৎ ফিরল যেন চণ্ডীবউয়ের। ধড়মড় করে পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়াল। পোশাকী শাড়িটা বদলে নিল চট্‌ করে। বারান্দায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল। অদূরে করুণ মুখ করে প্রসন্নময়ী তার দিকে চেয়ে আছে।

চণ্ডীবউয়ের তক্ষুনি মনে হল ওকে নিয়েই কিছু একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছে আর সেই কারণেই ঠাকুরের তলব। ওকে ভরসা দেবে কি, চণ্ডীবউ নিজেই বিলক্ষণ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। মাথা এখন একটুও গরম নয়, তাই ভাবনা। ওর দৃষ্টি এড়িয়ে মাথার ঘোমটা বড় করে ঠাকুরের ঘরের দিকে চলল।

শ্বাশুড়িকে ওখানে দেখবে জানত, আর ঘোমটার ফাঁকে দৃষ্টি চালিয়ে তাঁর এই তপ্ত মুখ দেখবে তাও জানাই ছিল। এখন সামলাবে কি করে তাই শুধু জানে না। শ্বশুরের সামনে তটস্থ হয়ে দাঁড়াল।

মহেশ্বর দত্ত বউয়ের সঙ্গে কথাবার্তার আগে পিছে মা মা-লক্ষ্মী ইত্যাদি জোড়েন। কিন্তু বিচারে বসে সেটা সম্ভব নয়। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে একটা মেয়েছেলেকে নিজের ঝিয়ের কাজে বহাল করে নিয়ে এসেছ শুনলাম, সে কে?

প্রসন্নময়ীর নামটাই শুধু জানে কে বলবে কি করে। ভাশুরপোদের বাড়ি থেকে তাড়ানোর কথা বললে তো হয়েই গেল। সেটা যে আবার শাশুড়ীর মারফৎ ঠাকুরের শোনা হয়েই গেছে, তা জানে না। চণ্ডীবউ নির্বাক।

তোমার আলাদা একজন ঝি চাই সে-কথা তোমার শাশুড়ীকে বললে না কেন?

অস্ফুট স্বরে চণ্ডীবউ বলল, সেজন্যে আনি নি...

তবে কি জন্যে?

চণ্ডীবউ চুপ আবার।

মহেশ্বর দত্ত আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ওই মেয়েলোকটি কে? তুমি চেনো কি ওকে?

নিরুপায় চণ্ডীবউ মাথা নাড়াল। অর্থাৎ জানেও না, চেনেও না।

মহেশ্বর দত্ত অবাক এবারে।—না জেনে না শুনে তাহলে কোথা থেকে ধরে আনলে তুমি?

...অঘোর নিবাস থেকে।

ব্যস, মহেশ্বর দত্তর বিচারের গাম্ভীর্য গেল, শাশুড়ীর মুখেও চকিত অস্বস্তির ছায়া। বউ যে অঘোর নিবাসে ক্ষমাযোগিনীর কাছে গেছল সেটা একজনের স্মরণ ছিল না, আর একজন জানেও না। মহেশ্বর দত্ত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন, ওকে তাহলে ওই ঠাকরোনটি দিয়েছেন—সেখান থেকে এনেছ?

সামান্য মাথা নেড়ে ফেলে মনে মনে শঙ্কিত চণ্ডীবউ। নির্ভেজাল সত্যি নয় বলেই সঙ্কোচ আর শঙ্কা। ক্ষমাযোগিনী দিয়েছে সেটা ঠিক নয়, সেখান থেকে এনেছে সেটুকুই কেবল সত্যি।...বলেছিল অবশ্য, শ্বশুর-শাশুড়ীর আপত্তি না হয় তো নিয়ে যা। কিন্তু তাকে দেওয়া বলে না।

আড়চোখে মহেশ্বর দত্ত গৃহিণীর বিপন্ন ভাবটুকু উপভোগ করলেন। মুখে বিচারকের গাম্ভীর্য আঁট হতে থাকল আবার। মেয়েলোকটি ক্ষমাঠাকরোনের জানা-চেনা?

এবারে একটু বেশি করে ঘাড় কাত করল চণ্ডীবউ। তার ওপর মৃদু গলায় বলল, খুব স্নেহ করেন...আর এই মেয়েলোকটি খুব অসুবিধেয় পড়েছে বলেই আনতে হল।

আনতে হল বলতে নিজেই এনেছে বোঝাতে চেয়েছিল, কিন্তু মহেশ্বর দত্ত এবং তাঁর গৃহিণী ধরে নিলেন অসুবিধেয় পড়েছে বলেই ক্ষমাযোগিনী বউয়ের মারফৎ তাকে এ-বাড়িতে পাঠিয়েছে। এবারে একটু কঠিন হয়ে গিন্নীকে জব্দ করার বাসনা মহেশ্বর দত্তর। গম্ভীর আদেশের সুরে বউকে বললেন তার আর কি করা যাবে, ওকে এক্ষুনি বলে দাও এ-বাড়িতে জায়গা হবে না, ঠাকরোনকে গিয়ে বলুক বাড়ির কর্ত্রীর মত নেই।

দত্ত-গিন্নী আঁতকে উঠলেন প্রায়, ওসব তন্ত্র-মন্ত্রের সাধক-সাধিকাদের ভয় তাঁর কর্তার থেকেও দ্বিগুণ। তার ওপর এই সাধিকাটির তো নামেই তটস্থ। বলে উঠলেন, আমি—আমিকি করে জানব ওই ঠাকরোনের কাছ থেকে আনা হয়েছে ওকে—আমাকে কেউ বলেছে?

মহেশ্বর দত্তর দু চোখে গিন্নীর মুখখানা চড়াও করল এবার।—কেউ বলে নি তো ওই মেয়েলোকটার সম্বন্ধে তুমি এত কথা জানলে কি করে? তাছাড়া যে এনেছে সে কেন আনল বা কোথা থেকে আনল না জেনেই বলতে বলতে এঘরে এসে হাজির হলে কেন? বউয়ের দিকে ফিরলেন, আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না—যা বললাম ওকে ডেকে তাই বলে দাও।

পরিস্থিতির এভাবে ভোল বদল হতে চণ্ডীবউয়ের হাসি চাপা দায়। ঘোমটার ফাঁকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, শাশুড়ীর মুখখানা দেখার মতই হয়ে উঠেছে। সঙ্কট যত রাগও ততো। বলে উঠলেন, ঘাট হয়েছে—ওকে বলে এসো দয়া করে এসেছে যখন মাথায় করে রাখব'খন।

এই বিবাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে না থেকে চণ্ডীবউ শশব্যস্তে ঘর ছেড়ে বাঁচল। মাথার ঘোমটা আপনিই খসেছে। তার এই ফেরত-মূর্তি দেখেই প্রসন্নময়ী যেন আশ্বাস পেল একটু।

সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চণ্ডীবউ তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল একদফা। তারপর ডাকল, ভিতরে এসো।

ঘরে ঢুকে আবার রাজেন্দ্রাণীর মতই পালঙ্কে বসল সে। দুরু দুরু বক্ষে প্রসন্নময়ী সামনে এসে দাঁড়াল।

তোমার বয়েস কত?

এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না প্রসন্ন। ঢোঁক গেলার ফাঁকে হিসেব করে নিল।—এক কুড়ি থেকে তিন বছরটাক্ বেশি।

স্বামী মরেছে কত দিন?

বছর দুই হল।

এরই মধ্যে এত যাত্রা শোনার শখ কেন?

জবাবে প্রসন্নময়ী প্রথমে করুণ মুখ করে তাকালো তার দিকে। তারপর অল্পবয়সী বউয়ের মন ভেজাবার চেষ্টায় তেমনি করুণ সুরেই বলল, বুক সারাক্ষণ পোড়ে বলেই একটু-আধটু যাই শুনতে—

অনুচ্চ ধমকের সুরে চণ্ডীবউ বলল, বুক পোড়ে বলে যাত্রা শুনে বুক জুড়াতে যাও? ক্ষমাযোগিনী চন্দনকাঠ ছুঁড়ে মেরেছিল যখন তাকে ও-কথা বললে না কেন? ভাশুরপোরা তিন-তিনবার করে তোমাকে বাড়ি থেকে তাড়ায় কেন?

ধমকের সুর বটে কিন্তু জ্বলন্ত মূর্তি নয়, অতএব প্রাণপণে আশাটুকু আঁকড়ে থাকার চেষ্টা প্রসন্নময়ীর। ধুপ করে বসে পড়ে তার পা দুটো আঁকড়ে ধরে বলে উঠল, বিশ্বাস করুন বউমণি, ওদের তরাসেই ঘর ছেড়ে পালাবার জন্যে অস্থির আমি। ওরা দুটো হাড়-বজ্জাত, বয়সে আমার থেকে দু বছর আর চার বছর করে বড় এক-একজন। কাকী বলে মান্যিগণ্যি করা দুরে থাকুক, যে চোখে তাকায় বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায়। স্বভাব-চরিত্তি ওদের একটুও ভালো নয়, আমিও সমান দাপটে চেঁচামিচি করি বলে অত রাগ ওদের। তাই ছুলছুতো পেলেই পাড়ার লোক ডেকে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়ে জব্দ করতে চায় আমাকে—ক্ষমা ঠাকরোনকে আপনি জিজ্ঞেস করবেন, এক বর্ণও যদি মিথ্যে বলে থাকি। যাত্রা শোনার ওই নেশাটুকু না থাকলে ঠাকরোন আমাকে কখ্খনো অত গালমন্দ করতেন না। আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ভাশুরপোরা এবারে আগে থাকতে ক্ষমা ঠাকরোনের কাছে নালিশ করে গেছে। ঠাকরোন ওদেরও ঝাঁটা-পেটা করতে ছুটেছিলেন।

পা দুটো চণ্ডীবউ আগেই গুটিয়ে নিয়েছিল। বাক্য শুনে কান-মুখ লাল। আবার যাত্রা শোনার নেশা শুনে হাসিও এসে গেছল। তাড়াতাড়ি ওকে তোলার তাগিদে যথাসম্ভব গম্ভীর মুখেই বলল, আচ্ছা, যাও এখন—

কোথায় যেতে বলছে প্রসন্নময়ীর ঠিক বোধগম্য হল না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কাল আসব?

কাল কেন, আজ কি?

সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল প্রসন্নময়ী।—আজই গিয়ে কাপড় দুখানা আর তোরঙ্গটা নিয়ে আসব?

কিচ্ছু আনতে হবে না, এখানেই সব পাবে।

প্রসন্নময়ীর বুকের ওপর থেকে একটা পাহাড়ই নেমে গেল বুঝি। চট্ করে আর একবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠল। তারপর ঘর ছেড়ে হৃষ্টচিত্তে আবার বারান্দায় এসে বসল।

সাত দিন না যেতে বউমণির উপর প্রসন্নময়ীর টানটা সাত বছরের মত হয়ে উঠল। যে মেয়ে ক্ষমাযোগিনীর মত ঠাকরোনকে মুখের ওপর অমন মূর্তিতে ঝাঁজিয়ে আসতে পারে, আবার লোকের কু-রটনার পরোয়া না করে শাশুড়ীর অমতেও সমান দাপটে তার মত একটা মেয়েলোককে এভাবে আশ্রয় দিতে পারে—সর্বদা তার পা দুখানা বুকে করে রাখতে চাইবে বইকি। তার এই যত্নের ঠেলাতেই চণ্ডীবউ অস্থির হয়ে ধমকে ওঠে, অত করতে গেলে দেবে তাড়িয়ে।

এক গাল হেসে প্রসন্ন বলে, আর তুমি তাড়িয়েছ বউমণি, খাটে উঠে শ্মশানযাত্রার আগে পেসন্নকে আর এই ঠাঁই থেকে নড়াতে পারবে না কেউ।

বউমণির মেজাজের মূর্তি প্রসন্নময়ী দেখেছে বটে, কিন্তু আসলে দিব্বি ছেলেমানুষ। আনন্দ হলে অমন সুন্দর হাসে বলেই এরই মধ্যে উল্টো-পাল্টা কথা বলে বা

কাজ করে বউমণিকে হাসতে চেষ্টা করে সে। আর সেই সঙ্গে সামনে বসে অজস্র রূপের প্রশংসা করে একটু রাগাতেও চেষ্টা করে। বলে, অনেক জন্মের অনেক তপস্যার ফলে এমন মনিব পেল।

হাসি চেপে চণ্ডীবউ তক্ষুনি বলেছে, আবার যাত্রা শুনতে যেতে চাইলে টেরটি পাবি মনিব কেমন। ধরে অঘোর নিবাসে ছেড়ে দিয়ে আসব তোকে।

তক্ষুনি জিব কামড়ে প্রসন্নময়ী মাথা নেড়েছে বটে, কিন্তু আশাও করেছে মন যুগিয়ে চলতে পারলে যাত্রা শোনার আনন্দ থেকেও বঞ্চিত হবে না।

দত্তবাড়ির ডাকসাইটে রূপসী বউয়ের খাস দখলের পরিচারিকা হয়ে শুধু যে প্রসন্নময়ীর বুকখানা পাঁচ হাত হয়েছে তাই নয়, তাকে পেয়ে মনে মনে চণ্ডীবউও খুশি। তার মস্ত একটা নিঃসঙ্গতা ঘুচেছে।

মহেশ্বর দত্ত সঙ্কল্পের রাস্তায় পা বাড়ালেন সেদিন। সেটা ঘোষালবাড়ির রাস্তা। আগেই ঘোষালের ছেলের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন যাচ্ছেন।

বিত্ত রক্ষার তাগিদ, নিজের ছেলের ভবিষ্যৎ সুনির্বিঘ্ন করার তাগিদ। আর সেই উদ্দেশ্যে সঙ্কল্পমত ঘোষালের ছেলেকে কাছে টেনে বশ্যতার আফিম গেলানোর তাগিদ। রাধানাথকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে গলাগলি করিয়ে দেবেন কিনা তাও ভেবেছিলেন। কিন্তু প্রথমেই অতটা করতে গেলেন না। যে ছেলের একদিন করণের মাথা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা, তার নিরাপদ কাঁধে বসিয়ে দিয়ে নিজের ছেলের মাথাটা উঁচিয়ে তোলার ব্যবস্থা করতে পারলে দুর্ভাবনার অবসান।

মদনমোহন বিনীত সমাদরে ঘরে এনে বসালো তাঁকে। তিনি বসতে বলার পর বসল। কথা শোনার ফাঁকে উঠে নিজের হাতে তামাক সেজে দিল। মহেশ্বর দত্ত পরম প্রীত। কিন্তু শিষ্টাচার সত্ত্বেও ছেলেটাকে আজ একটু বেশি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল তাঁর।

বললেন, এর মধ্যে আমি আর সময় পাই নি, তুমিও যাও নি—তোমার খুড়িমার তাগিদ, ছেলেটাকে ডাকো একদিন, নিজে সামনে বসে খাওয়াই। বাপ নেই মা নেই, কে-ই বা দেখেশোনে কে-ই বা আদর-যত্ন করে। বামুন হলে নিজে রেঁধে খাওয়াতে পারতো, সেই দুঃখও করছিল।

মহেশ্বর দত্তর মনে হল এমন অন্তরঙ্গ উক্তির পরেও গলে যাওয়া দূরে থাক, ছেলেটা যেন চেষ্টা করে হাসল একটু। এটা ঠিক শ্রদ্ধা বা সমীহ ভাব কিনা বুঝে উঠলেন না।

এসো একদিন, একদিন কেন—যেদিন খুশি আসতে পারো, বামুন তো বাড়িতে বাঁধাই আছে। সে যাক, আমি এলাম নিজের দায় নিয়ে, রাধাটা তো ছেলেমানুষই থেকে গেল, তোমাকে কাছে না পেলে তো আর চলে না। বেঁচে থাকলে তোমার বাবার কাছেই এসে ধর্ণা দিতুম, কিন্তু সময়ে সে সুমতি তো আর হল না—চলে যাবার পর টের পেলাম কোন্ জায়গাটা খালি হয়ে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন একটা।—এই বয়সে এত দুর্ভাবনার বোঝা কাঁধে কোন্ দিন শুনবে আমারও হয়ে গেছে।

মদনমোহন মন দিয়েই শুনল, কিন্তু বক্তব্য বোঝা গেল না। বাবার মৃত্যুর

পর ওই দুটো চোখে সত্যিই জল দেখেছিল মনে পড়ল। নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে বাবার কাজ সম্পন্ন করিয়েছিলেন। আর, এই কথাগুলোও আন্তরিকতায় ভরা। তবু কিছুই মন স্পর্শ করছে না। দত্তবাড়িতে গিয়ে সেদিন যতটুকু উত্তাপ নিয়ে এসেছিল ততটুকুও না। প্রশ্ন না করে জিজ্ঞাসু নেত্রে চুপচাপ প্রতীক্ষা করতে থাকল।

ভূমিকা শেষ করে মহেশ্বর দত্ত এবারে কাজের কথায় এলেন। নির্ভরযোগ্য আপনজনের অভাবে ব্যবসার সর্বত্র কিভাবে মার খাচ্ছেন সেটা বোঝালেন অথচ দেখেশুনে বুঝে নিতে পারলে এই ব্যবসা দ্বিগুণ বাড়তে পারে। বাড়াবার ইচ্ছে আছে কিন্তু এগোবেন কোন্ ভরসায়? যা আছে তা সামলাতেই হিমসিম অবস্থা। ভাবনা-চিন্তায় তাঁর শরীর ক্ষয় হতে বসেছে, পরমায়ু কমছে। এখন নিজের জনের মত মদনমোহন এগিয়ে এসে যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

বক্তব্য বোঝার পরেও মদনমোহন চুপ খানিকক্ষণ। তারপর নিরুত্তাপ মতামত জানালো। বলল, আপনার সে-রকম দরকার যদি কিছু হয় বলবেন। কিন্তু ব্যবসায় লাগা বা সে-রকম কিছু পাকাপ্যাক ভার নেওয়া সম্ভব নয়।

এত নরম সরম প্রস্তাবের পর সরাসরি এই ঠাণ্ডা প্রত্যাখ্যান আশা করেন নি মহেশ্বর দত্ত। আহত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, সম্ভব নয় কেন, তুমি চাকরি ভাবছ?

মদনমোহন নিরুত্তর।

মহেশ্বর দত্ত হাসলেন, তুমি ছেলের বয়সী তবু ঘোষাল-কর্তার ছেলে তুমি সে-কথা ভুলে তোমাকে আমি চাকরি করতে ডাকব না। চাকরি করার লোক অনেক আছে। আমার দাবি তার থেকে ঢের বেশি। দায়িত্ব নিলে তার প্রাপ্যও অবশ্যই বুঝে নেবে, তাহলেও সেটা চাকরি করার দায়িত্ব নয়। রাধানাথেব ভাই হয়ে সব বুঝেশুনে নেবার মত করে কাছে আসতে পারে এমন একজনকেই দরকার—

অনুচ্চ স্পষ্ট স্বরে মদনমোহন বাধা দিল, সে-রকম অনুগ্রহ নেবার লোক করণে পাবেন।...রাধানাথ আপাতত ভাই খুঁজছে না, আপনার টাকা খরচ করে আমাকে একেবারে সরাবার মত লোক খুঁজছে। ওকে বলবেন সে-রকম লোক পাওযা একটু শক্ত, ও নিজেই চেষ্টা করে দেখতে পারে।

মহেশ্বর দত্ত নির্বাক, হতভম্ব খানিকক্ষণ। ছেলের ভবিষ্যৎ নির্বিঘ্ন করার আশা বুঝি মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। যে প্রতিকূলতার সম্ভাবনা চিন্তা করে তিনি উতলা হয়েছিলেন তা যেন এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে, তাঁর চোখ বোজার অপেক্ষা রাখে নি। তবু অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছেন এ তোমাকে কে বললে? ও এ রকম পাগলের কাজ করতে যাবে কেন?

মদনমোহন জবাব দেয় নি। আর একটি কথাও বলে নি। মহেশ্বর দত্ত উঠে এসেছেন। ঘোষালের ছেলে যে আচরণ করল আর যেভাবে বলল, ব্যাপারটা অবিশ্বাস করার মত নয় একটুও। নিজের ছেলের উপরেই আগুন হয়ে ঘরে ফিরলেন বটে, কিন্তু ঘোষালের ওই ছেলেটার ওপরেও বিরূপই হয়েছেন। ঐশ্বর্যশালী মানুষ কত আর নত হতে পারেন! ওর বাপ-ঠাকুরদার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলেই সেধে গেছলেন তিনি। সেটা বড় করে দেখলে নিজের ছেলের পাগলামি এক ধমকেই ঠাণ্ডা করে দিতে পারতেন তিনি। তিনি গেছেন বলে ঘোষালের ছেলের নরম মুখ বা আপোসের

মুখ দেখলে ওর সামনেই রাধানাথকে ডেকে ফয়সালা করে দিতে পারতেন।

...তাঁর সেধে উপস্থিত হওয়াটা ওই ছেলে একটুও বড় করে দেখে নি। তাঁর উদারতার সম্মানও দেয় নি। শুধুই দুর্বলতা ভেবেছে।

বাড়ি ফিরেই রাধানাথের খোঁজ করলেন। সে বাড়ি নেই। এই মুখ দেখে দত্ত-গিন্নী শঙ্কিত, তার ওপর এসেই ছেলের খোঁজ। ভরসা করে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না কি হয়েছে।

মহেশ্বর দত্ত নিজেই বলেছেন। ছেলে এই এই করেছে আর তিনি এইভাবে অপমানিত হয়ে ফিরেছেন।

বলা বাহুল্য, ছেলে খুন খারাপির ষড়যন্ত্র করতে পারে সেটা গৃহিণী বিশ্বাস করতে রাজি নন, আর মনের জ্বালায় সে-রকম কিছু ঝোঁক যদি মাথায় চেপেও থাকে, ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দেওয়াই বিধেয় সেটা। অতএব তিনিও স্বামীর অপমানটাই বড় করে দেখলেন, আর এই সুযোগে ঘোষালের ছেলের সম্পর্কে তাঁর কান একটু না বিষিয়ে পারলেন না। রয়ে-সয়ে চাপা গলায় যেটুকু ব্যক্ত করলেন তার সারমর্ম, ওই ছেলেটাকে যতখানি আস্কারা কর্তা দিতে যাচ্ছিলেন তার যুগ্যি সে নয়। আর তার মতিগতিও সুবিধের নয় খুব। লোকে ওর সম্পর্কে এরই মধ্যে পাঁচরকম বলতে শুরু করেছে। বলবে না-ই বা কেন? মায়ের থানে বউ ভিরমি যেতে ওর জন্যে একটা দুর্ঘটনা হয়ত বেঁচেছে, কিন্তু তার আগে সারাক্ষণ ধরে ও যে ছায়ার মত বউয়ের পিছন পিছন ঘুরেছে সেটা তো আর মিথ্যে নয়। মেয়েরা দেখেছে, সকলেই দেখেছে। তারপর কোনদিন যে এই ত্রিসীমানা মাড়ায় না সে বাড়ি বয়ে-পরদিনই এলো বউয়ের খবর নিতে। শুধু তাই নয়, ওই ঘোষালের ছেলেকে অনেকেই আজকাল এ বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখে।

মহেশ্বর দত্ত অবিশ্বাস করতে পারেন নি। যত ভেবেছেন ততো বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। বউয়ের এই রূপ দেখে মাথা ঘুরে যাওয়া বিচিত্র নয়, বরং সম্ভবই বটে। সম্ভব বলেই ছেলের এত ক্রোধ কেন তারও হদিস পেলেন।

সেই বিকেলেই চণ্ডীবউ ভিতরে ভিতরে নাড়াচাড়া খেল একপ্রস্থ।

দুপুরে প্রসন্ন বেরিয়েছিল একটু। তার হুকুম নিয়েই গেছল। তার এই দিন ফেরার পর থেকে চেনা-জানা কারো সঙ্গেই দেখা হয় নি। সোয়ামীর ভিটের আশপাশের সমবয়সীদের সঙ্গে একটু দেখা-সাক্ষাৎ করে আসার বাসনা।

ফিরে এসে আমতা আমতা করে বলল, ঘোষালবাড়িব মদন ঠাকুরকে দেখলাম ওদিকের আমতলার রাস্তায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন বউমণি।

শোনামাত্র চণ্ডীবউয়ের মুখ লাল কয়েক নিমেষ। এই বাড়ির পিছনের দিকেই আমতলার রাস্তা। সামলে নিয়ে ঠাণ্ডা চোখে তাকালো প্রসন্নর দিকে, বাড়ি ফিরেই ও তাকে এই খবরটা দিল কেন? জিজ্ঞাসা করল, তাতে কি?

গলা খাটো করে ভয়ে ভয়ে এবারে প্রসন্ন বলল, রাগ না করো তো একটা কথা বলি বউমণি...

চণ্ডীবউ অভয় দিল না, প্রসন্নর মুখের ওপর ধারালো হয়ে উঠেছে।

প্রসন্ন যেন কলে পড়েছে, আর না বলেও উপায় নেই। ইনিয়ে-বিনিয়ে জানালো,

পেটুক বামুন মুনকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছল তার, খবরটা চুপিচুপি সে-ই বলেছে।...এখানকার দাদাবাবু নাকি অনেক টাকা খরচ করে মদন ঠাকুরকে একেবারে নিকেশ করার ষড়যন্ত্র করেছিল। মদন ঠাকুর সেটা জেনে ফেলে খুব হাসাহাসি করছে, আর বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াচ্ছে, দাদাবাবুর অমন বউয়ের কপালে সিঁদুর না থাকলে একটুও ভালো দেখাবে না বলেই দাদাবাবুর শত অপরাধ তিনি ক্ষমা না করে পারবেন না। সঙ্গীদের বলেছেন, কথাটা যেন তারা দাদাবাবুকে জানিয়ে দেয়। মুনকে বামুন স্বকর্ণে শুনেছে এ-সব—

চণ্ডীবউ নির্বাক। তার কপালের সিঁদুর-টিপের আভা মুখের দিকে ছড়াচ্ছে।

॥ ১৩ ॥

শক্তি থাকলে রাধানাথ এই করণের বুকে বড় রকেমের একটা ধ্বংসের তাণ্ডব দেখিয়ে ছাড়ত। সমস্ত করণ ত্রাসে কাঁপত। আর সেই ধ্বংসের ভস্মস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে রাধানাথ অট্টহাসি হাসত।

শক্তি নেই ফলে ধ্বংসের তাণ্ডব এখন শুধু তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অদৃষ্ট সর্বব্যাপারে এইগোছের বাম হলে চলে কি করে? সে এমন কি বেশি চেয়েছিল? শত্রু নিকেশ বীরের ধর্ম। মদনমোহনকে শেষ করে বীরের ধর্ম পালন করার একটা উদগ্র ইচ্ছা মাথায় চেপে বসেছিল। শত্রু তার ঘরের বউয়ের উপর পাপ-দৃষ্টি হেনেছে। ছল ছুতোয় বউয়ের সোনার অঙ্গ স্পর্শ করেছে পর্যন্ত। আর, তার পরেও বুক ফুলিয়ে কু-কথা বলে বেড়াচ্ছে। এমন কথা বলেছে যে কানে গেলে মরা মানুষেরও প্রেত হয়ে উঠে এসে ঘাড় মটকাতে ইচ্ছে করবে। এর উচিত ফয়সালা না করতে পারাটাই পাপ।

ঠারেঠোরে কিছু রসের কথা কদিন ধরেই কানে আসছে। সে সব কথা অন্তরঙ্গ ইয়াববকশীরা তার কানে তুলতে চেষ্টা করেছে। অন্য ঘরের ব্যাপার হলে রসের কথা রসিয়ে বলত। এক্ষেত্রে একজনের স্পর্ধা দেখার বিস্ময়ের ব্যঞ্জনা বেশি প্রকট হয়েছে। তবু কথা কানে আসছিল বলেই যে রাধানাথ এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তা নয়। ক্ষিপ্ত হবার মতই একটা প্রত্যক্ষ কারণ ঘটেছিল সেদিন।

...বাইরে রাত কাটানো নিয়ে কথা কাটাকাটির পর চাপা গর্জনে রাধানাথ বউকে যেদিন বলে বসেছিল, কোথায় রাত কাটাচ্ছি সে খোঁজ কেন—পাশে থাকলে ঘরের আলো নিভিয়ে মদনমোহন পাশে আছে ভাবতে সুবিধে হয়? জবাবে বউ তাকে তিনবার করে ইতর বলেছিল আর তারপর রাগে জ্বলতে জ্বলতে পাল্‌কি চেপে ক্ষমাযোগিনীর কাছে চলে গেছল।

...সেই দিন।

তার খানিক বাদে রাধানাথও বেরিয়ে পড়েছিল। পিছনের আমতলার রাস্তায় সামনাসামনি সাক্ষাৎ-শত্রুর সঙ্গে দেখা।

মদনমোহন।

শুকনো মুখ, উড়ু উড়ু চোখ—যেন পাখিটি হয়ে দত্তবাড়ির দোতলার একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়তে চায়। রাধানাথের সঙ্গে চোখাচোখি হতে তবে ঢুলু ঢুলু চোখের ঘোর কেটেছে। হাতেনোতে ধরা পড়ার পরেও নির্লজ্জ চোখে বাঁকা হাসি চিকিয়ে উঠতে দেখেছে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়েছে সঙ্গীদের আসরে এসে। মদনমোহনের নির্লজ্জতার কথা শোনামাত্র সঙ্গীরা মন্তব্য করেছে, একদিন কেন, চোরা গোপালকে প্রায়ই তো আজকাল ওই দিকে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। অনেকে দেখেছে। পাছে রাধানাথ দুঃখ পায় সেই জন্যেই তাকে বলা হয় নি। শুধু তাই নয়, ছিরে পাগলার মারফত মদনমোহনের যে উক্তি বন্ধুদের কানে এসেছে, কানের পরদা নাকি ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে তাদের।

রাধানাথের পীড়াপীড়িতে ছিরে পাগলার মুখে শোনা মদনমোহনের দুঃসাহসিক উক্তিও গোপন থাকল না। সে নাকি হেসে হেসে সকলকে বলে বেড়াচ্ছে, শ্রীরাধিকার আয়ান ঘোষের ঘর, তার কোমল বুকে বজ্রকানুর শর। আর বলেছে, কুলবতী সতী শ্রীমতীর চারধারে কুলের বেড়া বাঁধা, কিন্তু কদম্বতলে কুলভাঙানি শ্যামের বাঁশি বাজলে পরে হৃদয় যমুনার বন্যায় বেড়া যদি ভেঙে যায় তো শ্রীমতীর দোষ কি? ও-বাঁশির স্রোতে তখন ভেসে গেলে মরণ বটে, কিন্তু না ভাসলে যে দ্বিগুণ মরণ!

ছিরে পাগলার মুখে মদনমোহনের এমনি সব কান-বিষোনো বচন শুনে নাকি স্তম্ভিত হয়েছে রাধনাথের পার্ষদরা।

স্তম্ভিত রাধানাথও হয়েছিল। বচনের ধরণ-ধাবণ ছিরে পাগলার নিজস্ব, কারণ মদনমোহনের উক্তিতে কাব্যের ব্যঞ্জনা কমই থাকে। তবু শিকড় বিহনে গাছ গজায় না। ছিরে পাগলার এমন দুঃসাহসিক রসোক্তির মূলেও সত্য কিছু আছেই। ছিরে পাগলার ঘাড়ে দু-পাঁচটা মাথা নেই যে সবটাই শূন্য থেকে বানিয়ে বলবে। মদনমোহনের বাঁকা চলনের চাক্ষুষ প্রমাণ তো নিজেই পেয়েছে। এই একদিন নয়, থানের সেই ব্যাপারের পর থেকে তার নির্লজ্জ সাহসের অনেক প্রমাণই পেয়েছে।

নির্মম প্রতিশোধের সঙ্কল্পটা তার পর থেকেই দানা বাঁধতে শুরু করেছে। বউকে নিয়ে কোনরকম দুশ্চিন্তার কারণ ঘটে নি বটে, তবু আক্রোশ তার ওপরেও কম নয়। থানে গিয়ে অত বলি দেখেই যে ভিরমি গিয়েছিল বউ, সেটা অবিশ্বাস করে না, তার পর থেকে মদনমোহন যে নির্লজ্জ ব্যাপার করে চলেছে তাতেও বউয়ের হাত নেই জানে। আর, মাঝে-মধ্যে বউয়ের যে মূর্তি দেখে তাতে নিজেই এমন হকচকিয়ে যায় যে তাকে শ্রীমতীর সঙ্গে তুলনা করার মত কোনো দুর্ভাবনা মনেও আসে না। তবু বিয়ে করা বউ ঘরের মানুষকে কোন্ চোখে দেখে সে তো আর জানতে বাকি নেই। সমীহ করা দূরে থাক, উঠতে বসতে তাকে হেয় করে চলেছে। অন্য মেয়েমানুষ অর্থাৎ কুসুমবাঈয়ের ঘরে রাত কাটানোর ব্যাপারটা জানার পর থেকে তো তাকে দেখলেই দু চোখ দিয়ে গলগল করে যেন ঘৃণা ঢালতে থাকে। সে চাউনি দেখলে চুলের মুঠি ধরে বউকেও কুসুমবাঈয়ের ডেরায় টেনে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে রাধানাথের, তার চোখের ওপরেই বারবনিতার দেহবিলাসে দ্বিগুণ মেতে উঠতে সাধ যায়। বাড়িতে বাপ না থাকলে এইগোছের কিছু হয়ত করেই বসত সে।

এ ব্যাপার ভিন্ন ব্যাপার। তবু মদনমোহনকে চরম শাস্তি দিতে পারলে এই যাতনারও কিছুটা উপশম হতে পারে। একদিন না একদিন বউ জানবেই কার অমন বুকের পাটা।...শ্রীমতীর দশা না হোক, মনে মনে বীরপুরুষই ভাবে হয়ত ঘোষালবাড়ির ছেলেকে। চরম শাস্তিই পাওনা হয়েছে, ঘোষাল বংশ নির্বংশ হবে এবার। ধীরেসুস্থে তারপর রাধানাথ নিজেই একদিন বউকে বুঝিয়ে দেবে শাস্তিদাতাটি কে? এভাবে নিষ্কণ্টক হলে আরো একটা বড় লাভের আশা। তখন আর নতুন করে বারইয়ারীর স্বপ্ন না দেখলেও চলবে। কালে-দিনে ওই দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীই হয়ত তার হাতে মুঠোয় আসবে। ওই একজন সরে গেলে তার সমান তালে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মত মাথা এই করণে আর নেই।

সঙ্কল্পটা দুজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীর কাছে ব্যক্ত করেছিল রাধানাথ। বলেছিল, ওকে একেবারে সরিয়ে দেবার কথা ভাবছি।

সহজ কথাও দুর্বোধ্য মনে হয়েছে সঙ্গীদের। জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় সরাবে?

আঙুল তুলে মাথার ওপরটা দেখিয়ে দিয়েছে রাধানাথ। অর্থাৎ দুনিয়া থেকেই সরাবে।

সঙ্গীরা হতচকিত। হাতের গেলাসেব নেশা ছুটে যাওয়ার উপক্রম। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করেছে, কি করে, কি করে?

হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুলের সংযোগে টাকার কাল্পনিক শব্দ শুনিয়েছে রাধানাথ।—এই দিয়ে। এটা কম অস্ত্র ভাবো? লোক মিলবে না?

মদের গেলাস হাতে সঙ্গীদের নির্বাক মূর্তি রাধানাথের ভালো লেগেছিল। ওদের বোবা বানিয়ে দেবার মতই সঙ্কল্প বটে। কাজ হাঁসিল করতে পারলে গোটা করণেরও এই দশাই হবে। শিউরে উঠবে, কিন্তু মুখে কথা সরবে না কারো।

ভেবেচিন্তে খুব সঙ্গোপনে পালোয়ান ষষ্ঠীচরণের দ্বারস্থ হয়েছে প্রথম। এ কাজ ষষ্ঠীচরণ নিজে হাতে করবে এ অবশ্য আশা করে নি। যদিও রাধানাথের বিবেচনায় সে-ই যোগ্যতম লোক। তার কুস্তিব এক প্যাঁচে অনেক বীরপুরুষের সশরীরে স্বর্গলাভ হতে পারে। ও নিজে রাজী হলে কথাই নেই। ষষ্ঠীচরণকে না চেনে পাঁচ গাঁয়ে এমন লোক নেই বটে, কিন্তু জানাজানি হবে কি করে? জানবে তো শুধু একজন—সেই একজন কি পরলোক থেকে এসে জানান দিয়ে যাবে নাকি? তবু ষষ্ঠীচরণ রাজী হবে মনে হয় নি। না হোক, দূর দূর থেকে অনেক চেলাচামুণ্ডা আসে তার কাছে কুস্তি শিখতে। তারা ভদ্রজন তো নয়ই, অনেকেই তাদের মধ্যে ডাকাবুকো নীচু ঘরের লোক। ওদের গুরু যদি টোপ ফেলে, শুধু কেরামতি দেখাবার জন্যেই অনেকে হাঁ করে গিলতে আসবে সেটা।

উদ্দেশ্যটা রাধানাথ বেশ ঘোরালো করেই ষষ্ঠীচরণের কাছে ব্যক্ত করেছিল। বলেছিল, তার রূপসী বউয়ের ওপর যদি কেউ কু-দৃষ্টি দেয়, ছলছুতোয় যদি কেউ তার অঙ্গ স্পর্শ করে আর তারপর কুমতলবে বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে—তাহলে কর্তব্য কি?

শোনামাত্র সরলবুদ্ধি ষষ্ঠীচরণের মাথায় রক্ত উঠেছিল। তখনো পর্যন্ত দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ ষষ্ঠীচরণের মা হয়ে বসে নি বটে, খুনের দায়ে সাদামুখো দারোগা ওর পিছু ধাওয়া করেছিল এরও বছর দেড়েক বাদে। তবু দত্তবাড়ির নিমক তো খেয়েছে।

কুস্তি শেখার সময় এই বড়লোক শিষ্যই তো কত সাহায্য করেছে তাকে। দত্তবাড়ির বাবুমশায়েরও স্নেহের পাত্র ও, আপদে বিপদে সাহায্য করেন। অতএব তার জ্বলে ওঠাই স্বাভাবিক।

বলেছে, শুধু নামটা বলে দাও দিকিন, তারপর ঘরে গিয়ে ঘুমোও।

কি করবে?

কি আর করব, ধড় থেকে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিয়ে আসব।

রাধানাথের বুকের তলায় রক্ত নেচে উঠেছিল, সত্যি বলছ? সাহসে কুলোবে?

সাহসের খোঁচা খেয়ে ষষ্ঠীচরণের বিশাল ছাতি আরো ফুলে উঠেছিল। ষষ্ঠীচরণ মিথ্যে বড়াই করে না তো দাদাবাবু, তুমি শুধু নামটা বলে দিয়ে চলে যাও। মাটির তলায় পুঁতে ভিটেমাটি চষে দিয়ে আসি কিনা দেখো।

কিন্তু নাম বলার পর এই ষষ্ঠীচরণের তপ্ত মুখ চুপসে যেতে দেখেছে রাধানাথ। ওর সেই বোকা চোখ দেখে রেগেই গিয়েছিল।—কি হল, নাম শুনে ভয়ে যে আমসি হয়ে গেলে একেবারে।

খানিক বাদে আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়েছে ষষ্ঠীচরণ, ভয় নয় গো দাদাবাবু, বিশ্বাস হয় না।

কেন, কেন বিশ্বাস হয় না? হাজার লোকের চোখের ওপর মায়ের থানে কি কাণ্ড করেছে শোনো নি?

ষষ্ঠীচরণ শুনেছিল, কিন্তু ঘোষাল-কর্তার ছেলোর মনে কেনো কুমতলব ছিল এ সন্দেহ তার মনের কোণেও ঠাঁই পায় নি। অতঃপর ঘোষাল-কর্তার ছেলের কুমতলবের আরো অনেক গরম নজির দেখিয়ে ওকে তাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে রাধানাথ—লোকে কি রটিয়ে বেড়াচ্ছে তাও বলেছে। কিন্তু ষষ্ঠীচরণের সেই এক কথা, মাথা নাড়ে আর বলে, ঘোষালবাড়ির দা-ঠাকুর অমন কম্ম করবেন বিশ্বাস হয় না। মোটা টাকার লোভ দেখিয়েছে রাধানাথ, তাতেও ফল হয় নি। সাহায্য করার মত লোক দিতেও রাজী হয় নি। উল্টে তাকে উপদেশ দিয়েছে, ও-সব মতলব ছাড়ো দাদাবাবু, সেধে বিপদ-ডেকো নি।

জবাবে রাধানাথ তাকে কাপুরুষ বলেছে, তার এতবড় অসম্মানেও পঙ্গুর মত হাত গোটাচ্ছে বলে গাল দিয়েছে, নেমকহারাম বলেছে। ষষ্ঠীচরণের ঠাণ্ডা মুখ বদলায় নি তাতেও। উল্টে যে প্রস্তাব দিয়েছে রাগে গা রি-রি করে উঠেছে। বলেছে, যদি সত্যি হয় তো বাবুমশায়কে জানাচ্ছ না কেন, তাঁকে বলো, তারপর তিনি যা হুকুম করবেন তাই করব।

ওর কাছে ব্যর্থ হয়ে তখনকার মত রাধানাথের গোঁ আরো বেড়েছিল। সঙ্গোপনে নিজেই দুই-একজন যোগ্য লোকের সন্ধান করেছে। ফল কিছু হয় নি, মাঝখান থেকে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল কেমন করে। আর তার ফলে দ্বিগুণ হতাশা সম্বল রাধানাথের। মতলবটা ষষ্ঠীচরণ ফাঁস করেছে বিশ্বাস হয় না। অন্তরঙ্গ পার্ষদ দুটিও বিশ্বাসঘাতকতা করার লোক নয়। এক যদি মদের ঝোঁকে প্রকাশ করে থাকে।

যাই হোক, জীবনটাই বিস্বাদ ঠেকছিল রাধানাথের। এরই মধ্যে কানে গরম সিসে গলানো খবর এলো একটা। সকালে বাবা নিজে সেধে গেছল ওই শত্রুর কাছে, একেবারে তার বাড়িতে। নিজের ছেলের ভাবনায় ওর কাছে সাহায্য ভিক্ষে

করতে গেছল নাকি। ভিক্ষে মেলে নি। ঘোষালের ছেলে উল্টে তাকে অপমান করে ফিরিয়েছে। এই অপমানের ঢাক এত জোরে বেজে উঠেছে যে করণে আর কারো জানতে বাকি নেই বোধ হয়।

সম্ভব হলে চরম প্রতিশোধটা রাধানাথ এবারে তার বাবার ওপরেই নিত। রাগের পরে ভাবনা। চক্রান্তের খবরটা বাবার কানে তুলে দিয়েছে মদন ঘোষাল—নিজে অপমান হয়ে ফিরেছে সেটা কিছু নয়, উল্টে এখন ওর কৈফিয়ত তলব করা হবে হয়ত।

অশান্তি আর হতাশায় সেই রাতে কুসুমবাঈয়ের ডেরায় টানও শিথিল। সাহস সঞ্চয় করে বাড়ির দিকেই ফিরল সে। বাবা বেশি বাড়াবাড়ি করে তো ঘর-সংসার ছেড়ে বিবাগীই হয়ে যাবে।

যা ভেবেছিল তাই, দোতলায় উঠে নিজের ঘর পর্যন্ত পৌঁছানো গেল না। তার আগেই পিছন থেকে বাবার গুরুগম্ভীর ডাক শোনা গেল।—এদিকে আয়।

মহেশ্বর দত্ত তারই অপেক্ষায় ছিলেন। ছেলেকে ডেকে নিজের ঘরে এসে বসলেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাধানাথ মা-কে খুঁজল একবার, তারপর মরীয়া হয়েই বাবার ঘরে ঢুকল।

মহেশ্বর দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, যা শুনছি, সত্যি?

রাধানাথ নিরুত্তর।

ঘোষালের ছেলেকে খুন করার জন্য লোক লাগিয়েছিলি?

লাগাই নি, লোক খুঁজছিলাম।

রাগত মুখে মহেশ্বর দত্ত বলে উঠলেন, লোক খুঁজছিলি তাই পাঁচকান হয়ে গেল, আর লোক পেলে সে একেবারে ঢাকঢোল বাজিয়ে আসত—কেমন? কি হয়েছিল? আমাকে বলিস নি কেন?

বাবার রাগের ধরনটা তেমন জোরলো লাগল না রাধানাথের। ভরসা পেয়ে জবাব দিল, তোমাকে বলব কি করে, তুমি তো ওকে মাথায় তুলেছ—এদিকে সে কি করে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে জানো? মা আর দিদিদের জিজ্ঞাসা করে দেখো, গাঁয়ের যাকে খুশি জিজ্ঞাসা করে দেখো, এক তুমি ছাড়া সকলেই জানে—

গম্ভীর দৃষ্টিটা মহেশ্বর দত্ত আগে তার মুখের ওপর বুলিয়ে নিলেন একবার; তারপর উষ্ণস্বরে বললেন, তোর মা দিদি আর গাঁয়ের সকলে তিলকে তাল করতে জানে, তেমন কিছু হলে আমার কানে আসত। তা বলে তোকে এভাবে মাথা গরম করতে কে বলেছে—নিজের মুরোদ জানা নেই? বুদ্ধির ঢেঁকি একবোরে—

ফাঁড়া কেটেছে। বাবার এইগোছের শাসন যেন দুর্বলতার নামান্তর। অতএব ঈষৎ গোঁ-ভরেই রাধানাথ বলল, ও কাউকে ছেড়ে কথা কয় না, তোমাকেও আজ কতখানি অপমান করেছে, তাই নিয়ে সর্বত্র হাসাহাসি কানাকানি শুরু হয়ে গেছে—

আঁতে ঘা লাগতে মহেশ্বর দত্ত তেতে উঠলেন।—সব তোর জন্যে হতভাগা, বুঝলি? অপমান করতে পেরেছে শুধু তোর জন্যে, তুই মানুষ হলে আর ভাবনা ছিল না। যা এখন এখান থেকে—

বাবার ঘর থেকে বেরিয়ে বীরদর্পে নিজের ঘরের দিকে পা চালালো রাধানাথ।

বাবাকে যেন মনের মত জব্দ করে আসতে পেরেছে, এখন আর কারো পরোয়া করে না। ঘরের কোণে বউকে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভিতরটা চিড়বিড় করে উঠল আরো। একটু লক্ষ্য করে সোজা শয্যায় এসে বসল, তারপর সশ্লেষে বলে উঠল, অস্পৃশ্য মানুষ ঘরে এলো, বিছানা ছুঁলো—চান করতে হবে না তোমাকে?

জবাবে চণ্ডীবউ আরো একটু ঘুরে সোজাসুজি তাকালো তার দিকে। তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কাউকে খুন করার জন্যে তুমি লোক লাগাতে চেষ্টা করেছিলে?

তেজী সুরে জবাব দিল রাধানাথ, কাউকে নয়, ঘোষালবাড়ির ছেলে মদনমোহনকে—তোমার তাতে আপত্তি আছে?

চণ্ডীবউ নিরুত্তর, আরো কিছু শোনার প্রতীক্ষা। তেমনি তপ্ত শ্লেষের সুরে রাধানাথ আবার বলল, আর ঘোষালের ছেলে আমাকে কেন খুন করছে না সে খবর শুনেছ? তোমার সিঁদুর-পরা রাঙা মুখ বড় পছন্দ তার—বিধবা হলে তোমাকে এত ভালো দেখাবে না—শুধু এই জন্যেই দয়া করে সে আমার প্রাণে হাত দিচ্ছে না, বুঝলে? তোমার ওই রূপের দয়ায় আমি বেঁচে আছি—

মৃদু গলায় চণ্ডীবউ জিজ্ঞাসা করল, তুমি এ চেষ্টা করতে গেছলে কেন?

করব না-ই বা কেন, তোমার সত্যিই শ্রীমতীর দশা চলেছে নাকি?

শ্রীমতীর দশা কি?

শ্রীমতীর দশাও জানো না! রাধানাথ হেসে উঠল, শ্রীমতীর দশা মনে শ্রীরাধিকার দশা। শ্যামকিশোর যে তোমার দর্শনের আশায় সকাল দুপুর বিকেল রাত্তির বাড়ির আশপাশে ঘুরঘুর করে বেড়ায়, সে-খবর রাখো?

মুখ ক্রমশ লাল হচ্ছে চণ্ডীবউয়ের। তাই দেখে বাধানাথের বলার উৎসাহ আরো বাড়ছে। সামনে ঝুঁকল, আর সকলের কাছে কি বলে বেড়াচ্ছে শুনবে? বলছে, আমি আয়ান ঘোষ, তোমার আয়ান ঘোষের ঘর, আর তোমার কোমল বুকে ব্রজকানুর শর! সেই শরযাতনায় তোমার ছটফটানি শুরু হল বলে। কাব্য করেছে সে, বুঝলে? কাব্য করে বলেছে, শ্যামের বাঁশি কানে গেলে কুল না ভাসিয়ে রক্ষা আছে তোমার? তখন ভেসে গেলে মরণ বটে কিন্তু না গেলে যে দ্বিগুণ মরণ! ভালো লাগছে শুনতে? ওই শ্যামের সাধ ঘোচাতে চাওয়াটা খুব অন্যায় হয়েছে আমার?

লাল হতে হতে এবারে রক্তবর্ণ হয়েছে চণ্ডীবউয়ের মুখ। সেই স্তব্ধ জ্বলন্ত মুখ আর ঝলসে-ওঠা চোখে যা দেখে রাধানাথ অনেকদিন হতচকিত হয়েছে। কিন্তু আজ ঘাবড়ালো না। কারণ মনে হল, আজকের এই ক্রোধ ঠিক তার উদ্দেশে নয়।

চোখে চোখ রেখে চণ্ডীবউ তারই মুখখানা যেন ফালা-ফালা করল খানিক। তারপর অদম্য ক্রোধে হিসহিস করে বলে উঠল, তুমি ভীতু—ভীতু! এই যদি বলে থাকে নিজে ওকে পায়ের নীচে না থেঁতলে অন্য লোক লাগিয়েছ কেন? নিজে না পারো আমাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালে না কেন তার সামনে?

রাঁধানাথ বিমূঢ় খানিক। কিন্তু বউকে আজ ভালো লাগছে তার। হঠাৎ সে যেন কোনো একটা বড় রকমের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথের দিশা পেয়েছে। চোখের মুখের

এই আগুনে অতিবড় অপ্রতিহত শক্তিও সত্যিই বুঝি জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। এই একজন সহায় হলে আর যেন ভাবনা থাকে না। তাই ভালো লাগছে বউকে আজ। এত ভালো আর কখনো লেগেছে কিনা সন্দেহ।

অনেক রাত পর্যন্ত মুখ বুজে চণ্ডীবউকে এই ভালো লাগার ধকল পোহাতে হয়েছে। কুসুমবাঈয়ের ওখানে দেহবিলাসের কিছু স্থূল বৈচিত্র্য রপ্ত করেছে রাধানাথ। সেই কলায় বউকে বিবশ বিহ্বল করে তুলতে চেষ্টা করেছে সে। চণ্ডীবউয়ের সর্বাঙ্গ বিমুখ হতে চেয়েছে বার বার, তবু বাধা দেয়নি।

তার রাগ পড়ে নি, তেজ কমে নি। ওই অপমানের কথাগুলো যতবার মনে পড়েছে, এই রাগ আর তেজে একজনকে ভস্ম করতেই চেয়েছে। তবু কি যেন অস্বস্তি একটা। সেটা পুরুষের এই উদগ্র ভোগদখলের তাড়নায় নয়। এরই মধ্যে থেকে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল চণ্ডীবউ।

..মহাচণ্ডীর থানে কানা অশ্বত্থের নীচে জ্ঞান হতে উদ্বেগভরা যে দুটি প্রসারিত ব্যাকুল চোখের গভীরে তার দৃষ্টিটা হারিয়ে গেছল, হাজারো বাধা ঠেলে পরদিন কুশল-খবর নিতে আসার ফলে ঘোমটার আড়াল থেকে যে অনমিত আত্মবিস্মৃত মুখখানা লক্ষ্য করেছিল, আর ক্ষমাযোগিনীর বাড়ি থেকে ফেরার পথে স্তব্ধ মধ্যাহ্নে পাল্‌কির ঢাকনা সরিয়ে যে তন্ময় নিষ্পলক দুই চোখের ধাক্কায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে আবার পাল্‌কির ঢাকনা ফেলে দিতে হয়েছিল—সেই মানুষ এমন কুৎসিত কথা বলে বেড়াচ্ছে সেটা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে না পারার অস্বস্তি বুকের তলায় খচখচ করে উঠছে থেকে থেকে।

॥ ১৪ ॥

দেড় বছর পরের কথা। করণের ঝিমনো বাতাসে সাড়া জাগল আবার একদিন।

দত্তপাড়ায় বারইয়ারী হবে।

কামান দেগে মশা মারার খবর নয়। তীর ছুঁড়ে হাতি গণ্ডার ঘায়েল করার মত খবর। রাধানাথের আড্ডার আসর থেকে অনেক শূন্যগর্ভ কামানের গর্জন শোনা গেছে। শুনে শুনে কান ঝালাপালা সকলের। কিন্তু পলকা শরের মত এই খবরটা ভেসে এসেছে দত্তবাড়ির অন্দরমহল থেকে—যে এলাকার প্রতিটি মুহূর্তের খবর শোনার আকাঙ্ক্ষায় করণের রসিকজনেরা সদা উন্মুখ। সদ্য গত বৈশাখী-পূর্ণিমায় মহাচণ্ডীর থানে উনিশ বছরের চণ্ডী-বউয়ের এক নতুন রূপ দেখেছে অনেকে। তার আগের বছর বলির রক্ত দেখে যিনি ভিরমি গেছলেন, এটা তার বিপরীত রূপ। তার বিচিত্র আচরণের সেই এক ধাক্কায় কত জোড়া চোখ ঘায়েল হয়েছিল ঠিক নেই। দর্শন-সৌভাগ্য থেকে যারা বঞ্চিত হয়েছিল পরে বার্তা শুনে তারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে। আর সেই থেকে মনে মনে আগামী বৈশাখী-পূর্ণিমার দিন গুনছে। সকলে সেবারে বলাবলি করছিল, মদনমোহন দহন করেছে চণ্ডীবউ। স্বয়ং চণ্ডীকন্যাই নাকি মনে হয়েছিল তাকে তখন। কম করে দিন সাতেক সরবে হা-হুতাশ

করেছিল ছিরে পাগলা, শ্রীমতীর সেই ঘোমটা-খসানো সিঁদুর-গোলা রোষানলে জমাট-বাঁধা কৌতুক-বিদ্যুৎ—মরে যাই মরে যাই!

সোয়ামীর মান রক্ষার তাগিদে আস্ত একটা বারইয়ারী হবে দত্তপাড়ায় এটা সেই অন্দরমহলের খবর—সাড়া পড়ারই কথা। ওই খবরের সমর্থন মিলেছে মহেশ্বর দত্তর মুখ থেকে। পাড়ার লোকজন ডেকে একটা 'মিটিন' পর্যন্ত করে ফেলেছেন তিনি। এর পিছনে বউয়ের ইচ্ছের দাপটের কথাটা অবশ্য ফাঁস করেন নি। বলেছেন, পাড়ার সকলে আর আশেপাশের সকলে একত্র হলে দত্তপাড়ায় একটা বারইয়ারী করে দিতে পারেন তিনি। খরচপত্র যা লাগে তিনিই দেবেন, একে বড় করে তোলা আর এর মর্যাদা রক্ষার ভার আর সকলের।

ফলে করণের আবালবৃদ্ধের টনক নড়েছে। কেউ পুলকিত্ব কেউ উত্তেজিত কেউ রোমাঞ্চিত কেউ উদ্দীপিত। সকলের সব অনুভূতির সমষ্টিগত ঢেউটা এসে আছাড় খেয়েছে সুদূরকালের ঐতিহ্যপুষ্ট দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর তটে এসে। এই তটমূলের ভিত তাতে একটুও নড়ে নি বটে, বড়সড় আঘাতও কিছু বাজে নি। কিন্তু এ-হেন ঘোষণার আড়ালে ভিত নড়ানো বা আঘাত হানার চেষ্টার প্রচ্ছন্ন স্পর্ধা চোখে পড়বে না গাঁয়ে এমন নিরেট কেউ নেই। অতএব সকলের চাপা বা প্রকাশ্য উল্লাসভরা চোখ ছুটেছে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর দিকে। এই ঘোষণা থেকে এক সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার আভাস পেতে দেরি হয় নি কারো।

দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর বয়স্ক মুরুব্বিরা সচকিত একটু হয়েইছে। কিন্তু ঘাবড়ে না গিয়ে উল্টে বরং মনের মত রসদ পেয়েছে তারাও। সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা বারইয়ারীর আসর বসেছে। আলোচনা টীকা-টিপ্পনীর গরম আসর। ঘন ঘন লোকে ছুটছে ঘোষাল-বাড়ির মদনমোহনের খোঁজে। এমন খবরেও তার চটকদার পরামর্শের মাথা তেমন খুলছে না মনে হচ্ছে সকলের। ফাঁক পেলে আসর থেকে গা-ঢাকা দেয়, না পেলে বসে মিটিমিটি হাসে আর রসের কথা শোনে।

ওদিকে হরবোলা ছিরে পাগলা গলা দিয়ে হরেক রকমের চুকচুক শব্দ বার করে আর হাসে আর ছড়া কাটে। বলে, বিধবা বাপকে অমান্যি করলে ছেলের ওপর রাগ করে সাত পাক ঘুরে সে নটী ধরে আনতেও ছাড়ে না—বুঝলে?

বুঝুক না বুঝুক হাসির রোল ওঠে। এমন হেঁয়ালিভরা রসিকতা আবার গেঁজেল বাদশা সহায় ভট্টর বরদাস্ত হয় না। পর্যাপ্ত গাঁজার ধোঁয়ার অভাবে তার মাথা বা মেজাজ কোনোটাই খোলসা নয় ইদানীং। নতুন আর একটা বারইয়ারী গজানো মানেই গাঁজার ঘাঁটি বাড়া একটা। সহায় ভট্টর মতে গাঁজাশূন্য বারইয়ারী ধারাশূন্য নদীর মত। অমন নদীতে আর যাই চলুক মনপবনের নাও চলে না। অতএব আর একটা বারইয়ারীর আবির্ভাব সম্ভাবনার শুরুতে এইগোছের টীকা-টিপ্পনী তার ভালো লাগার কথা নয়।

ঘোলাটে দু চোখ ছিরে পাগলার মুখের ওপর আটকে নিয়ে সহায় ভট্ট বিরক্তিসূচক প্রশ্ন ছোঁড়ে, বিধবা বাপ আবার কি জিনিস?

আসর জমে ওঠে। বিধবা বাপ কি জিনিস বোঝাতে না পারার চটুল রসিকতায় হার্তি পঞ্চানন ছিরে পাগলা হাতির ডাক ডেকে উঠে ঘোড়ার চিঁহিঁ রবে তার সমাপ্তি ঘটায়। সহায় ভট্টর এক গুণমুগ্ধ গাঁজা-শিষ্য তার কানে ব্যাখ্যা গুঁজে দিতে চেষ্টা

করে। গাঁয়ের সম্মানশূন্য মুরুব্বিটিকে অর্থাৎ নাক উঁচু মহেশ্বর দত্তকে বলা হচ্ছে বিধবা বাপ, আসল বারইয়ারীতে কলকে না পেয়ে সাত পাকে বেঁধে তিনি নটী আনছেন অর্থাৎ নকল বারইয়ারীর প্রেমে পড়েছেন।

ঠোঁটের ডগায় হাসি লেগে আছে আর টিমেতালে ভুঁড়ি দুলেছে মুনকে ভট্চাযেরও। ছিরে পাগলার হাতের নাগাল থেকে একটু দূরেই অবস্থান তার। কারণ তার ভুঁড়ি দেখলে ওর কনুই শূলোয়। হাসছে বটে, কিন্তু ছিরের এই ঠাট্টার ছিরি তারও ভালো লাগে নি। আর একটা বারইয়ারী হলে লাভের আশা তারও কম নয়। সমস্ত অনুষ্ঠানের গোড়ায় বা শেষে ভোজ-পর্ব একটা অপরিহার্য অঙ্গ। এই পর্বের গন্ধ পেলে সে কনের ঘরের মাসি বরের ঘরের পিসি। দুটো ছেড়ে গোটাসাতেক বারইয়ারী হলে তার বারো মাসের সমস্যা ঘোচে। দ্বিতীয় একটা যে হচ্ছে তাও তার মতে উন্নতির লক্ষণ। সেই আনন্দে প্রসন্নময়ীর মুখে শোনা দত্তবাড়ির অন্দরমহলের গোপন খবরটা সে-ই ফাঁস করে ফেলেছে। যথা দত্তপাড়ায় নতুন বারইয়ারী গজিয়ে উঠছে একটা তার কারণ, ঘরের বউ চণ্ডীবউ নাকি কর্তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই দাবি পেশ করেছে। ঘরের আড়াল থেকে পেসন্ন স্বকর্ণে শুনেছে সে-কথা—শুনে তাজ্জব বনেছে।

মুখে যে যাই বলুক মনে মনে খুশি প্রায় সকলেই। গাঁয়ে সত্যিকারের মৌসুমী বাতাস এসেছে যেন। গতানুগতিকতার বাইরে একটু কিছু হলেই যেখানে উদ্দীপনায় নড়েচড়ে সজাগ হয়ে ওঠে সকলে, তার সঙ্গে উত্তেজনার রসদ যুক্ত হলে কথাই নেই। নতুন একটা বারইয়ারীর আবির্ভাব ঘোষণা করা মানেই বছরের পূজা আর উৎসব পার্বণে দ্বিতীয় দফা অকৃপণ আনন্দ পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। আর এক-প্রস্থ পূজাআর্চা খাওয়া-দাওয়া, আর এক-প্রস্থ যাত্রা গান তরজা কবির লড়াইয়ের জমাট আসর, আর এক-প্রস্থ খেলাধুলো আর মজাদার প্রতিযোগিতার উৎসব। দুই বারইয়ারীর পূজাআর্চা একদিনে হলেও আনন্দের আসল অনুষ্ঠানগুলো তো আর একদিনে হতে পারে না। সমঝদার ভাগাভাগি হলে উৎসবের প্রাণই আধখানা। গাঁ-সুদ্ধু লোক দু-তরফের ক্রিয়া-কলাপ দেখার পরে তো মান কষবে, রায় দেবে।

নতুন করে কেউ পূজো শুরু করবে বা সাধারণের কল্যাণে পুকুর কাটাবে শুনলে গাঁয়ের লোক সোৎসাহে এগিয়ে এসে প্রেরণা যোগায়। পশুর লড়াই বা বড়গোছের কুস্তি অথবা প্রতিযোগিতামূলক কোনো অনুষ্ঠানের খবর পেলে তাদের ডবল আনন্দ। তারও বাড়া ফূর্তি যদি শোনে মোটা নজরানার বিনিময়ে কলকাতার কোনো নামকরা রূপসী বাঈজীর আসর বসানোর উদ্যোগে মেতেছে কেউ। আর যদি শোনে, পরিচিত বাড়ির সুশ্রী কোনো বউ অথবা সুশ্রী যুবতী বিধবা কুলে কালি দিয়ে কারো সঙ্গে ঘর ছেড়েছে, গাঁয়ের লোকের চাপা উদ্দীপনা আর জটলা তার থেকে কম মুখর হয়ে ওঠে না। এ-হেন কারণে নতুন আস্ত একটা বারইয়ারীর আবির্ভাব ঘোষণা। তুলনা আছে এর? সে যে সকল আনন্দ সকল উত্তেজনা সকল উদ্দীপনার শৃঙ্গারক্ষেত্র!

তার ওপর কিনা দত্তবাড়ির স্নায়ু বিবশ করা ডাকসাইটে রূপসী চণ্ডীবউয়ের অদৃশ্য আঙুলের সঙ্কেত এর আড়ালে! পুরুষ ছেড়ে করণের রমণীকুলের নিভৃতেও এই নয়া মৌসুমী বাতাসের ছোঁয়া লেগেছে।

রাধানাথের অস্ত্র বদলেছে।

দেড় বছর আগে সেই এক রাতে বউকে ভালো লাগার বৈচিত্র্যটা বুদ্ধিমানের মতই রাধানাথ আগলে রেখেছে—মিইয়ে যেতে দেয় নি। সে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। বাইরে বারবনিতার আসর-মদিরায় স্বভাবদুর্বল স্নায়ুর যে অবাধ মুক্তি মেলে অন্দরে তা মেলে না। প্রবৃত্তির সেই উচ্ছৃঙ্খল আবর্তের মধ্যে সে অনেক সহজে নিজেকে খুঁজে পায়। অতএব জীবন থেকে সে-আকর্ষণ ছেঁটে দেওয়া সম্ভব নয়। বাইরে যাত্রা-গানের আমন্ত্রণ অথবা ছোটখাটো শিকারে যাওয়ার নাম করে সপ্তাহের দুই একটা রাত বাইরে কাটাতেই হয় তাকে। বউয়ের ভয়ে সত্যিই মদ ছাড়তে হলে তো জীবনই বিস্বাদ। রাধানাথ নিঃসংশয়, সুরলোকের সামগ্রী বলেই ওই বস্তুর নাম সুরা। এর মর্ম জানা থাকলে নিজেকে চণ্ডীর বদলে উর্বশী ভেবে বউ যথার্থই স্বর্গীয় আনন্দে ভাসতে পারত। কিন্তু জেনেশুনে রাধানাথ এ আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে কেমন করে?

আনন্দের এই পর্যন্ত যতদূর সম্ভব গোপনে সমাধা করে থাকে। ফলে পানের আসর অনেক সময় দিনমানেই শেষ করতে হয়। কারচুপির নানা ব্যবস্থা সহৃদয় বন্ধুরাই বাতলে দেয় তারপর। বউকে গোপন করার উদ্দেশ্যে কি কি উদরে চালান করলে কতক্ষণের মধ্যে সুরার ঝাঁজ সুরোদ্যানের মলয়দাক্ষিণ্যে আমোদিত হয়ে উঠতে পারে তা নিয়ে নিত্য-নতুন গবেষণা চলে। বাইরে রাত কাটানোর বাসনা দুর্নিবার হয়ে ওঠে যেদিন, রাতে মদ না খেতে পারার খেদ সে-দিনই শুধু চতুর্গুণ উসুল হয়ে থাকে।

ঘরের চণ্ডীমার্কা চণ্ডীবউয়ের কাছে রাধানাথকে ভালো ছেলে করে তোলার দায় এখন তার অন্তরঙ্গ সাগরেদরাও উপলব্ধি করতে পারে। কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শ পেলে দত্তপাড়ার স্বপ্নসম্ভবা বারইয়ারী কল্পঘুমের জঠর থেকে জেগে উঠতে পারে—মনের দুঃখে সে-বারতা অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে রাধানাথ ব্যক্ত না করে পারে নি। সেই সোনার কাঠি পড়ে আছে বাবার সিন্দুকে, আর তার চাবি সর্বদা বাবার ট্যাঁকে গোঁজা। ওই বাবাটি ভবপার পাড়ি দেবার আগে সেই চাবি রাধানাথের হাতে আসার সম্ভাবনার কথা আকণ্ঠ মদ গিললেও ভাবা যায় না। আর সংসারের মায়া কাটিয়ে ওই অবুঝ পিতৃদেবটি যে অদূর কালের মধ্যে ভবপার যাত্রার উদ্যোগী হবেন—সে-রকম লক্ষণও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

এই হতাশার মধ্যে একমাত্র ভরসা ঘরের বউ—চণ্ডীবউ। রাধানাথের সঙ্গে তার সাগরেদরাও এখন বিশ্বাস করে, বাপের দুর্গম ট্যাঁক-প্রদেশ থেকে সিন্দুকের চাবির গোছা শুধু ওই একটিমাত্র রমণী উদ্ধার করতে পারে। রমণী যদি সেইগোছর রত্ন হয় তাহলে মুনি-ঋষির জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার আসন টলে—এ তো মরজগতের সামান্য শ্বশুর একজন। রাধানাথের রমণীটি যে সেইগোছেরই রত্নবিশেষ, তাতে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুরামাহাত্ম্যে তাদের মাথা যখন পরিষ্কার, ওই গবেষণার ধারা তখন আরো·আদি সত্যের পথে বেগবান হয়েছে। অর্থাৎ সম্পর্কটা শ্বশুর-ছেলের বউ গোছের জটিল না হয়ে পড়লে ট্যাঁক-প্রদেশের চাবি উদ্ধার রঙিন জলের মতই সহজ ব্যাপার হতে পারত। কিন্তু তা না হলেও ওই দুরূহ কর্মটি এই এক তেজস্বিনী রমণীর দ্বারাই সম্ভব। এই রমণী সদয় না হলে ফ্যাসাদ। অতএব তার

চোখে রাধানাথের চরিত্রটি শিশির-ধোয়া ফুলের মত নিষ্পাপ করে তোলার গুরুদায়িত্ব অভিন্নহৃদয় সুহৃদ জনেদেরও বটেই।

তবু বউয়ের চোখে ধুলো রাধানাথ সব সময় ঠিকমত দিয়ে উঠতে পারে না। শিকার অথবা যাত্রার আসরের নাম করে বাইরে নিশি-যাপনের পর ঘরে ফেরে যখন, বউয়ের দৃষ্টিটা কেমন ঘোরালো হয়ে তার মুখের ওপর চক্কর খেতে থাকে। কল্পিত যাত্রার এক-একটা রোমাঞ্চকর অধ্যায় মুখস্থ বলেও তার মুখ থেকে সন্দেহের ছায়া ঘোচানো যায় নি। মৃত রক্তাক্ত হরিণ বা বুনো হাঁস যোগাড় করে আনা সত্ত্বেও না। আর অনেক সাবধানতার পরেও মদ খেয়ে আসার ব্যাপারটা কেমন করে যেন প্রায়ই ধরা পড়ে যায়। রাধানাথ যত বেশি ঢাকতে চেষ্টা করে বউয়ের চোখমুখ ততো বেশি তীক্ষ্ণ ধারালো হয়ে ওঠে।

আর বিড়ম্বনা সত্ত্বেও তখনই বোধ করি বউকে সব থেকে বেশি ভালো লাগে রাধানাথের। কারণ এই তীক্ষ্ণ ধারালো দিকটার প্রতিই তার আস্থা। এ তাকে যেমন বিঁধতে পারে, প্রয়োজনে তার দ্বিগুণ বিঁধতে পারে ওই ঘোষালবাড়ির ছেলেকেও। সে-রকম একটা প্রয়োজনের ফিকির আবিষ্কারের চেষ্টায় আছে রাধানাথ। দেড় বছর আগে বউয়ের সেই এক রাতের মূর্তি আর আগুন-ঝরা কথাগুলো চোখে আর কানে লেগে আছে তার। ঘোষালবাড়ির ছেলে অত সব কু-কথা বলে বেড়াচ্ছে শুনে রাগে রক্তবর্ণ হয়ে বলে উঠেছিল, তুমি ভীতু—ভীতু! এই যদি বলে থাকে নিজে ওকে পায়ের নীচে না থেঁতলে অন্য লোক লাগিয়েছ কেন? নিজে না পারো আমাকে নিয়ে নিয়ে দাঁড় করালে না কেন তার সামনে?

...সেই থেকে যে-কোনো সুযোগে বউকে একবার তার মুখোমুখি এনে দাঁড় করানোর বাসনা রাধানাথেব। কিন্তু মনের মত সুযোগ বা উপলক্ষ কিছু পেয়ে উঠছে না।

...আর, সেই থেকে বউয়ের তেজের ভক্ত হয়ে পড়েছে সে। ভিন্ন গোছের ভালো লাগতে শুরু করেছে তাকে। এই তেজের দিকটা জানে বলেই হয়ত বাবাও স্বয়ং চণ্ডী ঠাকরোণ ভাবে ছেলের বউকে। দত্তপাড়ায় বারইয়ারীর জন্য বাবাকে বশ করে টাকা আদায় কবা আর কার দ্বারা সম্ভব?

ফলে একসঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সাধনের আশায় রাধানাথ বলতে গেলে গত দেড় বছর ধরেই বউকে ভালো লাগার অনুশীলনে মেতে আছে। স্বভাবের দোষে মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে বটে, কিন্তু বউয়ের ওই ধারালো তীক্ষ্ণ মূর্তি দেখলেই রাধানাথের উদ্দীপনা বাড়ে, নতুন উদ্যমে ভালো লাগার মহড়া দিতে লেগে যায়।

কিন্তু এ উদ্যম যেমন স্থূল তেমনি কলাকৌশল-বর্জিত। চণ্ডীবউয়ের এও ভালো লাগে না। সম্ভোগের আবর্তে প্রবৃত্তির যে রূপ সব থেকে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা মনোহর নয়। তাছাড়া দুর্দম দস্যুর মত সর্ববাধার প্রতিরোধ থেকে রমণীকে ছিনিয়ে এনে ভোগবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত শক্তিমান পুরুষও নয় রাধানাথ। ফলে তার নিভৃতের রীতি অনেক সময়েই কুশ্রী মনে হয় চণ্ডীবউয়ের।

তবু সমর্পণ আর আনুগত্যের সুফল কিছু আছেই। অভিনয়ে সত্যি খুব অপটু নয় রাধানাথ। মনোবেদনার অভিনয় ইদানীংকালে মন্দ করছিল না। ঘোষালের ছেলের উদ্ধত অপমানে তার মানসম্ভ্রম ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে

সে তাকে করণের সর্বজনের চোখে হেয় করে চলেছে—এর পরেও সে ঘরে পড়ে আছে শুধু বউয়ের টানে, নইলে কবে বিবাগী হয়ে যেত ঠিক নেই। বাহুলগ্ন বউয়ের মুখের ওপর তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ছড়িয়ে রাধানাথ বলেছে, হয় সে বিবাগী হত নয়তো মদনমোহনকে নিজের হাতে খুন করে ফাঁসি যেত। কিন্তু কিছুই সে করতে পারছে না শুধু বউয়ের টানে।

এমনি এক নিভৃতে বউয়ের কাছে মনের বাসনা ব্যক্ত করেছে রাধানাথ। বলেছে, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আর ঘোষালের ছেলের মুখ একেবারে ভোঁতা করে দেওয়া যায় শুধু বউ যদি বলে কয়ে বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা তাকে যোগাড় করে দিতে পারে। শুধু এই ব্যবস্থাটুকু করে দিলেই বউয়ের কেনা গোলাম হয়ে থাকতেও আপিত্তি নেই রাধানাথের।

চণ্ডীবউয়ের চোখে তেমন উৎসাহের সঞ্চার দেখা যায় নি তখনো। জিজ্ঞাসা করেছে, টাকা পেলে আবার গুণ্ডা ভাড়া করবে?

দুর! বউয়েরই ছেলেমানুষি উক্তি যেন, রাধানাথ হেসে বলেছে, ওজন্যে আর কটা টাকা দরকার; ও তো ইচ্ছে করলে মায়ের থেকেই আদায় করে নিতে পারি। তার থেকে ঢের বেশি টাকার কথা বলছি, একটা কেলাব করার মত টাকা চাই।

চণ্ডীবউ অবাক, কেলাব কি?

বারইয়ারী গো বারইয়ারীকেই ইংরেজীতে কেলাব বলে।

ইংরেজী জ্ঞান দেখিয়ে বউকে তেমন মুগ্ধ করা যায় নি, সে চুপ করে ছিল।

কিন্তু কথাটা ওঠার পরেও চুপ করে থাকার পাত্র নয় রাধানাথ। সোৎসাহে বলেছে, মদন ঘোষালের এত সাহস এত দম্ভ এত দাপট কেন বুঝছ না—দক্ষিণপাড়ার ওই বারইয়ারীর মুরব্বি গোছের হয়ে ওঠেছে বলেই তো। ওইজন্যেই তো ওর পেছনে এত লোক, এত তাঁবেদার। এরপর গোটাগুটি পাণ্ডা হয়ে বসলে তো হাতে মাথা কাটবে!

অতএব সময় থাকতে দত্তপাড়ায় যদি একটা বারইয়ারী গড়ে তোলা যায়, তার সুফল কি হতে পারে বউকে বোঝাতে চেষ্টা করছে। দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর টাকার জোর কমেছে। এই সময়ে যদি দত্তপাড়ায় মনের মত একটা বারইয়ারী গজিয়ে ওঠে করণের রসিকজনেরা সব জোয়ারের জলে ভেসে আসার মত এদিকে ভেসে আসবে। ওদের ডবল জাঁকজমক আর আনন্দের ব্যবস্থা করতে পারলে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারী মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করবে—আর রাধানাথের ভক্ত সংখ্যাও তখন মদনমোহনের দ্বিগুণ হবে। এটাই তো আসল জোর!

আরজিটা মাথায় ঢুকেছে চণ্ডীবউয়ের। কিন্তু শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা কি করে আদায় করা সম্ভব ভেবে পায় নি। তাছাড়া এ ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করার মত মনের সায়ও মেলে নি তেমন। ভালো-মন্দের বিবেচনা আগের থেকেও প্রখর। বলেছে, কিন্তু ও-সব আখড়া মানে তো কেবল মদ-গাঁজা খাওয়া আর যাচ্ছেতাই সব ঠাট্টা তামাশার আড্ডা।

চাপা অসহিষ্ণুতার ওপর হাতাশার প্রলেপ ছড়িয়েছে রাধানাথ।—মদ-গাঁজা আর ঠাট্টা-তামাশা! ভক্তিভরে মা-দুগ্‌গার পূজো হবে, চণ্ডীর পূজো হবে, সরস্বতী আর

জগদ্ধাত্রীর পূজো হবে—এ সব কিছু নয়? তাছাড়া বছরে দু'তিন দফা যাত্রা হবে, গানের আসর বসবে, কত রকমের খেলা-ধূলোর ফূর্তি আর রেষারেষি হবে—সে-সব? যারা মদ-গাঁজা খায় আর যাচ্ছেতাই ঠাট্টা তামাশা করে তারা কি সব বারইয়ারী খোলার আশায় বসে থাকে নাকি?

এতসব যুক্তির পরে নতুন বারইয়ারী পত্তনের সঙ্গত কারণ নাকচ করে উঠতে পারে নি চণ্ডীবউ। কিন্তু শ্বশুরের কাছ থেকে অত টাকা আদায়ের রাস্তাটা আবিষ্কার করে উঠতে পারছিল না। পাকা দালান-কোঠা পূজোমণ্ডপ যাত্রাআসরের মণ্ডপ তোলা তো কম টাকার ব্যাপার নয়! কি-কি করলে চটকদার বারইয়ারী হয়, সে-ফিরিস্তিও শোনা হয়েছে।

শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা আদায় করে দেবে এমন আশ্বাস চণ্ডীবউ দেয় নি। কিন্তু টাকা সংগ্রহের প্রয়োজনটা সে যে উড়িয়ে দিতে পারছে না এটুকুই রাধানাথের আশার সম্বল। মাঝে একটা বছর গড়িয়ে গেল, একটা যুগ গড়ানোর মতই আস্ত একটা বছর। রাধানাথ হাল ছাড়ে নি তবু। বউয়ের এই উনিশ বছরের রূপের মধ্যে সত্তার যে বাড়তি পুষ্টির দিকটা তার চোখে পড়ে, সেটা নির্ভর করার মতই। বউয়ের সর্বাঙ্গ ঘিরে এই জোরটা যেন আপনার থেকেই উপছে পড়ছে। বাবার ওপরেও যে বউয়ের দখল বাড়ছে একটু একটু করে, সপুলকে রাধানাথ তাও লক্ষ্য করে। মা অবশ্য সেটা খুশির চোখে দেখে না, কিন্তু বিপাকে পড়লে তাকেও এই বউয়েরই শরণাপন্ন হতে হয়। একটু-আধটু ধমক-ধামক খেলেও ঘোমটা টেনে বাবার মেজাজের মুখে একমাত্র ওই বউই চুপচুপ দাঁড়িয়ে থেকে তাকে খাইয়ে দাইয়ে ঠাণ্ডা করে আনতে পারে। ঠাণ্ডা হবার পর মা-চণ্ডীর ছেলের মুখ বাবার। তখন আবার রীতিমত তোয়াজই করে বলতে গেলে। এসব স্বচক্ষে লক্ষ্য করার পরেও রাধানাথ আশাহত হবে কেন?

এদিকে সময়ে-অসময়ে একজনের প্রতি বউয়ের আক্রোশ জিইয়ে রাখার জাদুকাঠিটিও যেন তার হাতের মুঠোয় এখন। এই তাপ যত প্রখর হবে, বারইয়ারী পত্তনের সম্ভাবনা ততো উজ্জ্বল। বাবার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের চিন্তাটা বউয়ের মগজে কেটে বসুক, এই চাই। চিন্তাটা ফিকে হয়ে আসছে মনে হলেই সরব হা-হুতাশে রাধানাথ ঘোষালবাড়ির ছেলের কোনো নতুন দুঃসাহসিকতার গল্প ফেঁদে বসে। ঘরের বউয়ের শ্রীমতীর দশার অনেক কুশ্রী ইঙ্গিত আর আস্ফালনের কথা বলে। দু চোখ কপালে তুলে সেদিনও সংবাদ দিয়েছে, ঘোষালের ছেলে নাকি শ্রীমতীকে বশীকরণের চেষ্টায় কোন এক সাধুর পিছনে ঘুরছে। খবরটা দিয়ে অসহ্য ক্রোধে রাধানাথ নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে চেয়েছে।

এই দুঃসাহসের কথা কানে গেলেই বউয়ের মুখের রঙ পাল্টায়, চোখে বিদ্যুৎ ঝলসায়। তাই দেখে রাধানাথের চোখ জুড়োয়। ঘোষালবাড়ির ছেলের এমন দুর্জয় সাহসের উৎস যে ওই দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারী, ঘুরে ফিরে সেই অবধারিত প্রসঙ্গটাই এসে পড়ে। মান-সম্ভ্রম নিয়ে প্রাণে বাঁচার তাগিদে ওই রকম একটা উৎস এই দত্তপাড়ায়ও না হলেই নয় সে-কথাই বউকে আবার নতুন করে বোঝাতে বসে সে।

বুঝুক না বুঝুক, চণ্ডীবউ ঘোষালবাড়ির ছেলের ওই সব হীন উক্তি এখন আর

অবিশ্বাস করতে পারে না। কারণ, এ সম্বন্ধে প্রথম খবরটা সেই দেড় বছর আগে প্রথম পেয়েছিল প্রসন্নর মুখে। লোকটা বুক ফুলিয়ে নাকি বলে বেড়াচ্ছিল, অমন বউয়ের কপালে সিঁদুর না থাকলে একটুও ভালো দেখাবে না বলেই এ-বাড়ির ছেলের শত অপরাধ ক্ষমা না করে পারবে না সে।

সেই থেকেই দুর্জয় রাগ। কিন্তু একমাত্র চণ্ডীবউই জানে, এই সব হীন উক্তির ফলে রাগের তলায় তলায় এক ধরনের যাতনাও পুষছে সে। কেন সেটা নিজের কাছেও স্পষ্ট নয় খুব।

তারপর মহাচণ্ডীর থানে আবার সেই বৈশাখী-পূর্ণিমার ঘটনা। যে ব্যাপার নিয়ে গোটা করণে সাড়াই পড়ে গেছল একটা।

তার আগে ননদিনীরা আবার বাপের বাড়ি এসেছিল। তাদের সঙ্গে বউও মহাচণ্ডীর থানে যাবে শুনে তারা মুখ মচকে মন্তব্য করেছিল, থাক্ গিয়ে কাজ নেই, কোমল মন, বলির রক্ত দেখে আবার কার গায়ে ঢলে পড়বে কে জানে!

চণ্ডীবউ জবাব দিয়েছে, দেখেশুনে তোমরাই পছন্দমত লোক যোগাড় করে দিও ভাই।

সাহসের কথা শুনে তাদের গা জ্বলেছে, কিন্তু মুখের দিকে চেয়ে আর টিপ্পনীর দিকে ঘেঁষেনি।

এবারে স-সঙ্গী রাধানাথও সঙ্গে ছিল। সঙ্গে থাকাটা সে কর্তব্য-বোধ করেছে।

তার প্রত্যাশা মিথ্যা হয় নি। থানের ভিড়ের মধ্যেও মদনমোহনকে আবিষ্কার করতে পেরেছে। এবারে সে একা। তাকে দেখেই মনে হয়েছে, শয়তান ইচ্ছে করেই সঙ্গী বর্জন করেছে। আর মনে হয়েছে, শ্রীমতীর সঙ্গে তাকে দেখে প্রতীক্ষামগ্ন ওই রসাবিষ্ট দুই চোখ যেন ধাক্কা খেয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে একটু ঘোরাঘুরির পর চকিতে মাথায় একটা বুদ্ধি এলো রাধানাথের। দিদিদের সঙ্গে বউকে ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে করেই দলবলসহ সে তফাতে সরে গেল। কারণ বোকার মত চোখে চোখে আগলে রাখলে নাটক যদি কিছু ঘটার আশা থাকে তা ঘটবে না। রাধানাথ সরে গেল বটে, কিন্তু এত ভিড় সত্ত্বেও লক্ষ্য যেদিকে রাখার ঠিকই রাখল।

প্রায় আধ ঘন্টা বাদে দুই ননদিনী সচকিত হল প্রথম। ঘোষালবাড়ির ছেলের সেই আদিখ্যেতা শুরু হয়েছে। সেবারের মতই সঙ্গ নিয়েছে। তারা যে দেখছে বা গা টেপাটিপি করছে তাও হুঁশ নেই। তন্ময়বিহ্বল ড্যাবডেবে দুটো চোখ বউয়ের মুখের ঘোমটা কখন একটু সরবে সেই আশায় ব্যাকুল যেন। এদিক-ওদিক চেয়ে রাধানাথকে না দেখে বিলক্ষণ বিরক্ত তারা। ওদিকে বড় ঘোমটার আড়ালে তারাও ভালো করে বউয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছে না। ভিড় ঠেলে মহাচণ্ডীর বটমূলের দিকে এগোলে বলি আর বলির রক্ত চোখে পড়বেই—গরবিনী কোমলাবিধুরা এবারেও ভিরমি খাবেন কিনা কে জানে। রাধানাথকে সঙ্গে না দেখে আর এগোতেও সাহস হচ্ছিল না তাদের।

কিন্তু ভিড়ের চাপে পায়ে পায়ে বউ নিজেই এগোচ্ছে সেদিকে।

সেই একই দৃশ্য বটমণ্ডপের সামনে। এদিক-ওদিকে বহু ছাগ-নন্দনের রক্তাক্ত

ধড় আর মুণ্ডু গড়াগড়ি খাচ্ছে। যূপকাষ্ঠে গলা দেবার অপেক্ষায় আরো অনেকগুলো থরো থরো কাঁপছে আর করুণ রব তুলেছে। চারদিক রক্তে থৈ-থৈ।

দর্শন হল, প্রণাম হল, পূজো দেওয়া হল। মায়ের সিঁদুরের ফোঁটা পরা হল। কিন্তু এবারে অর বউয়ের ভিরমি যাবার কোনো লক্ষণ দেখল না ননদিনীরা। ভিড় ঠেলে খানিকটা ফাঁকায় বেরিয়ে আসতে গলদঘর্ম তারা। সেই সঙ্গে চাপা উত্তেজনা। ঘোষালবাড়ির নির্লজ্জ বেহায়া ছেলেটা ছায়ার মত সঙ্গে লেগেই আছে। খুব দূরেও নয় এখন, গজ-দশেক পিছনেই অতএব বার বার ঘাড় ফেরাতে হচ্ছে তাদের। ছোঁড়াটা যেন স্বপ্নের ঘোরে সঙ্গ নিয়েছে—এই হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি আর ভিড়ের কিছুই যেন তার কানে যাচ্ছে না, চোখে পড়ছে না। ননদিনীদের গা-টেপাটেপি আর চাপা ইশারা জমাট বেঁধে উঠেছে আবার।

অপেক্ষাকৃত এই ফাঁকায় আসার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হবার মতই এক তাজ্জব কাণ্ড। ননদিনীরা দু'চোখ কপালে তুলে দেখল, আশেপাশের সকলে দেখল, আর দূরের অগোচর থেকে স-সঙ্গী রাধানাথও দেখল।

এই আচমকা কাণ্ডটা ঘটালো চণ্ডীবউ।

তার চলার গতি ঈষৎ দ্রুত হবার মুখে হঠাৎ থেমেছিল। তারপর তেমনি আচম্বিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে। কারো চোখ পলক পড়ার আগেই হন হন করে মদনমোহনের ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল—তার পাঁচ-সাত হাতের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের এক ঝটকায় মাথার ঘোমটা খসে গেল।

অব্যক্ত বিস্ময়ে আর বিস্ফারিত নেত্রে সকলে ঘোষালের ছেলের পাঁচ হাতের মধ্যে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক অগ্নিবর্ণা রমণী। দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ। তীব্র তীক্ষ্ণ অকরুণ দুই চোখের শানিত অস্ত্রে সামনের স্থান-কাল বিস্মৃত পুরুষের মুখখানা বুঝি ফালা-ফালা করে দিচ্ছে।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু তার অনন্ত পরমায়ু যেন।

মদনমোহন চিত্রার্পিত, বিমূঢ়।

তারপর দৃষ্টির ঐ নিদারুণ অগ্নিবাণেই হঠাৎ সম্বিৎ ফিরল যেন। তবু আত্মস্থ হতে সময় লাগাল একটু। এবারে সজ্ঞানে মদনমোহনের আয়ত দুই চোখ সামনের জলন্ত মুখের ওপর প্রসারিত হল একবার। তারপর নির্বাক একরাশ বোবা মূর্তির পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে চলে যেতে লাগল সে।

যতটুকু দেখা গেল তাকে, তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে চণ্ডীবউ চোখের আগুনে দগ্ধ করল তাকে। দৃষ্টির আড়াল হতে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে চণ্ডীবউ ধীর পায়ে ননদিনীদের কাছে ফিরে এলো আবার।

এমন এক নিঃশব্দ নাটক করণের মধ্যে আর কেউ দেখে নি।

সম্ভব হলে ওই মহাচণ্ডীর থানেই বউকে মাথায় তুলে নাচত রাধানাথ। নির্লজ্জ ঘোষালের মুখের ওপর এত বড় চাবুক আর বুঝি কখনো পড়ে নি। বউয়ের মুখের ওপর তার সেই আত্মস্থ প্রসারিত দৃষ্টি যদি লক্ষ্য করেও থাকে—সেটা বিশ্লেষণের বস্তু ভাবে নি। তার মাথা নীচু করে আর একদিকে চলে যাওয়াটাই বড় করে দেখেছে। সেটাই চাবুকের মোক্ষম ফল ভেবেছে।

রাধানাথের অন্তরঙ্গ মহলে এই চাবুকের কথাটাই উদাত্ত হয়ে উঠেছে। এমন কি ননদিনীরাও অস্বীকার করতে পারে নি এটা চাবুক বটে।

উত্তেজনা সামলে সন্ধ্যায় মহেশ্বর দত্তকে প্রথম খবরটা দিয়েছেন তাঁর গৃহিণী। বউ যা করে এসেছে সেটা যথার্থ চাবুক কিনা, সেই উত্তেজনার মুখে দত্ত-গৃহিনী সঠিক উপলব্ধি করতে পারছিলেন না। মেয়েদের ডেকে মহেশ্বর দত্ত ব্যাপারটা শুনেছেন। আর সেই সন্ধ্যায়ই বাইরের আর দশ-জনের মুখেও শুনেছেন। যারা তাঁকে খাতির আর তোয়াজ-তোষামোদ করে—তারাও মুগ্ধবিস্ময়ে চণ্ডীমায়ের কোপ আর চাবুকের কথাই বলেছে। বিগলিত হয়ে বলেছে, মহাচণ্ডীর থানে আজ যথার্থ চণ্ডীদর্শন ঘটেছে তাদের।

মহেশ্বর দত্ত মৃদু মৃদু হেসেছেন, আর আনন্দে অল্প অল্প দুলেছেন। এত আনন্দ শরীরে বা মনে আর ধরে না বুঝি।

সন্ধ্যার পর দোতলার নিজের ঘরের দরজার কাছ থেকেই দরাজ গলায় হাঁক দিলেন, কই গো আমার মা-চণ্ডী কই—আমাকেও একবার দর্শন দিয়ে যাও!

পায়ে পায়ে কাছে আসতে একমুখ হেসে তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি।

চণ্ডীবউ নিজের ঘরে ফিরল প্রায় আধ ঘন্টা বাদে। রাধানাথ উন্মুখ হয়েই ছিল এতক্ষণ। এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে মুখে খুশি ছড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কি বলল?

জবাব না দিয়ে চণ্ডীবউ চুপচাপ কয়েক নিমেষ লক্ষ্য করল তাকে।—ওই আখড়া না কেলাব কি করবে বলছিলে...করতে চাও?

রাধানাথ লাফিয়ে উঠল প্রায়, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—বাবাকে বলেছ নাকি?

সেটা হলে দলবল নিয়ে সেখানে মদের আড্ডা বসাবে না?

কি যে বলো ঠিক নেই, এই তোমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—

আর কোনোরকম বেলেল্লাপনাও হবে না?

কি মুশকিল। আশার ধাক্কায় দম বন্ধ হবার দাখিল রাধানাথের।—তুমি চাইলে গোটা বারইয়ারী রোজ গোবরজলে গঙ্গাজলে নিকিয়ে দেব। বাবার সঙ্গে কি কথা হয়েছে?

আরো কয়েক পলক চেয়ে থেকে চণ্ডীবউ জবাব দিল, টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। কি করতে চাও তাঁকে গিয়ে বলো।

রাধানাথ কি শুনছে বা সামনে কাকে দেখছে জানে না যেন। একই দিনে মানুষ কবার করে কত আর মুগ্ধ হতে পারে।

॥ ১৫ ॥

বেশ ঘটা করে কাজে নেমেছেন মহেশ্বর দত্ত।

যা করেন অভিজ্ঞ পাকা হাতের স্বাক্ষর থাকে তাতে। কিন্তু এবারের সূচনায় একটা বড় রকমের প্রতিশ্রুতি দেখল করণের মানুষ।

ঘোষালবাড়ির ছেলেকে আত্মীয়সুলভ প্রলোভনের আফিম গিলিয়ে আপন বশে আনতে চেষ্টা করেছিলেন মহেশ্বর দত্ত। ওই দামাল ছেলের তুলনায় নিজের ছেলেকে নিতান্ত অপরিণত বুদ্ধি না-বালক ভাবতেন বলেই আপসের শেকলে বাঁধতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু ছোকরা আফিম গিলল না, শেকলে ধরা দিল না। ফলে দুর্জয় ক্রোধ। সেই ক্রোধের ফাঁকে ছেলের জন্য ভাবনাটা আগের থেকেও বেশি দানা পাকিয়ে উঠেছিল।

ঠিক এই দুশ্চিন্তার মুখে নিজের অন্তঃপুরে বড় রকমের একটা শক্তির উৎস দেখলেন যেন তিনি। থানের এবারের ব্যাপারটা সপল্লবে কানে আসার পর চণ্ডীবউকে সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী মনে হয়েছিল তাঁরও। স্বয়ং দশভুজার নারীরূপের প্রতি পাপদৃষ্টি হেনেছিল মহিষাসুর। তাতেই তার কাল হয়েছিল। থানের ঘটনা শোনার পর ঘরের বউয়েরও এইগোছেরই একটা শক্তি কল্পনা করেছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলের নিরাপত্তার ব্যাপারেও যে এই শক্তির ওপর নির্ভর করা যেতে পারে সেটা তখনো ভাবেন নি। আশার এই নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন সেই রাতে বউকে নিজের ঘরে ডাকার পর।

গিন্নীর মারফত ছেলের একটা নতুন বারইয়ারী স্থাপনের অভিলাষ বহুবার কানে এসেছে তাঁর। এ কানে শুনে ও কান দিয়ে বার করে দিয়েছেন তিনি। বেশি বিরক্তির কারণ ঘটলে পাল্টা ঝাঁজে গিন্নীর মুখ বন্ধ করেছেন। কিন্তু চণ্ডীবউয়ের মুখে সেই একই প্রস্তাব শুনে প্রথমে বিস্ময় আর পরে খুশিতে নির্বাক তিনি। এই প্রস্তাবের রূপ, উদ্দেশ্য সবই ভিন্ন মনে হয়েছে। বউকে তিনি ঘরে ডেকেছিলেন সামনা সামনি। একটু তোয়াজ করার জন্য। আর সোচ্ছ্বাসেই যেটুকু সম্পন্ন করে তাকে ঘরে যেতে বলেছিলেন।

কিন্তু চণ্ডীবউ দাঁড়িয়েই ছিল।

মহেশ্বর দত্তর তক্ষুনি মনে হয়েছে বউয়ের নিবেদন আছে কিছু। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছেন, কিছু বলবে?

মাথা নিচু করে চণ্ডীবউ আঙুলের ডগায় শাড়ির আঁচল পাকিয়েছে।

কি বলবে বলো না, চাই কিছু?

চণ্ডীবউ সামান্য মাথা নেড়েছে। অর্থাৎ চাই।

মহেশ্বর দত্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, বলো বলো, বুড়ো ছেলের কাছে আবার লজ্জা কি: কি চাই?

বউকে অদেয় কিছু নেই যেন।

ইংরেজি 'কেলাব' কথাটা মুখে আসে নি চণ্ডীবউয়ের, বাংলা বারইয়ারীও না। তার অনুচ্চ স্পষ্ট নিবেদনের সারমর্ম, এ পাড়ায় পূজো আর যাত্রা গান টান হতে পারে এ-রকম একটা দালান গোছের কিছু তুলে দিতে হবে।

মহেশ্বর দত্ত তক্ষুনি বুঝে নিয়েছেন কি চাই। বউয়ের মুখে এই প্রস্তাব শুনে তাঁর দু'চোখ কপালে। বিরক্তির বদলে বিস্ময়। কিন্তু দু'চার কথার পর ওই বিস্ময় এক চাপা আনন্দের দিকে গড়াল। বউয়ের মৃদু বক্তব্য, দক্ষিণপাড়ায় ওরকম একটা উৎসব-আনন্দের স্থান আছে বলেই সেখানকার দল ভারী—আর সেই জোরেই এ-বাড়ির লোককে তারা অপমান করতে সাহস পায়। ওমনি একটা জোরের জায়গা

এদিকেও হওয়া দরকার। এদিরে দল ভারী হলে তখন আর খামোকা কেউ অপমান করতে সাহস পাবে না।

ছেলে যত দুর্বল আর যত অপদার্থই হোক, তার অপমান বউয়ের অপমান হয়ে উঠেছে দেখলে কোন্ বাপ না খুশি হয়! তাছাড়া বারইয়ারী স্থাপনের এই সার্থকতার দিকটা এতদিন তাঁর মাথায় আসে নি। করণের মানুষগুলোর এই স্বভাবই বটে। সুখ বা আনন্দের জোরালো আলো দেখল কি পঙ্গপালের মত ছুটল সেদিকে। ইচ্ছে করলে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতই জোরালো আলো জ্বালতে পারেন তিনি। বলবান শত্রুর সঙ্গে আপোস সম্ভব না হলে তার শক্তির উৎস একেবারে নির্মূল করার বাসনা সহজাত প্রবৃত্তির মত উঁকিঝুঁকি দেয়। এই প্রবৃত্তির একটা যোগ্য রসদ পেলেন যেন মহেশ্বর দত্ত। বউয়ের রাঙা মুখের দিকে চেয়ে অপমান বরদাস্ত না করার চাপা তেজ দেখলেন যেন তিনি। মায়ের থানে বউয়ের মুখের কোন্ দৃপ্ত তেজের ঘায়ে মাথা নিচু করে সরে গেছে ঘোষালবাড়ির ছেলে, কল্পনায় তাও যেন স্পষ্ট অনুভব করলেন তিনি। ছেলের ব্যাপারে বাইরের অশ্রয় না খুঁজে এই তেজের ওপরেই অনায়াসে নির্ভর করা যেতে পারে মনে হল। বড়সড় এক দুর্ভাবনার অবসান।

হাসিমুখেই মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। হাসিমুখে বলেছেন, তাই হবে, মা-চণ্ডী চেয়েছে যখন—তাই হবে।

তাই হতে চলেছে। চখা বিলের নিরিবিলির ধার ঘেঁষে ছোটখাটো একটা প্রাসাদের অঙ্গবিস্তার শুরু হয়েছে। একসঙ্গে শতেক মেয়ে-পুরুষ সেই প্রাসাদ রচনার কাজে মেতেছে। গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে ইট চুন-সুড়কি মশলা-পাতি আসছে তো আসছেই।

দিনের মধ্যে দু'তিনবার মহেশ্বর দত্ত নিজে এসে দাঁড়ান। দেখেন, তদারক করেন। দত্তপাড়ার বহু লোক এখানে হাজিরা দেয় তখন। মহেশ্বর দত্তকে ঘিরে একটা বাহবার রব মুখর হয়ে ওঠে। তিনি খুশি হ'ন, কিন্তু রসনার লাগাম ছেড়ে দিয়ে সেটা প্রকাশ করেন না। তাঁর সৃষ্টি উদ্ধত, নিজে তিনি বিনীত। বলেন, যা করছেন তা নিজের জন্য নয়—করছেন দত্তপাড়ার মুখ চেয়ে। এরপর পূজো পার্বণ উৎসব আনন্দ সামাজিকতায় এর মান বজায় রাখার সব দায়দায়িত্ব দত্তপাড়ার মানুষদের। সকলের অনুরাগের বাঁধন পড়লে করণের এই বারইয়ারীর নাম কালের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

পার্ষদরা ঘন-ঘন ঘাড় দোলায়, নিশ্চয়, নিশ্চয়—

এই সরব সমর্থন থেকে মহেশ্বর দত্ত নিশ্চয়তার আশ্বাস পান।

ব্যাপার দেখে সকলের ছেড়ে রাধানাথেরও মাথা ঘোরার উপক্রম। তদারকের নামে সকাল-সন্ধ্যার বেশির ভাগ সময় সে-ও সদলবলে এখানেই কাটিয়ে যায়। তার অবস্থানের সময়টা অবশ্যই বাপের উপস্থিতির সঙ্গে মেলে না। চখা বিলের উল্টোদিকে বেনা ঝোপের ওধারে মস্ত আম জাম লিচু কাঁঠালের বাগান। ভিতরের অনেক স্থানে সূর্যিঠাকুরের শীর্ণ পদক্ষেপ। এমনি এক ঠাণ্ডা জায়গায় দ্বিপ্রাহরিক আসরটি ক্রমে জমজমাট হয়ে উঠেছে। আসর বেশি জমলে উঠে এসে সব দিন তদারকির দায়িত্ব পালন করা হয়ে ওঠে না। সুরা আর নিষিদ্ধ মাংসের আধিক্য

ঘটলে আগামী দিনের সুরার প্রাসাদ-গৃহের কাঠামো কুৎসিত কঙ্কালের মত মনে হয়। গাছের ছায়ায় সকলের মিলিত উৎসাহের ফেনায়-ফেনায় অনাগত প্রাসাদসুন্দরীর রূপটা বরং খোলে ভালো।

আসর গরম হতে না হতে দেবীর কৃপাপ্রসঙ্গ উঠবেই। সঙ্গীরা কেউ নরাধম নয় যে এমন এক সৃষ্টির পিছনে দেবীর কৃপাদৃষ্টির মাহাত্ম্য ভুলে থাকবে। বরং সুরার সঙ্গে নিষিদ্ধ মাংসের উদার মিলন ঘটলে স্তুতিরাগে ভক্তদের চোখ ছলছল করে ওঠে অনেক সময়, আর কণ্ঠেও তার ছোঁয়া লগে।

দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ সাক্ষাৎ জাগ্রত চণ্ডীরূপিণী তাদের কাছে। এই আসরে এক রাধানাথ ভিন্ন আর সকলের নির্ভেজাল নন্দী-ভৃঙ্গীর ভূমিকা।

রাধানাথ স্তুতিতে বাদ সাধে না। করণের বুকে এত বড় এক কাণ্ড সত্যিই ঘটতে যাচ্ছে যখন, বউয়ের মাহাত্ম্য অস্বীকার করে কি করে? একটু আনন্দের আশ্রয় চাইলে যদি চোখের সামনে প্রাসাদের আশ্রয় গজিয়ে উঠতে দেখা যায়, বিভ্রম স্বাভাবিক। কিন্তু বিয়ে করা বউকে ওরা জাগ্রত দেবীর আসনে বসালে নিজেকে নিয়ে এক-একসময় বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। ভক্তদের মত বউয়ের কৃপাদৃষ্টি কাম্য নয় তারও। বউ এই ভক্ত-বন্ধুদের চেনে না— কৃপা দিয়ে ও যেন শুধু তাকেই ছেঁকে ধরে আছে। কিন্তু সে-ও সদয় কৃপা নয়, অল্প অল্প বিস্ময়-মেশানো এক ধরনের নির্লিপ্ত কৃপা।

...ছেলে হল না, ছেলে হল না, করে মা যেন বাড়িতে একটা রব তুলে দিয়েছে। রাধানাথের রাগ হয় মায়ের উপর। বউয়ের কি হয় মুখ দেখে বোঝা যায় না। কিন্তু ছেলেপুলে না হওয়ার অপরাধটা বউ নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে মনে হয় না। ফলে রাধানাথ অস্বস্তি বোধ করে।...রাতের শয্যাটাকে সে কেমন ভয়ের চোখে দেখতে শুরু করেছে ইদানীং। অগোচরের ভয়। অথচ সমস্ত দিনমান ওই শয্যার আশ্রয়ের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। কেন থাকে জানে না। কোন্ বৈচিত্র্য তাকে এত টানে আজকাল তাও জানে না। কাছে এলে বা মুখের দিকে তাকালেই যেন নতুন শিখার হদিস মেলে। তখন নির্মমতম দস্যু হতে সাধ যায়।

...সেই পরাক্রম নিয়েই আসে। শিখা জয়ের তাড়নায় বাসনার কণাগুলো যথাযথ জ্বলে ওঠে, ঝলসে ওঠে। নিভৃতের স্বয়ংবৃত অভ্যর্থনায় তেমন জোরালো বাধাও কিছু উপস্থিত হয় না। অতএব গলদ কোথায় রাধানাথ সঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না। কিন্তু গলদ কোথাও আছেই। নইলে লুণ্ঠনের সম্পদ দুই দুরন্ত বাহুর অধিকারে থাকা সত্ত্বেও নিজের দেহের অভ্যন্তরে একটা বিশ্বাসঘাতকতার কারচুপি শুরু হয়ে যায় কেন? আর তারপর বিস্মৃতির তপ্ত উৎস ছেড়ে ভোগ-শরবিদ্ধ অর্ধদগ্ধ পুরুষকার পলায়নের পথ খোঁজে কেন? আবছা অন্ধকারে বউয়ের দু'চোখের নির্বাক দৃষ্টি তখন সব থেকে বেশি অসহ্য মনে হয়।

...অল্প অল্প বিস্ময়-মেশানো এক ধরনের নির্লিপ্ত কৃপাদৃষ্টি।

অতৃপ্ত ভোগের তীক্ষ্ণতম যাতনা রাধানাথের নিজের বুকের তলায় একটা ক্ষত সৃষ্টি করে চলেছে। সেটা তাকে বিকল করতে চায়, পঙ্গু করে দিতে চায়। তার বিরুদ্ধে যুঝতে হয় তাকে। যুঝে যুঝে নিজের শক্তির স্বাদ শক্তির নির্ভরতা ফিরে পেতে চায়। সেই তাড়নায় দিনে দুপুরে বা ভর-সন্ধ্যায় এক একদিন ছুটে যায় দক্ষিণপ্রান্তে কুসুমবাঈয়ের ডেরায়।

সেখানে শাহেনশা বাদশার ভূমিকা তার। আঙুলের ইশারায় সেবা মেলে, স্নায়ু-তাতানো পরিচর্যা মেলে, বিকৃত রুচির সমর্থন মেলে, উপকরণ মেলে। ফলে অনেকখানি আত্মনির্ভরতা নিয়ে ফেরে রাধানাথ। এই নির্ভরতার পুঁজি বাসনার সহস্র শিখার ইন্ধন যোগায়। রাতের ঘরের শয্যায় দস্যুর মতই দখল নিতে আসে আবার।

কিন্তু নিজের দেহের অভ্যন্তরে আবারও সেই বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। সেটা নির্মূল করার আক্রোশে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্ত আচরণ। তবু যেন নিষ্ফল বিনিময়ের এক শূন্য কোটরে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে সে।

...তারপর আবছা অন্ধকারে রমণীর দুই চোখের নির্বাক দৃষ্টি। অল্প অল্প বিস্ময়-মেশানো সেই একধরনের কৃপাদৃষ্টি।

চখা বিলের দ্বিপ্রাহরিক মজলিশে ঘরের জাগ্রত চণ্ডীর উদ্দেশে ভক্তদের স্তুতিরাগ শুনেও নিজের দুরবস্থাটা প্রকাশ করতে পারে না রাধানাথ। কিন্তু সুরার স্নেহধারার আধিক্য ঘটলে একেবারে চুপ করেও থাকতে পারে না। তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে তোমরা তো ভক্ত হয়েই খালাস, বউ জাগ্রত চণ্ডিকা হলে আমার অবস্থাখানা ভেবে দেখেছ?

বলার ধরনে বিষাদের ছোঁয়া পেয়ে ভক্তরা বিচলিত হয়ে ওঠে।—কেন ভাই, তুমি তো তাহলে শিবঠাকুর!

হ্যাঁ।' দ্বিতীয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ঠেলে বার করে রাধানাথ।—তার মানেই একেবারে বুকে পা। সেই রণচণ্ডী ঠাকরোনটি তবু সোয়ামীর বুকের ওপর পা দিয়ে ফেলে লজ্জায় আধ-হাত জিভ বার করেছিল—তোমাদের এই ঠাকরোন তাও করবে না।

সমস্যাই বটে। গেলাস উজাড় করে এক ভক্ত সমাধানের সান্ত্বনা খোঁজে,—কলির তেজ যে ভিন্ন তেজ ভাই, এরকমই তো হবে। পুরাণের অমন জাঁদরেল দেবীরও শ্বশুর ঘায়েল করার নজির আছে? জিভ না-ই বা কাটল, এমন তেজ না হলে কোলিকালে ওই বারইয়ারীর মুখ দেখারও আশা ছিল আমাদের?

পার্ষদরা ছেড়ে রাধানাথও এস সত্যটা অস্বীকার করতে পারে না। এ-দিক থেকে চিন্তা করলে আসল শিবঠাকুরের থেকেও সে ভাগ্যবান বটে।

গেলাস হাত একে একে অনেকেই উঠে দাঁড়িয়ে যেন স্বপ্নের ঘোরে চখা বিলের ওধারে আশার প্রাসাদ-সৌধের কাঠামোটি দেখে, আর কলির শ্বশুর ঘায়েল-করা চণ্ডী-মাহাত্ম্যের মহিমা উপলব্ধির জোয়ারে ভাসে।

কলির ভাগ্য মেনে তৃতীয় দীর্ঘনিঃশ্বাস উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে গেলাসের মুখে বোতল উবুড় করে ধরে রাধানাথ।

॥ ১৬ ॥

কোনো বনেদী জমিদারের সঙ্গে আর এক নতুন জমিদারের ঝগড়া ছিল। বনেদী জমিদারের কানে খবর এলো নতুন জমিদার জলদান-পুণ্যের পথে পা বাড়িয়েছে। প্রজাদের সুবিধের জন্য মস্ত এক পুকুর কাটানোর তোড়জোড় শুরু করেছে। যে

কাজ শেষ হলে তার দানের ওজনের সঙ্গে সঙ্গে নামের ওজনও কম ভারী হবে না।

বনেদী জমিদারের এলাকায় ছিল বিশাল এক মজাপুকুর। তারই কোনো পূর্বপুরুষের প্রজানুরাগের নজির সেটা। দীর্ঘদিনের অযত্নে পুকুর হেজেমেজে গেছে বটে, তবু পূর্বপুরুষের অত বড় কীর্তির ছটা তখনো নিষ্প্রভ হয় নি। নতুন জমিদারের খবরটা শোনামাত্র বনেদী জমিদার দ্বিগুণ আড়ম্বরে আর দ্বিগুণ ঘটা করে তার মজাপুকুর সংস্কারের উৎসবে মেতে উঠল। মজাপুকুর আর মজাপুকুর থাকবে না, তার টলোমলো কালো জলে সুদুর ঐতিহ্যের আলো ঠিকরোবে।

দত্তপাড়ায় নতুন বারইয়ারী স্থাপনের ফলাফলও ঠিক এইদিকেই গড়ালো। দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর সুদূর কালের ঐতিহ্যের স্মৃতি নিষ্প্রভ হয় নি বটে, কিন্তু সংস্কারের অভাবে কালের জরা কম জমে নি তাতে। সযত্ন সংস্কারের অভাবে ওই বনেদী জমিদারের মজাপুকুরের মতই অবস্থা ওর।

চখা বিলের ধা দত্তপাড়ার বারইয়ারীর প্রাসাদ-অঙ্কুর মাটি ফুঁড়ে মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর প্রধানদের মাথার রক্ত চলাচল বেড়ে গেল। নিজেদের এতকালের বারইয়ারীর দিকে দৃষ্টিপাত করল তারা। সে জিনিস গজিয়ে উঠেছে চখা বিলের এলাকা জুড়ে, তার পাশে বড় বেশি বর্ণ-শূন্য মনে হতে লাগল এটা। পুরনো দিনের বর্ণ ফেরাতে না পারলে মান-মর্যাদা ধূলিসাৎ।

নতুন করে বর্ণ ফেরানো শুধু নয়, বনেদী ঐতিহ্যের সাড়ম্বর বর্ণাঢ্যে একে জমজমে করে তোলার সঙ্কল্পে সব থেকে বেশি মেতে উঠল ঘোষালবাড়ির মদনমোহন ঘোষাল। পুরনো কালের স্মৃতির প্রতি তার অসীম মমতা। এই মমতার ফলে নিজের বসতবাড়ির জীর্ণ অবস্থা চোখে পড়ে না, কিন্তু নাটমন্দিরের শিল্পকারু সংস্কারে ছেদ পড়ে না স্বল্প-সম্বল ধানী জমি বেচে দিতে হলেও। চোখ-জুড়ানো শিল্পকারুতে নাটমন্দিরের চারদিকে দেয়ালে রামায়ণ-মহাভারতের যে দুটি অমর কাব্য সজীব হয়ে আছে তাঁর কোথাও এতটুকু রং চটলে মেজাজ বিগড়োয়। সংস্কার করতে না পারা পর্যন্ত ঘুম হয় না।

ঠিক এই চোখ আর এই মন নিয়েই মদনমোহন দৃষ্টিপাত করল দক্ষিণপাড়ার বনেদী ঐতিহ্যের বারইয়ারীর দিকে।

অনুরাগের অষ্ট পর্ব।

মদনমোহনের পরিবর্তনের মধ্যে একে একে এই পর্বগুলোর লক্ষণ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল তার গুণগ্রাহীদের চোখে। মদনমোহনকে নিয়ে সঙ্কট যেন তাদেরই। কলির গোপালের এই প্রেমদশা দুর্দশারই সামিল, বিশেষ করে শ্রীরাধিকাটি যেখানে অমন এক হোমরাচোমরা ঘরের কুলবধূ। মাথা খুঁড়ে প্রাণপাত করলেও এক্ষেত্রে প্রেমজ্বর জুড়োবার মত কালিন্দীর জলও মিলবে না, কদম্বের তলও মিলবে না। তার ওপর সেই শ্রীরাধিকা যদি অমন সাক্ষাৎ চণ্ডীরূপিণী হয়, তাহলে বুকের তলার দীর্ঘনিশ্বাসের পুঁজিটুকুও উজাড় করতে ভয়। প্রাণের বন্ধুর মুখ চেয়েও এমন দুঃসাহসিক প্রেম-দরিয়ায় তারা আশার তরী ভাসায় কি করে?

এদিকে দিনের পর দিন প্রাণের বন্ধুর হাল দেখে ভিতরে ভিতরে তারা নাজেহাল। মগজের সরস বুদ্ধি থেকে শুরু করে সর্বব্যাপারে তাদের ফাঁপা তহবিলের প্রধান

যোগানদার যে, সে যদি দিনকে-দিন এরকম আত্মমগ্নতার অন্দরে সেঁধিয়ে যায় তাহলে তো দক্ষিণপাড়া অন্ধকার!

ঠিক এই সমস্যার মুখে সব জড়তা ঠেলে মদনমোহনকে এগিয়ে আসতে দেখে সতীর্থদের উল্লাস ধরে না। তার এই উৎসাহ আর উদ্দীপনা ঘুম-ভাঙা সিংহের গর্জনের মত রোমাঞ্চকর লাগল তাদের। দত্তপাড়ায় বারইয়ারী আবির্ভাবের একটা জুতসই জবাব অচিরে দানা বেঁধে উঠল। এস নতুন প্রেরণার জোয়ারে ডুব দিতে পারার আনন্দে বন্ধুর প্রসঙ্গে গুণমুগ্ধদের দুর্ভাবনাও প্রায় ঘুচে গেল। তারা ভাবল, অনুরাগ-টনুরাগ কিছু নয়, এমন নির্বোধ অনুরাগের ফাঁস গলায় পরবে এত নীরেট নয় তাদের মদনমোহন। যে পরিবর্তন দেখে তারা ঘাবড়েছিল সেটা খেয়ালী মানুষের সাময়িক অবসাদ শুধু। সত্যিকারের সমস্যা উপস্থিত হওয়া মাত্র পুরুষমানুষের মত এগিয়ে এসে লাগাম ধরেছে।

অনুরাগ কিনা মদনমোহন নিজেও সঠিক জানে না।

কিন্তু নিজের অন্তঃপুরের কিছু বিপর্যয়ের খবর নিজে অন্তত সে ভালই রাখে। আচমকা আঘাতে স্নায়ু বিকল হয়, বিভ্রান্ত হয়। আবার তেমনি দ্বিতীয় কেনো জোরালো আঘাতে নাকি সেই বিকল স্নায়ু আত্মস্থ সক্রিয় হয়ে ওঠে অনেক সময়। মদনমোহনের বেলায়ও এই গোছের কিছু হয়েছে।

মহাচণ্ডীর থানের প্রথমবারের ঘটনা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, মোহগ্রস্ত করেছিল। তার পর থেকে সে যেন কিছু চোখে দেখছিল না, কানে শুনছিল না। কানে লেগেছিল রমণী কণ্ঠের নাড়ি-ছেঁড়া অস্ফুট একটু আর্তনাদ, মাগো, কত রক্ত। আর চোখ জুড়ে ছিল পর পর কতগুলো দৃশ্য—দিশেহারা ত্রাসে সেই রক্ত-কলঙ্কের ছোঁয়া থেকে ছুটে পালানোর চেষ্টা, কানা-অশথের প্রায় নাগালের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্মৃতি আর বিস্মৃতির সন্ধিক্ষণের সেই দোলায়মান অবস্থা, বাহ্যজ্ঞানরহিত মদনমোহনেব কোনে সমর্পণের চেতনালুপ্ত স্তব্ধতা খানিকক্ষণের, জলের ঝাপটায় থবথর কাঁপুনি, সবশেষে পুরুষের এক নির্বাক দৃষ্টির গহনে হারানো আয়ত-পক্ষ্ম নিবিড় কালো দুই চোখের তারায় বিমূঢ় বিস্ময়ের বন্যা ঠেলে চেতনার তট খোঁজার কয়েকটি নিথর মুহূর্ত। প্রথম দর্শনের পর সকলের লক্ষ্য অগ্রাহ্য করে ভিড়ের মধ্যে মদনমোহন ওই অনন্য রূপশিখার অনুসরণে মগ্ন ছিল যখন, তার অনুভূতিব রাজ্যে তখনো এত বড় ওলট-পালট হয়ে যায় নি। তখনো পুরুষের ঔদ্ধত্য ছিল, রমণীর রূপে পুরুষের মুগ্ধ হবার অধিকারের একটা প্রকাশ্য ঘোষণা ছিল।

বিনিময়ে স্মৃতির ওই সম্পদ কুড়োবে সে কি স্বপ্নেও কল্পনা করার মত?

দু-দুটো বছর মদনমোহন আর নিজের মধ্যে ছিল না। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বিমনা। আহারের রুচি গেছে, অনিদ্রার ক্লান্তি জমে জমে সর্বদা একটা ঝিমুনি ভাব এসেছে। অতি অনুগত ভক্তদের সঙ্গও কাম্য মনে হয় নি। অষ্টপ্রহব, এমন কি ঘুমের মধ্যেও ওই একটা দিনের স্মৃতি যেন স্পর্শ হয়ে বুকের তলায় লেগে ছিল—সেই থর থর কাঁপুনি...বিহ্বলতার দরিয়া থেকে ভেসে ওঠা কালো দুটি চোখের তারা...চেতনার আঘাতে ধড়মড় করে উঠে বসে মাথায় সিক্ত শাড়ির আঁচল টানার চেষ্টা...এই সব কিছু। আরো অনেক, অনেক কিছু। ওই একটা দিন কালের অনন্ত দিন-গুলির থেকে পৃথক আর বিচ্ছিন্ন বুঝি। ওই একটা বিচ্ছিন্ন দিনের·মধ্যেই টানা দুটো বছর বাস করছিল মদনমোহন।

অনুভূতিটা অবিচ্ছিন্ন সুখের নয়। বরং দুর্বহ যাতনার মতই। তবু তারও অনির্বচনীয় স্বাদ।

দুটো বছর সজ্ঞানে কাটায় নি মদনমোহন। চণ্ডীবউয়ের খবর নেবার জন্যে একেবারে যে দত্তবাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল থানের ঘটনার পরদিন—সেও খুব সুস্থ মাথার প্রতিক্রিয়া নয়। না এসে পারে নি তাই এসেছিল। কেউ বুঝি তাকে ওই বাড়ির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, আর একটিবার শুধু চোখের দেখা দেখতে পেলেও অনেকটা সুস্থ, স্বাভাবিক হতে পারবে সে।

দেখা পেয়েছিল। মহেশ্বর দত্ত তো চণ্ডীবউকে ঘরেই ডেকে এনেছিলেন, প্রণাম করতে বলেছিলেন, আদর করে সামনে বসিয়ে খাইয়েছিলেন। কিন্তু মদনমোহন সুস্থ বা স্বাভাবিক হওয়া দূরে থাক্, নিজেকে যেন দ্বিগুণ খুইয়েছে, দ্বিগুণ হারিয়েছে। দিনের পর দিন ভাবনার তন্ময়তা থেকে হঠাৎ নিজেকে টেনে তোলে যখন, দেখে মনটা উধাও হয়েছিল দত্তবাড়ির অদেখা অন্তঃপুরের দিকে। রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ সম্বিৎ ফেরে যখন, দেখে, নিজের অগোচরে পা দুটো দত্তবাড়ির পথ ধরেছে কখন।

...দেখা আর একদিনও পেয়েছিল। প্রসন্নকে সঙ্গে নিয়ে চণ্ডীবউ পালকি করে ক্ষমাযোগিনীর বাড়ি থেকে ফিরছিল যেদিন। দত্তবাড়ি থেকে লাল পালকি বেরুতে দেখে মোহগ্রস্তের মতই অনুসরণ করেছিল। তারপর মাঠের ধারে কদমসারির তলায় এসে দাঁড়িয়ে গেছল। পালকি আবার না ফেরা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়েই ছিল। পালকি ফিরতে দেখেই বুকের ভিতরে দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছল। তারপরেই শুদ্ধ।...পালকির ঢাকনা সরিয়ে চণ্ডী বউ মুখ বাড়িয়েছিল। তার চোখে চোখ পড়েছিল। কয়েক পলকের সেই বিমূঢ় দৃষ্টি-প্রাসাদের ভিতর দিয়ে একটা কল্পের অবসান যেন। চণ্ডীবউ কতটা চমকে উঠেছিল, চমকে উঠে কতটা দিশেহারা ব্যস্ততায় পরদা টেনে দিয়েছিল তা দেখলেও চোখের ঘোর কাটে নি তার। সামনে দিয়ে পালকি চলে গেছে। যত দূরে গেছে তারও ভেতরটা ধান-কাটা ক্ষেতের মত ততো শূন্য হয়ে গেছে। আর তারপর এক অশরীরী যাতনা বুঝি হাড়-পাঁজরের ভিতর দিয়ে নামা-ওঠা করেছে।

না, দত্তবাড়ির চণ্ডীবউকে কেন্দ্র করে তার ঠাট্টা-বিদ্রূপ কথা যতটা রটেছে, অতটা অশালীন উক্তি মদনমোহন সত্যিই করে নি কেনোদিন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের চোখে ধূলো দেবার জন্যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ অবশ্যই করেছে একটু-আধটু। সেটুকুই চারখানা হয়ে কানে গেছে সকলের। নিজেরাও বানিয়েছে অনেকখানি। তাছাড়া মদনমোহনের বিদ্রূপের ধারাবর্ষণ সবটুকুই রাধানাথকে লক্ষ্য করে। টাকা দিয়ে রাধানাথ বাইরের গুণ্ডা লাগিয়ে তাকে একেবারে শেষ করার অথবা পঙ্গু করার চেষ্টায় মেতেছে খবরটা ফাঁস হওয়া মাত্র। মদনমোহন সত্যিই ফুঁসে উঠেছিল। আর সেই মুখে যা বলেছিল তাও মিথ্যে নয়।

কিন্তু যত দাপটই দেখাক বাইরে, ভিতরের দুর্দশার খবরটা নিজের কাছে তো গোপন নেই। কিছুই ভালো লাগত না। নিজের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পর্যন্ত দুর্বহ রকমের ভারী ঠেকত। তার আচরণে অতি অন্তরঙ্গ জনেরাও কি ভাবছে বা কি সব কানাকানি করছে সেদিকে তার চোখ ছিল না, কান ছিল না, মন ছিল না। একটানা এমনি আচ্ছন্নের ঘোরে দুটো বছর কেটেছে তার।

তারপর সেই বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে, সেই মহাচণ্ডীর থানে তেমনি নির্বাক কিন্তু প্রচণ্ডতর আর এক ধাক্কা। স্বপ্নের ঘোরে যেন একটিমাত্র সচল লক্ষ্যবর্তিকার অনুসরণে মগ্ন ছিল সে। এই লক্ষ্যের অগ্রভাগে আর কেউ ছিল না, আর কিছু ছিল না। স্থান-কাল, মেলা, কাতারে কাতারে মেয়ে-পুরুষের মিছিল, উৎসব-কলরব—সব মুছে গেছল। সেই লক্ষ্যবর্তিকার কখনো কাছে এসেছে, কখনো বা ভিড়ের ঠেলায় পিছনে পড়ে গেছে খানিকটা—কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি।

আচমকা বিদ্যুৎ ঝলসে গেল একপ্রস্থ। সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের আঘাতে জড়পদার্থের মতই অনড় হয়ে গেল বুঝি মদনমোহন। চণ্ডীবউ ঘুরে দাঁড়াল, হাতের অশান্ত ঝটকায় মাথার ঘোমটা খসিয়ে দিল। রমণীর দৃপ্ত রোষের নির্বাক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল একটা। তার পাঁচ হাতের মধ্যে চোখে চোখ রেখে অবগুণ্ঠনমুক্ত যে রমণী দাঁড়িয়ে, সে বুঝি পারে এই দুনিয়াটাকে উল্টেপাল্টে দিতে।

এ ধাক্কাটা সামলাতে সময় একটু লেগেছে বটে, কিন্তু মদনমোহনের ঘুম ভেঙেছে। একটানা দু'বছরের একটা স্বপ্নের গহ্বর থেকে নিজেকে সে টেনে তুলেছে। তার মগজের কোষে কোষে সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেখান থেকে দেহের শিরায় শিরায় চেতনার তাপ ছড়িয়েছে।

দীর্ঘদিনের এই ক্লীবতার জন্য নিজেকে শত ধিক্কার দিয়েছে মদনমোহন। ওই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের জবাব যে নিষ্ক্রিয় আচ্ছন্নতা নয়, সেটা যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। আর তারপর করণের মাটিতে পুরুষের মত পা ফেলে চলার এক অস্থির তাড়না তাকে চঞ্চল করেছে। এই তাড়না নিয়েই সে সুহৃদজনের দলে এসে দাঁড়িয়েছে আবার।

এদিকে কিছু একটা করার মত পটভূমিও প্রস্তুত। দত্তপাড়ার নতুন বারইয়ারীর ভাবী প্রাসাদ ক্ষয়-ধরা দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর পৃষ্ঠপোষকদের বিচলিত করেছে। মদনমোহন আবার সজীবতার মধ্যে ফিরে আসার একটা পথ পেল যেন। নীরস পথও নয়। ওই বারইয়ারী আবির্ভাবের নেপথ্যে দাঁড়িয়ে দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ। দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর নতুন যাত্রায় প্রাকাশ্যে এসে দাঁড়াবে ঘোষালবাড়ির মদনমোহন।

তাই দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর নিষ্প্রভ দশা নিয়ে দিশেহারা আলোচনার মুখে তার প্রত্যয়বঞ্জক ঘোষণা শোনা গেল, এই বারইয়ারীও আমরা ঢেলে সাজাব, এও আবার মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবে।

কি করে, কি করে গো মদনমোহন? সকলের কৌতূহল আর উৎসাহ একসঙ্গে মুখর হয়ে উঠল।—কেমন করে ঢেলে সাজাবে, কেমন করে মাথা উঁচোবে? ওদের মত নতুন দালান তুলবে নাকি?

না। দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর যে রঙ আমাদের মনে লেগে আছে ঠিক সেই রকম করে আবার এর রঙ ফেরাব—সেটা দালানকোঠায় রঙ নয়, দশ গাঁয়ে সাড়া পড়ে যায় এমনি এক-একটা উৎসবের রঙ। অবশ্য এই দালানেরও সংস্কার কিছু করতেই হবে—

নবীনদের উল্লাসের মুখেই প্রবীণদের কথায় ভাঁটার টান ধরার দাখিল। তারা বলল, তা তো করবে, ওই নতুন রঙ ফেরাতে টাকা তো কম লাগবে না—অত টাকা আসবে কোথা থেকে?

মদনমোহনের আত্মপ্রত্যয়ে এতটুকু চিড় খেল না। জবাব দিল, ঠিক আগের দিনে যেমন করে আসত, টাকার জন্য দল বেঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে এমন কি দূরের শহরগুলোতে গিয়েও হানা দেব—টাকা না দিয়ে পার পাবে কি করে!

এবারে নবীনদের উল্লাসের নীচে প্রবীণদের সংশয় তলিয়ে গেল। অর্থাৎ মদনমোহন নিশান ধরলে আগের দিনের বারইয়ারী-অন্ত-প্রাণ মানুষদের মতই চাঁদা আদায়ের রোমাঞ্চকর অভিযানে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত তারা।

রোমাঞ্চকর অভিযানই বটে।

করণের দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর সঙ্ঘবদ্ধ চাঁদা আদায়ের অভিযানের খবর আশপাশের পাঁচ-দশখানা গ্রাম ছাড়িয়ে শহরেও পৌঁছুল। অর্থাৎ আগের দিনের মত ওই না-ছোড় দলটি শহরে এসেও যে হানা দেবে তাতে কারো সন্দেহ থাকত না। অবস্থা যাদের ভালো নয় তারা খুশি, আর অবস্থা যাদের ভালো তারা সচকিত।

করণের দক্ষিণপাড়ার ঐতিহ্যের মতই এই চাঁদা আদায়েরও এক স্মরণীয় ঐতিহ্য আছে। চাঁদা আদায়টা তখন দাতার সদিচ্ছা অথবা কৃপার ওপর নির্ভর করত না। দাতার অবস্থাবিশেষে চাঁদার অঙ্ক আদায়কারীরাই স্থির করত; তা না পেলে কখনো তোয়াজ-তোষামোদ করত না। ছলে বলে বা কৌশলে সেটা আদায় করে নিত। আর সেই আদায় করার বাহাদুরিটাই লোকে চট্ করে ভুলত না।

মদনমোহনের দলটিও সেই ঐতিহ্যের পুঁজি নিয়েই সোৎসাহে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। করণের বারইয়ারীর উন্নতির জন্য কি কাণ্ডই না করেছে এককালের নমস্য ব্যক্তিরা। অবশ্য তখন চাঁদা আদায়েব অভিযানে যাঁরা বেরুতেন তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্রাহ্মণের পৌরাণিক তেজ আর অভিমানও তাঁরা কাজে লাগাতে ছাড়তেন না। এর ওপর ছলাকলার প্রয়োগ তো আছেই।

এ প্রসঙ্গে সবার আগে তাদের মনে পড়বে করণের দক্ষিণপাড়ার এই বারইয়ারীর ভাণ্ডারে ডাকসাইটে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহর টাকাব থলে উজাড় করার গল্প। আগে থাকতেই সেদিনের ব্রাহ্মণরা খবর পেয়েছিলেন দক্ষিণপ্রান্তের গঙ্গা ধরে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বজরা আসছে—তিনি কোন্ পুণ্যতীর্থে না কোথায় চলেছেন।

বারইয়ারীতে অর্থদানের মত পুণ্য আর কি আছে? অতএব আগে থাকতে দল বেঁধে এই বারইয়ারীর পূর্বপুরুষেরা গঙ্গাতীরে এসে হাজির। সাধারণত চাঁদা আদায়ের যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে দলকে-দল এক মার্কামারা ছাপ নিয়ে বেরুতো। সকলের মাথায় বাবরি চুল, পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি, প্রায় হাঁটু ছোঁয়া লম্বা ধপ্‌ধপে মোটা পৈতে, আর আদুড় গায়ে সাদা চাদর।

কিন্তু এই চেহারা আর সাজপোশাকে গঙ্গাপথে গঙ্গাগোবিন্দের বজরার গতি রোধ করবেন কি করে তাঁরা? সকলেই জানেন কেমন রাশভারী দাপটের মানুষ ওই সিংহ মশাইটি। হয়ত তাঁদের দিকে দৃকপাত না করেই চলে যাবেন। অতএব সাজসজ্জা বদলালেন তাঁরা। সকলের মল্লবেশ, হাতে মোটা মোটা দড়ি কাছি। বজরা দেখামাত্র সকলে একসঙ্গে বীরদর্পে তারস্বরে চিৎকার-চেঁচামেচি লম্ফ-ঝম্প আর গর্জন শুরু করে দিলেন।—কোথায়? সিংহ কোথায়? সিংহ কোথায়? আমরা একবার তাকে দেখতে চাই! সিংহ যদি সত্যিই নির্ভেজাল সিংহ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের সামনে একবার বেরিয়ে আসুক!

অত লোকের সেই বিপুল তর্জন-গর্জন আর উক্তি কানে আসতে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বজরার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর নির্দেশে বজরাও পারের দিকে ঘেঁষল।

সঙ্গে সঙ্গে পারের দলের গর্জন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সমস্বরে চিৎকার করে তারা হুমকি ছাড়ল, সিংহমশাই, আমরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি।

কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে অনুমান করেই সিংহমশাই সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার অপরাধ?

অপরাধ! ক্রোধে যেন অগ্নিবর্ণ বারইয়ারীর বিগত পাণ্ডার দল।—অপরাধ কি একটু-আধটু! মহামায়া এবারে তোমার কাঁধে চেপে করণে আসবেন স্থির করেছেন আর তুমি এমন সিংহ যে এ-পথ দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছ! তাই আমরা এসেছি তোমাকে বেঁধে নিয়ে যেতে—

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বে-রসিক নন, দলটির মতলব ভালই বুঝলেন। টাকা আদায়ের অভিনব পন্থা দেখে পরিতুষ্ট হলেন তিনি। জবাব দিলেন, সিংহ তো বাঁধন মানে না, এখন উপায় কি বলো।

তারা সমস্বরে আবার চেঁচিয়ে উঠল, এ অপরাধের একমাত্র দণ্ড অর্থদণ্ড—আর কোনো উপায় নেই।

স্বেচ্ছায় ভালো রকমই দণ্ড দিয়ে গেলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

দ্বিতীয় যে কাহিনীটি বারইয়ারীর চাঁদা আদায়ের প্রাচীন আখ্যানে উজ্জ্বল হয়ে আছে, তার নায়ক দীনু ঘোষাল, ওই ঘোষাল বংশেরই একজন। মদনমোহনের পিতামহর জ্ঞাতিকুলের মধ্যে ওই এক কারণে দীনু ঘোষালের নামটি অমর হয়ে আছে।

গাঁয়ের এক ধনী ব্যক্তি শহরে বসবাস করতেন। লোকটি কৃপণ তো বটেই, আবার টাকার দেমাকে রাগী মানুষও। চাঁদার জন্য জ্বালায় বলে গাঁয়ের বারইয়ারী বা তার পৃষ্ঠপোষকরা দু'চক্ষের বিষ। তা বিষ হোক আর যাই হোক, গাঁয়ের লোকেরা যখন দল বেঁধে শহরে এসে তাঁর বাড়িতে উঠেছে, অতিথিসৎকার না করেই বা করেন কি?

ওদিকে ঘটনাক্রমে সেইদিনও ওই ধনী মানুষটির পরম পূজনীয় এক খোঁড়া গুরুঠাকুর এসে হাজির তাঁর বাড়িতে। অতএব দু'পর্যায়ের অতিথিদের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা হল। গুরুঠাকুরের রান্নার ষোড়শ উপকরণ এলো, তাঁর রান্নার জন্য ভালো জ্বালানী কাঠ এলো। অক্লেশেই তিনি তাঁর রান্না সম্পন্ন করে নদীতে স্নান করতে গেলেন। স্নানান্তে সানন্দে গুরু-ভোজন সম্পন্ন করার বাসনা।

ওদিকে চাঁদা আদায়ের দলের জন্য যে ভোজনের উপকরণ এসেছে, তা যেমনই অপ্রতুল তেমনি কদর্য। তার ওপর তাদের কপালে জুটল ভিজে কাঠ। গৃহস্বামীর উদ্দেশ্য সরল। এই গোছের অসুবিধে দেখে দলটি যাতে জাঁকিয়ে না বসে চটপট প্রস্থান করে।

দলপতি দীনু ঘোষালেরও তেমনি বাধা। চটপট মতলব স্থির করে ফেললেন তিনি। মতলব আর কিছু নয়, ভিজে কাঠের ধোঁয়ায় চোখের জল না ফেলে গুরুঠাকুরের জন্য যা রান্না হয়েছে তাই ভোজন করাটা অনেক সহজ এবং উপাদেয় ব্যাপার হবে। কিন্তু অতিথি হয়ে এসে অশোভন কিছু করতে পারেন না। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু না হয় এমন কিছুই করতে হবে।

অতএব পরামর্শ মত সাঙ্গোপাঙ্গোরা সব ভীতসন্ত্রস্ত মূর্তিতে গুরুঠাকুরের ভোজনস্থলের কিছু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর দীনু ঘোষাল গুরুঠাকুরের রান্না-করা অন্নব্যঞ্জন আগলে বসে রইলেন। তাঁর তখন রুক্ষ ভয়াবহ মূর্তি। উসকো-ফুসকো চুল, লাল চোখ। বসে আছেন, আর মাঝে মাঝে খ্যাঁক খ্যাঁক করে সামনে যাকে দেখছেন তাকেই তাড়া করে আসছেন। খোঁড়া গুরুঠাকুর ফিরতে তাঁর সেই ভয়াবহ বিসদৃশ আচরণ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। দূরে দূরে দাঁড়িয়ে সকলে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কি ব্যাপার?

শোকের মুখ করে সঙ্গীরা জানালেন, মহা বিপদে পড়েছেন তাঁরা—দীনু ঘোষালকে শেয়ালে কামড়েছে, উন্মত্ত হয়ে এখন তিনি যাকে সামনে পাচ্ছেন তাকেই কামড়াতে আসছেন। বলতে না বলতে খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দে উন্মাদ সদৃশ দীনু ঘোষাল তেড়ে এলেন গুরুঠাকুরটির দিকেই।

প্রাণে বাঁচলে অনেক গুরু-ভোজনের সুযোগ মিলবে, অতএব প্রাণটি হাতে করেই গুরুঠাকুর খোঁড়া পায়ে চোঁ-চোঁ দৌড়। খানিক বাদে শেয়াল-পাগলের উন্মত্ততা কমে এলো। ধীরেসুস্থে সকলে মিলে তখন গুরুঠাকুরের অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গতি করতে বসলেন।

কিন্তু বারইয়ারীতে চাঁদা দেওয়ার প্রসঙ্গে গুরুঠাকুটির এ ব্যাপারের আগেই যথাবিধি সৎ পরামর্শ দিয়ে গেছলেন। বলাবাহুল্য সেই পরামর্শ অনুযায়ী সামান্য চাঁদাই মিলল। একে অতিথিসৎকারের অপমান তার ওপর আবার এই!

অতএব ভেবেচিন্তে ঠাণ্ডা মাথায় দীনু ঘোষাল ঘোষণা করলেন, পরদিন ধর্মসংক্রান্ত একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করবেন তাঁরা, তাব জন্য একটি গুণীজনের সভা ডাকতে হবে।

ধর্মসংক্রান্ত জটিলতার মীমাংসায় সকলেরই আগ্রহ। এ ব্যাপারে বাধা দেওয়ার রীতি নেই। পরদিন সভা ডাকা হল। সভায় উক্ত গুরুঠাকুর, তাঁর ধনী শিষ্য হাজির—আর হাজির পণ্ডিত ব্যক্তিরা। দীনু ঘোষাল সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন, যদি কোনো ঠাকুরের অঙ্গহানি হয় তাহলে সে-ঠাকুরকে কি করা কর্তব্য?

সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে সায় দিলেন, সেরূপস্থলে উক্ত ঠাকুরকে নদীতে বিসর্জন দেওয়াই বিধি।

ব্যস, আর কথা নেই, একলাফে সসঙ্গী দীনু ঘোষাল আচমকা সেই গুরুঠাকুরের উপর চড়াও হয়ে তাঁকে কাঁধে তুলে ফেললেন। তারপর তাঁরা ঘোষণা করলেন, এই ঠাকুরটির এক পা খোঁড়া, আপনাদের সুব্যবস্থা অনুযায়ী এঁকে আমরা সলিলসমাধি দেব।

সকলের বিমূঢ় চোখের ওপর দিয়ে সত্যিই তাঁরা তাঁকে নদীর দিকে নিয়ে চললেন। আর সেই ফাঁকে তাঁকে বুঝিয়েও দিলেন তাঁদের ক্রোধের কারণখানা কি।

গুরুঠাকুরের অনুনয়-বিনয়, শেষে কান্নাকাটি। সর্বশেষে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, এই শিষ্যসমেত আরো কয়েকটি ধনী শিষ্যবাড়ি থেকে আশার অতিরিক্ত চাঁদা তিনি পাইয়ে দেবেন।

যেমন কথা তেমন কাজ। গুরুঠাকুর তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। তাঁর কৃপায় বারইয়ারীর জন্য সত্যিই আশাতিরিক্ত চাঁদা সংগ্রহ হয়েছিল সেবার।

দীনু ঘোষালের আরো কীর্তি অমর হয়ে আছে।

ভিন গাঁয়ের এক বড়লোক বুড়ো চাঁদার নামে ক্ষেপে উঠতেন। তাঁর নাম করলে নাকি উনুনের হাঁড়ি ফেটে যেত। বারইয়ারীর চাঁদা তোলার দল বেরিয়েছে শুনেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, একটা কানা-কড়িও মিলবে না তাঁর কাছে।

ক'টা দিন কেটে যেতে কিপটে বুড়ো একটু নিশ্চিন্তে বোধ করলেন। ভাবলেন হুমকি কানে গেছে বলেই বোধ হয় নচ্ছার ছেলের দল আর উত্ত্যক্ত করতে আসে নি।

কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত তাঁর মাথায়। একদিন খবর পেলেন সেই রাতেই ডাকাত পড়বে তাঁর বাড়িতে। দুর্ধর্ষ কোন্ এক ডাকাতের দল তাঁর টাকার সন্ধান পেয়ে পদধুলি দিতে আসছেন খবর পাঠিয়েছেন। তা সে-সময়ের দুর্ধর্ষ ডাকাতেরা জানান দিয়েই আসত অনেক সময়।

কিপটে বুড়োর থরহরি কম্প শুরু হল। সাহায্যের জন্য গাঁয়ের লোকদের হাতে পায়ে ধরলেন তিনি। মুখে অনেকেই আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু টাকার গরমে দেমাকী ওই কিপটে বুড়োকে দু'চক্ষে কেউ দেখতে পারে না। তাছাড়া ঘাড়ের ওপর কার ক'টা মাথা আছে যে জানান-দেওয়া ডাকাতের সঙ্গে লাগতে যাবে? প্রাণের মায়া কার নেই? অতএব কেউ যে সাহায্য করতে আসবে না মনে মনে বুড়োর তা জানতে বাকি নেই। তবু প্রাণের দায় বড় দায়।

ঘটনাচক্রে সেই সম্ভাব্য দুর্যোগের দিনই দলবলসহ দীনু ঘোষাল এসে হাজির। বুড়ো হাতে প্রাণ পেলেন যেন। জামাই-আদরে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁদের। বললেন, চাঁদা দেবেন, বেশ ভালো চাঁদাই দেবেন—তবে এক শর্তে। দলবলসহ দীনু ঘোষালকে রাতটা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। কোন্ এক ডাকাতের দলের উৎপাত হচ্ছে, এখানেও হামলা হবার সম্ভাবনা। তা জনমানুষকে নিরাপদে রাখাও তো বারইয়ারীর নির্ভীক ভালোমানুষদের কর্তব্য!

বুড়ো জানেন, মানী ডাকাতরা কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেন না—আসবেনই তাঁরা মোকাবিলা করতে। আর না যদি আসেন তাহলে নির্দিষ্ট দিনের পরে এসে আর বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। মোট কথা এ-রাতটা যদি কাটে তাহলে কাল-রাত্রিই কাটল একটা ধরে নিতে হবে।

সোৎসাহে দীনু ঘোষাল আর তাঁর সঙ্গীরা কোমর বেঁধে বাঁশ লাঠি-সোঁটা কেটে এনে প্রস্তুত। ছুরি-ছোরাও কিছু যোগান দিলেন কিপটে বুড়ো। দীনু ঘোষালের দল প্রস্তুত, কথা-মত আসেই যদি ডাকাতের দল একটিকেও আর ধড়ে মাথা নিয়ে ফিরতে হবে না। এদিকে কিপটে বুড়ো কাঁপতে কাঁপতে তাঁদের ষোড়শ উপচারে সেবার ব্যবস্থা করলেন।

কার-রাত্রি সত্যিই কাটল। ডাকাত এলো না। কিপটে বুড়োর নতুন প্রাণ, নতুন জীবন। তিনি ভাবলেন, তাঁর ব্যবস্থার খবরও ডাকাতরা পেয়েছে বলেই এলো না। হৃষ্টচিত্তে দরাজ হাতেই তিনি বারইয়ারীর চাঁদা গুনে দিলেন দীনু ঘোষালের হাতে।

খানিক বাদে, অর্থাৎ ভালো করে রোদ জাগার আগেই গাঁয়ের লোক-ছুটতে ছুটতে কিপটে বুড়োর বাড়ি এসে হাজির। কিন্তু বুড়ো বেশ খোশ-মেজাজে আর বহাল তবিয়তে আছেন দেখে যেন আকাশ থেকে পড়ল তারা। বলল, তবে যে

ওই বারইয়ারীর চাঁদা-তোলাওয়ালারা বলে গেল, ডাকাতের দল কথা রেখেছে, আর এসে যা নেবার নিয়েও গেছে!

শুনে কিপটে বুড়ো হতভম্ব।

দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর চাঁদা আদায়ের এমনি সব সোনার ঐতিহ্যের স্মৃতি আর উদ্দীপনায় বুকের ছাতি দশ হাত করে নিয়ে চাঁদা তোলার অভিযানে অবতীর্ণ স-কর্ণধার মদন ঘোষালের সাঙ্গোপাঙ্গরা। তারাও বাবরি চুল রেখেছে মালকোঁচা মেরেছে, কাঁধে চাদর ঝুলিয়েছে।

বেশ পরিবর্তন করে নি শুধু দল-নায়ক মদনমোহন।

তবু, তাদের বেলাতেই বা গাঁয়ে গাঁয়ে সাড়া পড়ে যাবে না কেন?

বারইয়ারীর পুরনো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দীপনায় দল-নায়ক মদনমোহনকে সামনে রেখে প্রথমেই গাঁয়ের বাইরে পা বাড়ালো। বলা বাহুল্য, চিরাচরিত মানব-রীতির ধারায় সাধারণ মানুষেরা খুশির অভ্যর্থনা জানালো, আর বিত্তবানেরা বিরক্ত হল। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা জোয়ারের জলের মত বিত্তবানের ঘরের দিকে ধাওয়া করলে ঝামেলা এড়ানোর জন্যেও অনেক চাঁদা দিয়ে ফেলে অব্যাহতি পেতে চায়। চাঁদা মন্দ উঠতে লাগল না। অতএব উৎসাহের আতিশয্যে অভিযানের পরিধিও বেড়ে চলল।

সেই সঙ্গে বাড়তে থাকল করণের সনাতন বারইয়ারীর সম্পর্কে সম্ভাব্য নবতর চিত্রের রটনার চটক।...কি হবে বারইয়ারী সংস্কারের পর? কী হবে না তাই শুধোও মিতেনরা। আগের মতই বারইয়ারী দিবস পালন করা হবে ঢালা তিন দিন তিন রাত—সেই বৈশাখি-পূর্ণিমার দিন থেকেই। সেই তিন দিন করণের অতিথি তোমরা—দল বেঁধে যাবে, যে বাড়িতে খুশি সেই বাড়িতে আতিথ্য নেবে—চেনা-পরিচয়ের কিছু দরকার নেই। যে গৃহস্থবাড়িতে উঠবে সে-ই তোমাকে আহার আর বাসস্থান দিতে বাধ্য হবে ওই তিনটি দিন—করণের সমস্ত মাতব্বর জনেরা একত্র হয়ে এই সিদ্ধান্ত করেছেন, আর গাঁয়ে ঢেরা পিটিয়ে প্রতিটি গৃহস্থকে তা জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা জানল, উৎসবে দান-ধ্যান যাগযজ্ঞ হবে, আর আনন্দসন্ধানীরা জানল, তিন দিন দিবারাত্র খেমটা বাঈনাচ ঢপ তরজা কবিগানের বন্যা বয়ে যাবে, এমন কি ছোটোখাটো ব্যবসায়ীরাও শুনল, উৎসবের ওই তিন দিন করণের দক্ষিণপাড়ার উৎসবে গিয়ে দোকানপসরা সাজিয়ে বসলে লাভ মন্দ হবে না। সেই লাভের আশায়ও সাধ্যমত যে যা পারল দিল।

উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর হয়ে রাণাঘাট, শান্তিপুর কৃষ্ণনগর পর্যন্ত চষে এসে যেন দিগ্বিজয় করে ফিরল দলটি। মদনমোহনের স্বর্গত পিতাটি পরিচিত এবং মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন অনেকের। তারই ছেলে সনাতন সংস্কৃতির উৎসটি পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চাইছে জেনে কোনো কোনো অবস্থাপন্ন শুভার্থী নগদ টাকা ছাড়াও বাৎসরিক বৃত্তির প্রতিশ্রুতি দিলেন। করণের দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর ঐতিহ্যের খবর কে আর না রাখে?

এই অর্থসংগ্রহের দিগ্বিজয় সম্পন্ন করে সদলবলে মদনমোহন বীরের মতই ফিরল যখন, করণের সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল। সংগ্রহের অঙ্কটা লোকের মুখে মুখে স্ফীত হতে থাকল। প্রতিশ্রুতির অঙ্কও কম পুষ্ট হয়ে উঠল না। কিন্তু আগের কালের

মতই করণের মেয়ে-পুরুষের মনে রোমাঞ্চের ইন্ধন যোগালো অর্থ সংগ্রহের এক-একটা রসপুষ্ট কেরামতির কাহিনী। বিনা আয়াসে অর্থ যাঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে, তাঁদের নিয়ে কে মাথা ঘামায়! টাকা যারা দিতে চায় নি, কি-কি কলা-কৌশলে তাদের ঘায়েল করে টাকা আদায় করা গেছে সেই আখ্যানগুলোই ডালেপালায় ছড়িয়ে পড়ল। যারা শুনল—শুনল তো বলতে গেলে সকলেই—তারা একবাক্যে স্বীকার করল, এ ব্যাপারেও পুরনো ঐতিহ্যের মান রেখেছে বটে মদনমোহন। গোল হয়ে বসে কতবার যে এই রসের কাহিনী শুনল সকলে, ঠিক নেই।

...শিবগঞ্জের কানা কেপ্পনকে নিয়ে কি কাণ্ড করল আমাদের মদনমোহন শোনো একবার। একজন অভিযাত্রী বিস্তার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ-তিরিশ জন উন্মুখ।

কি করল, কি করল মদনমোহন, কানা কেপ্পনই বা কে?

আরে ভাই সে এক মস্ত টাকাঅলা লোক, কলকাতা থেকে ব্যবসা গুটিয়ে শিবগঞ্জে প্রাসাদ হাঁকিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিন কাটাচ্ছে। লোকটার এক চোখ কানা, চোখে কলকাতার চশমা। চাঁদা চাইতেই লোকটা হবে না বলে আর একদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। মদনমোহন তখন এপাশ থেকে ভদ্রলোকের ওপাশে ঘুরে গিয়ে আবার ঠাণ্ডামুখে চাঁদা চাইলে। রেগে গিয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করল, বললাম হবে না, আবার এদিকে ঘুরে আসার অর্থ কি?

সবিনয়ে মদনমোহন জবাব দিল, আপনার ওদিকের চোখটা ঠিক নেই, ভাবলাম ওদিক থেকে চাঁদা চেয়েছি বলেই মন্দ বরাত, তাই এদিকে ঘুরে এসে চেয়ে দেখছি বরাত ফেরে কিনা।

লোকটা ঝাঁজিয়ে উঠল, ফিরবে না, কিচ্ছু হবে না।

মুখের ওপর মদনমোহন জিজ্ঞাসা করল, কেন হবে না?

লোকটা জবাব দিল, অপব্যয় পছন্দ করি না, তাই হবে না।

মদনমোহন ঠাণ্ডা প্রশ্ন ছুঁড়ল, তাহলে অপব্যয় করেন কেন?

লোকটা অবাক, আমি অপব্যয় করি। আমি?

হ্যাঁ, আপনিও বাজে খরচ করেন, আপনার একটি বই চোখ নেই, তবু দু'চোখে চশমা লাগিয়েছেন কেন?

লোকটা অবাক খানিকক্ষণ, তারপর বলল, ঘাট হয়েছে বাবারা, দিচ্ছি চাঁদা, নিয়ে যাও।

শেষ হতে না হতে আর একজন বললে, আর ডিহিদুগড়ার ব্যাপারখানা? এ কাহিনীর বৈচিত্র্য করুণরসাত্মক, কিন্তু শ্রোতাদের কাছে নীরস নয় একটুও।

ডিহিদুগড়ার একঘরে ঘোষের নাম কিছু আছে একটা, কিন্তু সে আর কারো মনে নেই। পয়সার গরমে সমাজ-বিধান অমান্য করতে দেখে সে-এলাকার মুরুব্বি সৎ ব্রাহ্মণরা একঘরে করেছেন তাকে। ঘটনা আর কিছু নয়, একঘরে ঘোষের একটা সুশ্রী বিবাহিতা মেয়ে ছিল ঘরে। জামাইটা পাষণ্ড বলে মেয়ে তার ঘর করত না, বাপের কাছেই থাকত। বাপের আদরের মেয়ে। তা সেখানকার এক বামুনের ছেলে সেই মেয়েটাকে ফুসলে বার করে নিয়ে যায়। যার ফলে সর্বত্র টি-টি। বামুন মাতব্বরেরা এসে জানালো, এত বড় অনাচারের যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত না হলে সব রসাতলে যাবে, অতএব প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আর অর্থদান বস্ত্রদানসহ

ভালো করে খাওয়াতে হবে। মেয়ের ব্যাপারে এমনিতেই আগুন জ্বলছিল ঘোষের মাথায়, তার ওপর মেয়েকে নিয়েও গেছে এক বামুনের ছেলে। ঘোষ ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, বামুনদের নোলায় আগুন দিতে পারলে যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত হবে।

এত বড় দুঃসাহসের প্রতিফল স্বরূপ ঘোষকে বিধিমত একঘরে করা হল, একমাসও হয় নি, ক্রুদ্ধ ঘোষ অচল, অটল। মনে মনে স্থির করেছেন, এই স্থান ত্যাগ করে চলে যাবেন, তবু প্রায়শ্চিত্ত করবেন না।

হঠাৎ একদিন, যে মধ্যাহ্নে করণের চাঁদা আদায়ের দল সেখানে হাজির—সে সকালেই গাঁ-সুদ্ধ তোলপাড়। ঘোষেদের পুকুরে একটি মেয়েছেলে ভেসে উঠেছে—ঘোষেরই মেয়ে। রাতের অন্ধকারে এসে নিজের শাড়ির আঁচলে হাত পা জড়িয়ে নিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ব্যস, এইবার যেন যোগ্য প্রতিশোধের মওকা পেল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল। তাদের হুকুম ভিন্ন শবদাহ করার ব্যবস্থায় এক পা এগিয়ে আসবে না, তা ছাড়া আত্মহত্যার দেহ বামুনের মন্ত্র-তন্ত্র ভিন্ন তার সদ্গতি হবে কেমন করে?

ঘোষের বাড়ির দিকে যেতে যেতে মদনমোহনের দল আদ্যোপান্ত শুনেছে। বেলা তখন দ্বিপ্রহর। মেয়ের মৃতদেহ সামনে নিয়ে পাথরের মতো বসে আছেন একঘরে ঘোষ। বাড়ির মেয়েরাও স্তব্ধ। কেউ শোক পর্যন্ত করতে পারছেন না।

পরিচিতজনের মত মদনমোহন তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, নিন উঠুন ঘোষমশায়, আর দেবি করা চলে না, আমরা এসে গেছি যখন আর আপনি কিছু ভাববেন না।

ঘোষমশায় ফ্যালফ্যাল করে দেখলেন সকলকে, তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, কে বাবা তোমরা?

আমরা করণের বারইয়ারীর লোক, কিন্তু করণের বারইয়ারীর লোকেরা আমোদ-আহ্লাদই করে না—এব্যাপার শুনে ছুটে না এসে পারি কি করে?... শুদ্ধির প্রশ্ন কেউ তোলে তো বলে দেবেন, করণের ওমুক ঘোষালের ছেলে এসে নিজের হাতে সব কাজ করে দিয়ে গেছে।

একঘরে ঘোষের আর তাঁর বাড়ির মেয়েছেলেদের দেহে প্রাণের সঞ্চার হল যেন এতক্ষণে। ঘোষমশাই দ্বিধান্বিত মুখে বললেন, কিন্তু বাবা তোমরা বামুনের ছেলে হয়ে শূদ্রের শবদাহ করবে?

মদনমোহন জবাব দিয়েছে, কায়েতও আছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু এ কাজ করলে বামুনের ছেলেদেরও কিছু পাপ লাঘব হবে, এজন্য আপনি কিছু ভাববেন না।

করণের বারইয়ারীর দল বিধিমত বেশ ঘটা করেই ঘোষমশায়ের দায়উদ্ধার করে দিলে। বিদায়ের আগে ঘোষমশাই বললেন, তোমরা দেবদূত, কিন্তু কেন তোমরা এখানে এসেছিলে তাও শুনেছি, একটু সবুর করো বাবারা।

ভিতরে গিয়ে যা তিনি এনে দিলেন মদনমোহনের হাতে, অত চাঁদা এক-সঙ্গে আর কেউ দেয় নি।

রাণাঘাটের দরোয়ান-ডাকা ধনী গৃহীর গল্পটাও কম মুখরোচক নয়।

...রাশভারী সেই ধনী ব্যক্তিটির আবার ব্রাহ্মণত্বের অভিমান বেশি। কোনো অনাচার

কদাচার বরদাস্ত করতে পারেন না, এ-সংবাদটা তাঁর বাড়িতে হানা দেবার আগেই শোনা গেছল। বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হুমকি শোনা গেল, এখানে কিছু হবে না, পথ দেখো।

মদনমোহন সবিনয়ে জবাব দিল, চাঁদা না পেলে যাই কি করে?

ব্রাহ্মণ খেঁকিয়ে উঠলেন, বলেছি তো এক পয়সাও হবে না, শেষে কি দরোয়ান ডাকতে হবে?

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মদনমোহন বলল, আপনি ব্রাহ্মণ সন্তানদের সঙ্গে এরকম দুর্ব্যবহার করছেন কেন?

সরোষে ব্যঙ্গ করে উঠলেন ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণসন্তান তোমরা! তোমাদের ব্রাহ্মণত্বের আছে কি?

মদনমোহন তেমনি জবাব দিলে, সবই আছে, একবারে নির্ভেজাল সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বলতে পারেন।

বটে! বটে! রোষে মুখ রাঙা ভদ্রলোকের।—হাঁ করো তো বাছারা, সাগ্নিক বামুনদের মুখে আগুন দেখি!

মদনমোহন জবাব দিল, মাত্র ওই আগুন থাকলে হাঁ করতে হবে, ফুঁ দিতে হবে, তবে আগুন বেরুবে—আমাদের কেরামতি তার থেকেও বেশি। আপনি অত দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, তবু আমাদের দেখেই জ্বলে উঠলেন একেবারে—কোন্‌টা বেশি হল মশাই?

ব্রাহ্মণ হাঁ খানিক। তারপর হা-হা করে হেসে উঠে ঘরে এনে বসালেন, জলযোগ করালেন, তারপর খুশিমনে চাঁদা দিয়ে বিদায় করলেন।

মোট কথা দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর চাঁদা আদায়ের রোমাঞ্চকর প্রহসন নিয়ে করণের মানুষ পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। অনেকেই বিশ্বাস করল, করণের বারইয়ারীর সেই পুরাতন যুগ সত্যিই ফিরে আসছে। আর সেই রটনাটা এত প্রখর হয়ে উঠল যে রাধানাথের নতুন চকমিলানো বারইয়ারীর দালানও নিষ্প্রভ হবার দাখিল। চাঁদা আদায়ের এক-একটা গল্প শোনে আর রাধানাথ জ্বলে জ্বলে ওঠে ভিখিরি বলে গাল দেয় নিজের দলের কাছে।

ওদিকে মুন্‌কে বুড়োর মুখ থেকে চাঁদা আদায়ের ঘটনাগুলো প্রসন্নর চোখকান দিয়ে গিলছে। তারপর ক্ষমাযোগিনীর কাছে মদনঠাকুরের চাঁদা তোলার গল্প সে-ই করেছে। শুনে হাসতে হাসতে ক্ষমাযোগিনী যা বলেছে, সেটাও পাঁচ কান হতে সময় লাগে নি। কাকে নাকি বলেছে ক্ষমাযোগিনী, ওই ডাকাত ছোঁড়াটাকে আসতে বলিস তো একবার—সেই যে বিয়ে করবে আশা দিয়ে পালিয়েছে, আর তার টিকির দেখা নেই কেন?

মজাদার গল্পগুলো সব থেকে বেশি রঙিয়ে রসিয়ে শোনাতে চেষ্টা করেছিল নিজের মনিবানীকে। অর্থাৎ চণ্ডীবউকে। বলেও ছিল। চণ্ডীবউ মন দিয়েই শুনেছে, কিন্তু ওর মত হেসে গড়ায় নি একটুও। উল্টে বরং ভ্রূকুটি করেছে।

প্রসন্ন জানে অবশ্য বউমণির মেজাজ প্রসন্ন নয় একটুও। আর তার কারণও না জানে এমন নয়।

এই জানাটাও গোপন থাকে নি একেবারে। করণে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মদনমোহনের

দলের অভিযানের কীর্তি যেমন ছড়ালো, তেমনি একটা চাপা রটনা কানেও এলো তাদের।

...এ-মাসের শেষেই নৌকাযোগে মহেশ্বর দত্ত সস্ত্রীক কলকাতা যাত্রার উদ্যোগ করেছেন। একবার কলকাতা যাতায়াত মানে ছ'মাস থেকে এক বছরের ধাক্কা—গিয়েই আর কে ফেরে? লোকজন সংগ্রহ করে মহেশ্বর দত্ত যাচ্ছেন আনন্দ করতে নয়, দেশ দেখতেও নয়, যাচ্ছেন কালীঘাটের পীঠস্থানে পূজো দিতে। কিন্তু পূজো দিয়ে পুণ্যি করাটাই নাকি একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

সস্ত্রীক মহেশ্বর দত্ত কলকাতায় যাচ্ছেন কারণ দত্তগৃহিণী স্বপ্ন দেখেছেন বংশধরের বাসনায় কলকাতার মায়ের থানে পুজো দিচ্ছেন তিনি—পুজো সুসম্পন্ন হলে চণ্ডীবউয়ের কোলে সন্তান আসবে।

এমন এক খবর কানে আসার ফলে মদনমোহনের দলের মধ্যে এ নিয়ে কম হাসাহাসি টীকা-টিপ্পনীর বান ডাকে নি। আর সেই হাসাহাসিতে মদনমোহনও যে যোগ দেয় নি এমন নয়।

কিন্তু বাড়ি এসে আর হাসতে পারে নি। কেন পারে নি জানে না। তার বদলে বিমনা হয়েছে।

তারপর হঠাৎ নিজের মনেই সঙ্কল্প করেছে, বারইয়ারীর চাঁদা তুলতে ওই দত্তবাড়িতেও যাবে। তাড়া নেই, সস্ত্রীক মহেশ্বর দত্ত কলকাতায় যাত্রা করার পর যাবে।

—দলবল নিয়ে নয়, একা যাবে মদনমোহন।

॥ ১৭ ॥

স্বপ্ন একটা যথার্থই দেখেছিলেন দত্তগৃহিণী।

তবে তাঁর স্বপ্ন দেখার উপযোগী অলক্ষ্য উপকরণগুলো অনেক আগে থেকেই মনের তলায় দানা বেঁধে উঠেছিল। আর তার ফলে যে চিত্রটা ভিতর থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল তার কিছু আভাস বিনা নিদ্রাতেও অনেক সময় ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে চেয়েছে।

তাঁর প্রথম দুশ্চিন্তা, এতখানি বয়েস হয়ে গেল বউয়ের, তবু ছেলেপুলে হওয়ার কোনো লক্ষণ কেন দেখছেন না? আর কটা মাস গেলে তো কুড়ি হবে বউয়ের বয়েস। এতদিনে একটা ছেড়ে তিনটে হতে পারত। অমন রূপের ডালির আড়াল ঘুচলে কুড়ি মানে তো বুড়ী। নিজের বেলাতেও তাই দেখেছেন, মেয়েদের বেলাতেও তাই দেখেছেন, পাড়াপড়শী পাঁচজনের সংসারেও তার ব্যতিক্রম দেখছেন না। যে বাড়ির বউদের রূপ আছে একটু-আধটু ওই বয়সে রূপ ছেড়ে তাদেরও পাকাপোক্ত মাতৃত্বের ছাপটাই আগে চোখে পড়ে।

কিন্তু এই বউয়ের সর্ব অঙ্গে আঁতিপাতি করে চোখ চালিয়েও সম্ভাব্য মাতৃত্বের কেনো সুদূর চিত্রও যেন তিনি ধরতে ছুঁতে পারেন না। উল্টে ওই রূপের বন্যার নিভৃতে কি একটা সবল সত্তার প্রকাশ দিনে দিনে পুষ্ট হয়ে উঠছে। সেটুকুই

অস্বস্তির কারণ দত্তগৃহিণীর। রাজ্যের লোকের চোখের ওপর ঘোষালবাড়ির যে ছেলেটাকে জ্বলন্ত তেজের চাবুকে অবশ পঙ্গু করে দিয়েছে শুনেছেন ওই চণ্ডীবউ—সেও তাঁর ভিতরে ভিতরে কি এক দুর্ভাবনার ছায়া ফেলে গেছে। মনে হয়েছে ওই তেজ এই সংসারের অন্তঃপুরেও একদিন স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। আর হয় যদি, ঘোষালবাড়ির ওই ছেলেটার মতই বিবশ হতচকিত হয়ে পড়বে হয়ত সকলে।

তাই বাড়ির কর্তার ওই খুশির মাত্রাধিক্য তাঁর মনঃপূত হয় নি একটুও। বউয়ের কথায় না পড়ে ছেলের জন্য দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারী যদি নিজ থেকেই করে দিতেন তিনি, সেটা বরং বেশি পছন্দ হত। আর মায়ের থানে মেলার হাটের মধ্যে ও-রকম একটা কাণ্ড করে বসার জন্য বউকে ডেকে বেশ করে যদি ধমকে দিতেন, তাহলে বোধ হয় আরো বেশি খুশি হতেন তিনি।

এদিকে বেশ কিছুকাল হল ছেলেকে ভালো করে লক্ষ্য করেছেন। ছেলে বদলাচ্ছে। আগে তার রাগ-বিরাগের সরব ঝাপটা ওদের ঘরের বদ্ধ দরজার এধারে হামেশাই উপচে আসত। সেটা অনেকদিনই গেছে। বউয়ের আঁচলধরা হয়ে পড়েছে রাধানাথ। সর্বক্ষণ যেন তোয়াজ—তোষামোদের মুখ। তাতেও আপত্তি ছিল না দত্তগৃহিণীর। কিন্তু তাঁর ধারণা, ওই আঁচলধরা ভাব আর তোয়াজ-তোষামোদের আসল কারণ ভয়। ওই বউকে ছেলেও আজকাল ভয় করে সমীহ করে—তার অনেক লক্ষণ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন।

কিন্তু এ-ও তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন যদি ঘরে ছেলেপুলে আসত। আদরের বউ যত প্রশ্রয়ই পাক, যতদিন কর্তা বেঁচে আছে ততদিন অন্তত সংসারক্ষেত্রে কারো প্রাধান্য নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সেদিক থেকে কর্তাটি কড়া মানুষ এ আস্থা তাঁর আছে। অতএব বউয়ের সব তেজ আর দেমাক ছেলেপুলে না হওয়ার অপরাধের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছিলেন তিনি। মেয়েলী বিবেচনায় তাঁর কেবলই মনে হত পুরুষের ওপর এত প্রভাব আর প্রতিপত্তি বলেই বউয়ের ছেলেপুলে হচ্ছে না। নিজের জীবনে তিনি উল্টো দেখেছেন। পুরুষের নিরঙ্কুশ প্রভাব আর প্রতিপত্তি দেখেছেন।

এ-সব তাঁর ভিতরের চিন্তা এবং নিজস্ব চিন্তা। সাহস করে স্বামীকে এর ভাগ দিতে যান নি কখনো। প্রথম, কারণ, চিন্তাটা নিজের কাছেই যুক্তিনির্ভর বা স্বচ্ছ নয়। দ্বিতীয় কারণ, শোনামাত্র কর্তা ছেলেকেই উল্টে অপদার্থ অমানুষ বলবে। অতএব কারণ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আসল সমস্যাটাই ইদানীং বড় করে তুলেছিলেন তিনি। ছেলেপুলে হচ্ছে না বা হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না এটা বোঝাবার জন্য তো আর যুক্তিতর্কের দরকার নেই।

শুনে শুনে মহেশ্বর দত্তও ইদানীং ভাবনায় পড়েছেন একটু। বিয়ের বহুকাল বাদে ছেলেপুলে হওয়ার দুই একটা নজির যা জানা আছে, সেগুলো যেন আর তেমন আশ্বাস যোগাতে পারছে না। গিন্নীর মুখে শুনে শুনে ব্যাপারটা তাঁর কাছেও একটা সমস্যার আকার নিচ্ছে। স্বাভাবিক স্থলে ছেলেপুলে এতদিনে তো হওয়ার কথা ঠিকই।...

অতএব গৃহিণী যখন এই উদ্দেশ্য নিয়ে গাঁয়ের দুই একটা জাগ্রতস্থানে পুজো-আর্চা পাঠিয়েছেন বা বউকে নিয়ে মানত করতে গেছেন—তাঁর সায় মিলেছে।

কিন্তু এ ব্যাপারে আবার বউয়ের নির্বাক অথচ গন্‌গনে হাবভাব দেখে শাশুড়ী যেমন অবাক তেমনি বিরক্ত। তাঁর ধারণা, বউকে যা করতে বলা হচ্ছে করছে সে কেবল শ্বশুরের ভয়ে নইলে তার নীরব আপত্তিটা যেন বড় বেশি স্পষ্ট আর তীক্ষ্ণ। বউ আচার-অনুষ্ঠান সব ঠিকমত পালন করে কিনা তাতেও কি-রকম সন্দেহ তাঁর। ঘরের বউয়ের পূজো-আর্চা-মানতের প্রতি নিষ্ঠা নেই, এ যেন এক তাজ্জব ব্যাপার! বিশেষ করে যে দৈব অনুষ্ঠানের সঙ্গে বংশধর আসার যোগ। ফলে গালে হাত দিয়ে এক-এক সময় আবার নতুন করে ভাবতে বসেন তিনি।

পরিণাম ক্রোধ।

অবস্থা পরিবর্তনের নতুন জোয়ারের মধ্যপর্যায়ে মহেশ্বর দত্ত ঠিক করেছিলেন কলকাতায় গিয়ে কালীঘাটে মায়ের পূজো দেবেন। সঙ্কল্পটা নতুন বা অভিনব কিছু নয়। দূরের হিন্দুঘরের বিত্তবান মাত্রেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এইগোছের সঙ্কল্প করে থাকেন। এতে বিত্তের ছটা বাড়ে, নামের প্রচার বাড়ে। নৌকোযোগে দূর থেকে কলকাতা ভ্রমণ দুরূহ অভিযান-তুল্য রোমাঞ্চকর ব্যাপার একটা সম্পন্ন না হলে বড়লোক নামের সার্থকতা অসম্পূর্ণ। সেদিন থেকে আর পাঁচজন বিত্তবানের মতই মহেশ্বর দত্তর এই সঙ্কল্প।

কিন্তু বিত্তের জোয়ার তখন বন্যার আকারে ওপ্‌চে উঠছিল বলেই মহেশ্বর দত্ত খুব একটা সময় পেয়ে ওঠেন নি। তাছাড়া সঙ্কল্প করে রাখা মানেই তো অর্ধেক কাজ এগিয়ে রাখা, বাকিটুকু সময়ে হবে। কিন্তু সে-সময় আর হয়ে উঠছিল না। ইদানীং সে-চিন্তাটা আবার মাথায় আসছিল। গিন্নীর সঙ্গে এ নিয়ে একটু-আধটু আলোচনাও করেছিলেন।

এতদিনের পথ নৌকোয় পাড়ি দেওয়ার নামেই গৃহিণীর সহজাত ভয়। ঝড়-জলের বিপদ আছে, চোর-ডাকাতের আতঙ্ক আছে। ঘরের মানুষ ঘরে না ফেরা পর্যন্ত কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারে না। আবার অমন জাগ্রতদেবীর থানে পূজো দেওয়ার সঙ্কল্পে বাধাও কেউ দিতে পারে না। ভয় আতঙ্ক বিপদ আছে বলেই পূজো সার্থক।

দত্তপাড়ার বারইয়ারী সবেগে চালু করে দিয়েই মহেশ্বর দত্ত দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন কিনা চিন্তা করছিলেন। বয়েস হয়ে যাচ্ছে, তবু স্বাস্থ্য অটুট আছে এখনো। কিন্তু আর বেশি দেরি করলে হয়ত শরীরে কুলোবে না।

এ-সব পুণ্যের অংশ সতীসাধ্বীরা সাধারণত ঘরে বসেই নিয়ে থাকেন। স্বামী না ফেরা পর্যন্ত উঠতে বসতে দেবতার পায়ে মানত করেন। ফেরার পর আনন্দে আটখানা হয়ে মহাপুণ্যবতী ভাবেন নিজেদের।

অতএব নিজে সঙ্গে যাওয়ার চিন্তাটা দত্তগিন্নীর মাথায় প্রত্যক্ষভাবে উদয় হয় নি ঠিকই। কিন্তু স্বামীর জন্যে দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা সম্প্রতি অবিরাম তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল।...রাধার যাতে ছেলেপুলে হয় কালীঘাটের মায়ের থানে সেজন্যেও ভালো করে পূজো দেওয়া দরকার। বলে দিলে কর্তা তা দেবেনও। কিন্তু তাঁর মতে আর একটুখানি নিবেদনও মায়ের চরণে রেখে আসা দরকার। বউয়ের অত চাপা তেজ আর চাপা দেমাক যাতে শান্তশিষ্ট বাধ্যতায় গলে-গলে পড়ে—এই সঙ্গে সেই ব্যবস্থাও করে আসা উচিত।

কিন্তু কর্তাকে সে-কথা বলা যাবে না, আর বললেও তিনি কানে তুলবেন না জানা কথা।

অতএব স্বপ্নটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় দেখেন নি দত্তগৃহিণী। আর যা দেখেছেন তাও অসংলগ্ন। দেখেছেন, মায়ের থানে ঘটা করে পূজো হচ্ছে। আবার খানিক বাদে দেখেছেন ফুটফুটে একটা ছেলে সামনে ঘুর ঘুর করছে। তারপরেই ঘুম ভেঙে গেছে। কন্টকিত হয়ে শয্যায় উঠে বসেছেন তিনি। ভোরের কাক ডাকা অন্ধকার ঘোচে নি তখনো। অতএব ভোররাতের অব্যর্থ স্বপ্ন যে তাতে আর ভুল কি। আর তাতে অসংলগ্ন যেটুকু ছিল আবেগের আধিক্যে তাও অনায়াসে জোড়া লেগে গেছে। যেমন, কালীঘাটের মা অথবা মায়ের থান স্বচক্ষে কখনো দেখেন নি, কিন্তু যা দেখেছেন সেটা সেখানকার মায়ের পূজো ছাড়া আর কি হতে পারে? কে পূজো দিচ্ছে কেন পূজো দিচ্ছে স্বপ্নে সেটা গোচর ছিল না। কিন্তু স্বপ্নটা যখন তিনিই দেখেছেন তখন পূজারিণীও তিনি ছাড়া আর কে হতে পারেন? আবার ফুটফুটে ছেলেটাকে যখন দেখেছেন তখন ধারেকাছে আর কিছু ছিল না। না পূজো, না জনমানুষ। তবু ওই ছেলে যে মায়ের পূজোর ফল আর দত্তবাড়ির বংশধর, তাতে সংশয়ের অবকাশ কোথায়?

মহেশ্বর দত্ত খুব ভোরে ওঠেন। প্রভাতী লগ্নে স্ত্রীর আলুথালু আবির্ভাবে ঘাবড়েই গেলেন তিনি। গিন্নী হাসছে কাঁদছে কাঁপছে। তারপরে সার কথা শুনেছেন—গিন্নী স্বপ্নাদিষ্টা হয়েছেন, কালীঘাটের মায়ের থানে নিজে গিয়ে তাঁকে পূজো দিতে হবে আর তারপর বংশধর আসবে। আসবে কেন পূজোর পর এসেইছে বলা যেতে পারে, কারণ সেই গোপালের চাঁদমুখ তো তাঁর দেখা সারা!

স্বপ্নকথা গোপনকথা। কিন্তু এমন এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার গোপন শেষ পর্যন্ত থাকল না। একেবারে আত্মজার কাছে বললে কি আর ক্ষতি, ফিসফিস করে দত্ত-গৃহিণী মেয়েদের কাছে বললেন—আর তারপর চোখ পাকিয়ে সাবধান করলেন কাক-পক্ষীতেও যাতে না জানে। পতির কাছে গোপনীয় কিছু নেই, মেয়েরা স্ব-স্ব পতিদেবতাদের কাছে অলৌকিক ঘটনাটা ব্যক্ত না করে পারল না। ওদিকে মহেশ্বর দত্তই বা কুল-পুরোহিতের কাছে স্বপ্ন-সমাচার না জানিয়ে এবং পরামর্শ না চেয়ে পারেন কি করে?

অতএব দত্তবাড়ির গৃহিণীর স্বপ্নবৃত্তান্ত একমাত্র কাকপক্ষী ছাড়া আর বোধ হয় সকলেই জানল। ওদিকে উদারচেতা কুল-পুরোহিত করণের মহাপুণ্যবতী বলে আখ্যা দিলেন মহিলাকে। তাঁর মতে কালবিলম্ব না করে সস্ত্রীক মহেশ্বর দত্তর কলকাতায় যাত্রা করা উচিত।

এমন এক ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হবার মত মনের জোর নেই মহেশ্বর দত্তব। উল্টে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে মনে মনে খুশিই হলেন তিনি। মায়ের আদেশে যাচ্ছেন যখন, ভয়ই বা কি ভাবনাই বা কি।

অযথা সময় নষ্ট না করে যাত্রার উদ্যোগে মনযোগী হলেন তিনি।

ব্যবস্থাপত্র এগোতে লাগল, সঙ্গী-সাথী ঠিক হল। দত্তপাড়ার বাতাসে আর একপ্রস্থ বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লাগল। মহামায়ার স্বপ্নাদেশঘটিত যাত্রা—তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ব্যাপার নয়। এই যাত্রা-দর্শনেও পুণ্য।

দিন এগিয়ে আসতে লাগল। দত্তগিন্নী আড়ালে আড়ালে চোখ মোছেন। আবার চোখে জল আসে বলে দেবীর কোপের ভয়ে কন্টকিত হন। ওদিকে মহেশ্বর দত্তরও

ভিতরটা নিরুদ্বিগ্ন নয় খুব। নয় বলেই বাইরে শান্ত, নরম তিনি। বাড়ি দেখাশুনা করার নৈতিক ভারটা পাড়ার বয়স্কজনদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করেছেন। মেয়ে-জামাইদের সুযোগ সুবিধে মত এক-একজনকে এখানে এসে থাকতে বলেছেন। পালোয়ান ষষ্ঠীচরণকে ডেকে পাঠিয়ে সর্বদা সজাগ চোখ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ছেলেকে ডেকে বিষয়-আশয় কোথায় কি আছে না আছে তার আভাস দিয়েছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত উপদেশ দিয়েছেন, যদিও বেশ জানেন ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্যবসা শুধু ভাঁটার স্রোতেই চলবে। তবু তাঁর কর্তব্য তিনি করলেন। সিন্দুকের চাবিটা প্রথমে চণ্ডীবউয়ের হাতে দিয়ে যাবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ভেবে তা করলেন না। বউকে কাছে ডেকে ছেলের হাতেই দিলেন চাবিটা। বললেন, এটা সর্বদা মা-লক্ষ্মীর কাছে রাখিস, নিজে নিয়ে ঘুরিস না। আর খরচপত্র যা করা দরকার সব চণ্ডীমায়ের পরামর্শ মত করবি।

এমন পিতৃভক্ত মুখ রাধানাথের আর বোধ করি কেউ দেখে নি।

কটা দিনের এই নতুন বাতাসের মধ্যে একমাত্র চণ্ডীবউই শুধু নীরব নির্বাক। এমন কি প্রসন্নর সঙ্গেও দিনান্তে দশটা কথা হয়েছে কিনা সন্দেহ। রাধানাথ এই ব্যতিক্রমটুকু লক্ষ্য করেছে। শ্বশুর চলে যাচ্ছে বলে আদরের মন-খারাপ ছাড়া আর কিছু ভাবে নি। মনের আনন্দে দুই একবার প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেও লাভ হয় নি। বউয়ের চাউনি উল্টে কেমন রুক্ষ মনে হয়েছে তার।

পুরুষদের কোলাকুলি আর মেয়েদের অশ্রু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্গা গণেশ স্মরণ করে সাড়ম্বরে যাত্রা-পর্ব সমাধা হল। মহেশ্বর দত্তর বজরার নোঙর উঠল। আর ধীরে ধীরে চুর্ণী-তটবাসিদের চোখের আড়ালও হল একসময়।

চাপা আনন্দটুকু সংগোনে চেপে রেখে রাধানাথ ঘরে ফিরল। আজকের বাতাসের যেন ভারী একটা মুক্তির স্বাদ। দুনিরীক্ষ্য দেবীটির উদ্দেশে মনে মনে প্রণামও জানিয়ে ফেলল। দেখতে দেখতে এর পর নতুন বারইয়ারীর উৎসব এগিয়ে আসবে। এর মধ্যে এত বড় স্বাধীনতা পরম ভাগ্যের লক্ষণ বইকি।

তবু অন্দরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গোটা বাড়িটাই হঠাৎ যেন কেমন ঝিমিয়ে আছে মনে হল।

ঘরে এসে দেখে বউ চুপচাপ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দূরের আকাশ দেখছে। পায়ের শব্দে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল।

এই নতুন স্বাধীনতার বাতাসে বউয়েরও উৎফুল্ল মুখ দেখলে খুশি হত রাধানাথ। এই মুহূর্তে বউকে খুশি রাখার ইচ্ছের মধ্যেও কৃত্রিমতা ছিল না হয়ত, কিন্তু বউয়ের এমন ঠাণ্ডামুখ দেখে গোড়াতেই সে চেষ্টায় এগোলো না। শয্যায় বসে পড়ে বড় করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, বাড়িটা এরই মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

জবাব না দিয়ে চণ্ডীবউ চুপচাপ চেয়েই রইল তার দিকে। ঠিক যেভাবে চেয়ে থাকলে রাধানাথ অনেক সময়ই অস্বস্তি বোধ করে। তবু আজ ধরে নিল মন বিষণ্ন বলেই এভাবে চেয়ে আছে। তাই এবারে একটু হাল্কা সুরেই বলল, ছ'মাসের মধ্যেই আবার ফিরে আসবে দেখো, দেখতে দেখতে কেটে যাবে—এত মন খারাপ করার কি আছে?

ঠাণ্ডা দুটো চোখ তার মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে চণ্ডীবউ ফিরে জিজ্ঞাসা করল, দেখতে দেখতে কেটে যাবে বলে তোমার মন খারাপ হয় নি তো?

কথাটা নিদারুণ সত্যি না হলে হয়ত রাধানাথের আঁতে এতটা ঘা পড়ত না। শোনামাত্র খুশির আমেজে চিড় খেল, দৃষ্টি ঘোরালো হয়ে উঠল।—তার মানে, তুমি বলতে চাও আমার বাবা-মা চলে গেল আমার কষ্ট হয় নি, আমার থেকে বেশি তোমার কষ্ট হয়েছে?

আবার একটু চেয়ে থেকে চণ্ডীবউ জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা-মা গেলেন কেন?

কি আশ্চর্য, মা এ-রকম একটা স্বপ্ন দেখেছে, যাবে না! পুজো দিলে ছেলেপুলে যদি হয়...

ধীর পায়ে চণ্ডীবউ কাছে এগিয়ে এলো। বেশ কাছে। চেয়েই আছে। চোখের পলক পড়ে না। তেমনি ধীর মৃদু অথচ খুব স্পষ্ট সুরে জিজ্ঞাসা করল, ছেলেপুলে হয় না কেন?

মুহূর্তে বেত্রাহত মুখ যেন রাধানাথের। কেউ বুঝি গোপনতার এক নিরাপদ খাঁচা থেকে খপ করে টেনে বার করে ফেলেছে তাকে। নীরব ক্রোধের আকারে সেই অস্বস্তির ঝটপটানি কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু তাপশূন্য রাগের অভিব্যক্তিটুকুও তেমন নির্ভরযোগ্য লাগছে না নিজের কাছেই।

বা রে! আমি তার কি জানি! বলতে বলতে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।—আমি কি বদ্যি না গণকঠাকুর—কেন হয় না আমি কি করে জানব—কত কারণে না হতে পারে—

বলতে বলতে যতটা সম্ভব বিরক্ত এবং রাগত মুখে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল সে।

চোখের আড়াল হবার পরেও চণ্ডীবউ সেদিকেই চেয়ে আছে।

॥ ১৮ ॥

দুর্বলের হাতে অস্ত্র এলে সে স্বাভাবিক ভাবেই খানিকটা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। একটা বাড়তি শৌর্যের ছটা নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। ওই অস্ত্র থেকেই সে আশ্রয়ের আশ্বাস পায়।

বাপ-মা চলে যাওয়ায় বিশেষ করে সেই গোছের একটা অস্ত্রই হাতের মুঠোয় পেয়েছে রাধানাথ। অতি নির্বোধও নিজের দুর্বলতার খবর রাখে। কিন্তু বউ যে সেটা এত বড় এক বিড়ম্বনার কারণ করে তুলতে পারে সে-সম্ভাবনা কোনদিন মাথায় আসে নি।

তাই হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে হতচকিত কাপুরুষের মতই সে বউয়ের সুমুখ থেকে পালিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু পরে দুঃসাহসের কথা ভেবে রাগে ফুঁসেছে, ফুলেছে। শুধু দুঃসাহস নয়, পুরুষের প্রতি কোনো ঘরের বউয়ের এরকম কটাক্ষ অমার্জনীয় নির্লজ্জতা ছাড়া আর কি?

এ অপরাধের যোগ্য শাস্তি মাথায় আসছে না বলেই ছটফটানি বেড়েছে। ফলে আকণ্ঠ মদ গিলেও তাপ জুড়োয়নি। ভক্তদের পরামর্শে কুসুমবাঈয়ের ডেরায় গিয়ে রাত কাটিয়েছে। বউয়ের গঞ্জনায় সখা তাদের বিচলিত, রাঙা জলের প্রভাবে এটুকু দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠতে সময় লাগে নি। অতএব তাকে নিয়ে রসের পূর্ণ জোয়ারে গা ভাসানো ছাড়া আর গতি কি।

কিন্তু রাধানাথের স্নায়ু এবারে অত সহজে ঠাণ্ডা হল না। বাবার অনুপস্থিতির ফলে তারই জোরটা কম কি এখন? ছমাস বাদে তার ফেরার কথা, কিন্তু ফিরে যে আসবেই কে হলপ করে বলতে পারে? ভাগ্য যে গতিতে প্রসন্ন তার ওপর, কত কিছুই তো ঘটে যেতে পারে। আর বাবা ফিরে এলেও ছটা মাস কম সময় নয়। অন্তত বউ টিট করার মত অঢেল সময়।

টিট করার প্রথম পন্থা হিসেবে পর পর সাতদিন রাধানাথ বাড়িমুখো হল না, বাড়ির কোনো খবরও নিল না। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রায়-সমাপ্ত বারইয়ারীর প্রাসাদেই আড্ডা জমতে লাগল। মহেশ্বর দত্ত যখন-তখন এসে হাজির হবার সম্ভাবনা নেই, কাজেই পুকুরধারের গাছের তলায় আসর জমানোরও দরকার নেই। ওদিকে সন্ধ্যার পর কুসুমবাঈয়ের ডেরায় গান-বাজনার আসর প্রতিদিনের থেকে প্রতিদিন বেশ জমাট বেঁধে উঠছে। একগাদা রসিকজন মিলে রোজ সেখানে হানা না দিয়ে মাঝে সাঝে কুসুমবাঈকে এখন এই বারইয়ারীর প্রাসাদে নিয়ে আসা যায় কিনা, সপারিষদ রাধানাথ এই চিন্তাও করছে সম্প্রতি।

এরই মধ্যে তাদের নেশা ছুটে যাবার মতই ব্যাপার ঘটল একটা।

সকলের জোড়া-জোড়া চোখ আচমকা এক পুঞ্জীভূত লালের ধাক্কায় বিস্ফারিত। ঠিক দেখছে কি নেশার ঘোরে দেখছে রাধানাথেরও সেই সংশয়।

সংশয় ঘুচতে সময় লাগল না। পাল্কির লাল শালুর পরদা সরিয়ে যে নেমে এলো তাকে দেখে বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত সকলের।

চণ্ডীবউ।

এতগুলো পুরুষের মধ্যে কোনো বাড়ির বউ, বিশেষ করে দত্তবাড়ির বউ এসে উপস্থিত হতে পারে সুরা-প্রকোপজনিত মস্তিষ্কেও সেটা কল্পনা করা শক্ত। সকলে ছেড়ে রাধানাথও ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে।

পাল্কি থেকে নেমে তরল আসরটির দশ হাতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে চণ্ডীবউ। মাথার ঘোমটাও এত বড় নয় যে মুখ দেখা যায় না।

কয়েক লহমা মাত্র। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি পাল্কিতে ফিরে গেল। হাতের ঝাপটায় লাল শালুর আবরণ আছড়ে পড়ল। পাল্কি তুলে নিয়ে বেহারারা ফিরে চলল।

কিন্তু সভা-রসিকদের চোখে একটুখানি অজ্ঞাত আতঙ্কের মত সেই লালের ঘোর লেগেই থাকল বুঝি।

আত্মস্থ হবার পর একমাত্র রাধানাথের পক্ষেই শুধু এতখানি বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ল। বাবা নেই এখানে অতএব ঘাবড়াবারও কারণ নেই খুব। সেই রাতে কুসুমবাঈয়ের ডেরার আসর স্থগিত থাকল। সরোষে আরো কয়েক পাত্র উজাড় করে একটা হেস্তনেস্ত করার সঙ্কল্প নিয়ে ঘরে ফিরল সে।

খাটের বাজুতে ঠেস নিয়ে চণ্ডীবউ বসে। পা টলছে বলেই আরো বেশি বুক ফুলিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল রাধানাথ। বেশ গলা ছেড়ে কৈফিয়ত তলব করল, কোন সাহসে তুমি সেখানে গেছলে?

জবাব না দিয়ে চণ্ডীবউ শাড়ির আঁচলটা নিজের নাকে চেপে ধরল। মত্ত হাতে রাধানাথ এক ঝটকায় সেটা নামিয়ে দিল আবার।—ও-সব সতীপনায় ভোলার মানুষ এ শর্মা নয়, আমি জানতে চাই ঢং করার জন্যে ওখানে কোন্ সাহসে গিয়ে হাজির হয়েছিলে তুমি?

খাট ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল চণ্ডীবউ। রাগে আর ঘৃণায় একটি একটি করে কথা নির্গত হল মুখ দিয়ে।—ভেবেছ, ঠাকুর আর ফিরবেন না কেমন? এই ছ'টা মাস আর শেষ হবে না—কেমন?

বউয়ের ঠিক এই মূর্তি দেখেই রাধানাথ বহুদিন বিচলিত হয়েছে। কিন্তু আজ তা হলে চলবে না। অতএব গলার স্বর আরো চড়ল, আরো কড়া করে চোখ পাকালো।—ও-সব ছেঁদো কথা আমি শুনতে চাই না, দত্তবাড়ির বউ হয়ে কোন্ আক্কেলে তুমি নির্লজ্জের মত ওখানে গেছলে?

এবারেও জবাবের ধার দিয়ে গেল না চণ্ডীবউ। স্থির কঠিন দু'চোখে মুখের ওপর ফেলে রেখে বলল, তোমার ওই বারইয়ারীর দালান আবার আমি ভেঙে মাটিতে মেশাতে পারি কিনা দেখবে? দেখতে চাও?

একটা মোক্ষম জায়গাতেই আচমকা ঘা পড়ল যেন। সম্ভব অসম্ভব চিন্তা করার ফুরসত নেই—তার আগেই সদ্য মাথা-গজানো বারইয়ারীর দালানকোঠা চোখের সামনে একপ্রস্থ দুলে উঠল বুঝি। হেস্তনেস্ত করার সঙ্কল্পে ভুল হয়ে গেল। শয্যায় বসে পড়ে বলে উঠল, মাইরি আর কি, অত সস্তা, বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লোহার মত শক্তপোক্ত ভিত তৈরি করিয়েছে—ভাঙলেই হল—

ঘৃণাভরা দুচোখের আর একটা ঝাপটা মেরে চণ্ডীবউ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বউ যা বলে গেল সত্যি সেটা সম্ভব কিনা রাধানাথের মাথায় সেই চিন্তাটাই ঘুরপাক খেয়ে গেল খানিকক্ষণ। ভাবতে গিয়ে মাথাটা সোজা রাখা গেল না বেশিক্ষণ।

চণ্ডীবউ আবার ঘরে ফিরল যখন, খাটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে রাধানাথ অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

খাট থেকে একটা বালিশ টেনে মেঝেতে ফেলল চণ্ডীবউ। আঁচল বিছিয়ে মাটিতে শয্যা নিল। সর্বাঙ্গে কি একটা বিষের যাতনা।

পরদিন থেকেই রাধানাথের ভিন্ন মূর্তি আবার। বউয়ের উক্তি, অর্থাৎ দালান ভেঙে মাটিতে মেশানের শাসানি যে কোনো ভাবেই সিদ্ধ হবার নয়, সকালের বাতাস মাথায় লাগার সঙ্গে সঙ্গে সেটা মনে হয়েছে। কারণ বাবার অনুপস্থিতিতে দাপটের সমস্ত হাতিয়ার এখন তারই হাতে। বাবা ফেরার অনেক আগেই বারইয়ারীর উদ্বোধন এবং ঢালা উৎসব সুসম্পন্ন হয়ে যাবে। নিশ্চয়তার এই দিকটা কাল মাথায়ই আসে নি।

অতএব বউয়ের শাসানির জবাবে বারইয়ারীর আসন্ন উৎসব ষোলকলায় পূর্ণ করে তোলার উদ্দীপনায় মেতে উঠল সে। প্রতিদিন বাবার সিন্দুক খোলা হতে লাগল। থোকে থোকে টাকা উবে যেতে লাগল।

চণ্ডীবউ বাধা দিচ্ছে না দেখছে শুধু।

পাঁচ দিনে পাঁচ দফা সিন্দুক খোলা হল, টাকা বার করা হল।

তার পরদিনও সিন্দুক খুলতে গিয়ে রাধানাথ দেখে পকেটে চাবি নেই। প্রথমে চমকেই উঠল সে। তাড়াতাড়ি বাবার ঘরে গিয়ে সিন্দুকের ডালা টেনে দেখল। যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি আছে। ছুটল বারইয়ারীতে। সেখানেও চাবি নেই। বাড়ি এসে আবার আঁতিপাতি করে খুঁজল। নেই কোথাও।

বউয়ের দিকে চোখ পড়তে কেমন মনে হল সে চাবির সন্ধান জানে। মুহূর্তে রক্ত উঠল মাথায়। কিন্তু বহুবারের অভিজ্ঞতায় দেখেছে রক্ত চড়লে শেষে নিজেকেই ঠকতে হয়। তাই বেশ কঠিন সংযত মুখ করেই বউয়ের সামনে এসে দাঁড়াল সে। চাবি কোথায়?

জবাব না দিয়ে চণ্ডীবউ তার দিকে তাকালো শুধু।

বাবার সিন্দুকের চাবি কোথায়?

আমার কাছে।

কেন?

তাই থাকার কথা। যাবার সময় ঠাকুর তাই বলে গেছলেন।

ও...! রাগে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে উঠল রাধানাথের।—সেই জন্যে আমার জামার পকেট থেকে তুমি চুরি করে চাবি সরিয়েছ...আর একঘন্টা ধরে আমি খোঁজাখুঁজি করছি দেখেও চুপ করে আছ?

চণ্ডীবউ নীরব, দৃষ্টিটা শুধু খরখরে হয়ে ওঠল। রাধানাথ আবার ঝাঁজিয়ে উঠল, ভালয় ভালয় চাবিটা এখন বার করে দেবে?

এ ক'দিন যা খরচ করেছ এক পয়সা অবধি তার হিসেব লেখো, তারপর দেব।

আর ধৈর্য সংবরণ করা গেলই না। মারমুখী রাধানাথ গর্জন করে উঠল, কি, এত বড় আস্পর্ধা! আমি হিসেব দেব তবে তুমি চাবি দেবে? বলি ওই সিন্দুক তোমার বাপের বাড়ি থেকে এসেছে, না বাপের জন্মে অত টাকা চোখে দেখেছ কোনদিন?

দু'চোখের সাদার ভাগ বড় হয়ে উঠেছে চণ্ডীবউয়ের, মুখেরও দ্রুত রং বদলাচ্ছে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়ার ওপর দিয়ে মেজাজ চড়াতে না পারলে বউ টিট হবে না। বউয়ের স্পর্ধা যে কত বেড়েছে সেটা সেদিনই সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে—মুখের ওপর যেদিন জিজ্ঞাসা করেছে ছেলেপুলে হয় না কেন? রাধানাথের সমস্ত পুরুষকার একেবারে ধুলোয় টেনে নামিয়েছে সেদিন। বাপ তুলে কটুক্তি করতে পারায় সে-অপমানের জ্বালা জুড়িয়েছে খানিকটা।

গলার স্বর সপ্তমে চড়ল আবার।—এক্ষুনি তুমি চাবি বার করবে কিনা আমি জানতে চাই?

অব্যক্ত ক্রোধে আর বিতৃষ্ণায় চণ্ডীবউ গিয়ে দেয়ালের খুপরি থেকে চাবির গোছা বার করে মেঝের ওপর ছুঁড়ে দিল। সজোরে ওটা ঘরের চৌকাঠে গিয়ে লাগল।

চাবি তুলে নিয়ে রাধানাথ বলল, তোমার তেজ আমি বার করছি!

সদর্পে চলে গেল তখনকার মত।

কিন্তু সত্তার সবল ভাগ প্রায় শূন্য বলেই এ দর্প দীর্ঘস্থায়ী হবার নয়।

দু'দিন না যেতে ভেতরটা কেমন মিইয়ে আসতে লাগল আবার। সতের চিন্তা মাথায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। চৌদ্দ বছর বয়সে ওই বেপরোয়া বউ বাপের ঘর ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল আর তারপর ক্ষমাযোগিনীর ঘরে এসে উঠেছিল। আর তারপর থেকে তার দুর্জয় তেজের যে সব কাণ্ড দেখেছে যে নিশ্চিন্ত থাকা দায়। কবে বাড়ি ফিরে দেখবে বউ ঘর ছেড়ে চলে গেছে—সেও যেন একেবারে অসম্ভব নয়। এ দুর্ভাবনা আগে কখনো মাথায় আসে নি। কিন্তু যে বউ মুখের ওপর ছেলেপুলে না হওয়ার কৈফিয়ত তলব করতে পারে তার অসাধ্য কর্ম কিছু নেই বুঝি। ওই এক কথায় রাধানাথের সমস্ত দাপট একেবারে অসাড়।

না, চাবি আদায় করে আনার পর থেকে এই দুটো দিন সে আর মদের আসর জমাতে পারছে না, কুসুমবাঈ এর আশ্রয়ে রাতও কাটাতে পারছে না। সে ঘরে ফিরলে বউ শয্যায় আসে না, মেঝেয় শোয়। রাধানাথ রাগে কাঁপতে থাকে, কিন্তু ভরসা করে গায়ে হাত দেওয়া দূরে থাক্, ডাকতেও পারে না। পারে না বলেই সেই চিরাচরিত লোভ মাথা চাড়া দেয়। এই লোভের মুখে স্বাভাবিক ভাবেই তখনকার মত মদের আসর বা কুসুমবাঈয়ের ডেরার টান নিষ্প্রভ মনে হয়। ছেলেপুলে না হওয়ার অপমানটা মিথ্যে প্রতিপন্ন করার বাসনা দুর্বার হয়ে ওঠে।

ন'দিন হল মহেশ্বর দত্ত কলকাতা রওনা হয়েছেন। রাধানাথের দুই দিদিই তখন পর্যন্ত বাপের বাড়িতে বহাল। পালা করে বাবা এক-একজন করে থাকতে বলে গেছেন। সেই পালাটা এখনো শুরু হয় নি। দুজনেই আছে। রূপসী বউয়ের ওপর তারা খুশি নয়, বাবা রওনা হবার পরেই বউয়ের সঙ্গে ভাইয়ের লেগে গেছে এটুকু অগোচর নেই তাদের। কি নিয়ে মন-কষাকষি সে-সম্বন্ধে কৌতূহলও আছে। কিন্তু তা বলে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত বরদাস্ত করার পাত্রী নয় তারা। সিন্দুকের চাবি সারাক্ষণ দখলে রাখার ফলে ব্যাঘাত যে ঘটছে সে হুঁশ রাধানাথের নেই। অতএব সচেতন তারাই করল তাকে। রাত্রে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বড়দি ডেকে বলল, কি রে রাধা, তোদের মতলবখানা কি, আমরা কি চলে যাব নাকি?

কেন? কেন? রাধানাথ যথার্থ অবাক।

বাবা তো থাকতে বলে গেলেন আমাদের, কিন্তু সংসার-খরচের টাকা-পয়সা কিছু না দিয়েই চলে গেলেন। এদিকে যে হাটবাজার বন্ধ হবার দাখিল সে খেয়াল আছে তোর?

রাধানাথ অপ্রস্তুত। খেয়াল এবার ভালোমতই হল। সেই সঙ্গে রাগও হল বউয়ের ওপর। সিন্দুকের চাবি কেড়ে নিয়েছে বলে এত তেজ যে সংসারের খরচের কথাটা পর্যন্ত মনে করিয়ে দেয় নি।

কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে রাগ করা গেল না। পকেট থেকে সিন্দুকের চাবি বার করে সেই দেয়াল-খুপরিতে সেটা রাখতে রাখতে যেন শূন্যের মধ্যে কথা ছুঁড়ল সে।—সিন্দুকের চাবি এখানে থাকলো। সংসার খরচ চলছে না সেটা আমাকে বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। সতের ব্যাপারে আমার বলে প্রাণান্ত অবস্থা—

ঘরের দ্বিতীয় ব্যক্তি দশ হাতের মধ্যে বসে আছে যখন না-শোনার কথা নয়।

তবু শুনল কি শুনল না বোঝা গেল না। নিভৃতের লোভ ছেড়ে অন্য কারণেও রাধানাথের ভিতরটা আপোসের দিকে ঝুঁকতে চাইছে। টাকা হাতে পেয়ে আর স্তাবকদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর সঙ্গে রেষারেষির ক্ষেত্রটা যে হারে বিস্তার লাভ করছে তাতে এই তেজী বউয়ের সহযোগিতাটুকু কাম্য ছিল। বিশেষ করে তারই সহায়তার যখন দত্তপাড়ায় এমন এক আবির্ভাব ঘটতে চলেছে। এ-বেলায় বউয়ের ওই তেজের ওপর তার যথেষ্ট আস্থা আছে। দক্ষিণ পাড়ার নায়ক মদনমোহন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কিছু স্পর্ধার উক্তি শুনিয়ে বউয়ের এই পাথর-মূর্তিখানা চণ্ডীমূর্তি করে তোলার একটা তাগিদও ভিতরে ভিতরে অনুভব করছে সে।

দেয়াল-খুপরিতে চাবি রেখে আড়চোখে বারকয়েক চেয়ে দেখল রাধানাথ, কিন্তু আবহাওয়া অনুকূল ঠেকল না তার।

রাধানাথ বলতে না পারলেও কথা ঠিকই কানে আসছে চণ্ডীবউয়ের। আর যে সব কথা কানে আসছে তাতে ভিতরে ভিতরে অস্বস্তিই বোধ করছে কেমন।

দক্ষিণপাড়ার দলের সঙ্গে রীতিমত রেষারেষি শুরু হয়েছে একটা। উত্তেজনার খবরগুলো বেশির ভাগই প্রসন্নময়ী শোনায় তাকে। আর ননদিনীরাও পাড়ার মেয়েদের মুখ থেকে পাঁচরকম শুনে এসে রোমাঞ্চকর জটলা ফেঁদে বসে।

চণ্ডীবউ শুনেছে, বিপক্ষদলের ধারণা প্রতিযোগিতার এই বাতাস নাকি জমে উঠেছে তারই জন্যে। অন্তঃপুরে বসে সে-ই নাকি কলকাঠি টিপছে। তারই ইচ্ছায় দত্তপাড়ায় বারইয়ারীর আবির্ভাব। আর পাল্কি চেপে সেদিন নিজে সে বারইয়ারী দেখতে গেছল—এ সংবাদও রাষ্ট্র হতে সময় লাগে নি। অতএব দত্তবাড়ির চণ্ডীবউকেই আসল প্রতিদ্বন্দ্বিনী ধরে নিয়ে দক্ষিণপাড়ার দল সোৎসাহে মানরক্ষার আসরে অবতীর্ণ।

কিন্তু দেখতে দেখতে এই রেষারেষির ব্যাপারটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে লাগল। দুই দলের মধ্যেই সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। দুই পক্ষের উৎসবের দিনও একই দিনে ধার্য হয়ে গেল। ফলে করণের ডবল আনন্দ লাভের আশায় জলাঞ্জলি। তার বদলে ডবল উত্তেজনার খোরাক পেল তারা। দলে টানাটানি আর সমর্থক ভাগাভাগির হিড়িক পড়ে গেল।

উৎসবের তারিখ খুব কাছে নয়, কিন্তু সব-কিছুর চূড়ান্ত ফয়সালার ব্যাপারটা যেন নাকের ডগায় এসে গেল। আক্রোশ সব থেকে বেশি দানা পাকিয়ে উঠল করণের গুণীজনদের উপর দখল নেওয়া নিয়ে। যেমন, বারইয়ারীর উৎসবে এবং মজাদার ব্যসনে হরবোলা শ্রীনাথ বা ছিরে পাগলা সর্বজনস্বীকৃত গুণী মানুষ। তার পাগলামি আর কসরৎ রসের খনিবিশেষ। তা অনেক টাকা কবুল করেও রাধানাথ তাকে নিজের দলে ভেড়াতে পারে নি। উল্টে সে হেসে হেসে জবাব দিয়েছে, মদনমোহন ছাড়লে যে ছিরে পাগলার ছিরি ঘুচে যাবে গো দত্ত-পো!

গেঁজেল সহায় ভট্ট পর্যন্ত দক্ষিণপাড়ার দলেই থেকে গেল। গাঁজায় দম দিয়ে সে নাকি মন্তব্য করেছে, দীনজনের নাকের ডগায় টাকা দোলানো আর রূপসীর অঙ্গ দোলানো দুই সমান মায়া। বিশ্বাস করেছ কি মরেছ।

সহায় ভট্টর থেকে অবশ্য মুনকে ভট্চাযের কদর ঢের বেশি। কিন্তু তারও

দোদুল্যমান অবস্থা। এই দলাদলির ব্যাপারটা তার অন্তত একটুও পছন্দ নয়। দলে ভেড়া মানেই তো উৎসবে ভোজন-আমন্ত্রণের সংখ্যা গণ্ডীতে বেঁধে ফেলা। এই সঙ্কটে পড়ে প্রসন্নময়ীর সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু পরামর্শ করার ফাঁক খুঁজছে সে।

ওদিকে পালোয়ান ষষ্ঠীচরণের নির্লিপ্ত হাবভাবও দত্তপাড়ার অনুরাগীদের বিরক্তির কারণ। সে যে-দলে আসবে সেই দলের শোভা-সম্বল দুইই বাড়বে। কিন্তু মওকা পেয়ে তারও বিচার-বিবেচনা যেন কলাগাছ হয়ে ফুলে উঠেছে। সে বলছে, সবাই আপনার জন, দল আবার কি!

শেষের এই দুজনকে নিয়ে অবশ্য খুব একটা চিন্তিত নয় রাধানাথ। তাদের দুর্বলতার ঘাঁটি জানা আছে। নিজের বউ একটু সদয় হলে এ দুজনের সমস্যা ঘুচে যাবে। দক্ষিণপাড়ার আসল দলটা কি করে ভেঙেচুরে ঝাঁঝরা করে দেওয়া যা এটাই তার দিবা-রাত্রের চিন্তা এখন।

গুজবে আর রটনায় করণের বাতাসে একটা উত্তেজনার স্রোত বইতে লাগল। আর তার ফলে ভিতরে ভিতরে সব থেকে বেশি উতলা হয়ে পড়ল চণ্ডীবউ। এই রেষারেষি থেকে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যাওয়ার আশঙ্কা। দু তরফের সব গুজবই সকলে বিশ্বাস করছে।

দত্তপাড়ার দলের কানে এলো আটঘাট বেঁধে দক্ষিণপাড়ার দল নতুন বারইয়ারীর উৎসব পণ্ড করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে। ওদের জোয়ানের দল লাঠিসোঁটা নিয়ে রীতিমত প্রস্তুত। আচমকা হামলা করে সব ভেস্তে দেবার মহড়াও নাকি দিচ্ছে তলায় তলায়। আর বাইরে নাকি বলেও বেড়াচ্ছে কেউ কেউ একজন মেয়েমানুষ, অর্থাৎ দত্তবাড়ির ঘরের বউ এই ব্যাপারে মেতেছে যখন—তার মুখে ভালো রকম চুনকালি দেবার ব্যবস্থাই করবে দক্ষিণপাড়ার মরদেরা।

রটনা কানে আসতে চণ্ডীবউয়ের মুখ লাল হয়েছে। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা হবার পরে কে জানে কেন, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় নি তার। অনেকবার ভেবেছে ষষ্ঠীচরণকে ডেকে তাকে প্রস্তুত থাকতে বলবে কিনা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও করে নি।

দু'দিন না যেতে এদিকের পাল্টা ব্যবস্থার খবর কানে আসতে দুশ্চিন্তা আরো বাড়ল বই কমল না। এরই মধ্যে সিন্দুক থেকে বেশ কয়েক থোকে টাকা বেরুতে দেখেছে চণ্ডীবউ। আর তারপরেই শুনল, পাল্টা শিক্ষা দেবার জন্য দত্তপাড়ার দল দ্বিগুণ প্রস্তুত। আসলে বিপক্ষ দল শয়তানী করতে পারে জেনে প্রস্তুত বলতে গেলে তারা আগে থাকতেই ছিল। রাধানাথের পক্ষে আগে যা করা সহজ হয় নি, টাকার জোরে এখন তার বিশ গুণ করাও জল-ভাত ব্যাপার। বাইরে থেকে ছোটখাটো একটা সশস্ত্র বাহিনীই আমদানি করার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে সে। টাকার নিমক খেলে যারা একের পরে এক মাথা মাটিতে শুইয়ে দিতে পারে।

মনে মনে চণ্ডীবউ এই প্রথম বোধ করি শ্বশুরের অভাবটা সব থেকে বেশি অনুভব করছিল।

এমন দিনে বিস্ময়ে হতভম্ব হবার মতই ব্যাপার ঘটে গেল একটা।

রাধানাথ বাড়ি নেই, প্রাতরাশ সেরে খানিক আগে বেরিয়েছে। বড় ননদ শ্বশুরবাড়ি

চলে গেছে, ছোট ননদ পড়শিনীদের খবর নিতে বেরিয়েছে। দু'চোখ কপালে তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রসন্নময়ী হাজির।—বউমণি! কি ভয়ানক ছেলে গো ওই ঘোষালবাড়ির মদনঠাকুর—বারইয়ারীর চাঁদা আদায় করতে একেবারে একলাটি এই বাড়িতে এসে ঢুকেছে! দাদাবাবু বাড়ি নেই শুনেও বলল কিনা, বউঠাকরোনকে শুধিয়ে এসো চাঁদা দেবেন কিনা!

বিস্ময়ের ধকল সামলে উঠতে সময় লাগল।

দাঁড়িয়ে একটা উপভোগ্য দৃশ্য দেখল যেন প্রসন্নময়ী। বউমণি তার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে—চেয়েই আছে। তারপরেই সমস্ত মুখখানা সিঁদুরে রাঙালো বুঝি। কোনো রূপসীর মুখে লালের এমন বাহার প্রসন্নময়ী আর বোধ হয় কখনো দেখে নি।

তকতকে মেঝেয় বসে নৈমিত্তিক পূজোর নৈবেদ্যর চাল বাছছিল চণ্ডীবউ। হাত অনেক আগেই থেমে গেছল। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। মুখের সিঁদুরের আভা কমেছে, কিন্তু প্রসন্নময়ীর চোখ ফাঁকি দেবার মত একেবারে মুছে যায় নি।

চণ্ডীবউ দ্রুত ভেবে নিচ্ছে কিছু। দৃষ্টিটা প্রসন্নময়ীর মুখের ওপর থমকে আছে।—তুই কি বললি?

আমি আবাব কি বলব, আমাকে জিগেস কবতে বললেন, জিগেস করতে এলাম।

তাব জবাবের ফাঁকে আরো দ্রুত কি ভেবে নিল চণ্ডীবউ। আচ্ছা বসতে বল্, আমি যাচ্ছি।

বউমণি নিচে যাবে শুনে বিস্ময়ে আর একদফা হাবুডুবু খেয়ে উঠল প্রসন্নময়ী। রোমাঞ্চকব উত্তেজনা সামলাতে সে বেবিয়ে এলো।

একলা ঘবে চুপচাপ আরো খানিক দাঁড়িয়ে রইল চণ্ডীবউ। সেবারে ডাব মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়নের কথাটা একবার মনে এলো। কিন্তু পরক্ষণে সে চিন্তা বাতিল করে দিল।

নিজের অগোচরে আস্তে আস্তে ঘুবে দাঁড়াল। দেয়াল জোড়া আয়নায় আপাদমস্তক নিজের মূর্তিটাই দেখল একবার। চুলের বোঝা সুবিন্যস্ত নয় খুব। কেউ না এলেও নিচে নামার আগে এমনিতেই একবার চিরুনি বুলিযে নিত বোধ হয়। কিন্তু আয়নায় নিজেকে দেখলই শুধু, সেদিকে এগলো না। শাড়ির আঁচলটা মাথায় তুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে সিঁড়ির দিকে চলল।

নিচের তলার ঝি-চাকর জ্ঞাতিবর্গ উদ্‌গ্রীব, উন্মুখ। কারো দিকে না তাকিয়েও এধার-ওধারে জোড়া জোড়া বিস্ময়বিস্ফারিত চোখের ঝাপটা খেল চণ্ডীবউ। চাঁদা চাইতে যে এসেছে তার দুর্বার সাহসের খবর সকলেই রাখে। হকচকিয়ে গেলেও সবাই জানে তাব কাণ্ডকারখানা এমনি বিচিত্রই বটে। কিন্তু ঘরের যে বউটি নিচে নেমে সকলের চোখের উপর দিয়ে সোজা ওই অন্দরমুখী বাইরের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল তার তেজ বড় কি মহিমা বড়, সেইটুকুই যেন বিশ্লেষণের বস্তু। আবার বিস্ময়ে এমনই হাবু ডুবু অবস্থা যে চোখের রসদটুকুই সব—বিশ্লেষণের অবকাশ নেই।

দুই ঘরের মাঝের দরজায় পাতলা চিকের পর্দা ঝুলছে। সেটা একটু ফাঁক করে প্রসন্নময়ী দাঁড়িয়ে। এদিকের করে ঘরে পা দিয়ে চণ্ডীবউ মাথার আঁচলটা আরো একটু টেনে দিল। মন্থর পায়ে চিকের সামনে এসে দাঁড়াল।

চমকে চিকের পর্দা ছেড়ে দিয়ে প্রসন্নময়ী ফিরে তাকালো। চোখ-মুখের চাপা উত্তেজনা আর কৌতূহল তরলাকারে ভেঙে পড়ার দাখিল। বউমণি তাকে চলে যেতে বলবে কি দাঁড়াতে বলবে চাউনি বিন্যাসে সেই সঙ্কট।

হাত তুলে নীরব ইশারায় দাঁড়াতেই বলল।

ও-ঘরে কুর্সি ছেড়ে আপনা থেকে আস্তে উঠে দাঁড়াল মদনমোহন। সরু চিকের ওধারে দ্বিতীয় রমণীমূর্তির আবির্ভাবের ছায়া স্পষ্ট হয়েছে। অলঙ্কারের খুব মৃদু রিন-রিন শব্দ কানে এসেছে।

গোটাকতক নিস্পন্দ মুহূর্ত। চিকের পর্দা ফাঁক হল আবার। প্রসন্নময়ীর কালো মুখের আধখানা দেখা গেল। বউমণি এয়েছেন ঠাকুর, কি বলবেন বলুন।

মদনমোহন ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো একবার। তারপর দৃষ্টি আবার অলক্ষ্য অস্তিত্বের আভাসের দিকে ঘুরে গেল। একখানি অবয়বের আভাসই শুধু দেখেছে, আর কিছু না। দু'চোখের প্রসাদলাভের এই বঞ্চনাটুকু সহ্য হবার নয় যেন। সামনের চিকের পর্দার আড়ালটুকু টেনে ছিঁড়েখুঁড়ে দেবার একটা উদগ্র ঝোঁক সামলে নিল। নির্বাক দৃষ্টি আবছা মূর্তির ঊর্ধ্ব-কেন্দ্র থেকে নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। একেবারে শেষপ্রান্তে এসে স্থির। ঘরের মেঝে আর চিকের মাঝে চার-ছ আঙুল ফাঁক যেখানে সেইখানে। শাড়ির লালপাড়ের নিচের অংশ, তার নিচে আলতা-পরা দুখানি পায়ের দুটো লালের রেখা। সেখান থেকে দু'চোখ আর উঠল না।

জবাব দিল, আগেই তো বলেছি...চাঁদা চাই। এতকালের প্রতিষ্ঠান ঢেলে সাজা হচ্ছে, তার জন্যে চাঁদা...।

মুখ সরিয়ে নিয়ে প্রসন্নময়ী বউমণির দিকে তাকালো। ঠাকুরের উক্তি তো স্বকর্ণেই শুনেছে, এখন জবাব কি দিতে হবে সেই প্রশ্ন।

চণ্ডীবউয়ের হাতের চুড়ি আর কঙ্কন একটু জোরেই রিন-রিন করে উঠল আবার। আঙুল তুলে ইশারায় নিজেদের বাড়ির পিছনের দিকটা দেখিয়ে দিল। বুদ্ধি খুব কম ধরে না প্রসন্নময়ী, ইঙ্গিত ঠিকই বুঝে নিল। তবু খুব ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বারইয়ারীর কথা বলব?

চণ্ডীবউ মাথা নেড়ে সায় দিল। কিন্তু সায় পেয়ে বচনপটিয়সী প্রসন্নময়ী এ-রকম কাঠখোট্টা উক্তি করে বসবে ভাবে নি। চিকের ওধারে মুখ বাড়িয়ে মোলায়েম সুরেই ফসফস করে বলে দিল, পিতিষ্টান তো আমাদের দত্তপাড়ায় একটা হল গো দাদা-ঠাকুর, তোমাদের থেকে ঢের ঢের বড় পিতিষ্টেন—তা বউমমিণ নিজেরটা ছেড়ে তোমাদের টাতে চাঁদা দিতে যাবেন কেন? তোমরা কি আমাদের একটি পয়সা দিয়েছ?

একটু আগে প্রসন্নময়ী এই বাইরের মানুষের উদ্দেশে সসম্ভ্রমে আপনি করে কথা বলেছে। রেষারেষির ইন্ধন পাওয়া মাত্র 'তুমি'তে এসে গেল। সেটা কানে না গেলেও এইগোছের উক্তির কারণেই চণ্ডীবউ ঈষৎ বিব্রত এবং বিরক্ত। চিকের ওধারে মদনমোহনের দু'চোখ দুখানি পায়ের লালের রেখার ওপরেই আটকে আছে।

স্পষ্ট গম্ভীর সুরে জবাব দিল, চাইলে দিতে পারি।...তোমার বউমণিকে বলো, আকাশে তারা অনেক, কিন্তু চন্দ্র সূয্যি একটা করেই ওঠে—করণের বারইয়ারী বলতে ওই একটাই, ওতে আমাদের-তোমাদের বলে কিছু নেই।

প্রসন্নময়ী ভেবেছিল তার রসনার ওই এক শরেই মদনঠাকুর ঘায়েল হয়ে সুড়সুড় করে প্রস্থান করবে। তার বদলে বচনবিন্যাসের এই জালে পড়ে মুখ টেনে নিয়ে জবাবের আশায় দু'চোখ আবার বউমণির দিকে ফেরাতে হল। আর বড় ঘোমটা সত্ত্বেও তার মুখখানা একটু লালচে ঠেকল চোখে। রাগের লক্ষণ কিনা সঠিক বোঝা গেল না।

খুব মৃদু, প্রায় অস্পষ্ট গলায় চণ্ডীবউ নির্দেশ দিল, জিজ্ঞেস কর্ ঠাকুর আর শাশুড়ী মা দুজনই কালকাতায়, চাঁদা কে দেবে?

চিকের এধারে মদনমোহনের বুভুক্ষু কান দুটো অন্তত জুড়লো এতক্ষণে। এত মৃদু আর এত অস্পষ্ট কণ্ঠের প্রতিটি বর্ণ তার উৎকর্ণ দুই শ্রবণগ্রাসের ভেতর দিয়ে নিভৃতের এক অমূল্য সঞ্চয়ের কুঠুরিতে গিয়ে জমা হল বুঝি। প্রথম শোনা কণ্ঠস্বরের এই আভাস অনাস্বাদিত একটু শান্তির প্রলেপের মতই।

প্রসন্নময়ীর পুনরুক্তির অপেক্ষা রাখল না মদনমোহন। তার মুখখানা চিকের এধারে ভালো করে গোচর হবার আগেই তেমনি ধীর গলায় জবাব দিল, ওনারা কলকাতায় চলে গেলেও দত্তবাড়ি থেকে প্রার্থীকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হতে পারে ভাবি নি।

প্রত্যুত্তরের নির্দেশ নেবার দরকারটা ভুল হয়ে গেল প্রসন্নময়ীর। কোনো রোমাঞ্চকর বিতর্কের আসরে এক বিশেষ মর্যাদার ভূমিকা পেয়েছে যেন। আধা প্রতিবাদের সুরে বলে ফেলল, দাদাবাবুও তো বাড়ি নেই, চাঁদা দেবে কে?

মদনমোহনের ঠাণ্ডা দু'চোখ আবার প্রসন্নময়ীর মুখের ওপর উঠে এসে স্থির একটু। তাতেই হকচকিয়ে গেল সে। কথা যার সঙ্গে কইছে সে কোন্ দরের মানুষ সে-সম্পর্কে সচেতন হল সম্ভবত। আড়ালের পার্শ্ববর্তিনীর উদ্দেশে মদনমোহন শান্তমুখে বলল, তাহলে চলে যাই?

চণ্ডীবউ দ্রুত ভেবে নিল কি। ওদিকে কি জবাব দিতে হবে হদিস না পেয়ে প্রসন্নময়ীর দুটো গোল চোখ বউমণির মুখের ওপর আটকেছে। বউমণি যদি চলে যেতেই নির্দেশ দেয় তাহলেও একটু বিড়ম্বনার কারণ হবে যেন। অথচ ও ছাড়া আর কেন্ নির্দেশই বা দিতে পারে?

নীরব মুহূর্ত কয়েকটা। হাতেব নড়াচড়ায় মাথার বড় ঘোমটায় একটু টান পড়েছে কিনা চণ্ডীবউ খেয়াল করে নি। পরস্থিতিবিশেষে সঙ্কোচ সিকেয় তুলে রাখতে পারে সে। চিক ঘেঁষে দাঁড়ানোর ফলে ওধারেব মানুষকে প্রায় স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। নিরুত্তাপ মুখে কোনো অশোভন আগ্রহ দেখছে না, চলে যেতে বললে বিনা অভিযোগেই চলে যাবে বোঝা যাচ্ছে।

প্রসন্নময়ীর দিকে তাকালো।—জিজ্ঞেস কর্, ওদিককার দলের সঙ্গে এদিকের একটা বড় কিছু গণ্ডগোল বাধবে শুনছে সকলে—সেটা কেন?

হুকুম তামিল করার দরকার হল না প্রসন্নময়ী কারণ বউমণির এবারের কথাগুলো মৃদু বটে, কিন্তু আগের থেকে আরো স্পষ্ট।

তেমনি ঠাণ্ডা গলায় মদনমোহন জবাব, দিল, গণ্ডগোল বাধতে পারে সে খবর আমাদেরও কানে আসছে। কেন, সেটা এদিকের কর্তাব্যক্তিরাই ভালো বলতে পারবেন।

নাম না করলেও কাকে দায়ী করতে চায় চণ্ডীবউ ভালই বুঝেছে। কানের কাছটা

গরম ঠেকছে তার। প্রসন্ন ফ্যালফ্যাল করে একবার তাকে দেখছে আর একবার মুখ বাড়িয়ে চিকের ওধারের মানুষকে।

আরো একটু স্পষ্ট স্বরে চণ্ডীবউ বলল, আমরা শুনছি গণ্ডগোলের জন্য দুদিকের ভদ্রলোকেরাই তৈরি আছেন।

ওটা করণের গুজব। ও-ব্যাপারে আমাদের কোনো প্রস্তুতি নেই, হাতও নেই।...আমাদের দলটাকে আমরা গোটা করণের দল বলে ভাবি, নইলে চাঁদা চাইতে আসব কেন?

চিকের ফাঁক দিয়ে ওধারের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে চণ্ডীবউ এই আসার কারণটাই আর একবার বুঝে নিতে চেষ্টা করল। বিসদৃশ আচরণের এতটুকু আভাসও চোখে পড়ল না।...এখানে চাঁদা চাইতে আসার মত দুর্বার সাহসের মূল্য দিতে প্রস্তুত চণ্ডীবউ। কিন্তু তার আগে যে কারণে ক'দিন ধরে ভিতরে ভিতরে উতলা হয়ে আছে, সে-সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট অঙ্গীকার পেতে চায় সে। এই দলাদলি রেষারেষির ফলে একটা বড় রকমের রক্তারক্তির আশঙ্কা। সেটাই নির্মূল করে দেবার ইচ্ছে। চাপা উত্তেজনা দমন করে ধীরে অনুচ্চস্বরে বলল, এ ব্যাপারে একজন লোকেরও কোনরকম ক্ষতি হবে কিনা জানা দরকার।

মদনমোহনের স্থিরদৃষ্টি ওদিকের আবছা মূর্তির দিকে থমকে রইল খানিক। তারপর জবাব দিল, আমাদের হাত দিয়ে হবে না।

এটুকু শোনার পর হঠাৎ আবার আত্মস্থ হল চণ্ডীবউ। প্রসন্নর চোখে চোখ পড়তে খেয়াল হল কথাবার্তা তাকে বাদ দিয়ে সরাসরি হয়ে গেল। তার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ভেবে নিল কি।

বসতে বল্। ধীর শান্ত বিজয়িনীর পদক্ষেপে অন্দরের দিকে ফিরে চলল।

মদনমোহন বসল না। ভেতরটা যেন ভরাট হয়ে গেছে। নিজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। কি পেল, কেন এ-রকম হল বিশ্লেষণ করার তাগিদ নেই। চাঁদা পাবে, না পেলেও এই প্রাপ্তির অনুভূতির বোধ করি তারতম্য হত না। কিন্তু অনেক পেলেও পাওয়ার শেষ মেটে না বুঝি। এ পরিপূর্ণতার মুখেও হঠাৎ কি-রকম একটা ছায়া পড়ার দাখিল। সেটা সরাবার অসহিষ্ণু তাগিদ।...চাঁদা পাবে...সামনে চিক ফাঁক করে যে পরিচারিকা দাঁড়িয়ে, তার হাত দিয়ে পাবে।

দত্তবাড়ির বউয়ের কাছ থেকে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর জন্য মদনমোহনের চাঁদা চাইতে আসাটা গুরুগম্ভীর পর্যায়ের ব্যাপার নয় কিছু। বন্ধুবান্ধব সঙ্গীসাথীরা শুনবে যখন, উৎকট রকমের হৈ-হৈ করে উঠবে, হাসি-মস্করায় ফেটে পড়বে। কিন্তু মদনমোহন জানে সে স্বেচ্ছায় এই বৈচিত্র্য ঘটাতে আসে নি। না এসে পারে নি, তাই এসেছে। এক অন্ধ অনুভূতি তাকে টেনে এনেছে। তাই এতক্ষণের মধ্যে তার আচরণে বা তার নিভৃতে কোনরকম লঘু চপলতার লেশমাত্রও ছিল না। এখনো নেই। তাই এবারেও যা করল, এক অব্যক্ত অদৃশ্য তাগিদেই করল।

প্রসন্নময়ীর মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল।—তোমার নাম যেন কি!

পেসন্নময়ী।

আচ্ছা প্রসন্নময়ী, একটা কাজ করতে পারো?...আমার শরীরটা ভালো নেই বড় তেষ্টা পেয়েছে...এক গেলাস জল বা একটা ডাব-টাব এনে দিতে পারো?

বামুনের ছেলের তেষ্টা পেয়েছে শুনে প্রসন্নময়ী ব্যস্ত হয়ে উঠল।—আপনি বসুন গো ঠাকুর, এখুনি এনে দিচ্ছি।

চলে গেল। মদনমোহন আরো উন্মুখ। মুখ ফুটে বলেছে যখন জলের বদলে ডাবই আনবে মনে হয়। তাতে একটু বেশি সময় লাগার কথা।—এখন ভাগ্যের পরীক্ষা।

অশান্ত প্রতীক্ষায় কাটল খানিক। এবারে চিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে মদনমোহন। ওধারে প্রত্যাশিত পদার্পণ।

ঘরে পা দিয়ে চণ্ডীবউ প্রসন্নকে না দেখে থমকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকালো। চিকের ওধারে আছে কিনা ঠাওর করতে পারল না। ভুরুর মাঝে বিরক্তির রেখা পড়ার উপক্রম।

সময় নষ্ট করার মত অবকাশ যে হাতে নেই, মদনমোহনের থেকে বেশি আর কে জানে। কিছুটা গম্ভীর আবেদনের সুরে বলল, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি, চাঁদাটা পেলে চলে যাই।

কি করবে ভেবে না পেয়ে চণ্ডীবউ কয়েক পা এগিয়েই এলো। তারপর আবার ফিরে গিয়ে প্রসন্নকে খুঁজে পেতে ডেকে আনাটা বিসদৃশ ঠেকল কেমন। অগত্যা আরো একটু এগিয়ে চিক ফাঁক করে আড়াল থেকেই টাকা সমেত হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

ওই একখানা হাত ছাড়া মদনমোহন এই দুনিয়ায় আর কিছু দেখছে না। অঞ্জলি পাতার মত করে নিজের দু'হাত পেতে এক অপার্থিব দান গ্রহণ করল বুঝি। দাত্রীর শুভ্র নিটোল সালঙ্করা হাতখানি চিকের আড়ালে সরে যাওয়া মাত্র আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে দ্রুত প্রস্থান করল সে।

এবারে আস্তে আস্তে চিকটা ঠেলে চণ্ডীবউ শূন্য ঘরটার দিকে তাকালো একবার। তার পরেও একটু দাঁড়িয়ে থেকে গোটা ব্যাপারটা মাথায় নেবার চেষ্টা বোধ হয়। কিন্তু তার আগেই প্রসন্নময়ীর আবির্ভাব।

উদ্ধত রোষের মুখে তার হাতে পাথরের গেলাস দেখে চণ্ডীবউ অবাক। আর চিক সরিয়ে ওদিকের ঘর ফাঁকা দেখে দ্বিগুণ অবাক প্রসন্নময়ী।

ওমা! তেষ্টার মুখেই ঠাকুরকে বিদেয় করলে নাকি? নিজে থেকে ডাব খেতে চেলেন যে গো!

চণ্ডীবউ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল তার দিকে।

তারপরেই একসঙ্গে একরাশ রক্তকণা মুখের দিকে ধাওয়া করল বুঝি। পরক্ষণে লাল আবির-গোলা মুখে তরতর করে প্রসন্নময়ীর বিমূঢ় চোখের আড়াল হয়ে গেল চণ্ডীবউ।

উত্তেজনা আর হৃদয়গহনের দুর্গম আবেগ এক বস্তু নয়। একটির বাস স্নায়ুতে, অপরটির চিত্তের গভীরে। একটির শুধু ছটা, অপরটি শিখাদীপ্ত। একটি সুলভ, অন্যটি বিরল। উত্তেজনা কল্পনার ডানায় ভর করে ছোটে, হৃদয়াবেগ বাস্তবে ঝাঁপ দিতে চায়। একটি দোসর খোঁজে, অপরটি নিভৃতচারী।

এই বিভেদে সদ্য বর্তমানের গোটা করণ থেকে শুধু একটি মানুষ বিচ্ছিন্ন। মদনমোহন। যারা তাকে মাথায় তুলে নাচতে চাইল, তাদের থেকেও।

দত্তবাড়ি থেকে বেরিয়ে কোন দিকে তাকায় নি। বিস্ময়ের ধাক্কায় কত জোড়া চোখ কপালে ওঠার দাখিল তাও লক্ষ্য করে নি। সোজা বাড়ির পথে পা বাড়িয়েছে। সেও অভ্যেসে, নইলে পথের দিশাও ছিল না। যে অনুভূতি একটা স্পর্শের মত সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে আছে সেটুকু ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো অস্তিত্বের সম্পর্কে সে সচেতন নয়। এটুকু তার একান্ত সঙ্গোপনে আগলে রাখার বস্তু। এই মুহূর্তে লোকচক্ষুর আড়ালে দুনিয়া ছাড়া হতেও আপত্তি নেই তার।

কিন্তু তা হবার নয়।

বড় দীঘিরও মাঝখানে একটা ঢিল পড়লে তার তরঙ্গ-বৃত্ত বড় হয়ে হয়ে পারের দিকে ছড়ায়। এ তো ছোট করণের মন-সরোবরে মস্ত একটা পাথরের চাঙ পড়ার মত ব্যাপার।

বাড়ি এসেও অন্দরের দিকে এগোয় নি মদনমোহন। নাটদালানের নিরিবিলিতে এসে বসেছে। বাধা না পড়লে সকাল পেরিয়ে দুপুর ছাড়িয়ে বিকেল গড়িয়ে যেতে পারত। নাটদালানে এসে দেয়ালের গায়ের যে রঙিন চিত্রকারু চোখ টানে তার—রামায়ণ-মহাভারতের সেই সজীব মুখ-চরিত্রাবলীও অলক্ষ্যেই থেকে গেল। মদনমোহন নিজের নিভৃতে অবগাহন-মগ্ন।

বাধা পড়ল।

মদন ঘোষালকে দত্তবাড়ি থেকে বেরুতে দেখে যে ক'জোড়া চোখ কপালে উঠেছিল, তাদের কৌতূহল সরব হয়ে উঠতে সময় লাগে নি। দেখতে দেখতে সেই সরব তরঙ্গ-বৃত্ত বৃহৎ হয়ে উঠেছে।

খবরটা দক্ষিণপাড়ার শুভানুধ্যায়ীদের কানে যেতে তারা হতচকিত প্রথম। দলনায়কের মতিগতির কূল মেলা ভার। মতিচ্ছন্ন কিনা তাই বা কে জানে। দুই দলের মধ্যে যে শত্রুতা দানা বেঁধে উঠেছে, তাতে সব থেকে বেশি সাবধান হবার কথা ওই মদন ঘোষালের। সুবিধে পেলে রাধানাথ যে আর ছেড়ে কথা কইবে না তার লক্ষণ অস্পষ্ট নয় একটুও। এসময়ে কিনা একেবারে বাঘের গর্তয় গিয়ে ঢোকা! অক্ষত ফিরেছে কিনা তারই বা ঠিক কি!

অতএব ছিরে পাগলা সদলবলে উপস্থিত মদনমোহন-সন্নিধানে। মুন্‌কে ভট্‌চাযের সঙ্গে দেখা হতে তাকেও হিড়হিড় করে টেনে এনেছে। তখনো দলাদলি চলছে শুধু, পাকাপাকি দল ভাগ হয়ে যায় নি। মুন্‌কে ভট্‌চাযের কপালে কোনো দলের ছাপ না পড়ে তো বেঁচে যায়। এক দলের ছাপ পড়ে গেলে অন্য দল তাকে খেতে ডাকবে এমন আশা বাতুল করে। তার উপর কৌতূহলের টান তো আছেই। ওদিকে গেঁজেল সহায় ভট্টও গুটিগুটি না এসে পারে নি। শুনছে যা, সাতসকালে ওই ঘোষাল-পো কষে গাঁজায় দম দিয়েছিল কিনা সেই সংশয় তার। অনাথায় অমন শত্রু-প্রেমিক হয়ে ওঠা সম্ভব কি করে!

দু'হাত কোমরে তুলে আর দুই চোখ যথাসম্ভব ধারালো করে ছিরে পাগলা আগে মদনমোহন দর্শন-পর্ব সম্পন্ন করে নিতে চাইল। কোনরকম আঘাতের চিহ্ন বা বে-ইজ্জৎ হবার লক্ষণ চোখে পড়ল না।

বিরক্তি চেপে নির্লিপ্ত মুখে মদনমোহন জিজ্ঞাসা করল, কি খবর?

জোড়া জোড়া চোখগুলো তার মুখের ওপর নিঃশব্দে ঘুরল একপ্রস্থ। আর ছিরে

পাগলা তেমনি নীরবে তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করল একবার। অর্থাৎ অবয়বের চারদিক দেখে নিল।

খানিক আগে তুমি দত্তবাড়ি গেছলে?

হ্যাঁ।

কেন?

বারইয়ারীর চাঁদা আদায় করতে।

সকলের গলায় একটাই অস্ফুট বিস্ময় ভেঙে পড়ল।—কি কাণ্ড! বলো কি!

শুধু মুন্‌কে আর গেঁজেল ভট্টর দু'চোখ বিস্ফারিত। দম বন্ধ করে ছিরে পাগলা বলে উঠল, চাঁদা আদায় করতে রাধানাথের কাছ থেকে!

না।

তবে? দত্তমশাই তো কলকাতায়! তাহলে...তাহলে দত্তবাড়ির চণ্ডীবউয়ের কাছ থেকে?

মদন ঘোষাল তেমনি নির্লিপ্ত মুখে ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ তাই।

বড় ঢেউ পারে এসে আছাড় খায়। এই বিস্ময়ের শেষ তরঙ্গ নাটদালানের এই ঘরে এসে ভাঙল এবারে। গলা দিয়ে কোঁ-কোঁ দুটো শব্দ বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে ছিরে পাগলা প্রতিরোধ করল সেটা। ঘাড় ফিরিয়ে প্রথমেই মুন্‌কে ভটচাযের ভুঁড়িতে আচমকা কনুইয়ের গুঁতো দিল একটা। তার দুর্দশার দিকে না তাকিয়ে দু'হাতে গেঁজেল ভট্টর মাথাটা ধরে বেশ করে ঝাঁকিয়ে দিল বারকয়েক। নিজের মাথাটা স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কিন্তু ওদের দিয়ে বোঝার চেষ্টা। ঠিকই আছে, কারণ মুন্‌কে ভুঁড়িতে হাত বুলোচ্ছে আর সহায় ভট্টর নাক কান চোখ দিয়ে অদৃশ্য গাঁজার ধোঁয়া বেরুচ্ছে মনে হয়। হামলার ভয়ে দলের অন্য সঙ্গীরা একটু সরে দাঁড়াতেই চুক করে মদনমোহনের একবোরে পায়ের কাছটিতে বসে পড়ল ছিরে পাগলা। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা সেই পায়েব ওপর নোয়াতে লাগল।

ও কি! সচকিত মদনমোহন পা সরিয়ে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে ভাববিহ্বল ছিরে পাগলার গলায় আকুতি ঝরল,

> রাখো রাখো নাথ, এই শির তব চরণে রাখো,
> চরণে রাখো, শরণে রাখো, মিনতি রাখো,
> ওই পদরজ অভাগার ললাটে মাখো!

মদনমোহন অল্প অল্প হাসতে লাগল। ব্যাপারখানা এরা যত বড় করে দেখতে চায়, সে ততো বড় করে দেখাতে চায় না।

ওই মুখে হাসি দেখে হঠাৎ অসহিষ্ণু একটা ভ্রূকুটি করে শ্রীনাথ তাকালো তার দিকে।—চাঁদা আদায় করতে পেরেছ?

মদনমোহন মাথা নাড়ল, পেরেছে!

কে দিল রাধানাথের বউ?

মদনমোহন আবার মাথা নাড়ল।

নিজের হাতে দিল?

জবাব এড়াবার জন্য এবারে মদনমোহান জোরেই হাসল।

কিন্তু হাবভাবে আর কৌতুকের লেশমাত্র নেই শ্রীনাথের। তার সামনে যেন হাতে-নাতে ধরা আসামী উপস্থিত একটি।—কত দিল?

দেখি। কামিজের জেব থেকে টাকার গোছা বার করে মদনমোহন নির্লিপ্ত মুখে গোনা শুরু করল।

কত পেলে না পেলে এ পর্যন্ত গুণে দেখারও সময় হয় নি?

মদনমোহন থতমত খেল একটু। সত্যিই যা পেয়েছে তা গোণা-গুণতির বাইরে। কিন্তু অন্য সকলের আগ্রহের ফাঁকে আশ্রয় মিলল যেন। টাকার গোছার থেকে তারা পরিমাণ ঠাহর করার চেষ্টায় ব্যগ্র। একসঙ্গে অত টাকা আর কোথাও মিলেছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু গোনা শেষ হবার আগেই শ্রীনাথ ছোঁ মেরে টাকার গোছা নিয়ে নিল। বলল, থাক্, গুণতে হবে না, বারইয়ারীর টাকা তো শিরোমণি মশায়ের কাছে থাকে—দিয়ে দেব, সে-ই গুণে নেবে।

মুহূর্তের মধ্যে স্নায়ুতে স্নায়ুতে কিছু যেন হয়ে গেল মদনমোহনের। রিক্ত অনুভূতি একটা। ছিরে পাগলা আচমকা বুঝি সর্বস্বান্ত করে দিল তাকে। ক্রুদ্ধ গম্ভীর চোখে সে চেয়ে রইল তার দিকে।

আর, সেই কয়েক লহমার মধ্যে বিপরীত মুখ ছিরে পাগলার। ঘাবড়ে গেছে যেন। টাকার গোছা আবার মদনমোহনের হাতে গুঁজে দিল। তারপর তেমনি আচমকা তার মাথাটা দু'হাতে সাপটে ধরে কাছে টেনে এনে কানে কানে বলল কি। মদনমোহনের বিব্রত মুখ আবার।

একটা ঝটকা মেরে ছিরে পাগলা উঠে পড়ল। ব্যস্তসমস্ত। এর হাত ধরে টেনে ওকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠল, চলো চলো সব ঘরে চলো, রসের বাটিতে যেন পিঁপড়ে আটকেছে একগাদা, নড়া-চড়ার নাম নেই—বেলা গড়িয়ে গেল, এখনই শুকনো মুখ বাছার, এরপর কখন চান হবে কখনই বা স্ব-পাক আহারের তোড়জোড় করবে!

নিতান্ত বেরসিকের মতই ঠেলে-ঠুলে সকলকে নিয়ে বেরিয়ে এলো সে। পথে নেমে আর এক দফা থমকে তাকালো। রুষ্ট গম্ভীর চোখ পাকিয়ে দেখে নিল একপ্রস্থ। তারপরেই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তারস্বরে গাধার ডাক ডেকে উঠল বারকতক। হুলবোলা নাম সার্থক তার—সভয়ে হাতকয়েক করে পিছিয়ে গেল অনেকেই। কিন্তু ছিরে পাগলার মুখ দেখে মনে হল সরোষে তাদেরই সে এক-একটি আস্ত গাধা বলতে চাইছে।

ডাকের রেশ তাদের কান থেকে বিলীন হবার আগেই এগিয়ে গিয়ে গেঁজেল বাদশা সহায় ভট্টর গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল প্রায়, গলার স্বর হতাশায় ভেঙে পড়ার দাখিল।

সখা হে! আর যে গো গাঁজার নেশা জমবে না।
এই সাদা চোখে আর গাঁজার ধোঁয়া
লাগবে না
ভাতারকে আর মা বলে যে
ডাকবে না

হায় হায় হায় হায়, হায় হায় হায়
অনঙ্গশরে যে গো ভোলানাথের
কক্ষে ভেসে যায়

রসের এই নতুন হাওয়া ওদের মগজের দিকে ধাওয়া করার আগেই মুন্‌কে ভট্‌চাযের একখান হাত বগলদাবা করে ছিরে পাগলা হন হন করে হেঁটে চলল একদিকে। দশ গজ না এগোতে মুন্‌কে হাঁফ ধরার দাখিল। শরীরটা ছেড়ে দিতেই গতি আপনা থেকে শিথিল হল। তারপর হাত ছাড়ালো।

কি ব্যাপার ঠিক বোঝা গেল না তো!

শ্রীনাথ টিপ্পনী কাটল, তোমার কোমর থেকে চক্ষু পর্যন্ত উদর আর তার ওপর থেকে মাথা পর্যন্ত উদরের চিন্তা—বুঝবে কি করে?

ওই টাকা সত্যি চণ্ডীঠাকরোন দিয়েছেন?

না তো কি ঘোষাল-পো মিছে কথা কইছে!

এক অধরা উত্তেজনায় মুন্‌কে ভট্‌চায হাঁসফাঁস করল একটু।—তাহলে ব্যাপারখানা ভালো করে না শুনে হুট্‌ করে চলে আসার মানে কি হল?

না এলে মদনমোহন এরপর আমাদের ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে তাড়াত। ওর এখন নির্জনতা দরকার।

কেন, নির্জনে কি করবে?

বসে বসে ওই টাকার গন্ধ শুঁকবে। তারপব সযত্নে তোরঙ্গে তুলে রাখবে।...ও টাকার মুখ এক মদন ঠাকুর ছাড়া আর কেউ কোনোদিন দেখতে পাবে না।

সে কি! মদনমোহন টাকাগুলো সব মেরে দেবে—বারইয়ারীতে দেবে না!

বুদ্ধির ঢেঁকি! মেরে দেবে কেন, বাস্কয় নিজের টাকা নেই ঘোষালপো'র? তাই থেকে টাকাটা দিয়ে দিতে পারবে না?

ছিরে পাগলার মুখ গম্ভীর, কিন্তু ভেতরটা অচপল নয় আদৌ সেটুকু বোঝার মত বুদ্ধি মুন্‌কে ভট্‌চাযের আছে। রহস্যটা এর পরেও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসছে না। একটু থেকে জিজ্ঞাসা করল, তাতে কি লাভ?

শ্রীনাথ চোখ পাকিয়ে তাকালো তার দিকে। ভুঁড়িতে একটা গুঁতো মেরে বুদ্ধি খোলসা করে দেবার বাসনা। লোভ সামলে তিরিক্ষি মেজাজে বলে ওঠল, কি লাভ? বলি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পেটে পুরেও তুমি ছোঁক ছোঁক করে ওই ধুমসী পেসন্নময়ীর কাছে যাও কোন্‌ লাভের আশায়?

নির্বোধের সংস্রব এড়ানোর জন্যেই যেন পাশের মেঠো রাস্তা ধরে হন হন করে এগিয়ে গেল ছিরে পাগলা। মুন্‌কে ভট্‌চায বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে। প্রথম অনুভূতিতে কানের ভিতরটা কি রকম করে উঠল তার। চণ্ডীবউয়ের তীক্ষ্ণ ধারালো অথচ রূপ-লাবণ্যে ভরা মুখখানা চোখের ওপর দিয়ে ঝলসে গেল। তাকে এমন চটুল রসিকতার মধ্যে টেনে আনার অপরাধ যেন মুন্‌কে ভট্‌চাযেরই।

কিন্তু তারপরেও ব্যাপারটা ভালো করে বোঝার একটা অদম্য আগ্রহ ভেতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল। ভাবছে, মদন ঠাকুরের সাহসের অন্ত নেই, বুক ঠুকে চাঁদার জন্যে সে-ই পারে দত্তবাড়িতে গিয়ে হাজির হতে।

...কিন্তু চণ্ডীবউ টাকা দিতে গেল কেন?

নতুন তরঙ্গের সব থেকে বড় ঢেউটা এসে ভাঙল রাধানাথের বুকের মধ্যিখানে।

তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও এই আঘাতে ভুলুণ্ঠিত একেবারে। কল্পনার এক-একটা ভাঙা-চোরা ডালপালা আশ্রয় করে কে কোথায় ছিটকে পড়ল ঠিক নেই।

...দত্তবাড়ির চণ্ডীবউয়ের কোন্ কম্মটা বিশ্বাস করবে আর কোন্টা করবে না? এযাবৎ একের পরে এক বিস্ময়ের ধকল সামলাতে সামলাতে কতবার তাদের রঙিন নেশা চটে গেছে। কিন্তু আজকের এই খবরের পর ভরা দুপুরে ঠোঁটের ডগায় এক-বিন্দু কিছু না ঠেকিয়েও মাথাটা মাতালের মতই ভোঁ ভোঁ করছে তাদের।

...মদনমোহন একলা গেছল দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর চাঁদা চাইতে ওই দত্তবাড়ির চণ্ডীবউর কাছে আর তার গর্দান নেবার বদলে প্রসন্ন দাক্ষিণ্যে তার হাতে টাকা ঢেলেছে চণ্ডীবউ—এও বিশ্বাস করতে হবে তাদের? নাকি গাঁজায় দম দিয়ে বসে আছে করণের মানুষগুলো? উদ্ভট কল্পনার ছাই সত্য বলে ওড়াবে সব?

এমনি হতচকিত অবস্থার মধ্যে রাধানাথের বাড়ি থেকে একটা চাকর এসে হাজির। যা সচরাচর হয় না। তার নিবেদন, ছোট দিদিমণি ছোট কর্তাকে এখুনি বাড়ি আসতে বলছেন একবারটি। বিশেষ দরকার।

রাধানাথের ভিতরে ভিতরে যে অদৃশ্য নখদন্ত থাবা মেলছিল আর মুখব্যাদান করছিল, সেগুলো বুঝি এই গোবেচারা চাকরটার অস্তিত্ব ফালা-ফালা করে দিতে উদ্যত।

এগিয়ে এলো।—কেন ডেকেছ?

সে মাথা নাড়তেই চাপা গর্জন আবার।—একেবারে খুন করে ফেলব সব, ছোড়দি কেন ডেকেছে?

ঘাবড়ে গিয়ে চাকরটা জবাব দিল, তেনার বোধহয় শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার ইচ্ছা।

রাধানাথ থমকে চেয়ে রইল খানিক।—সকালে ঘোষালবাড়ির ছেলে এসেছিল?

মূর্তি দেখে চাকরটার প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া। মাথা নাড়ল। এসেছিল।

চাঁদা নিয়ে গেছে?

পেসন্ন বলছিল নিয়েছেন।

বউমণি নিজে দিয়েছে?

পেসন্ন বলছিল—

বেচারা চড় খেতেই এসেছিল যেন, ঠাস করে গালে আচমকা চড় পড়তে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো।

রাধানাথ আসরে ফিরে গেল। খানিক আগেও রসের আসর ছিল এটা, এখন শোকের আসর। শোকের মুখ সকলের।

স্তব্ধ রাধানাথ বোতল বার করল। ছোড়দি কেন লোক পাঠিয়ে ডেকে থাকতে পারে সে-চিন্তা মনের কোণেও ঠাঁই পেল না আর। বোতল হাতে নিয়ে ঘোলাটে চোখে সঙ্গীদের দিকে তাকালো একবার। তাপের নির্বাক চোখে নীরব অনুমোদন,

অর্থাৎ এই সঙ্কটে এ ছাড়া আর গতি কি! সেই সঙ্গে চোখে-মুখে অস্বস্তিও একটু—বোতল মাত্র একটা বেরুলো কেন? স্নায়ু কি তাদেরও বড় বিচ্ছিরি ভাবে নাড়া-চাড়া খায় নি?

বোতল হাতে অনুগত সঙ্গীদের মুখের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎ একটা উৎকট ইচ্ছে জাগল রাধানাথের। ইচ্ছে হল একটার পর একটা বোতল বার করে ওদের মাথায় একে একে ভাঙে।

ছিপি খুলে বোতলটা মুখে উপুড় করে ধরল। ঢালছে, ঢেলেই চলেছে।

স্নায়ুগুলো একে একে যেন জায়গামত গিয়ে বসতে লাগল। খানিক বাদে অর্থাৎ দ্বিতীয় দফায় সঙ্গীদের বুক খালি করে বোতলটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসতে সেই স্নায়ুতে চিন্তার বৈচিত্র্য দেখা দিতে লাগল।

...রাধানাথ ভাবছে।

...বউ কি দেবী না দানবী?

...এই দত্তপাড়ায় নতুন বারইয়ারী তুলে দিয়ে ওই বউ স্বপ্ন-উর্বশীর নাচ মর্ত্যে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করল।...ঘোষালের ছেলের মুখে চুনকালি দেবার জন্যে নিজে কোমর বেঁধে লেগে অবুঝ বাবাকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করল।

সেই ছেলেরই কোলে মাথা রেখে একবার মায়ের থানে ঢলে পড়ল, আর একবার ঘোমটা খসিয়ে চণ্ডীমূর্তি ধারণ করল।

...কু-কথা বলেছে শুনে রণরঙ্গিণীর মত দু'চোখে আগুন ঠিকরিয়ে একবার ঘোষালের ওই ছেলের মুখ পায়ের তলায় থেঁতলাতে চাইল, আবার সেই ছেলে চাঁদা চাইতে এল যখন, তার দু'হাত ভরে টাকা দিয়ে দিল!

ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল রাধানাথ। টেনে টেনে বলল, তার এক হাতে সুধাপাত্র, অন্য হাতে বিষভাণ্ড।

সভাসদরা ঘন ঘন মাথা নেড়ে উঠল। কথাগুলো এক মুখ থেকে আর এক মুখে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল। এক হাতে সুধাপাত্র, অন্য হাতে বিষভাণ্ড! এ ছাড়া আর কি? আর কি হতে পারে? আ-হা আ-হা রব তুলে কেউ কেউ সাহসে ভর করে বোতলের জন্য হাত বাড়াল।

কিন্তু রাধানাথের ভিতরে তখনো বিষের যাতনাটাই বেশি। বোতল আবার নিজের মুখেই উপুড় করল সে।

কি করবে রাধানাথ এখন? বাড়ি যাবে? বাড়ি গিয়ে সেই একঘেয়ে কৈফিয়ত দাবি করবে? যা এ পর্যন্ত অনেকবার করেছে, আর বউ ঝলসে উঠে এমন কিছু বলেছে যার ফলে চিড়বিড় করতে করতে আবাব বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে! সেই একঘেয়ে নাটকের দাপাদাপি চলবে আবার?

আসর ছেড়ে সোজা রাস্তায় এসে দাঁড়াল। বাড়ির দিকে নয়, পা চালালো কুসুমবাঈ এর ডেরার দিকে। মাথার ওপর সূর্য আগুন ঢালছে। রাধানাথের মাথার আগুন তার থেকে আপাতত কম চড়া নয় বলেই টের পাচ্ছে না।

পৌঁছুল যখন, ঘেমে নেয়ে গেছে। পা দুটো আর দেহের ভার বহনে গররাজি। ধুপ করে কুসুমবাঈয়ের অবিন্যস্ত শয্যায় বসে পড়ল। অবিন্যস্ত কারণ এ-সময়ে বাবু আসতে পারে সেটা অতি বড়আশাবাদিনীর পক্ষেও ভাবা শক্ত।

কুসুমবাঈকে দেখা-মাত্র একটা ক্রূর অভিলাষ যেন দেহের পাতাল থেকে ফুটো ঘোলাটে চোখের দিকে ঠেলে উঠতে লাগল। রূপোপজীবিনী কুসুমবাঈকে দেখছে না ঠিক, প্রমীলাকুলের একজনকে দেখছে যাদের সকলকে এই মুহূর্তে ধ্বংসের চিতায় জ্বলে-পুড়ে মরতে দেখলে রাধানাথ অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে পারত। ওমনি একটা ধ্বংসের আমন্ত্রণ নিয়েই যেন দু'হাত বাড়াল তার দিকে।

আত্মরক্ষায় অধিকার সকলেরই। অসময়ে এই উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তি পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে কুসুমবাঈ বড়দরের কিছু গণ্ডগোলের ঘ্রাণ পেয়েছে। সুচতুরার মতই আবার একটা বোতল আর গেলাস এনে সামনে ধরেছে তার। অর্থাৎ ভেতরটা নরক না হলে নরকের আগুন জ্বলবে কি করে!

দ্বিতীয় দফায় এই বোতল সম্পূর্ণ খালি করার মত অবকাশ মিলল না। তার আগেই রাধানাথ শয্যায় মুখ থুবড়ে পড়ে অঘোরে ঘুমুতে লাগল।

সূর্য তখন পাটে নেমেছে। বাড়ির পিছনে আমতলার দিকটায় সূয্যি ডোবার আগে আঁধার ঘনায়। রাধানাথ ওই পথে বাড়ি ফিরছিল। অবসন্ন স্নায়ুগুলো তখনো কোনো নির্দিষ্ট চিন্তার পথে জোট বাঁধতে পারে নি। বাইরের পদক্ষেপের মতই ভেতরটাও ছাড়া-ছাড়া।

আবছা আঁধারে বাগানের নির্জন পথ ধরে আসছিল। স্নায়ু সজাগ থাকলে এ সময়ে এ পথ ভাঙার কথা নয়। সাপটাপের ভয় আছে। আর, সে-ভয় রাধানাথের বেশি ছাড়া কম নয়। কিন্তু ও-সব ভয়-ভাবনা আপাতত মাথায় ঢোকে নি। ঘুম ভাঙতে অভুক্ত শরীরটাকে টেনেটুনে দাঁড় করিয়েছে। বাড়ি ফেরার তাগিদে কুসুমবাঈয়ের দিকে ফিরেও তাকায় নি।

আমবাগানের পথ ধরে আসতে আসতে ভাবছিল রাধানাথ, ও-রকম একটা টানা ঘুম দিয়ে উঠে ভালই হয়েছে। খানিকটা শক্তি সঞ্চয় হয়েছে। ওই মাথা নিয়ে সকালে বাড়ি ফিরলে সুবিধে হত না। এই দিনেই সন্ধ্যা পর্যন্ত সে বাড়ি ফিরল না দেখে বউয়ের একটু ভয় ধরা স্বাভাবিক। বউ চিন্তা-ভাবনার সময় পেয়েছে, দুর্বল হবার অবকাশ পেয়েছে। বাড়ি ফিরে ধীরেসুস্থে রাধানাথ এখন বিচারের নির্মম দণ্ড হাতে নিতে পারবে।

হঠাৎ সচকিত।

সভয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে বাড়ির পিছনের ঝাঁকড়া আমগাছটার দিকে চোখ চালালো রাধানাথ। সেদিক থেকেই সড়সড় শব্দ কানে এসেছে একটা। চোখ একটু বসতে বিমূঢ় হঠাৎ। আমগুঁড়ির পাশে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে।

পরমুহূর্তে সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি। শরীরের সমস্ত শিথিল স্নায়ুগুলো একসঙ্গে টানা দিয়ে উঠল বুঝি। আর তার ভিতর দিয়ে উষ্ণ রক্তস্রোত বন্যার মত মাথার দিকে ধাওয়া করল।

...লোকটা দাঁড়িয়ে, আর তার সামনে ঝুঁকে দাঁড়ানো মানুষটার সামনেই, আমগুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আবছা মূর্তির মত বসে আছে আর একজন।

রাধানাথ নিঃসংশয় সেই একজন মেয়েমানুষ।

রাধানাথের চোখের সম্মুখ থেকে আমবাগানের নির্জন আবছা আঁধারে একটি

পুরুষ এবং একটি রমণী ভিন্ন দুনিয়ার এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্ভব অসম্ভবের অস্তিত্ব মুছে গেছে।

কতক্ষণ বা ক'টা মুহূর্ত অমনি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিল জানে না। পায়ে পায়ে রাধানাথ এগিয়ে গেছে তারপর। সোজাসুজি এগোয় নি, ঝাঁকড়া আমগাছটার পিছন দিক ধরে খুব সন্তর্পণে এগিয়েছে। একেবারে সামনে গিয়ে না পড়া পর্যন্ত দু'তরফের কেউ কাউকে দেখতে পাবে না।

আঁধার ফুঁড়ে রাধানাথ সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র অস্ফুট আর্তনাদ করে চমকে উঠল সেই মেয়ে-পুরুষ। হঠাৎ যেন ভূত দেখেছে তারা। রাধানাথকে দেখার পরেও ভূতই দেখছে।

একই সঙ্গে রাধানাথ নিজেও হতভম্ব, বিমূঢ়।

...একটি পুরুষ আর একটি রমণীই বটে। পুরুষ এক হাতে আমগাছে ভর দিয়ে খুব ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল আর রমণী আমগুঁড়ির ওপরে ঠেস দিয়ে বসে ছিল।

তারা প্রসন্নময়ী আর মুন্‌কে ভট্‌চায।

সম্বিৎ ফিরতে প্রসন্নময়ী হাঁসফাঁস করে উঠে দাঁড়াল কোনরকমে। গলা দিয়ে আবার একটা অস্ফুট আর্তনাদের মত শোনালো।—হতভাগা মিনষে কেচ্ছা শোনার লোভে আমাকে এখানে ডেকে এনে পথে বসালো গো!

বলতে বলতে ছুট্। ওদিকে মুন্‌কেও ভুঁড়ি সামলে অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে দ্রুত চোখের আড়ালে মিলিয়ে যেতে লাগল।

বিমূঢ় মুখে রাধানাথ দাঁড়িয়ে তখনো। কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে।

প্রসন্নময়ীর হতচকিত উক্তি মিথ্যে নয়। পেটুক মুন্‌কে ভট্‌চায অমন আজব রসের খবরটা শোনার লোভেই প্রসন্নময়ীকে এই নিরিবিলিতে টেনে এনেছিল। ছিরে পাগলার কোন্ কথা কতটা সত্যি ঠাওর করা শক্ত। অপর কারো ব্যাপার হলে সে অতটা মাথা ঘামাতো না। কিন্তু দত্তবাড়ির চণ্ডীবউকে নিয়ে কথা। যার মুখখানা মনে এলেই দু'চোখ নীচু করার মত একটা আঁচ এসে লাগে—রূপের এমনি তেজ।

কিন্তু সেই রূপে আর তেজে ঘোষালপো মদন ঠাকুর মজেছে শুনলে ভিতরটা কতক্ষণ আর স্থির থাকতে পারে! চণ্ডীবউয়ের তরফ থেকে কোনরকম প্রশ্রয় আছে কিনা সে সম্ভাবনার কথা মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিতে সভয়ে জিভ কেটেছে মুন্‌কে ভট্‌চায। মনে মনে নাক-কান মলেছে। কিন্তু অত বড় শত্রুপক্ষকে চাঁদা কেন দিল চণ্ডীবউ সেটা তার কিছুতে মাথায় ঢুকছিল না।

মুন্‌কে ডাকলেই যে প্রসন্নময়ী এরকম নিরিবিলিতে ছুটে আসে এমন নয়। এজন্যে সাধ্য-সাধনা করতে হয়, যাত্রা বা গান শোনানোর মত কিছু লোভের টোপ ফেলতে হয়। কিন্তু আজ চোখের ইঙ্গিতেই এসেছে প্রসন্নময়ী। ভিতরটা তারও ফুলে-ফেঁপে উঠছিল। গাঁয়ের মানুষদের জিভের ডগা কেমন নড়ছে, কতটা নড়ছে না শোনা পর্যন্ত তারই বা মুখে ভাত রোচে কেমন করে?

অতএব এই নিরিবিলিতে বলাবলি শোনাশোনির ব্যাপারটা ভালই হল। মুন্‌কে ছিরে পাগলার কথা বলল, আর প্রসন্নময়ী চাক্ষুষ যা দেখেছে তাই। প্রসন্নময়ীর বলার মধ্যে রসের ছিটে-ফোঁটা ছিলই, কারণ চাক্ষুষ তো সে আর কম দেখে নি! মদন ঠাকুর চাঁদা চাইতে এসেছে শুনেই বউমণির মুখ লাল হতে দেখেছে,

ডাব খেতে চেয়ে রসিক ঠাকুরটি তাকে ঘর থেকে সরিয়ে বউমণির হাত থেকে চাঁদা নিয়েছে, আর প্রসন্নময়ীকে ডাবের গেলাস হাতে ফিরতে দেখে ব্যাপার বুঝে বউমণির গোটা মুখে রক্ত-ছোটার বাহার দেখেছে। অবশ্য এ-সব কথা এত খোলাখুলি ওই পেটুক বামুনকে বলে নি প্রসন্নময়ী, গলা দিয়ে খাবার নামতে থাকলেই পেটে আর কথা রাখার জায়গা থাকে কিনা সন্দেহ। যেটুকু বলেছে ঠারেঠোরে বলেছে।

তবু যত রেখে-ঢেকেই বলুক, পাত্র-পাত্রী কে দেখতে হবে। মদনমোহন আর চণ্ডীবউ। করণের সাক্ষাৎ পুরুষ আর প্রকৃতি। অতএব আসন্ন সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় কাক-পক্ষীর অগোচরের এই নিরিবিলিতে পেটের ভাবনা ভুলে মুনকে ভট্চাযের আর এক উপোসী ক্ষুধা যদি ভেতর থেকে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে, খুব দোষ দেওয়া যায় না।...প্রসন্নময়ী আমগুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ছিল আর সে তার পাশে উবু হয়ে। তার একটা হাত প্রসন্নময়ীর মাথার ওপর নেমে এসেছিল কখন। সেখান থেকে পিঠ ঘেঁষে কাঁধের দিকে এসেছে আর তার পরেও বাধা না পেয়ে আর একটু অবাধ্য হবার উপক্রম করেছে।

তখনি বিষম ফোঁস।

বড়সড় একটা ঝামটা মেরে হাতসুদ্ধ তাকে ঠেলে সরিয়েছে প্রসন্নময়ী। ঠেলার ছন্দপতনে বসা থেকে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়িয়েছে মুনকে ভট্চায। এক হাতে হামাগুঁড়ির উঁচু দিকটায় ভর করে ঝুঁকে নীচু হয়ে প্রসন্নময়ীর মুখখানা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করেছে সে। কপট ঝামটা কি সত্যিকারের তাই বোঝার চেষ্টা।

ঠিক সেই মুহূর্তে আচমকা ওই ভূত দেখার মত ত্রাস।

প্রসন্নময়ীর আর্ত খেদোক্তি রাধানাথের কানে গেছে কিন্তু ভিতরে ঢোকে নি। যাদের ভেবেছিল তারা নয়। কিন্তু একটি পুরুষ আর একটি রমণী তো বটে! যেটুকু দেখল সেটা অভিসারের চিত্র তো বটে! অতএব এই দেখা থেকেই তপ্ত মস্তিষ্কে চিত্রের পাত্র-পাত্রী বদলে দেখার ঝোঁকটা মাথায় চেপে বসতে লাগল যেন।...অভিসারের খাসা জায়গাই বটে। আর এদিকেই মদনমোহনকে অনেক সময় ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে।

ঘুম দিয়ে উঠে স্নায়ু যেটুকু দখলে এসেছিল রাধানাথের তাও গেল আবার। সেই দুপুরের মতই মাথার ভিতরে রক্ত আছড়াতে লাগল। বাড়ির দিকে না গিয়ে ওই বাগানের পথ ধরেই আবার সে আড্ডার দিকে ছুটল। তরল রসদে গলা বুক না জ্বললে এই মাথা ঠাণ্ডা হবে না। ভক্তরা তখনো কেউ আসে নি। বোতল বার করে রাধানাথ খানিকটা গলায় ঢালতে না ঢালতে থমকালো আবার। মাথা ঠাণ্ডা করার দরকার কি? মাথা ঠাণ্ডা করে কি লাভ হবে? সেই ঠাণ্ডা মাথায় হয়ত অনেক কিছু ঢুকবে না, সেই ঘোলাটে চোখে হয়ত অনেক কিছুই দেখতে পাবে না। হয়ত বা ঘুমিয়েই পড়বে দুপুরের মত।

ঠক করে বোতল রেখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার।

মদ খায়ই নি বলতে গেলে অথচ পা দুটো টলছে, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। তখনি মনে হল প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। দুপুর থেকে বলতে গেলে আহার জোটে নি। বাড়ি গিয়ে খাওয়ার ধৈর্য থাকবে কিনা জানে না। না থাকাই সম্ভব। তাছাড়া বাড়িতে ফিরবেই যখন দেরিতে ফেরাই ভালো। এই একটা দিন অন্তত মাথার ওপর যত দখল থাকে ততো ভালো।

দোকান থেকে পেট পুরে পুরি-মিঠাই খেয়ে নিল। তারপর সোজা চলে গেল চুর্নীর দিকে। অন্ধকারের পরদায় সব দিক ঢাকা, লোকজনও কম সেদিকে। নিরিবিলিতে বসে ভেবে নেবে একটু। কিন্তু ভাবনা তেমন এগুলো না। ঘুরে-ফিরে আমবাগানের দৃশ্যটাই চোখের সামনে ভাসতে লাগল। আর সেই দৃশ্য তার ভিতরের দুটো চোখকে আর এক অভিসার-চিত্রের দিকে ঠেলে ঠেলে দিতে লাগল।

বাড়ি ফিরল যখন, রাত মন্দ নয়।

নীচেই ছোড়দির সঙ্গে দেখা প্রথম। ছোড়দি চাকর পাঠিয়ে ডেকেছিল মনে পড়ল। মুখ যতখানি সম্ভব গম্ভীর করে ছোড়দি বলল, চলে যাব বলে তোকে ডেকেছিলাম, তুই এলি না তাই রাতটা থেকে গেলাম—কালই আমার শ্বশুরবাড়ি যাবার ব্যবস্থা করে দে বাপু, চারদিকে যে ঢি-ঢি পড়ে গেছে, সেখানেও কি দুর্নাম রটবে শেষে কে জানে, মানে মানে এখন সরে পড়া ভালো—

সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে রাধানাথ সাফ জবাব দিল, যেও, কাল ব্যবস্থা করে দেব।

উত্তেজনার এমন ইন্ধন যোগাবার পরেও ভাইয়ের এই মূর্তি দেখবে বা এই জবাব শুনবে ভাবা যায় নি। নেশা-টেশার মুখে এই রকম বলেছে ধরে নিয়ে বোন স্বস্তিবোধ করতে চেষ্টা করল একটু।

সেই সকাল থেকে আজ চণ্ডীবউয়ের ভিতরটাও শান্ত নেই খুব। একজন চাঁদা নিয়ে চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যে এখানকার বাতাসসুদ্ধ বদলে গেছে যেন। বাইরে থেকে ফিরে ছোট ননদ তার মুখখানা যেভাবে দেখেছে, মেজাজ বিগড়োবার দাখিল। জিজ্ঞেস না করে পাবে নি, কি দেখছ?

ছোট ননদ জবাব দিয়েছে তোমাকেই দেখছি গো!...ঘোষালবাড়ির ছেলেকে নাকি তুমি ওদের বারইয়ারীর চাঁদা দিয়েছ শুনলাম?

হ্যাঁ, দেওয়া দরকার হয়েছিল।...তা শোনাশুনির ব্যাপারটা তো বাইরে থেকেই সেরে এসেছ, আর শুনে কি হবে?

নিজের ঘরে চলে এসেছে। তারপর থেকে ঘরের লোকের খোঁজে বাড়িতে আজ বাইরের লোকের আনাগোনা বেড়েছে টের পেয়েছে। দুপুরে ছোট ননদিনীর কাছে পাড়ার মেয়েদের গল্পগুজব করা আজ নিতান্তই যেন দরকার হয়ে পড়েছিল। বাড়ির দাসদাসী এমন কি প্রসন্নময়ীর চোখের দিকে চেয়ে পর্যন্ত গা জ্বলে উঠতে চেয়েছে চণ্ডীবউয়ের।

কিন্তু যতটা জ্বলে ওটা স্বাভাবিক ততটা জ্বলে উঠছে না।...সেই থেকে বার বার এক কথাই ভেবেছে চণ্ডীবউ, ভাবতে চেষ্টা করেছে। একজনের দুঃসাহসের মূল্য দিয়ে সে খারাপ কিছু করে নি। দু'দলের রেষারেষিতে একটুও রক্তপাত হবে না, করণের একজন মানুষেরও এতটুকু ক্ষতি হবে না এই অঙ্গীকার পেয়ে তবে টাকা দিয়েছে। করণের শান্তিই যে বড় করে দেখেছে। দু'তরফেই বিপদ কাটিয়ে দিয়েছে। শ্বশুর শুনলে খুশি হত। সকলেরই খুশি হবার কথা। নিশ্চিন্ত হবার কথা। সেই নিশ্চিন্ত-বোধটাই বড় করে তুলতে চেষ্টা করছে চণ্ডীবউ।

...কিন্তু চেষ্টাই শুধু করছে।

...ডাব খেতে চেয়ে প্রসন্নময়ীকে ঘরে থেকে সরিয়ে তার হাত থেকে চাঁদা নেবার অভিলাষ সব যেন কদর্য করে দিয়েছে। শুধু এইটুকুর সঙ্গেই আপোস করতে পারছে না চণ্ডীবউ। রাগে সমস্ত মুখ গনগন করে উঠেছে এক-একবার, আবার একটা বিমনা অস্বস্তিও ছেঁকে ধরেছে।

রাধানাথ ঘরে পা দিয়ে বিমনাই দেখল তাকে। ওদিকে জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। দু'চোখ ধকধক করে জ্বলে উঠল রাধানাথের। ঠোঁটের ফাঁকের ক্রূর তির্যক হাসি। নাটকীয় ছাঁদে টেনে টেনে বলে উঠল, আ-হা, কার অপেক্ষায় শ্রীমতীর এই দশা!

চণ্ডীবউ ফিরে তাকালো। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। এই মূর্তি নতুন দেখছে না। কথার ভাব-ভঙ্গীটাই শুধু অনারকম।

তোমার অপেক্ষাতেই। সকাল থেকে ছিলে কোথায়?

নিষ্ঠুর বিকৃত হাসিটা মুখে কেটে কেটে বসতে লাগল আরো।—মরে যাই, মরে যাই! বাতি দুটো নিবিয়ে দেব? আলো থাকলে তো এই হতভাগার মুখে আর স্পর্শে মদনমোহন ফুটে উঠবে না!

ভিতরটা আগের মতই রি-রি করে উঠতে চাইল, অথচ আজ আর আগের মত ঝলসে উঠতে পারল না চণ্ডীবউ। চুপচাপ একটু চেয়ে থেকে বলল, মুখ-হাত ধুয়ে এসে খেয়ে নাও।

ওদিকের কোণে তার খাবার ঢাকাই আছে। উদ্‌ভ্রান্ত আক্রোশে রাধানাথ সেদিকে এগিয়ে গেল।—খেয়ে নেব! শ্রীমতীর এখন আয়ান ঘোষের মন ভোলাবার চেষ্টা! সঙ্গে সঙ্গে এক লাথিতে ঢাকনা-সুদ্ধ খাবারের বাসন সাত হাত দূরে ছত্রখান। এঁটো-কাঁটার ব্যাপারে বউয়ের সংস্কার আছে জেনেও রাধানাথ সেই পায়েই একেবারে বিছানার ধারে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। পরক্ষণে কি মনে পড়তে হেসে উঠল আবার। হাসি নয়, উল্লাস।—শ্রীমতীর দাসী প্রসন্নময়ীকে দেখলাম—

থমকে থেমে গেল। বলবে না। বললে সতর্ক করে দেওয়া হবে। ওদিকের রাস্তায় মদনমোহনকে মাঝে-মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় কেন সে রহস্যের এখনো কিনারা হয় নি। ভবিষ্যতে ওটা আরো কারো লীলাকুঞ্জ হবে কিনা কে জানে! প্রসন্ন আর মুন্‌কের মারফৎ মন-চালাচালি হয় কিনা তাই বা কে জানে! অতএব এ-ব্যাপারটা ফাঁস করবে না। প্রসন্নও সাহস করে তার মনিবানীকে কিছু বলবে না জানা কথাই।

বউয়ের মুখে আজ আর সে রকম তেজ দেখছে না। রং-করা দুগ্‌গা প্রতিমার মত আর আর গনগনিয়ে উঠছে না মুখখানা অপরাধের এও যেন নজির একটা। তার সামনে রাধানাথ পুরুষসিংহ আজ। নিজের হিংস্র বিদ্রূপ-ভরা মুখখানা কাছে নিয়ে এলো আরো।—বলি, সর্বস্ব নাও বলে সিন্দুকে যা ছিল সব ঢেলে দিয়েছ না আছে কিছু?

চণ্ডীবউ ঘাবড়ায় নি। এই মুখে ভিতরের যে কদর্যতার ছাপ পড়ে আছে তাই দেখছে। জবাব দিল, অনেক আছে।

আছে! কি ভাগ্য, শ্রীমতীর কি অগাধ করুণা এই অভাগার ওপর! তা এই দাক্ষিণ্যবর্ষণে ভক্তর মুখখানা কেমন হল, সে কি বলল, কি করল—প্রসন্ন এসে বলে নি তোমাকে?

টাকা আমি নিজেই দিয়েছি, প্রসন্ন তখন সেখানে ছিল না।

প্রসন্নও ছিল না সেখানে! বিকৃত উত্তেজনা চোখেমুখে আর ধরে না বুঝি।—একবাড়ি লোকের মধ্যে দিনের আলোয় ভক্তের টানে দেবী নিজে ছুটে গেছল? কি আনন্দ! চাঁদা দেবার সময়ে একটু-আধটু হাতে হাত ঠেকে নি? চোখে চোখ মেলে নি?

বউয়ের নিরুত্তর নিষ্পলক দুই চোখ আপাতত তার চোখের সঙ্গেই মিলে আছে। মাথার ভিতরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল রাধানাথের। দু'হাতের থাবায় তার কাঁধ দুটো ধরে সামনে টেনে আনল। কেন টাকা দিয়েছ? কার হুকুমে টাকা দিয়েছ তুমি? গোটা গাঁয়ে আমার মুখ পুড়িয়ে কালি করে দেবার দুঃসাহস তোমার হয় কি করে?

ভিতরের তাপ এখন মুখের দিকে ছড়াচ্ছে চণ্ডীবউয়ের। তবু খুব সংযত জবাব দিল, টাকা তোমার নয়, আর তোমার হলেও তা দেবার জন্যে হুকুমের দরকার হয় না। চাঁদা সকলের ভালোর জন্যে দিয়েছি, কোন অশান্তি হবে না, মারামারি কাটাকাটি হবে না, একজন লোকেরও ক্ষতি হবে না এই কড়ারে দিয়েছি।

ও! রাগে বীভৎস হয়ে উঠল রাধানাথের মুখ।—কড়ার-টরারও হয়ে গেছে—তার দয়া-ভিক্ষার বিনিময়ে টাকা দিয়েছ! কড়ারই যদি করলে তো তার মুণ্ডুটা এখান রেখে যেতে হবে সেই কড়ার করলে না কেন? সে চাঁদা চাইতে এসেছিল কি কিজন্যে এসেছিল এখানে তুমি কিছুই জানোনা, কিছুই বোঝো না—কেমন?

ঠিক এইখানেই ধাক্কা খেল চণ্ডীবউ। ঘোষালবাড়ির ছেলের শেষের আচরণ অমন বিসদৃশ না হলে এই ধাক্কা খেত না, এরও জবাব দিতে পারত।

দেখছ কি চেয়ে চেয়ে! অসহিষ্ণু হাতের কাঁপুনিতে আরো কাছে টেনে আনল।—আমি লোকটা কেমন?...সে তোমার আগেরজন বুঝে গেছে, জেনে গেছে—তুমিও জানতে চাও? বুঝতে চাও?

কত বড় পুরুষসিংহ সে সেটা জানিয়ে দেবার, বুঝিয়ে দেবার এই যেন প্রকৃষ্টতম মুহূর্ত। ওই নির্বাক চোখে আব মুখে একটা একটা করে ছুঁচ বিঁধিয়ে দেবার মত করেই ক্রুর আনন্দে বলল, মাথার ওপব এই ঝাড়লণ্ঠনটা এখানে কেন জানো? তোমার আগেরজনের জন্য—আমার সেই আগের বউয়ের জন্য। এর সবগুলো আলো জ্বলত, আর তার নীচে তাকে নাচতে হত—ঠিক বাঈজীদের মত করে নেচে আমার মন ভোলাতে হত। নাচতে পারত না, নাচতে চাইত না—কিন্তু আমি চাবুক হাতে নিলেই কাঁপতে কাঁপতে হুকুম পালন করত। চাবুক কোনদিন কাজে লাগাতে হয় নি, সেটা হাতে করলেই কাজ হত—আমি যে ভেতরে ভেতরে শুধু মজা পেতাম আর হাসতাম তাও টের পেত না, এমন ভয় সে করত আমাকে।

আরো শুনবে? আরো শুনতে চাও?

ভয়ে নয়, জঘন্যতম বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ চণ্ডীবউ। লোকটা তাকে অত জোরে ধরে আছে বলেই সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে—নইলে পায়ের নীচের মাটি দুলছে তার।

তাই দেখে রাধানাথের হিংস্র আনন্দ আরো বুঝি খলখল করে উঠল। বলে গেল, আগের রাতে মালতীবউ আমার অবাধ্য হয়েছিল, পরের সন্ধ্যায় আমি তাকে বলে গেছলাম ফিরে এলে ওই ঝাড়ের আলোর নীচে তাকে একবারে বিবস্ত্র

হয়ে নাচতে হবে, একটা সুতোও গায়ে থাকবে না—আর অবাধ্য হলে গায়ের ছালচামড়া আস্ত থাকবে না। সে জানত আমার কথার নড়চড় হয় না, তাই আমি বাড়ি ফেরার আগেই সে বিষ খেয়েছিল, বুঝলে! কলকে ফলের বিষ খেয়ে সে পালিয়ে ছিল। তোমার এত দেমাক কিসের? এত স্পর্ধা কিসের? রূপের? গায়ের এই সাদা চামড়া আর মাংস খুলে নিলে যে কঙ্কাল বেরুবে, সেও কি মলতীবউয়ের থেকে বেশি সুন্দর হবে ভেবেছ?

এই দেমাকী রূপসী বউয়ের এমন শক্তিশূন্য নিস্পন্দ দেহ এভাবে বুঝি আর হাতের মুঠোয় পায় নি কখনো। তাই নির্দয় পুরুষের তেজ আগুনের ফুলকির মত বউয়ের সমস্ত শক্তি হরণ করেছে ভেবে বিকৃত উদ্দীপনায় হৃৎপিণ্ড নাচছে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের যে আদিম তাড়নায় পুকুরে কুসুমবাঈয়ের ডেরায় ছুটেছিল সেই আগুন দাউ দাউ করে দ্বিগুণ জ্বলে উঠেছে মাথায়।

রাধানাথের হাতের থাবা দুটো দুই নরম কাঁধের হাড়ের ওপর বসার উপক্রম। তার পরেই আচমকা ধাক্কায় রূপ আর দেমাকের তুলনা নেই এমন এক অবাধ্য রমণীকেই যেন নরম শয্যায় উল্টে ফেলে দিল সে। তারপর শেকলছেঁড়া পশুর মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় রূপসী রমণীর বুকের আঁচল খসে গেল। নির্মম হাতের দু'তিনটে হ্যাঁচকা টানে অন্তর্বাস ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল।

বড় লণ্ঠন দুটো জ্বলছে ঘরে। সেই আলোয় এক আদিমতম পুরুষের লোলুপ উন্মাদ হাসি রমণীর সর্বাঙ্গে ঠিকরে পড়ছে। সেই সঙ্গে অস্ফুট মত্ত কথার আগুনও।—আলো জ্বলুক, এই পুরুষমানুষটা তোমার ঘোষাল বাড়ির নাগর নয় সেটা ভালো করে দেখে নাও, বুঝে নাও!

চণ্ডীবউ বাধা দিচ্ছে না, মৃত্যুর মত একটা যাতনা হাড়-পাঁজরের মধ্যে হাহাকার করে উঠতে চাইছে। এই দেহের কাঠামো ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে যাবে বুঝি। কিন্তু মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আর্তস্বরও বার হচ্ছে না। চণ্ডীবউ শুধু দেখছে। ভোগ নয়, ভোগ-বিকৃতির নিষ্ঠুর নৃশংস উল্লাস দেখছে।

দেখছে দেখছে দেখছে।

॥ ২০ ॥

রাধানাথ ভয়ে কাঠ, দু'চোখ বিস্ফারিত। চোখের সামনে গলায় দড়ি বাঁধা একটা রমণীর দেহ ঝুলছে। রাধানাথ আর্তনাদ করে উঠতে চাইল, গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। রমণীর দেহটা তার দিকেই ঘুরছে আস্তে আস্তে, আর রাধানাথ কাঁপছে ঠকঠক করে। কাকে দেখবে জানে না।

একটু একটু করে ঝুলন্ত দেহটা তার মুখোমুখি ফিরল। বীভৎস, বিকৃত রাধানাথ আঁতকে উঠেছে, কাঁপছে। কিন্তু তবু যাকে ভেবেছিল সে নয়, চণ্ডীবউ নয়। মালতীবউ। গলায় দড়ি বাঁধা মালতীবউ তার চোখের সামনে। আবারও আর্তনাদ করে ওঠার মুখে ঘুম ভেঙে গেল।

বুকের ভিতর তখনো ঠকঠক হাতুড়ির ঘা পড়ছে। চোখে যেন ওই বীভৎস দৃশ্যটা লেগে আছে। সর্বাঙ্গ ঘামে জবজব করছে।

উঠে বসল। পাশে চণ্ডীবউ নেই। মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়েই আছে কিনা জানে না, ও-পাশ ফিরে আছে। ভয়ে আচ্ছন্ন রাধানাথ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। অন্ধকার ফিকে হয়ে ভোরের আলোর আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দুর্বল রাধানাথের ত্রাস আরো বেড়ে গেল যেন। ভোররাতের অশুভ স্বপ্ন। এমন স্বপ্ন সে দেখল কেন? মালতীবউ আবার গলায় দড়ি দেবে কেমন করে? তাহলে কে গলায় দড়ি দেবে?

চণ্ডীবউ গলায় দড়ি দিতে পারে এ তার একবারও মনে হয় না।...কিন্তু যদি দেয়? মলতীবউয়ের বদলে দৃশ্যটা চণ্ডীবউকে কেন্দ্র করে ভাবতে চেষ্টা করল। ঠিক পারা গেল না। তার আগেই তিন ভুবনের অগোচরের সব বিপর্যয় তার নিজের মাথায় ভেঙে পড়ার মত অনুভূতি একটা।

ভোরের প্রথম আলো ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীবউয়ের ঘুম ভাঙে। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। চোখ মেলেই স্রস্ত বসন সংযত করতে করতে উঠে বসল। দু'চোখ পাশের শয্যার দিকে ঘুরল একবার। এত সকালে মানুষটাকে এভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হবার কথা। কিন্তু যে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় সমস্ত রাত ছটফট করেছে তাতে যেন আর কোনো বিস্ময়েরই ঠাঁই নেই। পলকের চোখোচোখি হওয়ার মধ্যেও সেই বিতৃষ্ণাই ঠিকরে বেরিয়েছে। শুধু বিতৃষ্ণাই নয়। চণ্ডীবউয়ের জীবনে আর বুঝি কোনো সম্বলই অবশিষ্ট নেই। এমন নিঃস্ব রিক্ত দেউলে আর বুঝি কেনো নারী হতে পারে না।

উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল সে।

বেশ বেলা পর্যন্ত শুয়ে বসে গড়িয়ে কাটিয়ে দিল রাধানাথ। যতক্ষণ সে ঘরে থাকবে বউ এ-মুখো হবে না জানে। গত রাতে নিজের পুরুষকারের ওপর আস্থা কিছুটা ফিরেছে। সকালে বউয়ের এই মুখ দেখেও কিছুটা তুষ্টি লাভ করার কথা। দেমাকের গরম গেছে। তবু ভিতরে ভিতরে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতি একটা।

কিন্তু ঘরেই বা আর কতক্ষণ বসে থাকতে পারে? বিশেষ করে এই সময়ে। দুই বারইয়ারীতেই বেশ একটা সংগঠনের তোড়জোড় চলছে। কার দলের লোক কত বেশি কেরামতি দেখাতে পারে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই জটলা চলে। এত বেলা পর্যন্ত কর্ণধারকে না দেখে তার দলের লোকে হয়ত দিনমানেই অন্ধকার দেখছে চোখে।

অগত্যা বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নীচে নেমে এলো। সামনেই ছোড়দির সঙ্গে দেখা। ঘরের আটপৌরে বেশই আছে—চলে যাবার মতো কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ল না। তবু রাতের কথাটা মনে পড়ল তার। কাছে এসে গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি সত্যি যাচ্ছ নাকি?

নিজের মর্যাদা রক্ষার সুযোগ পেল একটু ছোড়দি।—ভাবছি তো...কেন?

গলা আরো খাদে নামিয়ে রাধানাথ বলল, ভাবতে হবে না, এবারে টিট্ হয়েছে মনে হয়।

ছোড়দির উৎসুক মুখে খুশির অভিব্যক্তি। কিছু একটা হয়ে গেছে সকালে বউয়ের মুখ দেখেই বোঝা গেছে। কি হয়েছে তাই জানার আগ্রহ। ভাই পা পাড়াতেই উতলা মুখ করে জিজ্ঞাসা করল, যে গোঁয়ার তুই, গায়ে হাতটাত তুলিস নি তো আবার?

ছোড়দি কানে মধু ঢেলে দিল যেন। সে-যে পুরুষমানুষ সেটা সকলেই বুঝছে তাহলে। জবাব দেবার দরকার বোধ করল না রাধানাথ। যা বোঝবার বুঝুক। মুচকি হেসে রাস্তায় নেমে এলো সে। কিন্তু তার পরেই ভিতরের সেই অস্বস্তিটা বিমনা করে দিতে লাগল তাকে।...এত বছর বাদে ভোররাতে এমন একটা বীভৎস স্বপ্ন কেন দেখে উঠল সে? আর কেবলই মনে হল, মালতীবউ কি ভাবে মরেছিল সেটুকু অন্তত এ বউয়ের কাছে ফাঁস না করলেই ভালো হত।

কিন্তু চণ্ডীবউ টিট্ কেমন হয়েছে সেটা বোঝা গেল দুটো দিন না যেতেই। এই দুটো দিন রাতে বাড়ি ফিরেছে রাধানাথ। মদে ডুবেও অস্বস্তিটা দূর করতে পারে নি। দু'রাতই বউকে ভূমিশয্যায় শয়ান দেখেছে। গম্ভীর মুখেই রাধানাথ নিজের শয্যা আশ্রয় করেছে। কোনরকম কথা বলে নিজের মর্যাদা লাঘব করে নি।

তার পরদিনই পালোয়ান ষষ্ঠীচরণকে কেন্দ্র করে সেই এক অভাবিত ব্যাপার ঘটে গেল। পাশের গাঁয়ের এক দুশ্চরিত্র লোককে রাগের মাথায় ষষ্ঠীচরণ খুন করবে বলে শাসিয়েছিল। শাসানির খবর অনেকেই জানত। সেই লোকেটা সত্যিই খুন হয়ে বসল। ষষ্ঠীচরণ খবর পেল এক লালমুখো দারোগা আসছে তাকে হাত-পড়া পরাতে। সাত বছরের মেয়ের হাত ধরে পালিয়ে এসে ষষ্ঠীচরণ চণ্ডীবউয়ের কাছে ধরণা দিল, আকুল হয়ে বলল, মা রক্ষা করো, ধরলে ফাঁসী হবে, মেয়ে অনাথ হবে, মেয়ের মাথায় হাত রেখে দিব্যি করল, কাউকে সে খুন করে নি।

...তারপর দলবলসহ লালমুখো দারোগা তার খোঁজে দত্তবাড়িতে আসতে চণ্ডীবউ তাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করল। পরে নিজের মাথার ঘোমটা খাটো করে বিদেশী দারোগার সামনে এসে দাঁড়াল। সকলে ভয়ে জড়সড়, রাধানাথ পর্যন্ত বাড়ি নেই তখন। সাহেবের দো-ভাষীর সাহায্যে চণ্ডীবউ তাঁকে বোঝালো, দত্তপাড়ায় নতুন বারইয়ারী উপলক্ষে একটা উৎসব আসছে বলে ক'দিন ধরে দিবারাত্র এই বাড়িতেই আছে ষষ্ঠীচরণ, এক ঘন্টার জন্যেও বাইরে বা কোথাও যায় নি।

...চণ্ডীবউকে দেখে সার্জেন্ট সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তার দু'চোখে পলক পড়ছিল না, চণ্ডীবউয়ের কথা এক বর্ণও বোঝে নি, মিষ্টি একটা স্বর শুধু গানের মত কানে ঢুকছিল তার।

লালমুখো দারোগার বাড়ি আসার খবরটা ততক্ষণে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। কতজনে তো স্ব-চক্ষেই দলবল নিয়ে দত্তবাড়িতে ঢুকতে দেখেছে তাকে। দলে দলে লোক এসেছে দত্তবাড়িতে। আর খবর পেয়ে রাধানাথও প্রাণপণে ছুটে এসেছে। এসে দেখে দারোগা হাঁ করে বউয়ের মুখের দিকে চেয়েই তার দো-ভাষীর কাছ থেকে কিছু একটা বক্তব্য বুঝে নিচ্ছে। কি দেখল আর কি বুঝল লালমুখো সাহেব সেই জানে। একটু বাদে চণ্ডীবউয়ের কাছ থেকে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে বিদায় হল।

বাদবাকি সকলে ভোজবাজী দেখে উঠল যেন একপ্রস্থ।

সকলের জোড়া জোড়া বিমূঢ় চোখের ওপর দিয়ে চণ্ডীবউ দোতলায় উঠে গেল।

তার পরনে গরদের শাড়ি। একটু আগে বাইরে বেরুবে বলে পাল্কি ঠিক করতে বলেছিল। তিন রাত ধরে মনে এতটুকু শান্তি ছিল না তার। আজ শনিবার, সকালে অনেকবার মনে হয়েছিল উলুবনের মহাচণ্ডীর থানে যাবে একবার। প্রায়শ্চিত্তের তাগিদে যাবে কি শান্তিভিক্ষা করতে, জানে না। ভিতরের দুর্বহ যাতনায় শুধু যাবার কথাই মনে হয়েছে বার বার।

যাবার জন্য সবে প্রস্তুত হয়েছিল, তার মধ্যে এই বিভ্রাট।

ষষ্ঠীচরণের ফাঁড়া কাটার ফলে মায়ের থানে যাবার তাগিদটা আরো বেশি অনুভব করল চণ্ডীবউ। বিশ মিনিটের মধ্যেই আবার ঘর থেকে বেরুলো সে।

বারান্দায় মুখোমুখি রাধানাথ দাঁড়িয়ে। নীচে লাল পাল্কি প্রস্তুত তাও দেখছে।

তার মুখের দিকে না তাকিয়েই চণ্ডীবউ পাশ কাটাতে চাইল।

কোথায় যাচ্ছ?

জবাব না দিয়ে চণ্ডীবউ এগিয়ে গেল। অদূরে ছোড়দি দাঁড়িয়ে। সদ্য সদ্য বাড়িতে এমন কাণ্ড ঘটে যাবার পর সেও উপরে না উঠে পারে নি। তাকে দেখার ফলেই রাধানাথের পক্ষে এই অবাধ্যতা সহ্য করা কঠিন হল একটু। ভেতর থেকে জোর পাচ্ছে না তেমন, তবু এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল আবার।—কোথায় চললে জিজ্ঞেস করলাম যে?

চণ্ডীবউ থমকে দাঁড়াল। এই বাধাও যেন অশুভ। আরক্ত দু'চোখ মুহূর্তের জন্য তার মুখের ওপর স্থির হল।—যমের বাড়ি। তুমি আটকাবে না সঙ্গে যাবে?

নিজের অগোচরেই সরে দাঁড়াল রাধানাথ। ছোট ননদের হতভম্ব মূর্তির সামনে দিয়ে চণ্ডীবউ নীচে নেমে গেল।

নীচে নামতে আর একদফা বাধা। কিন্তু এটা বাধা ঠিক নয়। মা-মা করে ষষ্ঠীচরণ তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে মা-দশভূজা দশ হাতে সন্তানকে রক্ষা করেছে এই কথাই বার বার বলতে লাগল।

চণ্ডীবউ বলল, সরো আমি মায়ের থানে যাচ্ছি, তোমার জন্যেও পূজো দেব। ঘুরে না আসা পর্যন্ত থেকো।

ফিরে আসতে ঘন্টা দুই।

বাড়ির পিছনের আমতলার রাস্তা ধরে ফিরছে। সেটাই সোজা পথ। আর গাছের ছায়ায় ছায়ায় আসতে পাল্কি বেহারাদের পক্ষেও সুবিধে।

লোকজন প্রায় নেই এদিকে। লাল শালুর পর্দা খানিকটা ফাঁক করে ভিতরে বসে আছে চণ্ডীবউ। অন্যমনস্ক। পূজো দিয়েছে বটে, কিন্তু কেমন যেন উদ্দেশ্য শূন্য পূজো। মন ঠাণ্ডা হয় নি একটুও, উল্টে ভিতরটা তেতে আছে।

হঠাৎ অদূরের গাছের পাশে একটা লোককে দেখে অন্যমনস্কতা উবে গেল। পরদাটা টেনে দিয়ে ফাঁক বন্ধ করতে গিয়েও করল না। মুখে রক্ত জমছে একটু একটু করে। স্থির কঠিন নেত্রে তাকালো আবার। লোকটাও এদিকেই চেয়ে আছে, আর এই লাল পালকি দেখবে এই আশাতেই আছে যেন।

মদনমোহন।

ঠাণ্ডা মাথায় দেখার চোখ থাকলে এই মূর্তি দেখে অন্তত মাথায় রক্ত ওঠার

কথা নয় চণ্ডীবউয়ের। ওই প্রত্যাশার মধ্যেও শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ের অভিব্যক্তিটুকুই হয়ত বেশি চোখে পড়তে পারত তার। সকালের যে খবর শুনে সে বেরিয়ে যাবার পরেও দলে দলে বাড়ির মেয়ে বউরা পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছিল দত্তবাড়িতে—ঘোষালবাড়ির মদনমোহনের এখানে এসে দাঁড়ানোটাও সেই আকর্ষণেই। সেও না এসে পারে নি। কেউ তাকে টেনে এনেছে, ঠেলে এনেছে।

সরু পথ ধরে পাল্কি তাকে ছাড়িয়ে এলো।

চণ্ডীবউ কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে এলো। সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ, দু'চোখ জ্বলছে।

রাধানাথ আর বেরুতে পারে নি। বউ গরদ পরে দিনেদুপুরে সত্যি যমের বাড়ি চলল, সেটা অবশ্যই বিশ্বাস করে নি। তবু সকালের ওই বিভ্রাটের পর সমস্ত পুরুষকার ধূলিসাৎ তার। বউ না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করছিল না।

কিন্তু এই প্রত্যাবর্তন দেখে সচকিত সে। মনে হল সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও ওই চোখের আর ওই মুখের আঁচ এসে গায়ে লাগবে বুঝি।...অথচ হাতে পূজোর প্রসাদী ডালা।

বাড়ির পিছনের ওই আমতলার এলাকা কার?

আচমকা এই ঝাঁজালো প্রশ্ন শুনে রাধানাথ আরো বিমূঢ়।—কি বলছ?

আমি জানতে চাই পিছনের আমতলার খোলা এলাকা কাদের?

আমাদের।...কেন?

জবাব না দিয়ে চণ্ডীবউ দু'পা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।—প্রসন্ন! প্রসন্ন!

হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এসে এক-গলা ঘোমটা দিয়ে থমকে দাঁড়াল প্রসন্নময়ী। বউমণির সামনে দাদাবাবু দাঁড়িয়ে।

চণ্ডীবউ দোরের দিকে এগিয়ে এলো।—নীচে ষষ্ঠীচরণ বসে আছে, এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয় তাকে।

প্রসন্নময়ী আবার দৌড়াল।

ষষ্ঠীচরণকে দোতলার অন্দরে নিয়ে আসার হুকুম শুনে রাধানাথ আরো হতভম্ব। আবার একটু কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার? ষষ্ঠীচরণকে ওপরে কেন?

দাঁতে করে ঠোঁট চেপে চণ্ডীবউ জ্বলন্ত চোখে একবার তাকালো তার দিকে। জবাব দিল না। ঘন নিশ্বাসে বুকের কাছটা এক-একবার ফুলে ফুলে উঠছে।

ষষ্ঠীচরণ এলো। পিছনে প্রসন্নময়ী। চৌকাঠের এধারে এক পা বাড়িয়ে চণ্ডীবউ বলল, তোমাকে একটা কাজের ভার দিলে করতে পারবে?

ষষ্ঠীচরণ জবাব দিল, মা হুকুম করলে এই প্রাণটাও দিতে পারব।

বেশ, এই নাও ধরো। বলে পূজোর প্রসাদের ডালিটাই তার হাতে দিয়ে দিল।—শোনো, বাড়ির পিছনের ওই আমতলার এলাকা আমাদের। লোকের দরকার হলে ওখান দিয়ে যাতায়াত করবে, কিন্তু কেউ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না। কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তুমি তাড়িয়ে দেবে ওখান থেকে—সে যেই হোক—বুঝলে?

বুঝুক না বুঝুক ষষ্ঠীচরণ বিস্মিত মুখে মাথা নাড়ল।

আর তারপরেও যদি কথা না শোনে তুমি ব্যবস্থা করবে, তাতে কিছু হয় তো আমি দেখব। যাও।

চণ্ডীবউ ঘরে ঢুকে গেল।

বিমূঢ় মুখে ষষ্ঠীচরণ প্রস্থান পরল।

হুকুম শুনে প্রসন্নময়ী প্রথম বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার আর মুন্‌কে পোড়ারমুখোর ব্যাপারটা দাদাবাবু ফাঁস করেছেন মনে হতে চমকে উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে তা নয়। বউমণি তাহলে মশা মারার জন্য অতবড় কামান দাগত না।

অন্য কিছু। অন্য ব্যাপার।

কার উদ্দেশ্যে এই হুকুম সেটা স্পষ্ট বুঝেছে রাধানাথ। পূজো দিয়ে ফেরার মুখে আমতলায় কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে বউ, বুঝতে একটুও কষ্ট হয় নি তার। তার হতভম্ব মুখখানা চাপা আনন্দে ডগমগ করছে এখন। বউয়ের এই মূর্তি তার নিজেরই সেই রাতের পুরুষকারের ফল—তা ভাবতে পারছে না। তবু চাপা আনন্দ, চাপা উল্লাস।

মাঝের ওই ব্যাপারটা ঘটে না গেলে আজ এই বউকে মাথায় করে নাচতে পারত সে।

দত্তবাড়ি থেকে বেরিয়ে বিমূঢ় ষষ্ঠীচরণ পিছনের আমতলার দিকে পা বাড়ালো। হাতে পূজোর প্রসাদের ডালি। সকাল থেকে এ ক'দিন মনের ওপর দিয়ে সব থেকে বড় ঝড়টা গেছে। সে কাপুরুষ নয়। বরং বুকের পাটা যদি এ গাঁয়ে কারো থেকে থাকে, তবে ষষ্ঠীচরণেরই আছে। কিন্তু ভগবানের মারকে ভয় কে না করে? লোকটা অসৎ নয় একটুও, তাই দিশেহারা হয়েছিল।

...তারই কোনো স্নেহভাজন গরিব শিষ্যর এক বিধবা বোনের ইজ্জৎ নিয়ে ছাড়বে বলে বড়াই করেছিল পাশের গাঁয়ের একটা মদ্যপ শয়তান। এ-রকম সর্বনাশ সে অনেক লোকেব করেছে। বহু লোকের রাগ ছিল তার ওপর।

বিহিত করার জন্য গরিব শিষ্য তার গুরুর শরণাপন্ন হয়েছিল। আর ষষ্ঠীচরণ নিজে পাশের গাঁয়ে গিয়ে অনেকের সামনেই তাকে খুন করবে বলে শাসিয়ে এসেছিল।

তার ক'দিনের মধ্যেই এই খুন। ষষ্ঠীচরণ স্বপ্নেও ভাবে নি এই দায় তার কাঁধে চাপতে পারে। কে বা কারা লোকটাকে খুন করে থাকতে পারে তার কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু সর্বপ্রথম নাম ছড়ালো তারই। এই কারণেই লালমুখো দারোগা আসছে শুনে সে দিশেহারা হয়েছিল। কোম্পানীর বিচার আচারের ওপর তাদের এতটুকু আস্থা নেই। একবার নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরতে পারলে মুক্তির আশা সেখানেই শেষ। তার ওপর মা-মরা মেয়ের চিন্তা।

দুর্যোগ যেন কোনো দৈব-মন্ত্রে কেটে গেল। লালমুখো দাবোগা যেন মাথায় ধুলো-পড়া সাপের মতো তাকে খালাস দিয়ে চলে গেল। মায়ের সেই মহিমা ভোলবার নয়। বরাভয় মা-ই বটে যেন। তবু দুর্যোগের ধুকপুকুনি বুকে লেগেই ছিল। থাকারই কথা। কি যে হতে পারত তার দুঃস্বপ্ন কাটা অত সহজ নয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে ষষ্ঠীচরণ সব ভুলে গেছে থানের থেকে ফেরার পর মায়ের এই মূর্তি দেখে। আর তার এই তাজ্জব আদেশ শুনে। কেন এই আদেশ সেটা তার মাথায় তখন বিন্দুমাত্র ঢোকে নি। সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে মায়ের সেই রক্তবর্ণ জাগ্রত চণ্ডীরূপ দেখেছে। আর আমতলার দিকে এগোবার পরেও এই রূপই তার চোখে ভাসছে।

হঠাৎ পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল ষষ্ঠীচরণের। আর সেই মুহূর্তেই একটা কুয়াশার পরদা চোখের সমুখ থেকে সরে গেল যেন। কিছুই আর দুর্বোধ্য থাকল না। থানের থেকে ফিরে এসেই মায়ের ওই রক্তবর্ণ চণ্ডীমূর্তি কেন তাও না। তার ওপর অমন অদ্ভুত আদেশ কেন, তাও না।

নিমেষের মধ্যে চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে গেল ষষ্ঠীচরণের, গায়ের পেশীগুলো দাড়া মেরে উঠল। কিন্তু তার পরেই সব আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে গেল। সেই সঙ্গে মুখে একটা চিন্তাচ্ছন্ন বেদনার ছায়া নেমে এলো।

ষষ্ঠীচরণ জানে বুকের পাটা শুধু তার নয়, এ গাঁয়ে আর একজনেরও আছে। জানে বলেই তার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম। আর সেই কারণেই রাগ গিয়ে ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তিকর বেদনা।

রাস্তার ধারে বড় আমগাছটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ঘোষালবাড়ির মদন ঠাকুর। এখনো তার দিকে চোখ পড়ে নি। বিমনা চোখে দালানের পিছন দিকটার পানে চেয়ে আছে।

আত্মস্থ হয়ে ষষ্ঠীচরণ পায়ে পায়ে আবার এগোতে লাগল।

...গাঁয়ে বাস করে ষষ্ঠীচরণ কানে তুলো ঠেসে বসে থাকে না। এযাবৎ অনেক কিছুই তার কানে এসেছে। কিন্তু তার অনেকটাই সে এক কানে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। করণে রস রটনার বিস্তার কিভাবে হয়ে থাকে সেটা ভালই জানে। আর দু'তরফের রেষারেষি থেকে দুই একটা রসের খবর যা কানে আসে তাও ছেলেমানুষের কাণ্ড ছাড়া আর কিছু ভাবে না সে। বড় ঘরের ঢাক বড় করেই বাজিয়ে থাকে সকলে।

কিন্তু আজকের এই এক সকালে যেন দৃষ্টিটাই বদলে গেল ষষ্ঠীচরণের। এক মাত্র ঘোষালবাড়ির মদন ঠাকুর ছাড়া করণের আর যে-কোনো লোককে ওভাবে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কি যে করে বসত জানে না। তাকে দেখে ভেতরটা আরো বেশি অস্থির হয়ে পড়ল। দত্তবাড়ির দাদাবাবুটি এই নালিশ নিয়েই একদিন তার কাছে এসেছিল, মনে পড়ল। ঘোষাল-পো'কে টিট করার জন্য লোক চেয়েছিল তার কাছে। কিন্তু ষষ্ঠীচরণ তখন এক বর্ণও বিশ্বাস করে নি।

আরো একটু কাছে এগিয়ে আসতে মদনমোহনের তন্ময়তা ভঙ্গ হল। অন্তরঙ্গ মুখে জিজ্ঞাসা করল, ষষ্ঠীচরণ যে, কি খবর?

প্রণাম দাদাঠাকুর, খবর ভালো।...তুমি এখানে এই রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে?

রোদ্দুর আবার কোথায় দেখলে, গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি।...তা কি ব্যাপার বলো দেখি, এ আবার কি বিভ্রাটে পড়েছিলে?

প্রসাদের ডালিটা ষষ্ঠীচরণ মেয়ের হাতে দিয়ে তাকে বাড়ি চলে যেতে বলল। তারপর মদন ঘোষালের দিকে ফিরল। ঠাণ্ডা মুখ।—হ্যাঁ দা-ঠাকুর, ফাঁসির দড়িটা লালমুখো দারোগা একেবারে হাতে করে নিয়েই এসেছিল, মা আমার যেন নিজে হাতে সেটা গলা থেকে তুলে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। মায়ের আমার সাক্ষাৎ জাগ্রত রূপ দেখলাম আজ দা-ঠাকুর। মা-কে আজ আমি অন্তর থেকে মা ডেকেছি, ভালো করি নি?

মদন ঘোষাল মাথা নাড়ল কি নাড়ল না। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, কি হল

ব্যাপারখানা বলো না শুনি?...খবরটা কানে আসার পর বাড়িতে আর থাকা গেল না, বুঝলে। সকলের মুখে কেবল এক কথা সাহেব-দারোগা দত্তবাড়িতে এসেছে ষষ্ঠীচরণকে ধরে নিয়ে যেতে।...সত্যিই ও বাড়ির বউয়ের কথায় দারোগা তোমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল?

ষষ্ঠীচরণ মাথা নাড়ল।—গেল। মা আমার সামনে এসে দাঁড়াতেই সাহেব ব্যাটার 'দিব্য-দৃষ্টি' খুলে গেল।

সাহেব চলে যাওয়ার বিবরণটা সংক্ষেপে সারল ষষ্ঠীচরণ। আর মদন ঠাকুর সেটা কত আগ্রহে শুনল তাও লক্ষ্য করল। ব্যাপারটা জানিয়ে তাই সবিস্ময়েই যেন বলল, তা এ খবরটা শোনার জন্য সেই থেকে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ। কাতারে কাতারে লোক এলো গেলো, তোমার এত উঁচু মাথা, তুমিও বাড়ির ভিতরে চলে গেলে না কেন দা-ঠাকুর। দত্তবাড়িতে এমন বিপদনাশিনী মা আছেন আমাদের, আজ তো সকলের আনন্দের দিন—কেউ কিছু মনে করত না।

ষষ্ঠীচরণের মনে হল কথাগুলো কানে ঢুকল না। দত্তবাড়ির ওই পিছনের দিকটায় চোখ রেখে তন্ময় হয়ে কিছু একটা দৃশ্যই কল্পনা করছে যেন। আর, ঠোঁটের কোণে একটু হাসির মত লেগে আছে।

গম্ভীর মুখে ষষ্ঠীচরণ বলল, তোমার সঙ্গে আমার একটু পরামর্শ ছিল দা-ঠাকুর। দরকারে তোমার বাবা মশায়ের কাছে ছুটে ছুটে গেছি, তিনি হাতে ধরে উপদেশ দেছেন। কত স্নেহ যে করতেন...। তিনি নেই এখন তো মাথা বলতে তুমি—

ষষ্ঠীচরণের মুখ দেখে হোক বা এই ভণিতা শুনে হোক, মদনমোহন সচকিত একটু।—কি বলো তো?

তার চোখে চোখ রেখেই ষষ্ঠীচরণ ঠাণ্ডামুখে বলে গেল, ও বাড়িতে মায়ের আমার আজ দুই 'মূর্তি' দেখলাম দা-ঠাকুর। দুই-ই চোখ জুড়িয়ে যাবার মত। একবার দুগ্‌গার মত দারোগা তাড়ালো যখন, আর একবার থানের পূজো সেরে মা-চণ্ডীর মত রাঙামুখে ফিরে এলো যখন। আমাকে ডেকে প্রসাদের গোটা ডালিটা হাতে দিয়ে শুধোলো, একটা কাজের ভার দিলে করতে পারবে? আমি বললাম, মা হুকুম করলে এই প্রাণটাও দিতে পারব।...ঠিক বলি নি দা-ঠাকুর?

মদন ঘোষালের দৃষ্টিটা এবার ষষ্ঠীচরণের মুখে স্থির হয়ে বসতে লাগল। জবাব না দিয়ে মাথা নাড়ল শুধু। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, কি কাজের ভার দিলেন তোমাকে?

বললেন বাড়ির পিছনের এই আমতলা তেনাদের, দরকার হলে সকলে এখান দিয়ে আসা-যাওয়া করবে, কিন্তু কেউ এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে না—কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে সরিয়ে দিতে হুকুম করলেন আমাকে—বললেন, যদি কথা না শোনে তুমি ব্যবস্থা করবে, তাতে কিছু হয় তো আমি দেখব।...সদ্য সদ্য হাতে করে প্রাণটি বাঁচানের পর মা যদি এভাবে ছেলেকে পরীক্ষা করেন, ছেলের রাজী না হয়ে উপায় আছে দা-ঠাকুর?

মদন ঘোষাল তেমনি স্থিরনেত্রে ষষ্ঠীচরণের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তার পর হঠাৎ হেসে তার পিঠ চাপড়ে দিল সে। বলল, তোমার সমস্যা আমি বুঝেছি ষষ্ঠীচরণ, তুমি ঠিক কাজই করেছ, রাজী না হয়ে তোমার উপায় নেই।

একটু দ্রুতই আমতলা ছেড়ে ঘরের দিকে ফিরল মদন ঘোষাল।

সাহেব দারোগার হাত থেকে ষষ্ঠীচরণকে রক্ষা করেছে দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ, করণে এ এক চমকপ্রদ ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু তার থেকেও ঢের বেশি রোমাঞ্চকর পরের ব্যাপারটা। যে ব্যাপারটা এতকাল অন্তত কিছুটা রাখা-ঢাকার মধ্যে ছিল।

সগর্বে রাধানাথ নিজেই তার পার্ষদদের কাছে বউয়ের সেই চোখ-ধাঁধানো তেজ আর কলির ভীম ষষ্ঠীচরণের প্রতি তার হুকুমের কথা বলেছে। শুনে পার্ষদরা বিস্মিত রোমাঞ্চিত পুলকিত। আর, গায়ে কাঁটা-দেওয়া সেই হুকুম যখন স্বকর্ণে শুনেছে প্রসন্নময়ী, সেও মুখ শেলাই করে বসে নেই। ফলে নতুন উত্তেজনায় করণের বাতাস টইটুম্বুর।

নির্লিপ্ত নির্বিকার শুধু মদনমোহন। প্রিয়জনদের জোড়া-জোড়া চোখের উদ্ভাসিত নীরব প্রশ্নের জবাবেও নিরুত্তর। কিন্তু ভিতরটা তার শান্ত বা নির্লিপ্ত নয় একটুও। সেখানে যেন বিচিত্র এক তাণ্ডব চলেছে। উৎসবও বলা যেতে পারে। আমতলায় আর যাবে কিনা জানে না। কিন্তু সেখানকার ওই অনমিতা দৃপ্তা রমণীটির সঙ্গে আজ আবার যে যোগটা সে অনুভব করছে, সেটা দুর্নিবার। সে-যদি নিয়তির যোগও হয়, তবু যেন বিচ্ছিন্ন হবার উপায় নেই।

ইচ্ছেও নেই।

দুই বারইয়ারীরই উৎসবের দিন এগিয়ে আসছে। একই দিনে উৎসব। এই দিন ধার্য করার কৃতিত্ব রাধানাথের। দক্ষিণ পাড়ায় বারইয়ারীর খোদ মাতব্বরটির মাথার ওপর চণ্ডীবউয়ের কোপ ভেঙে পড়েছে বোঝার পর তার বুকের ছাতি দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। তার ওপর গাঁয়ের সেরা পালোয়ান ষষ্ঠীচরণ সহায়। তাকে এখন কেনা গোলাম ভাবছে রাধানাথ।

তার স্ফূর্তি দেখে মনে হবে মদনমোহনের সর্বনাশ আসন্ন তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। অতএব একই দিনে উৎসব যাপনের রোমাঞ্চ থেকে সকলকে বঞ্চিত করবে কেন সে? অন্যথায় রেষারেষি জমজমাট হবে কেমন করে?

একদিকে দত্তপাড়ার নতুন বারইয়ারীর প্রথম সাড়ম্বর আত্মপ্রকাশ, অন্যদিকে দক্ষিণপাড়ার শতেক বছরের পুরনো বারইয়ারীর নতুন জীবনে পদার্পণের ঘোষণা। ছোট ব্যাপার নয় কোনটা। করণের বাতাস উত্তেজনায় ভরপুর। প্রতিটি মানুষরে বুকের তলায় শিহরণ। একদিকের দণ্ডধর করণের নয়া শৌর্যের প্রতীক মদনমোহন, অপর দিকের দিকদিশরিণী এক স্বর্ণচণ্ডিকারূপিণী অন্তঃপুরিকা যার নামও চণ্ডীবউ। যে রমণী সামনে এসে দাঁড়ালে খুনের আসামী ধরতে এসে লালমুখো দারোগা মাথা হেঁট করে চলে যায়। যে রমণীর এমন দুর্জয় তেজ, যে মদনমোহনের মত দুর্দম পুরুষকে টিট করার জন্য ষষ্ঠীচরণকে নিজের এলাকা প্রহরায় মোতায়েন করে।

এমন এক রেষারেষির সূত্রপাতে রস যত, শঙ্কা-মেশানো শিহরণ তার দ্বিগুণ হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এত বড় ব্যাপারটা জমে উঠেছে সেই চণ্ডীবউ এক নির্লিপ্ত কঠিন স্তব্ধতার আড়ালে বসে আছে। শুধু তারই কোনরকম কৌতূহল নেই, আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই।

ঘোষালবাড়ির ছেলের মাথায় তার কোপ ভেঙে পড়েছে সত্যি কথাই। কিন্তু সেই রাগের খড়্গ চণ্ডীবউ নিজের মাথার ওপরই তুলে ধরেছে এখন। তার সমস্ত কোপ নিজেকেই দহন করছে। আজ এত বছরে ঘোষালবাড়ির ছেলের মতিগতি জানতে বুঝতে কি তার বাকি ছিল কিছু? তবু চোখে ঠুলি পরে থেকে কেন সে ওই লোকের পুরুষাকারটাকেই বড় করে দেখতে চেয়েছে, বিশ্বাস করতে চেয়েছে? সেই বিশ্বাস এখন কোন্ ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে? ষষ্ঠীচরণকে ওই আদেশ দেবার পর গোটা গাঁয়ে এখন কতটা টি-টি পড়ে গেছে সেটা চণ্ডীবউ অনুমান করতে পারে। তাদের গোপন কানাকানির ব্যাপারটাকে এখন একেবারে দিনের আলোয় টেনে আনা হয়েছে। চণ্ডীবউ নিজেই এনেছে। কিন্তু এই পরিণামের প্রশ্রয় সে কেন দিয়েছে? গেলবারে মায়ের থানে একরাশ লোকের মধ্যে ঘোমটা খসিয়ে যে তেজে ওই লোকটার মুখ সে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল—সেই লোকটাই বাড়ি বয়ে চাঁদা চাইতে আসতে কেন সাততাড়াতাড়ি নিজে গিয়ে চাঁদা দিতে ছুটেছিল?

'...কড়ারই যদি করলে তো তার মুণ্ডুটা এখানে রেখে যেতে হবে সেই কড়ার করলে না কেন? সে চাঁদা চাইতে এসেছিল কিজন্যে এখানে তুমি কিছুই জানো না, কিছুই বোঝো না, কেমন?'

সেই রাতে ঘরের বিকৃত মানুষটার এই কটুক্তির জবাব চণ্ডীবউ দিতে পারে নি। কারণ সত্যিই না জানার কথা নয়, না বোঝার কথা নয়। সেই জানা আর বোঝাটা নগ্ন হয়ে উঠেছিল প্রসন্নকে ডাব আনতে পাঠিয়ে ওই লোক চোরের মত তার হাত থেকে চাঁদা নিয়ে চলে যাবার পর। কিন্তু এত বছর ধরে সব জানা আর বোঝা সত্ত্বেও ওই ঠুনকো পুরুষকারের প্রশ্রয় চণ্ডীবউ কেন দিতে গেছল? কেন মুণ্ডুটা রেখে যাবার কড়ারই করতে পারে নি?

তাই ষষ্ঠীচরণকে অমন হুকুম দেবার পরেও নিজের ওপরে এক দুঃসহ ক্রোধ তার।

নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতা থেকে রাধানাথ বউয়ের কোপের আঁচটুকু ঠিকই অনুভব করছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার প্রতি এক নীরব ঘৃণার আঁচও এমনই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে এ-সময়ে রাধানাথের কাছে সেটা প্রায় অস্বস্তিকর। বারইয়ারী নিয়ে এই উত্তেজনার সময় বউয়ের সঙ্গে আপোস কাম্য।

পর পর কটা রাত বউয়ের ভূমিশয্যা দেখে রাধানাথের ভেতরটা রাগে চিড়বিড় করেছে। শুধু তাই নয়, এই সদর্প ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবার স্থূল লোভ অনেক কষ্টে সংবরণ করতে হয়েছে। সাহসে কুলোয় নি। সেই এক রাতের মত ব্যভিচারী আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই রমণীদেহ ছিন্নভিন্ন করে আপন দখলে আনার বিকৃত পুরুষকার যেন একেবারে উবে গেছে। লোভের অসংযত তাড়না সত্ত্বেও ভূমিশয্যার দিকে এগোতে পারে নি। ভোর রাতের সেই অশুভ স্বপ্নের দৃশ্যটা মনের তলায় থিতিয়ে আছে—গলায় দড়ি বাঁধা মালতীবউয়ের বীভৎস মূর্তি। শুধু এই ভয়ই নয়, দারোগার হাত থেকে ষষ্ঠীচরণকে রক্ষা করে তাকে আমতলায় প্রহরায় বহাল করার পর থেকে এই বউ যেন এক দুর্ভেদ্য স্থির সাদাটে শিখার গণ্ডীর মধ্যে বসে আছে। রাধানাথ কাছে ঘেঁষে কেমন করে, আপোসই বা করে কেমন করে?

সেদিন আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। রাধানাথ নাটকের সমঝদার, নিজেকেও

অভিনয়-পটু ভাবে। এ বিদ্যার ওপর আস্থা আছে। ঘরে ঢুকেই এই গুণটুকুর ওপর নির্ভরশীল হল।

তার কারণও আছে। এবারে বউয়ের সঙ্গে অনুকূল রফা একটা না হলেই নয়। বাইরে মুনকে ভট্‌চাযকে নিয়ে এক ফ্যাসাদ দানা পাকিয়ে উঠেছে। দল ভাঙানোর উদ্দীপনায় মেতে ফ্যাসাদটি অবশ্য রাধানাথই বাধিয়েছে। এই দল ভাঙানোর রোমাঞ্চটাই সব থেকে বড় এখন। বউয়ের তেজের শেকলে ষষ্ঠীচরণের মত পালোয়ান এভাবে বাঁধা পড়ার পর থেকে রাধানাথের আশা দ্বিগুণ বেড়েছে। করণের গুণীজন বলতে হাতের এক আঙুলে গোনা যায় এমন কটি বানুষ—ডাকসাইটে পালোয়ান হিসেবে ষষ্ঠীচরণ, ভোজনপটু হিসেবে মুনকে ভট্‌চায, গাঁজার কেরামতি দেখাতে সহায় ভট্ট, আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহ গলার ভেলকিবাজিতে আসর মাত করতে হরবোলা ছিরে পাগলা বা শ্রীনাথ। গুণী বটে এরা সকলেই, তবু এরই মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক দেখতে হলে কদর সব থেকে বেশি ছিরে পাগলার। তার চপল প্রতিভার বহুমুখী বিস্তার। মদন মোহনের খপ্পর থেকে কোন রকমে তাকে টেনে নিয়ে আসতে পারলে দক্ষিণপাড়ার দল কানা। চার গুণীর মধ্যে ষষ্ঠীচরণ আর মুনকে ভট্‌চাযকে হাতের মুঠোয় পুরতে পেরেছে ভাবার পর যেভাবে হোক হরবোলা শ্রীনাথকে ভাঙিয়ে এনে বিপক্ষ দল কানা করার লোভ রাধানাথ কিছুতে আর সংবরণ করতে পারে নি।

একটা মতলব এঁটে সে মুনকে ভট্‌চাযের ওপর চড়াও হয়েছিল।—কি ভট্‌চায, আমতলার রসের ব্যাপারটা তাহলে ভালই চলেছে বলো।

চার আঙুল জিভ কেটে ভট্‌চায জবাব দিয়েছে, কি যে রসিকতা করো দত্ত-পো, ভালো লাগে না।...ছিরের মুখে ঘোষাল-পো'র তোমাদের বাড়ি থেকে চাঁদা আদায়ের কথাটা শুনে সেদিন তাজ্জব বনে গেলাম, তাই দুটো কথা শোনার লোভে মাগীকে ওখানে ডেকেছিলাম।

মুখ মচকে রাধানাথ যেভাবে হেসেছিল তাইতেই মুনকের কপালে ঘাম দেখা দিয়েছিল। বচন শুনে ত্রাসে কণ্টকিত। তার কাঁধ চাপড়ে রাধানাথ বলেছে, আবছা আঁধারের অমন নিরিবিলিতে কোন্ লোভে ডেকেছিলে সে তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি গো ভট্‌চায, অত লজ্জা পাচ্ছ কেন! গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে ওই মোটাসোটা হাতখানা তোমার কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছিল তাও এই পোড়া চোখে পড়ে গেছে। তা যাক, আমি ভাবছি রসে ডুবুডুবু তোমরা, অথচ মাঝখান থেকে চণ্ডীবউয়ের সমস্ত কোপ গিয়ে পড়ল বেচারা মদনমোহনের ওপর, ষষ্ঠীচরণকে সরাসরি আমতলার পাহারায় বসিয়ে দিল।...মদনমোহন আমার যত শত্রুই হোক, জেনেশুনে তার ওপর অন্যায় কি করে করি বলো, ভাবছি আসল ব্যাপারখানা বউকে বলেই দেব।

চণ্ডীবউয়ের নামখানা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুনকে ভট্‌চাযের বিবর্ণ বদন। দু'হাত জুড়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, দোহাই তোমার দত্ত-পো, এই গরীব বামুণকে মেরে তোমার কি লাভ হবে?

রাধানাথ চিন্তান্বিত।—সত্যিই তো, তোমার যাতনা বাড়িয়ে কি আর লাভ! তার থেকে বেশ বুদ্ধি খাটিয়ে একটা কাজ যদি করতে পারো, চণ্ডীবউ নিজে সামনে

বসে সাতদিন ধরে তোমাকে চব্যচোষ্য খাওয়াবে আর তার প্রসন্নদাসী তোমাকে আরো একটু সুনজরে দেখবে সেই ব্যবস্থা বরং আমি করে দিতে পারি...

সঙ্কটের দরিয়া থেকে একেবারে সুধাতটে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসে দোদুল্যমান ভট্‌চাযের গোল গোল দু'চোখ উৎসুক।

যে-ভাবে হোক শ্রীনাথকে দত্তপাড়ার বারইয়ারীর দলে টেনে আনতে হবে, তোমার সঙ্গে তো তার খুব খাতির!

শোনামাত্র ভট্‌চাযের বিরস মুখ।—আমার ভুঁড়িতে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ও একটু সুখ পায়, এর বেশি আর কি খাতির!

না না, তোমাকে ভালবাসে বলেই ও-রকম করে। একেবারে সুখের চূড়োয় বসিয়ে দেওয়া হবে তাকে বলো গে যাও, বরং তোমাদের চণ্ডীবউয়ের নাম করে ব'ল—নতুন বারইয়ারীর সব-কিছুর পিছনে কে দাঁড়িয়ে আছে কে আর না জানে।

সংশয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে ভট্‌চায চলে গেছে। তারপর আজ আবার পাংশুমুখে এসে যে সমাচার শুনিয়েছে, রাগে রাধানাথের দু'হাত নিশপিশ করেছে শুধু। ভট্‌চায জানালো, ছিরের দল ছেড়ে নতুন দলে আসা দূরের কথা, উল্টে সে তাকে জানিয়েছে, মুন্‌কে যদি কোনো দলে ভেড়ে, তাহলে সকলে মিলে ঠিক করেছে তার জালার মত ভুঁড়িখানা চারফালা করে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। ভালবাসে বলেই ছিরে পাগলা তাকে খুব কষে সাবধান করে দিয়েছে।

রাধানাথ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল।—ও, সাবধান করেছে বলেই তোমার মুখখানা একেবারে আমসি হয়ে গেল!

মুন্‌কে তক্ষুনি মাথা নেড়ে সায় দিল।—ছিরে যে ভয় দেখালে বুকখানা শুকিয়ে কাঠ একেবারে। আমি ছাপোষা গরীব মানুষ, আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া কোরো না দাদা, দোহাই তোমার—

বনের পাখি ধরতে গিয়ে হাতের পাখিও যে পালায়! রাধানাথ বরদাস্ত করে কেমন করে? রাগে ফেটেই পড়ল সে।—তুমি তাহলে দু'তরপের পোঁ ধরে ওই ভুঁড়ি তাজা করবে ভেবেছ, কেমন? তোমার আমতলার কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দিলে কটা পূজো-পার্বণে আর শ্রাদ্ধবাড়িতে তোমার ডাক পড়বে ভাবো? অত সাধের ভুঁড়ির হাল তখন কি হবে?

কত আর সয়! নিরুপায় মুন্‌কে ভট্‌চায বলে উঠল, কিন্তু ভুঁড়ি যদি ফাঁসিয়েই দেয় তাহলে আর এ চিন্তা করে কি হবে? সকলে মিলে যদি এভাবে আমার পিছনে লাগো তাহলে আমি বিবাগী হয়ে চলে যাব এই বলে দিলাম—

রাগে ভয়ে আর দুঃখে বিপুল কায়াটি নিয়ে বিবাগী হবার মত করেই প্রস্থান করল মুন্‌কে ভট্‌চায।

বিশেষ করে এই কারণেই আজ রাধানাথ বউয়ের শরণাপন্ন। আর যাত্রার আসরে যে নাটকীয় আত্মসমর্পণে সে অভ্যস্ত, এই পরিস্থিতিতে সেটাই তার একমাত্র অস্ত্র!

প্রস্তুত হয়েই বাইরে থেকে মঞ্চে পদার্পণ করল যেন। বিষণ্ণ মুখ, চাউনিতে হতাশা। ঘরে পা দিয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে নিল একবার। ভূমিশয্যার ওধারে বারান্দা-সংলগ্ন দরজায় ঠেস দিয়ে বউ বসে আছে। বাইরের অন্ধকারের দিকে চোখ। তার পদার্পণ টের পেয়েও সে-চোখ এদিকে ফিরল না।

অভিনয় পটুতা সত্ত্বেও একটা কটূক্তি বেরিয়ে আসার উপক্রম রাধানাথের মুখ দিয়ে। সামলে নিল।—শোনো!

বাইরের অন্ধকার থেকে দৃষ্টিটা খুব আস্তে আস্তে তার দিকে ঘুরল। নির্লিপ্ত কঠিন।

আর কত দুঃখ তুমি আমাকে দেবে?

কথাগুলোর সঙ্গে বুকের গভীর থেকে অনুকূল একটা অভিব্যক্তি টেনে তোলার আগে রাধানাথ নিজেই থতমত খেয়ে উঠল একপ্রস্থ। ওই অব্যক্ত নীরব দু'চোখ থেকে হঠাৎ যেন এক ঝলক ঘৃণা উপ্‌চে উড়ে সজোরে তার মুখের ওপর ঝাপটা মেরে বসল।

আপোসের অভিনয়ে এসে রাধানাথ হাল ছাড়ে কেমন করে? ধাক্কাটা সামলে নিয়ে মুখখানা আরো বেজার করে বলল, রাগের মাথায় সেদিন একটু বেশিমাত্রায় ওইসব খেয়ে তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য পাগলের মত কি-সব বলেছি—আর তুমি তাই বিশ্বাস করে আমার সঙ্গে এ-রকম ব্যাভার করছ, তাই না?

রাধানাথের মনে হল এবারে একেবারে রঙের তুরুপ মেরে বসেছে সে। চণ্ডীবউয়ের টানা কালো দু'চোখের চাউনি সত্যিই মুহূর্তের মধ্যে বদলালো আবার। তীক্ষ্ণ নীরব দৃষ্টির গভীরে কি-যেন একটা আশা চক-চক করে উঠল। চেয়ে আছে। বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না।

রাধানাথ আশায় ভরপুর।—ঠিক বলি নি?

তোমার আগের বউয়ের কথা যা বলেছে ঠিক নয়?

রাধানাথ হেসে উঠল।—দেখেছ! ঠিক ধরেছি। আচ্ছা, তুমি কি একেবারে ছেলেমানুষ! বাবা তো তাঁর চণ্ডী-মা বলতে একেবারে অজ্ঞান—বিশ্বাস না হয়, তিনি এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

চণ্ডীবউ উঠে এলে। কাছে এসে দাঁড়াল। এখনো জানে না বিশ্বাস করবে কি করবে না। আশার উত্তেজনায় মুখ লাল।—আমাকে ছুঁয়ে বলো।

ঝুঁকে রাধানাথ সোজা তার পায়ে হাত দিতে গেল। সচকিত হয়ে চণ্ডীবউ দু'হাত সরে দাঁড়াল।

দেখছে তার পরেও। সত্যি কি সত্যি না, সেটা যেন সে দু-চোখ দিয়েই টেনে বার করবে।

অভিনয়ের মুখোশ যত শক্ত করেই এঁটে বসুক, এই চাউনি বিষম অস্বস্তিকর। এটা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাধানাথ।—আমার ঘাট হয়েছে, এ-সব উদ্ভট চিন্তা ছেড়ে দাও।...তুমি ভালো ভেবেই চাঁদা দিয়েছিলে, কিন্তু তাই নিয়ে যে কেচ্ছা শুরু করেছে মদনমোহন, আমারই বা মাথা ঠিক থাকে কি করে? কেমন লোক সে, তো নিজেই বুঝছ...

অপাঙ্গে চেয়ে দেখল বউয়ের মুখে কঠিন রেখা পড়ছে। রাধানাথ উৎফুল্ল। কিন্তু মুখ আরো বিরস। বলল, একই দিনে উৎসব, এখন সে কত ভাবে আমাকে জব্দ করবে উঠে পড়ে সেই মতলব ভাঁজছে—

একই দিনে করলে কেন, ঠাকুর ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেত না?

বেশ! বাবাই তো করতে বলে গেছে। অম্লানবদনে আর একটা মিথ্যের জাল

বুনল রাধানাথ।—আমাদের দিন জেনে নিয়ে মদনমোহন ওই দিনে তাদের উৎসব ফেলেছে। তার ভয়ে এখন আমাদের আবার দিন বদলাতে বলছ?

না।

চাপা আনন্দে আটখানা রাধানাথ, এই না-এর যেন আর নড়চড় নেই। বিষাদের সুর আরো একটু চড়িয়ে বলে উঠল, শুধু কি তাই! তোমার কাছে কড়ার করে গেছে—অশান্তি হবে না, ওদিকে বেচারা মুনুকে ভট্‌চাযের ওপর চড়াও হয়ে তাকে শাসিয়েছে, আমাদের দল ভেঙে তার দলে না গেলে ভুঁড়ি চারফালা করে দিয়ে তাকে খুন করা হবে। ভয়ে মুনুকে এখন বিবাগী হবে ঠিক করেছে।...সাহস পেয়ে পেয়ে এই রকমই অপমান যদি ও করে আমাকে, তাহলে আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া আর আমার উপায় কি?

এই মূর্তিই দেখতে চেয়েছিল রাধানাথ। চণ্ডীবউয়ের থম্‌থমে মুখখানা থেকে যেন তেজ ঠিকরে পড়ছে এখন। এত সাহস যে একটা লোক তার জন্যেই পেয়েছে এ যেন। নিজের কাছেও অস্বীকার করার উপায় নেই আর। সেই রাগ আর সেই ক্ষোভ।

গলার স্বর আরো মোলায়েম করে রাধানাথ বলল, ভট্‌চাযকে দলে না পেলে আমার অপমানের আর শেষ থাকবে না—তাকে একবার তোমার কাছে ডেকে পাঠাব? নিজের কানে শুনতেও পারবে সব...

জবাবে চণ্ডীবউ তেমনি কঠিন মুখে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ শুনবে এবং ব্যবস্থাও করবে।

রাধানাথ নিশ্চিন্ত। মুনুকে ভট্‌চাযকে পাল্টা ভয় দেখিয়ে সত্যি-মিথ্যেয় তালিম দিয়ে নিয়ে আসা জল-ভাত ব্যাপার। তাছাড়া, ছিরে পাগলার শাসানিটা আসলে যে মদনমোহনেরই শাসানি সেটা ওই পেটুক সর্বস্বকে বোঝাতে একটুও বেগ পেতে হবে না।

বুকভরা আদবে সোহাগে এই রাতে বউকে একেবারে অস্থির করে তোলার চেষ্টা রাধানাথের। কিন্তু চণ্ডীবউ অস্থির হয়ে উঠছে না, উঠতে পারছে না। মালতীবউয়ের ব্যাপারটা সত্যি কি সত্যি না, ভিতরে ভিতরে সেই সংশয়ের কাঁটা-ছেঁড়া চলেছে। ক্ষণে ক্ষণে বক্ষলগ্ন মানুষটাকে দেখছে।

...যত দেখছে ততো তার মনে হচ্ছে আবার এক মিথ্যের ওপর আশার ভিত বাঁধতে চলেছে সে। মনে হচ্ছে সে-রাতের সেই কদর্য বীভৎসতার প্রকাশ মিথ্যে হতে পারে না। অথচ প্রাণপণে চাইছে মিথ্যে হোক। যা শুনেছে আর যা দেখছে সব মিথ্যে হোক। মিথ্যে হোক, মিথ্যে হোক।

মিথ্যে না হলে চণ্ডীবউয়ের বাঁচার সম্বল ফুরিয়ে গেল।

মুনুকে ভট্‌চায ভেবেছিল প্রাণে বাঁচতে হলে বিবাগী হওয়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু দুদিনের মধ্যে তার আতঙ্ক কেটে গেল। দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ ডেকেছে শুনে কাঁপতে কাঁপতে এসেছিল। যদিও রাধানাথ তাকে বেশ করে তালিম দিয়েই পাঠিয়েছিল, তবু জ্যান্ত চণ্ডীর সামনে এসে দাঁড়াতে হবে ভেবে তার হাঁটু আর ভুঁড়ি সমান বেগে কেঁপেছে।

কিন্তু চণ্ডীবউয়ের সামনে এসে দাঁড়ানোর ধকল তাকে পোহাতে হয় নি। প্রসন্নময়ীর উদ্‌গ্রীব মুখ থেকে তার আগমনবার্তা পেয়ে চণ্ডীবউ তাকে দিয়েই বলে পাঠিয়েছে, বল্‌গে যা তাঁর ভয়ের কিছু নেই, দলও ছাড়তে হবে না বিবাগীও হতে হবে না, আমি ষষ্ঠীচরণকে বলে দেব কেউ তার গায়ে হাত ছোঁয়ালে কাঁধের ওপর মাথা থাকবে না—এ যেন সকলকে জানিয়ে দেয়।

এত্তেলা নিয়ে প্রসন্ন পা বাড়াতে যাচ্ছিল, ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াতে হল।

শোন্!

কিছু বলার আগে প্রসন্ন হকচকিয়ে গেল একটু। এবারে বউমণির ঠাণ্ডা চোখের ভ্রূকুটি যেন তারই উদ্দেশে।

দিনে-দুপুরে গিয়ে আসকারা দিতে বসিস না—যাবি বলবি চলে আসবি—যা!

মোটা শরীর নিয়ে প্রসন্নময়ী চোখের আড়াল হয়ে বাঁচল। বুকের ভিতরটা কাঁপছে। সেদিনের আমবাগানের ব্যাপারটা দাদাবাবু বলেছে মনে হয় না। প্রসন্ন তো আড়ি পেতেই আছে, বলে থাকলে এতদিনে ঠিক টের পেত। উল্টে সেই থেকে বাক্যালাপ বন্ধ দেখে আসছে দু'জনের। বউমণির ক'দিকে কটা করে কান আর চোখ ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে এসেছিল প্রসন্নময়ী।

ওদিকে মুন্‌কে ভট্‌চায প্রস্তুত হয়েই ছিল। ওই জ্যান্ত চণ্ডী একবার মুখের দিকে তাকালে আর তার জিভ নড়বে না জানে। তাই সামনের চিক্ নড়ে উঠতেই দু'হাত জুড়ে গদগদ গলায় বলে উঠল, মা গো, আমি দীন সন্তান—

আ-মর্ মিন্‌সে, কাকে কি বলে ঠিক নেই!

সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নর রুদ্রাণী মূর্তি দেখে মুন্‌কে হতচকিত।

প্রসন্ন দ্বিতীয় দফা হিসহিস শব্দে মুখঝামটা দিয়ে উঠল, বলি দল ছেড়ে বিবাগী হয়ে যাবে কোন্ চুলোয় কাপুরুষ খরগোস কোথাকার!

বিষণ্ণ বদনে মুন্‌কে বলল, ছিরে যে শাসিয়ে দিল ভুঁড়ি চারফালা করে দেবে!...তোমার বউমণি কি বলল?

এই মুখ দেখে প্রসন্নর হাসি পেয়ে গেল। তবু গম্ভীর।—বউমণি বলল দল ছাড়লে ষষ্ঠীচরণের লোক ওই ভুঁড়ি আটফালা করে দেবে। এখন যা পছন্দ তাই করো গে যাও।

মুন্‌কে ভট্‌চায অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, আমি তো তাহলে সর্বভাবে মরলাম রে পেসন্ন।

হাসি চাপার চেষ্টায় প্রসন্ন ভ্রূকুটি করে মুখ ভেঙচে উঠল, ও! কি বীর পুরুষ রে আমার!...মরণ তোমার আমার হাতে, বউমণি বলেছে কেউ তোমার টিকিতে হাত দিতে এলে তার ধড়ে মাথা থাকবে না, ষষ্ঠীচরণকে ডেকে সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে—যাও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও গে এখন পেটুকরাম!

প্রসন্ন ফেরার উদ্যোগ করতে মুন্‌কে সদ্য সদ্য প্রাণে বাঁচার আশায় ফস্ করে তার আঁচলটা ধরে ফেলল, শোন্ শোন্ পেসন্ন—

এক ঝটকায় আঁচল ছাড়িয়ে নিয়ে প্রসন্ন ফোঁস করে উঠল, বলি দিনে দুপুরে লাজের মাথা খেয়েছ? বউমণির জানতে কিছু বাকি নেই, ভালো চাও তো পালাও এখন—

মুন্‌কের ভালো করে মুখ শুকোবার আগেই একজন পরিচারকের পদার্পণ।—পেসন্নদি, বউমণি বললেন ভট্‌চায মশাই আজ দুপুরে এখানেই খেয়ে যাবেন, আর তোমাকে বললেন পুকুরে জাল ফেলিয়ে বড় দেখে একটা মাছ ধরবার ব্যবস্থা করতে।

মুন্‌কের দিকে চেয়ে প্রসন্ন হেসেই ফেলল। ড্যাবডেবে দুই চোখ দিয়ে লোভ যেন চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। চেয়ে আছে এমন যেন প্রসন্নর মাথাটাই পাকা মাছের মাথা একখানা।

এর পর থেকে দুই বারইয়ারীর দল-পুষ্টি রেষারেষিটা তরল আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল হঠাৎ। ব্যাপারটা প্রথমে জমে উঠল ওই মুন্‌কে ভট্‌চাযকে নিয়েই।

মানুষটা মনের আনন্দেই ছিল। চুপি চুপি দক্ষিণপাড়ার মাতব্বর মদনমোহনের সঙ্গে দেখা করার পর পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। সে তাকে অভয় দিয়েছে কেউ তার কোনরকম ক্ষতি করবে না।

এমন দিনে করণের মাটিতে এক প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব। ভিন গাঁয়ের মানুষ নাম বেণীমাধব। পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আসর মাত। ব্যাপার আর কিছুই না, ক্ষুধার্ত হয়ে করণের এক বড়সড় ময়রার দোকানে উঠেছিল। ময়রা কি চাই জিজ্ঞাসা করতে সে পাল্টা প্রশ্ন করল, আমাকে পেট ভরে ফলাহার করাতে কত নেবে?

ভেবে-চিন্তে ময়রা জবাব দিল, পাঁচ আনা।

পাঁচ আনায় পেট ফুরান করে ফলাহারে বসল বেণীমাধব। খানিকক্ষণের মধ্যেই ময়রার কাঁদ-কাঁদ মুখ। চিঁড়ে দই মিঠাই মণ্ডা থেকে শুরু করে ক্ষীর ছানা পর্যন্ত দোকানে যা কিছু ছিল সব নিঃশেষ। চতুর ময়রা বেশিক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকল না। করণের দুই বারইয়ারীর দলপুষ্টির রেষারেষির খবর সে রাখে। পরম সমাদরে বেণীমাধবকে সে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীতে এনে হাজির করল। সব শুনে উল্লসিত তারা। মুন্‌কের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মিলেছে। সবাই তাকে জিজ্ঞেস করছে মুন্‌কেকে হারাতে পারবে কিনা। জবাবে সবিনয়ে বেণীমাধব বলেছে এই আহারটুকুর গুণে রসিকজনের কাছ থেকে সে উপাধি পেয়েছিল 'ব্রহ্মা'—সেই জঠরের জ্বালায় ব্রহ্মা অন্নসন্ধানে বেরিয়েছে—এই জ্বালায় তার পক্ষে এখন মুন্‌কে হজম করা কুন্‌কে হজম করার সামিল। শুনে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর আবাল-বৃদ্ধের আনন্দ ধরে না। আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে যেন তারা। ময়রার লোকসান তারাই পুরিয়ে দিলে।

তারপর দেখতে দেখতে রটে গেল গোটা মুন্‌কেকে হজম করার মত বৈশ্বানর সদৃশ ব্রহ্মার আবির্ভাব ঘটেছে করণে এবং সেই গুণী দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর শোভাবর্ধন করে আছে!

রটনার জোরে সপারিষদ রাধানাথ সচকিত। ওদিকে দুর্ভাবনায় মুন্‌কের মুখ শুকনো। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভোজনপটু কত বড় জানে না, কিন্তু দুর্ভাবনা সেই কারণেও নয়। চিন্তার আসল কারণ, করণের মত ছোট গাঁয়ে দু'দুটো ভোজনবিশারদের জায়গা হবে কেমন করে? একাধিপত্য ছিল যখন তখনই তো মাসের তিরিশ দিন মনের মত আহার জোটানো দায় হত। এখন না হয় একটা বড় রকমের রেষারেষি চলেছে, কিন্তু পরের স্বাভাবিক সময়ে কি হবে? তখনো পাল-পার্বণে নেমন্তন্ন ভাগাভাগি হলে তো মুনকের মাথায় বজ্রাঘাত!

এর পরও আর এক অপ্রত্যাশিত বিপদে মুনকে দিশেহারা। তখনো জানে না এটা কত বড় প্রতিকূল আশির্বাদ। দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর এক পৃষ্ঠপোষকের কাছে মুনকেব কিছু টাকা দেনা ছিল। সে-সময় কারো মনে দত্তপাড়ার বারইয়ারীর অস্তিত্বও ছিল না। এখন মওকা মুঝে সেই দেনাদারটি নালিশ ঠুকে দিয়ে মুনকের একেবারে কারাবাসের ব্যবস্থা করে ফেলল। এত সত্বর এই ব্যবস্থার পিছনে দক্ষিণপাড়ার পৃষ্ঠপোষকদের বেশ একটা কারসাজি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মজা জমে উঠল। দত্তপাড়ার সকলের ধারণা, এই কারসাজির পিছনে আসল মাথাখানা মদনমোহনের। অতএব সকলে একটা পাল্টা ঘোষণা আশা করছে। আশা করছে মুনকের দেনার টাকা রাধানাথ দত্ত অন্যথায় চণ্ডীবউ শোধ করে দেবে।

রাগের মাথায় রাধানাথের সেই রকমই ইচ্ছে হয়েছিল। চণ্ডীবউও আপত্তি করত না, কারণ শোনামাত্র সে উতলা হয়ে বলেছে, জেলে তো বেচারা না খেয়েই আছে বোধ হয়, সেখানে তাকে পেট ভরে খেতে দেবে কে?

কিছু না ভেবে রাধানাথ জবাব দিল, খেতে দিতে ডিক্রিদারই বাধ্য, খোরাকির জন্য মুনকে তার কাছ থেকে রোজ দু'আনা করে পাবে।

মাত্র দু'আনায় তার মত মানুষের কি খাওয়া হবে?

রাধানাথ জবাব দিল, না হলে কি হবে!

কি মনে হতে চণ্ডীবউয়ের দু'চোখ ধারালো হয়ে উঠল।—তুমি এক্ষুনি গিয়ে তোমার উকীলবাবুর কাছ থেকে জেনে এসে তো, ডিক্রি যে পেয়েছে সে ভট্চায মশাইকে পেট ভরে খেতে দিতে বাধ্য কিনা। যদি হয় তাহলে পেট ভরে খেতে দিক, দেখি ক'দিন পারে।

এবারে রাধানাথের দু'চোখ চকচকিয়ে উঠেছে। সে ছুটেছে উকিলের কাছে। সেই ভদ্রলোকও তারিফ করে উঠেছে। এরপর যে প্রহসনের সূত্রপাত সেটা মজাদার ব্যাপার বটে। কারাধ্যক্ষের মারফৎ জজসাহেবের কাছে মুনকে ভট্চায বিধিবদ্ধভাবে লিখিত আবেদন পেশ করেছে, দু'দিন হয়ে গেল প্রায় নিরুম্বু উপোস চলছে তার, কারণ দু'আনার বরাদ্দ আহারে তার কিছুই হয় না—জীবনধারণের জন্য কমপক্ষে দৈনিক দু'টাকার আহার চাই তার, অন্যথায় প্রাণে বাঁচা দায়।

আবেদন পড়ে লাল চামড়ার জজ কৌতুক বোধ করল। তার ওপর কারাধ্যক্ষ যখন জানালো দু'দিন ধরে লোকেটা সত্যিই প্রায় না খেয়ে আছে, তখন কৌতূহল আরো বাড়ল। দু'একজন নেটিভ সাঙ্ঘাতিক খেতে পারে এমন গুজব তার কানে এসেছিল। তা বলে দিনে দু'টাকার আহার! রাক্ষস ভিন্ন অত কেউ খেতে পারে!

সাহেব বিচারক মানুষ। অতএব চাক্ষুষ দেখে বিচার করার আগ্রহ হল তার। একবারের জন্য দু'টাকা বরাদ্দ করা হল, এবং কারাধ্যক্ষকে জানানো হল সে নিজে এসে দেখবে আবেদন যথার্থ কিনা।

বাস, তিন ক্রোশ দূরের মহকুমার খবর করণে পৌঁছুতে সময় লাগল না। বেশ একটা শোরগোল পড়ে গেল। সকাল হতে বহু লোকে ছুটল জেলখানার দিকে। স্বয়ং বিলিতি ধর্মাবতার আসছে মুনকের খাওয়া দেখতে এমন ঘটনা কটা ঘটে।

ওদিকে দু'টাকা হাতে পেয়ে রক্ষীর প্রহরাধীনে মুনকে নিজেই বাজারে গেল। দু'টাকায় কতই বা বাজার হবে—আট সেব চাল, তিন সের ডাল, সাড়ে সাত

সের একটা রুই মাছ, দু'হাঁড়ি দই আর কিছু মণ্ডা। চান টান করে মুন্‌কে নিজেই রান্না করল। ওদিকে ঘোড়ায় চড়ে জজসাহেবও খাওয়া দেখতে হাজির। বিশেষ অনুমতিক্রমে সামনের খোলা চাতালে বসে খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল মুন্‌কেকে, কারণ দর্শকরাও তার আহার দেখার জন্য আকুল। অনেকেই জানে না সেই ভিড়ের মাঝে ব্রহ্মা বেণীমাধবও দাঁড়িয়ে আছে।

কতকগুলো আঙ্গট কলাপাতা বিছিয়ে তার ওপর হাঁড়ির সব ভাত ডাল আর মাছ ঢেলে নিয়ে এবং দই মিষ্টি পাশে রেখে মুন্‌কে আহারে বসল। তারপর সেই আহার দেখে সাহেবের দু'চোখ কপালে। দেখতে দেখতে ভাত ডাল আর মাছের স্তূপ নিঃশেষ। মুন্‌কের তখন সংহার-মূর্তি। সাড়ে সাতসেরি মাছের মাথাটা তুলে নিয়ে সেই বিশাল-বদন ব্যাদান করে কড়মড় করে যেই কামড় বসিয়েছে, সাহেব সভয়ে তিন-পা ঘোড়া পিছিয়ে নিয়ে বলে উঠল, হামকো খাও মৎ! ইসি বাদ উ ডানব হামকো খা লেগা!

পরক্ষণে ঘোড়া ছুটিয়ে পলায়ন।

করণে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল একটা। সাহব সেই বিকেলেই ডিক্রিদারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছে, খোরাকির বাবদ ভট্‌চাযকে সে রোজ দু'টাকা করে দিতে পারবে কিনা! কাঁপতে কাঁপতে ডিক্রিদার জানিয়েছে সে অপারগ। অতএব সাহেবের হুকুমে মুন্‌কে ভট্‌চায মুক্ত।

সেই মুক্তির উল্লাসে করণের বাতাস মুখরিত। সদলবলে রাধানাথ ঢাক ঢোল কাঁসর ঘন্টা শাঁখ বাজিয়ে আর গলায় মালা পবিয়ে ভট্‌চাযকে আনার ব্যবস্থা করেছে। কার বুদ্ধিতে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল এই উল্লাসের ফাঁকে সে-খবরও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আর সেই উল্লাসে রাধানাথ এও ঘোষণা করে বসল, পুরস্কাব স্বরূপ চণ্ডীবউ মুন্‌কে ভট্‌চাযকে এক বছবেব জন্য দৈনিক দু'টাকা করেই বৃত্তিদান প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

চণ্ডীবউ জানেও না। এ প্রতিশ্রুতি রাধানাথেব নিজেরই মস্তিষ্কজাত। কিন্তু শুনে চণ্ডীবউও অখুশি নয়।

সেই সাঁঝের আঁধারেই দক্ষিণপাড়ার নতুন গুণী 'ব্রহ্মা' বেণীমাধব গাঁ থেকে উধাও।

দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর মুখে চুনকালি। উৎসবের মাত্র এই কটা দিন আগে 'ব্রহ্মা' বেণীমাধব এভাবে রণে ভঙ্গ দিয়ে তাদের নাককান কেটেছে। অতএব দলের মুরুব্বিকে নিয়ে তাদের একটা জোরদার মন্ত্রণায় বসার ইচ্ছে। এই এক ব্যাপারেই দলের চটক অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সুনাম ফেরাতে হলে মাথা খাটিয়ে তেমনি চটকদার কিছু একটা করা দবকার।

কিন্তু এই ব্যাপারের পর মাথা খাটানোর আসল মানুষটাকে মেজাজে আনা যেন আরো কঠিন হয়ে পড়ল। অবশ্য মেজাজেই আছে সে, দিব্বি খুশি মেজাজে! শুধু মদনমোহনের মুখেই যেন চুনকালির দাগ নেই। উল্টে সে যেন করণের আর দশজনের মতই ব্যাপারটা উপভোগ করছে। এমন কি মন্ত্রণার আসরেও তাকে পাওয়া ভার।

এই সংকটের মুখে সেদিন মদনমোহন সশরীরে যে প্রস্তাব নিয়ে এলো, শুনে সকলের চক্ষুস্থির। খানিকক্ষণ পর্যন্ত কারো মুখে কথা সরে না।

সে এসেই প্রস্তাব পরল দুই বারইয়ারীর উৎসব একদিনে হবে না। তাদেরটা বেশ কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দিতে হবে।

সকলে হতচকিত। নির্বাক বিমূঢ় খানিক। তারপরে সমস্বরে উদ্‌বেগে ভেঙে পড়ল। সে কি গো! আজ বাদে কাল যাত্রাওয়ালা আর নাচিয়ে গাইয়েদের সব বায়না করে আনার কথা—

বাতিল করে দাও। ও আর নতুন কি করা হল, সকলেই করছে।

যাত্রা নাচ গান ভিন্ন উৎসব জমজমাট হতে পারে কি করে কারো মাথায় এলো না। কে কত ভালো যাত্রার দল আর নামী নাচিয়ে-গাইয়ে নিয়ে আসতে পারে এই চিন্তাটাই মগজে দানা বেঁধে আছে সকলের। তার বদলে কিনা যাত্রানাচ গান সব বাতিল!

সহায় ভট্টর পর্যন্ত গাঁজার ঝিমুনি কেটে যাওয়ার দাখিল। লাল-লাল দু'চোখ টান করে সে শুধালো, তাহলে উৎসবটা কি হবে?

মদনমোহন হাসছে মিটিমিটি। চোখ ঘুরিয়ে সহায় ভট্টর মুখখানা চড়াও করল।—আচ্ছা সহায় খুড়ো, এমন যদি কোনো উৎসব হত সেখানে তোমার ছেলে বত্রিশের বদলে চৌষট্টি ছিলিম কড়া গাঁজা ওড়াচ্ছে, আর সকলে তাকে খুব বাহবা দিচ্ছে, আর তুমি সামনে বসে তাই দেখছ—তোমার কেমন লাগত?

উদ্ভট প্রশ্ন শুনে সকলের আর এক দফা বিভ্রম। সহায় ভট্টরও সেই অবস্থা। বিড়বিড় করে জবাব দিল, নিজের ছেলেকে অত গাঁজা খেতে দেখলে কার আর ভালো লাগে।

এই উত্তরই যেন আশা করেছিল মদনমোহন। হাসতে লাগল। তার চোখ দুটো এবার ছিরে পাগলার দিকে ঘুরল!—কি গো শ্রীনাথ, অমন বাজ-পড়া মুখখানা করে বসে আছ কেন? তোমারও তো ছেলে আছে একটা, ধরো কালে দিনে সেও যদি তোমার থেকে ডবল খিস্তিখেউর করে হাতী-ঘোড়ার ডাক ডেকে মোষের পিঠে চড়ে বসে—তুমিও আনন্দে হাততালি দেবে তো?

ছিরে পাগলা যেন প্রতিকূল কিছুর ভণিতা দেখছে। সাদাসাপটা জবাব দিল, আমি না হয় জাহান্নমে গেছি বুঝলাম, তোমার মতলবখানা কি বলো, লোকের ট্যাঁক ফাঁক করে টাকা এনে এখন গীতা-চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করবে?

না তা না, আমি ওদের তাক লেগে যাওয়ার মত কিছু করার কথা ভাবছি।

তাতে কারো আপত্তি নেই। উদ্‌গ্রীব সকলে। সোৎসাহে সায় দিল কেউ কেউ, আমরাও তো তাই চাই। কী করবে বলো?

বোসো, সময়ে সব জানতে পাবে, মোট কথা আমার ওপর তোমাদের বিশ্বাস আছে কি নেই?

বারইয়ারীর রসিকরা হঠাৎ বিপাকেই পড়ল যেন। 'কি যে বলো, কি যে বলো' করে উঠল তারা। শুধু ছিরে পালগার চোখে সংশয়, তাই মুখখানা বিরস। সে ফস করে জবাব দিল, বিশ্বাস আমাদের ষোল আনার ওপর আঠারো আনা আছে, কেবল তোমার মাথার মালপত্তর আগের মত সব ঠিক আছে কিনা আমার বাপু সেই সন্দ।

কেন?

তোমার ভাবগতিক দেখে।...মুন্‌কে এভাবে অপমান করলে আমাদের, তাতেও তোমার কোনো তাপ-উত্তাপ দেখিনে।

অম্লানবদনে মদনমোহন জবাব দিল, ব্রহ্মাকে নিয়ে তোমরাই তো নাচানাচি করলে। ভিন গাঁয়ের লোককে জব্দ করে মুন্‌কে মুখ রক্ষা করেছে—আমি তো খুশি হয়েছি।

ছিরে পাগলার ছদ্ম-গাম্ভীর্যে ভরাট দু'চোখে নিঃশব্দে সকলের মুখের ওপর ঘুরল একপ্রস্থ। দলের প্রধান মাতব্বরটির মাথা বিগড়োনোর সন্দেহ যে অমূলক নয় এ চাউনি দিয়ে সেটাই আগে বুঝিয়ে দিল সকলকে। তারপর দৃষ্টিবাণে আর ব্যঙ্গবাণে সরাসরি মদনমোহনকেই বিদ্ধ করতে চাইল।—তা তুমি খুশিটি ঠিক কিজন্যে গো মদন-সখা, ভিন গাঁয়ের লোককে মুন্‌কে জব্দ করেছে বলে, নাকি সেই জব্দ করার মন্ত্রটি কোনো পরমা পুরললনার মগজ থেকে বেরিয়েছে শুনেছ—সেই জন্যে?

রসের মোক্ষম অস্ত্রখানা এতদিনের মধ্যে এমন খোলাখুলি তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারে নি কেউ। মন্ত্রণার আসরের মানুষেরা সচকিত। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে মদনমোহন হাসতে হাসতে প্রস্থান করে সেখান থেকে।

দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর সমস্ত উৎসব আপাতত বন্ধ, এ খবর শোনার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় সপার্ষদ রাধানাথ আনন্দে আটখানা। তার ভক্তরা সব ধুলো-বালির ওপর ডিগবাজি খেল কয়েক দফা। রাধানাথ ফূর্তিতে বিগলিত বদন। বউয়ের বুদ্ধি আর মুন্‌কের কেরামতির একখান ঝাপটা খেয়েই এই হাল ওদের!

কিন্তু সুস্থ চিন্তার অবকাশ মিলতে ক্রমে এই আনন্দের ওপর একটা সংশয়ের ছায়া দুলতে লাগল। দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর তহবিলে চাঁদা কম জমে নি সে-খবর রাধানাথ রাখে। লোকের গলায় বাঁশ চেপে চাঁদা আদায় করেছে তারা। সেই টাকার থলে নিয়ে চুপচাপ ভালো মানুষের মত বসে থাকবে, বিশ্বাস কবাও বোকামি। আসলে ওরা কি করে না করে দেখে নিয়ে তার ওপর টেক্কা দেবার মতলব এঁটেছে নিশ্চয়।

অস্বস্তিটা প্রথমে স্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করল। বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে সুখ আছে। মেজাজে থাকলে চট্‌পট বুদ্ধি বাতলে দিতে পারে। আর ফন্দি-ফিকিরের জাল ছিঁড়ে তচ্‌নচ করে দিতেও সময় লাগে না। বলল, ব্যাটাদের পেটে পেটে নিশ্চয় কিছু মতলব আছে, নইলে এভাবে পিছিয়ে যাবার মত ভালো মানুষ ওরা নয়!

চণ্ডীবউ মন্তব্য কিছু করল না। গৃহশান্তি বজায় রাখার চেষ্টা আপাতত সেও করছে বটে, কিন্তু ভেতরটা তার এই পর্যায়ের শলা-পরামর্শে মেতে ওঠার মত তরল হয়ে যায় নি। তাছাড়া দক্ষিণপাড়ার উৎসব স্থগিত রাখার পিছনে ওদের কু-মতলবটাই তার চোখে বড় হয়ে উঠল না। উল্টে ভাবতে ইচ্ছে করল, যে কড়ারে ওদের মুরুব্বির হাতে সেদিন চাঁদা তুলে দিয়েছিল সেটাই হয়ত একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায় নি। প্রসন্নকে ডাব আনতে পাঠিয়ে যেভাবে লোকটা তার হাত থেকে টাকা নিয়ে চলে গেছল, তাতে তাকে শুধু ইতর ছাড়া আর কিছু ভাবতে চায় না চণ্ডীবউ। তবু সেদিনের সেই ফয়শালার সম্মানটুকু হয়ত রেখেছে। অশান্তি

এড়াবার জন্যই সম্ভবত এই ব্যবস্থা। কিন্তু সে কথা বললে এদিকের স্নায়ুতে আবার কাটাছেঁড়া শুরু হবে।

কাছে সরে এসে রাধানাথ তাগিদ দিল, কি করা যায় বলো তো?

কথার ফাঁকে এই কাছে আসার প্রীতি ভাবটা চণ্ডীবউ কদিন ধরে লক্ষ্য করছে। গা ঘেঁষে বসে, অন্তরঙ্গ হাত কাঁধে বা বাহুতে চালান করে দেয়। চণ্ডীবউ বাধা দেয় না বটে, কিন্তু ভিতরের একটা বিতৃষ্ণা অনুভূতি যেন তাকে দূরে ঠেলে দিতে চায়। অবিশ্বাসের যে মেঘ তার মধ্যে জমে আছে সেটা যেন এত সহজে তরল হবার নয়। অথচ প্রাণপণে চাইছে তরল করে আনতে। চাইছে নতুন করে আবারও বিশ্বাসের বীজ বুনতে।

সাদাসিধে জবাব দিল, কি আবার করবে...ভালোই তো হল, দু'তরফের উৎসবই সকলে দেখতে পাবে, একদিনে হলে তো গাঁয়ের লোকই ঠকত!

এই জন্যই বউকে এক-একসময় আবার ছেলেমানুষের মত অবুঝ মনে হয় রাধানাথের। বিরক্তি চাপতে চেষ্টা করেও পেরে উঠল না।—হ্যাঁঃ, তুমি কি ভেবেছ গাঁয়ের লোকের মুখ চেয়ে ওই পাজীটা এই ব্যবস্থা করেছে! আসলে আমাদের জব্দ করার মতলব কিছু।

হতেও পারে। অবিশ্বাস করার মত আর পুঁজি নেই চণ্ডীবউয়ের হাতে। পাজী ছাড়া আর কি, ইতর ছাড়া আর কি! তার কত দুঃসাহস দেখেছে, কত রকমের মতলব টের পেয়েছে সে আর চণ্ডীবউয়ের থেকে কে বেশি জানে? এই চিন্তাতেই ভিতরটা তেতে উঠল একটু। জবাব দিল, তাহলে জব্দ যাতে না করতে পাবে আটঘাট বেঁধে সেইভাবে এগোও।

সোৎসাহে সেই ব্যবস্থাতেই এগোলো রাধানাথ। শত্রুপক্ষের অস্ত্র দিয়েই শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার মতলব মাথায় এলো প্রথম। ওরা মুন্‌কের প্রতিদ্বন্দ্বী এক পেটুক রামকে এনে তাদের ঘায়েল করতে চেয়েছিল। সেই বৈশ্বানর ব্রহ্মা ওদের মুখে চুনকালি দিয়ে পালিয়েছে। সত্যিকারের মজাদার গুণী বলতে ওদের এক ছিরে পাগলাই সবেধন নীলমণি। গেঁজেল সহায় ভট্ট আর যাই হোক গাজার ধোঁয়ায় গাঁয়ের উৎসব জমিয়ে তুলতে পাবে না। অতএব তার চিন্তা আপাতত বাতিল করা যেতে পারে। শুধু ছিরে পাগলার জুড়ি একটা গুণী জোটাতে পারলেই কিস্তিমাৎ! পারবে না-ই বা কেন? হরবোলা তো দুজন একজন সর্বত্রই আছে। যাচাই-বাছাই করে একটাকে ধরে এনে গাঁয়ে বসানো যাবে না! টাকা ঢাললে কি না হয়!

শোনামাত্র রাধানাথের পার্ষদরাও টগবগিয়ে ফুটে উঠল।—কি না হয় কড়ি ঢাললে, ফাঁকা আকাশও ঢাকা যায়। আর বলবেই বা কে কি, খাল কেটে কুমীর আনার রাস্তা তো ওই বাছাধনরাই দেখিয়েছে ব্রহ্মদত্যিকে এনে! তুমি আর দেরি করো না রাধানাথ, চারদিকে লোক পাঠাও—ছিরে পাগলার একটা বাবা ধরে নিয়ে আসুক!

খুব সংগোপনে সেই চেষ্টা শুরু হল। আর তার পরেই আর এক চমকপ্রদ বুদ্ধি খেলে গেল রাধানাথের মগজে। তাদের তুলনায় দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর গুণীবল যে কিছুই নয় সেটা জাঁকিয়ে প্রচার করার মওকা ছাড়ে কোন্ মূর্খ! বিশেষ করে ষষ্ঠীচরণের মত ভীম-পালোয়ান যখন একেবারে হাতের মুঠোয়! জোর যার মুলুক তার, এই জোরের খবরটা গাঁসুদ্ধু লোকেব চোখের সামনে ঘটা করে তুলে ধরবে

না কেন? এক ষষ্ঠীচরণকে দিয়েই তো রেষারেষির নাটক জমজমাট হয়ে উঠতে পারে।

সঙ্কল্প স্থির হওয়া মাত্র আরো অনেক সূক্ষ্মবুদ্ধির বিস্তার ঘটতে লাগল। আর দু'তিন দিনের মধ্যেই এক অভিনব প্রচারের চটকে করণের মানুষ উদগ্রীব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। প্রচারের সারকথা, পরের সপ্তাহেই দত্তপাড়ার নতুন বারইয়ারীর উৎসব শুরু হবে ষষ্ঠীচরণকে দিয়ে। করণের এবং আশেপাশের সমস্ত গাঁয়ের সেরা পালোয়ানদের মল্লযুদ্ধ আহ্বান জানানো হচ্ছে। একে একে তিনজন পালোয়ানের সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত ষষ্ঠীচরণ। যে তাকে হারাতে পারবে তার গলায় সোনার সুতোয় বাঁধা সোনার মোহর পরিয়ে দেওয়া হবে। হারাতে না পারলে সেই মোহর ষষ্ঠীচরণের গলায় যাবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলে মজা আর কতটুকু হল! ষষ্ঠীচরণ জিতবে জানা কথাই, তার ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে সাহস করবে কিনা সন্দেহ। সেক্ষেত্রে প্রচারের পরের অংশটুকুই উপভোগ্য সব থেকে। ষষ্ঠীচরণের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী যদি না মেলে তাহলে দত্তপাড়ার বারইয়ারীর পছন্দমত তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতীকের সঙ্গে লড়তে হবে ষষ্ঠীচরণকে। সেই প্রতীক তি জনকে সঙ সাজিয়ে মল্লভূমিতে আনা হবে। ষষ্ঠীচরণ একে একে তাদের হারিয়ে বে সোনার তারে বাঁধানো মোহর গলায় ধারণ করবে।

প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মজার ব্যাপারটা কি হবে বুঝতে কারো বাকি থাকল না। ষষ্ঠীচরণের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর মিলবে কোথায়? সোনার তারে বাঁধানো মোহরের লোভে আশপাশের গাঁ থেকে যদি লড়তে আসেও কেউ, তাদের কুপোকাত হতে সময় লাগবে না। তখন ওই বাছাই করা বিশিষ্টদের অর্থাৎ তাদের প্রতীক সঙ তিনটির ডাক পড়বেই। আসরে কৌতুকের বন্যা নামবে তখনই।

প্রতীক সঙ তিনটি কোন্ বিশিষ্টজনদের তাও বুঝতে এবং রটতে বাকি থাকল না। একজন গেঁজেল সহায় ভট্ট, দ্বিতীয়জন হরবোলা ছিরে পাগলা, আর তৃতীয়জন বলা বাহুল্য, দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর মুকুটমণি স্বয়ং মদনমোহন।

এর থেকে বেশি কৌতুকপ্রদ রোমাঞ্চকর ব্যাপার আর কি হতে পারে!

মুখ সত্যিকারের শুকালো দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর অনুগতদের। এর থেকে অপমানকর হেনস্থা আর কিছু আছে নাকি? শত্রুপক্ষ এমন সব তাজ্জব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে আর তাদের মাতব্বরটি কিনা গণ্ডারের চামড়ার খোলস এঁটে নিদ্রা যাচ্ছে? তাদের উৎসবই বন্ধ, তারা শুধু এইসব দেখবে চেয়ে চেয়ে আর অপমান হজম করবে?

দুজন অত্যুৎসাহী লোকে গিয়ে মদনমোহনকে ধরে নিয়ে এলো। এর পরেও যদি সে চুপ করে থাকে তো ছিরে পাগলার কথাই সত্যি বুঝতে হবে—তার মাথাই খারাপ হয়েছে ধরে নিতে হবে।

মদনমোহন চুপ করে থাকলো না। হেসে জিজ্ঞাসা করল, কি গো, সব এমন গোমড়ামুখ কেন?

ছিরে পাগলা ফোঁস করে উঠল, তোমরাই বা এমন খুশিমুখ কেন, ভিতরে ফাগুন বাতাস বইছে!

তেমনি হেসেই মদনমোহন মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, তাই বইছে বটে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তা তোমাদের কি হয়েছে?

সহায় ভট্টর কাঁদো কাঁদো মুখ।—কি হয়েছে সেই খবরও রাখো না?

রাখি। তার জন্যে এত ভাবনা কিসের, ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে লড়তে পারবে না?

অন্য সময় হলে এ রসিকতায় ছিরে পাগলাও যোগ দিত, কিন্তু প্রতীক সণ্ড হিসেবে সহায় ভট্টর পরেই যে তার নাম! অতএব সে চিড়চিড়িয়ে উঠল, তুমিও কি এটা মজাদার ঠাট্টার ব্যাপার ভাবছ!

না। মদনমোহন এবারে গম্ভীর।—আমার প্রতীক সণ্ড দাঁড় করানোর সুযোগ ওরা পাবে না, ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে আমি নিজেই লড়ব ঠিক করেছি।

আসরে বাজ পড়ল যেন একটা। মদনমোহনের ওই ছিপছিপে শরীরে জোর বেশ আছে সকলেই জানে। তার থেকেও চতুর্গুণ আছে সাহস তাও সকলেই জানে। তা বলে ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে লড়তে যাবে এমন সাহস আত্মহত্যার সামিল ছাড়া আর কি?

সমস্বরে হাঁ-হাঁ করে উঠল সকলে।—সত্যি সত্যি লড়বে? ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে? ঠিক করে ফেলেছ?

মদনমোহন আরো গম্ভীর। কিন্তু ভিতরে ভিতরে হাসছে যেন। মাথা নাড়ল।—হ্যাঁ। তোমাদের কিছু ভয় নেই। তোমরা শুধু এই খবরটা রাধানাথের কানে তুলে দাও, আর জানতে চাও, আমি জিজ্ঞেস করেছি যে জিতবে তার গলায় সোনার সূতোর মোহরের মালাখানা তার বউই পরিয়ে দেবে কিনা।

সমস্যা যত বড়ই হোক, সত্যিকারের রসের রসিক নয় কে! খানিকক্ষণের জন্য আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গেল যেন আসরে। দৃশ্যটা কল্পনা করতে গেলেও রোমাঞ্চকর বটে। তারপর হাল্কা বিভ্রম সকলের মুখে। কি আছে তাদের মাতব্বরের মাথায় কে জানে।

দ্বন্দ্বমল্লের আহ্বান গ্রহণ এবং সেই সঙ্গে এমন বেপরোয়া রসিকতার খবরটা শুকনো খড়ের গাদায় আগুন লাগার মত করেই করণের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। যত শঙ্কা, তত রোমাঞ্চ।

চণ্ডীবউয়ের সমস্ত মুখ আলতা-গোলা লাল। তার সামনে দাঁড়িয়ে রাধানাথ রাগে ফুঁসছে আর অনুপস্থিত একজনের মাথা দাঁতে করে চিবুচ্ছে।

চণ্ডীবউ বলে উঠল, জিতলে নিজে হাতেই দেব না হয় মালা পরিয়ে, কিন্তু তার আগে যে-শরীরে এত শখ সেই শরীরখানা মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারবে না তোমাদের ষষ্ঠীচরণ?

রাধানাথ থমকালো কয়েক মুহূর্ত। দৃষ্টি বউয়ের আগুনপানা মুখের ওপরে নিবদ্ধ। তার পরেই কি এক নতুন উদ্দীপনায় উদ্ভাসিত সমস্ত মুখ। পরক্ষণে পড়ি-মরি করে ছুটে বেরিয়ে এলো সে। সোজা নীচে। দুইজন লোকপাঠালো ষষ্ঠীচরণকে ধরে আনার জন্য। এক্ষুনি—এক্ষুনি চাই তাকে!

দশ মিনিটের মধ্যেই ষষ্ঠীচরণ হাজির। সেই সঙ্গে নীচের ঘরে সমবেত হয়েছে রাধানাথের জনাকয়েক ইয়ার-ভক্ত। কিন্তু তাদের দিকে তাকাবার সময় নেই রাধানাথের। ষষ্ঠীচরণকে সঙ্গে করে সোজা ওপরে উঠে এলো সে। একেবারে নিজের ঘরে।

মায়ের উদ্দেশে সবিনয়ে প্রণাম জানালো ষষ্ঠীচরণ। রাধানাথ জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের মদন ঠাকুরের স্পর্ধার কথা শুনেছ?

বিব্রত মুখ করে ষষ্ঠীচরণ জবাব দিল, হ্যাঁ দাদা, সাহস করে লড়তে আসে আসুক, তা বলে অমন রসিকতা করা দাদাঠাকুরের উচিত হয় নি।

চণ্ডীউয়ের আরক্ত ভাব তখনো মিলায় নি। ষষ্ঠীচরণের কথা শোনামাত্র মুখ আবার টক্‌টকে লাল।

রাধানাথের ভিতরে ভিতরে চাপা উল্লাস।—খুব তো মা-মা করো, এত বড় অপমানের জবাব তুমি দেবে কি না সেটাই তোমার মা জানতে চান।

বিমর্ষ-মুখে ষষ্ঠীচরণ বিড়বিড় করে জবাব দিল, কি করতে হবে মা-জননী আদেশ করুন।

অবকাশ না দিয়ে রাধানাথই ঝলসে উঠল, কি করতে হবে তা বলে দিতে হবে? ওর ওই মুখ মাটির সঙ্গে একেবারে থেঁতলে দিতে হবে, হাড়গোড় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে হবে, জন্মের মত শিক্ষা দিতে হবে—বুঝলে? তোমার মা-জননী নিজের মুখে এই চেয়েছেন, বুঝলে? বুঝলে?

জবাবে ষষ্ঠীচরণ তার মা-জননীটির দিকেই তাকালো একবার । অধীর মুখ রাধানাথের।—চুপ করে আছ কি হে ষষ্ঠীচরণ, দাপট দেখিয়ে কুস্তিতে নামে যদি, তার পরেও তুমি কি ভক্তিশ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠবে নাকি?

বক্র গাম্ভীর্যে ষষ্ঠীচরণ জবাব দিল, লড়তে এলে ষষ্ঠীচরণ কাউকে খাতির করে কথা কয় না।

সোল্লাসে রাধানাথ তার পিঠ চাপড়ে দিল।—এই তো মরদের মত কথা! ওর লড়ার সাধ জীবনের মত মিটিয়ে দিতে হবে তোমাকে—হাড়গোড় ভেঙে একেবারে পঙ্গু করে দিতে হবে। তোমার কোনো ভাবনা নেই—শত্রুকে কেউ দয়া করে? সব দায় আমার, ওই পুরস্কার ছাড়াও আরো কিছু পাবে তুমি জেনে রেখো। দৃপ্ত চোখে বউয়ের দিকে তাকালো একবার, শত্রুনিপাত যেন হয়েই আছে।—যাই, কি হল জানবার জন্যে নীচে ওরা আবার সেই থেকে বসে আছে, তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে জলটল খেয়ে যেও ষষ্ঠীচরণ।

উল্লাসে উড়ে চলল সে। ঘরে ষষ্ঠীচরণের সামনে চণ্ডীবউ নির্বাক দাঁড়িয়ে। রাগ গিয়ে হঠাৎ তার চোখেমুখে শঙ্কার ছায়া একটা। কল্পনায় কি যেন দেখে উঠলো সে, আর সঙ্গে সঙ্গে শিউরেও উঠল। বলে ফেলল, ওভাবে কাউকে তুমি জখম-টখম করতে যেও না ষষ্ঠীচরণ!

ষষ্ঠীচরণ হাসল। না গো মা-জননী, তাই কখনো পারি! ওই দাঠাকুরের বাবামশায় আমাদের কাছে দেবতা ছিলেন, তাঁর চরণামৃত মুখে নিয়ে আমার বাবা সগ্গে গেছেন এখনো মনে আছে। জখম-টখম ইচ্ছে করে করব না, তবে ঠাকুরটির আমার সাথে লড়ার সাহস কি করে হল ভেবে পাই না!

এত কথা কানে ঢুকল না চণ্ডীবউয়ের। তার মুখ টকটকে লাল আবার। একটু আগে নিজমুখে ষষ্ঠীচরণকে যে নিষেধটা করল তারই প্রতিক্রিয়া। আর তার দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ষষ্ঠীচরণ পায়ে পায়ে প্রস্থান করল। তাকে কিছু খেতে দেওয়া হল না তাও মনে থাকল না চণ্ডীবউয়ের।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের ওপরই জ্বলতে লাগল চণ্ডীবউ। ক্ষোভের দাহ্য অনুভূতি

একটা। একজন এভাবে অপমান করার পরেও কেন ষষ্ঠীচরণকে নিষেধ করতে গেল সে?

কেন? কেন?

॥ ২১ ॥

ব্যাপার সত্যিই জম-জমাট।

বারইয়ারীর নতুন দালানের সামনে বারান্দার এ-মাথা ও-মাথা জুড়ে চিক বাঁধা হয়েছে। তার ওধারে এ তল্লাটের প্রায় সমস্ত বাড়ির বউ-ঝিয়েরা গিস্‌গিস্‌ করছে। এই এক ব্যাপারেই রাধানাথ বারইয়ারীর উৎসবে নতুন বাতাস এনেছে বলা যেতে পারে। মল্লযুদ্ধের অনেক রকম রোমাঞ্চকর প্রহসনের কথা শোনা আছে, কিন্তু সেখানে এ-রকম গাদা গাদা পুরললনার অবস্থান বোধ করি এই প্রথম। এতকাল এই ক্রীড়াটি অন্তত পুরুষের একচেটিয়া উপভোগ্য বস্তু ছিল।

অবশ্য মূলত রমণীকুলের আগ্রহ এবং উদ্যোগেই এই বৈচিত্র্যের সূত্রপাত। এত বড় ব্যাপার যেখানে, চোখের প্রসাদ থেকে কে আর বঞ্চিত হতে চায়?

মেয়েরা দল বেঁধে এসে চণ্ডীবউকে ধরেছে। এমন একটা কাণ্ড তারা স্বচক্ষে দেখবে না! তাদেরও দেখার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

বউয়ের মুখে রমণীকুলের এই আর্জি শোনামাত্র নতুন উদ্দীপনায় মেতেছে রাধানাথ। তার সাঙ্গীসাথীদেরও উল্লাস ধরে না। মেয়েদের পুকুরঘাটে অথবা গৃহস্থবাড়ির আনাচে-কানাচে দৃষ্টি যাদের সর্বদা ছোঁক ছোঁক করে, মা-বোনের দরদে তাদেরও গলার স্বর উদাত্ত হয়ে উঠল। অতএব রাতারাতি ব্যবস্থা হতে আর অসুবিধে কি! আর এই ফাঁকে রাধানাথ চিকের আড়ালেই বউয়ের জন্য একটা বিশিষ্ট আসনও তৈরি করিয়েছে। বিচ্ছিন্ন একটি নেত্রীর আসন।

এই জন্যেই চণ্ডীবউ দ্বিগুণ লজ্জা পেয়েছে। একে তো সে আসতেই চায় নি। সকলের, বিশেষ করে ঘরের লোকের সনির্বন্ধ অনুরোধে আসতে হয়েছে। বউয়ের আপত্তি দেখে রাধানাথ এক মোক্ষম চাল চেলেছিল। বলেছিল, যে হাড়পাজী লোকটা বুক ঠুকে এতবড় কু-কথা উচ্চারণ করেছিল, ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে না লড়ার একটা ফিকির পেয়ে যাবে না সে? বলবে পাছে ষষ্ঠীচরণ হারে দত্তবাড়ির বউ সেই ভয়ে আসে নি। নইলে অন্য বাড়ির মেয়ে-বউরা উপস্থিত সেখানে, সেখানে সে নেই কেন?

অর্থাৎ, জিতলে দত্তবাড়ির বউয়ের হাত থেকে মোহর-বাঁধা সোনার সুতোর মালা পাবে না বলেই সে লড়বে না।

শুনে চণ্ডীবউয়ের মুখ আবার লাল হয়েছে। কিন্তু কাজও এতেই হয়েছে। চণ্ডীবউ সদর্পে এসেছে। তারপরে এমনি উঁচু আসনে তাকে ঠেলে তোলা হল দেখে বিড়ম্বনার একশেষ। চিকের আড়ালে হলেও এই বৈশিষ্ট্য সকলের চোখেই পড়ছে।

সে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে নব উদ্যমে হৈ-হৈ করে উঠল নতুন বারইয়ারীর

ভক্তরা। চিকের আড়াল থেকে চণ্ডীবউ সেদিকটা দেখে নিল একবার। বহুজোড়া চোখের দৃষ্টি চিকের গায়ে আছড়ে পড়েছে। তার মধ্যে ওই একজোড়া চোখও আছে বইকি। থাকবে, চণ্ডীবউ জানত। কিন্তু সত্যিই সে ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে লড়তে এসেছে, ভাবতে পারছে না। গায়ে ঢিলে কোর্তা, পরনে কোঁচানো বাবু ধুতি। স্থান-কাল বিস্মৃত হয়ে এদিকেই চেয়ে আছে।

ষষ্ঠীচরণ আসরে নামল। এই মূর্তিতে চণ্ডীবউ আর দেখে নি তাকে। ছোটখাটো পাহাড় যেন একখানা। পরনে আঁট জাঙিয়া। এ ছাড়া গায়ে আর একখানা সুতোও নেই। বুক চিতিয়ে এসে দাঁড়াল যখন, দত্তপাড়ার বারইয়ারীর দল সরবে সম্বর্ধনা জানালো তাকে। শুধু চণ্ডীবউয়ের ভিতরে ভিতরে কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কা। নিজের অগোচরে চিকের ভিতর দিয়ে তার দু চোখ আবার ওই বিশেষ একজনের মুখের দিকে ঘুরল। সেই মানুষ তখনো এই চিকের দিকেই চেয়ে আছে। ষষ্ঠীচরণ আসরে নেমেছে তাও খেয়াল নেই যেন।

নিজের বাঁ কাঁধ আর বুকের মাঝামাঝি পেল্লায় দুটো চাপড় মেরে ষষ্ঠীচরণ ঘোষণা করল, শুধু দু'তিনজন নয়, যতজন খুশি একে একে এসে তার সঙ্গে লড়তে পারে। সকলকে হারিয়ে তবেই সে পুরস্কার নেবে।

দত্তপাড়ার বারইয়ারীর দল বিপুল কলোচ্ছ্বাসে বাহবা দিয়ে উঠল তাকে। কিন্তু দেখা গেল এই ঘোষণার পরেও কেউ তার দিকে এগিয়ে আসছে না। অগত্যা ষষ্ঠীচরণ তার জন্য দুই প্রিয় শিষ্যর উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়ল, কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে আছিস কেন, কেউ না আসে তো তোরাই আয়, মরদের মত লড়ে যা—।

প্রস্তুত হয়ে একে একে দুজনেই এলো তারা। গায়ে-গতরে তারাও কম যায় না। কিন্তু দুজনকেই ঘায়েল করে মাটিতে চিৎ করে শুইয়ে ফেলতে দশ মিনিট করেও সময় লাগল না ষষ্ঠীচরণের। ওই বিশাল দেহ নিয়ে একে একে দুজনেরই বুকের ওপর চেপে বসল সে। এই দৃশ্য দেখে চিকের ওধারে মেয়েদের ত্রাস। এধারে ছেলেদের উল্লাস।

খেলার নামে এ-রকম একটা আসুরিক ব্যাপার শুধু চণ্ডীবউয়েরই মনঃপুত হচ্ছে না। উল্টে ভিতরের চাপা অস্বস্তিটা আরো বেড়ে গেছে যেন।

বারকতক ডাকাডাকির পরেও আর যখন কেউ লড়তে এলো না, রাধানার ইশারায় তার এক সাগরেদ মল্লভূমির মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে ঘোষণা করল, এবারে করণের তিনজন বাছাই করা ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান দেখানো হবে এই নতুন বারইয়ারীর তরফ থেকে। সেই তিজনকে একে একে ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে নামার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। প্রথম নাম, গাঁজা বিশারদ সহায় ভট্ট!

দর্শকদের মধ্যে তুমুল হাস্যরোল উঠল একটা। তিনবার সহায় ভট্টর নাম ধরে হাঁক পাড়া সত্ত্বেও কেউ এগিয়ে এলো না। আসবে না জানা কথাই।

চতুর্থবার হাঁক দিয়ে অতি মন্থর গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল একজন। তাকে দেখামাত্র হেসে সারা সকলে। করনের ধুতির কোঁচা মাটিতে লুটোচ্ছে, গায়ে হলদে রঙে ছোপানো হাঁটুছোঁয়া আলখাল্লা, মাথায় কাঁচা-পাকা পরচুলা, নাকের নীচে সেই রকমই নকল গোঁপ একজোড়া, হাতের গাঁজার কল্কে।

গাঁজার নেশায় পদক্ষেপ ঠিক রাখতে না পেরেই যেন মেয়েদের চিকের দিকে এগিয়ে গেল কয়েক পা। আর একজন ছুটে এসে দু-হাতে কাঁধ ধরে তাকে ষষ্ঠীচরণের দিকে ফিরিয়ে দিল। সর্ব অঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে এবারে সে মল্লভূমিতে এসে দাঁড়াল। দু'চোখ টান করে ষষ্ঠীচরণকে দেখল একবার। তার পর বলে উঠল, গাঁজার গুণে স্বয়ং দেবাদিদেবের চেলা আমি সহায় ভট্ট, আমার সঙ্গে লড়তে চাও এত সাহস তোমার? আচ্ছা রোসো এক ছিলিম টেনে নিই আগে।

শূন্য গাঁজার কল্কেতে উপর্যুপরি পাঁচ-সাতটা রাম টান দিল সে, তারপর সেই কল্কে সমেত আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে দুই বাহু বাড়িয়ে দিল ষষ্ঠীচরণের দিকে।—এসো সখা এসো, লড়া যাক।

ষষ্ঠীচরণ এগিয়ে এসে দু'হাতে আলটপকা মাথার ওপর তুলে নিল তাকে, শূন্যে কয়েকটা পাক দিয়ে মাটির ওপর শুইয়ে দিল। নকল সহায় ভট্ট চিৎ হয়ে শুয়ে বারকয়েক হাত-পা ছুঁড়ে শেষে গাঁজার কল্কে মুখে ধরল আবার।

তাকে পাঁজাকোলে করে তুলে নিয়ে যেতে দ্বিতীয় সম্মানী ব্যক্তি হিসেবে ডাক পড়ল শ্রীনাথ অনাথায় ছিরে পাগলার। এবারেও সে না আসতে তার বদলে নকল শ্রীনাথ এসে হাজির। ফড়িংয়ের মত লাফাতে লাফাতে এলো সে। সেই সঙ্গে গলা দিয়ে পশু পাখির কান্না ঝরতে লাগ। ষষ্ঠীচরণ যতবার এগিয়ে আসে তার দিকে, সে লাফিয়ে লাফিয়ে সরে যায় আর পশুপাখির গলায় নানা ভাবে মিনতি জানায়।

ষষ্ঠীচরণ খপ করে তাকে ধরে ফেলল একবার। বেড়াল যেমন ইঁদুর ধরে, সেইরকম করে। তারপর আগের বারের মতই মাথার ওপর তুলে নিল তাকে। নকল ছিরে পাগলার কিচিরমিচির ত্রাস দ্বিগুণ বাড়তে লাগল। ষষ্ঠীচরণ একটু উঁচু থেকেই ধুপ করে মাটিতে ফেলে দিল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে হাতির গলার আর্তনাদ একটা, তারপরেই চুপ একেবারে। অর্থাৎ ষষ্ঠীচরণের হাতে পড়ে নকল ছিরে পাগলার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল। এবারে চারজন লোকে ছুটে এসে যেন সৎকার করার উদ্দেশেই তাকে তুলে নিয়ে গেল।

সকলের হাসির দমকে বাতাস মুখরিত। আর থেকে থেকে তাদের উল্লাসধ্বনি সম্ভবত গাঁয়ের অপর প্রান্ত থেকেও শোনা গেছে। এই কাণ্ডকারখানা দেখে চিকের আড়ালে বসে হাসছে চণ্ডীবউও।

এর পরের নামটি ঘোষণা করা মাত্র হুল্লোড় থেমে গেল। উদ্গ্রীব সকলে। শেষের এই ঘোষণার ব্যঞ্জনা আরো মোলায়েম, কিন্তু আরো চটকদার।

এবারের করণের সব থেকে মানী সব থেকে গুণী আর সব থেকে দুর্জয় সাহসী দক্ষিণপাড়ার কর্ণধার শ্রীমদনমোহন ঘোষালকে বিনীত আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ষষ্ঠীচরণ—অমন গুণীর সঙ্গে এক হাত লড়তে পারলে তার জীবন ধন্য হবে, আর দর্শকদেরও দু'চোখ পরিতৃপ্ত হবে।

সকলের উৎসুক উদ্গ্রীব জোড়া জোড়া চোখ এবারে মদনমোহনের মুখের ওপর। চিকের ওধারে মেয়েদের এবং চণ্ডীবউয়েরও।

নাম ধরে দ্বিতীয়বার ডাকতেই এদিক থেকে ছিরে পাগলা খেঁকিয়ে উঠল, এবারে আর সং বার করতে হবে না, স্বনামধন্য সম্মানী ব্যক্তি নিজেই যাচ্ছেন ষষ্ঠীচরণের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য বাতাসসুদ্ধ থমকে রইল যেন। ইশারায় রাধানাথ ষষ্ঠীচরণকে নতুন করে একদফা তাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করল।

নির্লিপ্ত মদনমোহনের কাণ্ড দেখে তার অন্তরঙ্গ জনেরাও অবাক। মদনমোহন গায়ের শৌখিন ঢোলা কোর্তাটা খুলে ছিরে পাগলার হাতে দিল। তরপর পরনের ওই কোঁচানো ধূতিটাই মালকোঁচা মেরে নিল। ধুতির সামনের দিকটা একটু তুলে দুদিকের কোমরে গুঁজে দিল। তাতেও ধুতি হাঁটুর ওপরে উঠল না।

আগের দুজনের সঙ সেজে মল্লভূমিতে আসাটা পরিহাসের ব্যাপার। কিন্তু এবারে তো আর তা নয়। এই বেশে কেউ সত্যিকারের কুস্তি লড়তে নামে!

কিন্তু মদনমোহন তেমনি নির্লিপ্ত। অলস মন্থর গতিতে রণক্ষেত্রে এসে দাঁড়াল সে। একমাত্র তারই যেন কিছুমাত্র উদ্বেগ নেই।

ষষ্ঠীচবণ এগিয়ে এসে তার তিন হাতের মধ্যে দাঁড়াল। গম্ভীর। সে আশা করছিল দাদাঠাকুর সত্যিই লড়তে আসবে না। সবটাই হয়ত ঠাট্টা আর গুজবের ব্যাপার। খানিক আগে তাকে ওই রকম বাবু-বেশে দেখেও ওই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল। একটু নিশ্চিন্তও হয়েছিল। ঠাকুরটি গোঁয়ার কেমন জানে। হার সহজে মানতে চাইবে না, ফলে আঘাত-টাঘাত লাগার সম্ভাবনা। লড়তে এলো দেখেই ষষ্ঠীচরণ বিরূপ। দুর্মতি আর কাকে বলে!

ভ্রূকুটি করে ষষ্ঠীচরণ তাকে দেখল একটু। তারপর বলল, ধুতিটা আরো তুলে কোমরে গোঁজো না, আর পৈতেটাও সরাও—এখানে কি হাওয়া খেতে এসেছ?

মদনমোহন ঠাণ্ডা বিদ্রূপের সুরে জবাব দিল, সব ঠিক আছে তুমি ঘাবড়ে না গিয়ে থাকলে চলে এসো।

ষষ্ঠীচরণ তাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যেই দু'পা এগিয়ে এলো। কিন্তু তারপর আবার থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। এবারে আরো বেশি ভ্রূকুটি!—পৈতেটা ওভাবে হাঁটু পর্যন্ত ঝুললে লড়বে কি করে, ওটা অন্তত ট্যাঁকে গোঁজো!

কি করে লড়ব সে আমি বুঝব, তুমি চলে এসো না!

এত বড় সমাবেশে একটি টুঁ শব্দ নেই। উৎকর্ণ উদ্‌গ্রীব সকলে। চিকের আড়ালে চণ্ডীবউও নিজের অগোচরেই সামনের দিকে ঝুঁকেছে।

মদনমোহনের গলায় হাঁটু-ছোঁয়া ধপধপে সাদা মোটা পৈতেটা এখন বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ছে সকলের।

মল্লক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালে ষষ্ঠীচরণের অন্য মেজাজ। যথার্থই তেতে উঠেছে সে। বলল, দেখ দাদাঠাকুর, চালাকি কোরো না, ওটা গায়ে-পায়ে লেগে যাবে না? ছিঁড়ে যাবে না?

এবারে মদনমোহনও বিরক্ত যেন। সমান ত্মালে ঝাঁজিয়ে উঠল, লাগে লাগবে ছেঁড়ে ছিঁড়বে, তেমার তাতে কি? তুমি না-লড়ার ছুতো খুঁজছো নাকি?

ষষ্ঠীচরণের থমথমে মুখ।—ছুতো খুঁজছি কিনা সে তোমাকে এক্ষুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি পৈতে ট্যাঁকে গুঁজছ না কেন?

মদনমোহন জবাব দিল, সৎ ব্রাহ্মণের পৈতে এ-রকমই থাকে—ট্যাঁকে গুঁজলে তার মাহাত্ম্য খর্ব হয়।

ও! রাগে গলার স্বর চড়ছে ষষ্ঠীচরণের।—মাহাত্ম্য খর্ব হয়! আগে যখন আমার

সঙ্গে কুস্তির মহড়া দিতে আসতে, তখন ওই পৈতের গোছা ট্যাঁকে গোজা থাকত কি করে?

মদনমোহন আগের মতই নির্লিপ্ত।—আগের থেকে এখন আমি একটু বেশি ধার্মিক হয়ে পড়েছি যে!

দক্ষিণপাড়ার দর্শকরা উল্লাসে ভেঙে পড়ল। তাদের কুশাগ্র-বুদ্ধি মাতব্বরটির এই চালের যেন তুলনা নেই। আনন্দের আতিশয্যে ছিরে পাগলা গলা দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার শব্দ বার করে ফেলল কয়েকটা। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, লড়ে যাও ষষ্ঠীচরণ, লড়ে যাও! পৈতে নষ্ট হয় হবে—তোমার তাতে কি? সাহস থাকে তো লড়ে যাও!

মদনমোহনের কূটবুদ্ধিব চাল বুঝতে আর বাকি নেই কারো। নিরপেক্ষ দর্শকরা আর চিকের আড়ালে মেয়েরাও মদনমোহনের ধার্মিক হওয়ার কথা শুনে হেসে সারা। শুধু দক্ষিণপাড়ার পৃষ্ঠপোষকরা ব্যাপারটা উপভোগ করতে পারছে না। তাদের ষষ্ঠীচরণের ওপরও রাগ হচ্ছে, মদনমোহনের ওপরেও। ষষ্ঠীচরণকে তাতিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে তারাও।—তুমি লড়ে যাও ষষ্ঠীচরণ, পাপ হয় ওর হবে, ওর চালাকি বুঝতে পারছ না? লড়ে যাও!

কিন্তু ষষ্ঠীচরণ পাথরেব মত দাঁড়িয়ে। কঠিন চোখ দুটো তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে।—তুমি পৈতে ট্যাঁকে গুঁজবে কিনা?

না। তুমি লড়বে কিনা?

দুজনে দজনের দিকে নিষ্পলক চেয়ে।

রাধানাথের আর সহ্য হল না। নিজের এই খাস এলাকায় তার যা বল, সঙ্গী-সাথী সহ ওই মদনমোহনের হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে। সেই গোছের কিছু করার মতই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক নেমন্তন্ন পেয়েই বিপক্ষ দল এখানে এসেছে। অতএব যা সে করতে চায করা যাচ্ছে না। ফলে অসহিষ্ণু আক্রোশটা তার ষষ্ঠীচরণের ওপরেই গিয়ে পড়ছে।

আর সহ্য করতে না পেরে দাপাতে দাপাতে ষষ্ঠীচরণের কাছে চলে এলো সে। কিন্তু তার অনুরোধ এমন কি হুমকিতেও কাজ হল না। ষষ্ঠীচরণের এক কথা, ওঁকে পৈতে ট্যাঁকে গুঁজতে বলো, না হলে লড়তে পারব না।

ক্রোধে ক্ষোভে আগুন হয়েই রাধানাথ চিকের আড়ালের ওই বিশিষ্ট আসনের দিকে ছুটল। দু'মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এসে ষষ্ঠীচরণের হাত ধরে চিকের ওই বিশিষ্ট আসনের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

উন্মুখ উদ্‌গ্রীব সকলে। আসর জমেছে বটে। জোড়া-জোড়া চোখ চিকের আড়াল ছিঁড়েখুঁড়ে ভেতরে ঢুকতে চাইছে।

চিকের এদিক থেকে নয়, ঘুরিয়ে চিকের ওধারেই ষষ্ঠীচরণকে পাঠিয়ে দিল রাধানাথ।

থমথমে মুখে ষষ্ঠীচরণ চণ্ডীবউয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। মায়ের মুখখানাও প্রসন্ন দেখল না।

ষষ্ঠীচরণ বলল, এ-রকম চালাকি করবে বলেই আমার সঙ্গে সাহস করে লড়তে এসেছে—

চালাকি বুঝেও তুমি ওকে আসকারা দিচ্ছ কেন? চালাকি অন্য কেউ করছে যখন, তোমার দোষ হবে কেন?

বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে দু'হাত জোড় করল ষষ্ঠীচরণ।—ছেলের ওপর এ আদেশ কোরো না মা-জননী।...মরার আগেও আমার বাবা অনেকবার মরো-মরো হয়েছিল—একবারের বিষম সঙ্কটে আঙুলে জড়ানো পৈতে-সুদ্ধু হাতখানা বাবার মাথায় রেখে পর পর তিন রাত গায়ত্রী জপ করেছিলেন ওই দাদাঠাকুরের বাবামশায়। সেবারের সঙ্কট কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সে-দৃশ্য আমি ভুলব না। আর পৈতে গলায় ওই দাদাঠাকুরের দিকে চেয়ে আমি কেবল ওঁর বাবামশায়কেই দেখছি—ওই পৈতে নিয়ে দাদাঠাকুর ছেলেমানুষি চালাকি খেলছে বলে আমিও পৈতের অমর্যাদা করব কি করে! লড়তে গেলে ওটা ছিঁড় যাবেই, গায়ে-পায়ে লাগবেই...আমাকে এ-রকম হুকুম কোরো না মা-জননী!

ষষ্ঠীচরণের মুখের দিকে চুপচাপ খানিক চেয়ে রইল চণ্ডীবউ। তারপর বলল, আচ্ছা যাও গিয়ে বলো, তুমি জিতেছ, তোমাকে পুরস্কার দিতে বলেছি আমি...আর তোমাকে সে-পুরস্কার আমি নিজে হাতে দেব।

ষষ্ঠীচরণ চলে গেল।

খানিক বাদে অব্যক্ত ক্রোধ চেপে রাধানাথ সেই ঘোষণাই করল। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপাড়ার দলের দিক থেকে তুমুল প্রতিবাদ উঠল।—কক্ষনো না, কক্ষনো না! ষষ্ঠীচরণ লড়াই করল না যখন, ধরে নিতে হবে মদনমোহন জিতেছে!

ক্ষিপ্ত রাধানাথের দল পাল্টা জবাব দিল, মদনমোহন কাপুরুষ, প্রাণের দায়ে পৈতের আশ্রয় নিয়েছে, পৈতের মর্যাদা নষ্ট করেছে—মদনমোহন পাতক!

নিজের দলকে থামিয়ে দিয়ে মদনমোহনই উত্তেজনার অবসান ঘটালো। পরণের ধুতি ঠিক করে গায়ে জামা চড়াতে চড়াতে উৎসুক হয়ে চিকের ওই বিশেষ দিকে তাকালো। স্বল্পক্ষণের জন্য চিকের আড়াল ঘুচে যাবে সেটাই যেন একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার তার।

...দড়িটানা চিক্ উঠে যেতে লাগল। উঁচু আসনে চণ্ডীবউ বসে। ঘোমটার ফাঁকে তার নাকের ডগা আর মুখের সামান্য একটু অংশ শুধু দেখা যাচ্ছে। আর সালঙ্কার চাঁপার বরণ হাত দু'খানা। মুগ্ধ চোখে জনতা তাই দেখছে। করণের বুকে এত বড় আধুনিকতার নজির আর দেখেনি কেউ।

নির্দেশমত ষষ্ঠীচরণ এগিয়ে গেল। চণ্ডীবউ সোনার সুতোয় বাঁধা মোহর তার হাতে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল। আর তক্ষুনি বিপুল হাততালির সঙ্গে তারস্বরে দত্তপাড়ার নতুন বারইয়ারীর জয়ধ্বনিতে বাতাস ভরাট হয়ে গেল। একমাত্র দক্ষিণপাড়ার দলটি ছাড়া সকলের গলাতেই এই জয়ধ্বনি।

পুরস্কার নিয়ে ষষ্ঠীচরণ ফিরে আসতে দক্ষিণপাড়ার দলের দিক থেকে একটি একক হাততালির শব্দ কানে এলো সকলের। অন্য সকলের হাততালি তখন থেমেছে বলেই বেখাপ্পা রকমের স্পষ্টভাবে শোনা গেল। ফলে সকলের দৃষ্টি সেদিকে ফিরল।

হাততালি দিচ্ছে স্বয়ং মদনমোহন।

সামান্য মুখ তুলে একঝলক দৃটিপাত করল চণ্ডীবউও। দড়ি ছেড়ে দিতে চিকটা নেমে এলো আবার।

যতই গলা ফাটিয়ে জয়ধ্বনি দিক, এ-জয়টা ঠিক মন ভরে উঠার মত লাগছে না রাধানাথের দলবলের কাছে। রাধানাথের তো লাগছেই না। দলবল নিয়ে গোমড়া মুখ করে সে নতুন বারইয়ারীর সামনের প্রশস্ত ঘরে এসে বসেছে। ষষ্ঠীচরণের ওপর রাগে জ্বলছে সে, তার মুণ্ডুপাত করতে ইচ্ছে করছে। সেই সঙ্গে লড়াইয়ের হুকুম দিল না বলে বউয়ের ওপরও বিষম রাগ হচ্ছে। আপাতত দুজনের একজনেরও মুখ দেখার ইচ্ছে নেই তার।

ছয় বেয়ারার লাল পালকি দুলতে দুলতে দত্তবাড়ির দিকে চলেছে। দু'দিকের পরদা ফেলা। ভিতরে চণ্ডীবউ। রাগ তারও হচ্ছে। যতই ঘটা করে পুরস্কার দিক ষষ্ঠীচরণকে, বুদ্ধির খেলায় তারা যে জব্দ একটু হয়েছে সেটা অস্বীকার করতে পারছে না। সেই জন্যেই রাগ। কিন্তু রাগটা যেন ঠিকমত জমাট বাঁধতে পারছে না।...তার বদলে ধপধপে সাদা লম্বা পৈতে ঝোলানো মূর্তিটা চোখে ভাসছে। আর সেই সঙ্গে কিছু কথাও কানে লেগে আছে। বিশেষ করে সেই অমায়িক বচন—ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে আগে লড়াইয়ের মহড়া দেবার সময় পৈতে কোমরে গুঁজত...এখন সেটা পারছে না কারণ আগের থেকে এখন সে একটু বেশি ধার্মিক হয়ে পড়েছে।

...রাগের বদলে চণ্ডীবউয়ের ঠোঁটের ডগায় হাসি ভেঙে পড়ছে।

॥ ২২ ॥

যত রাগই হোক, বুদ্ধিমানের মত রাধানাথ এবারে আর ঘরে এসে চারখানা হয়ে ফেটে পড়ল না। রাগের ফলাফল অনেকবার দেখেছে। দেখে আর ঠেকে শিখেছে। তার চিরশত্রু দক্ষিণপাড়ার ওই মাতব্বরটিকে জীবনের মত শিক্ষা দেবার এত বড় সুযোগটা ষষ্ঠীচরণ হেলায় হারালো, সেই পরিতাপ সহজে ভোলবার নয়। আর নিজের বউ তার ওপর জোর খাটালো না—সেই ক্ষোভও সহজে জুড়োবার নয়।

তবু এবারে আর ভুলের রাস্তায় পা দিল না সে। অনেকখানি মদ গেলার পর মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হতে ষষ্ঠীচরণ আর সেই সঙ্গে নিজের বউকে ক্ষমাই করে ফেলল। ফূর্তির রসদ জঠরে চালান হতে বন্ধুরাও গোটা ব্যাপারটা রঙিন করে দেখতে লাগল। মদনমোহন কি আর করেছে, চালাকি করে নিজের প্রাণখানা বাঁচিয়ে নিয়ে গেছে শুধু। নইলে জয় তো তাদেরই হয়েছে। তাছাড়া বৈচিত্র্যের এতবড় চমক করণে কেউ আর দেখেছে কোন দিন?

অতএব সমস্ত খেদ আর ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে সদলবলে এই চমকটাই জিইয়ে রাখার উদ্দীপনায় মেতে উঠল রাধানাথ।

চমকই বটে। ক'দিন ধরে পর পর এমন আনন্দের ঘটা করণে আর কে কবে দেখেছে? ঐ দু'রাত আসর মাত করে গেল বেলডাঙার মতি রায় আর নীলকণ্ঠের যাত্রার দল। কানে লেগে থাকার মতই কীর্তন শুনিয়ে গেল কৃষ্ণনগরের বেদানা আর পান্না কীর্তনওয়ালী, কবিগান ঢপ আর তরজার আসর জমজমাট করে গেল

রাণাঘাটের রসিক চক্রবর্তী আর চাকদার ভুবন পালের দল। এতদিন ধরে বাইরের এই সব শিল্পীদের নামই শুধু শুনেছিল করণের মানুষেরা। তাদের চোখ-কান সার্থক। এর ওপর সেদিন আবার ময়ূরপঙ্খী সঙ বার করল দত্তপাড়ার বারইয়ারীর দল। এমন সঙও করণে স্মরণীয় কালের মধ্যে দেখা যায় নি। ইচ্ছে করেই সেই সঙ আবার দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর নাকের ডগা দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হল।

এই থেকেই বড় রকমের একটা মারামারির ব্যাপার ঘটে যেতে পারত। সচরাচর তাই ঘটে থাকে। কারণ সঙ বার করার উদ্দেশ্যই হল প্রতিপক্ষকে অপমান এবং ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করা। যথেষ্ট শক্তিসংগ্রহ করেই রাধানাথ বেপাড়ায় এই সঙ পাঠিয়েছে। ওদের মাতব্বর শান্তি বজায় থাকবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দেখা যাক, কি-রকম শান্তি বজায় থাকে! গণ্ডগোল যদি বাধে মিছিলের সঙ্গে যে জনা-চল্লিশ লোক মিশে আছে তারাই মোকাবিলা করতে পারবে। তারা এ গাঁয়ের লোক নয়, বাইরের লোক। রাধানাথ কাঞ্চনমূল্যে সংগ্রহ করেছে তাদের। এবং দরকার পড়লে কি করতে হবে না হবে সেটা তাদের ভালো করেই বোঝানো হয়েছে।

অতএব ছোটখাটো একটু গোলযোগ রাধানাথ আর তার সঙ্গীদের অভীপ্সিতই ছিল।

কিন্তু তাও হল না।

দক্ষিণপাড়ার চাঁইদের হাত নিশপিশ করছে। বিশেষ করে বিপক্ষ দল যখন সাহসের মাত্রা ছাড়িয়ে সেই সঙ নিয়ে তাদের বারইয়ারী ঘিরে নাচানাচি করেছে, তখন তো রক্ত মাথায় ওঠার দাখিল!

কিন্তু দুটো ঢিল-পাটকেল পর্যন্ত ছোঁড়া গেল না তাদের মাতব্বরটির জন্য। সে বেশ কড়াভাবে নিষেধ করে দিল সকলকে। উল্টে তাদের নির্দেশ দিল, তোমরা বাহবা দাও, তারিফ করো।

নাকের ডগায় ঘন্টাখানেক দাপাদাপি করে সঙ নিয়ে ওরা চলে গেল। অপমানে আর ক্ষোভে এদিকের ভক্তদের মুখ কালো। দত্তপাড়ার নতুন বারইয়ারী একের পর এক যা করে চলেছে, এরপর তাদের মুখরক্ষা হবে কেমন করে?

নির্বিকার শুধু মদনমোহন। সে বলল, হবে, ওদের থেকে অনেক বড় কাজ করব আমরা।

নিজের অপ্রতিহত দাপটে রাধানাথ ডগমগ। বুকের ছাতি দ্বিগুণ এখন। ওরা সব কাপুরুষ। খরগোশ ওরা সব। নইলে সঙের জয়যাত্রাও এমন সুনির্বিঘ্ন হল কেমন করে?

আত্মতুষ্টির এই পর্যায়ে মুনকে এসে একটা খবর দিল তাকে। শোনামাত্র মগজের ঘিলুসুদ্ধ ফুটে উঠল রাধানাথের। জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরল সে। এই দুঃসাহসের জবাব কি দেওয়া যেতে পারে সে-পরামর্শটা শুধু বউয়ের সঙ্গেই করা যেতে পারে, আর কারো সঙ্গে নয়।

মুখ দেখেই চণ্ডীবউ উতলা একটু। বে-পাড়ায় সঙ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার তেমন সায় ছিল না। এই থেকেই কিছু বিপত্তি ঘটল কিনা কে জানে। কিন্তু যা শুনল, অপ্রত্যাশিতই বটে। শোনামাত্র কানের দু'পাশ ধরে লালের আভা ছড়াতে লাগল।

...মুনকের মারফৎ মদন ঘোষাল খবর পাঠিয়েছে, আগামী কাল সকালের দিকে সে একটা দরকারী আলোচনার উদ্দেশ্যে দত্তবাড়িতে আসছে। সেখানে দত্তবাড়ির বউরাণীও উপস্থিত থাকলে ভালো হয় কারণ মদন ঘোষালের ধারণা এ ব্যাপারে তাঁরও মতামত এবং সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন।

কি যে বলবে চণ্ডীবউ হঠাৎ ভেবে পেল না।

দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে রাধানাথের। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, এবারে তাহলে ভালোরকমই শিক্ষা দিয়ে দিই, কি বলো?

বিচ্ছিরি একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল যেন চণ্ডীবউ। জিজ্ঞাসা করল, কি করবে?

কি করব! এভাবে অপমান করতে এলে ওকে আমি আস্ত ফিরতে দেব ভাবো?

একটু চুপ করে থেকে চণ্ডীবউ মৃদু মন্তব্য করল, এভাবে খবর পাঠিয়ে অপমান করতে আসবে না।

ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগল রাধানাথের। বলে উঠল, তোমাকে উপস্থিত থাকতে বলেছে সেটাই তো অপমান, এর থেকে অপমান আর কি হতে পারে?

চণ্ডীবউ চুপ একটু। কথাটা যে মিথ্যে নয়, জোর দিয়ে তা অস্বীকার করা যাচ্ছে না। অথচ এই ধৃষ্টতার জবাব সামনের লোকটার স্থূল প্রতিশোধ নেবার বাসনাতেও সায় দিতে পারছে না। নিরুত্তাপ অথচ স্পষ্ট করেই বলল, সে কৈফিয়ত তার কাছ থেকে নিতে পারো। কিন্তু আগে থাকতে জানান দিয়ে অতিথিব মত বাড়ি আসছে যখন, এর বেশি আর কোনরকম হামলা করা ঠিক হবে না, তাতে গাঁসুদ্ধু দুর্নাম রটে যাবে—আসলে সে-রকম কিছু ঘটুক এই মতলব নিয়েই হয়ত আসছে।

মগজ তেতে আছে, বউয়ের পরামর্শ আদৌ মনঃপূত হলনা। তিক্ত ঝাঁঝে রাধানাথ বলে উঠল, রসগোল্লা সন্দেশ ক্ষীরখণ্ডি সাজিয়ে অতিথি-আপ্যায়ন করব নাকি তাহলে?

অস্বস্তি গোপন করে চণ্ডীবউ জোর করেই হাসতে চেষ্টা করল একটু।—তা যদি করতে পার তাহলে যে আসছে সে তোমাকে তার থেকেও বেশি চালাক ভাববে। মোট কথা, যা বলে খুব ঠাণ্ডা মাথায় শুনবে, আর তার থেকেও ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দেবে। আমি পাশের ঘরে থাকব, দেখি কি মতামত আব সাহায্য চায়!

হাতের মুঠোয় পেয়ে এভাবে শিকার ছেড়ে দেওয়ার মত কূটনীতির সমঝদার নয় রাধানাথ। গুম হয়ে বসে ভাবতে লাগল। কিন্তু বউয়ের কথাগুলো একেবারে বাতিলও করে দিতে পারছে না। বিপদ তুচ্ছ করেও আগে থাকতে জানান দিয়ে ভালো মানুষের মত আসছে যখন, তার মাথায় বড় রকমের চালাকি কিছু আছেই। চোখ তুলে বউয়ের দিকে তাকালো। মন্ত্রণা পছন্দ হোক বা না হোক, হাসির ছোঁয়া-লাগা অন্তরঙ্গ মুখখানা মন্দ লাগছে না। সহযোগিতার এই রূপটাই কাম্য বটে।

রাত্রি।

পাশের লোক অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

বিনিদ্র শয্যায় চণ্ডীবউ ছট্‌ফট করছে। থেকে থেকে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে তার।

...রমণীর তূণে অব্যর্থ অস্ত্র আছে কিছু। নিজের সে-অস্ত্র অমোঘ চণ্ডীবউ সেটা ভালো করেই জানে। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক ঘরের এই লোকের প্রতি আজ সেটা সে প্রয়োগ করেনি, এ কি হলপ করে বলতে পারবে? একটা অস্বস্তিকর অঘটন পরিহারের তাড়নায় অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে আর পরোক্ষ প্রশ্রয়ে খানিক আগে এই মানুষটাকেই কি সম্পূর্ণ বশীভূত করে ফেলে নি? পুরুষকার শূন্য দুর্বলের বাসনায় নিজেকে সঁপে দিয়ে তার সর্বসমস্যায় দোসরের ভূমিকাটি কি দ্বিগুণ নির্ভরযোগ্য করে তুলতে চান নি?

ছট্‌ফটানি বাড়ছে চণ্ডীবউয়ের। ফলে বিপক্ষ দলের যে লোকটা এর জন্য দায়ী, অসহিষ্ণু রাগ আর বিতৃষ্ণা তারই ওপর।

কথামত পরদিন সকালের দিকে মদন ঘোষাল নির্লিপ্ত সহজ মুখে দত্তবাড়িতে পদার্পণ করল। সঙ্গে শ্রীনাথ। রাধানাথ প্রস্তুতই ছিল। তবু তাদের দেখামাত্র শিরায় শিরায় একটা উষ্ণ স্রোত ওঠানামা করতে লাগল। একটা ক্রূর অভিলাষ সংযমের বাঁধ উপছে উঠতে চাইছে।

তাদের বসতে দিল। নিজেও বসল। গম্ভীর।

সহজ সদালাপের সুরে মদনমোহন বলল, সকলেই তোমাদের নতুন বারইয়ারীর প্রশংসা করছে, সব কটা উৎসবই বেশ জমেছে—আর কিছু বাকি আছে নাকি?

রাধানাথের দু'চোখ খরখরে হয়ে উঠছে। সহিষ্ণুতায় চিড় খাচ্ছে। চিকের আড়ালে একজন এসে দাঁড়িয়েছে টের পেল। ভেতর ভেতরে একটু জোরও বাড়ল যেন। গম্ভীর শ্লেষে জবাব দিল, কতটা বাকি সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে, তোমার চালচলনের ওপর।

অর্থাৎ চালচলন ভালো না হলে তাকে টিট করতে বাকি। পাশের ঘরে রমণীর আবির্ভাব মদনমোহনও টের পেয়েছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ তার। রাধানাথের উক্তির তাৎপর্য বুঝেও না বোঝার ভান করল।

কি রকম?

বাজে কথা ছেড়ে কি মতলবে এসেছ বলো!

সহজ হাসিমুখেই মদনমোহন জবাব দিল, মতলব খারাপ কিছু নয়। কারণে এখন দুটো বারইয়ারী আমাদের, এখানকার লোকের যাতে সব দিক থেকে ভালো হয় সেই দায়িত্বও এখন আমাদের ভাগ করে নেওয়া উচিত। তোমরা তাদের আমোদ-আহলাদের দিকটা দেখছ ভালো কথা, আমরা তাই অন্য দিকটা ভাবছি। ছেলেদের জন্য এখানে স্কুল একটা আর না হলেই নয়, তাছাড়া একটা হাসপাতাল ঘরও দরকার, গাঁয়ের লোক বারো মাস ভুগছে। একজন ডাক্তার এনে যদি বসানো যায়, শহর থেকে ওষুধপত্র যোগাড় করা খুব কঠিন হবে না। আমরা ঠিক করেছি এই দুটো কাজে লেগে যাব।

রাধানাথ তেমনি ক্রূর সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে আছে। দুটো প্রস্তাবই অসার তার কাছে। পরোপকারের দোহাই দিয়ে বাড়িতে ঢোকার মতলব ছাড়া আর কিছু ভাবছে না সে। হাত দুটো নিশপিশ করছে তার, কিন্তু সেই সঙ্গে বউয়ের গতকালের কথাগুলোই সত্যি বলে মনে হচ্ছে। অতিথির মত এসে অপমানিত হয়ে ফিরে

গেলে দুর্নাম রটাতে সুবিধে হবে। ছিরে পাগলার দিকে তাকাল একবার। বসে আছে যেন করণে অমন গম্ভীর মানুষ আর দুটি নেই!

কঠিন গলায় জবাব ছিল, তোমাদের যা খুশি করো, যে চুলোয় খুশি যাও—এখানে কি জন্যে এসেছ?

মদনমোহনের একাগ্র দৃষ্টিটা বার বার ওই চিকের গায়ে আছড়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু জোর করেই সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আছে। বলল, গাঁয়ের ভালো তো একলা করা যায় না, সকলেরই সাহায্য দরকার। গাঁয়ের তুমি বিশেষ একজন, তোমার সাহায্য তো আরো বেশি দরকার। তাছাড়া আর একটা কাজও যদি তুমি করে দাও, ভালো হয়—

রাধানাথের সন্দিগ্ধ দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে। সে শোনার অপেক্ষায় আছে, বোঝার অপেক্ষায় আছে।

মদনমোহন বলল, দত্তমশাইকে যদি একটু লিখে দাও, ফেরার আগে করণের মাথা হিসেবে তিনি যেন বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে দেখা করে আমাদের কথা বলেন। স্কুল খোলার দিনে ওঁকে আমাদের মধ্যে পেলে করণের মুখ উজ্জ্বল হবে—দয়া করে একবারটি যদি আসেন। আর সেই সঙ্গে দত্তমশাই এখানে বসবাস করার মত একজন ডাক্তারও ধরে নিয়ে আসতে পারলে তো একেবারে নিশ্চিন্তি।

বলা বাহুল্য, এই মোলায়েম উক্তির পরেও রাধানাথের মুখে একটা নরম রেখাও পড়ল না। পড়বে না জানাই ছিল। মদনমোহন যাকে শোনাতে এসেছিল সে শুনেছে। তার প্রতিক্রিয়া অনুমানের চেষ্টায় উন্মুখ। কিন্তু চিকের ওধার থেকে চুড়ির একটু টুনটান শব্দও কানে এলো না।

নিরস কঠিন গলায় রাধানাথ জিজ্ঞাসা করল, এই জন্যেই এসেছ?

হ্যাঁ।

বাবাকে আমি চিঠি লিখব আশা করো?

গাঁয়ের ভালো চাইলে লিখবে না কেন?

দু'চোখে গলগল করে বিদ্বেষ উপছে উঠছে রাধানাথের।—আমাব বউকেও উপস্থিত থাকতে বলেছিলে কেন?

অবাধ্য দৃষ্টিটা এবারেও চিকের দিকে ঘুরতে দিল না মদনমোহন। গলার স্বরে শুধু সম্ভ্রমের ছোঁয়া লাগল একটু।—উনি করণের ভালো চান, ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তা করেন, তাই। এ ব্যাপারে তাঁর মতামতেরও বিশেষ একটা মূল্য আছে বলে আমরা মনে করি।

ও! ক্রুদ্ধ বাক্যবাণে তাকে বিধ্বস্ত করে দিতে চাইল রাধানাথ।—ওই তো ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, তোমার আরজি শুনছেন। মতামত দেবার জন্যে তাঁকে ডাকি তাহলে এখানে?

অপরিসীম একটা লোভ সামলে মদনমোহন শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল।—ছি ছি, উনি কষ্ট করে শুনলেন সেটুকুই ভাগ্য। পরামর্শ বা মতামত যদি কিছু দেন, তোমার কাছ থেকেই জানতে পারব। আচ্ছা চলি—

দরজার দিকে পা বাড়ালো। ছিরে পাগলা বোবা গাম্ভীর্যে অনুসরণ করল তাকে। যতক্ষণ দেখা গেল, রাধানাথ জ্যান্ত ভস্ম করল তাদের।

চিক ঠেলে রাধানাথ এ-ঘরে এল। চণ্ডীবউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে তখনো। রাগ আর উত্তেজনায় ভেতরটা এভাবে ফুটতে না থাকলে বউয়ের এই লালচে মুখের দিকে চেয়ে কিছু একটা ব্যতিক্রম চোখে পড়ত রাধানাথের। সে ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অগোচরের একটা চাপা বিড়ম্বনা ঠেলে সরাবার চেষ্টা চণ্ডীবউয়ের।

কিন্তু রাধানাথের অতশত চোখ নেই। ঘরে পা দিয়েই বলে উঠল, দেখলে! কত বড় শয়তান দেখলে! আমি বাবাকে চিঠি লিখব আর তুমি মতামত দেবে শুধু আশা নিয়েই এসেছিল যেন, আর কিছু না—প্রেমবিলনো চৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে উঠেছে একেবারে!

নিরুত্তর চণ্ডীবউ মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে ভিতরের দিকে পা বাড়ালো। আড়ালে-আবডালে অনেকগুলি উৎসুক মুখ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে জানা কথা। দিনমানে সকলের চোখের সামনে ঘরের লোকের সঙ্গে কথা কওয়া রীতি নয়।

কিন্তু আসলে চণ্ডীবউ আড়াল খুঁজছে। দোতলায় উঠে সোজা নিজের ঘরে চলে এলো। তারপর খানিকক্ষণের মধ্যেও দ্বিতীয় আর কেউ এলো না দেখে স্বস্তি বোধ করল।...বারইয়ারীর উদ্দেশে ছুটেছে নিশ্চ । সঙ্গীসাথীরা সব কাল থেকেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

...চণ্ডীবউ বিব্রত, কারণ ঘরের মানুষের মত ...ও ভিতরটা দক্ষিণপাড়ার ওই দুরন্ত সাহসী মাতব্বরটির ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে না। যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, করণের মানুষ তার কতটা দাম দেবে জানে না, কিন্তু চণ্ডীবউ না দিয়ে পারছে না। পারবে না জেনেই যেন এসেছে। এ-রকম প্রস্তাব নিয়ে আসার পিছনে আর যদি কোনো অভিসন্ধি না থাকত, চণ্ডীবউ নিজেই হয়ত কলকাতায় চিঠি দেবার জন্য তাগিদ দিত। দিনকে-দিন গাঁয়ের যে চেহারা হচ্ছে ভাবতে গেলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সকলেই মোটা-রসে মেতে আছে আর মনের আনন্দে নীচের দিকে নেমে চলেছে। শিক্ষাদীক্ষার পর্ব ওই পাঠশালাতেই শেষ। আর অসুখ তো গাঁয়ে লেগেই আছে। তখন ঠাকুর-দেবতা আর হাতুড়ে বদ্যি ভবসা।

কিন্তু সত্যিই গাঁয়ের আর গাঁয়ের লোকের ভালো করার উদার চিন্তা নিয়েই শুধু বাড়ি বয়ে এসেছে লোকটা, এ বিশ্বাস করতে হলে জেনেশুনে নিজের চোখেই ঠুলি পরতে হয়। আলোচনার ছলে বাড়ি আসা আর তাকে সেখানে থাকতে বলার পিছনে একটা অভিসন্ধি অন্তত একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট।...একজন যেখানে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা ঢেলে স্থূল আনন্দে গা ভাসিয়েছে, আর একজন সেখানে কত উদার, কত উঁচুস্তরের মানুষ সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল, কানের পর্দায় খোঁচা দিয়ে শুনিয়ে গেল।

...দেখিয়ে গেল আর শুনিয়ে গেল কাকে? শুধু তাকে। শুধু চণ্ডীবউকে। দ্বিতীয় আর কাউকে নয়।

এতটা জেনে আর বুঝেও কেন চণ্ডীবউ ওই লোকের ওপর আর সেরকম জ্বলে উঠতে পারছে না! মায়ের থানে সেই প্রথম অঘটনের যোগাযোগ থেকে শুরু করে, নতুন বারইয়ারীর লড়াইয়ের আখড়ায় সেদিন ষষ্ঠীচরণকে জব্দ করা পর্যন্ত ক'বছর ধরে যে কাণ্ড করে চলেছে, তার উপলক্ষ যে-ই হোক, লক্ষ্য

যে কে সেটা চণ্ডীবউ ছেড়ে করণের একটি প্রাণীরও আর জানতে বাকি নেই এখন। এই সেদিনও ওই লোকের ওপর চণ্ডীবউ যথার্থই নির্মম হয়ে উঠতে পেরেছিল। অসহ্য রাগে ষষ্ঠীচরণকে পিছনের আমবাগান পাহারা দেবার নির্দেশ দিতে পেরেছিল। লোকটার উদ্দেশ্য আজও তেমনি স্পষ্ট। অথচ আজ চণ্ডীবউ চেষ্টা করেও মেজাজ চড়াতে পারছে না কেন?

রাতে রাধানাথ বাতাস সাঁতরে বাড়ি ফিরল যেন। ফূর্তিতে ডগমগ। ক'দিন ধরে নূতন বারইয়ারীর উৎসবের চটকে দক্ষিণপাড়ার দল এমনিতেই মিইয়ে আছে। তার ওপর আবার কাল যা দেখবে তারা, ওদের অস্তিত্ব একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যেতে বাধ্য!

ভাগ্যখানা প্রসন্নই বটে।

ছিরে পাগলের বিষদাঁত ভাঙার লগ্ন আসন্ন। এই সেদিন মুন্‌কের প্রতিদ্বন্দ্বী এনে দল পুষ্ট করতে গিয়ে বিপক্ষের ওরা নিজেদের নাক-কান কেটেছে। মুন্‌কের সেই খাওয়া দেখে 'ব্রহ্মা' বেণীমাধব ওদের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে একেবারে গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে। সত্যিকারের গুণী বলতে ওদের এখন এক ছিরে পাগলা—সবেধন নীলমণি। কিন্তু বরাতজোরে আজ তারও জুড়ি মিলেছে। জুড়ি কেন, রাধানাথ আর তার সঙ্গোপাঙ্গদের বিশ্বাস এমন গুণী অনায়াসে ছিরে পাগলার ওপর টেক্কা দিয়ে চলতে পারবে।

এই নতুন গুণীর নাম বীরবাহাদুর। বাঙালী নয়, আদিনিবাস বিহার। বাংলা আর হিন্দী দুই-ই টগবগ করে বলতে পারে। দীর্ঘকাল দিনাজপুরের রাজবাড়িতে কেটেছে। শুধু হরবোলা নয়, পাকা ভাঁড়ও বটে। রাজার পেয়ারের লোক ছিল সে। সেখানে কত জায়গাব কত সেয়ানা গুণীকে যে ঘায়েল করেছে আর নাকের জলে চোখের জলে এক করেছে, ঠিক নেই। মাস কয়েক হল দেশ দেখার তাগিদে বেরিয়ে পড়েছে। রাণাঘাটে হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে কিছু কসবত দেখাচ্ছিল, সেখানে রাধানাথের দুই সাগরেদের সঙ্গে দেখা। দলপতির নির্দেশে তারা ছিরে পাগলার জুড়ি খুঁজতে বেরিয়েছিল। মণি-কাঞ্চন যোগ। বিস্তর লোভ দেখিয়ে তারা গুণীকে বগলদাবা করে করণে এনে হাজির।

তার গুণপনার কিছু কিছু নমুনা দেখে সপারিষদ্ রাধানাথ আনন্দে আটখানা। কোথায় লাগে ছিরে পাগলা! ছিরে কেরামতি দেখে দেখে করণের লোকের চোখ পচে গেছে। সেদিক থেকেও এই বৈচিত্র্য লোভনীয়। আর লোকটা বাঙালী নয়, তাও এক বাড়তি আকর্ষণ। তাছাড়া চেহারাখানাও ছিরে পাগলার উল্টো একেবারে। দিব্বি মোটাসোটা ঘি-চাপাটি খাওয়া মূর্তি, মাথাব চুলে কদমছাঁট, গোল মুখ, ভোঁতা নাক, আর দুটো ড্যাবডেবে চোখ। যে-রকম হাবা-গোবা মুখ করে চেয়েছিল, তাইতেই ওরা হেসে সারা, আর তারপরেই আচমকা এমন একখানা সিংহের গর্জন করে থাবার ঝাপটা মেরে উঠল যে সত্রাসে সাত-হাত দূরে ছিটকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি তারা।

সোচ্ছ্বাসে বউয়ের কাছে নতুন গুণীর সমাচার বিস্তার করছিল রাধানাথ। আজই ঢেঁড়া পিটিয়ে সকলকে জানান দেওয়া হয়েছে। অমন একখানা ঘোষণা শুনে সর্বত্র

সাড়া পড়ে গেছে। কাল জমজমাট উৎসব। চণ্ডীবউ শুনছিল আর হাসতে গিয়ে হাই তুলছিল। শেষে বলেই ফেলল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে...।

রাধানাথ মিথ্যে আঁচ করে নি খুব। দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর উৎসাহীদের প্রায় সব কটি মুখ নিষ্প্রভই বটে। তাদের মাতব্বর মাথা উঁচিয়ে দত্তবাড়িতে হাজির হয়ে রাধানাথের এবং চিকের আড়ালে চণ্ডীবউয়ের উপস্থিতিতে যে প্রস্তাব দিয়ে এসেছে তাতে রসের খোরাক কিছু মিলেছে বটে, কিন্তু নিজেদের প্রতিষ্ঠানের জলুস কিছুমাত্র বেড়েছে বলে ভাবতে পারছে না কেউ। অপর পক্ষ দিনের পর দিন যেখানে উৎসব-আনন্দের হাট বসিয়ে চলেছে, তার পাশে কিনা নিরস স্কুল আর হাসপাতাল ঘর! ও-সব করে কোন্ চতুর্বর্গ লাভ হবে?

সকলের থেকে বিরস-বদন ছিরে পাগলার। নতুন গুণী বীরবাহাদুরের আবির্ভাব এবং তার সরগরম ঘোষণা শুনে সব থেকে বেশি সচকিত সে-ই। দলের অপমান তো বটেই, তার ওপর বিশেষ করে এ যেন তারই এতদিনের একচ্ছত্র সুনামের ওপর হামলা। একবার তো ভিন গাঁয়ের কোন্ এক পেটুক ব্রাহ্মণকে এনে নিজেরাই নাকানি-চোবানি খেয়েছে, এর ওপর ওদের পর... গুণী এসে সত্যিই যদি আসর মাত করতে পারে তাহলে আর বাকি থাকল কি? সঙ্কট কি শুধু এই, কদর কমে গেলে শ্রীনাথ নিজে যে পেটে-ভাতে মরবে? এ তো তার জীবিকাও বটে!

না, নিজের ওপর শ্রীনাথ আস্থা হারায় নি। মাথা খাটালে এখনো সে নতুন অনেক কিছু দেখাতে শোনাতে পারে। কিন্তু সে-সুযোগ কোথায়? সে কি স্কুলে বা হাসপাতাল ঘরে আসর জমাতে বসবে? গত রাতে ওই সরগরম ঘোষণা শোনার পর থেকেই ভিতরটা চিড়বিড় করছে তার। রাগ সব থেকে বেশি মদনমোহনের ওপর। রসের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে যেন একেবারে! আরো কত অপমান হলে তবে তার টনক নড়বে!

কিন্তু মেজাজ যতই বিগড়োক বিকেলে দত্তপাড়ার দিকে গুটি-গুটি না এগিয়ে পারল না। পরদেশী গুণীর কেরামতি স্বচক্ষে দেখার কৌতূহল আছেই।

এই উৎসবের ভিড়ে অন্তত ছিরে পাগলা হারিয়ে যাবার মানুষ নয়। তাকে দেখামাত্র দল-নির্বিশেষে অনেকে হৈ-হৈ করে উঠল। দক্ষিণপাড়ারও অনেকেই এসেছে। কিন্তু শ্রীনাথ যেন কাউকেই চেনে না। নির্লিপ্ত মুখ।

রাধানাথ এগিয়ে এসে বীরবাহাদুরের কানে কানে বলল কি, তারপর শ্রীনাথকে দেখিয়ে দিল। বীরবাহাদুর ড্যাব-ড্যাব করে খানিক চেয়ে রইল তার দিকে, তারপর তেমনি চেয়ে থাকতে থাকতেই চোখের মণি দুটো একেবারে নাকের দু'পাশে এনে ফেলল। অর্থাৎ, আসরে আর একজন সগোত্রীয় গুণী দেখে সে ট্যারা বনে গেছে।

সকলে হেসে উঠল। শ্রীনাথেরই শুধু পালিশ-করা নির্লিপ্ত মুখ।

নতুবা বারইয়ারীর সামনের খোলা জমিতে বহু দর্শকের বৃত্তাকারের ভিড়। সেই ভিড় ঘেঁষে বীরবাহাদুর ভালুকের মত চার হাত-পায়ে চক্কর খেয়ে চলেছে। আর থেকে থেকে ভালুকের মতই গা-ঝাড়া দিয়ে গর্জন করে উঠছে। খাঁচায়বদ্ধ ভালুক ঠিক যেমন করে গজরায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে এই করার পর হঠাৎ যেন সঙ্গী খুঁজে পেল সে। অর্থাৎ সঙ্গীর অভাবেই এতক্ষণ যেন মেজাজ ঠিক ছিল না তার।

আনন্দে দু'পায়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আর হাত দুটো সামনের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে টলতে টলতে শ্রীনাথের দিকে এগিয়ে চলল সে। দু'হাতে তার দুই কাঁধ ধরে আলিঙ্গনের ইচ্ছায় তাকে কাছে টেনে এনে মনের আনন্দে সে ভালুক-নাচ নাচতে লাগল। আর সেই সঙ্গে জিভ বার করে থ্যা-থ্যা করে শব্দ করতে করতে তার চোখে-মুখে যা ছিটিয়ে দিতে লাগল, সাধারণস্থলে গা ঘিনঘিনই করার কথা।

কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতি নয় এটা। তাই ছিরে পাগলার দুর্ভোগ দেখে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। বীরবাহাদুরের এই খেলা দেখানোর তাৎপর্য সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তার সঙ্গে পাল্লা দিতে এলে অমন গুণীর মুখে সে এই বস্তু দিয়ে থাকে।

এতখানি অপমানের পরেও শ্রীনাথের সমস্ত মুখ তেমনি ভাবলেশশূন্য, নির্লিপ্ত। পাছে সে চলে যায় সেই জন্য নতুন বারইয়ারীর একজন ছুটে গিয়ে এক বালতি জল নিয়ে এলো। অনুকম্পাবশে নিজের হাতে তার মুখ ধুয়ে দিল, আর যত্ন সহকারে নিজের কোঁচা দিয়ে মুখখানা মুছে দিল।

তাই দেখেও হাসছে সকলে। ছিরে পাগলাকে এমন বে-ইজ্জত হতে আর দেখে নি কেউ।

এখানকার প্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষ করে কোন্ কোন্ খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মজার খোরাক যোগায়, রাধানাথের কাছ থেকে বীরবাহাদুর তা সকালেই জেনে রেখেছিল। এবারে স্পষ্ট বাংলায় সে নিবেদন করল, কাঁচা হরবোলারা কি কি কসরৎ দেখিয়ে দর্শক মাত করতে চায় এখন সে সেই মহড়া দেবে। ছিরে পাগলার অনেক খেলাই অবলীলাক্রমে দেখিয়ে চলল সে। এমন কি ভিজা কাপড়ের ওপর ছায়া ফেলে শুধু হাতের কারসাজিতে নানান্ পশু-পাখির অবয়বও দেখিয়ে দিল। আর শেষে এক-ঠেঙে বকের ঠোক্করটা শ্রীনাথের ব্রহ্মতালুর ওপরই মেরে বসল।

আবারও হাসির ধুম পড়ে গেল। রাধানাথ ছুটে এসে তার পিঠ চাপড়ে দিল। সাবাস! বলল, কাঁচা হরবোলার খেলা তো হল, এবারে একটা পাকা গুণীর খেলা দেখিয়ে দাও ওস্তাদ!

মুখ কাঁচু-মাচু করে বীরবাহাদুর খেলার ভণিতা শুরু করল। বলল সে একজন দাগী আসামী, দেশে সাহেব ধর্মাবতারের কাছে একবার তার বিচার হয়েছিল।

অনেকে সমস্বরে ধুয়া ধরল, কেন বিচার হয়েছিল? তুমি কি করেছিলে?

খুন!

খুন! আঁতকে উঠল সকলে।—কাকে খুন করেছিলে তুমি?

দেশওয়ালি ভাষায় বীরবাহাদুর টেনে টেনে জবাব দিল, এক চুহা। (একটা ইঁদুর)

নতুন মজার রসদ পেল সকলে।—বিচারখানা কি-রকম হয়েছিল শুনি?

করুণ মুখ করে বীরবাহাদুর জানালো, সে একটা ইঁদুর মেরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেটা সাহেব হাকিমের এক মেমসায়েবের গায়ে গিয়ে পড়েছিল। রেগেমেগে সে তক্ষুনি গিয়ে হাকিমের কাছে নালিশ করেছিল, বীরবাহাদুর চুহা মেরে তার গায়ে ফেলেছে। হাকিম সাহেব দিনমানেই আচ্ছা করে সরাব খেয়ে বসেছিল। ওদিকে তার এক পেয়ারের দিশী মেয়েমানুষ ছিল, আদর করে সাহেব তাকে চুহা ডাকত। সরাবের ঝোঁকে সে ভাবল বীরবাহাদুর তার চুহাকেই মেরে ফেলেছে। রেগেমেগে তক্ষুনি সে ছুটে এলো বিচার করতে।

ভণিতা শুনেই বাহবা দিয়ে উঠল সকলে। এবারে কি হবে ছিরে পাগলা অন্তত ভালই অনুমান করতে পারে। ওই খোট্টা ব্যাটা নিজেই এখন একবার মাতাল হাকিম আর একবার আসামী হয়ে দুটো ভিন্ন গলার কসরত দেখিয়ে বিচারের প্রহসন ফেঁদে বসবে। এমন কি, আরো বাড়তি রস যুগিয়ে সাহেব হাকিমের মেয়েমানুষ চুহাকে সেখানে হাজির করে তার গলাও নকল করে আসর মাত করতে চাইবে হয়ত। আর লোকগুলো যে তখন উল্লাসে নাচতে থাকবে তাতেও সন্দেহ নেই।

ছিরে পাগলা অনেকক্ষণ মুখ বুজে সহ্য করেছে, আর কাঁহাতক সহ্য হয়? এতক্ষণ ধরে অপমানের জবাব দেবার অপেক্ষায় ছিল সে। আর ধৈর্য থাকল না। ভণিতার পরে বাহবা রব শেষ হতে হঠাৎ সকলের পিলে চমকে দিয়ে একটানা বিকট গাধার ডাক ডেকে উঠল সে।

অর্থাৎ, এতক্ষণে এক গাধা আর এক খাঁটি গাধার সন্ধান পেয়েছে।

প্রহসন শুরু করার মুখে এমন একটা বাধা পড়তে বীরবাহাদুর থমকে তাকালো সেদিকে। কিন্তু বিলিতি সাহেবের বিচার-পর্ব জমিয়ে তোলার আগ্রহে এযাত্রা তাকে ক্ষমা করে দিল। মুখ দিয়ে ফু করে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ বার করে, অর্থাৎ এক ফুৎকারে তাকে উড়িয়ে দিয়ে আবার শুরু করতে গেল।

আবারও বাধা। এবারে আরো বেশিক্ষণ। আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে ছিরে পাগলা তারস্বরে গাধার ডাক ডেকেই চলেছে।

তারপর আবার যে-কে সেই। তেমনি ভাবলেশশূন্য মুখ। বীরবাহাদুরের ভাঁটার মত গোল-গোল দু'চোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে। ওদিকে জমাটি প্রহসনের মুখে দু'দুবার এ-রকম বিঘ্ন ঘটতে রাধানাথ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা চটে উঠল।

কিন্তু কিছু করা বা বলার আগেই উৎসুক সকলে। জবাব বীরবাহাদুরই দেবে মনে হয়। তড়াক করে ঘুরে দাঁড়াল সে। যেখানে তার কসরত দেখানোর সরঞ্জাম থাকে, সেখান থেকে একটা মোটা দড়ি তুলে নিয়ে তাতে ফাঁস লাগাতে লাগাতে বলে উঠল, আরে মেরি গধ্ধী কাঁহা গয়ী রে? তারপর দড়ির ফাঁস হাতে দর্শকদের সামনে ঘুরতে ঘুরতে সে তার পলাতক গাধীটিকেই খুঁজে বেড়াতে লাগল যেন কাঁহা গেয়ী মেরি গধ্ধী—!

রুদ্ধশ্বাসে সকলে মজা দেখতে লাগল। গাধী খুঁজতে খুঁজতে বীরবাহাদুর ছিরে পাগলার সামনে এসে দাঁড়াল। তাবপরেই হারানিধি প্রাপ্তির উল্লাস।—আরে, এ-হি মেরী গধ্ধী! সজোরে তার কাঁধে এক চাপড় মেরে হিড়হিড় করে তাকে কাছে টেনে এনে দড়ির ফাঁস গলায় পরাতে গেল।

পর-মুহূর্তে তাজ্জব ব্যাপার!

চোখের পলকে ছিরে পাগলা উপুড় হয়ে চতুষ্পদ গাধা বনে গেল। আর তারপরেই পিছনের জোড়া পা ছুঁড়ে বীরবাহাদুরের চোখ মুখ বেড়িয়ে গাধার এক রাম চাঁট। বীরবাহাদুর টাল সামলাতে চেষ্টা করেও পেরে উঠল না। অন্ধকার দেখতে দেখতে অত বড় শরীরটা নিয়ে চিৎপাত। নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ছুটল, চোখের একটা মণি ফেটে যাবার দাখিল। যাতনায় কাটা ছাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে লাগল বীরবাহাদুর।

আসর সুদ্ধু মানুষ বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। রাধানাথ আর তার সাগরেদরাই ছুটে

এলো প্রথম। তারপর অন্যেরাও ঝুঁকল। জোয়ান লোকটার মুখ গলা বুক রক্তে ভেসে যেতে দেখে চক্ষুস্থির সকলের।

...ছিরে পাগলারও।

অঘটন ঘটার মুহূর্তে যদি ছিরে পাগলা পলায়ন-কলার স্তাবকের মত দুর্গা বলে ছুট্ লাগাত তাহলে বোধ হয় এমন ফ্যাসাদে পড়তে হত না। এই বয়সেও ছেলে-ছোকরাদের ডবল ছুটতে পারে। কিন্তু সে-প্রয়োজনটা চট্ করে তার মাথায়ই এলো না। আর সকলের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে জোয়ান লোকটার ছট্‌ফটানি আর রক্তস্রোত দেখতে লাগল।

ফলে বিপাক এড়ানোর পথ থাকল না। পালাতে পারে মনে হওয়া মাত্র বীরবাহাদুরকে ছেড়ে রাধানাথ ছুটে এসে ছিরে পাগলার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরক্ষণে তার সাগরেদরাও।

ছিরে পাগলা ধরাশয়ী। একসঙ্গে পাঁচ-সাতটি মরদ গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ধরাশায়ী না হয়ে উপায় কি? যুঝতে চেষ্টাও করল না। মাতব্বরের আদেশে একজন ছুটে গিয়ে লম্বা একটা দড়ি নিয়ে এলো। প্রথমে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হল, তারপর তুলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ঠেলে তাকে বারইয়ারীর বারান্দা ঘেঁষা বকুল গাছটার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। গাছের সঙ্গে কষে দ্বিতীয় বাঁধন। ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকালো ভিন্ন ছিরে পাগলার আর নড়া-চড়ার উপায় থাকল না।

একই দিনে দ্বিতীয় উৎসব শুরু যেন। শুধু রাধানাথ আর তার সাগরেদরা নয়, নতুন বারইয়ারীর বহু শুভার্থীও উল্লাসে মেতে উঠল। আহত বীরবাহাদুরের দিকে আর চোখ দেবার ফুরসত নেই কারো। এমন একটা উত্তেজনার খোরাক যোগাবার দরুন তারা খুশি বরং। কিন্তু বীরবাহাদুরের খুশি হবার কোনো কারণ নেই। রক্তের নোনা স্বাদ সে একাই টের পাচ্ছে। ওদিকে দিনের আলোয় টান ধরেছে সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে আসছে। আরো খানিক সময় কেটে গেলে আজ আর নাকের ভাঙা হাড় আর মুখের ভাঙা দাঁতের ক্ষত মেবামতের কোনো আশা থাকবে না। সকলের নাকের ডগা দিয়ে অথচ প্রায় সকলেরই অলক্ষ্যে চেনা গাছ-গাছড়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল সে। নাকের ভাঙা হাড়ের যন্ত্রণায় তখনো মাথাব ঘিলু নড়া-চড়া করছে।

ছিরে পাগলার হাতে অল্প-বিস্তর নিগ্রহ লাভ হয় নি সমবয়সীদের মধ্যে এমন মানুষ বিরল। এযাবৎ তার অপমান বিদ্রূপ টীকাটিপ্পনী সব হজম করতে হয়েছে ওর খুঁটির জোরে। খুঁটি মদনমোহন। কিন্তু এই নতুন বারইয়ারীর অভ্যুদয় এবং পর পর এতগুলো জমজমাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবার ফলে বিপক্ষ দলের ওই খুঁটির জোর একবোরে নড়বড়ে হয়ে গেছে। আর কিছুদিন এমনি চললে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ। অতএব ছিরে পাগলার এই দুর্দশা দেখে অনেকের অনেক দিনের চাপা আক্রোশ উল্লাসের আকারে ফেটে পড়াই স্বাভাবিক।

মেরে ফেলো! পিটিয়ে একেবারে শেষ কবে দাও ওকে! কেউ কেউ আবার বলল, পিটুনির চোটে কত রকমের স্বর বেরোয় ওর গলা দিয়ে সেটাই আগে পরখ করা হোক!

এই গোছের চেঁচামেচিতে রাধানাথ খুব একটা কান দিল না। তার এখন বিচারকের ভূমিকা। কাঁধে বিচারের গুরুদায়িত্ব। অবশ্য তার বিচার দেখেও সকলের চোখ জুড়োবে জানা কথা। কারণ রাধানাথের নিজের আক্রোশ ওদের চতুর্গুণ। সে নিঃসংশয়ে ধরে নিয়েছে মদনমোহনের কারসাজিতেই ছিরে পাগলা এই কাণ্ড করেছে। নইলে এমন দুঃসাহস ওর হয় কি করে?

বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে শাস্তির প্রথম পর্ব স্থির করা হল। ওই বাঁধা অবস্থায় ছিরে পাগলাকে বীরবাহাদুরের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। গাছের সঙ্গে সর্বাঙ্গে বাঁধা পড়লেও মুখখানা তো খালি আছে। সাধ মিটিয়ে বীরবাহাদুর ওই মুখখানা আগে থেঁতলে দিক। তার পরের বিচার পরে।

পরক্ষণে বিরক্তির একশেষ। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করেও বীরবাহাদুরের টিকির দর্শন মিলল না। এদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে, কাকে কোথায় খুঁজতে পাঠাবে? রাগে সমস্ত মুখ গনগনে হয়ে উঠল রাধানাথের। ছিরে পাগলার দিকে চোখ পড়তে মনে হল বীরবাহাদুর নিখোঁজ শুনে যে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে তার গালে পেল্লায় এক চড় বসিয়ে দিল রাধানাথ। দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল, বীরবাহাদুব নেই বলে তুই পার পাবি ভেবেছিস!

গালের ওপর এমন একখানা চড় পড়ার পরেও ছিরে পাগলার ভিতরের মেজাজখানা বাইরে থেকে বোঝা গেল না। বাইবে আরো ঠাণ্ডা আবো বিষণ্ণ মুখ। গলার স্বরেও হতাশা একটু। আবছা অন্ধকারে রাধানাথের চোখে চোখ রেখে বলল, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি মদনমোহনের সঙ্গে লাগতে চাও দত্ত-পো? কোথায় পুরস্কার দেবে, তা না নিজের হাতে মেরে বসলে আমাকে?

শুধু রাধানাথ নয়, চাবদিক থেকে যারা ওকে ছেঁকে ধরেছে এই উক্তি শুনে তারা অনেকেই বিভ্রান্ত। একটু পরেই রাধানাথই চোখ পাকালো আবার—কি বলতে চাও খোলসা করে বলো, নইলে মারের এখনি হয়েছে কি?

প্রাণের দায়ে চোখেমুখে তুরীয় ভাব ছিরে পাগলার।—এমন বুনো মোষের মত বুদ্ধি তোমার, মারবে বইকি, মনের সাধে মেরে নাও।...আমি নিজেই হাবা একটা, নইলে তোমার উপব নির্ভরের আশা নিয়ে এখানে আসব কেন...এখন আমার দু-কূল গেল।

রাধানাথ জানে ছিরে পাগলাকে বিশ্বাস করা সাপকে বিশ্বাস করার সামিল। এক ওর মা-মনসা ছাড়া, অর্থাৎ তার মুরুব্বি মদনমোহন ছাড়া আর সক্কলের ওপর ছোবল উঁচিয়েই আছে। মেজাজ বিগড়োলে মদনমোহনকেও ছেড়ে কথা কয় না, ছোবল না বসাক ফোঁস-ফোঁস করতে ছাড়ে না। সেই ছিরে পাগলার এমন হাব-ভাব দেখে আর এই কথা শুনে ধোঁকা একটু লাগলই। সেটা না বুঝতে দেবার তাগিদে আবারও চোখ পাকিয়ে তেড়ে এলো রাধানাথ—বাজে ফ্যাচ-ফ্যাচ না করে কি বলতে চাও ঠিক ঠিক বলো শিগগীর, নয়তো গায়ের ছাল তুলে নেব এক্ষুনি।

অগত্যা বিমর্ষ মুখে ছিরে পাগলা যা নিবেদন করল তার সারমর্ম, মদনমোহনের সঙ্গে তার একহাত হয়ে গেছে—শুধু তার কেন, অনেকেরই হয়ে গেছে। প্রায় সকলেই বুঝে নিয়েছে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর শুকনো পলতেটা আর তেমন করে

জ্বলবে না। এ-কথা মুখে কেউ না বলুক মনে মনে অনেকেই বলছে। কিন্তু ছিরে পাগলা মনে-মুখে এক মানুষ, অত ভয়-ডরের ধারে ধারে না। মদনমোহনের মুখের ওপর সে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর সঙ্গে আর তার কেনো সম্পর্ক থাকল না। তাকে পেয়ে রাধানাথ সাদরে বুকে টেনে নেবে আশা করেই বেছে বেছে আজকের দিনটিতে সে এখানে হানা দিয়েছিল। পরদেশী গুণীকে ও কত সহজে নস্যাৎ করে দিতে পারে সেটা ভালো করে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই এই কাণ্ড করেছিল। কোথায় রাধানাথ ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচবে, তার বদলে কিনা এই হেনস্থা!

শুধু রাধানাথ কেন, উপস্থিত প্রায় সকলেই বিভ্রান্ত একটু। ছিরে পাগলার এইগোছের পরিবর্তন অবিশ্বাস্য। মদনমোহন কায়া, ছিরে পাগলা তার অবিচ্ছেদ্য ছায়া। তাছাড়া ওর এই উক্তিতে বিশ্বাস করলে সদ্য বর্তমানের সমস্ত উত্তেজনা আর সব মজা মাটি।

বিশ্বাস কোরো না দত্ত-পো, ওর একটা কথাও বিশ্বাস কোরো না! এখন বিপদে পড়ে সাধু সাজছে—ছাড়া পেলেই মুখোশ খুলে গজরাবে!

সমস্বরে এই মন্তব্য শুনে রাধানাথের বিভ্রম বাড়ল আরো। তার অন্তরঙ্গ সাগরেদদেরও প্রায় সকলেই এই মন্তব্যে সায় দিল। অথচ ছিরে পাগলা যা বলেছে তার সবটুকুই লোভনীয়। সত্যি যদি হয়, এর থেকে আনন্দের আর কি আছে?

ভ্রূকুটি করে তার মুখের সামনে এগিয়ে এলো রাধানাথ।—চালাকি হচ্ছে!

ছিরে পাগলা মাথা নাড়ল। চালাকি হচ্ছে না। বলল, তোমার সাঙ্গো-পাঙ্গগুলো সব গাধা—

এদিক-ওদিক থেকে ক্রুদ্ধ রব উঠল আবার।—দেখলে দত্ত-পো, সাহস দেখলে? নিজের কানে শুনলে তো? আমাদের সব গাধা বলল, তার মানে ঘুরিয়ে তোমাকে সর্দার-গাধা বলা হল!

অকাট্য যুক্তি। রাধানাথের দু'চোখ আবার খরখরে হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে হাত দুটোও আবার নিশপিশ করে উঠল। দ্বিতীয় দফা চড়-চাপড় শুরু হবে বুঝে নিয়ে নিরুপায় ছিরে পাগলা প্রাণের দায়ে মুখে হাসি ফোটালো একটু। অন্তরঙ্গ সুরে বলল, ওদের বুদ্ধি দেখো দত্ত-পো, আমার যেন ঘাড়েব ওপরে তিনটে মাথা আছে যে শত্রু হয়ে সিংহের ল্যাজ ধরে টানতে আসবো...আসলে ওরা চাইছে তুমি আমাকে একটু মারধোর করো। তাতেই যদি ওদের তুষ্টি হয় তাই করো না—

রাধানাথের উদ্যত হাত আপনা থেকেই নেমে এলো আবার। অমায়িক বচন শুনে কি যে করবে ভেবে পেল না। এদিকে আঁধার আরো গাঢ় হয়েছে। তিন হাত দূরের মুখও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ রাধানাথের মনে হল বিচার বিবেচনা করার আগে খানিক তরল পদার্থ জঠরে চালান করে মাথাটা সাফ করে নেওয়া দরকার। এধারে সরে এসে দু'তিনজন প্রাণের ইয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিল একটু। তার প্রস্তাবে বন্ধুরা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। তারপর উপস্থিত উদ্‌গ্রীব মুখগুলোর উদ্দেশে রাধানাথ ঘোষণা করল, আজ সমস্ত রাত ছিরে পাগলা এইভাবে গাছের সঙ্গে বাঁধা থাকবে, কাল সকালে তার বিচার হবে, কারণ বিচারটা খুব

ভেবে-চিন্তে করা দরকার। অতএব মজা দেখার আশায় যারা দাঁড়িয়ে আছে আজকের মত তারা বাড়ি যেতে পারে।

একসঙ্গে অনেকে বাধা দিয়ে উঠল, পালাবে, ও ঠিক পালাবে!

রাধানাথ নিশ্চিন্ত করল ওদের, পালাবে না, কারণ সমস্ত রাত ধরে তারাই ওকে পাহারা দেবে এবং পরামর্শ করবে। তাদেরও ধারণা, ছিরে পাগলা ভাঁওতা দিচ্ছে, যদি তাই হয় রাত পোহালে তার শাস্তি দেখে সকলের চোখ যে জুড়োবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অগত্যা ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক একে একে সকল দর্শককেই বাড়ির পথ দেখতে হল। এর পরেও যারা নড়তে অনিচ্ছুক রাধানাথের সঙ্গীরা তাদের ঠেলে সরালো।

জোরালো বাতি জ্বেলে রাতের আসর বসল দালানের বারান্দায়। গাছটা হাত তিরিশেক দূরে হবে সেখান থেকে। রাধানাথের নির্দেশে একজন একটা লণ্ঠন জ্বেলে ছিরে পাগলার সামনে রেখে তার গালে একটা ঠোনা মেরে চলে গেল। লণ্ঠন রাখা হল, কারণ সাপটাপের ভয় আছে তাছাড়া বাঁধা অবস্থায় ছিরে পাগলা কি করছে না করছে নজর রাখা হবে।

দেখতে দেখতে আসর জমজমাট। বোতল খোলার ব্যাপারে রাধানাথ আজ দ্বিগুণ উদার। আনন্দেরই দিন বটে। ছিরে পাগলা যদি শত্রু হয়ে এই সিংহগুহায় পা দিয়ে থাকে, তাহলে একটা জাত-শত্রু তাদের হাতের মুঠোয় এসেছে বলতে হবে। আর যদি মিত্র হয়ে এসে থাকে, তাহলেও ষোল আনা লাভ। বীরবাহাদুরের মত ওস্তাদকেও চোখের পলকে একেবারে কুপোকাত করার মতই গুণী যে বটে তাতে আর সন্দেহ কি! অমন গুণীকে দলে পেলে চতুর্বর্গ লাভ।

কিন্তু নেশা জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুণীর সম্পর্কে পরামর্শের ধারাটা প্রতিকূল খাতে গড়াতে লাগল। এই অবস্থায় পুরেনো স্মৃতিই বেশী মনে পড়ে কিনা কে জানে! প্রথম থেকেই ছিরে পাগলার ছিদ্রান্বেষণ শুরু হল। কবে কাকে কটু কথা বলেছে, কাকে অপমান করেছে, কর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ইত্যাদি। আলোচনার গরমে ওর গুণের দিকটা মুছেই গেল। আগুনে ঘৃতাহুতি দেবার মত করে একজন সকলের চোখের সামনে পাঁচ-সাত বছর আগের এক অপরাধের দৃশ্য টেনে আনল। মায়ের থানে যেবারে চণ্ডীবউ বলি দেখে ভিরমি খেয়েছিল আর মদনমোহন তার মাথাখানা কোলে নিয়ে শুশ্রূষা করেছিল—সেবারের কথা। সে-খবরটা এখানে ছিরে পাগলাই দিয়ে গেছল। ব্যঙ্গ করে করে ও যে ভাষায় সেই দৃশ্যটা বর্ণনা করেছিল তা যেমন কুৎসিত তেমনি অপমানকর। আশ্চর্য, এত বছর আগে ছিরে পাগলার সেই ব্যঙ্গবাণ প্রায় হুবহু মনে পড়ছে সকলের। ও বলেছিল, এদিকে মদনমোহনের কোলে মাথা রেখে মা-লক্ষ্মী অজ্ঞান, অন্যদিকে সব্ব আপদ থেকে তাঁকে আগলে রেখে মদনমোহনও প্রায় অজ্ঞান, আর তারা যারা বোবার মত দাঁড়িয়ে দেখছিল—তারাও। রসের বর্ণনা সেখানেই শেষ করে নি ছিরে পাগলা, সাহসের মাত্রা ছাড়িয়ে সকলের কান বিষনোর মত করে আরো কিছু বলেছিল। বলেছিল, মদনমোহনের হাতের জলের ঝাপটা খেয়ে জ্ঞান ফেরার আগে সে কি কম্প মা-লক্ষ্মীর, তড়কা জ্বরের মত সর্ব-অঙ্গের থর-থর ভূমিকম্প যেন একেবারে—গোপীকুলমানিনী মা রাধিকারও অমন কম্প হয়েছিল বলে শোনে নি...

নেশার ঘোরে রাধানাথের দু'চোখ এমনিতেই লাল, তার ওপর এই পুরনো স্মৃতির ধাক্কা খেয়ে ও দুটো জ্বলন্ত কয়লার টুকরো হয়ে উঠল। ছিরে পাগলার মুণ্ডু চিবুনোর মত করে সে ঘোষণা করল, ওই শয়তানকে কাল টুকরো টুকরো করে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হবে—তার ফলে যদি ফাঁসি যেতে হয় সেও আচ্ছা।

সাগরেদরা চোখ বুজে তাদের মাতব্বরের ফাঁসির দৃশ্যটাই সম্ভবত কল্পনায় দেখে নিতে চেষ্টা করল। কাঁদ-কাঁদ হয়ে একজন তারপর আবেগভরে প্রতিবাদ করে উঠল, আমরা থাকতে ফাঁসি তোমার হতে যাবে কেন, ফাঁসির দড়ি মালার মত করে আমরাই গলায় পরব।

॥ ২৩ ॥

কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত অসহ্য টনটন করছে ছিরে পাগলার। অদূরে দাওয়ার আসরের দিকে চেয়ে মুখ বুজেই অজস্র গালাগাল দিতে থাকল। কিন্তু বাঁধন ঢিলে হবার নয় তাতে। উল্টে দড়িটা যেন ক্রমে গায়ের মাংস কেটে বসছে। সমস্ত রাত এভাবে কাটলে কাল আর বিচার শোনার জন্য বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ।

...তবু 'ওই মদমত্ত আসরের দিকে চেয়ে ছিরে পাগলা কিছু আশা করছে। আশা করছে সমস্ত রাত এভাবে কাটবে না। খবরটা এতক্ষণে মদনমোহনের কানে গেছে নিশ্চয়। গিয়ে থাকলে সে চুপ করে বসে থাকবে না। রক্তচক্ষু মেলে দাওয়ার দিকে তাকালো। আর খানিকক্ষণের মধ্যেই ওদের উল্লাস তুঙ্গাবস্থার দিকে গড়াবে মনে হয়। গেলাস হাতে এরই মধ্যে কেউ কেউ ঢলে পড়েছে। ছিরে পাগলা বিড়বিড় করে শাপান্ত করল, খা খা, খেয়ে যত শিগগীর পারিস সশরীরে সগ্গে যা তোরা। এর জবাব দেব তোদের—দেব দেব দেব, আমিও শ্রীনাথ নাম ধরি—

একটু বাদেই হতাশা আবার। সামনের ওই দাওয়াব দিকটা ছাড়া চারিদিক ঘন অন্ধকার। পাঁচ হাত দূরে চোখ চলে না। জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝির ডাকে কান ঝালাপালা। মশার দঙ্গল আরো বেশি জ্বালাচ্ছে। এক একটা মিনিট এক-একটা ঘন্টা। গা ছমছম করছে ছিরে পাগলার।...খবর কানে গেলেও ওই প্রেমচাঁদ জঙ্গল ভেঙে এই আঁধাবে ছুটে আসবে কিনা কে জানে? কোন্ স্বপ্নে ডুবে আছে তারই বা ঠিক কি! মন-চোরার মনখানা তো সর্বক্ষণ সেই চাঁদবদনীর শোবার ঘরের দরজায় মাথা খুঁড়ছে। মেয়েমানুষে মন মজলে তার পৌরুষ ভেড়ার গোত্র! এক জোড়া রমণী-পুরুষের উদ্দেশে মনে মনে ছিরে পাগলা অশ্লীল কটুক্তি করে উঠল একটা।

রোমাঞ্চকর খবরটা শুধু মদনমোহনের কানেই যায় নি, তারও আগে চণ্ডীবউয়ের কানে বিঁধেছে। উত্তেজনায় ভরপুর প্রসন্নময়ী মোটা শরীর নিয়ে নীচে থেকে ওপরে ছুটে এসেছে। তারপর দু'চোখ কপালে তুলে ঘটনার আদ্যোপান্ত পল্লবিত করেছে।

শুনে চণ্ডীবউও কাঠ খানিকক্ষণ। তারপর মনের তলায় অশুভ ছায়া পড়তে সচকিত। কি থেকে কি ঘটে ঠিক কি! সাপে কাটতে পারে, শেয়ালে কামড়াতে

পারে। তাছাড়া লোকটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে যারা মদ গিলতে বসেছে, নেশার ঘোরে তারাও বড়-রকমের কিছু বিপত্তি ঘটিয়ে বসতে পারে। মদ গেলার কথা প্রসন্ন অবশ্য বলে নি, ওটুকু চণ্ডীবউয়ের নির্ভুল অনুমান।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ছট্‌ফট করার পর দু'চোখে হঠাৎ প্রসন্নর মুখের ওপর থমকালো।—তোকে এত সব খবর কে দিলে?

ঠোঁট উল্টে প্রসন্নময়ী ঘুরিয়ে জবাব দিলে, ও-মা, এ খবর কি করণের কারো জানতে বাকি আছে! চারদিকে তো হৈ-চৈ পড়ে গেছে একেবারে!

সোজা জবাব না পেয়েই যেন চণ্ডীবউয়ের গলার স্বর অসহিষ্ণু একটু।—তোকে কে বললে?

এত বড় উত্তেজনার বদলে এমন প্রশ্ন বা এই মেজাজ কে আশা করে? ঢোঁক গিলে প্রসন্ন সাদা মুখ করে বলল, ওই মুন্‌কে পেটুক!

এই জবাবই যেন আশা করছিল চণ্ডীবউ। দু'চোখ প্রসন্নর মুখের ওপর আর এক দফা নড়াচড়া করল। কিন্তু প্রসন্নর মনে হল, বউমণির মাথায় কিছু একটা মতলব ঘুরপাক খাচ্ছে।

উনি আছেন এখনো?

কি জানি!

ন্যাকামো করিস না। না জানিস দেখে আয় চট্ করে—শিগগীর যা!

এমন তাড়ার তাৎপর্য না বুঝে প্রসন্নময়ীব বিস্ময়ের থেকেও অস্বস্তি বেশি। মাথায় আবার কি চাপলো কে জানে?

উঠে ঘর ছেড়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই হল। মুন্‌কে আছে কি নেই খুব ভালোই জানে। ওরই আশায় বসে আছে। সব্ব-অঙ্গ রোমাঞ্চিত হবার মত এমন তাজ্জব ঘটনার খবরদারী করার পর পেসন্ন রাতের আহারের ব্যবস্থা কিছু করবে জানা কথাই। তাছাড়া বউমণিকে সংবাদটা দিয়ে ফাঁক পেলে পালিয়ে এসে পা ছড়িয়ে আবার শুনতেও বসবে।

খানিক বাদে গুটি গুটি ফিরে এসে প্রসন্নময়ী মাথা নাড়ল। অর্থাৎ মুন্‌কে আছে।

তারপরই বউমণির হুকুম শুনে আকাশ থেকে পড়ল একেবারে। চণ্ডীবউ বলল, তাহলে তাঁকে নিয়ে তুই এক্ষুনি চলে যা, একটা ছুবি-টুরি কিছু নিয়ে যা—কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, গিয়ে বাঁধন কেটে দিবি, কেউ কিছু বলে তো তখন আমার কথা বলিস—

হুকুম শোনাব পরেও প্রসন্নময়ীর অঙ্গ অবশ যেন।

হাঁ করে দেখছিস কি, যা বললাম কানে গেল!

তাড়া খেয়ে প্রসন্ন সচকিত একটু।—হ্যাঁ বউমণি, কিন্তু...এই রেতে যাব বলছ?

চণ্ডীবউ যথার্থই রেগে গেল। তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বলে উঠল, দেখ্, ভালো হবে না বলছি! রাতে তুই কোথাও যাস না কেমন? পাজী হতচ্ছাড়ী কোথাকার—ওই ভাবে থেকে লোকটা মরবে?

প্রসন্নময়ী দিশেহারা হঠাৎ। আপাতত নিজে বাঁচার তাগিদে নিমেষে উঠে প্রস্থান করল। চোখের আড়াল হবার পর বিস্ময়ের পালা।

...বুকের ভিতরটা কাঁপছে। বউমণি মানুষ কি অন্য কিছু ভেবে পেল না। দু'রাত

আগে ও ছোটখাটো একটা অপকম্ম করেছিল বটে। পাশের গাঁয়ে জমজমাট নাটক ছিল—নল-দময়ন্তী পালা। একদিন আগে থেকে এসে এমন লোভ দেখালো আর এমন ফুসলালো মিনসেটা যে ঘরে থাকতে পারাই গেল না। বিকেল থেকে গা-হাত-পা ম্যাজ ম্যাজ আর মাথার যন্ত্রণার কথা বারকয়েক বউমণির কানে তুলে সন্ধ্যের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে শয্যা নিয়েছিল। বউমণিই বলেছিল, শুয়ে ঘুমোগে যা, রাতে কিছু খেয়ে কাজ নেই।

ও সামনে থাকে বলেই বউমণির খেতেশুতে একটু দেরি হয়। নইলে তাড়াতাড়িই হয়ে যায়। তাই হয়েছিল। তার ওপর বরাত আরো প্রসন্ন। বউমণির খাওয়া হতে না হতে বন্ধ দরজার আড়াল থেকে দাদাবাবু ফিরল টের পেয়েছে। নিত্য রঙে থাকে আজকাল, গান ভাঁজতে ভাঁজতে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় ওঠে। তবু বউমণি আগের মত রাগারাগি করে না। করলে পরদিন মুখ দেখেই প্রসন্ন টের পায়।

...প্রসন্নময়ী দু'কান খাড়া করে সময় গুনছিল। বেশির ভাগ রাতে দাদাবাবুটি বাইরে থেকে খাওয়াদাওয়া সেরে আসে। সেই রাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। খানিক বাদে ও-ঘরে আগল পড়ার শব্দ কানে আসতে প্রসন্নময়ী নিশ্চিন্ত। নিজের ঘরের দরজা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে এসেছিল। তারপর রান্নাঘরের দাওয়ায় বসেই পরিপাটি করে আহার সেরেছে। খেতে খেতে বুড়ো বামুন ঠাকুরকে জানিয়েছে বউমণির তাগিদে পড়েই সে যাত্রা দেখতে যাচ্ছে। বউমণির তো ও চোখের মণি, তার ওপর যাত্রা-গান পছন্দ করে জানে। না পাঠিয়ে ছাড়ল না। সে খিড়কির দরজা দিয়ে যাবে, কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। টের পেলেই তো সব যাবার জন্য নাচানাচি করবে, তাই বউমণি শুধু বামুন ঠাকুর ছাড়া আর কাউকে জানাতে নিষেধ করে দিয়েছে, ইত্যাদি।

সকলের অগোচরে বাড়ি ফেরার ব্যাপারেও প্রসন্নময়ীর কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল না। বামুন ঠাকুটির ভোররাতে নিদ্রাভঙ্গ হয়, খিড়কির দরজা দিয়েই তখন সে পুকুরে গিয়ে জপ-তপ স্নানাদি সম্পন্ন করে। বাড়ির মানুষেরা তখন ঘুমে অচেতন। সে-সময়ে সকলের অলক্ষ্যে ঘরে ফেরা আরো সহজ।

যাত্রা দেখে প্রসন্নময়ী মনের আনন্দে ঘরে ফিরেছিল। আর সেই আনন্দে ওই পেটুকরামের একটু-আধটু বেচালও চোখ পাকিয়ে বরদাস্ত করেছিল। মুন্কের বেচাল বলতে খুব নিরাপদ বুঝলে গায়ে-পিঠে একটু-আধটু হাত বুলনো। তা বেচারার জন্য প্রসন্নর মায়াই হয় এক-একসময়। নিজেকে ছেড়ে আর একটা পেট চালানোর ভয়ে বিয়েটা পর্যন্ত করতে পারল না।

যাই হোক, এ দু'দিনে প্রসন্নর মনে শঙ্কার এতটুকু ছায়া পড়ারও কারণ ঘটে নি কিছু। আর বউমিণির মুখে এই ঝাঁঝালো উক্তি শুনে হতভম্ব। বুকের তলায় কাঁপুনি এখনো থামে নি।...বউমণি জানল কি করে? টের পেল কি করে? বামুন ঠাকুর বলেছে? সে-সম্ভাবনা মনের কোণে ঠাঁই পাবার মতও নয়। ওই বামুন ঠাকুর আজ পর্যন্ত বউমণির মুখ দেখবারও সুযোগ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। নাম শুনলে ভয়ে জড়সড়। শুধু বামুন-ঠাকুর কেন, বেশির ভাগ চাকর-বাকরগুলোরও সেই দশা। তারা শুধু ওই একজনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সদা সজাগ এবং সচেতন।

তাহলে বউমণি জানল কি করে? টের পেল কি করে?

বাইরে এসে বারান্দার দেয়ালের সঙ্গে মিশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রসন্নময়ী। কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। বারান্দায় ঝাড়লণ্ঠনের আলো ঝলমল করছে। সেইজন্যই বাইরের অন্ধকার আরো ঘোরালো, আরো ধারালো ঠেকছে চোখে। ওই অন্ধকার যেন ওকেই গেলার জন্য হাঁ করে আছে।

ঘরের ভিতর থেকে ছায়া এগিয়ে আসছে একটা লক্ষ্য করে নি। তারপরেই আবার আঁতকে উঠতে হল। বউমণি ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

চোখাচোখি হতে বিষম থতমত খেয়ে প্রসন্ন বলে উঠল, যাচ্ছি বউমণি, ইয়ে ভাবছিলাম...তেনারা কি-সব খেয়ে আনন্দ করছেন শুনেছি, তার মধ্যে হুট করে গিয়ে পড়ব, তাই-ভ-ভয়-ভয় করছে...

ওকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চণ্ডীবউ অবাকই হয়েছিল। কথা কটা শোনামাত্র সমস্ত মুখ লাল। না, দুশ্চিন্তায় আর উত্তেজনায় বাস্তবের এদিকটা তার মাথায় আসে নি। বসে বসে কোন্ বস্তু গিলে নরকে সাঁতার কাটছে সব, তা চণ্ডীবউ যেমন জানে, প্রসন্নও তেমনিই জানে। বাড়ির মনিবের ওপর বয়েসকালের ঝি-চাকরাণীর পর্যন্ত এমন অবস্থা যে, সে-সময়ে সামনে যাবার নামে ভয়ে মুখ সাদা।

একটা যন্ত্রণাই যেন চুপচাপ সামলে নিল চণ্ডীবউ। তার পর মৃদু-কঠিন সুরে হুকুম করল, বাড়িতে কে কে আছে দেখ্, সব সঙ্গে নিয়ে যা—

আবার ঘরে ঢুকে গেল।

হুকুমটা বোধগম্য হতে মুনুকেরও সময় লাগল খানিক। তারপর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় তারও দু'চোখ কপালে। প্রসন্নর মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রমাদ গুনতে লাগল। হুকুমের যে নড়চড় হবে না সেও ওই মুখ থেকেই বুঝে নিল।

ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো একটা। বলল, ভাবলাম এখান থেকে চারটে খেয়েদেয়ে তোর সঙ্গে একটু গপ্প-সপ্পো করে ঘরে যাব...এ আবার কি ফ্যাসাদ হল!

মেজাজ প্রসন্নময়ীরও বিগড়েই আছে। সে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, তুমি উঠবে এখন না বসে ফ্যাচ-ফ্যাচ করে রাত বাড়াবে? যেমন খবর এনেছ তেমনি খাবি খেয়ে নাও আগে, তারপর কিছু জোটে কিনা দেখা যাবে?

অগত্যা উঠতে হল।

লণ্ঠন হাতে মুনুকে চলেছে। পাশে প্রসন্ন। তাদের একটু পিছনে লাঠি হাতে তিনটি চাকর। গাঁয়ের রাস্তায় রাতে বেরুতে হলে লাঠি হাতে নেওয়া রীতি।

মুখ বুজে খানিক পথ চলার পর মুনুকের গা-ছমছম ভাবটা ক্রমে কমে আসতে লাগল। যে কার্যসাধনে চলেছে, সেটা খুব দুরূহ বা সঙ্কটজনক মনে হচ্ছে না এখন। আসরের পানাহারজনিত তুরীয় অবস্থার চিত্রটা মুনুকের জানা আছে। হয়ত কেউ টেরই পাবে না। টের পেলেও, কার হুকুম-পালনে এসেছে শুনলে নেশাই ছুটে যাবে সক্কলের। করণ ছেড়ে ভূ-ভারতে আর কোনো রমণীর এমন প্রভাব আছে কিনা মুনুকের জানা নেই। তাছাড়া, হাজতে লাল-মুখো সাহেবের সামনে ভোজনের কেরামতি দেখিয়ে বিপক্ষের সেই নতুন গুণী বৈশ্বানর 'ব্রহ্মা' বেণীমাধবকে ঘায়েল করে গাঁ-ছাড়া করার পর থেকে সে তো মহা আদরের পাত্র দত্তপাড়ার পাণ্ডাদের। ওদের মুরুব্বি পর্যন্ত আজকাল কত খাতির করে তাকে। আচমকা অমন

হুকুম শুনে অভ্যাসের দোষেই প্রথম ঘাবড়ে গেছল, নইলে তার অত ভয়ের কি আছে!

ভয় দূর হতে আবছা আঁধারে মুনকে লুব্ধ চোখে প্রসন্নর দিকে তাকালো বার-কতক। যাত্রাটা বেশ রোমাঞ্চকর মনে হতে লাগল তার। কিন্তু গায়ে পিঠে হাতে ছোঁয়াবার উপায় নেই, লণ্ঠনটা তারই হাতে, ফলে পিছন থেকে চাকরগুলো ঠিক দেখতে পাবে। অভিলাষের তাড়নাতেই হঠাৎ ভোজন সর্বস্ব মুনকের মাথায়ও পুরুষের বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে গেল একপ্রস্থ। ঢোঁক গিলে প্রস্তাব করল, ওদের ফিরে যেতে বল্ পেসন্ন।

প্রসন্নময়ী অবাক একটু।—কাদের?

ওই পিছনে যারা আসছে, ওদের।

প্রস্তাবের তাৎপর্য ঠাওর করা গেল না তবু।—তারপর?

তারপর শুধু তোতে আমাতে যাব।

প্রসন্নময়ীর গতি শিথিল। আবছা অন্ধকার ফুঁড়ে ঘাড় বাঁকিয়ে মুখখানা দেখতে চেষ্টা করল। এমন বীররসের নজির এই প্রথম। চাপা গলায় বলে উঠল, ভীমরতি ধরেছে?

প্রস্তাব পেশ করার পর মুনকের সাহস আর লোভ আরো বেড়েছে। জবাব দিল, না রে না, মদ গিলে যে অবস্থা ওদের এখন, হয়ত কেউ টেরই পাবে না, চুপচাপ কাজ হাসিল করে চলে আসব—তাতে তোরও কত নাম হবে। আর টের পেলেই বা কি—তোর বউমণি হুকুম দিয়েছে, তার ওপরে সঙ্গে আমি আছি অত ভয়ের কি আছে—আমি তো এখন কত আপনার জন ওদের। তাছাড়া ওদের তো এখন চোখের ঠিক নেই, লাঠি-সোঁটা হাতে এদের দেখলেই বরং একটা হুলুস্থুল বেধে যেতে পারে।

এবারে মুনকের উক্তির সবটুকুই যুক্তিসঙ্গত মনে হল প্রসন্নময়ীর। ষাঁড়গুলো যেমন লাল দেখলে ক্ষেপে, লাঠি-সোঁটা দেখে নেশার ঝোঁকে ওনাদেরও সেই অবস্থা হবে কিনা কে জানে—তখন কে লোক বা কার লোক হুঁশ না থাকা বিচিত্র কি—শত্রুকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছে মনে হলেই হল!...কিন্তু নিজের কথা ভেবেই দ্বিধান্বিত প্রসন্নময়ী। বলল, আর নেশার ঝোঁকে ওরা যদি আমার ওপর হামলা করতে আসে?

না, এ সম্ভাবনা মুনকের মাথায় আসে নি একবারও। ইচ্ছে করল হাতের লণ্ঠনটা তুলে প্রসন্নময়ীকে ভালো করে দেখে নেয় খানিক। ওর এই ভয়টা সম্পূর্ণ অলীক মনে হলেও শুনতে কেন যে এত ভালো লাগল জানে না। শুধু ভালো লাগা নয়, হামলা করার জন্য তারই হাত দুটো যেন নিশপিশ করে উঠল হঠাৎ।

পুরুষমানুষের মত করেই একটু হাসল তারপর। বলল, কি বলিস্ ঠিক নেই, আমি কি মরে গেছি, না জেনেশুনে তোকে বাঘের মুখে ঠেলে দিতে যাচ্ছি। বরং কিছু গণ্ডগোল না চাস তো যা বললাম তাই কর্, আধখানার বেশি এসে গেলাম, সময় থাকতে ওদের ফিরে যেতে বল্—

না, পেটুকরামকে আজ একটু অন্যরকমই লাগছে বটে প্রসন্নময়ীর। বেশ বুদ্ধিমানের মতই কথাবার্তা কইছে। ভয়ের কিছু থাকলে অত ভীতু মানুষ এত সাহস করত

না। লাঠি-সোঁটা হাতে লোক দেখার বিপদের দিকটাও বাতিল করা গেল না। তাছাড়া, এমন একটা কাণ্ড সত্যিই যদি ওদের ছাড়াই হাসিল করে আসা যায়, পরে করণের আর কারো জানতে বাকি থাকবে না কার হুকুমে কে এই কাজ করল। তখন বউমণির সঙ্গে গাঁয়ের লোকের মুখে ওর কথাও ছড়াবে।—আর, ছড়ালেও ওই চণ্ডী-ঠাকরোনের ভয়ে স্বয়ং দাদাবাবুও মুখ বুজেই থাকবে। যাত্রাগানের মেয়ে-সাজা রাণীর কপালেও এমন সুযোগ আসে কিনা সন্দেহ।

গতি আগেই শ্লথ হয়েছিল। পিছনের লোক তিনটে প্রায় পিছনেই হাঁটছে প্রসন্নময়ী ঘুরে দাঁড়াল।—এই আর আসতে হবে না, তোরা বাড়ি চলে যা—বউমণি যদি তোদের ফিরতে দেখে কিছু জিজ্ঞেস করেন তো বলবি অন্য বিপদের কথা ভেবে পেসন্ন পাঠিয়ে দিলে—আর না জিজ্ঞেস করলে তোদের নিজের থেকে কিছু বলার দরকার নেই।

লোক তিনটেও খুব স্বস্তির মধ্যে ছিল না। কোন্ দরকারে বউমণির হুকুমে এই রাতে প্রসন্নর সঙ্গ নিতে হয়েছে সেটা অনুমান করা তাদের পক্ষে সহজ হয় নি। অজানা আশঙ্কায় লাঠি কাঁধে দুরু দুরু বক্ষেই আসছিল তারা। প্রসন্নর উক্তি শোনা মাত্র তিনজনে একসঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে প্রস্থান করে বাঁচল।

তারা আড়াল হতে প্রসন্নর গা ছমছমানি বাড়ল আবার। লোকটার কথায় ওদের বিদায় দিয়ে ভালো করল কিনা বুঝছে না। নিজের অজ্ঞাতে মুন্‌কের গা ঘেঁষে এগোতে লাগল।

লণ্ঠনটা একটু ধর দেখি। মুন্‌কের বুকের ভিতরটা এবারে আরো বেশি টিপটিপ করছে।

লণ্ঠনটা কেন ধরা দরকার না বুঝেই প্রসন্ন হাত বাড়িয়ে নিল ওটা। তার একটু বাদেই সচকিত। মুন্‌কের একটা ভারী হাত ওর পিঠের ওপর দিয়ে অন্যদিকের কাঁধ বেষ্টন করল। প্রসন্ন তখনো আপত্তি করে নি, গা-ছমছম ভাবটা বরং কমল একটু। ফলে মুন্‌কের লোভ বাড়ল। মোটা হাতের আকর্ষণ আর কাঁধের ওপর দিয়ে আঙুলের উসখুসুনি টের পেতেই প্রসন্ন যেন আর এক বাস্তবে ফিরল। থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকালো।—ওরে ড্যাক্‌রা, আমি মরছি নিজের ভাবনায় আর এই রস করার জন্যে ওই লোকগুলোকে ফিরতে বলা হল?

আরে না না, অন্ধকারে হোঁচট-টোচট খাবি, তাই...

তাই? চাপা তর্জন আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।—আমি কিছু বুঝি না, কেমন? ছাড়ো বলছি, নইলে দেব এই লণ্ঠন দিয়েই—

বাহুবেষ্টনের সাধ জলাঞ্জলি দিয়ে মুন্‌কে সভয়ে তিন হাত সরে গেল।

কিন্তু এই নির্জন আঁধারে এতটা ব্যবধানও খুব কাম্য নয় প্রসন্নময়ীর। তাই আরো রাগ হয়ে গেল। তার ভাবনা-চিন্তার সুযোগ নিয়ে লোকটা অমন করছিল মনে হতেই মেজাজ বিগড়েছিল, নইলে অতটা দপ করে জ্বলে ওঠার কথা নয়। কিন্তু ওই ঝাঁজের পর আবার ফিরে ডাকাও চলে না।

মুখ বুজে কয়েক পা এগোতে মুন্‌কেই আবার আপসের সুযোগ দিল। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুই বড় নিষ্ঠুর পেসন্ন, পুরুষের দুঃখ বুঝিস না—

লণ্ঠন হাতে প্রসন্নময়ী আবার পাশের দিকে ঘেঁষল একটু। কথাবার্তা কইলেও আঁধারের তরাস কমে যেন। শুধু আঁধারের কেন, এর পর কপালে কি আছে কে জানে। কিন্তু এই লোকের সে চিন্তা-ভাবনা নেই কেন কে জানে! হয়ত সত্যিই তেমন ভয়ের কিছু নেই, নইলে এর মত ভীতু মানুষের মগজে এসময়েও এমন কু-বুদ্ধি গজায় কি করে? এই খুনসুটি করার জন্যেই যে লোকটা চাকর তিনটেকে সরিয়েছে তা তার অবাধ্য হাত আর আঙুলগুলোই যেন বলে দিয়েছে ওকে।

গম্ভীর মুখেই জিজ্ঞাসা করল, পুরুষের কি দুঃখ?

ফোঁস করে আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মুন্‌কে।—কি দুঃখ তুই বেশ জানিস।...বড় বড় মানুষ, মুনি-ঋষি, এমন কি ভগবানেরাও এক-একটা মেয়ের জন্য কত কাণ্ড করেছে...আমাকে তুই মিছিমিছি খারাপ ভাবলি...

ছদ্ম কোপ আর অবিশ্বাসের অছিলায় প্রসন্ন আবার নিরাপদ সান্নিধ্যে এগিয়ে এলো।—তুমি একটি আস্ত শয়তান, কোন্ বড় বড় মানুষ, কোন্ মুনি ঋষি আর ভগবানেরা মেয়েদের জন্যে কি করেছে!

ফিরে হাত ধরার লোভ সামলে মুন্‌কে গড় গড় করে জবাব দিল, ইয়ে, কত আছে—মেনকার জন্যে বিশ্বামিত্রের জপতপ গেল, সত্যবতীর জন্য পরাশর দিনকে রাত করে ফেলল, সতী অহল্যার জন্য ইন্দ্র ঠাকুর স্বগ্য থেকে মর্ত্যে নেমে ভোল পালটে ফেললে, দেবগুরু বেস্পতি পর্যন্ত কামনার জ্বালায় বড় ভাই উতথ্য ঋষির বউয়ের সঙ্গে কি পাগলামি করে বসল, আর শ্রীরাধিকার জন্য কেষ্ট ঠাকুরের কাণ্ডকারখানার তো শেষ নেই—তেনাদের তুই শয়তান বলিস?

প্রসন্নর রাগ গেছে, ভয়ও কমছে। অন্ধকারেও হাসি গোপন করা সহজ হল না বলে তাড়াতাড়ি শাড়ির আঁচলে মুখ চাপা দিল।

মুন্‌কের গলায় এবার অভিমান ঝরল।—কেউ শয়তান নয়, ভেতরের যন্তন্নায় ওমনি হয়, বুঝলি?...মুনি ঋষিরাই অমন হলে মানুষের কি হয় তুইই বল্! এই দেখ্ না আমাদের মদন ঠাকুরের মতন গাঁয়ে আর কটা আছে, আর তোর বউমণি তো রূপে তেজে সাক্ষাৎ চণ্ডী-ঠাকরোন—বললে জিভ না খসে যায় আবার—তেনার জন্যেও কিনা দিনকে-দিন অমন মানুষটারও মাথাই বিগড়ে যাচ্ছে...ভেতরের যন্তন্না এমনিই জিনিস, বুঝলি?

বারইয়ারীর দালান আর বেশি দূরে নয়, দুজনের কারোই হুঁশ নেই। প্রসন্নময়ীর দম ফেটে হাসি আসছিল। অন্ধকারে সে ফাঁড়া কাটিয়ে এবারে নিজে থেকেই মুন্‌কের একখানা হাত ধরল। ধরল বটে কিন্তু বউমণির সম্পর্কে ওই উক্তি করার দরুন ছদ্ম ঝাঁজে আর এক দফা ত্রাস সঞ্চারের বাসনা।

কিন্তু তার আগে সত্যিকারের ত্রাসে আচমকা নিজেই আঁতকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মুন্‌কেও।

সামনের অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে কে। মুন্‌কের হাত আঁকড়ে ধরে প্রসন্নময়ী থরথর করে কাঁপতে লাগল। মুন্‌কে রাম-নাম জপছে।

ভূত নয়, ঢ্যাঙা-মত মানুষই একটা।

অন্ধকার ফুঁড়ে এদিকেই চেয়ে আছে। এগিয়ে এলো।

মদনমোহন। এখানে এই রাতে তাকে চেনার পরেও স্তব্ধ দুজনে। মুন্‌কে তো খোলাখুলি বিপক্ষ দলের মানুষ এখন। শোধ নেবার জন্য তাকে যদি হিড়হিড় করে দক্ষিণপাড়ায় টেনে নিয়ে গিয়ে ছিরে পাগলার মত গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে, কে ঠেকাবে? মুখখানাও তো যেন এই অন্ধকারের মতই থমথম করছে মদন ঠাকুরের।

কিন্তু প্রসন্নময়ীর মুখের ওপর আটকে আছে মদনমোহনের দু'চোখ।—এই রাতে তোমরা এখানে কেন?

প্রসন্নময়ীর জিভে সাড় এলো ততক্ষণে। জবাব দিল, ছিনাথ ঠাকুরকে ওঁরা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন শুনে আমাদের বউমণি খুব রেগে গেছেন—আমাকে হুকুম করলেন এক্ষুনি গিয়ে বাঁধন কেটে দিতে। ইয়ে—এই ছুরি নিয়ে তাই যাচ্ছিলাম—

জিভ নড়লেই প্রসন্নর বুদ্ধি খোলে। কোমরে গোঁজা ছুরিটাও বার করে দেখালো।

এই আঁধারেও প্রসন্নর মনে হল মুখখানা ঠাকুরের তেমনি গম্ভীর বটে কিন্তু চোখের কালো তারা দুটিতে যেন হাসি চিকিয়ে গেল একটু।

আচ্ছা তোমরা ঘরে যাও...আর তোমার বউমণিকে বোলো বারইয়ারীর চাঁদা নেবার সময় তাঁর সঙ্গে যে শর্ত হয়েছিল সে আমি ভুলি নি, আর বোলো তাঁর রাগ হয়েছে শুনে আমি খুশি হয়েছি।

অন্ধকারে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল।

প্রসন্ন আর মুন্‌কে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর মুন্‌কের হুঁশ ফিরল প্রথম। কাঁধ ধরে এক হ্যাঁচকা টানে প্রসন্নকে সচকিত করে বলল, শিগগীর পালাই চল্—

প্রথম ধাক্কায় প্রসন্ন পালাবার পথই ধরতে গেল। কিন্তু দু'পা গিয়েই থমকে দাঁড়ালো।...মদন ঠাকুর কোথায় কি উদ্দেশ্যে গেল সেটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। কি বিপত্তি ঘটে এখন কে জানে! মনে হতেই প্রসন্নর বুকের ভিতরে ধুকপুকু। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কৌতূহল। না, তাদের ভয় পেয়ে পালাবার মত কিছুই আর ঘটতে পারে না। খপ করে মুন্‌কের একটা হাত শক্ত করে ধরে ফেলল সে। উত্তেজনায় ফিসফিস করে বলল, যাব কেন, ভয়ের কি আছে, এসোই না—

তাকে এক-রকম হিড়হিড় করে টেনেই নিয়ে চলল। খানিকটা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে গেল। বড় জোড়া-হিজল গাছ দুটোর ফাঁক দিয়ে ওই বকুল গাছ দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কারণ ওটার গুঁড়ির সামনে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। সেই স্তিমিত আলোয় গাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা ছিরে পাগলাকেও দেখা যাচ্ছে।...মদন ঘোষাল নিঃশব্দে তার কাছাকাছি এগিয়ে গেছে।

...অদূরের বারইয়ারীর বাবান্দায় ফরাসের ওপর কেউ চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে, কেউ কুণ্ডলী পাকিয়ে। সেই অবস্থায় নেশার ঘোরে এখনো হাত-পা ছুঁড়ছে কেউ। ছিরে পাগলার দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনেই সম্ভবত রাধানাথ সমেত আরো জনাকতক বসে আছে। কিন্তু লক্ষ্য আর কেউ রাখতে পারছে না। এ-ওর গায় ঠেস দিয়ে দলা পাকিয়ে ঝিমুচ্ছে। ঝাড়লণ্ঠনের জোরালো আলোয় ওখানকার স্পষ্ট দৃশ্যটা উপভোগ্য মনে হতে পারত। কিন্তু তার বদলে নিঃশব্দে মদন ঠাকুর যত এগোচ্ছে ওই বকুল গাছটার দিকে ততো যেন বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ছে প্রসন্নময়ীর।

সজোরে দু'চোখ বুজে সেই থেকে দেহের যাতনা সহ্য করছিল ছিরে পাগলা। গায়ে হাত পড়তে এত চমকে উঠল যে মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদই বেরিয়ে এলো একটা। তার পরেই সচকিত। না, ওরা টের পায় নি মনে হয়।

কোন দিকে না তাকিয়ে মদনমোহন হাতের ধারালো ছুরি দিয়ে মোটা দড়ির বাঁধন কেটে চলেছে। দড়ি চামড়া কেটে বসার দাখিল। তাই সময় লাগছে।

যে বিপত্তির আশঙ্কা প্রসন্নময়ীর, তার থেকেও বেশি কিছুই ঘটে গেল বুঝি।

গায়ে-গায়ে ঠেসাঠেসির অস্বস্তির দরুন হোক বা যে জন্যেই হোক রাধানাথ মাথা উঁচিয়ে সোজা হয়ে বসল একবার। তারপর নেশাটা আরো একটু বিস্মৃতির দিকে ঠেলে দেবার জন্যে সামনের বোতলটা তুলে মুখে ঠেকালো। সেই সঙ্গে দু'চোখ আপনা থেকেই বকুল গাছটার দিকে ঘুরল একবার। তারপর দু'চোখ টান করে ব্যাপারখানা বুঝতে চেষ্টা করল।...একটার বদলে দুটো মানুষ দেখছে যেন।

কে? কে ওখানে?

সাঙ্গোপাঙ্গরাও ধড়মড় করে উঠে বসতে চেষ্টা করল। তারপরেই রাতের স্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল।—কে? কে? কে ওখানে? কোন্ শালা—

মদের বোতল হাতে স্খলিত পায়ে রাধানাথ ছুটে আসতে চেষ্টা করল। পিছনে সঙ্গীরা।

মদনমোহন তখন নীচু হয়ে পায়ের দিকের বাঁধন কাটছে। আর কটা মিনিট সময় পেলে কাজটা নির্বিঘ্নে সমাধা হত।

রাধানাথের এক হাতে বোতল, মদমত্ত আক্রোশে অন্য হাতে মদনমোহনের চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলতে চেষ্টা করল তাকে।

জোরালো আলো থেকে এই আবছা অন্ধকারে ছুটে আসার দরুন হোক অথবা নেশার কারণে হোক, তার সাগরেদরা হঠাৎ ঠাওর করে উঠতে পারল না লোকটা কে। তারা চিৎকার করে উঠল, মেরে ফেলো রাধানাথ, খুন করে ফেলো শালাকে—

পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে তবে মদনমোহন সোজা হয়ে দাঁড়াল। রাধানাথের সঙ্গীরা তখনই শুধু টের পেল শালাটি কে। কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ় সকলে।

এতক্ষণের যাতনা আর ধকলের ফলে ছিরে পাগলার স্নায়ু আত্মস্থ নয়। ওদের এই বিভ্রমের ফাঁকে ত্রাতাকে ফেলেই দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যের মতই একছুটে অন্ধকারে মিশে গেল সে।

নিমেষে দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি মাথার মধ্যে তোলপাড় শুরু করল রাধানাথের। এক হাতে তখনো মদনমোহনের চুলের মুঠি ধরা। ক্ষিপ্ত আক্রোশে অন্য হাতের মদের বোতল দিয়েই সজোরে মাথায় মেরে বসল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে বোতলটার আধখানা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল।—তুই? তোর এত সাহস? আজ তোকে এখান থেকে জ্যান্ত ফিরতে দেব ভেবেছিস—এত সাহস তোর? সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা বোতলের বাকি আধখানা দিয়ে আবার কপালে আঘাত করে বসল সে।

পরমুহূর্তে অচমকা রাগ আর নেশা দুই-ই একসঙ্গে ছুটে গেল বুঝি। শুধু তার নয়, সাগরেদদেরও।

সমস্ত মুখ রক্তে ভাসছে মদনমোহনের। কপাল কেটে আর মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে। গায়ের জামাটা লাল হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মুখ দিয়ে যাতনার একটু শব্দও বার করে নি মদনমোহন। সোজা রাধানাথের মুখের দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ কেমন ঘাবড়েই গেল রাধানাথ। টলতে টলতে দ্রুত দাওয়ার দিকে চলল। আরো বেশি ঘাবড়ে সঙ্গীরাও অনুসরণ করল তাকে।

তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে আছে মদনমোহন। দেখছে ওদের।

আর রক্তে ভাসছে।

॥ ২৪ ॥

খুব একটু একটু করে পূর্ব-আকাশের গা থেকে কালোর দাগ মুছে যেতে লাগল।

খুব একটু একটু করে রাতের জমাট-বাঁধা অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতে লাগল।

খুব একটু একটু করে ভোরের বার্তা ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

শেষে ভোর হল।

রোজই হয়। কিন্তু ঠিক এমন করে হয় কিনা চণ্ডীবউ জানে না।

এত বড় রাতটা ঠায় জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কেটে গেল। স্নায়ুর ওপর দখল হারালে বিনিদ্র রজনী যাপন এই প্রথম নয়। কিন্তু চণ্ডীবউ তখনো যুঝতে পেরেছে। নির্মম হোক বা কঠিন হোক, কিছু একটা সঙ্কল্পে দানা বেঁধে উঠতে পেরেছে।

কিন্তু সদ্য গত এই এক অন্ধকার রাতের বোঝা একেবারে স্বতন্ত্র। না, অন্ধকারের আর ছিটেফোঁটাও নেই কোথাও। ভোরের শুচি আলোয় ঘরের ভিতরসুদ্ধ স্নান করছে এখন। কিন্তু চণ্ডীবউয়ের স্নায়ুতে-স্নায়ুতে এখনো ওই এক রাতের আঁধারের গলানো স্রোত বইছে। এ আঁধার জীবনে আর ঘুচবে কিনা জানে না।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে প্রসন্ন রাতের ঘটনার আদ্যোপান্ত জানিয়েছে তাকে। বলতে বলতে ও বার বার শিউরে উঠেছে। কিন্তু চণ্ডীবউ নির্বাক স্তব্ধ। কি বলছে, কি শুনছে তাও যেন ভালো করে জানে না।

কিন্তু শুনেছে ঠিকই। ওর প্রত্যেকটা কথা কানের পর্দা ছিঁড়েখুঁড়ে মগজে বিঁধেছে, বুকে বিঁধেছে। যত বিঁধেছে ততো নির্বাক, ততো স্তব্ধ চণ্ডীবউ।

তারপর পলে পলে এই রাত কেটেছে।

...একটা মানুষ, পুরুষ মানুষ সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করে আশ্রিতজনের উদ্ধারে এসেছিল। একদল মত্ত শত্রুর সামনে তাকে উদ্ধার করেছে। সেই শত্রুদের প্রধান তার ঘরের মানুষ। নিজের আওতার মধ্যে তাকে একলা পেয়ে সে তাকে কাপুরুষের মত নির্মম নৃশংস আঘাত করেছে। এমন আঘাত করেছে যে, প্রসন্নর কথা সত্যি হলে এতক্ষণে কি অঘটন ঘটে গেছে ঠিক নেই। কিন্তু সে আঘাতের পরেও ওই পুরুষমানুষ আর্তনাদ করে ওঠে নি, আর্ত ত্রাসে ছুটে পালিয়ে যায় নি। দাঁড়িয়ে রক্তস্নান করেছে আর মত্ত ঘাতকদের দেখেছে। ভীরু কাপুরুষেরা তাইতে ঘাবড়েছে। আর তারাই তার সামনে থেকে পালিয়েছে।

...বাড়ি থেকে ছুটে বেরুতে ইচ্ছে করছিল চণ্ডীবউর। বিপর্যয় কতখানি ঘটে

গেল নিজের চোখে দেখার তাড়না। দেখতে পারবে। এমনি স্থির অবিচল দাঁড়িয়েই দেখতে পারবে। আঘাত দেখতে নয়, ঘরের মানুষ কোন্ স্তরে নেমে থাকতে পারে তার নজির স্বচক্ষে দেখলে তবে বুঝি নিজের নরকবাসের চিত্রটা সম্পূর্ণ হবে।

কিন্তু চণ্ডীবউ ঘরের বউ। রাত ছেড়ে দিনের আলোতেও এই চিত্র দেখতে ছোটা সম্ভব নয়।

...প্রসন্নকে বলেছিল, বারইয়ারীর চাঁদা নেবার শর্ত ভোলে নি। প্রসন্ন না বুঝুক এ-কথার তাৎপর্য চণ্ডীবউয়ের থেকে ভালো কেউ জানে না। ওই দুঃসাহসী লোকটা বাড়ি বয়ে চাঁদা চাইতে আসতে দস্তুরমত একটা কড়ার করেই চাঁদা দিয়েছিল চণ্ডীবউ। দুই বারইয়ারীর রেষারেষিতে এখানকার একটি লোকেরও কোনরকম ক্ষতি হবে না—এই কড়ারে দিয়েছিল। চণ্ডীবউয়ের বিশ্বাস নিজের অমন একটা ক্ষতি হতে পারে জেনেই শ্রীনাথকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য শত্রুর এলাকায় একলা এসে দাঁড়িয়েছে।

...তারপর কাপুরুষের আঘাতে নিজে রক্তস্নান করে চণ্ডীবউয়ের দিকে একটা নির্মম পরিহাস ছুঁড়ে দিয়েছে।

দাঁড়িয়েই ছিল। নীচে ফটকের দিকে মানুষের গলা। চণ্ডীবউ সামান্য ঝুঁকে তাকালো।

জনা পাঁচ-ছয় সঙ্গী পরিবৃত হয়ে রাধানাথ ফিরল। পা টলছে এখনো। প্রথম ভোরের এই আলোয় জাগা তার পক্ষে স্বাভাবিক নয় খুব। অন্দরের দরজার কাছাকাছি এসে সঙ্গীরা অস্ফুট স্বরে কি-সব যেন বলে চলে গেল। রাধানাথ ভিতরে কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে লাগল। তাকে দেখা মাত্র চণ্ডীবউয়ের কেমন মনে হল লোকটা ভয় পেয়েছে। আর সেই জন্যেই সঙ্গীদের প্রহরায় এমন সাত সকালে ঘরে ফিরেছে।

কোনরকম ষষ্ঠ চেতনার অনুভূতি কিনা বলা যায় না, ঠিক নিজের ঘরের নীচে এসে ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকালো রাধানাথ। রাত-জাগা ঘোলাটে চোখ। সঙ্গে সঙ্গে হকচকিয়ে গেল একটু। ওপর থেকে একপ্রস্থ তপ্ত গলিত ঘৃণা যেন সজোরে তার মুখের ওপর আঘাত করল।

হ্যাঁ, এত ঘৃণা চণ্ডীবউ বুঝি আর কোনদিন তাকে করে নি। এত ঘৃণা চণ্ডীবউ আর কোনদিন কাউকে করে নি।

দোতলায় উঠে রাধানাথ ঘরের ভিতর দিয়ে ফালি-বারান্দার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। নীচে থেকে যা দেখল সেটা চোখের ভ্রম কিনা সেই সংশয়। তার পায়ের শব্দ পেয়েও চণ্ডীবউ ঘুরে দাঁড়ায় নি। সামনের দিকেই চেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়িতে পা দিয়ে নিজস্ব মেজাজে ফেরার চেষ্টা রাধানাথের। তরল পরিহাসের সুরে বলে উঠল, সখীর বুকের তলায় কেন্ বেদনা উথলে উঠল, এই সকালে কার আশায় দাঁড়িয়ে গো—আমার নাকি?

খুব আস্তে আস্তে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল চণ্ডীবউ। না, চোখের ভ্রম নয় রাধানাথের, সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণার সেই উদগ্র ঝাপটা মুখের ওপর আঘাত করল তার। অবিশ্বাস্য, অফুরন্ত। রাধানাথ হকচকিয়ে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

তারপরেই মনে হল রাতের ঘটনা বউ জানে। সেই কারণেই হঠাৎ এত ঘৃণা এত বিদ্বেষ। কিন্তু অত রাতে কে ওকে খবর দিল, আর এত ভোরে তো করণের

মানুষ ভালো করে চোখ মেলে তাকায় নি—জানল কি করে! অন্যায়ের সমর্থন জুটলে ভীরু মন সবল হয়, না পেলে নৃশংস হয়ে উঠতে চায়। রাধানাথের চাউনিটা অসহিষ্ণু হিংস্র হয়ে উঠতে লাগল। বিকৃত গলায় বলে উঠল, কাল রাতে নাগর তোমার রক্তের স্বাদ টের পেয়েছে, বুঝলে? নিজের রক্তের—ছিরেকে ছাড়াতে এসে নিজের অর্ধেক খুইয়ে গেছে—ওই ভাঙা মাথা আর ফাটা কপাল নিয়ে বাছাধনকে এ-জীবনে আর ফোঁসফোঁস করতে হবে না—বুঝলে?

ঘৃণা বিদ্বেষ উপচে ওঠা চণ্ডীবউয়ের নিশ্চল কঠিন দুই চোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে শুধু।

রাধানাথের মনের তলায় সংশয় যেন সাপের মত কুণ্ডলী পাকাতে শুরু করেছে। সামান্য এগিয়ে এলো। খবরটা জানে যে তাতে আর এতটুকু সন্দেহ নেই।—কি ব্যাপার, মাঝরাতের অমন খবরখানাও জেনে বসে আছ মনে হচ্ছে? নাগর নিজেই এই মূর্তিখানা দেখিয়ে সেবা-টেবা আদায় করে গেছে নাকি?

চণ্ডীবউ তেমনি নিষ্পলক, তেমনি নিশ্চল।

বিকৃত সন্দেহে রাধানাথ ওই মুখখানা যেন কেটে কেটে দেখতে লাগল। ঈর্ষার বুনটে মনের তলায় যে সন্দেহ অনেক দিন ধরে দানা বেঁধে উঠেছিল চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে আজ সেটাই যেন গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল। খপ করে তার একখানা হাত ধরে নির্মম গলায় জিজ্ঞাসা করল, তুমি জানলে কি করে?

জবাব না পাবার ফলে হাতের ওপর চাপ বাড়তে লাগল। গলার স্বর আরো ঘোরালো আরো ধারালো।—আমি জানতে চাই অত রাতের ব্যাপারখানা এরই মধ্যে তুমি জেনে বসে থাকলে কি করে?

এ যাবৎ অনেকবার যা ঘটেছে, আজও সেই পরিণতি। বউয়ের নিশ্চল সঠিক মুখখানা হঠাৎই সেই কি-যেন-এক অলৌকিক প্রাণের শিখায় জ্বলতে শুরু করেছে। তার রক্তিম আভা আর তাপ রাধানাথের চোখে-মুখে ঠিকরে পড়ছে। বউয়ের এই মূর্তি দেখে সে অনেকবার কুঁকড়ে গেছে, সভয়ে অনেকবার দূরে সরে গেছে। আলোয় স্পর্শ কাতর কীটের মত আজও সেই দশা তার। আবার সেই সঙ্গে বহুবারের ওই পরাভূত অবস্থা থেকে নিজেকে টেনে তোলারও চেষ্টা—কি, গিলবে নাকি আমাকে, অমন করে দেখছ কি?

...তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ত্রস্তে হাত ছেড়ে দিল রাধানাথ। বউয়ের এই ঘোষণার মধ্যে আচমকা একটা শেষের ছায়া দেখল বুঝি। একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ যেন ধাক্কা দিয়ে সরালো তাকে। সত্রাসে চেয়ে রইল খানিক। কথা কটা রক্ত-মাংসের কোনো রমণীর কি আর কারো তাও সঠিক ঠাওর করা যাচ্ছে না। ভিতরে আড়াল নেবার তাগিদ, বাইরে পরাজিত পৌরুষের শেষ দম্ভ।—আচ্ছা সমস্ত রাত জেগে ক্লান্ত এখন, দিন কার ঘনিয়েছে পরে খবর নেব!

ঘরে ঢুকে গেল। একটু দূর থেকেই দেহটা যেন পালঙ্কের শয্যার ওপর ছুঁড়ে দিল।

ধীরপায়ে চণ্ডীবউও ঘরে এসে দাঁড়াল। চেয়ে দেখল। ও-দিক ফিরে আছে। এই ভীরু প্রতিক্রিয়া তার চেনা। জানা। তবু দেখছে।

দিনের আলো খরখরে হয়ে উঠছে। ঘরে রোদ ঢুকেছে।

কিন্তু চণ্ডীবউয়ের বুকের তলায় রাতের ওই দুঃসহ অন্ধকারের বোঝা তেমনি থিতিয়ে আছে।

বিকেলের মধ্যে প্রসন্নর সঙ্গেও একটি কথার বিনিময় হয় নি চণ্ডীবউয়ের। দূর থেকে লক্ষ্য করেছে ঘরের লোকে কি জেরা করছে ওকে। আধ-হাত ঘোমটা টেনে প্রসন্নময়ীকে বারকয়েক ডাইনে-বাঁয়ে আর দুই-একবার সোজাসুজি মাথা নাড়তে দেখেছে। কথা কিছু বলে থাকলেও কানে যায় নি।

তারপর যেন পরিত্রাণ পেয়ে হাঁপ ফেলে বেঁচেছে প্রসন্নময়ী। চাপা উত্তেজনা নিয়ে চণ্ডীবউয়ের সামনে ঘুরঘুর করেছে। কিছু বলার আগ্রহ। কিন্তু চণ্ডীবউয়ের কিছুমাত্র শোনার আগ্রহ নেই। কি জিজ্ঞাসা করছিল জানে। রাতের খবরটা বউ জানল কি করে সেই কাঁটা বিঁধে ছিল। সেটার নিরসন হয়েছে বোধ হয়। হয়েছে কিনা কে জানে। হোক না হোক চণ্ডীবউ নির্লিপ্ত, কঠিন।

কিন্তু ভিতরটা তার অতটা নির্লিপ্ত নয়। চোখ সজাগ, দু'কান উৎকর্ণ। নীচের ঝি-চাকরেরা চাপা গলায় কথা বললেও ওপর থেকে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করেছে। চরম দুঃসংবাদ কানে আসে কিনা শুনতে চেষ্টা করেছে। সন্ধ্যার দিকে প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা না করে পারল না—ওদিকের খবর শুনেছিস কিছু, আছে না গেছে?

প্রসন্নময়ী খবর যা দিল তার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বুকের থেকে একটা পাথর নামল যেন। গালে হাত দিয়ে প্রসন্নময়ী দু' চোখ কপালে তুলল।—বলব কি গো বউমণি, কাল অমন রক্তে ভাসাভাসি কাণ্ড দেখে আমি তো ভেবেছিলাম সকালের মধ্যেই সব-শেষ হবে—কিন্তু কি কঠিন প্রাণ দাদাঠাকুরের কে জানে! শুনলাম কপালে মাথায় ফেটি বেঁধে আজ বিকেলই নাকি ঘুবে বেড়াচ্ছে।

চণ্ডীবউয়ের ত্রাস কমল বটে, অশান্তির বিন্দুমাত্র লাঘব হল না। মাথাটা তার এত হেঁট হয়ে গেছে যে সে-যাতনা কেউ বুঝবে না। ঘরের ওই মানুষ তো নয়ই।

তার অনুমান মিথ্যে নয়। ভিতরে ভিতরে রাধানাথ বেশ ভয় পেয়েছে বোঝা যায়। শত্রুপক্ষ এরপর চুপ করে বসে থাকবে না ধরেই নিয়েছে। চার পাঁচ দিনের মধ্যে বাড়ির চৌহদ্দি পেরুলো না। অন্তরঙ্গ দু'চারজন সাগরেদ বাড়িতেই এসেছে। রাধানাথ সাগ্রহে নীচে নেমে এসেছে। নীচে বসে অনেকক্ষণ ধরে তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেছে। বুকের তলায় দুর্ভাবনা থিতিয়ে আছে, সেটা আরো বেশি বোঝা গেছে রাত্রিতে। বেপরোয়ার মতো ঘরেই মদের বোতল খুলে বসেছে। দুনিয়ার কাউকে সে কেয়ার করে না এটাই বোঝাতে চায়। যেটুকু বোঝবার চণ্ডীবউ বুঝে নেয়। আগে হলে সে-সময় ঘরের ত্রিসীমানা মাড়াতো না। কিন্তু এখন সোজা ঘরে আসে, সামনে দাঁড়িয়ে দেখে। একটি কথাও বলে না।

নেশার ঝোঁকে তখন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে চেষ্টা করে রাধানাথ। হয়তো বা ভয়ও তরল হয় একটু। ফলে আস্ফালন বাড়ে। বলে, এ দুনিয়ায় কাউকে পরোয়া করে না সে, কা-উ-কে না। নেশা জমে উঠতে সেদিন বউয়ের হাত ধরে বীরপুরুষের মতই বিছানার দিকে টানতে চেষ্টা করেছিল। বেশি দরকার হয়

নি, একটু জোরে ঠেলে দিয়ে চণ্ডীবউ হাত ছাড়িয়ে নিতেই টলতে টলতে ধুপ করে আবার বিছানায় গিয়ে পড়েছে। বউয়ের মুখের সেই নিঃশব্দ গনগনে তাপে নেশার গরম ফিকে হবার দাখিল। ফলে আস্ফালন আরো জোরদার করতে হয়েছে। বলেছে, তোমার নাগরকে আমি দেখে নেব, আর সেই সঙ্গে তোমাকেও—বুঝলে? ওই প্রথম বউয়ের হাল কি হয়েছিল শোনো নি? সাবধান বলে দিলাম—সাবধান!

আগেও একবার ষষ্ঠীচরণকে দেখা করার জন্য খবর পাঠিয়েছিল রাধানাথ। নিরাপত্তার জন্য তাকেই সব থেকে বেশি দরকার এখন। কিন্তু ষষ্ঠীচরণ আসতে পারে নি। তার জ্বর চলেছে। শুনে অসহিষ্ণু রাধানাথের ইচ্ছে করেছে জল ঢেলে তার জ্বর ঠাণ্ডা করে দেয়। সেদিনও শুনল ষষ্ঠীচরণের জ্বর কমে নি।

তারপর দিন সকালের দিকে ষষ্ঠীচরণের দুটি জোয়ান গোছের শিষ্য বাড়ি এসে হাজির। সঙ্গে রাধানাথের দু'জন অন্তরঙ্গ সাগরেদ। শিষ্য দুটি যা নিবেদন করল তার সারমর্ম, গুরুজী এখনো বিছানা ছেড়ে উঠে আসতে পারছে না। তাই দাদাবাবুকে নিয়ে যাবার জন্য তাদের পাঠিয়েছে, বলেছে, জরুরী কথা আছে অবশ্য যেন আসেন। পথে আসতে দাদাবাবুর বন্ধু দুটির সঙ্গে দেখা হতে তাদেরও নিয়ে এসেছে।

শুনে উত্তেজনা আর শঙ্কায় রাধানাথের বুকের ভিতরে দাপাদাপি শুরু হল। বিশেষ কারণ ভিন্ন ষষ্ঠীচরণের এভাবে লোক পাঠাবার কথা নয়। তবু জিজ্ঞাসা করল, কি জন্যে যেতে বলেছে তোমরা কিছুই জানো না?

তারা মাথা নাড়ল। খুব জরুরী কথা আছে ভিন্ন গুরুজী আর কিছুই বলে নি।

বন্ধুদের এ-পাশে ডেকে রাধানাথ আলাপ করে নিল একটু। যাওয়াই উচিত। এই দিনমানে ভয়ের আর কি আছে। সাগরেদ দুটিও তো সঙ্গেই থাকছে। তাছাড়া ষষ্ঠীচরণের দুই শিষ্যের দিকে চেয়েও ভরসা বাড়ল। আশপাশের দু'পাঁচটা গাঁয়ের অমন অনেক জোয়ান মরদ ষষ্ঠীচরণের শিষ্য মনে হতে রাধানাথের মনের বল দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তবু ঠোঁটে হাসি ফুটিয়েই জিজ্ঞাসা করল, আসার সময় কেউ ওঁত পেতে আছে দেখলে না তো?

তারা মাথা নাড়ল। তারপর চোখে সামান্য হাসি ছড়িয়ে ইশারায় নিজেদের কোমরের দিকটা দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ ফতুয়ার নীচে কোমরে মাল গোঁজা আছে, কেউ কাছে এলে তার অব্যাহতি নেই। তাছাড়া দাদাবাবুর আমবাগানের ভিতর দিয়ে গেলে কতটুকু আর পথ!

অতএব দু'দিকে দুই শিষ্য আর দুই সাগরেদ নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে রাধানাথ পিছনের আমবাগানের ভিতর দিয়ে চলল ষষ্ঠীচরণের সঙ্গে দেখা করতে।

পথ খুব কম নয়, আর নির্জন বাগানখানাও ছোট নয়। বাগানের চার ভাগের তিন ভাগ পথ অতিক্রম করতেই আচমকা অন্তরাত্মা সুদ্ধ কেঁপে উঠল রাধানাথের। তার সাগরেদ দুটিরও। বড় ঝাঁপা অশথ গাছটা পেরুতেই কোথা থেকে ভুঁই ফুঁড়ে যেন চারটে ষণ্ডা গোছের লোক মাথার ওপর ঝক্‌ঝকে ছোরা উঁচিয়ে ছেঁকে ধরল তাদের। অস্ফুট আর্তনাদ করে রাধানাথ ষষ্ঠীচরণের শিষ্য দুটির দিকে তাকিয়ে দেখে ধারালো ছোরা উঁচিয়ে ধরেছে তারাও, কিন্তু শত্রুর দিকে নয়, তারই দুই সাগরেদের মাথার ওপর।

তখনি বোঝা গেল তারা আর যে-ই হোক ষষ্ঠীচরণের শিষ্য নয়।

ওই ছোরার মতই ধারালো গলায় একজন শাসিয়ে উঠল, একবোরে চুপ, টুঁ-শব্দটি করলে তিনজনকেই একেবারে টুকরো টুকরো করে মাটিতে পুঁতে ফেলব—কাক-পক্ষীতেও টের পাবে না।

রাধানাথ আর তার দুই সঙ্গী মুহূর্তের মধ্যে বোবা পাথর একেবারে।

দেখতে দেখতে তিনজন লোক মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে রাধানাথকে আষ্টেপৃষ্ঠে কষে বেঁধে ফেলল। আর বাকি তিনজন সাগরেদ দুটির মাথার ওপর ছোরা উঁচিয়ে থাকল। শিষ্যদের একজন চাপা উল্লাসে বলে উঠল এই শালা টোপ দুটোকে হাতের মধ্যে না পাওয়াতে কাতলাটাকে ধরতে দু'দিন দেরি হয়ে গেল।

বন্ধন-কার্য সম্পন্ন হতে একজন জিজ্ঞাসা করল, এখন এই দু'ব্যাটার কি ব্যবস্থা করি?

আর একজন জবাব দিল, কেটে-কুটে মাটিতে পুঁতে ফেলা যাক।

দুই সাগরেদ ডুকরে উঠে হাত জোড় করল।

তৃতীয় আর একজন উদার ছাড়পত্র দিল, থাক্ যেতে দে, মদন ঠাকুর গায়ে হাত তুলতে নিষেধ করেছে। চতুর্থজন তাদের মাথার ওপর আর এক দফা ছোরা উঁচিয়ে শাসালো, তোমাদের পিছনে সর্বদা ছায়ার মতো লোক ঘুরছে, ভালো ছেলের মতো সোজা বাড়ি চলে যাও কারো কাছে মুখ ফুটে কিছু বলেছ কি—

বাকিটুকু ছোরার ডগা বুকে ছুঁইয়ে বুঝিয়ে দিল।

ছাড়া পেয়ে তারা চোঁ-চাঁ দৌড়। প্রাণ সত্যিই বাঁচল তখনো বিশ্বাস করতে পারছে না।

আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় রাধানাথ যেন বোবা পুতুল বনে গেছে একেবারে। তার চিন্তাশক্তিও লোপ পেয়ে গেছে। লোকগুলো কি করছে বা কি করবে তাও বুঝছে না। দুজন প্রকাণ্ড একটা বস্তার মুখ ফাঁক করে ধরল, আর বাকি ক'জন আলতো করে তাকে তুলে ধরে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। একজন রসিকতা করে বলল বস্তায় ছ্যাঁদা আছে ভয় নেই দম বন্ধ হয়ে মরবে না—তবে নড়াচড়া করেছ বা গণ্ডগোল পাকাতে চেষ্টা করেছ কি মদন ঠাকুরের হুকুম, একেবারে শেষ করে বস্তাসুদ্ধ কানা-দামোদরে পুঁতে ফেলতে হবে।

রাধানাথ তেমনি বোবা, তেমনি সম্বিৎশূন্য।

বস্তার মুখ বেঁধে ফেলা হল। ধরাধরি করে কাঁধে তোলা হল। তার শরীরের ওজন নিয়ে অস্ফুট কটূক্তি শোনা গেলো। খানিক বাদেই তাকে বড়সড় একটা ঝুপড়ির মধ্যে ফেলা হল টের পেল। পরক্ষণে শেষ বোধশক্তিটুকুও বিলুপ্ত যেন। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ হট্-হট শব্দে গোরুর গাড়ি চলতে লাগল।

...রাধানাথ গোরুর গাড়িতে চলেছে।

অকস্মাৎ যেন সমস্ত চেতনা একসঙ্গে ফিরে এলো আবার। মুহূর্তের মধ্যে স্নায়ুতে স্নায়ুতে ঝড় একপ্রস্থ' দিনমানে খোলা সড়কের ওপর দিয়ে এরা কোন্ রসাতলে টেনে নিয়ে চলেছে তাকে?

যে-করণে কিছু ঘটার আগে গুজব রটে—সেখানে এত বড় একটা ব্যাপার দুপুর গড়াবার আগে কেউ টেরই পেল না। তারপর আচমকা বিস্ফোরণের মতই ফেটে পড়ল খবরটা।

এই পর্বও জমে উঠল মদন ঘোষালের ইঙ্গিতে। চাপা কানাকানি উদগ্র হয়ে উঠতে আধ-ঘন্টাও সময় লাগল না। আর গোপনতার প্রয়োজন নেই মদনমোহনের। এযাবৎ সে যেমনটি চেয়েছিল ঠিক তেমনিই হয়েছে।

যে শুনল সে-ই বিমূঢ় প্রথম। তারপরেই শিউরে উঠল। ...সেই সকাল থেকে দত্তবাড়ির রাধানাথ নিখোঁজ। তাকে গুম করে আনা হয়েছে ওই ঘোষালবাড়িতে? রক্তের বদলে রক্তের বন্যা বইবে সেখানে! বইবে না বইছে? নির্মম প্রতিশোধ নেওয়া হবে! নেওয়া হবে না নেওয়া হয়েই গেছে এতক্ষণে?

ওই তো ভাঙা-দেয়াল-ঘেরা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে নির্বিলিক তপস্বীর মতো। কিন্তু ওটার আশপাশে আজ লোক ঘেঁষছে না কেন?

বহু লোকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে দেখছে আর জটলা করছে। চকিত দিশেহারা ভাব সকলের।

অস্ফুট আর্তনাদ করে প্রসন্ন ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, সব্বনাশ হয়েছে বউমণি, দাদাবাবুকে সেই সকালে মদন ঠাকুরের দল ধরে নিয়ে গেছে—কি সব ছাইভস্ম শুনছি, সব্বনাশ বুঝি এতক্ষণে ঘটেই গেল গো!

বলা বাহুল্য, দত্তপাড়ায় যখন খবরটা এসেছে রটনা তখন প্রাণান্তর উপসংহারে এসে ঠেকেছে। অর্থাৎ প্রতিশোধের নির্মম পরিসমাপ্তি ঘটেই গেছে।

চণ্ডীবউ চমকে উঠল বটে কিন্তু ব্যাপারটা বোধগম্য হল না খানিকক্ষণ পর্যন্ত। তারপর নির্বাক বহুক্ষণ। শেষে তার নির্দেশে লোক ছুটল রাধানাথের সেই দুই সঙ্গীর বাড়িতে, সকালে যারা এখানে এসেছিল। যে খবর এলো তারপর আর অবিশ্বাসের কিছু নেই।

তবু প্রাণপণে অবিশ্বাস করেছে চণ্ডীবউ। সমস্ত অন্তর দিয়ে অবিশ্বাস করছে। এ হতে পারে না, এমন হতে পারে না।

সমস্ত মুখে যেন আগুনের আঁচ লেগেছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল একসময়। প্রসন্নকে বলল, পাল্কি ঠিক করতে বল্, আমি বেরুবো এক্ষুনি।

খানিকক্ষণের মধ্যে করণের পথের মানুষ ছেড়ে বাড়ির মেয়েবুড়োরাও দোরগোরায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

লাল পাল্কি চলেছে দক্ষিণপাড়ার দিকে।

সঙ্গে দরোয়ান নয় পাইক নয় বরকন্দাজ নয়—শুধু চার বেয়ারা ওই চোখ ধাঁধানো লাল পাল্কি বয়ে নিয়ে চলেছে।

সেই সকাল থেকেই রাধানাথ শেষের মুহূর্ত গুনে চলেছে বটে, কিন্তু শেষ সত্যিই এখনো হয়নি। তবে যে-কোন মুহূর্তেই হয়ে যেতে পারে।

বাইরের দুটো ঘর ছেড়ে ভিতরের ঘরে এনে বস্তা থেকে বার করা হয়েছে রাধানাথকে। তখন থেকেই দেহে প্রাণটুকুই শুধু ধুকপুক করছে। তাকে শুনিয়ে মদন ঘোষাল চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করেছে, কেউ টের পায় নি তো?

কাজ যারা হাঁসিল করেছে তারা সমস্বরে বলেছে, কেউ না, দাদাবাদুর দুটি বন্ধু ছাড়া আর কেউ না—তা তুমি যেখান থেকে খুশি চামড়া ছাড়াতে পারো,

তারা মুখে রা কাটবে না...আর বলো তো রাতেই ওই দুটোকে খতম করে দিয়ে আসি—

একটু চিন্তা করে মদন ঘোষাল বলল, সেই ভালো শত্রুর শেষ রেখে কাজ নেই।

ঘরের মধ্যে দক্ষিণপাড়ার অনেক বাছাই-করা মাতব্বরদের দেখল রাধানাথ। তাদের প্রত্যেকের মুখ সাক্ষাৎ যমের মুখ। সব থেকে বেশি নির্দয় ছিরের মুখ। তার চিবুকে বেশ জোরেই একটা ঠোনা মেরে বলে উঠল, কি গো বীরপুরুষ, এবার তোমার ধড়ে মাথাখানা উঁচিয়ে রাখবে কোন্ ঠাকুদ্দা?

ভয়ে-ত্রাসে থরথর কাঁপছে রাধানাথ। ভিতরটা ডুক্‌রে কেঁদে উঠতে চাইছে কিন্তু গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরুচ্ছে না।

তাকে ধরে ঘরের মাঝখানে নিয়ে আসা হল। তারপর নিজে হাতে করে মদনমোহন বাঁধনগুলো খুলে দিতে লাগল। অনেকে হাঁ-হাঁ করে উঠতে সে জবাব দিল, এর ভিতর থেকে ও পালাতে পারলে আমাদের গলায় দড়ি—বাঁধার দরকার কি।

মুখে গোঁজা কাপড়ও টেনে নিয়ে কাঁধ চেপে সকলের মাঝে বসিয়ে দিল তাকে।—এবারে তোমরা বিচার করো, আমার আর কিছু বলার নেই।

তক্ষুনি বিচার-সভা বসল। এক মদন ঘোষাল বাদে বিচারক সকলেই।

তারা একবাক্যে রায় দিল, বিচার তো হয়েই গেছে, এখনো তোমার মাথা আর কপালের রক্তে চার-ভাঁজ ফেটি লাল হয়ে আছে, ব্রাহ্মণের রক্ত, এর একটাই প্রতিশোধ আমরা জানি—সূর্যের মুখ দেখা আজই ওর শেষ।

মদন ঘোষাল চুপ। আপত্তি করল না।

অতঃপর আলোচনা শুরু হল প্রতিশোধটা কি-ভাবে নেওয়া হবে। কেউ বলল, এই বাড়িতেই জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হোক, কেউ বলল, আধখান পুঁতে ছাল চামড়া ছাড়ানো হোক, আবার কেউ বলল, কেটে টুকরো টুকরো করে আবার বস্তায় পুরে কানা দামোদরে ভাসিয়ে দেওয়া হোক। এই নিয়েই মত-বিরোধ দেখা দিল, বিতর্ক চলল। রাধানাথ শুনছে আর ফ্যালফ্যাল করে এক-একজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে। শরীরটা ক্রমে অসাড় হয়ে আসছে তার।

শেষে মদন ঘোষাল বলে উঠল, প্রতিশোধের জন্য যা-ই করা হোক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথির অনাদর চলবে না। অতএব আগে দুপুরের আহারাদি সম্পন্ন হোক, তারপর আবার আলোচনায় বসা যাবে।

ছিরে পাগলা সোচ্ছ্বাসে সায় দিল, সেই ভালো, বলির পাঁঠাকে পর্যন্ত একটু ঘাস-জল খাইয়ে নিতে হয়।

আহারের ব্যবস্থা শুধু অতিথির নয়, উপস্থিত সকলেরই। তবে তারই মধ্যে অতিথির একটু বিশেষ ব্যবস্থা। কিন্তু রাধানাথ খাবে কি, সে যেন পুতুল একখানা।

গম্ভীর মুখে উপদেশ দিল মদন ঘোষাল, হাত গুটিয়ে বসে থেকো না, খেয়ে নাও—জীবন-মৃত্যু ও তো মায়ার খেলা।

বিমূঢ় মুখে রাধানাথ চেয়ে রইল তার দিকে।

এদিক থেকে ছিরে পাগলা ঝাঁজিয়ে উঠল, খাবার সামনে নিয়ে আমরা সঙের মতো বসে থাকব!...পাঁচ গুনতে গুনতে তুমি খাবারের থালায় হাত দেবে কিনা?

রাধানাথ চমকে তাকালো তার দিকে, তারপর তাড়াতাড়ি খেতে লাগল।

খাওয়াদাওয়ার পর তাকে মাঝখানে বসিয়ে দণ্ডের প্রয়োগ-বিধি নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। এবং সেই তর্ক এই বিকেল পর্যন্ত চলেছে।

হঠাৎ বিচারকরা সকলেই সচকিত একটু। বাইরে থেকে এক ছোকরা এসে মদন ঘোষালের কানে কানে বলল কি। তারপরেই মুরুব্বীর চোখের ইশারায় ঘরের চার-পাঁচজন উঠে চলে গেল।

আর তার একটু বাদেই নাটকের এক অভাবিত দৃশ্য দেখল যেন রাধানাথ। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে কি সত্যি দেখছে সেই সংশয়। দেখছে একখানা জ্বলন্ত শিখার মতো ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে তার বউ—চণ্ডীবউ। আর তাকে দেখামাত্র ঘরের সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, ওদের মাতব্বর মদনমোহন অতি বিনয়ী গৃহস্বামীর মতো একেবারে করজোড়ে দাঁড়িয়ে।

স্তব্ধ নির্বাক মুহূর্ত কয়েকটা।

চণ্ডীবউয়ের মাথায় মাত্র তিন আঙুল ঘোমটা। কপাল থেকে মুখের সবটুকুই দেখা যাচ্ছে। অপলক চোখে সে রাধানাথকে লক্ষ্য করল।

ধীর গম্ভীর মুখে মদনমোহন বলল, আজ আমার বাড়ির ধুলোমাটিও ধন্য।...রাধানাথ, তোমার ওপর আমার নিজের অন্তত আর কোনো রাগ নেই, বরং আজ আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।

চণ্ডীবউয়ের অপলক দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে এবারে তার দিকে ঘুরল।

রক্তের ছোপ-লাগা কপাল আর মাথায় বাঁধা ফেটির ওপর থমকালো।

কিন্তু মদনমোহনের দৃষ্টি রাধানাথের মুখের ওপর। তেমনি জলদগম্ভীর গলায় আবার বলল, রাধানাথ, তোমার ওপর আমরা কোনরকম অত্যাচার করেছি কিনা উনি স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন।...এমনিতে আসতেন না বলে তোমাকে হয়ত একটু কষ্ট দিয়েই আনতে হয়েছে। আমার ধারণা, তারপর থেকে অতিথি সৎকারে কোনরকম ক্রুটি করি নি এবং যতদূর সম্ভব এ পর্যন্ত সম্মানিত অতিথির মতই ব্যবহার করেছি...এ যদি সত্যি না হয় তাহলে তুমি নির্ভয়ে অস্বীকার করতে পারো।

চণ্ডীবউয়ের দু'চোখ ওই মুখের ওপর স্থিরনিবদ্ধ তেমনি। ওই মুখের ওপর আর রক্তের ছোপ-লাগা ওই ফেটির ওপর।

অবধারিত মৃত্যু থেকে এতক্ষণে হঠাৎই যেন জীবনের আলোয় ফিরে এলো রাধানাথ। আর সেইটুকুই ধরে রাখার উন্মুখ ব্যগ্রতায় উঠে দাঁড়িয়ে স্থানকাল বিস্মৃতের মতো বলে উঠল, না না, কিচ্ছু ক্রুটি হয় নি, কিচ্ছু অসম্মান হয় নি—এবারে আমাকে তুমি বাড়ি যেতে দাও।

মদন ঘোষালের দু'চোখে এবারও অবাধ্য হল না, আর কোনদিকে ঘুরল না। তার দিকেই চেয়ে আছে। বলল, যাও।...তবে যদি সম্ভব হয়, তোমার স্ত্রীকে হেঁটে যেতে বলো, তুমি বরং পালকিতে ওঠো।

স্নায়ুর যে অবস্থা, কথা কানে ঢুকল না রাধানাথের, মুক্তির ঘোষণাটাই পরম সম্পদ যেন। মাথা নাড়তে নাড়তে তিন লাফে দরজার কাছে এগিয়ে এলো সে।

চণ্ডীবউয়ের মুখ লাল এখনো, কিন্তু আগের সেই শিখার সঙ্গে ঠিক যেন মিল নেই। নিজের অগোচরেই মাথার কাপড়টা টেনে দিল একটু। তারপর দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল।

বড় বড় পা ফেলে আগে আগে রাধানাথ চলেছে। মৃত্যুর দরজা দিয়ে জীবনের পথে পা ফেলতে চলেছে। অনেকটা পিছনে মন্থরগতি চণ্ডীবউ।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েই সেদিকে চেয়ে আছে মদনমোহন। হাসছে অল্প অল্প।

দু'পাশে আর পিছনে হুমড়ি খেয়ে আছে তার পার্ষদরা।

প্রায় আধাআধি পথ ভাঙার পর রাধানাথের মাথাখানা সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। আর সেই সঙ্গে এক দুঃসহ উষ্ণ তাপে ভরাট হয়ে উঠতে লাগল। হ্যাঁ, এই উঁচু মাথাখানা তার হেঁট হয়েই গেছে। পায়ে পায়ে হেঁট হচ্ছে। কোনদিকে তাকাতে পারছে না রাধানাথ। সর্বত্র লোক দাঁড়িয়ে। কেউ কাছে আসছে না। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। যেন এই মুখ আর কেউ কোনদিন দেখে নি।

অর্ধেক রাস্তা পেরুবার পর রাধানাথের মনে হতে থাকল মাথা তার একেবারে কাটাই গেছে।

সরোষে সামনের দিকে তাকালো একবার। লাল পালকি অনেকটা আগে আগে চলেছে। বিলক্ষণ দ্রুত হাঁটছিল রাধানাথ। তবু চার বেয়ারার পালকি আগে তো যাবেই। সেই লাল পালকির দিকে চেয়ে চোখের শিরায় লালচে আভা ছড়াতে থাকল। পুঞ্জীভূত আক্রোশ ওটার ওপর গিয়ে আছড়ে পড়ছে।...সকালে ষষ্ঠীচরণের শিষ্য সাজিয়ে লোক পাঠিয়ে তাকে বাড়ির বার করে বস্তায় পুরে ধরে নিয়ে গিয়ে এত কাণ্ডর পর বউ এসে ঘরে পা দেওয়া মাত্র তাকে ছেড়ে দেওয়া হল কেন? রাধানাথ এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছে রক্তের বদলে রক্ত ঝরানোর উদ্দেশ্য মদন ঘোষালের আদৌ ছিল না। নিজের হাতে তাহলে বাঁধন খুলে দিত না, খাইয়ে-দাইয়ে আপ্যায়ন করত না। যা করেছে সব ছল, সব মেকী। কিন্তু বউ হুট করে অত বড় শত্রুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল মজা দেখছে? তার দুরবস্থা দেখতে? কাছে-দূরে এই সব লোকগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যা দেখছে তাই দেখতে? লাজলজ্জা খুইয়ে এই কাণ্ড করে এলো তারই ঘরের বউ?

সুখের শরীর, দ্রুত হাঁটার ফলে হাঁফ ধরেছিল। কিন্তু পায়ের পেশীগুলো যেন হঠাৎ আবার টান-টান হয়ে লাফিয়ে উঠতে চাইল। ছুটে গিয়ে ও পালকির পথ আগলে দাঁড়াতে ইচ্ছে করল। হ্যাঁচকা টানে ওই লাল শালুর ঢাকনাটা টেনে ছিঁড়ে ভিতরের মুখখানা এই মুহূর্তেই দেখতে ইচ্ছে করল।...দেখবে, খুব ভালো করেই দেখবে। এবারে আর মায়া দয়া নয়, রূপ দেখে আর ভোলা নয়। আগের বউয়ের কথা বলে অনেকবার ভয় দেখিয়েছে, শাসিয়েছে, কিন্তু সে-রকম কিছু করার চিন্তা সত্যিই মাথায় কখনো আসে নি। আজ আসছে। এখন আসছে। ঠিক তেমনি, তেমনি কেন, তার চতুর্গুণ একটা আক্রোশ উদগ্র হয়ে উঠচে। আঃ, বাড়িটা কতদূর আর!

কিন্তু নিজের এলাকায় পা দিয়ে দেখে এখানে অন্যরকম হাওয়া। এখানে সকলের মুখেই ত্রাস। আবার তাকে সুস্থভাবে হেঁটে আসতে দেখে স্বস্তিও। কোথা থেকে ছুটে এলো তার চার-পাঁচজন অন্তরঙ্গ ভক্ত। ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখ, যা দেখছে তা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এখনো। রাধানাথের নাকে চোখে মুখে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল তারা—যথার্থই সব ঠিক আছে কিনা, সব অক্ষত আছে কিনা।

অধীর উত্তেজনায় তারা যে সমাচার শোনালো, ওই লাল পালকিকে কেন্দ্র করে তার তপ্ত আক্রেশের ওপর যেন গুব গুব করে ঠাণ্ডা জল ঢালা হয়ে গেল একপ্রস্থ।

...এখানে ওরা শুনেছে, সকলেই শুনেছে, শত্রুপক্ষ গুম করে নিয়ে গেছে রাধানাথকে। তারপর খতম করেই ফেলেছে একেবারে। আর তাকে কেউ কোনদিন জীবিত দেখবে না। শুনে ভক্তরা সব হাহাকার করে উঠেছিল। সেই নিদারুণ শোকের মুখেও কারো কারো মনে হয়েছিল, খবরটা এই মুহূর্তে তার বাড়িতে জানানো উচিত, বিশেষ করে তার ঘরের জীবন্ত চণ্ডীকে। অঘটন যদি মা চণ্ডীর কৃপায় একেবারে না-ই ঘটে গিয়ে থাকে তাহলে একমাত্র ওই জীবন্ত চণ্ডীই পারেন কিছু একটা অসাধ্যসাধন করতে।

...তক্ষুনি ওরা ছুটেছে খবর দিতে। প্রসন্নময়ীকে নীচে ডেকে এনে যা বলার বলেছে। শোনামাত্র প্রসন্ন চাপা আর্তনাদ করতে করতে ওপরে ছুটেছে। তার একটু বাদেই দেখে লালের জ্যোতি ঠিকরে লাল পালকি চলল দক্ষিণ পাড়ার দিকে। সেই লাল পালকি দেখেই ওদের মনে হয়েছিল, স্বয়ং জীবন্ত চণ্ডী চলেছে স্বামী উদ্ধারে, যা শুনছে তার সবটুকু সত্যি না-ও হতে পারে, অঘটন সম্পন্ন না-ও হয়ে থাকতে পারে—হলে দেবীর কোপে সব ছারখার হয়ে যাবে না? এখন দেখছে যা ভেবেছিল তাই—দেবী গেলেন আর তার খানিক বাদেই সুস্থ বহাল তবিয়তে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছে তাদের মুরুব্বী।

দূরের ওই লাল পালকির দিকে চেয়ে দু হাত জুড়ে ওদের কেউ কেউ ভক্তিভরে প্রণামই করে ফেলল। তারপর দলপতিকে ছেঁকে ধরল, কি হল বলো—বলো রাধানাথ, আমরা যে ভালো করে দম ফেলতে পারছি না এখনো—দেবী গেলেন আর ওমনি সুড়সুড় করে ওরা ছেড়ে দিল তোমাকে?

নিজের অগোচরেই রাধানাথ সামান্য মাথা নাড়তে ভক্তরা সব উল্লাসে হৈ-হৈ করে উঠল। কি-ই বা বলবে রাধানাথ, সত্যিই তো সেই রকমই হয়েছে।

...বউ তাহলে মজা দেখতে যায়নি। মর্মান্তিক কিছু অঘটনের খবর পেয়েই শত্রুপুরীতে হানা দিয়েছে। তাকে উদ্ধার করে আনতেই গেছে। বিমূঢ় চোখে সামনের দিকে তাকালো। লাল পালকি তখন বাড়ির ফটকের কাছাকাছি। চোখে ওটা বড় বেশি লাল ঠেকছে এখন।

নিজের মধ্যে কি এক অস্বস্তিকর ব্যতিক্রম অনুভব করছে চণ্ডীবউও। পালকি থেকে নেমে দোতলায় উঠে সোজা নিজের ঘরে ঢুকেছে। তার আগে মাথার ছোট ঘোমটা খানিকটা বড় হয়েছে। ভালো করে কেউ তার মুখ দেখতে পায় নি। না পেলেও বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র ত্রস্ত সচকিত সকলে।

কিন্তু সকলে যা ভাবছে, সমস্ত গাঁয়ের লোক যা ভাবছে, চণ্ডীবউ তা ভাবতে পারছে না। সত্যিই কি চরম সঙ্কটের মুখ থেকে, মৃত্যুর মুখ থেকে স্বামীকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো? সমস্ত ব্যাপারটা যে একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয় সেটা চণ্ডীবউয়ের থেকে বেশি আর কে অনুভব করেছে? সেই প্রহসনের ফাঁদে সে পা দিয়েছে। অপর পক্ষের এটুকুই কাম্য ছিল।...তার পর একটা পরিহাস তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারা হয়েছে। কপালে বাঁধা ফেটিতে শুকনো রক্তের মধ্যেও

যেন শর্তভঙ্গের বিদ্রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কাপুরুষকে কেমন করে দয়া করতে হয় সেই বিদ্রূপও। অথচ এই বিদ্রূপ আর পরিহাসের মধ্যেও পৌরুষের অভাব ছিল না, পুরুষোচিত বিনয়ের অভাব ছিল না।

এমন এক ঘটনার পরে ঘরের লোকের প্রতি ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপচে ওঠার কথা। চোখের একটা খরদৃষ্টিতে ওই মুখখানা একেবারে ঝলসে দিতে পারার কথা। আজ সকাল পর্যন্তও এই ঘৃণা আর এই বিদ্বেষ আর এই জ্বালা একটা বিস্ফোরণের মুখে এসে পুঞ্জীভূত হয়েছিল।

...অথচ এমন ঘটনার ফলে চণ্ডীবউ কিছু একটা চিন্তার অবকাশ খুঁজছে, নিরিবিলি ফাঁক খুঁজছে, আড়াল খুঁজছে। নিজেরই ভিতরের এই অস্বস্তিকর ব্যতিক্রমটা কি তা সামনাসামনি মুখোমুখি দেখে নেওয়ার তাড়না।

সেই তাড়নায় ঘরের লোকের অস্তিত্বশুদ্ধ তুচ্ছ আপাতত।

দিনটা কাটল একরকম করে।

রাত্রি। রাধানাথ শয্যায় শয়ান। চণ্ডীবউ ঘরে এসে দাঁড়ালো। সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও চোখ তুলে তাকায় নি তার দিকে। তাকালে কুঁকড়ে যাবে জেনেও তাকায় নি। এবার তাকালো। দু'চোখ বোজা। ঘুমিয়েছে মনে হয়।...এতখানির পরেও সহজে ঘুম আসে। এটা আশীর্বাদ কি নির্লজ্জতার সব থেকে বড় নজির জানে না।

অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালো। ঘরের কোণের দাঁড়-করানো শীতলপাটির দিকে। ওটা এনে মেঝেতে বিছাবে। তারপর শয্যা থেকে একটা বালিশ টেনে শয়ন। গত ক'রাত ধরে এই ভুমিশয্যার আশ্রয়ে উপদ্রবের গোপন অভিলাষও টের পায় নি। সে-সাহসও মিইয়ে আসছে অনুভব করতে পারে।—শুধু সাহস?

যাক্। ক'দিন ধরেই ঘরটা বদলে নেবার কথা ভাবছে। এদিকের পর পর ক'টা ঘর খালিই পড়ে থাকে। বারইয়ারীতে নেশার ঝোঁকে ওই রক্তকাণ্ড ঘটিয়ে এসে রাতে ঘরে অবস্থানের পর থেকেই কথাটা মনে হচ্ছে তার। ঘরের বাতাস ক্লেদাক্ত ঠেকছিল। কিন্তু তখনো ঘর বদলায় নি তীব্র বিদ্বেষ আর তীব্র আক্রোশের ফলে। সে ঘরে না থাকলেই বরং লোকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে ভেবে। ওই নীরব দহনের হাত থেকে তাকে অব্যাহতি দিতে চায় নি বলে।... এবার পৃথক ঘরে শয্যায় ব্যবস্থা করে নিলেই হয়।

পাটিটা টেনে নেবার জন্য এগিয়েও নিল না। শোবে'খন। ঘুম চোখের ধারে কাছে নেই। পায়ে পায়ে শিয়রের দিকের সরু বারান্দায় এসে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।...যে অস্বস্তিকর অনুভূতিটা সেই থেকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করে তুলেছে তাকে, সাহসে ভর করে এখন তার আবরণটা রূঢ় হেঁচকা টানে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল হুঁশ নেই। হয়ত কিছুক্ষণ। হয়ত অনেকক্ষণ। হঠাৎ সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল বার দুই। তারপর কোমর থেকে বুক পিঠ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, মাথা প্রায় রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে এলো।

চণ্ডীবউ ফুলে ফুলে হাসছে। বেদম হাসছে হঠাৎ। সেই হাসি সামলাতে না পেরে রেলিং ঘেঁষে বসেই পড়ল।

ষষ্ঠ চেতনার অনভূতি কিনা জানে না, ঘুরে তাকালো।

পিছনে, চৌকাঠের ওধারে রাধানাথ দাঁড়িয়ে। হাসছিল যে বুঝতে পারে নি। মুখোমুখি চোখোচোখি হতে বুঝতে পারল। বিস্ময় গিয়ে মুখে কঠিন রেখা পড়ছে।

আঁচলে করে একটু সময় নিয়ে চণ্ডীবউ ভালো করে মুখ মুছে নিল। কিন্তু ভিতরে স্বতঃস্ফূর্ত যে ব্যাপারটা ঘটে গেছে সেটা মুছে ফেলা গেল না। আরক্ত মুখে হাসির আভা ভেজা দাগের মতো জড়িয়ে আছে।

না, রাধানাথ ঘুমোয় নি। ঘুমোতে চেষ্টাও করে নি। সকাল থেকে তার স্নায়ুর ওপর দিয়ে যে-ধকল গেছে সেই ক্লান্তি দূর করার জন্য একটা আস্ত বোতল খুলে বসার কথা। কিন্তু মনেও আসে নি। করণের মানুষের কাছে তার মাথা কাটা গেছে। এ যাতনা কতদিনে উপশম হবে জানে না। তবু মাথার মধ্যে থেকে থেকে যে বিষের স্রোত বইছে সেটা এই কারণেও নয়।...বিপদের খবর শুনে বউ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অতখানি তেজ আর অতটা সাহস আছে বলেই যেতে পেরেছে। রাধানাথও সেটা অস্বীকার করে না। আর গাঁয়ের লোক তো ধন্য ধন্য করছে, আরো করবে। আর, বউ না গেলে আরো কতক্ষণ তাকে ওই নরক-যন্ত্রণা পেতে হত তারও ঠিক নেই।

...সব ভালো, সব সত্যি। কিন্তু তার শত্রুর ওই উদারতার মুখোশ কতটা সত্যি? এর আড়ালে যে ছুরিটা লুকিয়ে আছে এর পরেও কি রাধানাথের চোখে সেটা গোপন থাকবে? গোপন অবশ্য আগেও ছিল না। তার আচার-আচরণের ব্যতিক্রমটা বহুদিন থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এতখানি দুঃসাহসিক নগ্ন হয়ে ওঠে নি। সঙ্গে সঙ্গে মদনমোহনের অনেকদিন আগের একটা উক্তি মনে পড়েছে।...দম্ভভরে কাকে বলেছিল, কপালে সিঁদুর না থাকলে বউয়ের অত রূপ মানায় না, তাই রাধানাথকে ক্ষমা করে দিল। কিন্তু এই দিনের ব্যাপারটা শুধু দম্ভ নয়, শুধু অনাবৃত লোভ নয়—তার থেকে ঢের বেশি কিছু।

তার চিন্তার যাতনাটাই তাকে বিছানা থেকে তুলে ছেড়েছিল। এই যন্ত্রণাই তাকে ঘর আর বারান্দার মাঝের চৌকাঠের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কায় মনে হয়েছিল বউ ফুলে ফুলে কাঁদছে। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকাতে এই দৃশ্য। নিঃশব্দে এমন বিপুল হাসি আর দেখে নি। এতক্ষণের যন্ত্রণার ওপর যেন প্রচণ্ড আঘাতের মতো এসে পড়ল ওই হাসি।

কুটিল সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে আছে।—এত আনন্দ এত হাসির কি হল?

জবাব মিলল না।

চৌকাঠের বাইরে এক পা রেখে ধারালো চাপা হুঙ্কারে আবার জিজ্ঞাসা করল, আমার কথা কানে যাচ্ছে? রাত দুপুরে এত আনন্দের কি হল তোমার? এত হাসি কিসের?

আঁচলে করে ধীরে সুস্থে আর এক দফা মুখ মুছল চণ্ডীবউ। তারপর তেমনি বসে থেকেই সোজা তার চোখের দিকে মুখ ফেরালো। খুব নির্লিপ্ত সহজ সুরে জবাব দিল, আবারও হাসি পাচ্ছে।

—কেন?

—তোমার শত্রুপুরিতে যে-মুখ করে বসেছিলে মনে পড়ছে....

গত ক'দিন ধরে সেই জমাট-বাঁধা ঘৃণা আর বিদ্বেষের লেশমাত্র নেই। ওই

এক হাসিতে সব যেন ধুয়ে-মুছে গেছে। এমনকি গলার স্বরও কৌতুকপ্রচ্ছন্ন কিন্তু বিচিত্র রকমের সহজ আর স্বাভাবিক।

—এই জন্যে হাসছিলে?

—না।

—তাহলে কিজন্যে? চাপা হুঙ্কারের মতো শোনালো আবার।

—হাসি পেল, তাই। সুখের শরীরে অনেক ধকল গেছে, চুপচাপ শুয়ে থাকোগে যাও—

এই মুহূর্তে যদি বউয়ের গলা টিপে ধরতে পারত, ভিতর ঠাণ্ডা হত। ওই অত হাসির কোনো না কোনোভাবে মদনমোহনের অভিসন্ধির সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যত আক্রোশই হোক, রাধানাথের নড়াচড়ার শক্তিও বিলুপ্ত যেন। বউয়ের এমন সহজ মূর্তি আর অবজ্ঞা-ভরা এই উক্তি বুঝি অবশই করে ফেলেছে তাকে। রাগ বা বিতৃষ্ণারও যোগ্য নয় বলেই যেন এই রূপান্তর বউয়ের, আচরণে এমন বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।

অপেক্ষা করল একটু। মুখখানা অপলকে দেখার ফাঁকে আসলে নিজেকে টেনে তুলল একটু। তারপর বলে উঠল, আমার বিশ্বাস ওই শয়তান আজ এত কাণ্ড করেছে তুমি ওর বাড়িতে যাবে শুধু এই আশাতে বুঝলে?

সেই আশ্চর্য সহজ মুখ করেই চণ্ডীবউ মাথা নাড়ল। জবাবও দিল, তাই হবে।

—সেটা তোমরও মনে হয়েছে তাহলে? আগে মনে হয়েছে, না পরে?

—পরে।

—তাহলে সেই খুশিতে আর আনন্দে তুমি আটখানা—কেমন? এরও প্রতিশোধ আমি নেবা নেবো নেবো—বুঝলে?

চণ্ডীবউ স্থির চোখে চেয়ে রইল একটু। কিন্তু মুখভাবের কিছু মাত্র পরিবর্তন ঘটল না। আল্‌তো করে জিজ্ঞাসা করল, কি করে? তাকে বাড়িতে ডেকে পাঠাবো একদিন?

ফর্সা মুখ রাগে নীল হয়ে উঠেছে।—যত বিপদই হোক তুমি ডেকে পাঠালে ঠিক আসবে—কেমন?

—মনে হয় আসবে।

—আর, ওই বিকেল থেকে ডাকতেও ইচ্ছে করছে, তাই না?

আগে এই গোছের ইঙ্গিত মাত্রে রাগে সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ হতে দেখেছে বউয়ের। কিন্তু আজ কোনোরকম তাপের লেশমাত্র নেই এমন নির্লিপ্ত সহজ। জবাব দিল, না, কি-রকম প্রতিশোধ নাও দেখার জন্য এখন ইচ্ছে করছে।

মাটি ছেড়ে ধীরেসুস্থে চণ্ডীবউ দাঁড়াল। তার পাশ ঘেঁষেই ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল একবার। পিছনে দ্বিতীয় প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও উদাসীন। এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের কোণ থেকে শীতলপাটিটা হাতে নিল। না, এ-ঘরে আজ আর থাকতে পারবেই না মনে হচ্ছে। ভিতরে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। প্রসন্নকে বলে পাশের ঘরটা ঝাড়া-মোছা করে রাখলে হত। কাল বলবে। আজ রাতের মতো ওই বারান্দার আশ্রয়টুকু বরং ঢের ভালো।

দরজার চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তেমনি। ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে পাশ

কাটানোর পরিসর আরো কমেছে। চাউনিটা ধক্‌ধক্‌ করছে। রমণী-দেহ ফালা করে দিতে চাইছে।

চণ্ডীবউ এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। চোখে চোখে তাকালো। তেমনি সহজ নির্লিপ্ত অবজ্ঞায় যেন চোখ দিয়েই সরতে বলল তাকে।

—শোবে কোথায়, এই বারান্দায়?

হ্যাঁ। কাল থেকে ওই পাশের ঘরটায় ব্যবস্থা করে নেব।

রাতের ওই হাসির পর থেকে এ কার মুখ দেখছে, কার গলা কার কথা শুনছে—দুর্জয় ক্রোধের মধ্যেও রাধানাথের সেই বিস্ময়। কিন্তু এ বিস্ময়ের সবটুকুই সহিষ্ণুতার শেষ তারে বাঁধা। বলে উঠল, ও...এখন ঘর বদল করার দরকার হয়েছে তাহলে, এ-ঘরে আর মন টিকছে না। তা শুধু ঘর কেন, বাড়ি বদল করতে ইচ্ছে করছে না?

সোজা তার চোখের দিকে চেয়ে আছে চণ্ডীবউ। হেসে উঠতেও পারে যেন। কিন্তু হাসির আভাস শুধু গলার স্বরেই ফুটল।—ইচ্ছে করলেই আর পারা যাচ্ছে কি করে। সরো, রাত হয়েছে, আর ভালো লাগ[illegible] না—

হাতের পাটি রাধানাথের গায়ে ঘষটে গে[illegible]। চণ্ডীবউ বারান্দায় এলো। পাটি বিছালো। বসল তার ওপর। তারপর আলস্য ভেঙে শুয়ে পড়ল। বালিশেও দরকার নেই।

রাধানাথ আবার ঘুরে দাঁড়াল। দেখল। তারই বড় ছায়াটা সরাসরি বউয়ের ওপর পড়েছে। রমণী-দেহ তাই আর একটু বেশি আবছা দেখাচ্ছে।

রাধানাথ ঘরে ঢুকল। আলোটা নেভাল। তারপর আবার দরজার কাছে এলো।

এই রমণীর রাগ দেখেছে, ঘৃণা দেখেছে, বিদ্বেষ দেখেছে। সেই আঘাতে বহুবার পঙ্গু হয়েছে, চেষ্টা করে হোক বা সময়ের দাক্ষিণ্যে হোক—এইসব সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু রমণীর এই ব্যতিক্রম, এমন নির্লিপ্ত সহজ অবজ্ঞার ফলে তার সমগ্র অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন। রমণীর তূণে এমন অমোঘ অস্ত্র তার কল্পনার অতীত। মাত্র আধ-ঘন্টার মধ্যে ভিতরটা যেন রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে একেবারে।

...কিন্তু পশুর রীতি ভিন্ন। আহত পশু শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগেও মরণ কামড় বসাতে চায়। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সেই আহত পশুর পদসঞ্চার অনুভব করেছে রাধানাথ।

তারপর...

তারপর ওই রমণী-দেহ বিদীর্ণ করার তাড়নায় সমস্ত নখদন্ত মেলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আগেও এমন হয়েছিল। নিঃশেষ দখলের তাড়নায় তখনো দয়া ছিল না, মায়া ছিল না। তবু আগের থেকে অনেক—অনেক তফাত। অস্তিত্ব রক্ষায় এক অন্তিম হিংস্র মুহূর্ত যেন এটা।

চণ্ডীবউ আগেও বাধা দেয় নি, আজও না। কিন্তু এক্ষেত্রেও আগের সঙ্গে এই রাতের অনেক তফাত। আগের সহিষ্ণুতা পাল্টা আঘাতেরই প্রতীক। আর এই রাতের সহিষ্ণুতার আঘাত খানিক আগে সেই নিদারুণ অবজ্ঞার, যে-আঘাতে পুরুষ অস্তিত্বের সত্তাসুদ্ধ দীর্ণ-বিদীর্ণ।

রাধানাথ নিজেই নিজের সমাধি রচনা করে উঠল। মরণ-কামড় দিতে গিয়ে নাগালের মধ্যে পেয়েও শিকারীর শেষ আঘাতে যেমন করে মুখ থুবড়ে পড়ে, ঠিক সেই দশা রাধানাথের। ধরা-পড়া হৃতসর্বস্ব তস্করের মতো উঠে নিজের দেহের কাঠামোটাকে শুধু ঘরের শয্যায় আশ্রয়ে এনে ফেলল সে। ঘরে আলো নেই, অন্ধাকার। রাধানাথের চোখের সামনে তামাম দুনিয়া অন্ধকার।

এ অভিজ্ঞতাও একেবারে নতুন নয়। হিংস্র দখলকামী পৌরুষ অপরিপূর্ণতার পরাজয় নিয়ে আগেও একাধিকবার ফিরে এসেছে। কিন্তু আজকের ব্যর্থতার সঙ্গে তারও যোজন তফাত। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়েই অনুভব করছে, আজ সে হৃতসর্বস্ব। সর্বগ্রাসী এক নিঃসীম অন্ধকারের সমুদ্রে ভাসছে সে।

পরদিন সকালে সংগোপনে বদ্যির কাছে এসেছে। এক ফোঁটা মদ না খেয়েও মাতালের মতো টলতে টলতে গেছে। তার বিধান নিয়ে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরেছে।

তারপর প্রতীক্ষা। রাতের ক্রূর প্রতীক্ষা।

এবং তারপর দ্বিগুণ ব্যর্থতা। অন্ধকারের মহাসমুদ্রে আত্মনাশের আক্রোশ।

পরের রাত্রিতেও।

তিনটে রাতের অবসান। না, এই দিনটা আর কোনো আশা কোনো আশ্বাস নিয়ে আসে নি।

ভোর হতে ভূমিশয্যায় উঠে বসল চণ্ডীবউ। ওই লোক তার আগেই বিছানায় উঠে বসে আছে। দেখল কয়েক পলক। না, এই তিন রাতেও আচরণের এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নি চণ্ডীবউয়ের। তেমনি আত্মস্থ, তেমনি নির্লিপ্ত, সহজ। চাউনিতে শুধু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ-ছটা।

এই দিনে রাধানাথ আর ঘর ছেড়ে বেরুলো না। ফলে দিনের মধ্যেই বউয়ের সঙ্গে অনেকবার দেখা হল, চোখাচোখি হল। প্রতিবার মনে হল তার কালো চোখের গভীরে সেই নীরব বিদ্রূপ আর ব্যঙ্গচ্ছটা যেন বাড়ছে।

আরো একবার মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো চণ্ডীবউ। সোজা তাকালো তারপর দরজার দিকে চেয়ে ঈষৎ জোরে ডাকলো, প্রসন্ন, প্রসন্ন!

রাধানাথ সচকিত একটু। সে ঘরে থাকলে এভাবে ডাক পড়ে না। দরজার খানিকটা ওধারে ঘোমটা-টানা প্রসন্নর মূর্তি দেখা গেল।

সেদিকে দু'পা এগিয়ে খুব সহজ আর স্বাভাবিক সুরে চণ্ডীবউ হুকুম করল, পাশের ওই ঘরটার ওরকম দশা কেন? বেশ করে ধুয়ে-মুছে তকতকে করে রাখিস তো। আজই—

মাথা নেড়ে প্রসন্ন বাইরে থেকেই চলে গেল।

চণ্ডীবউ মুখ ঘুরিয়ে শয্যায় বসা মূর্তিখানার দিকে কালো চোখের দৃষ্টিটা প্রসারিত করল একবার। তারপর অনায়াসে মন্থর গতিতে দরজার দিকে এগলো।

সেই সন্ধ্যাতেই দূতমুখে একটা সংবাদ পেল রাধানাথ। চণ্ডীবউ শুনল। বাড়ির দাসদাসীরাও শুনল।

সংবাদটা রাধানাথের কাছে অন্তত ডুবন্ত মানুষের শেষ প্রত্যাশার মতো।

...মা-কে নিয়ে বাবা, অর্থাৎ মহেশ্বর দত্ত ফিরে আসছেন। অনেকদিন হল

শরীর বিশেষ অসুস্থ তাঁর। নৌকোযোগে রওনা হয়েছেন অনেক আগেই। কিন্তু রুগ্ন শরীরের দরুন মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে। দূত আগে এসে তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবরটা দিয়ে গেল।

বাবার কি রোগ, কতটা অসুস্থ তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মেজাজ নয় রাধানাথের। শোনার পর থেকে কেবলই মনে হচ্ছে বাবা-মায়ের ফেরা দরকার—এই মুহূর্তে ফেরা দরকার।

পাশের ঘরে অন্ধকারের বিনিদ্র শয্যায় চণ্ডীবউ তাঁদের কথাই ভাবছিল। বিশেষ করে ভাবছিল শাশুড়ির আশার কথা।...বংশধর আসছে স্বপ্ন দেখে কলকাতায় মায়ের থানে পূজো দিতে ছুটেছিলেন।

অতি দুঃখে মানুষ কাঁদে। কিন্তু সহিষ্ণুতার সীমা ছাড়ালে নির্মমভাবে হেসে উঠতেও পারে।

তেমনি হেসে উঠতে ইচ্ছে করছিল চণ্ডীবউয়ের।

॥ ২৫ ॥

প্রায় আট মাস আগে করণের শুভার্থী এবং অনুগ্রহভাজনেরা রক্তমাংসের এক তর-তাজা মানুষকে চুনীর ঘাট থেকে বিদায় দিয়েছিল, আট মাস বাদে এই ঘাটে এসে একটি কঙ্কালকে ঘিরে অভ্যর্থনা জানালো তারা।

যে দেখল মহেশ্বর দত্তকে, সে-ই চমকে উঠল। হাড়ের ওপরে চামড়া বসানো। জীর্ণ, শীর্ণ। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। মেরুদণ্ডের হাড় বেঁকে গেছে মনে হয়। দু'দিকের চোয়াল উঁচিয়ে আছে, চোখ দুটো গর্তে। হাত পা বুক ঘাড় কাঁধ সব সরু হয়ে গেছে। এক নজর তাকালেই মনে হয় মানুষটার ওপর ওপরওয়ালার নোটিশ পড়ে গেছে।

ধরাধরি করে বজরা থেকে নামানো হল তাঁকে। ওই মূর্তি দেখে চণ্ডীবউ স্থানকাল ভুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল শুধু। অসুখ আগেই খবর পেয়েছে কিন্তু অসুখে কারো এই হাল হতে পারে এ যেন কল্পনা করা যায় না। যে উঁচু লম্বা মানুষটা গেছলেন তিনিই ফিরলেন যা ভাবা শক্ত।

ঘাটে নেবে শ্বশুরকে তার দিকে এগোতে দেখে হুঁশ ফিরল। সচকিত হয়ে নিজেই এগিয়ে গেল চণ্ডীবউ। গলায় আঁচল জড়িয়ে হাঁটুর ওপর বসে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল। এই প্রণাম-বিধিতে সময় লাগে একটু। ততক্ষণে শাশুড়ী এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। তার পিছনে রাধানাথ।

প্রণাম সারা হতে পাশের দিকে অর্থাৎ গৃহিনীর দিকে চেয়ে কি ইঙ্গিত করলেন মহেশ্বর দত্ত। গৃহিণী ইশারা বুঝেও ইতস্তত করলেন এক মুহূর্ত। ঘাটের এত লোকের মধ্যে এই ইচ্ছেটা প্রত্যাশিত নয় খুব। চণ্ডীবউ ততক্ষণে তাঁর পায়ে মাথা রেখেছে। অতএব তখন বাধা না দিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। প্রণাম সম্পন্ন হাত হাত বাড়িয়ে বউয়ের মাথার ঘোমটা পিছন দিকে টেনে খাটো করে দিলেন। তারপর একখানা বাহু ধরে আস্তে আস্তে দাঁড় করিয়ে দিলেন তাকে।

বাইরের লোকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বউয়ের মুখখানা দেখার জন্যে ব্যগ্র হয়েছিলেন মহেশ্বর দত্ত।

দেখলেন।

আর কারা এসে প্রণাম করছে তাঁকে খেয়াল নেই। বউকেই দেখছেন। নিষ্প্রভ মুখে হাসির ছোঁয়া লাগল। বললেন, একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম, কতক্ষণে মায়ের কাছে যাব, মা-লক্ষ্মীকে দেখব, রাস্তা আর ফুরোয় না। এবারে আমার মায়ের কাছে এসে পড়েছি, নিশ্চিন্ত—

মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে রাধানাথ বাবাকে দেখছিল আর বউকে দেখছিল। প্রণাম-পর্বটা সে বজরাতেই সেরেছিল। বাবার শরীর এত খারাপ হয়েছে ভাবে নি। কিন্তু তার এই বিচলিত মুখ বাবার স্বাস্থ্যের কারণে নয়।...বউকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বাবা যেন বিয়ের আগের সেই মা-চণ্ডীর স্বপ্ন দেখার হাওয়াটা টেনে আনছে। গত দু'দিন ধরে মনে মনে অনেক মতলব ভেঁজেছে সে। বর্তমানের পরিস্থিতিতে মা-কে এবং তাঁর মারফত বাবাকেও স্বপক্ষে চাই-ই। নইলে পায়ের নীচে সর্বদা যে মাটি দুলছে এখন, সেটা স্থির হবে না। কিন্তু বাবার প্রথম আচরণেই সেই আশার ওপর যেন বড় রকমের ঝাপটা পড়ল একটা।

যে ভগ্নাকৃতি মানুষটার পদার্পণ ঘটল তাকে আর চণ্ডীবউকে কেন্দ্র করে অন্য সকলের দৃষ্টি উৎসুক হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে কোনোদিকে লক্ষ্য ছিল না কারো। অন্য কোনো নাটকের জন্য কেউ প্রস্তুতও ছিল না।

ধরাধরি করে মহেশ্বর দত্তকে পালকিতে বসানোর আগে ঘাটে মদনমোহন উপস্থিত। সঙ্গে শ্রীনাথ। মদনমোহনের কপালে ফেটি বাঁধা তখনো। এখন সাদাই সেটা, রক্তের দাগ নেই।

সামনে এসে দু'হাত জুড়ে মাথা নীচু করে নমস্কার জানালো। বলল, আপনি আজ আসছেন শুনে তাড়াতাড়ি এলাম। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে আপনার, কি অসুখ করেছে?

এতদিন বাদে নিজের মাটিতে পা দিয়ে সকলকেই নিতান্ত আপনার জন মনে হচ্ছে মহেশ্বর দত্তর। এই ছেলেকে আশা করেন নি বলেই হয়তো আরো বেশি খুশি। তাঁর কাঁধে একখানা হাত রেখে বললেন, আর বাবা কি অসুখ, শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসতে পেরেছি এই ঢের, এখন চোখ বুজলেও খেদ থাকবে না।...তো তোমরা ...এ কি, দেখেও তো নিজের কথাই বলে যাচ্ছি, কপালে কি হয়েছে তোমার?

প্রসঙ্গ এড়াতে চেষ্টা করল মদনমোহন, সামান্য লেগে গেছল...আপনি অসুস্থ হয়ে ফিরছেন খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু এতটা ভাবি নি...আমি না হয় একবার রাণাঘাটে চলে যাই, সেখানে একজন নাম-করা কবিরাজ আছেন, ধরে নিয়ে আসতে চেষ্টা করি—

সে এসে দাঁড়ানোর পর এইটুকু অবকাশের মধ্যেই মহেশ্বর দত্ত কেমন করে যেন অনুভব করলেন এখানকার আটটা মাস নিরুপদ্রবে কাটে নি। এবং যা-ই ঘটে থাকুক, তার নায়ক সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে-ই। এটুকুর মধ্যেই রাধানাথকে লক্ষ্য করেছেন তিনি, তার দু'চোখ দুটো কয়লা জ্বলছে। তাঁর মা-চণ্ডীর মুখ রক্তবর্ণ,

ছেলেটাকে দেখেও মাথার খাটো ঘোমটা টেনে দেয় নি—সোজা চেয়ে আছে তার দিকে। আর, ঘাটে এই একজনের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেরও স্তব্ধ সচকিত মূর্তি। অসুস্থ বলেই ভিতরটা আগের থেকে ঢের বেশি দুর্বল মহেশ্বর দত্তর। টাকার জোরটা আর এখন অন্তত সব থেকে বড় জোর নয়। গত আট মাসের সমাচার কিছুই জানেন না। তবু এরই মধ্যে মনে অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া পড়েছে।

হাসতেই চেষ্টা করলেন। জবাব দিলেন, আগে ঘরে গিয়ে বিছানা নিই বাবা, তারপর যা ভালো বোঝা তোমরাই তো করবে—

ধরাধরি করে মদন ঘোষাল আর শ্রীনাথই তাঁকে পালকিতে বসিয়ে দিল। অন্য সকলে দর্শক। সকলেরই দুটো চোখ মদন ঘোষালের ওপর। চণ্ডী বউয়েরও। মাথার কাপড়টা টেনে দেবার কথা মনে হয় নি।...সামনে এসে দাঁড়ানোর পর লোকটা কোন অছিলায় এবারও তার দিকে ফেরে নি, তার দিকে তাকায় নি। তাহলে সচেতন হত। স্থান-কাল ভুলে চণ্ডীবউ লোকটার স্নায়ুর জোর দেখছে কি বুদ্ধির বেপরোয়া চমক দেখছে জানে না।

পালকিতে বসে মহেশ্বর দত্ত স্বাভাবিক আমন্ত্রণ জানালেন, সময় করে বাড়িতে এসো বাবা, অবিশ্যি এসো, যে কটা দিন আছি তোমরা না দেখলে কে আর দেখবে—

যাবে কি যাবে না মদন ঘোষাল কিছুই বলল না। বেয়ারারা পালকি তুলে নিল। আর ঠিক তখনই মদন ঘোষাল ঘুরে দাঁড়াল। দু'চোখ সোজা চণ্ডীবউয়ের মুখের ওপর। পলকের দৃষ্টি। গভীর।

এতক্ষণে সচকিত হয়ে চণ্ডীবউ মাথার ঘোমটা টেনে দিল। নিজের পালকির দিকে এগিয়ে গেল। শাশুড়ী তখনো তাঁর পালকিতে ওঠেন নি। নৌকোর মাল-পত্র সম্পর্কে নির্দেশ দেবার জন্য হাতের ইশারায় ছেলেকে ডাকছেন। কিন্তু রাধানাথের অগ্নিদৃষ্টি তখনো তার শত্রুর দগ্ধানোর চেষ্টায় উদগ্র-নিবিষ্ট।

ছেলের আন্তরিক ব্যস্ততার ফাঁক দিয়েই কিছু দেখতে চেষ্টা করছেন মহেশ্বর দত্ত, কিছু বুঝতে চেষ্টা করছেন। কটা দিন স্থানীয় কবিরাজের কাছে নিজে ছোটাছুটি করছে, ওষুধপত্র নিজে নিয়ে আসছে, পথ্যের খোঁজ করছে, মায়ের নির্দেশে নিজে গিয়ে বাবার জন্যে উলুবনের মহাচণ্ডীর থানে পূজো দিয়ে এসেছে। সেদিন স্বামীকে শুনিয়ে দত্ত-গৃহিণী মন্তব্য করলেন, ছেলেটার মতিগতি ফিরেছে মনে হয়, কিন্তু সব শুনে তো শরীরের রক্ত হিম আমার, কি যে হবে এর পরে ঠাকুর জানেন...

শরীরের কারণেই এই তিনটে দিন ঘরে বসে চুপচাপ দম নিচ্ছিলেন মহেশ্বর দত্ত। অসুস্থ শরীরে পথের এত বড় একটা ধকলে প্রাণটা বেরিয়েই যাবে মনে হয়েছিল। এদিকের অন্তরঙ্গ বয়স্ক মানুষেরা দু'বেলাই তাঁকে দেখতে এসেছে। তাতেও বিরক্ত এবং ক্লান্ত বোধ করেছেন। তারই মধ্যে তাদের চোখে-মুখে কিছু চাপা আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন তিনি। হাওয়া অনুকূল বুঝলে কিছু যেন বলতে পারে। কিন্তু মহেশ্বর দত্ত কিছুই শুনতে চান নি, শরীরের যাতনা আর দুশ্চিন্তায় অস্থির তিনি। শুধু এই নয়, বাড়ির মধ্যেও কিছু একটা পরিবর্তন অনুভব করেছেন। বাইরে প্রকাশ নেই, তবু এ বাড়ির বাতাসের কোনো ব্যতিক্রম ঘটলে ঘ্রাণ টেনে বুঝতে

পারেন তিনি। কিন্তু দু'দিন পর্যন্ত তা নিয়ে মাথা ঘামানো পর্যন্ত শরীরের অবস্থায় কুলোয় নি। যখন-তখন একমাত্র তাঁর মা-চণ্ডীর খোঁজ করেছেন। দু'দণ্ড না দেখলে অস্থির। অবশ্য এমনিতেই চণ্ডীবউ তাঁর ঘরে অনেকবার করে যাতায়াত করছে। কবিরাজী চিকিৎসার অনেক ঝামেলা, সময় ধরে ওষুধ-পত্র পথ্য দেবার দায়িত্ব সে নিজে থেকেই হাতে তুলে নিয়েছে। এ ছাড়া ফাঁক পেলেই চুপচাপ শ্বশুরের ঘরে বসে থাকে। রাতেও থাকে বহুক্ষণ পর্যন্ত, শেষে শাশুড়ী তাকে ঠেলে পাঠায়।

বউয়ের এই বার বার আসা-যাওয়া, ওষুধ আর পথ্য দেওয়া, এমন কি নিঃশব্দে সামনে বসে থাকার মধ্যেও কিছু যেন ব্যতিক্রম অনুভব করেছেন মহেশ্বর দত্ত। তার নীরব শক্তিটা যেন আগের থেকেও দৃপ্ত অথচ আগের থেকেও বেশী সংহত মনে হয়েছে। প্রথম দিন নিজের ঘরে শয্যা নেবার কিছুক্ষণের মধ্যে মিনমিন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি গো, এই কটা মাস বেশ ভালো ছিলে তো মা-লক্ষ্মী?

চণ্ডীবউ মাথা নেড়েছে, ভালো ছিল।

—বাঁদরটা জ্বালায় নি?

মহেশ্বর দত্ত জবাব আশা করেন নি। এবারও মাথা নাড়লে খুশি হতেন। আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন, বউয়ের সামনে ছেলে ঘরে ঢোকে না। এখন মা-কে বাইরে ডেকে নিয়ে কথা বলে। অথচ বাপের সুচিকিৎসার জন্য সে-ও কম ব্যস্ত নয়। রাণাঘাটের বড় বদ্যি আনার জন্য লোক পাঠাতে চেয়েছিল, মহেশ্বর দত্ত বাধা দিয়েছেন। তাঁর ধারণা পাছে ঘোষালবাড়ির ছেলে ওর ওপর টেক্কা দিয়ে আগের ভাগে কিছু করে বসে সেইজন্যেই এত ব্যস্ততা।

আজ শরীরের ক্লেশ একটু কমেছে। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগে ভালো করে গৃহিণীর থম্‌থমে মুখখানা একটু দেখে নিলেন। এতদিন বাদে ঘরে ফেরা সত্ত্বেও বউয়ের প্রতি রীতিমত অপ্রসন্ন দেখেছেন তাঁকে।

—কি হয়েছে?

নিঃশব্দে বসে থেকে অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন কি হয়েছে।

বলা বাহুল্য আট মাসের সমাচার শোনানোর মধ্যে বউয়ের প্রতি দরদের ছিটে-ফোঁটাও ছিল না দত্ত-গৃহিণীর। উল্টে রাগটুকুই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই রাগ নৌকা থেকে নেমে চূর্ণীর ঘাটে পা দিয়ে বউয়ের দিকে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে। বউ তাঁকে প্রণাম করে ওঠার ফাঁকে তার সর্বাঙ্গে চোখ চালিয়ে সন্তান-সম্ভাবনার ছিটেফোঁটা লক্ষণও তাঁর চোখে পড়ে নি। উল্টে শ্রী যেন আরো বেড়েছে। সে-তুলনায় ছেলের মুখখানা আগের থেকে ঢের শুকনো রোগা মনে হয়েছে তাঁর। এত কষ্ট এত আশা সব যেন ওই বউই ব্যর্থ করে দিয়েছে।

এই অনুকূল অবকাশেই দু'দিন ধরে রাধানাথ তার মায়ের কান বিষিয়েছে। তার সদ্য বর্তমানের সংকট থেকে সকলের চোখ ফিরিয়ে রাখতে হলে মা-বাবা দুজনকেই বউয়ের প্রতি বিরূপ করে তোলা দরকার। তার সময় চাই কিছু। সময় হয়ত সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। সংগোপনে চিকিৎসাও চালিয়ে যাচ্ছে। পুরুষকারের দর্পে কিছুকাল পা ফেলে চলতে পারলে সঙ্কট কেটে যাবে। ততদিনে মা-বাবার শাসনে বউয়ের তেজ ঝরুক খানিকটা। এ ছাড়া নিজের মর্যাদা রক্ষার আর উপায় নেই।

ছেলের চোখে জল পর্যন্ত দেখেছেন তার মা। তারপর আর অবিশ্বাসের প্রশ্ন

আসে কি করে। বাপ মায়ের আট মাসের অনুপস্থিতিতে ঘোষালবাড়ির ওই লম্পট ছেলে কত ভাবে জব্দ করেছে তাকে, কত নির্যাতন করেছে, তার কোনো প্রসঙ্গ বাদ দেয় নি। বউয়ের প্রতি তার মন্দ চোখের খবর গাঁ-সুদ্ধ লোক জেনে গেছে। আর ওই পাজী লম্পটের প্রতি বউয়েরও যে পরোক্ষ টান একটু আছেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে আভাসও দিয়েছে। টান না থাকলে, তাকে জব্দ করার জন্য ওই শয়তান তারই বাড়িতে ওদের বারইয়ারীর চাঁদা চাইতে এলে বউ নীচে নেমে নিজে হাতে ওকে টাকা দিল কেন? দিলও কম নয়, অনেক টাকা।...কুস্তির মজলিশে শয়তানটা পৈতে দেখিয়ে ষষ্ঠীচরণকে বোকা বানালো, অথচ সাধাসাধি করেও বউয়ের মুখ খোলানো গেল না—সে হুকুম করলে ষষ্ঠীচরণ নিশ্চয় বরাবরকার মতো ওর মুখ থেঁতলে দিত।...ছিরে পাগলার অত বড় বেয়াদপির জবাবে তাকে শাস্তি দেবার জন্য গাছের সঙ্গে বাঁধা হয়েছিল, আর তাই শুনে বউয়ের দরদ এমন উথলে উঠল যে সেই রাতে দারোয়ানগুলোকে আর প্রসন্নকে আর মুনকেকে পাঠালো তাকে ছাড়িয়ে আনতে। তারপর যখন দাপট দেখিয়ে ঘোষালের ওই বদমাশ ছেলে নিজেই এলো ছিরেকে ছাড়িয়ে নিতে তখন রাগের মাথায় রাধানাথ তাকে মেরে বসবে না তো কি?...সব শেষে ছলায় ভুলিয়ে ওকে আমবাগানে বস্তা-বন্দী করে শত্রুপুরীতে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা। রাধানাথের ধারণা, যতই ভয় দেখাক ওকে ওরা মেরে ফেলত না। আসলে ওই শয়তান পাজী লম্পট চেয়েছিল বউ ওর বাড়িতে আসুক। সে যাওয়া মাত্রই ছেড়ে দিয়েছে। ওর মতলব বউ তখন না বুঝুক পরে সে বুঝেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বোঝার পরেও রাগে জ্বলে ওঠা দূরে থাক, রাতদুপুরে একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বউয়ের সে-কি হাসি? সেই হাসি রাধানাথ স্ব-চক্ষে দেখেছে।

উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। শুনতে শুনতে মা-কে অনেকবার কন্টকিত হতে দেখেছে। আমবাগানে বস্তা-বন্দী করে নিয়ে যাবার কথা শুনে তো আর্তনাদই করে উঠেছিলেন। শেষে রাগের যে অভিব্যক্তি দেখেছে তাতে অনেকখানি আশ্বস্ত। এত দাপট আর এত ঘৃণা বউয়ের যে এক-ঘরে শোয় না পর্যন্ত—মায়ের কানে এ-সংবাদটাও তুলে দিতে ভোলে নি।

রাতটা যন্ত্রণা আর জ্বলুনিব মধ্যে দিয়ে কেটেছে দত্ত-গৃহিণীর। সেই থেকে বউয়ের মুখের দিকে তাকান নি পর্যন্ত। তার রূপ আর তেজ বাড়ছে অথচ ছেলেটা শুকিয়ে কাঠ। বড় আশা নিয়ে এত কষ্ট করে কলকাতায় ছুটেছিলেন মায়ের পূজো দিতে। সে আশায় ছাই, উল্টে কিনা মরণাপন্ন স্বামী নিয়ে ফিরতে হল। সব দোষ বউয়ের নয় তো কি? স্বপ্ন তিনি ঠিকই দেখেছিলেন, আর বউয়ের মন আর মতি থাকলে বংশধরের মুখও ঠিকই দেখতে পেতেন। কিছু হল না, কিচ্ছু হল না—সব গেল।

কিন্তু সকালে এই বউয়েরই মুখের দিকে চেয়ে নিজের অগোচরে একটু থমকাতে হয়েছে তাঁকে। তখনো বেশ সকাল। এরই মধ্যে স্নান সেরেছে। আধ-ভেজা চুলের বোঝা পিঠে ছড়ানো। পরনে গরদ, কপালে সিঁথিতে টকটকে তাজা সিঁদুর, হাতে শ্বশুরের ওষুধ।

চোখ ফেরানো যায় না সত্যি কথাই, অথচ চোখ ফেরাতে চান তিনি। ছেলে যে ইঙ্গিত করেছে তাও বিশ্বাস করতে চান, কিন্তু এই মূর্তি দেখলে বিশ্বাস করা কেমন যেন শক্ত হয়ে পড়ে। সকালে মাথা একটু ঠাণ্ডা, তাই সংশয়ও একটু

উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বউয়ের যত দোষই থাক, ছেলের স্বভাবও যে জানে না এমন নয়।...তার বাপের স্বভাবও জানতেন। সে-তুলনায় ছেলের চরিত্র যে ঢের বেশি নীচুস্তরের এই অশান্তিও মনের তলায় ঢাকা ছিলই। সকালে বউয়ের এই মুখের দিকে চেয়ে আরো একটু সমস্যায় পড়লেন তিনি।...ছেলে যে-সব ইঙ্গিত করেছে সেটা খোলাখুলি বলতে গেলে কর্তা বিশ্বাস করবেন না, উল্টে অসুস্থ শরীরে হঠাৎ ক্ষেপেই উঠবেন হয়ত। বউ তাকে ভালো মতো বশ করেছে।

কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যে মন স্থির করে কর্তার কাছে এসে বসলেন তিনি। বউ যেমনই হোক, ঘোষালের ওই লম্পট ছেলের মতলব যে ভালো নয় সে তো বুঝবেন। তাঁরা চোখ বুজলে ওই ছেলে তাঁদের ছেলেকে প্রাণে বাঁচতে দেবে? নিষ্কণ্টক হবার জন্য একেবারে শেষ করে ফেলবে না? আস্কারা তেজ দেখিয়ে কিছু প্রশ্রয় যে বউ ওকে দিয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই—নইলে নীচে নেমে নিজে চাঁদার টাকা দিতে যাবে কেন? ব্যাপারটা যে সত্যি ইতিমধ্যে প্রসন্নকে জেরা করে তিনি তা জেনে নিয়েছেন।

আট মাসের ঘটনা ব্যক্ত করেছিলেন তিনি স্বামীর কাছে। বউয়ের প্রতি কটাক্ষ তেমন স্পষ্ট না হলেও উষ্মা গোপন থাকছিল না। শুনতে শুনতে অসুস্থ মহেশ্বর দত্তর মুখের ওপর কালো ছায়া পড়ছিল। তিনি শুনছিলেন শুধু, একটিও মন্তব্য করছিলেন না। গৃহিণী তাই ভয়ে ভয়ে এক-একবার তাঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

—বলে যাও।

বাধা পড়ল। দুধের বাটি হাতে চণ্ডীবউ ঘরে ঢুকেছে।

মহেশ্বর দত্ত নীরস কণ্ঠে বলে উঠলেন, দরকারী কথা কইছি, এখন যাও।

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চণ্ডীবউ থমকে তাকালো একবার। দুধের বাটিটা সামনে রেখে যাবে কিনা সেই দ্বিধা। শাশুড়ী তক্ষুনি হাত বাড়াতে বাটিটা তাঁর হাতে দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে এলো।

গৃহিণী মনে মনে খুশি। এই সুরে বউয়ের সঙ্গে কথা কইতে আর শোনেন নি। দুধের বাটি সামনে ধরলেন!—আগে খেয়ে নাও।

মহেশ্বর দত্ত আবারও তেতে উঠলেন, যে পিণ্ডি গিলছি আগে সেটাই শেষ হোক—

গৃহিণী তাড়াতাড়ি দুধের বাটি সরিয়ে রাখলেন।

সব শোনার পর মহেশ্বর দত্ত স্তব্ধ নির্বাক অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, এ-সবই তুমি তোমার ছেলের মুখে শুনেছ তো?

প্রশ্নের ধরণটা পছন্দ হল না। গৃহিণী মাথা নাড়লেন। তারপর একটু জোর দিয়েই বললেন, শ্রীনাথকে ছাড়িয়ে আনার জন্য রাতদুপুরে লোকজন দিয়ে প্রসন্ন আর ওই পেটুক বামুনকে পাঠিয়েছিল সে-খবর তো আর মিথ্যে নয়—প্রসন্নই বলেছে—আর বউমা নিজের হাতে ওই ছোঁড়াটাকে চাঁদা দিয়েছিল কিনা তাকেই ডেকে জিজ্ঞাসা করো না—

—হুঁ। মহেশ্বর দত্ত অন্যমনস্ক। ভাবছেন কিছু।

সেদিন বয়স্ক পড়শীরা স্বাস্থ্যের খবর নিতে এলে দু'এক কথার পর তিনি তাদের ফিরিয়ে দিলেন না। নিজেই জানালেন একটু সুস্থ আছেন, পথের ধকল কমেছে

খানিকটা। তাদের জন্য জলখাবারের হুকুম দিয়ে গল্প করতে বসলেন। গল্পের বিষয়বস্তুর ইন্ধনও তিনিই যোগালেন।

এরা সকলেই অল্প-বিস্তর অনুগ্রহভাজন তাঁর। তাই ঘোষালবাড়ির ওই ছেলের প্রসঙ্গে নিন্দার সুরেই কথাবার্তা কইল। কিন্তু তাঁর নিজের ছেলে অর্থাৎ রাধানাথের প্রসঙ্গও যে সন্তর্পণে এড়িয়ে গেল তাও লক্ষ্য করলেন। সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ শুধু তাঁর ঘরের বউয়ের সম্পর্কে। সাক্ষাৎ মা-চণ্ডীই বলল তারা তাকে। এই প্রশংসা নিখাদই মনে হল মহেশ্বর দত্তর। তখনই শুধু দু'দুটো বড় খবর জানলেন তিনি। এক, গোরা সাহেবকে হটিয়ে দিয়ে পালোয়ান ষষ্ঠীচরণকে খুনের দায় থেকে রক্ষা করার খবর। দ্বিতীয়, বুদ্ধির জাল ফেলে গোরা হাকিমকে কাবু করে মুনকেকে হাজত থেকে বার করে আনার খবর। আর গোরা হাকিমের সামনে মুনকের সেই রাম খাওয়া এমনই রোমাঞ্চকর ব্যাপার যে সাহেব তো পালালোই, ওদের দলের ভিন গাঁয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী পেটুক 'ব্রহ্মা' ভয়ে গাঁ থেকেই উধাও।

মহেশ্বর দত্তর কান জুড়চ্ছে। ভিতরে ভিতরে বড় বড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন তিনি। বাইরে গম্ভীর। বললেন, কিন্তু বউমার একটা বিচার আমাকে করতেই হবে, শুনেছি নিজে হাতে তিনি ওদের বারইয়ারীর চাঁদা দিয়েছেন—

অনুগ্রহভাজন শুভার্থীরা থমকালো একটু। নীরব খানিক। কিন্তু গাম্ভীর্য সত্ত্বেও কর্তার রোগপাণ্ডুর মুখখানা অকরুণ মনে হল না খুব। তাই সাহসে ভর করে একজন বলে ফেলল, ইয়ে, চাঁদা দিয়েছেন বটে...কিন্তু আমরা তো শুনেছি দু'বারইয়ারীতে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি কাটাকাটি হবে না এই কড়ারে মা-চণ্ডী টাকাটা দিয়েছিলেন...নইলে যে রেষারিষি চলছিল তখন রক্তারক্তি কাণ্ড একটা হতই।

মহেশ্বর দত্ত উৎসুক, উদ্গ্রীব। তাই নাকি?

সকলেই তখন একবাক্যে সায় দিল, তাই বটে—ঘোরালো অবস্থাই দাঁড়িয়েছিল।

মহেশ্বর দত্তর আবার কান জুড়িয়েছে। ভিতরটা হালকা হয়ে হয়ে অসুখটাকে পর্যন্ত যেন তরল করে দিয়েছে। এই খুশির আঁচ পেয়ে শুভার্থীরা তখন আর একটা মনের কথাও ব্যক্ত করে ফেলেছে। নিজের আওতায় পেয়ে রাগের মাথায় রাধানাথ যে আঘাত করে বসেছিল ঘোষালবাড়ির ওই ছেলেকে, তারপর হাতে পেয়ে ওই গোঁয়ার ছেলে এত সহজে রাধানাথকে ছেড়ে দিত না নিশ্চয়—মা-চণ্ডী গিয়ে হাজির হতে সর্বরক্ষে। ভয়ে ত্রাসে গাঁয়ের লোকেরা তো বোবাই হয়ে গেছল।

তারা চলে যাবার পর গিন্নীকে দেখামাত্র মহেশ্বর দত্ত দপ করে জ্বলে উঠলেন একপ্রস্থ।—তোমার ছেলে একটা বাঁদর, আস্ত একখানা মর্কট—বুঝলে?

প্রথমে গৃহিণী হকচকিয়ে গেলেন। তারপর তাঁরও রাগ হল। ছেলে যেমনই হোক, এতখানি পক্ষপাতিত্ব কোন মায়ের সহ্য হয়! বলে উঠলেন, তুমি যখন এই ভাবো, তখন বাইরের মেয়ের আর দোষ কি—সে আরো বেশি করে ভাবুক। অভিমানে গলায় ভাঙন ধরল, চোখে জল এলো।—নাতির মুখ দেখব আশায় কত কষ্ট করে কোন্ দূরে ছুটে গেলাম, পূজো দিলাম—কিন্তু কার কি হবে—এত তেজ তোমার ওই ভালো মেয়ের যে ছেলের সঙ্গে এক ঘরে থাকে না পর্যন্ত—তোমার আসকারা না পেলে এত সাহস হয় কি করে?

বেগে প্রস্থান করলেন তিনি। মহেশ্বর দত্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

এর পরেই যাকে ডাকার কথা তাকে, অর্থাৎ চণ্ডীবউকে ডাকলেন না। জোর-জবরদস্তি করলে শ্বশুরের সামনে হাঁ-না গোছের দু-একটা কথা মুখ দিয়ে বার করে। কি ভেবে প্রথমে ছেলেকেই ডাকলেন তিনি। সে আসতে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর মায়ের কাছে শুনলাম বউমা ওদের বারইয়ারীতে অনেক টাকা চাঁদা দিয়েছেন। সত্যি নাকি?

ছেলে সবিনয়ে মাথা নাড়ল। সত্যি।

—কেন দিয়েছেন জিজ্ঞেস করেছিলি?

ছেলে নীরব এবার।

—বেশি কথা বলতে আমার কষ্ট হয়, কেন দিয়েছেন জিজ্ঞেস করেছিলি?

—বউমা কি বলেছেন?

—বলেছে, মারামারি কাটাকাটি হবে না এই কড়ারে দিয়েছে।

তারপরেও তুই শ্রীনাথের গায়ে হাত তুলতে গেলি কেন? তাকে বাঁধতে গেলি কেন?

—আমার লোককে সে আগে মেরেছিল।

মহেশ্বর দত্ত ক্রুদ্ধ মুখে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, খেলার মধ্যে মারা আর এই মারা এক হল? আর তা বলে তুই ঘোষালের ছেলের মাথা ফাটাতে গেলি?

ছেলে নিরুত্তর।

সেই সকাল থেকে একরকম নিঃশব্দে প্রস্তুত হচ্ছিল চণ্ডীবউ। শ্বশুরের ঘরে তার ডাক পড়বে। জেরা শুরু হবে। কৈফিয়ত তলব হবে। সে জবাব দিতে পারবে না। মুখ বুজে থাকতে হবে। কিন্তু মুখ বুজে থাকাটা অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ার সামিল। এই বিকেল পর্যন্ত সেটুকুই সহ্য করার শক্তি সংগ্রহ করছে সে। হাওয়া-বদল সকাল থেকেই টের পাচ্ছে।

ঘরের জানলার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল।

শশব্যস্তে ঘরে ঢুকল প্রসন্নময়ী।—মা মা করে কর্তা যে ওদিকে গলা ভেঙে ফেললেন, তুমি শুনতে পাচ্ছ না বউমণি?

চণ্ডীবউ আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। শুনতে পায় নি। এত দূর থেকে শুনতে পাওয়ার কথাও নয়। মা-মা করে ডাকছেন, আজ এটুকুই শুধু অপ্রত্যাশিত।

ঘরে পা দিতেই মহেশ্বর দত্ত বলে উঠলেন, এতক্ষণে আমার চণ্ডীমা সদয় হল? বুড়ো ছেলের ওপর রাগ হয়েছে বুঝি, অ্যাঁ? নিজের হাতে আর ওষুধ দিলে না পথ্যি দিলে না, সব ওই বুড়ী করছে, কি ব্যাপার? দেখি, মুখখানা দেখি—মাথার ঘোমটা টানো তো—

এর থেকে অপ্রত্যাশিত আর কি হতে পারে? চণ্ডীবউ পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে গেল। মাথার ঘোমটা সামান্য খাটো করে হাসতেও চেষ্টা করল একটু।

—বাঃ, এই তো! সাক্ষাৎ মা-চণ্ডীই বটে। দেখো, চোখ বোজার সময় হয়েছে, যে কটা দিন আছি এখন রাগ হলেই রাগ করব—কিন্তু তা বলে আমার মা-চণ্ডী ফিরে রাগ করলে আমি আরও তাড়াতাড়ি চোখ বুজতে চেষ্টা করব বলে দিলাম। বোসো এখানে, বোসো বলছি।

শয্যার পাশে বসল। আধঘণ্টা ধরে তারপর মহেশ্বর দত্ত মা-লক্ষ্মী মা-লক্ষ্মী করে

কলকাতার গল্প শোনালেন আর নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে হতাশার কথা শোনালেন। তারপর নিজের থেকেই আবার তাকে অব্যাহতি দিলেন, যাও মা যাও সারাক্ষণ আমি একলাই তোমাকে আগলে রাখব কেন?

ভিতরে ভিতরে বেশ অবাক হয়েই চলে এসেছে চণ্ডীবউ। শেষের অমন কথাও আগে আর কখনো শোনে নি।

সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে লাঠির ঠুক-ঠুক আওয়াজ কানে আসতে সচকিত। পরক্ষণে আরো সঙ্কুচিত। লাঠি ভর করে ঘরের দরজার সামনে শ্বশুর এসে দাঁড়িয়েছেন, পিছনে শাশুড়ী।

হাসিমুখে মহেশ্বর দত্ত বললেন, শুয়ে বসে থেকে হাতে পায়ে খিল ধরে গেল—মা-লক্ষ্মী এ ঘরে দেখছি, কি করছ গো?

চণ্ডীবউ ততক্ষণে মাথার কাপড় টেনে দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঘরের ভিতরে চোখ চালালেন মহেশ্বর দত্ত তারপরেই বিষম অবাক যেন—এ-ঘরে বাক্স বিছানা আলনা...কে থাকে?

চণ্ডীবউ নির্বাক। ওদিকে শাশুড়ীও নিরুত্তর।

মহেশ্বর দত্তর গলা চড়ল—বলি বাড়িতে কি নতুন লোক এলো নাকি? এঘরে কে থাকে?

মিনমিন করে পিছন থেকে শাশুড়ী জবাব দিলেন, বউমা-ই থাকে শুনেছি...সুবিধে হয় বোধ হয়।

এবারে আকাশ থেকেই পড়লেন যেন মহেশ্বর দত্ত।—অসুবিধে হয়! অসুবিধে হলে নিজের ঘর ছেড়ে আসতে হবে! তারপরই রাগ।—আমি বনেদী মানুষ, এখনো বেঁচে আছি, এই বাড়ি ঘর দোর সব এখনো আমার—এখানে এক হাত জায়গা কারো নিতে হলে আমার হুকুম নিতে হবে—বুঝলে তোমরা? সরোষে গৃহিণীর দিকে ফিরলেন, হাঁ করে দেখছ কি ও ঝিটাকে ডেকে এই সব ওর ঘরে নিয়ে যেতে বলো। সময় হলে আমিই সব ব্যবস্থা করতে পারব, সেজন্যে কারো ভাবতে হবে না—

লঠির শব্দ তুলে অসহিষ্ণু পায়ে প্রস্থান করলেন তিনি। শাশুড়ী অনুসরণ করলেন।

চণ্ডীবউ নিশ্চল দাঁড়িয়ে। 'সময় হলে' বলার ইঙ্গিতটা বেশী স্পষ্ট ঠেকল কানে। সময় হলে অর্থাৎ লোক বাড়লে।...

রাত্রি।

বাহুতে কপাল আর চোখ ঢেকে রাথানাথ শয্যায় শয়ন। চণ্ডীবউ ঘরে ঢুকল। শয্যার সামনে এসে দাঁড়াল। ঠোঁট লাল। পান খাচ্ছে। প্রতি বৃহস্পতিবার শাশুড়ীর লক্ষ্মীপূজার পান খেতে হয়।

কপাল থেকে একবার হাত সরালো রাধানাথ। ঘুমের আমেজ এসেছে যেন...ওই লাল ঠোঁটের থেকেও বউয়ের মুখ বেশি জ্বলজ্বলে আর চকচকে ঠেকল।

চণ্ডীবউ কাছ থেকেই দেখছে তাকে। আল্‌তো করে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মা স্বপ্ন দেখে-ছেলের আশায় কলকাতায় পূজো দিতে ছুটেছিলেন...আমি এ-ঘরে এলেই তাঁর স্বপ্ন সফল হবে?

সঙ্গে সঙ্গে দু'কান লাল রাধানাথের। এই ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ একেবারে অশ্লীল

ঠেকল কানে। কিন্তু ঘুমও পেয়েছে, অতএব রোষের অভিব্যক্তি ভালো করে প্রকাশ পাবার আগেই তার একখানা বাহু আবার চোখ আর কপালের ওপর ওঠে এলো।

॥ ২৬ ॥

মহেশ্বর দত্তর অসুখ বেড়েই চলল। চিকিৎসার ঘটাও। রাণাঘাটের বড় বদ্যিকে দ্বিতীয় দফা তলব পাঠাতে তিনি সাফ জবাব দিলেন রোগীর মরজিমতো চিকিৎসা করে তিনি সুনাম খোয়াতে রাজী নন, ওই লোকের রোগ সারানো শিবের অসাধ্য।

রাণাঘাটের বড় বদ্যির পথ্যের ফিরিস্তি শুনেই তার ওপর আস্থা হারিয়েছিলেন মহেশ্বর দত্ত। কলকাতার বদ্যিদের মতোই শিক্ষা-দীক্ষা তাঁরও। ভাত বন্ধ, পোলাউ-কালিয়া বন্ধ, পরমান্ন বন্ধ, সন্দেশ রাজভোগ ক্ষীরখণ্ডি বন্ধ, মায় আলু পর্যন্ত বন্ধ। মেহ রোগ ইংরেজি নাম ডায়বেটিস—এই সব বন্ধ না করলে নাকি চিকিৎসা নিরর্থক। তাছাড়া আরো কি-সব রোগের উপসর্গের দরুন পথ্যের বরাদ্দ যা তারও পাচ্যপ্রণালী এমন যে গলা দিয়ে নামানো দায়।

বলা বাহুল্য কলকাতায় বদ্যির নির্দেশ তিনি আদৌ মানেন নি। তোয়াজের শরীর, সাতদিন এই পথ্যের ওপর চললেই তো উপোসে স্বর্গলাভ হবে, তার জন্যে আর চিকিৎসার দরকার কি?

এ-ব্যাপারে গৃহিণীও স্বামীর সঙ্গে দ্বিমত নন খুব। পেট খারাপ নয়, জ্বর-জ্বালা নয়, অথচ যা-কিছু মুখরোচক সব বন্ধ—এ কেমন কথা?

রাণাঘাটের বদ্যির কথা শুনে মেজাজ বিগড়েই গেছল মহেশ্বর দত্তর। এ তো আর কলকাতা নয় যে মুখ বুজে থাকবেন। বলেছিলেন, সব বন্ধ করলে বুকের লাপ-ডাপ বন্ধ হতে কদিন আর লাগবে। ঠিক আছে, আপনি চিকিৎসা তো করুন।

অর্থাৎ রোগের চিকিৎসা হোক, পথ্য নিয়ে তাঁর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। পরে করণের বদ্যি সমঝদারের মতোই তাঁর এ উক্তি সমর্থন করেছে। সব ছাড়লেও দু'বেলা চারটে করে সরু চালের ভাত আর সকালে চারটে সন্দেশ এবং বিকেলে চারটে রাজভোগ ভিন্ন দত্তমশায়ের মতো মানুষের শরীর টেকে কি করে? ও শরীরে এই তো উপোসের সামিল। অতএব মহেশ্বর দত্ত রাণাঘাটের বদ্যির চিকিৎসার নির্দেশ আর করণের বদ্যির পথের নির্দেশ মেনেছেন।

ফলে এক মাস না যেতে কাহিল অবস্থা। দত্তগৃহিণীর ধারণা এ-ভাবে আহার কমানোর ফলেই কর্তার এই হাল। রাণাঘাটে আবার লোক ছুটতে তার মারফত তিনি আবেদন পেশ করেছিলেন, রাতে অন্তত খানিকটা রাবড়ি ভিন্ন কর্তার শরীর টিকছে না। আহারের ফিরিস্তি শুনে নাকি আষাঢ়ের মেঘের মতো হয়েছিল রাণাঘাটের বড় বদ্যির মুখখানা, আর রাবড়ির আবেদন শুনে তেড়ে মারতেই এসেছিলেন। তারপর সাফ জবাব দিয়েছেন তার দ্বারা কিছু হবে না।

ভিন্ দেশের চিকিৎসকের থেকে গাঁয়ের বদ্যির ওপর দত্তগৃহিণীর অন্তত আস্থা বেশি। বলতে গেলে আপনার জন, দয়া-মায়া আছে। সাড়ম্বরে অভয় দিয়ে সে

চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করল। আর প্রথমেই রোগীর অভ্যাসমত আহারের পুনর্ব্যবস্থা করে দত্তগৃহিণীর আস্থা অর্জন করল।

এদিকে কর্তার রোগও খারাপের দিকে গড়াতে থাকল। টোটকা-টুটকি কবচ তাবিজ সব নিষ্ফল। মহেশ্বর দত্তর চারদিকে একটা শেষের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। শুভার্থীজনের পরামর্শে গাঁয়ের পশ্চিম প্রান্তের নয়নচাঁদ সাধুর শরণাপন্ন হলেন তিনি।

গাঁয়ের ব্রাহ্মণদের প্রতিকূলতা আর টিকা-টিপ্পনী ঠেস ঠিসারার মধ্যেই ওই সাধুর নাম ছড়াচ্ছে, ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে। নয়নচাঁদ নীচুজাতের সন্তান। তার বাপ ছিল ভদ্রলোক মাত্রেরই অনুগ্রহভাজন। সাধুর নিজগুণে জাত নিয়ে খোঁচাখুঁচি কমে এসেছে তখন। গুণীর কোপে সকলের ভয়। তাঁর ব্যধি সারানো ফাঁড়া কাটানোর কেরামতিতে এখন আর সাহস করে অবিশ্বাস করে না কেউ। সাধু নিজে অস্বীকার করে বলেই সেটা আরো বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। ওদিকে মানুষটা যেমন সরল তেমনি অমায়িক। বছরে ন'মাস খালি গায়ে থাকে, পরিষ্কার খাটো ধুতি পরে, চোখে তার-জড়ানো কাচ লাগিয়ে কাঁথা সেলাই করে আর গান করে। ছেলেবেলায় অপঘাতে তার একটা চোখ নষ্ট হয়েছিল, সেই জন্যই অন্য চোখেও এখন কাচ লাগাতে হয়। সম্প্রতি সাধুর তান্ত্রিক বশ করার খবর রটতে তার প্রতি লোকের ভয়-ভক্তি আরো বেড়েছে। অঘোর নিবাসের ক্ষমাযোগিনী আর তার ভাই ওই হৃদয় অঘেরীকে সাধুর দাওয়ায় বসে থাকতে দেখা গেছে। এবং হৃদয় অঘোরীকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ওখানে। যে হৃদয় অঘোরী ক্বচিৎ কারো সামনা-সামনি পড়ে গেলে ভয়ে দশ হাত তফাতে হটে যেতে হয়, যার হাতের দুধ আর গঙ্গাজল পড়লে মন্ত্রসিদ্ধ মড়ার মাথার খুলিগুলি এখনো খট-খট করে হাসে বলে জানে সকলে—সেও কিনা ওই সাধুরভক্ত হয়ে উঠেছে! অতএব তার মাহাত্ম্য নিয়ে সংশয় প্রকাশের সাহসও এখন স্তিমিতপ্রায়।

কিন্তু আশ্চর্য, মহেশ্বর দত্তর ডাকে সাড়া মিলল, কিন্তু সাধু এলো ন। সনির্বন্ধ অনুরোধের জবাবে নয়নচাঁদ জানালো, নিত্যপুরুষের দীন সেবক সে—কোনো অহং-কর্মের উদ্দেশ্য নিয়ে কোথাও আর তার যাওয়া সম্ভব নয়।

শুনে শ্রদ্ধা-ভক্তি দ্বিগুণ বেড়েছে মহেশ্বর দত্তর। সেই সঙ্গে ভয়ও। আরোগ্যের আশা নেই বলেই নয়নচাঁদ এলো না, নইলে ঠিক আসত। নিজের বিকল দেহটা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে তিনিই গেলেন। নয়নচাঁদ আগের মতোই ভক্তিভরে তাঁর সামনে আনত। আগের মতো কেন, আগের থেকে ঢের বেশি।

ব্যাধির প্রকোপ দেখে সে বিষণ্ন হয়েছে। নিজের অক্ষমতা জানিয়ে ওষুধও দিয়েছে। বলেছে, বাবুমশায়, তাঁকে ডাকুন, তিনি সদয় হলে তবেই ওষুধ তবেই চিকিৎসা।

বার দুই-তিন মহেশ্বর দত্ত তার কাছে গেলেন। ওষুধ এনেছেন। খেয়েছেন। ভক্তি আর বিশ্বাসের ফলেই গোড়ায় গোড়ায় মনে হয়েছে ভালো আছেন, মনে হয়েছে সেরে উঠবেন। কিন্তু দ্বিগুন বিষাদে আচ্ছন্ন হতে খুব বেশি সময় লাগে নি। দেহ শয্যায় মিশছে। তারপর ক্রমে উত্থানশক্তিরহিত।

এই সময় থেকেই বউকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন শাশুড়ী। কলকাতায় গিয়ে কর্তাকে কালব্যধিতে ধরেছে এ যেন তারই অপরাধ। আট মাসের অনুপস্থিতিতে বউয়ের বুকের পাটা কতখানি বেড়েছে আর কত কাণ্ড করেছে শুনতে বাকি নেই।

তাছাড়া ছেলে নিজেই যে বউয়ের মতিগতি সম্পর্কে কত সন্দিগ্ধ তাও জানেন। মায়ের পূজোয় কোথাও ব্যাঘাত ঘটেছে বলেই কর্তার সুস্থ দেহে ব্যাধির প্রকোপ। অনাচার—মনের তলায় কেউ অনাচার পুষছে। পুরুষের অনাচার ধর্তব্যের মধ্যে নয়, ওটা স্বভাবের অঙ্গ। কিন্তু অন্তঃপুরের মেয়ে বউয়ের মনের তলায় অনাচারের সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকেও একটা সংসার জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যেতে পারে বলে বিশ্বাস।

এই অনাচারের ছায়াই দত্তগৃহিণী আজকাল বেশি করে দেখতে লাগলেন। কলকাতায় মায়ের থানে পূজো দেবার আগে আর পরেও বউকে অনেক শেকড় বাকড় পরানো হয়েছে, অনেক অব্যর্থ গুণীর লতাপাতা বেটে খাওয়ানো হয়েছে। কিন্তু সব হজম। বংশধর আসার কোনো লক্ষণই নেই। কিন্তু ইদানীং এত দুঃসাহস ওই দেমাকী বউয়ের যে মন্ত্রপূত তাবিজ-কবচ-ওষুধবিসুদের ওপরেও অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস। এখন কিছু ধারণ করতে বললে যেন শোনেই নি এমনি ভাবখানা করে চলে যায়, কিছু বেটে-টেটে খেতে বললেও তাই। ও-সব ঘরে দিয়ে এলেও তেমনি পড়ে থাকে—এত সাহস এখন ওই বউয়ের।

রাগে আর দুশ্চিন্তায় জর্জরিত তিনি। বংশধরের মুখ দেখতে পেলেন না সেই খেদ তো আছেই। তারপর কর্তার শরীরের যে হাল, চোখ বুজলে এমন বউকে কে সামলাবে? আর তারপর তিনি নিজে চোখ বুজলে। ভাবতে গেলে শিউরে ওঠেন। সব যাবে, সেই সঙ্গে তাঁর পেটের ছেলে রাধানাথও যাবে। বউয়ের প্রতি মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠতে লাগল তাঁর। সামনে যত নয়, আড়ালে তার দ্বিগুণ। এই সংকটের একমাত্র সমাধান সময় থাকতে এবং কর্তা বেঁচে থাকতে ছেলের আবার বিয়ে দেওয়া। দিলে রূপসী বউ টিট হবে, তার প্রতাপ কমবে। ছেলে রক্ষা পাবে। বংশ রক্ষা পাবে। এমন গল্পও শুনেছেন, অহঙ্কারী বউয়ের ছেলে হয় না দেখে স্বামী আবার বিয়ে করল, আর তখন পরের বউ ছেড়ে আগের বউয়েরও সুড়সুড় করে ছেলে হল—তখন দুই বউয়ের ছেলে পুলেয় ভরাট সংসার।

কিন্তু মুশকিল হল, কর্তার কাছে প্রস্তাবটা ভালো করে উত্থাপনও করতে পারেন না দত্তগৃহিণী। আভাস দিতে গেলেও অসুস্থ শরীরে এমন মারমুখী হয়ে ওঠেন যে পালাবার পথ খুঁজতে হয়। ফলে ক্রমাগত ছেলের মন ঘোরাতে চেষ্টা করেছেন তিনি। কর্তাকে বল্, চিরকাল ওই বাঁজা বউ নিয়ে ঘর করবি!

রাধানাথ পাশ কাটাতে চেষ্টা করে, বেশি বেগতিক দেখলে পালায়। এই পালানোর মধ্যে পুরুষের তেজ ছেড়ে কাপুরুষতাই বেশি চোখে পড়ে তাঁর। অসহায় বোধ করেন, আবার রাগে জ্বলেন। তাঁর বদ্ধ ধারণা, মুখে যত হম্বিতম্বি করুক আর নালিশ করুক, আসলে মনে মনে ওই রূপসী দেমাকী বউকে বিলক্ষণ ভয় করে ছেলেও। নইলে এই বয়সের ছেলে, বিয়ের নামে পালায়! ভয় করলে যে সর্বনাশ এটুকু পর্যন্ত বোঝে না।

শাশুড়ীর মনোভাব চণ্ডীবউয়েরও অগোচর নয়। ঘরের লোকের তরল ঠাট্টা ইয়ারকির থেকে টের পায়। মায়ের কথা বলে বউকে একটু ঘাবড়ে দেবার ইচ্ছেও যে মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দেয় না এমন নয়। এ ছাড়া প্রসন্নও চুপিচুপি একদিন কর্তা-গিন্নীর ঝগড়ার খবর জানিয়েছে তাকে। গিন্নীর ফরমাশমত আমলকি-চূর দিয়ে আসতে গিয়ে

প্রসন্ন ঘরে আর ঢুকতে পারে নি। ছেলের আবার বিয়ের কথা নিয়ে ঝগড়া। কর্তা নাকি বেশ চড়া গলায় বকাবকি করছিলেন গিন্নীকে। কি বলে গিন্নীকে বকাবকি করছিলেন ইচ্ছে করলে চণ্ডীবউ তাও শুনতে পারত। কিন্তু সেদিক থেকে খানদানী সম্ভ্রমবোধ তারও। ওটুকু শুনেই প্রসন্নকে ধমকে উঠেছিল, তোর সবেতে আড়ি পাতা দরকার কি—যা, বেরো এখান থেকে!

তারপর অব্যক্ত রাগে দাঁতে করে নিজের ঠোঁট কামড়েছে শুধু। পারলে একটা ছেড়ে আরো একগণ্ডা বিয়ে দিত ওঁদের ছেলের, দিয়ে দেখত ক'গন্ডা ছেলেপুলে আসে! মুখে কিছু না বললেও তার এই মেজাজের আঁচ শাশুড়ী পাচ্ছেন ইদানীং। শ্বশুরের কাজ সযত্নে নিজের হাতে করে কিন্তু শাশুড়ীকে দেখলে নিঃশব্দে সরে আসে।

কর্তা-গিন্নীর কানে একদিন খবর এলো নয়নচাঁদ সাধুর অলৌকিক করুণার ফলে আধ-বয়সী এক বন্ধ্যা সন্তানলাভ হয়েছে। রমণীটি নাকি ঠায় চার ঘন্টা সাধুর পা জড়িয়ে ধরে পড়ে ছিল আর কাঁদাকাটা করেছিল। নাজেহাল হয়ে সাধু তাকে কথা দিয়েছিল নিত্যপুরুষের কাছে প্রার্থনা করবে। সেই প্রার্থনায় ফল ধরেছে শুনলেন কর্তা-গিন্নী।

নতুন আশায় আর একদফা চাঙা হয়ে উঠলেন মহেশ্বর দত্ত। সাধুর কাছে ঐকান্তিক আরজি পাঠালেন। বংশধরের মুখ দেখে যাবেন, এটুকুই আশা এখন, আর কোনো ভিক্ষে নেই। সাধু নিজে আসবে না, অতএব ছেলে আর বউকে একসঙ্গে সাধুর কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি। বাপের হুকুমে রাধানাথ বউকে নিয়ে বেরিয়ে মাঝপথ থেকে সরে গেছল। এই প্রত্যাশা নিয়ে অন্তত সাধুজীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস তার নেই। ভয়, সাধুজী এক-নজর তাকিয়েই পাছে সমস্ত দুর্বলতা ধরে ফেলে। সে চলে যেতে চণ্ডীবউ ষষ্ঠীচরণের ডেরায় খনিক সময় কাটিয়ে ঘরে ফিরেছে। তারপর কর্তার উন্মুখ জেরার সামনে পড়ে জবাব দিয়েছে, সে কিছু জানে না, তার সঙ্গে সাধুজীর কোনো কথা হয় নি।

মহেশ্বর দত্ত ধরে নিয়েছেন, কথা তাহলে ছেলের সঙ্গে হয়েছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সে চোখ-কান বুজে বাপকে ভাঁওতা দিয়েছে, বলেছে, এ সম্বন্ধে কারো সঙ্গে কথাবার্তা কইতে সাধুজী নিষেধ করেছেন।

মাস ছয় আশায় আশায় থাকার পর শাশুড়ীর আবার মেজাজ বিগড়াতে শুরু করেছে দেখেই শ্বশুর এবার সাধুজীর কাছে একলা পাঠিয়েছেন তাঁর মা লক্ষ্মীকে। পশ্চিম-প্রান্তের সাধুজীর আখড়ার পথে চার-বেয়ারার সেই লাল পালকি অনেকে দেখেছে। সেবারে চণ্ডীবউ যথার্থই সাধুর কাছে গেছে। খবর পেয়ে ঘোষালবাড়ির ছেলেটা আগেই যে সেখানে গিয়ে আড়ালে ওত পেতে বসেছিল জানে না। সাধুর কাছে গিয়ে চণ্ডীবউ শ্বশুরের ব্যামোর কথা বলেছে আর তাঁর জন্য ওষুধ চেয়েছে। তারপর সদর রাস্তায় সকলের চোখের ওপর দিয়ে, সকলের চোখে লালের ঘোর লাগিয়ে, রক্তগোলাপ পালকিতে হেলেদুলে রাজেন্দ্রাণীর মতোই ঘরে ফিরেছে। তারপরেই শ্বশুরের ঘরে ডাক পড়বে জানে। কি বেশে দত্তবাড়ির বউ গেছল সাধু-সন্নিধানে বুড়ো-বুড়ী তাও খুঁটিয়ে দেখবেন জানা কথাই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মোটা দুটো গয়না হাতে পরেছে, গলায় ঝকমকে একটা বাড়তি হার আর দু'হাতের আঙুলে

আরো দুটো করে আংটি পরেছে, আর তারপর বেশ খানিকটা সিঁদুর কপালে আর সিঁথিতে লেপে দিয়েছে। সাধুজীর আশীবাদ ভেবে ওটুকু দেখেই আশায় আনন্দে শ্বশুর শাশুড়ী রোমাঞ্চিত।

...রাতে তার সেই মূর্তি দেখে ঘরের লোকও উৎসুক হয়েছিল বইকি। সাধুর কাছে যাওয়ার খবর রাখত। জিজ্ঞাসা করেছিল, সাধু কি বললেন?

—কি বলতে পারেন বলে তোমার মনে হয়?...আশার কথা কিছু?

বিব্রত মুখে রাধানাথ বলেছে, ইয়ে, না—

লুব্ধ দু'চোখ মুখে আটকেছে, কথা খুঁজে পায় নি।

তাহলে?

প্রসঙ্গ বাতিল করে রাধানাথ অনেক দিন বাদে আবার তরল তোষামোদের সুরেই বলেছিল তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু আজ...মাইরি বলছি।

চণ্ডীবউয়ের চোখে তারায় তখনই শুধু হাসি কেঁপে উঠেছিল এক ঝলক। চোখে চোখ রেখে বিদ্রূপের সুরে বলে উঠেছিল, তাহলেই বা কি...?

ওই একটি কথায় আর একটু হাসিতে কি হুল ছিল, তা শুধু এই একজনই জানে। রাগে মুখ কালো করে রাধানাথ পাশ ফিরে শুয়ে ছিল।

'আমাদের রোগ শোক দুঃখ সবই পাপের ফল—পূর্বজন্মের পাপ, এ-জন্মের পাপ, নিঃশ্বাসে পাপ টেনে নিচ্ছি, প্রশ্বাসে পাপমোচনও করছি কিছু—কিন্তু টানার ভাগ মোচনের ভাগ থেকে বেশি হয়ে পড়েই—'

বুক-সমান কাঁচা-পাকা দাড়ি নেড়ে গভীর তত্ত্বকথাগুলো বলেছিলেন কৃষ্ণ নগরের নামী পণ্ডিত বিষ্ণুশরণ হালদার। মহেশ্বর দত্তর বড় মেয়ে নিজের ছেলেপুলে সহ শ্বশুরকুলের এই গুরুদেবটিকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ি পদার্পণ করেছে। বাবা-মা কলকাতা থেকে ফেরার পর দুই মেয়েই একবার করে এসে দেখাসাক্ষাৎ করে গেছে। এবং বাপের ব্যাধির দরুন মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তারাও বউয়ের ওপর বিরূপ হবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু নিজেদের সংসারের ঝামেলায় বাপের বাড়িতে বেশিদিন থাকার সুযোগ মেলে নি।

বাপের অসুখ সংকটের দিকে গড়াচ্ছে শুনে বড় মেয়ে আসি-আসি করছিল। এমন দিকে স্বয়ং বিধাতাই মুখ তুলে চাইলেন বুঝি। সশরীরে গুরুদেবের আবির্ভাব। পর্যটনে বেরিয়ে তিনি আবার তাঁর পিতার বিস্মৃতপ্রায় শিষ্যদের সঙ্গে সংযোগ-সাধনে উদ্যোগী। বছর বাষট্টি-তেষট্টি বয়েস। বাপের বিত্তের দরুন শ্বশুরালয়ে মহেশ্বর কন্যার কদর সব থেকে বেশি। তার সেবা-যত্ন পেয়ে গুরুদেবও তার প্রতি অচিরে প্রসন্ন। গুরুদেবের একজন অনুগামী শিষ্য আছে সঙ্গে। তার মুখে গুরুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে মেয়ে এবং তার শ্বশুরবাড়ির মানুষেরা মন্ত্রমুগ্ধ।

এমন একজনের কাছে মেয়ে তার বাপের সঙ্কট মোচন প্রার্থনা করবে না তো কার কাছে করবে। গুরুদেব সদয়। তিনি একবার দেখবেন এবং যথা-সাধ্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে এসেছেন।

তাঁকে দেখে আর মেয়ের মুখে তাঁর কথা শুনে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যেন

বড়সড় একটা আশার আলো দেখেছেন দত্তগৃহিণী। কর্তার তখন বিছানায় নড়াচড়ার ক্ষমতাও ফুরিয়ে এসেছে। সময় ঘনিয়ে এসেছে, প্রাণপণে সেটা অস্বীকার করতে চাইলেও করা যাচ্ছে না। কপাল আর সিঁথিতে সিঁদুরের পরিমাণ চারগুণ বাড়িয়েও দত্তগৃহিণীর রাতে ঘুম নেই। অন্যদিকেও বুকের তলায় আর মাথার মধ্যে সর্বদাই হতাশার দপদপানি। বউকে সেই দ্বিতীয় দফা নয়নচাঁদ সাধুর কাছে পাঠানোর পরেও বছর ঘুরে এলো। বংশধরের মুখ দেখা আর কপালে নেই বুঝে নিয়েছেন। ছেলের আবার বিয়ের নামে কর্তা এখনো তেমনি বিমুখ। তাও মনে জোর পেতেন যদি ছেলেটার মেরুদন্ড বলে কিছু থাকত, যদি বাপের অমতেই আর একটা বিয়ে করার দিকে ঝুঁকত। এখন তার মনে হয় ওই রূপসী বউ শশুর আর স্বামী দু'জনকেই গুণ করেছে—নইলে এই দশা হয়!

এমন দিনে মেয়ে সহ এই ক্ষমতাসম্পন্ন গুরুটিকে পেয়ে যেন নতুন প্রাণ পেলেন তিনি। তাঁরই শ্রীমুখের বচন শুনছিলেন একাগ্রচিত্তে।

গুরুদেব এসেই প্রথমে কর্তার ঘরে ঢুকেছিলেন। স্থির দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেছেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে বুকে হাত বুলিয়েছেন। তারপর মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করেছেন। একটু বাদে কর্তা ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। গুরুদেবও। সেই দৃশ্য দেখে সকন্যা দত্তগৃহিণী কণ্টকিত।

গুরু-সেবার রাজসিক পর্বের পর বিকেলের দিকে তাঁর পায়ের কাছে বসে ছিলেন দত্তগৃহিণী। মেয়ে গুরুর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

বিষ্ণুশরণ দত্তগৃহিণীর মুখের দিকে নিস্পলক চেয়ে রইলেন খানিক। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। দত্তগৃহিণী দুরু-দুরু কাঁপতে লাগলেন। একটু বাদে প্রসন্ন হাসিতে গুরুদেবের মুখ ভরে উঠল। বললেন, মা-গো, আপনার কপালে আর সিঁথিতে ওই সিঁদুর থাকবে না—এও কখনো হয়! এ পরীক্ষা পরীক্ষা—পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়।

গুরুদেবের গলার স্বর টনটনে গম্ভীর। একটা ধাতব রেশ কানে লেগে থাকে যেন। দত্তগৃহিণী কেঁদে ফেললেন, তারপর ওই পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

আধঘন্টা বাদে এমনি মূর্ত পরিবেশে গুরুদেবের কানে দ্বিতীয় সমস্যাটি নিবেদন করলেন দত্তগৃহিণী। বলা বাহুল্য সেটি বংশধরের সমস্যা। সেই স্বপ্নসমাচার এবং কলকাতায় কালীঘাটের জাগ্রত পীঠস্থানে পুজো দিয়ে আসার প্রসঙ্গও অনুক্ত থাকল না।

গুরুদেব বললেন, আচ্ছা, মা-কে ডাকুন একবার, দেখি।

বউয়ের ওপর শাশুড়ীটি ইদানীং সর্বদা রুষ্ট। আজ আরো বেশি রুষ্ট, কারণ এমন একজন মহাপুরুষের পদার্পণ সত্ত্বেও দেমাকী বউ এ-পর্যন্ত এ-দিক মাড়ায় নি। তিনিও ডাকেন নি অবশ্য, কিন্তু গরজ থাকলে নিজে ছুটে আসতে পারত না? ও পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়তে পারত না? আজকের দিনেও সকাল থেকে এ-পর্যন্ত যে রাধানাথেরও টিকির দেখা মেলে নি সেই রাগও বউয়ের ওপরেই গিয়ে পড়ছিল। যেমন বরাত সেই রকমই তো মতিগতি হবে সব।

যাই হোক, এবারে ডেকেই পাঠালেন।

চণ্ডীবউ এলো। ধীর ঠাণ্ডা পদক্ষেপ। মাথায় আধ-হাত ঘোমটা। আনত মুখ।

খরখরে গলায় শাশুড়ী হুকুম করলেন, ভক্তিভরে প্রণাম করো, সাক্ষাৎ দেবতা এসেছেন দয়া করে, দেখো যদি ভাগ্য ফেরে।

পায়ের কাছে মাথা রেখে চণ্ডীবউ প্রণাম করল। সেই প্রণামে শাশুড়ীর খরচোখেও অভক্তির কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না। আসল প্রণামের পর শাশুড়ী আর বড় ননদের আনুষঙ্গিক প্রণামও বাদ গেল না।

গুরুদেব স্থিরনেত্রে চেয়ে আছেন বউয়ের দিকে। তাঁর বুক-প্রমাণ কাঁচা-পাকা দাড়িও স্থির যেন। মুখ দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু রূপ অনুমান করতে পারছেন।

আমি বুড়ো মানুষ, লজ্জা কি! শিষ্যা অর্থাৎ ঠাকরোনের বড় মেয়ের দিকে তাকালেন।—মায়ের মুখখানা যে একবার দেখব!

বড় ননদ ব্যস্ত হাতে বউয়ের ঘোমটা টেনে দিল।

...সেই রূপ দেখে গুরুদেব যেন স্তব্ধ ক্রমশ। গম্ভীরও। নিস্পলক দৃষ্টি।

আমার দিকে চোখে তুলে তাকাও তো!

আস্তে আস্তে মুখ তুলল চণ্ডীবউ। আদেশ পালন করল। সোজা মুখের দিকে তাকালো। এবং পুনর্নির্দেশ না মেলা পর্যন্ত চেয়েই রইল।

অনেকগুলো অস্বস্তিকর মুহূর্ত। মা-মেয়ে দুজনেরই চোখেমুখে শঙ্কার ছায়া। বলা হয়েছে বলেই বউয়ের আর চোখ নাবাবার বা মুখ নামাবার নাম নেই। গুরুদেব দেখছেন। আর বউও তেমনি চোখে চোখ রেখে চেয়ে আছে। এমন নির্লজ্জ বুকের পাটা আর কে বা দেখেছে! ননদ আর শাশুড়ী দুজনেরই বুকের ভিতরটা ঢিপঢিপ করছে।

গুরুদেবের তন্ময়তায় ছেদ পড়ল। নড়েচড়ে এবারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকলেন তিনি। মুখ গম্ভীর। গলার স্বরও।—হাতখানা একবার দেখি?

চণ্ডীবউ আঁচলের তলা থেকে একখানা হাত আস্তে আস্তে সামনের দিকে বাড়ালো।

গুরুদেবের কণ্ঠে একটু অনুযোগের সুর।—প্রথমেই বাধা পড়ল। মেয়েদেব হাত দেখতে চাইলে বাঁ-হাতখানা এগিয়ে দিতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে শাশুড়ীর আর ননদের ভ্রূকুটি। মেয়েদের বাঁ-হাত দেখাতে হয় এ তো সকলেই জানে, বলিহারি কাণ্ডজ্ঞান।

ঠাণ্ডা মুখে বাঁ হাত প্রসারিত কবল চণ্ডীবউ। ঝুঁকে সমনোযোগে গুরুদেব করতলের রেখা দেখলেন তারপর আবার মুখের দিকে তাকালেন।—আচ্ছা তুমি এসো এখন, আমি একটু ভেবে দেখি...

চণ্ডীবউ উঠে চলে গেল। মা-মেয়ে দুজনেরই মনে হল, যাবার আগে আর একবার প্রণাম করে যাওয়া উচিত ছিল। যতক্ষণ দেখা গেল তাকে গুরুদেব সেদিকে চেয়ে রইলেন। মা-মেয়ের চোখে এই শ্রীমুখও একটু অপ্রসন্ন এবং চিন্তাচ্ছন্ন ঠেকল যেন।

নিজের মনেই দুই-একবার মাথা নাড়লেন গুরুদেব। তারপর অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বললেন, এত রূপ থাকা কি ভালো...কি জানি, নারায়ণ জানেন।

আরো কিছু শোনার আশায় মেয়ে উন্মুখ। বউয়ের এত রূপ কোনো দিন খুব উদাস চোখে দেখে উঠতে পারে নি। দত্তগৃহিণী ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত। জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেপুলে হওয়ার আশা নেই?

গুরুদেব চিন্তামগ্ন তেমনি।—জানি না, পুরুষের থেকে প্রকৃতি সবলা, বিধিরোষে

সে-নারী অফলা।...তা ছাড়া আরও কি জানেন মা, এত রূপ থাকলে তার ওপর অশুভ চোখ পড়ে, ফলে সঙ্কল্প নষ্ট হয়...

তত্ত্বকথা যাদের শোনানো হল তারা নির্বাক একবারে।...অশুভ চোখ যে পড়েছে তাতে আর ভুল কোথায়? ক'বছর ধরেই ঘোষালবাড়ির ওই শয়তান ছেলেটার অশুচি চোখ পড়ে আছে! দু'দিন আগেও পাড়ার এক মহিলা দুপুরে গল্প করতে এসে ঠারেঠোরে বলে গেছে সন্ধ্যার দিকে ওই শয়তানকে প্রায়ই এ-বাড়ির আশপাশে ঘুর ঘুর করেত দেখে। সেদিন নীচের একটা চাকর বলছিল, ঘোষালবাড়ির দাদাঠাকুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তার কাছ থেকে কর্তার অসুখের খবর নিচ্ছিল। রাগে দুঃখে হতাশায় দত্তগৃহিণীর মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল।

সন্ধ্যার পর গুরুদেব আবার কর্তার ঘরে এলেন। তাঁর সামনে অদূরের একটা জলচৌকিতে চণ্ডীবউ বসে। মাথার কাপড় আর একটু টেনে দিয়ে চণ্ডীবউ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

সমস্ত দিন আচ্ছন্নের মতো কাটিয়ে মহেশ্বর দত্ত এখন দুই-একটা কথা বলছিলেন। গুরুদেব আবারও তাঁর বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন, বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন। তারপর মুখ তুলে গভীর এবং গম্ভীর দৃষ্টিতে চণ্ডীবউয়ের দিকে তাকালেন। গৃহিণী বা তাঁর মেয়ের চোখে সেটা আদৌ খুশির চাউনি বলে মনে হল না।

মহেশ্বর দত্ত টেনে টেনে বললেন, আমার মা-লক্ষ্মীকে দেখেছেন ঠাকুর মাশাই, সাক্ষাৎ মা-চণ্ডী আমার—

গৃহিণী এবং মেয়ের মুখ আরো গম্ভীর। সামান্য মাথা নেড়ে গুরুদেব এই দুই ভক্তের দিকে তাকালেন। আর চণ্ডীরূপিণী মা-লক্ষ্মীটি কর্তার অন্তত বিশেষ প্রিয়পাত্রী এটুকু ভালো করেই বুঝে নিলেন।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর গুরুদেবের ঘরে চণ্ডীবউয়ের ডাক পড়ল আবার। প্রসন্ন হন্তদন্ত হয়ে এসে হাতের ইশারায় তাকে বাইরে ডেকে খবরটা দিয়ে গেল। ঘরে ঢোকা সম্ভব নয়, কারণ দাদাবাবু অর্থাৎ বাধানাথ শয্যায় বসে পান চিবুচ্ছে।

বিরক্তিতে চোখ-মুখ কুঁচকে গেল চণ্ডীবউয়ের। এ সময়ের ডাক অপ্রত্যাশিত। বিরক্তি সামলে জিজ্ঞাসা করল, সেখানে আব কে আছে?

মা-আর দিদিমণি। গলা একটু খাটো করে বলল, তুমি গেলে তেনারা ঘরে থাকবেন না বোধ হয়, তোমার সঙ্গেই কিছু কথাবার্তা কইবেন শুনলাম—

চণ্ডীবউয়ের দু'চোখ ওর মুখের ওপর ঘুরল একপ্রস্থ। সেই থেকে আজ আর ওকে বিশেষ কাছে দেখে নি চণ্ডীবউ, গুরুদেবের ওদিকেই ঘুর ঘুর করছে। প্রগাঢ় ভক্তি-বিশ্বাস ওর, এ-সব লোকের সুনজরেও দৈব কল্যাণ লাভের আশা কিছু শুনে না থাকলে এ-কথা বলত না।

আচ্ছা, তুই যা।

ঘরে ফিরে এলো। শয্যায় বসা মানুষটার দিকে চুপচাপ তাকালো।

কি?

নীচে ডাকছেন।

কে? ওই গুরুদেব?

চণ্ডীবউ মাথা নাড়ল।

বাড়িতে পা দিয়েই গুরুদেবটির খবর শুনেছে রাধানাথ। তার দিদিই এসে সবিস্তারে তার মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ পল্লবিত করেছে। আর বাবার ব্যাধিসংকট মোচনের ব্যবস্থা যে হবে সে আশ্বাসও দিয়েছে।

শুনে ভালো-মন্দ কিছুই বলেনি রাধানাথ। কেন বলে নি বা কেন কিছুমাত্র আগ্রহ দেখায় নি সেটা চণ্ডীবউ অন্তত অনুমান করতে পারে। দৈব প্রক্রিয়ায় বাবা ভালো হবে সে-বিশ্বাস নেই হয়ত। তার থেকে বড় কারণ, শ্বশুর কলকাতা থেকে ফেরার পর থেকেই এই লোকের টাকার টানাটানি চলেছে। আটমাসে তার হাত আট হাত দরাজ হয়ে উঠেছিল। গোড়ায় যে সমস্যায় পড়ে বাবা-মায়ের প্রত্যাবর্তনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল—সে-সমস্যাও এখন অনেকখানি গা সওয়া হয়ে গেছে। অতএব অভাব-বোধটাই প্রকট এখন। চণ্ডীবউয়ের এও ধারণা, বাপ বাঁচবে না ধরে নিয়ে তাঁর ছেলে এখন চোখ বোজার প্রতীক্ষাতেই বসে আছে। কথায় কথায় সেদিন বলেই ফেলেছিল, এত কষ্ট পাওয়ার থেকে শান্তিতে চলে যাওয়াই ভালো।

রাধানাথ জিজ্ঞাসা করল, এ-সময়ে তোমাকে ডাকছেন কেন?

ভালো কাজের আবার সময়-অসময় কি? তোমার ছেলেপুলে হয় না তার জন্যে কিছু করবেন মনে হয়...।

সাদা-মাটা ভাবে বললেও বক্র সুর একটু ছিলই।—হুঁ! বিরক্তিতে রাধানাথের গলা দিয়ে ওই শব্দটুকু বেরুলো শুধু।

তুমি সঙ্গে আসবে?

আমি! আমি কি করতে যাব?

চণ্ডীবউ চেয়ে রইল একটু। শ্লেষ গোপন থাকল না, বলল না, তুমি আর কি করতে যাবে!

প্রসন্ন সত্যি কথাই বলেছে। নীচে গুরুদেবের ঘরে এসে দাঁড়াতে বড় ননদ তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সে জায়গায় হাত ধরে বউকে বসালো। কথাবার্তা কইতে অসুবিধে হবে বলেই হয়ত মাথায় ঘোমটাও সে-ই টেনে ছোট করে দিল। ওদিক থেকে শাশুড়ী গম্ভীর উপদেশের সুরে বললেন, ঠাকুর যা বলেন ভক্তিভরে শোনো। যাই, উনি আবার অনেকক্ষণ ধরে একলা আছেন, দেখে আসি—

তিনি চলে গেলেন। তাঁর পিছনে মেয়েও। চণ্ডীবউ অনুভব করল নিষ্পলক দুটো চোখ তার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। আস্তে আস্তে সেও মুখ তুলে তাকালো একবার।

গুরুদেব চেয়ে আছেন। তার দু'চোখের ভিতর দিয়ে গভীর মনোযোগে ভূত-ভবিষ্যৎ দেখছেন যেন। দেখা শেষ হল। বড় নিঃশ্বাস পড়লো একটা।

তোমার শাশুড়ী ঠাকরোনকে আমি বলছিলাম, মেয়েদের রূপ বেশি হলে ভাগ্যের ব্যাপারে প্রায়ই টান পড়ে। কিন্তু মন শুদ্ধ আর একাগ্র হলে বিরূপ ভাগ্যের অনেক সদয় খেলাও দেখা যায়। বুঝেছ?

চণ্ডীবউ মাথা নাড়ল কি নাড়ল না।

শিরদাঁড়া আর একটু সোজা করে বসলেন গুরুদেব।—একটা কিছু না করলে তোমার শাশুড়ী তো আমাকে কিছুতে ছাড়বেন না দেখছি, দেখা যাক।...কিন্তু যা-ই

করি সব কিছুর ওপরে তোমার মনে তেমনি অখণ্ড ভক্তি আর বিশ্বাস থাকা দরকার। তা আছে তো?

চণ্ডীবউয়ের আনত মুখ আবার আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠল। তাঁর চোখের দিকেই তাকিয়ে সামান্য মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, নেই।

নেই! ইঙ্গিতেও এমন স্পষ্ট জবাব গুরুদেব আশা করেন নি।—আমার ওপর তোমার বিশ্বাস নেই? তাহলে আর আমি মিথ্যে কষ্ট করতে যাই কেন?

কষ্ট করবেন না। খুব অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট জবাব।

পরদিন সকাল থেকে শাশুড়ী আর বড় ননদের থমথমে মুখ। গুরুদেব তাদের যা জানাবার জানিয়েছেন।

শেষ আশাটুকুর জলাঞ্জলি। শোনার পর থেকে দত্ত গৃহিণীর ভিতরটা পুড়ছে। তেমনি ক্রুদ্ধ তিনি। সেই সঙ্গে বহু সংশয় কাঁটার মতো বিঁধছে। বউকে দেখেই গুরুদেবের মুখখানা কেমন হয়ে গেছল। তার আগে তিনি বলেছিলেন, রোগ-শোক-দুঃখ সবই পাপের ফল, নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে পাপ টানছে সকলে। বউ কতটা টানছে সে সন্দেহ দানা বাঁধতে লেগেছে। ওর সন্তান-কামনা নিয়ে কলকাতা থেকে ফেরার আগেই কর্তার এমন মরণাপন্ন অবস্থা।...গুরুদেব আরো বলেছিলেন, রূপ বেশি হলে তাতে অশুভ ছায়া পড়ে। অশুভ আর অশুচি ছায়া যে পড়েই আসছে তাতে কারো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেও যে একতরফা কে জানে! এদিকের অত রূপের তলায়ও যে পাপ-চিন্তা লুকিয়ে নেই কে হলপ করে বলবে! কলকাতা থেকে ফেরার পর রাধানাথ তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই সন্দেহই সব থেকে বেশি প্রকাশ করেছিল। তাঁদের অনুপস্থিতির কালে যত কাণ্ড বউ করেছে তার কোনোটাতে ঘোষালবাড়ির ওই দুর্দান্ত ছেলেটার প্রতি শত্রুতার লেশমাত্রও ছিল না। বরং উদারতা ছিল। একের পর এক ঘটনাগুলো তলিয়ে ভেবেছেন দত্তগৃহিণী, আর মনের ওপর একের পর এক সন্দেহের বিষ-ছোবল পড়েছে।

কর্তার আরোগ্য বিধানে মন দিয়েছেন গুরুদেব। বাড়িতে বড় আকারের গ্রহ-শান্তির যজ্ঞ হবে। তারপর নব-গ্রহ কবচ ধারণ করানো হবে কর্তাকে।

পাঁচ দিন ধরে এর তোড়জোড় চলেছে। বিশাল ব্যাপার। শুচিশুদ্ধভাবে সব ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন গুরুদেব। কাজের দিন খুব সকালে পাড়ার অন্তরঙ্গ মহিলাদের স্নান সেরে শুচিমত সাহায্যের জন্য আসতে অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন দত্তগৃহিণী। তাঁরা এসেছেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে ছোট মেয়েও এসেছে।

দোতলার সব থেকে বড় ঘরখানায় সকাল থেকে বৃহৎ আয়োজন চলেছে।

অন্যদিনের থেকে অনেক সকালে স্নান সেরেছে চণ্ডীবউও। শাশুড়ীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হলেও তার কর্তব্যের ত্রুটি থাকবে কেন? টকটকে লাল পাড়ের গরদ পরেছে একখানা। পিঠের ওপর ভিজে চুলের বোঝা ছড়ানো। পায়ে পায়ে যজ্ঞের বড় ঘরে এসে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল যেন।

শাশুড়ী ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন। তাপর প্রচণ্ড রোষে আচমকা বিষ ছড়ালেন একপ্রস্থ।—তুমি এখানে কেন? তুমি এ-ঘরে এসেছ কোন্ সাহসে? আঁটকুড়ী

অলপ্পেয়ে মেয়ে—সংসারটাকে একেবারে ছারখার করে দিতে না পারলে শান্তি হবে না তোমার, কেমন? যাও যাও—বেরোও বলছি এখান থেকে।

ঘরের মহিলারা সব স্তব্ধ। অদূরের পরিচারিকারা নির্বাক। চণ্ডীবউ নিষ্প্রাণ নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত। ভাবলেশশূন্য দুই চোখ শাশুড়ীর মুখের উপর।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। তারপর দ্রুত নিজের ঘরে এসে ঠাস করে দরজা দুটো বন্ধ করল। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল একটু। মাথার ভিতরে কি প্রলয় ঘটে যাচ্ছে চণ্ডীবউ জানে না। মুখের দিকে ঝলকে ঝলকে রক্ত ছুটছে। দু'চোখে সাদা আগুন।

কি করবে এখন চণ্ডীবউ জানে না। চারিদিকে তাকাচ্ছে। দেয়ালে ছবি একখানা কালীর ছবি। রোজ একবার ফুল জল দেয় সেখানে। আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে গেল। দু'হাতে ছবিটা ধরে কালীর মূর্তির দিকে চেয়ে রইল। দু'চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে তেমনি।

চণ্ডীবউয়ের গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না, ঠোঁট দুটো সামান্য নড়ছে শুধু। সে বলছে কিছু। বলছে, আমি যদি সতী মায়ের মেয়ে হই তাহলে সন্তান আসবে। আমি যদি অসতী না হই তাহলে সন্তান আসবে। আসবে আসবে আসবে। সে এসে এসে অপমানের জবাব দেবে দেবে দেবে।

পরদিন। আর তার পরের তৃতীয় দিন।

দত্তবংশের দুটি কালান্তক দিন।

পরদিন দুপুর থেকে বিসূচিকা রোগে সাত ঘন্টা যোঝার পর দত্তগৃহিণী চিরকালের মত চোখ বুজেছেন। আর গুরুদেবটি সকলের অগোচরে সেই রাতেই প্রস্থান করেছেন।

তার তিন দিন বাদে মহশ্বের দত্তর জীবন দীপও নিভেছে। রোগজর্জর বার্ধক্যের শোক তাঁকেও মুক্তি দিয়েছে।

দৈবে অখণ্ড বিশ্বাস যাদের তারা গুরুদেবের মাহাত্ম্য অস্বীকার করতে পারে নি একেবারে। মুমূর্ষু কর্তার আগে কপালে সিঁদুর লেপেই তো পুণ্যবতী ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল!

কিন্তু অপরে অন্য কথাও বলছে। বলছে, চণ্ডীবউয়ের অপমানে স্বয়ং মহাচণ্ডীর কোপ লেগেছে। নইলে এমন অঘটনও হয়?

॥ ২৭ ॥

কাল নিজের পায়ের চিহ্ন মুছে মুছে যায়। মানুষ যতক্ষণ সম্ভব তার স্মৃতির বোঝা বয়। তারপর সেটাও নিজে থেকে খসে যায়। ও-ই চিরাচরিত রীতি।

কিন্তু দত্তবাড়িতে এর বিপরীত ঘটল। স্মৃতির বোঝা সরাবার জন্য যে শুচি-গম্ভীর সময়টুকু দরকার, নতুন মনিবের দাপটে তার বিদায় ত্বরান্বিত হল। অবশ্য মৃত্যুর দু'দুটো থাবা পড়তে দিনকতকের জন্য রাধানাথ বিমূঢ় হয়ে গেছল। একজন যাবে

বলেই সে মনে মনে প্রস্তুত ছিল। বাবা। সেই প্রস্তুতি ক্রমশ তাকে শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির তলায় তলায় লোভ আর লাভের উৎস। বাবার বিত্ত কোথায় কোন্ দিকে ছড়িয়ে আছে তার হদিস জেনে রাখাটা দরকার মনে হয়েছিল। বাবাও বুঝদার মানুষের মতই একটু একটু করে তাকে সেই হদিস দিচ্ছিল। তার কাঁচা টাকা ছাড়া বিত্তের বাদবাকি সন্ধান রাধানাথ মোটা-মুটি জেনে-নিয়েছিল। বাবার কাঁচা টাকা আর সোনা আর মোহরের পরিমাণও অঢেল বলেই ধারণা। আর ধারণা, বাবা কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর থেকে সে-সব ওই পেল্লায় সিন্দুকটাতেই জমা হচ্ছে। গায়ে চাদর জড়িয়ে খাজাঞ্চি এলেই বাবার তাকে শোবার ঘরে ডেকে পাঠাবার কারণও অনুমান করতে পারত। চাদরের তলায় খাজাঞ্চির শূন্য হাত নয়। আর ওই অত বড় সিন্দুক খোলা তখন আর বাবার সামর্থ্যে কুলতো না। রাধানাথ ধরেই নিয়েছিল ওই সিন্দুকের চাবি মা আর বউয়ের হাতে পড়বে। সেজন্যে খুব উদ্‌বেগ ছিল না। জল যেমন নীচের দিকে গড়ায় তেমনি অবধারিত নিয়মে সিন্দুকের ওই কাঁচা বিত্তও দু'দিন আগে হোক পরে হোক তার হাতের মুঠোতেই আসবে।

এতখানি প্রস্তুতির পরেও বাবার টিকটিক করে টিকে থাকাটা রাধানাথের কাছে সুবিবেচনার অভাবের মতো লাগছিল। তার ওপর দিদির গুরুঠাকুরকে এনে বাবার কল্যাণে এই যাগযজ্ঞ নিরর্থক লাগছিল। যাবেই যে তাকে এভাবে ঠেকা দিয়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করে লাভ কি! অনর্থক কষ্ট বাড়ানো।

এর মধ্যে আচমকা আকাশ থেকে মায়ের ওই মৃত্যু নেমে আসতে হকচকিয়ে গেছল। ওপরঅলার বিধানে আরো কি অভাবিত ঘটে ঠিক কি-! বাবার বালাই নিয়েই কি পুণ্যবতী মা আগে সরে পড়ল? একদিকে যে বাবা আর একদিকে যে বউ—মাঝখানে মা-ই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। এখন কি দু'দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে প্রাণটাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে ... তরতাজা মানুষটা যদি এভাবে চোখ বুজতে পারে তো চোখ যে বুজতে যাচ্ছিল সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে না তার বিশ্বাস কি?

কিন্তু বিধি শুধু সদয় নয়, অপ্রত্যাশিত প্রসন্নই বটে তার ওপর। তিন দিনের মধ্যে বাবাও শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে বিস্ময়ের ধাক্কায় তেমনি হকচকিয়ে গেছল। মায়ের শোকে এই তিনদিনের মধ্যে বাবা একটা ব্যবস্থার কথাও বলে যেতে পারে নি। সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত তার বালিশের নীচেই ছিল।

সব কিছু দখলের পরেও মনের তলায় অনেক সময় অকারণ শঙ্কার ছায়া পড়ে। বিশেষ করে দখলটা যদি খানিকটা চুরির দখল বলে মনে হয়। রাধানাথ এটুকু ঠিক জানে বাবা একটু সুস্থির হতে পাবলে সিন্দুকের ওই চাবি বউয়ের হাতে পড়ত। আর তারপর থেকে সেটা যে একটা স্থায়ী অশান্তির কারণ হত তাতে ভুল নেই।

বাবা চোখ বোজার পরদিন। রাত একটু বেশি হতে সন্তর্পণে বাবার সিন্দুক খুলেছিল রাধানাথ। খোলার আগে বারকয়েক চমকে এদিক-ওদিক তাকিয়েছে। দুর্বার লোভ, অন্যদিকে থেকে থেকে মনে হচ্ছিল বাবাই যেন ভ্রূকুটি করে চেয়ে তার দিকে। সিন্দুক খোলার পর দুই চক্ষু বিস্ফারিত। না, এত টাকা এত সোনা রাধানাথ কল্পনাও করতে পারে নি। টাকা আর মোহরে পেল্লায় সিন্দুকের আধখানা ঠাসা। দেখে চোখে পলক পড়ে না।

চমকে ফিরে তাকিয়েছে। মনে হয়েছে কেউ যেন দেখছে কোথাও থেকে। না মনের ভয়। দরজা বন্ধ। বাড়িসুদ্ধু ঘুমে অচেতন। মৃতের ঘর খালি রাখতে নেই বলে সে এই ঘরে শুয়েছিল। কারো কোনরকম সন্দেহ হবার কারণ নেই।

সিন্দুকের ওই লোভনীয় জঠরের দিকে দৃষ্টি ফিরেছে আবার। রাধানাথের জোরে হেসে উঠতে ইচ্ছে করছিল, লাফাতে ইচ্ছে করছিল, ওই অঢেল কাঁচা-বিত্ত হাত দিয়ে ঘেঁটে ছানাছানি করে তার স্বাদ নিতে ইচ্ছে করছিল।

আচমকা বিদ্যুতের ধাক্কা যেন একটা। ঘুরে তাকিয়েছে। ভয়ে শিরদাঁড়া অবশ। খাটের পাশের জানলাটা কে নিঃশব্দে খুলেছে। বাইরের অন্ধকারে কেউ যেন দাঁড়িয়ে।

কে? কে?

সম্বিৎ ফিরতে একটু জোরেই চেঁচিয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের ডালা ফেলেছে। অন্ধকার থেকে হাতের চুড়ি-বালার শব্দ এলো যেন একটু। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজা খুলে দিয়েছে।

বউ। চণ্ডীবউ।

অপ্রস্তুত রাধানাথ।—তুমি! কি ব্যাপার? ঘুমোও নি?

চণ্ডীবউ ভিতরে ঢোকে নি। চৌকাঠের এধারে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। সিন্দুকটার দিকে তাকিয়েছে একবার। তারপর রাধানাথের দিকে।—ঘরে আলো জ্বলছে কেন দেখতে এসেছিলাম।

...ও। উত্তেজনাটুকু হাসি দিয়ে ঢাকার চেষ্টা রাধানাথের। সে কি করছিল বউ দেখেইছে। বলল, একসঙ্গে দু'দুটো বড় কাজ সামনে, দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছিল না—ঘরে কি আছে না আছে দেখছিলাম। পরক্ষণে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছিল, সিন্দুকে যা আছে সমস্ত জীবনে শেষ হবার নয় মনে হয়েছিল, তাই সাগ্রহে ডেকেছিল, তুমি দেখবে তো এসো না—

তুমি দেখো।

চলে গেছে। বলা বাহুল্য তার চাউনি বা এই যাওয়াটা একটুও মধুর ঠেকে নি চোখে। উল্টে অকারণ শঙ্কার ছায়াটা ঘন হয়েছে পরদিন থেকে। ভাগ্যের এত বড় পরিবর্তনে নিজেই খানিকটা বিভ্রান্ত বলে বোধ হয়। পাড়া-পড়শীর কানাকানি তারও কানে এসেছে। অনেকে বলাবলি করছে চণ্ডীবউয়ের অপমানে স্বয়ং মহাচণ্ডীর কোপ লেগেছে—নইলে এমন অঘটনও হয়! কি অপমান রাধানাথ খবর রাখে না। শোনার পর বউকে একটু তোষামোদই করতে গেছল।—সক্কলের সামনে মা তোমাকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছিল শুনলাম....রেগে গিয়ে সত্যিই তুমি কি কিছু শাপমন্যি করেছিলে নাকি?

কি!

চোখের ওই আগুন দেখেই চুপসে যাবার দাখিল।—না, ওই ইয়ে—যত সব বাজে কথা কানে আসছে।

তখনকার মতো চোরের মুখ করে পালিয়েছিল।

খুব ঘটা করে বাপ-মায়ের কাজ শেষ করেছে রাধানাথ। শ্রাদ্ধে এত ঘটাও করণের লোকে আর বুঝি দেখে নি। এই একটা মাস কোনরকম অনাচারের দিকে তাকে ঝুঁকতে দেখেনি কেউ। শ্রাদ্ধের দিন সমস্ত গাঁয়ের লোক দত্তবাড়িতে। এই

একটা দিনের জন্য শত্রু-মিত্রের ভেদাভেদ ঘুচে গেছল। দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর লোকেরাও এসেছিল।

এসেছিল মদনমোহনও।

প্রায় চার ঘন্টা দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে সব দেখাশুনা করেছে। যেন তারই ঘরের কারো কাজ। সামনাসামনি এই মাতব্বরি রাধানাথের ভালো লাগে নি। কিন্তু সে কৃতার্থ হবার মতই বিনয় দেখাতে পেরেছে। বাবা নেই মাথার ওপর, রক্ষণাবেক্ষণের একটা শক্তিমান খুঁটি যে সরে গেছে সেই চেতনা আছে। নিজের সেই ক্রূর আঘাত দিয়ে বসাটাও ভোলার নয়। তার বদলে ওই লোক শুধু জব্দ করেছিল তাকে, মারাত্মক প্রতিশোধ কিছু নেয় নি। সদ্য বর্তমানে বিপুল সম্পদ হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্র-বদল হয়েছে। এখন কারো শত্রুতা কাম্য নয়। এখন ভোগের কাল। তা'ছাড়া ওই সম্পদের শক্তি সংহত করার জন্যও অবকাশ দরকার একটু। তারপর দেখা যাবে কাব কত মুরোদ!

সকলেব চোখের আড়ালে ঘোমটা টেনে বসে থাকবার দিন ফুরিয়েছে চণ্ডীবউয়েরও। শ্বশুর-শাশুড়ীর এত বড় কাজে তার কর্ত্রীর ভূমিকা। সে দায়িত্ব পালন করেছে। মেয়েদের আদর অপ্যায়ন অভ্যর্থনার ত্রুটি রাখে নি। এরই ফাঁকে বারকয়েক ঘোষালবাড়ির ছেলেব দিকে চোখ গেছে। পুরুষদের আলাদা মণ্ডপ, তার প্রবেশ-পথে একাধিকবার তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। একবার চোখে চোখ পড়তে মাথার কাপড়টা চার আঙুল টেনে দিয়ে চণ্ডীবউ ঈষৎ দ্রুত অন্দরেব দিকে চলে গেছে। দু'চোখের নীবর স্তবের সঙ্গে ওই পুরুযোচিত গাম্ভীর্যটুকুই আগেও অনেক সময় বিচিত্র মনে হয়েছে তাব। সাত-আট বছর আগে মহাচণ্ডীর থানে সেই প্রথম অঘটনের শুরু থেকে ওই দুটো চোখে বিরক্ত হবার মতো কোনরকম লঘু চপলতা দেখেছে বলে মনে পড়ে না।

শেষের দিকে বাছাই করা নিকট ব্রাহ্মণদের ভোজন-ব্যবস্থা। এমনি স্বতন্ত্র গোছের আহাব-পর্বে শ্বশুরের সঙ্গে শাশুড়ীও উপস্থিত থাকতেন চণ্ডীবউ জানে। এ তার থেকেও অনেক বড় দায়। নীচের তলায় বড় হলঘবে এই বিশেষ ব্যবস্থা। কাউকে ডাকতে হল না, চণ্ডীবউ নিজে থেকেই এসে দাঁড়াল।

বিশিষ্টদের মধ্যে ঘোষালবাড়িব মদন ঘোষাল একজন তো বটেই। তার খোঁজ করতে দেখা গেল সে নি-পাত্তা। নিজের বিশাল পাতাখানায় জলেব হাত বুলাতে বুলাতে মুনকে ভট্চায বলল, মদন ঠাকুর তো ঘরে চলে গেছে।

রাগ চেপে রাধানাথ বলে উঠল, চলে যেতে দেখেও আমাকে খবর দিলে না? ঘুরে ছিরে পাগলার দিকে ফিরল, এই যে শ্রীনাথ, ওকে যেতে দিলে কেন...এই দিনেও আমাকে জব্দ করতে চাও?

গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে শ্রীনাথ জবাব দিল, তুমি পীড়াপীড়ি করবে বলেই না বলে চলে গেছে। আমি নিষেধ করতে মদনমোহন বলল, আমার বাবার কাজে দত্তমশাই অনেক করেছিলেন, সেই ঋণ শুধতে এসেছিলাম—খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে নেই ছিনাথ, মিথ্যে আমার জন্যে ব্যস্ত হতে বারণ কোরো।

গম্ভীর টান-টান মুখ রাধানাথের। পুরনো রেষারেষির ছায়া পড়েছে। বউয়ের দিকে চোখ পড়তে মনে হল মদন ঘোষাল না খেয়ে চলে যেতে সভার মধ্যে

এই একজনই ভিতরে ভিতরে সব থেকে বেশি আহত হয়েছে। সেই মুহূর্তে রাধানাথের ভিতরটা আরো বেশি তিক্ত-বিরক্ত।

রাত তখন অনেক। বাড়ির মানুষেরা সকলেই শ্রান্ত, অবসন্ন। গায়ের ফতুয়াটা খুলে দূরে ফেলে রাধানাথ বলল, সবেতে বাহাদুরি দেখানো চাই, না খেয়ে চলে গিয়ে বাহাদুরি দেখানো হল—বুঝলে?

বুদ্ধিমতীর মতো মন যুগিয়ে চলতে হলে তক্ষুনি সায় দেবার কথা। তার বদলে চণ্ডীবউ চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপর নির্লিপ্ত জবাব দিল, খাবে না জানা কথাই তো!

কেন, জানা কথা কেন?

তেমনি নিরুত্তাপ গলায় চণ্ডীবউ বলল, কপালের ঘা শুকোলেও দাগটা থেকেই গেছে। নিজের স্বার্থেই এমন শত্রুতার অবসান কাম্য রাধানাথের। ফলে এই উক্তি দ্বিগুণ বিরক্তির কারণ। বলে উঠল, ও...আর ওই ছিরে পাগলা আর ওর ওই সব-সাঙ্গোপাঙ্গরা যে কব্জি ডুবিয়ে খেয়ে গেল?

চণ্ডীবউ জবাব দিতে যাচ্ছিল, সকলের সঙ্গে তার এখানেই তফাত বোধ হয়। বলল না। বললে শান্তি ব্যাহত হবে।

শ্বশুর-শাশুড়ীর বিয়োগে চণ্ডীবউয়ের শোক কতটা হয়েছে নিজেও ঠাওর করতে পারে না। এর মধ্যে শাশুড়ীর মৃত্যুটা আকস্মিক। এত আকস্মিক যে সে নিজেই হতচকিত। না, মর্মান্তিক ক্রোধের মুহূর্তেও এ-রকমটা সে চায় নি। বরং যে-কোনো অলৌকিক উপায়ে তাঁর বাসনা পূর্ণ হোক, ভুল ভাঙুক, এই চেয়েছিল। তাঁর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে নিজের অপরিপূর্ণতার একটা নতুন ব্যথা চিনচিন করে বাজছে। সেই সঙ্গে এক ধরণের অসহিষ্ণুতা বাড়ছে চণ্ডীবউয়ের। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরের এই কালীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো সে যে কথাগুলি বলেছিল, শাশুড়ীও যেন তার সবটুকু জানেন এখন। কালীর ছবি সাক্ষী রেখে অমন প্রতিজ্ঞার দেমাক কোথায় থাকে তাই দেখার প্রতীক্ষায় আছেন যেন। আগেও নিজের ছেলের দোষ দেখেন নি, ওপারে গিয়েও দেখবেন বিশ্বাস করে না। ঘোরালো ধারালো চোখে ওই কালীর ফটোর দিকে চেয়ে চণ্ডীবউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে অনেক সময়।

তিন মাস না যেতে শোক ছেড়ে দুটো মানুষের স্মৃতিও মুছে যাবার দাখিল। সম্পদ হাতে আসার ফলে শক্তির নতুন স্বাদ পাচ্ছে রাধানাথ। এ-সুখ যেন অফুরন্ত। বউকে বশ করতে না পারার খেদ চাড়িয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো তাকে বিশেষ ঘাঁটাতে চায় না। তার চাউনি-টাউনিগুলো যেন কি-রকম ঠেকে আজকাল। ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বাড়ির একতলাতেই রাতের আসর বসাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু প্রথম এক রাতের মহড়ার ফল দেখেই সে-ইচ্ছে বাতিল করতে হয়েছে। পরদিন, মাথা যখন ঠাণ্ডা, বউ সোজা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা করেছে, এখন থেকে বাড়িতেই এ-সব চলবে তাহলে?

বিত্তবান রাধানাথ থতমত খেয়েছে।—রোজ কেন, ইয়ে, মাঝে-সাজে—

এই তোমায় শেষবারের মতো বলে দিলাম, আবার যদি দেখি, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

আগে হলে রাধানাথের পুরুষকারে ঘা পড়ত। কিন্তু আগের সঙ্গে এখন অনেক তফাত। বিত্তমান পুরুষ রাগ চেপে রসিকতার রাস্তা নিয়েছে।—কি সর্বনাশ! কোথায় যাবে?

দেখতে পাবে।

বউয়ের দেমাক ভাঙার জন্যেই বাড়িতে রাতের আসর দ্বিগুণ জমজমাট করার সঙ্কল্প সন্ধ্যের মধ্যেই মিলিয়ে গেছে।

শোক কিনা জানে না, শ্বশুরের অভাব প্রতিনিয়ত অনুভব করছে চণ্ডীবউ। তার কত বড় সম্বল গেছে টের পাচ্ছে। এদিকে মদের মাত্রা বাড়ছে, ফুর্তি বাড়ছে। অন্যত্র রাত কাটিয়ে সকালে যখন চোরের মুখ করে বাড়ি ফেরে—মুখের দিকে তাকালেই চণ্ডীবউ টের পায় কোথায় গেছল। কি করে টের পায় সে নিজেও জানে না, কিন্তু পায় ঠিকই। রাগে ঘৃণায় দু'চোখ তার ধকধক করে জ্বলে ওঠে। আগে ঠিক এ-রকমটা হত না। এখন কেন হয় তাও জানে না। তার পরেই কি এক অনাগত শঙ্কার ছায়া দোলে চোখের সামনে । চণ্ডীবউ ঠাওর করতে পারে না কি সেটা। শুধু অস্বস্তিতে ভিতর ছেয়ে যায়।

মত্ত অবস্থায় সেদিন সন্ধ্যারাতেই বাড়ি এসে হাজির রাধানাথ। গান ভাঁজতে ভাঁজতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। দূর থেকে তাকে দেখেই প্রসন্নময়ী ছুটে পালালো।

ঘরে ঢুকেই রাধানাথ থমকে দাঁড়াল। সামনে বউ! চণ্ডীবউ। কিন্তু রাধানাথ যেন বিমূঢ় হতচকিত। নিজের অগোচরে গলা দিয়ে অস্ফুট উক্তি নির্গত হল একটা।—এই যাঃ!

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত উঠল চণ্ডীবউয়ের। মুহূর্তের মধ্যে তার চোখের সম্মুখ থেকে একটা পর্দা সরে গেছে—যা বোঝার নির্ভুল বুঝে নিয়েছে। চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। কঠিন গলায় বলল, ভুল হয়ে গেছে। নেশার ঝোঁকে এক জায়গায় যেতে আর এক জায়গায় এসে গেছ!

নেশা সত্ত্বেও রাধানাথ ঘাবড়েই গেল। এ-রকম ভুলটাও বউ টের পেয়ে গেল কি করে ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি মিথ্যের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করল।—মাইরি বলছি, না, এই বুকে হাত দিয়ে বলছি, তোমার সঙ্গে তুলনা কোন্ শা—থুড়ি—

টলতে টলতে বিছানার দিকে এগোলো সে। চণ্ডীবউ এক ঝটকায় দরজার কাছে চলে এলো।—প্রসন্ন! প্রসন্ন!

প্রসন্ন পড়িমরি করে ছুটে এলো। এই গলায় ডাক শুনলে বুক সকল দাস-দাসীরই কাঁপে। কিন্তু ঘরে কে আছে জানে, তাই একটু আড়াল নিয়ে দাঁড়াল।

আজ থেকে আমি ওদিকের ঘরে—এই ঠাকুরের ঘরে থাকব—এক্ষুনি ব্যবস্থা কর।

ঠিক এইগোছের ব্যাপার আগেও ঘটে গেছে। প্রসন্নর ঘাবড়াবার কথা নয় খুব। কিন্তু আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বউমণির যে মূর্তি দেখল, কাঁপুনি ধরার দাখিল। কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে হুকুম তামিল করার প্রতিশ্রুতি জানালো। তারপর দ্রুত প্রস্থান। দাদাবাবু ঘরে থাকতে বউমণির জিনিসপত্র সরাবে কি করে জানে না।

নেশার ঝোঁক তখনও কাটে নি বলেই এই হুকুম কানে যেতে রাধানাথ বিলক্ষণ আহত। সেই সঙ্গে এই হুঁশও আছে যে সিন্দুকটা বাবার ওই ঘরেই। দেয়ালের

সঙ্গে গাঁথা ওটা, সরাবার উপায় নেই। সে বাড়ি না থাকলে ওই ঘরের দরজায় পেল্লায় দুটো তালা ঝোলে। এই চণ্ডী ওই ঘর দকল করে বসলে তো সর্বনাশ!

কাঁদ-কাঁদ সুরে বলে উঠল, বাবা তোমাকে এত ভালবাসত আর বাবার আদেশ অমান্য করবে তুমি?

চণ্ডীবউ ঘুরে দাঁড়াল। দু'চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে তখনো। এ-রকম রাগও কি আগে হত? এত রাগ আর এ-রকম অসহিষ্ণুতা?

মরীয়া হয়েই রাধানাথ বলে গেল, একবার তুমি ঘর বদলেছিলে, আমার দুঃখু দেখে বাবা ফের ঠেলে তোমাকে আমার কাছে পাঠালো...আজ বাবা থাকলে তুমি এভাবে আমাকে ত্যাগ করতে পারতে?

চণ্ডীবউ দু'পা এগিয়ে এলো। অসহিষ্ণু কঠিন সুরে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল, বাবা থাকলে তোমার কাঁধের দু'দিকে এভাবে দুটো বাড়তি মাথা গজাতে পারত?

সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল রাধানাথ। মা নেই অথচ বাবা আছে—এমন সম্ভাবনা এখন কল্পনাই করা যায় না। জীবনটাই মরুভূমি হয়ে যেত তাহলে। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে স্খলিত গলায় আপসের চেষ্টা করল।—মাইরি বলছি, আমাকে দুঃখু দিলে সগ্‌্গ থেকে বাবা ডবল দুঃখু পাবে!

স্থির হয়ে দাঁড়াবার আগেই চণ্ডীবউ ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাধানাথ ধুপ করে আবার বিছানায় বসে পড়ল। নেশা ফিকে হয়ে আসছে, তবু নরম বিছানাটা এমনই বস্তু যে এ-অবস্থায়ও বিরস রাধানাথ গা ছেড়ে শুয়ে পড়ল।

দু'চারবার এ-পাশ ও-পাশ করেই ঘুম। আবার যখন ধড়মড় করে উঠে বসল, তিনটে ঘণ্টা কেটে গেছে। উঠেই যে দৃশ্য দেখল রাধানাথ হতভম্ব। ঘরে তেমনি জোরালো আলো জ্বলছে। দেয়ালের গায়ে কালীর ছবিটার দিকে চেয়ে বউ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। চোখের পলক পড়ছে না, নিঃশ্বাস নিচ্ছে ফেলছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

রাধানাথ হাঁ করে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে দেখে নিল এখনো নেশার ঘোর আছে কিনা। মাথা ভার-ভার বটে, কিন্তু সাফ। অগত্যা গলা ঝাড়ার মতো করে শব্দ করল একটু।

চণ্ডীবউ আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা থমথমে মুখ।

ইয়ে, তুমি ও-ভাবে দাঁড়িয়ে...

জবাব দিল না। নিষ্পলক দুই চোখ তার মুখের ওপর।

তাতেও অস্বস্তি। ব্যস্ত মুখে রাধানাথ আবার জিজ্ঞাসা করল, বলছিলাম তুমি বাবার ঘরে—মানে—ঘর বদলাও নি?

এক-পা এক-পা করে খানিকটা কাছে এসে দাঁড়াল চণ্ডীবউ। মুখের ওপর থেকে চোখ নড়ল না। ঠাণ্ডা, স্পষ্ট জবাব দিল, না।

তা হলে...আমাকে এ-ঘর ছেড়ে যেতে হবে?

না।

তবু দুর্বোধ্য ঠেকছে রাধানাথের।—মা-মানে, আমরা দুজনেই এই ঘরে থাকব?

এবার ঈষৎ অসহিষ্ণু শোনালো জবাবটা।—হ্যাঁ।

রাধানাথ হাঁ করে চেয়ে রইল। আনন্দ প্রকাশ করতেও ভয়।

রাত হয়েছে, তুমি খাবে কিছু, না তার দরকার নেই?

ঠিক ঠিক শুনছে কিনা রাধানাথের সেই সংশয়। তাড়াতাড়ি জবাব দিল, খাব—খুব খিদে পেয়েছে।

তেমনি ঠাণ্ডা পায়ে চণ্ডীবউ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাধানাথ সবিস্ময়ে সেদিকে চেয়ে রইল। একটু বাদেই ফিরে এলো আবার। তার পিছনে আসন আর জলের গেলাস হাতে একগলা ঘোমটা-টানা প্রসন্নময়ী। আসন পাতল। জলের ছিটে দিয়ে জায়গা মুছে গেলাস রেখে চলে গেল। ভাতের থালার পাশে বাটি সাজিয়ে রেখে গেল বামুন ঠাকুর।

রাধানাথ খাচ্ছে। আর আড়চোখে এক-একবার বউয়ের দিকে তাকাচ্ছে। বউ অদূরে বসে একখানা হাত তার গালের ওপর রেখে তার দিকেই চেয়ে আছে। এ-রকম খাওয়া এই প্রথম বোধ হয়। কিন্তু ঘরের নীরবতা বেশি ভারী ঠেকছে।

তুমি খেয়ে এসো না!

চণ্ডীবউ জবাব দিল না। তেমনি বসে রইল। তেমনি চেয়ে রইল।

রাধানাথের ভালো লাগছে। কিন্তু কি-রকম অস্বস্তিও সেই সঙ্গে। কালীর ছবির সামনে ওই রকম পাথরের মতো কি করছিল কে জানে! কিন্তু সন্ধ্যার ওই ব্যবহারের পর এই ঠাণ্ডা মুখ যেন কল্পনা করা যায় না! ভালই বেশি লাগছে। আনন্দ একটু প্রকাশ করেই ফেলল।—তুমি আর কখনো সামনে বসে এভাবে আদর করে খাওয়াও নি।

হাতের চেটো থেকে গাল না তুলে চণ্ডীবউ বলল, তুমি সুযোগ দিয়েছ?

রাধানাথ বিস্মিত, পুলকিত। সন্ধ্যার ব্যাপারটাই দুঃস্বপ্ন কিনা সেই সংশয়। আনন্দে কি যে বলে ফেলল নিজেরই হুঁশ নেই। বলল, ওই ছাইভস্ম গেলা এমন অভ্যাস হয়ে গেছে...তারপর হাজার ইচ্ছে করলেও তোমার কাছে আসতে পারি না, ভয় করে...মনে হয় তুমি যেন একখানা আগুনের গোলা, কাছে এলেই পুড়ে ভস্ম হয়ে যাব।

হাতে গাল রেখে তেমনি বসে আছে চণ্ডীবউ। চোখে চোখ। জবাব দিল, ওসব খেও না তাহলে মনে হবে না। একটু চুপ করে থেকে যে-প্রশ্নটা করে বসল রাধানাথের খাবি খাবার দাখিল।

আমার কাছে আসতে ভয় করে বলে অন্য জায়গায় যাও?

ইয়ে, মানে কি যে বলো! খাওয়া শেষ। রাধানাথ তাড়াতাড়ি উঠে বাঁচল। মুখ বেশ করে ধুয়ে কানে চোখে ঘাড়ে জল দিয়ে ফিরে এলো। প্রসন্নময়ী ততক্ষণে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে চলে গেছে।

গামছায় মুখ মুছে বিছানায় এসে বসল। চণ্ডীবউ যেখানে বসেছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে তখন।

কি হল, তুমি খেতে গেলে না?

সে-কথার জবাব না দিয়ে চণ্ডীবউ পালঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ে রইল একটু। চোখেমুখে রাগের লেশমাত্র নেই। এই মূর্তি দেখে রাধানাথের চোখে লোভ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তে চমকে উঠল।

চণ্ডীবউ জিজ্ঞাসা করল, অন্য জায়গায় তুমি কেন যাও?

ফাঁপরে পড়ে রাধানাথ বলে উঠল, এই কান মলছি, নাক মলছি—আর কখনো যাব না।

চণ্ডীবউয়ের ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির রেখা দেখা দিল। শয্যায় একেবারে কাছ ঘেঁষে বসল। অনেকক্ষণ হয়ে গেলেও নাকে সামান্য অপ্রিয় গন্ধ আসছে। আর কোন দিন হলে এটুকুতেই ছিটকে সরে যেত। এই রাতে গেল না। চেয়ে আছে। ঠোঁটের হাসিটুকু খুব আস্তে আস্তে যেন সমস্ত মুখে ছড়াচ্ছে। অদ্ভুত সুন্দর আর লোভনীয় লাগছে রাধানাথের। যে-রকম কাছে বসেছে হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেও আপত্তি হবে মনে হয় না। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত অস্বস্তিতে লোভ দমন করছে রাধানাথ।

চণ্ডীবউ বলল, আমি সে-কথা বলছি না। আমি জিজ্ঞাসা করছি তুমি যাও কেন?

সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে রক্ত সরতে লাগল রাধানাথের। দারুণ অস্বস্তি। কি জিজ্ঞাসা করছে এতক্ষণে মর্মান্তিক ভাবেই বুঝেছে। তার সম্পর্কে বউয়ের জানতে বাকি নেই কিছু, তাই চানতে চায় কেন যায়, কোন প্রত্যাশায় যায়?

ঘুম পাচ্ছে। রাধানাথ শুয়ে পড়ল।

ঘুম পায় নি। এদিকে ফেরো।

হঠাৎ অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠস্বর। রাধানাথ ঈষৎ ভয়ে ফিরে তাকালো। মুখেও কঠিন রেখা পড়েছে গোটাকতক। খরখরে চোখ।

তারপরেই ফিক করে হাসল একটু। ফলে আগের থেকেও যেন সুন্দর দেখালো।—আচ্ছা আর ও-সব জিজ্ঞাসা করব না, একটা খবর দিই তোমাকে তোমার বন্ধু ঘোষালবাড়ির ওই ছেলে প্রায়ই আজকাল সকালটা ওই আমতলার দিকে আর বিকেল থেকে সন্ধ্যা বাড়ির সামনের রাস্তায় কাটায় তুমি টের পাও?

সে কি! সটান উঠে বসল রাধানাথ। মুখ রাগে কালো—ষষ্ঠীচরণ আজকাল আর আমতলার দিকটা দেখে না?

জানি না। অনেক দিন হয়ে গেল, আর তাকে কিছু বলি নি।

বলো তাহলে! দাঁত কড়মড় করে বলে উঠল, তোমার যদি সায় থাকে তো আবারও এমন শিক্ষা দিতে পারি—

চণ্ডীবউ জবাব দিল না। অন্যমনস্ক। দেয়ালে কালীর ছবিটার দিকে তাকিয়েছে। আরো অন্যমনস্ক। চোখ-মুখ স্থির।

হঠাৎ তার দিকে ঘুরল আবার।—আচ্ছা ঠাকুরের অসুখ কলকাতার কবরেজে ঠিক ধরেছিল আর ঠিক চিকিৎসা করছিল তাই না?

কিছু না বুঝেই রাধানাথ মাথা নাড়ল।

তাহলে কালকাতায় বেশ ভালো ভালো বদ্যি আছে!

তা তো আছেই।

বিমনা আবার। শেষে গা-ঝাড়া দিয়ে আত্মস্থ হল যেন। হাসলও ঠিক আগের মত করে।—কি বলছিলে শিক্ষা দেবে?

রাধানাথ মাথা ঝাঁকালো। অর্থাৎ সেই রকমই বাসনা।

চোখেমুখে মুহূর্তের জন্য একটা তাচ্ছিল্যের ছায়া পড়ল চণ্ডীবউয়ের। দুজনের শক্তি সাহস আর বুদ্ধির ফারাক জানা আছে। সেই ভাবটা চাপা দিয়ে খুব সহজ সুরে বলল, কিন্তু তুমি তো আমার কাছে আসতেই ভয় পাও বললে, তাহলে তার ওপর এত রাগ কেন তোমার?

সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু তপ্ত রাধানাথের।—তা বলে ও কাছে আসতে চাইবে নাকি, ওর ধড় থেকে আমি মাথাটা নামিয়ে দেব না?

দেবে! মুখে নয়, চোখে হাসির ঝিলিক চণ্ডীবউয়ের।

আলবত্ দেব।

বা-ব্বা। যাক, সে-ভাবনা আমিই ভাবতে পারব। পালঙ্ক থেকে নেমে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। মুখের মিষ্টি-মিষ্টি ভাবটুকু এরই মধ্যে মিলিয়ে গেছে। ঈষৎ খরখরে চাউনি। গলার স্বরও অন্যরকম।—শোনো, তুমি কলকাতা যাচ্ছ। সঙ্গে আমিও যাব। সামনের শীতের আগেই যাতে ব্যবস্থা হয় সেই চেষ্টা করো।

রাধানাথ হতচকিত। বিমূঢ়। মনে হল একখানা আগুনেব শিখা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

॥ ২৮ ॥

কলকাতার আধুনিকতার হাওয়া আস্তে আস্তে বাইরের দিকে ছড়াচ্ছিল। তার ছিটেফোঁটা করণের দিকেও আসছে।

শোনা যাচ্ছে খুব শিগগীরই কলের গাড়ি ছুটবে কলকাতা থেকে রাণাঘাট, আর রাণাঘাট থেকে কলকাতা পর্যন্ত। নৌকোর এক মাসের পথ এক দিনে পাড়ি দেবার সুখ এনে দিচ্ছে কোম্পানী। বাস্তব থেকে রটনার উত্তাপ চারগুণ বেশিই হয়ে থাকে। তা রাণাঘাট পর্যন্ত রেল এলে করণ আব কতদূর! ডাঙায় চললে রাণাঘাট বড় জোর এক-দেড়দিনের পথ।

কোম্পানীর কলের গাড়ির রটনা অবশ্য কযেক বছর ধরেই শোনা যাচ্ছিল। তার প্রাথমিক উত্তেজনাও জুড়িয়েছে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে আর খুব বেশি দেরি নেই। করণের অনেকে রাণাঘাটে গিয়ে কলের গাড়ির লাইন বসানো পর্যন্ত দেখে এসেছে। অন্যদিকে রাণাঘাট একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে ওঠার দরুন কলকাতার সঙ্গে তার যোগ নিবিড় হয়ে উঠেছে। কোম্পানীর ছোট বড় বহু কর্মচারী আর শ্রমিক হরদম আসছে সেখানে। অনেক দূরদর্শী ব্যবসায়ীরও আনাগোনা বেড়েছে। কলকাতার আধুনিকতার হাওয়াটি বিশেষ করে তারাই এদিকে টেনে আনছে।

করণের মানুষ নীতি নিয়ে সাড়ম্বরে জটলা করে, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না বড় একটা। লোভের আর রসের ইন্ধন পেলে চোখ-কান বুজে তারা অনেক নীতি অনায়াসে রসাতলে পাঠিয়ে থাকে। কিন্তু নতুন হাওয়ার দুটো লক্ষণ দেখে এই নীতি বিশারদই একটু বিচলিত।

প্রথম, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিয়ে নিয়ে মাতামাতির অনেক গাল-গল্প এদিকে ভেসে আসছে। ফলে গাঁয়ের অনেক সোমত্ত বিধবাদের চাল-চলনে একটু নাকি

চনমনে ভাব দেখা যাচ্ছে। বড় বড় মানুষেরা তাদের কানে-মনে বিষ ঢোকালে তাদের মতি স্থির থাকে কি করে? দু-চারটে বিধবাকে নিয়ে বড়দরের কেলেঙ্কারি ফি বছর সব গাঁয়েই হয়ে থাকে—করণে একটু বেশিই হয়। তাই নিয়ে বড় রকমের হৈ-চৈও হয়ে যায় অনেক সময়, আর চুপিসাড়ে অনেক বিধবাকে জন্মের মতো গাঁ ছেড়েও চলে যেতে হয়। সেটা হল এক জিনিস। তা বলে বিধবাগুলোকে ধরে ধরে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোন্ নীতিবিশারদ বরদাস্ত করতে পারে? এই তো সেদিন বসন্তপুরে উঠতি পয়সাঅলা এক কারবারী ছোকরার দুর্দশার গল্প শুনে সকলের তাক লেগে গেছে! ছেলেটার সঙ্গে এক গরিব বিধবা-কন্যার একটু রসের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছিল। অন্তত ছেলেটা যে মজেছিল তাতে কারো সন্দেহ নেই। শোনা গেল সেই ছেলে রাণাঘাট থেকে শাড়ি আর গায়ের জামা এনে উপহার দিতে গেছল তাকে। সেই বিধবা কন্যা নাকি ফোঁস করে উঠে সে-সব মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছে বিয়ে করতে রাজী থাকো তো বলো, ছিবড়ে করে ফেলে পালাবার মতলবে এলে মুখে ঝাঁটা বুলবো।

রটনার কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে কেউ জানে না। কিন্তু সকলেই বিশ্বাস করে। অবৈধ-প্রণয় সর্বত্রই আছে, করণে হয়ত এর একটু বেশি ছড়াছড়ি। তোর সতীত্বের বড়াই থাকে তো মুখে এমনিতেই ঝাঁটা বুলো—তা বলে বিয়ের প্রস্তাব দিবি!

অস্বস্তির দ্বিতীয় হাওয়ার নাম বেম্ম হওয়া। উঠতি বাবু-ছোকরাগুলো দু'দশদিনের জন্য বাইরের এদিক-সেদিক থেকে ঘুরে এসেই ব্রাহ্মদের চালচলন নকল করছে। চামড়ার শৌখিন জুতো কিনে আনছে, গলাবন্ধ লম্বা লম্বা জামা তৈরি কবিয়ে আনছে। ফতুয়া বর্জন করছে। এই করে গাঁয়ের আর পাঁচটা ছেলের মাথা খাচ্ছে।

এই দুটো হাওয়ার সঙ্গেই দত্তবাড়ির চণ্ডীবউ যুক্ত হয়ে পড়ল কেমন করে। উপযুক্ত আধারে পড়লে সামান্য ব্যাপারেরও চটক বাড়ে। সেই গোছেরই একটা সূচনা পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল।

শ্বশুর-শাশুড়ী চোখ বোজার মাস-কতকের মধ্যেই চণ্ডীবউয়ের পা হয়েছে সেটা সকলেই লক্ষ্য করেছে। বয়স্ক আর বয়স্কাদের একটু-আধটু চোখে টাটিয়েছে। আর সমবয়সী বউরা খুশি হয়েছে। অত বড় লোকের বাড়ির রূপসী বউয়ের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠলে কে না খুশি হয়? দিনেদুপুরে চণ্ডীবউকে পায়ে হেঁটে সমবয়সী পড়শিনীদের বাড়ি যেতে দেখা যাচ্ছে। যাদের বাড়ি যায় তারা খুশিতে আটখানা। ফলে দত্তবাড়িতে তারা যে ডবল আসে সেটা কারো চোখে বড় হয়ে ওঠে না। ক'মাসের মধ্যে দেখতে দেখতে পাড়ার অনেক বাড়ির মেয়ে-বউয়ের সঙ্গে তার খাতির হয়ে গেল। এত বছর দেখেও যারা দূর থেকে খানিকটা ঈর্ষা খানিকটা সম্ভ্রমের চোখে লক্ষ্য করত তাকে, তারাই যেন নতুন করে আবিষ্কার করল চণ্ডীবউকে। চণ্ডীবউ তাদের স্তুতির পাত্রী হয়ে উঠল।

এদিকে মদের ঝোঁকে সাগরেদদের কাছে বউয়ের তাকে নিয়ে কলকাতায় যাবার সঙ্কল্পটা রাধানাথ ব্যক্ত করে ফেলেছিল। সঙ্কল্পের কারণ অবশ্য বলে নি। সেই রাতের কটা দিনের মধ্যেই রাধানাথের মানসিক অবস্থা যথাপূর্ব। মদ না খেলে মোটে মেজাজই ওঠে না। অন্যদিকে লোভের সামগ্রীর মতো ঘরের বউকে নাগালের মধ্যে পেলেও হাত বাড়াতে পারে না। লোভের ফল সর্বদাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার

আতঙ্কে পর্যবসিত। সাগরেদদের সঙ্গে পরামর্শ করেই বউকে স্তোকবাক্যে ভুলোতে চেষ্টা করেছে, রেলগাড়ি হলেই অনায়াসে তখন হুস করে কলকাতা চলে যাওয়া যাবে—এখন এত কষ্ট করে কে?

বউয়ের চাল-চলন বদলাতে দেখেও একটু আশ্বস্ত সে। যা নিয়ে ভুলে থাকে থাক—তাকে না ঘাঁটাতে এলেই খুশি এবং নিশ্চিন্ত। মোট কথা, চণ্ডীবউয়ের কলকাতা যাওয়ার সঙ্কল্পটা এরই মধ্যে বেশ জানাজানি হয়ে গেছে তারপর উদ্দেশ্যটাই হাতড়ে বেড়িয়েছে সকলে। এরই মধ্যে দু-দুটো মজাদার খোরাক পেয়ে অনেকে অনেকরকম ভাবতে লাগল।

প্রথম খোরাক, বিধবা বিয়ে সংক্রান্ত।

বুড়ো কর্তা আর গিন্নী মারা যাবার পর প্রসন্নময়ীর কর্তৃত্ব স্বাভাবিক ভাবেই একটু বেড়ে গেছল। অন্যান্য দাস-দাসীদের আর বামুন ঠাকুরের কাছে তাব প্রতাপও বেশি। ফলে মুনুকের আনাগোনাও বাড়ছিলই। এলেই প্রসন্নর তদারকে খাওয়া জোটে—আর নীচেব একটা কোণের ঘরে বসে নিশ্চিন্ত মনে ওর সঙ্গে একটু গল্পসল্পও করা যায়। বউমণি কাছে কাটুনি দে... এ বাড়িতে এত সাহস কাবো নেই। রাতে বেবিয়ে চুপিচুপি যাত্রা দেখাও চল...।

দুপুরে সেদিন ভারী খাওয়ার পর মুনুকে ভ...য মাদুরে গা ছেড়ে দিয়ে একটু আরাম করছিল। আর পাশে পা ছড়িয়ে বসে প্রসন্ন হাত-পাখা নিয়ে নিজেব গায়ের মাছি তাড়াবার নাম কবে তাকেও একটু-আধটু হাওয়া করছিল। মুনুকে একটা নাটকের গপ্প শোনাচ্ছিল তাকে, আব সেই ফাঁকে কাপড়-জড়ানো তার ভারী বুকের দিকে ঘনঘন তাকাচ্ছিল। নাটকে গপ্প ফাঁদলে প্রসন্ন এত তন্ময় হয়ে পড়ে যে সেই ফাঁকে ওকে মনের সাধে দেখে নেওয়া যায়, গপ্প জমে উঠলে ওর গায়ে একটু-আধটু হাত ছোঁয়ানোও যায়। বুঝতে পারলে প্রসন্ন ঝামটা মেবে হাত সরিয়ে দেয় বটে, কিন্তু গপ্প শোনার ঝোঁকে খুব একটা রাগ করে না।

গল্পের মাঝে হঠাৎ থেমে গিয়ে মুনুকে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়তে প্রসন্ন অবাক একটু।—কি হল?

প্রসন্ন রে, আমার দুঃখু কেউ বুঝবে না, তুইও না!

প্রসন্নময়ী বুঝল, আর তক্ষুনি আধহাত সরে বসে মুনুকের বিশাল ভুঁড়ি বরাবর পাখার ডাঁট তুলে ঝাঁজিয়ে উঠল, দেব এক ঘা বসিয়ে, বিটলে বামুন কোথাকার?

প্রসন্ন! প্রসন্ন!

দোতলা থেকে বউমণির ডাক শুনে একসঙ্গে বিষম চমকে উঠল দুজনেই। এ সময় এভাবে কখনই ডাকে না। দোতলার বারান্দার রেলিংএ দাঁড়িয়ে ডেকেছে। প্রসন্ন উঠে পড়ি-মরি করে ছুটল—একবার দোতলার দিকেও তাকালো। কেউ নেই রক্ষা—হাঁক দিয়েই ভিতরে চলে গেছে বোঝা গেল।

ঘরে ঢুকে দেখে বউমণি গা ছেড়ে পালঙ্কে শুয়ে আছে, কিন্তু রাগ-রাগ চোখ।

কোথায় ছিলি?

নী-নীচে।

নীচে আর কে আছে?

প্রসন্ন প্রমাদ গুনছে। এমন ফ্যাসাদ কে কল্পনা করতে পারে!—ওই বামুনের কাছে একটা নাটকের গপ্প শুনছিলাম গো বউমণি।

শোয়া থেকে সরোষে উঠে বসল চণ্ডীবউ—রোজ রোজ তোর নাটকের গল্প শোনা! আমি কিছু টের পাই না ভেবেছিস!

প্রসন্নময়ীর ভিতরে ত্রাস, বাইরে হাসি-হাসি মুখ।—কি করব, তুমিই তো ওর খাওয়া বরাদ্দ করেছ, পেটুক মানুষ, পেটের দায়ে একটু ভালো-মন্দ খাবার লোভে আসে—

ভালো-মন্দ খেয়ে তোকে গল্প শোনাতে বসে, কেমন? আমি তোকে চিনি না? ওকে সাফ কথা জিজ্ঞেস করবি তোকে বিয়ে করবে কিনা, নয়তো এভাবে চললে তোকেই আমি একদিন বাড়ি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় কবব বলে দিলাম।

প্রসন্নময়ীর তামাটে মুখেও রক্ত ছুটল যেন। সেই সঙ্গে দুই চক্ষু কপালে। বলো কি গো বউমণি, ও হল গিয়ে বামুনমানুষ, আর আমি—

বিয়ে করলে তুইও বামুন হয়ে যাবি—যা ভাগ এখান থেকে!

বলতে বলতে হাসির দমকে বিছানায় লুটোপুটি। প্রসন্ন আবার হাঁ খানিকক্ষণ। তারপর ছুটে পালালো। সোজা নীচে।

সমাচার শুনে মুন্কের দুই চক্ষু ছানাবড়া। প্রসন্নর তাড়া খেয়ে তক্ষুনি উঠে পালিয়েছে। তারপর থেকে চিন্তিত, বিষণ্ন। খাওয়ার বরাত লাটে উঠল কিনা কে জানে—আর প্রসন্ন দেখার সুখটুকুও গেল বুঝি! কিন্তু দত্তবাড়িব বউমণি এমন রসিকতা করল কি করে? আর রসিকতা যদি না কবে থাকে? পেসন্নকে বিয়ে? সব্বনাশ!

...ভাবতে যদিও খারাপ লাগছে না, তবু সর্বনাশ ছাড়া আব কি?

মাথাটা এমনিই গণ্ডগোল হয়ে গেল যে দুশ্চিন্তার কথাটা শেষ পর্যন্ত ছিরেকে না বলে পারল না। বিপদে পড়লে সকলেই আপনার জন।

ব্যস, মৌচাকে ঢিল। কথাটা গ্রামসুদ্ধ রাষ্ট্র হইতে তিনদিনও সময় লাগল না। পরের রাত্রিতেই মত্ত অবস্থায় রাধানাথ এসে বউকে চোখ রাঙালো, বলি ব্যাপারখানা কি, এটা কি মহাভারতের যুগ পেয়েছ যে যে যাকে ধরে টানলেই হল! আমার বাড়ির বিধবা ঝি-কে ওই পেটুক বামুন বিয়ে করবে এত বড় স্পর্ধা! ওই দুটোকেই ফাঁসিতে লটকাবো আমি তার আগে।

এই মূর্তি দেখলে ঘৃণায় চণ্ডীবউ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। দু'চোখ লাল হতে থাকে তাব। আগে ঠিক এ-রকমটা হত না। কঠিন দু'চোখ কালী-মূর্তির ছবিটার পরও থমকে ছিল। রাধানাথের গলার স্বর খানিকটা নরম তক্ষুনি। কিন্তু পরক্ষণেই তার এত ক্ষোভের কাবণ বোঝা গেল।

তুমি যা-খুশি তাই বলবে আর তাই নিয়ে কেমন ঢি-ঢি পড়ে যায় সে-খবর রাখো! ছিরের দল কি বলে বেড়াচ্ছে জানো! বলছে, বিদ্যেসাগর বিধবা বিয়ের সঙ্গে সধবা বিয়ের ব্যবস্থা করলেই একেবারে সবদিকের সুরাহা হয়ে যেত। এই মস্করার অর্থ বুঝতে কারো বাকি আছে ভাবো! এ-সব কথা কি ছিরের মগজ থেকে বেরিয়েছে না ওই শয়তান মদন ঘোষালের মাথা থেকে!

এবারে চণ্ডীবউ তার দিকে মুখ ফেরালো আস্তে আস্তে। মুখ লাল, পরিহাসের অর্থ অস্পষ্ট নয় তার কাছেও। ওই লোক এমন উক্তি করতে পারে একটুও বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু সে কথা বলল না। দু'চোখে ঘৃণা ঝরছে তখনো কিন্তু গলার স্বর

ঠাণ্ডা। বলল, তুমি ফিরলে সকলের মুখ আমি বন্ধ করে দিতে পারি—তা না হলে আরো অনেক শুনবে। ফিরতে রাজী আছ?

বারে! তোমার কেবল এক কথা! আমি আবার নতুন করে কি করলাম?

বলতে বলতে ঘর ছেড়ে প্রস্থান। নেশার ঝোঁকে তেতে উঠেছিল বলে চলে এসেছে। এখন পালানোর তাগিদ। বউয়ের মুখে আপোসের কথা শুনলেও আজকাল কেমন ভয়-ভয় করে রাধানাথের।

ভিতরে এই মূর্তি হলেও বাইরের মানুষ কিন্তু বেশ এক-একটা মজার কাণ্ড দেখছে চণ্ডীবউয়ের। মুনুকের বিধবা বিয়ের প্রসঙ্গ না জুড়োতে আবার এক কাণ্ড। ঝাঁপিতে শৌখিন জুতো নিয়ে ফেরিঅলা এসেছিল দত্তবাড়িতে। মেয়েদের জুতোও ছিল তার মধ্যে। চণ্ডীবউ তার কাছ থেকে একজোড়া মেয়ে-চটি কিনে বসেছে। আর তাই পরেই দিব্বি পাড়ায় মেয়েদের বাড়ি যাতায়াত শুরু করেছে।

ব্যাপারখানা যত কৌতুককরই হোক, অন্য বাড়ির কর্তারা মনে মনে চিন্তিত। দেখাদেখি তাদের বাড়ির বউ-ঝিয়েরাও যদি জুতো পরা শুরু করে তাহলে তো আধুনিকতার বাতাসে করণ মূর্ছা যাবে!

এই দু-দুটো ঘটনা থেকে মাথা খাটিয়ে চণ্ডীবউয়ের কলকাতা যাবার ইচ্ছের একটা কারণ বার করে ফেলল কেউ কেউ। চণ্ডীবউ কলকাতা যেতে চায় স্বচক্ষে বিধবা বিয়ে দেখতে আর হালফ্যাশান শিখতে। গেঁও করণে কি আছে?

দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর চটক বলতে কিছু নেই আর। নিষ্প্রভ দশা। এর জন্য দায়ী মনে-মুখে সকলে একজনকেই করে। দায়ী মদনমোহন। সকলে তার ওপর নির্ভর করেছিল। মানুষটা সকলের থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য সে-সম্বন্ধে আজও কারো সংশয় নেই। শাস্ত্র বলে পরস্ত্রীর দিকে চোখ দিও না, হৃতবীর্য হবে। এমন ডাকসাইটে পাণ্ডার এই দশাই হবে কিনা কে জানে!

মরা গাঙে যেমন সময় বান ডাকে তেমনি হঠাৎ-হঠাৎ এক-একসময় যেন সজাগ হয়ে ওঠে মদনমোহন। তখন যে কতটা পারে তাও দেখেছে সবাই। পুরনো বারইয়ারীতে নতুন প্রাণসঞ্চারের সঙ্কল্পে অল্পদিনের মধ্যে কি কাজ করল, কত টাকা তুলল সেটা এরই মধ্যে ভোলার কথা নয়। কিন্তু তারপর? তারপর বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। একটু আনন্দের মুখও দেখল না কেউ। প্রথমে স্কুল করে গাঁয়ের ছেলেদের বিদ্যাদিগ্‌গজ করে তুলবে ঠিক করেছিল। ভেবেছিল এমন মহৎ চেষ্টা দেখে লাজ-মান ছেড়ে ঘরের এক কুলবধু ওই কাজে মন-প্রাণ সমর্পণ করে দেবে। বলতে গেলে প্রত্যেকের অমতেই ওই সব টাকা শেষ পর্যন্ত জমা পড়েছে বিভাগীয় কমিশনারের তহবিলে। কি না, তাদের প্ল্যানে এখানে হাসপাতাল করার সঙ্কল্প আছে—সেই হাসপাতাল হলে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর নামে আলাদা ব্লক হবে—বারইয়ারীর নাম চিরকাল বেঁচে থাকবে।

বারইয়ারীর পৃষ্ঠপোষকরা মনে মনে বলেছে, গুষ্টির পিণ্ডি হবে!

শাস্ত্রবচন অভ্রান্ত-জ্ঞানে অনুরাগীরা এখনো অবশ্য তাকে ঠিক হৃতবীর্য ভাবে না। বিশেষ করে শ্রীনাথ হরবোলা। ঝিমুনো-দশা থেকে টেনে তুলতে পারলে মানুষটা এখনো কত শক্তি আর কত বুদ্ধি ধরে তা তো অনেকবারই দেখা গেছে। বুদ্ধির

জোরে ষষ্ঠীচরণের মতো পালোয়ানকেই ঘায়েল করেছে, গাছের সঙ্গে বেঁধে মাতালগুলো যখন এর প্রাণ নিয়ে টানাটানি করছিল, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে এই মদনমোহন তখন একলা গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে এনেছে, রক্তপাতের জবাবে কি নিখুঁত কৌশলে রাধানাথকে নিজের বাড়িতে এনে বন্দী করেছে, যার দরুন তার মানসপ্রেয়সীকে পর্যন্ত সে-বাড়িতে ছুটে আসতে হয়েছে। এমন কতই তো দেখল যার তুলনা নেই।

তাই, একমাত্র সে-ই এখনো গোটাগুটি আশা ছাড়তে পারছে না।

সেদিন বলল, আর কেন, বারইয়ারীর ঘরে একটা তালা লটকে দাও না, আমরা সব নদীতে চান করে শুদ্ধ হয়ে নিই!

কেন? টিপ্পনীর কারণটা সঠিক যেন বোধগম্য হল না মদনমোহনের।

কেন তাও বুঝতে পারছ না! তোমার দলের লোকেরা এখন নতুন বারইয়ারীর আশে পাশে ছোঁক-ছোঁক করে বেড়াচ্ছে—এখানকার অন্ত্যেষ্টিটা হয়ে গেলে আর পিছু-টান থাকে না!

মদনমোহন বলল, ওদেরই বা কি হচ্ছে, ওই আহাম্মকটার টাকায় শুধু মদের হল্লা চলছে।

তবু তো হল্লা একটা। সক্কলের মুখে মুখে ওদের নাম।

মদনমোহন মুখ টিপে হাসতে লাগল। তারপর শুধালো, মুখে মুখে ওদের নাম না দত্তবাড়ির বউয়ের নাম? তার সঙ্গে পাল্লা দিই কি করে?

তবে আর কি, বছরে পর বছর ধরে তুমি কেবল কুল-ভাঙানোর স্বপ্ন দেখেই কাটিয়ে দাও! ঠাকরোনটির কথা মনে হলেই দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাতে ইচ্ছে করে আমার। কি মনে পড়তে ক্ষোভ ভুলে ছিরে পাগলা উৎসুক একটু।—তোমার ওই কুলবতী আবার এক নতুন রঙ্গ শুরু করেছে শুনেছ?

মদনমোহনের অজানা কিছু নেই, তবু পলকা বিস্ময়।—না তো, কি?

শোন শুনলে তোমার কান মন জুড়োবে। তাদের বাড়ির রাস্তা দিয়ে আজ কাল ঢাক-ঢোল বাজিয়ে কোন নতুন বউকে শ্বশুরবাড়ি যেতে দেখলেই দত্তবাড়ির পেয়াদা পথ আগলে দাঁড়ায়। তারপরে শ্রীচরণে জুতো চড়িয়ে দত্তবাড়ির বউ এসে পালকির ঢাকনা তুলে নতুন বউয়ের মুখ দেখে, তার প্রশংসা করে, সে-রকম বউ হলে একটু রঙ্গরসও করে, তারপর জোর করেই বউয়ের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেয়। অন্য পথ দিয়ে যাদের বউ নিয়ে যাবার কথা, তারাও এখন দত্তবাড়ির রাস্তা দিয়ে যেতে শুরু করেছে। ওই কুলবতী হলেন গিয়ে করণের সাম্রাজ্ঞী এখন, তাঁকে মুখ না দেখিয়ে কেউ ঘরে বউ তুলবে কি? আসলে নিজের থেকে রূপসী কেউ যাচ্ছে কিনা তাই দেখে বোধ হয়।

ছিরে পাগলা অতিরঞ্জিত কিছু করে নি। ইদানীং চণ্ডীবউকে এই মজায় পেয়ে বসেছে বটে। ঘটা করে বউ নিয়ে যেতে দেখলেই আগের ভাগে তার গিয়ে মুখ দেখা চাই। তক্ষুনি প্রসন্নকে নীচে থেকে লোক নিয়ে ছুটতে হয় বউয়ের পালকি আগলাতে। বাড়ির পেয়দাগুলোও এক মজা পেয়ে বসেছে এখন। তাদের বউমণি এসে নতুন বউ দেখে পালকি না ছাড়া পর্যন্ত ফটকের সমুখ থেকে বউয়ের পালকি নড়বে না।

মাস দেড়েক পরের কথা।

অনেক দিন বাদে করণে আবার বেশ স্মরণীয় ঘটনাই ঘটে গেল একখানা।

বেশ বড়সড় মিছিল করে বউ নিয়ে আসছিল কারা। মিছিল দেখেই বোঝা গেল কোন বড়ঘরের মেয়ে আর কোন বড়ঘরে চলেছে। ঢাক-ঢোল কাঁসর-ঘন্টা বাজছে। বউয়ের পালকিখানা মস্ত একখানা লালপদ্মের মতো করে সাজানো হয়েছে—দেখলেই চোখ টানে।

দূর থেকে দেখেই চণ্ডীবউ প্রসন্নকে ইশারা করল। প্রসন্ন তক্ষুনি নীচে ছুট। বড় মিছিল, তাই বেশি কয়েকজন লোক দরকার হয়েছে তার। ওরা সব লোকেদের বোঝাচ্ছে বউমণি বউ দেখবেন তাই একটু দাঁড়িয়ে যেতে হবে। ওদিকে প্রসন্নময়ী পালকি ধরেই দাঁড়িয়ে আছে।

একটু বাদেই চণ্ডীবউ নেমে এলো। তার হাতে রূপোর সিঁদুর-কৌটো আর টাকা। এভাবে আটকানোর জন্য মিছিলের লোকগুলো বিরূপ একটু—তারা নাকি অনেক দূর যাবে। কিন্তু চণ্ডীবউকে দেখামাত্র সব চুপ একেবারে।

চণ্ডীবউ পালকির কাছে এগিয়ে গেল। নিজের হাতে ঢাকনা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিল।

পরমুহূর্তে বিষম একটা ঝাঁকুনি খেয়ে নির্বাক বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত।

পালকির মধ্যে চেলি মাথায় দিয়ে বসে আছে ঘোষালবাড়ির ছেলে মদনমোহন। চণ্ডীবউয়ের পাশ ঘেঁষে উঁকি দিয়েছিল প্রসন্নময়ীও। সে অস্ফুট আর্তনাদই করে উঠল একটা।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। থতমত খেয়ে নিজের অগোচরেই ঢাকনাটা ফেলে দিল চণ্ডীবউ। মুখে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠছে। ক্ষিপ্রহাতে মাথায় ঘোমটাটা টেনে দিয়ে দ্রুত ফটকের দিকে পা বাড়ালো। সেই মুহূর্তে দ্বিগুণ জোরে মিছিলের কাঁসরঘন্টা বেজে উঠল।

একেবারে দোতলায় উঠে নিজের ঘরে এসে বিছানায় বসে হাঁপাতে লাগল চণ্ডীবউ। মুখ তখনো সিঁদুর-বর্ণ। এরকম এক অসম্ভব ব্যাপার কি করে ঘটল তখনো যেন ভালো করে মাথায় ঢুকছে না। নিরীহ টানা দুটো পুরুষের চোখ এখনো যেন তার মুখের ওপর আটকে আছে। স্নায়ুগুলো সব কাঁপছে চণ্ডীবউয়ের।

একটু বাদে প্রসন্নময়ী ঘরে ঢুকল। তারও বিভ্রান্ত দিশেহারা মূর্তি। ওকে দেখে হঠাৎ উগ্র রোষে ফেটেই পড়ল চণ্ডীবউ।—দূর হ, দূর হ, দূর হ বলছি এখান থেকে!

প্রসন্নময়ী সভয়ে ঘর ছেড়ে পালালো।

ওদের শাঁক আর কাঁসরঘন্টার শব্দ এখনো যেন দু'কানের পবদা ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে। চণ্ডীবউ কি যে করবে ভেবে না পেয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল।

তারপর করল যা সে-ও এক বিচিত্র ব্যাপার। হঠাৎই বিছানায় আছড়ে পড়ল। তারপর হাসি। হাসি হাসি বেদম হাসি। হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল একেবারে। সেই হাসির দমকে প্রাণটাই বেরিয়ে যাবে বুঝি।

তারপর...

তারপর সেই চিরাচরিত ব্যাপার। করণের আকাশ মাটি বাতাস রসের জোয়ারে টই-টম্বুর।

হেসে গড়াতে পারে নি শুধু একটি লোক। রাধানাথ। সে পারে নি বলেই তার সাগরেদদেরও চেষ্টাকৃত গোমড়া মুখ। সেই রাতে আর ঘরমুখো হয় নি রাধানাথ। ক্ষতের ওপর প্রলেপ দেবার চেষ্টায় অন্যত্রও যায় নি। বারইয়ারীর দালানে বসেই মাঝরাত্রি পর্যন্ত মদ গিলেছে। বাড়ি গিয়ে কি করবে, বউয়ের সঙ্গে সেই চিরাচরিত রাগারাগি বকাঝকি? অনেক করেছে, ওতে আর রুচি নেই।

বার বার ভাবতে চেষ্টা করল, বউয়ের দোষ কিছু নেই। তার নতুন বউয়ের মুখ দেখার এই নির্দোষ কৌতুক এতদিন তো সকলেই মজার চোখে দেখেছে। এমন কি রাধানাথ নিজেও। ওই নরাধম পাজী যে এমন নির্লজ্জ সুযোগ নেবে তার—বউ ভাববে কি করে? শাস্তি, মারাত্মক শাস্তি কিছু ওই শয়তানকেই দেওয়া দরকার। কিন্তু শাস্তির কথা যত ভাবছে, ততো যেন সেটা নিজের বউয়ের মাথায়ই ভেঙে পড়তে চাইছে।

শেষরাতে স্বপ্ন দেখল রাধানাথ, সে আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা মিলে বাড়ির আঙিনার ভিতরেই এক জায়গায় চুপিচুপি এক রমণীর মৃতদেহ মাটির তলায় পুঁতে ফেলছে।

বেলাবেলি বাড়ি ফিরল। তার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত বউয়ের সঙ্গে একটা কথাও হল না। কিন্তু রাধানাথ লক্ষ্য করছে তাকে। বেশ ভালো করেই লক্ষ্য করছে। বাইরে বউ গম্ভীর বটে, কিন্তু সেটা যেন মেকী ঠেকছে চোখে। ভিতরে ভিতরে একটা আনন্দের হাওয়া বইছে মনে হয়।

আর চুপ করে থাকা গেল না। শেষে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, কালকের ব্যাপারটা শুনলাম, সকলে খুব আনন্দ করছে, তোমাকেও তো অখুশি দেখছি না!

না। চোখে চোখ বেখে চণ্ডীবউ কাছে এসে দাঁড়াল।—ওই ব্যাপার শোনার শোকে রাতটা বাইরে কাটিয়ে এলে?

রাধানাথ বলতে পারল না, ওই ধাক্কা খেয়ে কাল রাতে সে কোনো রমণী-কুঞ্জে গিয়ে হাজির হয় নি—বারইয়ারীতেই পড়ে ছিল। রাগের ওপর হাসি টানার চেষ্টায় আরো বিকৃত দেখালো মুখ।—কেন? ঘরের আলো নিভিয়ে মনের মানুষ ভাবতে সুবিধে হত?

বহুদিন আগে এইগোছের শ্লেষের প্রত্যাশিত ফল দেখেছিল। আজ ঝলসে উঠবে ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু তার বদলে যে প্রতিক্রিয়া দেখল রাধানাথ নিজেই অবাক। তার দিকে চেয়ে আছে, হাসছে না, অথচ চোখ থেকে একটা চাপা হাসি যেন সমস্ত মুখে ছড়াচ্ছে।

রাধানাথ এবারে সরোষে বলে উঠল, তুমি কি ভেবেছ আমি জানতে চাই। আমাকে চেনো না?

অনুচ্চ ঠাণ্ডা সুরে চণ্ডীবউ পাল্টা প্রশ্ন করল, আমাকে তুমি চেনো না? তুমি কি ভেবেছ?

তার মানে?

গলার স্বর তেমনি অনুচ্চ, কিন্তু এবারে আচমকা ঝলসে উঠল যেন চণ্ডীবউ।—তার মানে তুমি কলকাতা যাচ্ছ? কবে?

বাঃ, বা-রে! বললাম যে রেলগাড়ি হোক্—

ওসব রেলগাড়ি-ফাড়ি বুঝি না, এই শেষবারের মতো তোমাকে বলে দিচ্ছি, ভালো চাও তো ব্যবস্থা করো।

দেয়ালে টাঙানো কালীর ছবিটার ওপর চোখের আগুনের একটা ঝাপটা মেরে চণ্ডীবউ ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল।

রাধানাথ সেই আগের বারের মতোই হতচকিত।

॥ ২৯ ॥

মুমূর্ষু রোগীর দেহে হঠাৎ জীবনের আলো ঝলমলিয়ে উঠতে দেখলে তার আত্মজনেরা যেমন করে খুশির বন্যায় ভাসে, যেমন করে মৃত্যুর চিন্তা মন থেকে ঝেঁটিয়ে সরাতে চায়—তেমনি করেই আনন্দে মেতে উঠেছিল দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর ভক্তরা, তেমনি করেই এতদিনের নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে চেয়েছিল তারা। বাঁচতে পারে, দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারী আবার আগের মতই রঙ্গ-রসে ভরা জীবনের জোয়ারে ঝলমলিয়ে উঠতে পারে। মদনমোহন মদনমোহনই বটে, তার আর এক দফা প্রমাণ হয়ে গেল। সে একক। সে অনন্য। স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা। সেই এক ঘায়ে করণে আবাব কৌতুকের বান ডেকেছে।

...সকলের চোখেমুখে এক অব্যক্ত কৌতূহল। এভাবে জব্দ হবার পর দত্তবাড়ির চণ্ডীবউয়েব মনের অবস্থাখানা ঠিক কি-বকম? ঠাকরোন কি জীবনে আব রাস্তার মিছিল আটকে পালকির ঢাকনা তুলে অচেনা নতুন বউয়ের মুখ দেখতে আসবে কোনদিন? রূপের দেমাক আর বুদ্ধির দেমাকে আব ডগমগ করবে?

ঘটনাটা যারা স্বচক্ষে দেখে নি, দত্তবাড়িব রূপসী বউয়ের সেই বিভ্রান্ত হতচকিত মূর্তি-কল্পনা করে তাদেরও রোমাঞ্চ ধরে না। পুরুষেব মত পুরুষ সমস্ত করণে একজন বই দুটি নেই। পারে, ওই এক মদনমোহন পারে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর শুকনো শিরায় শিরায় নতুন জীবন আব নতুন যৌবনের স্রোত বইয়ে দিতে। সে সক্রিয় হলে সমস্ত গাঁ-খানাই তরতাজা হয়ে চনমনিয়ে উঠতে পারে। তার নজির তারা আগেও অনেক দেখেছে, আবারও দেখল।

দু'তিন দিন ধরে ভক্তরা তাদের গুরুকে মাথায় তুলে নেচেছে। আরো ক'দিন নাচত বলা যায় না। সেই নাচের ভিতর দিয়ে নতুন প্রাণে আশা আর উল্লাস প্রায় মত্ততার আকার নিয়েছিল।

তারপরেই অবাক কাণ্ড। মানুষটা যেন হঠাৎ গাঁ থেকেই উবে গেল। আশার ব্যাধিতে সব থেকে বেশি ভুগছিল শ্রীনাথ—ছিরে পাগলা। সে শুধু এই কাণ্ডর পরে নয়, বরাবরই বিশ্বাস করত দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর জিয়ন-মরণের ভোমরা ওই একটিমাত্র মানুষের করতলগত। গাছে বেঁধে মারার হেনস্থাটা ছিরে পাগলা জীবনে ভুলবে না। মনের তলায় প্রতিশোধের আগুন জ্বলছেই। শুধু মদনমোহন ইচ্ছে করলেই তার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ হতে পারে। সেই ইচ্ছেরই স্ফুলিঙ্গ দেখেছিল সে।

কিন্তু মদনমোহন নেই।

সকালে নেই, দুপুরে নেই, বিকেলে নেই, রাত্রিতে নেই। বাড়িতে যে লোক থাকে দুই-একজন, তারাও তার গতিবিধির খবর রাখে না। প্রথমে ভয়ই ধরেছিল, শত্রুপক্ষ তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুমটুম করে ফেলল নাকি!

সে-রকম কিছু যে হতে পারে না তাও জানে ছিরে পাগলা। খোঁজখবর করতে তার দেখা না মিলুক হদিস মিলল। কেউ বলল খুব ভোরে বা বেশি রাত্রিতে মদন ঠাকুরকে দত্তবাড়ির পিছনের আমবাগানের দিকে দেখা গেছে। কেউ জানালো, দুপুরে উলুবনে মহাচণ্ডীর থানের কাছে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছে তাকে। আবার কেউ নাকি বিকেলে চুর্ণির ধারেও দেখেছে।

বিকেলে চুর্ণির ধারেই ছিরে পাগলা সাক্ষাৎ পেল তার। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে শুকনো নদীর দিকে চেয়ে আছে। দেখামাত্র পিত্তি জ্বলে উঠল ছিরে পাগলার। নবীন তপস্বীর মুখ যেন। দুনিয়ার পারে বসে দুনিয়া দেখছে। না, আশা করার আর কিছু নেই। যে-আশার স্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠেছিল সেটা অন্তিমের আলো, একেবারে নেভার আগে শেষবারের মতো দপদপিয়ে উঠেছিল।

দু'হাত কোমরে তুলে গুরুগম্ভীর পর্যবেক্ষণে মন দিল ছিরে পাগলা।

মদনমোহন হাসতেই চেষ্টা করল একটু।—কি?

পালকির শুভদৃষ্টি তোমার বুকের ভিতরটাকেই কচকচ করে কাটছে তাহলে?

মদনমোহন অস্বীকার করল না। মাথা নেড়ে সায় দিল। তাই।

মহাচণ্ডীর থানে মাথা খুঁড়ে কিছু সুরাহা হল?

মদনমোহন হাসিমুখেই উল্টো রকমের মাথা নাড়ল। হল না।

তাহলে?

বোসো। তাহলে কি করা যায় তুমিই বলো। আমি ভেবে পাচ্ছি না।

হাত-তিনেক ফারাকে শ্রীনাথ বসল। তেমনি গম্ভীর। না, এই মানুষকে দিয়ে দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারীর নতুন জীবনের আশা আর যে করে সে বাতুল। নতুন চিন্তায় শ্রীনাথের ভিতরটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। রাধানাথের হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে আনার আক্রোশ উদগ্র হয়ে উঠল।—সত্যি কিছু করতে চাও? সে হিম্মৎ আছে?

হিম্মতের কথা শুনে মদনমোহন নড়েচড়ে বসল একটু।—কি রকম?

বোকাগুলো সব দুর্জয় সাহসী ভাবে তোমাকে। আমারও এক-একবার সেই রকম ভুল হয়েছে। তুমি চমক লাগাতে পারো, ভোগ করার সাহস তোমার কানাকড়িও নেই—একটা মেয়েমানুষের কথা চিন্তা করেই বছরের পর বছর কাটিয়ে দিলে, স্বপ্নের সেতু ধরে রূপসী তোমার কাছে এসে ধরা দেবে ভাবো নাকি?

ভিতরে ভিতরে বিরক্ত বোধ করছে মদনমোহন। তার শান্ত তন্ময়তার ওপর একটা স্থূল আঁচড় ফেলছে যেন কেউ। তার ভিতরে কি হচ্ছে এরা বুঝবে না। কনে দেখার ব্যাপারে চণ্ডীবউকে জব্দ করার যে-ঘটনায় এরা উল্লাসিত, তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মদনমোহন ছটফট করছে কটা দিন ধরে। সে যেন শুচিতা নষ্ট করেছে কিছুর। রমণীর গভীর কালো চোখের সেই হতচকিত বিভ্রম আর বিস্ময়ের পরমুহূর্তের ভর্ৎসনাটুকু শিরায় শিরায় যেন বেদনার চিড় টেনে দিয়ে গেছে। বুকের তলায় সেই আঘাতটুকু খচখচ করছে। কেবলই মনে হয়েছে, ওই রমণীর চোখে নিজেকে

সে নীচে টেনে নামিয়েছে। সেই সঙ্গে আগে কখনো যা ভাবত না তাও ভাবছে। বউ এভাবে জব্দ হবার ফলে রাধানাথ তার প্রতি অকরুণ হবে, তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে। রমণীর নির্দোষ কৌতুকপ্রিয়তা তার নিজের কাছেই বিষাদ হয়ে উঠবে।

জবাব না দিয়ে মদনমোহন শ্রীনাথের দিকে চেয়ে রইল। তপ্ত ইন্ধন যোগাবার মত করে ছিরে পাগলা বলল, যদি সতিকারের পুরুষমানুষ হও তো আর চমক দেখিয়ে বেড়িও না, ওতে খিদে মিটবে না—কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো। রাধানাথের শেষ দেখবার জন্যেও আমি আছি তোমার পিছনে।

কি বলতে চায় কি যেন বোধগম্য হল না। জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল মদনমোহন। শ্রীনাথ বলল, একটা মেয়েকে গায়েব করে ফেলা খুব কঠিন নয়, এই গাঁয়ে সেই সু-কর্ম আগেও ঢের হয়েছে—এ শুধু একটু বড়ঘরের আর বড় দরের ব্যাপার। তোমার রূপসী মোহিনীকে নিয়ে সোজা কলকাতায় পাড়ি দিতে পারলে কে আর টিকির খোঁজ পাবে?

ছিরে পাগলা যা বলল তার বাস্তব সম্ভাবনাটা মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল মদনমোহনের। দীর্ঘ-উপবাসী এক লোভাতুর সেই দুর্লভ রমণীর স্পর্শ-সান্নিধ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে যেন। তারপরেই নিশ্চল, স্তব্ধ মদনমোহন। বিবেকের কশাঘাতে জর্জরিত করে নিজেকে উদ্ধার করেছে। লোভ নির্মূল করতে চেয়েছে। সময় লেগেছে, কিন্তু নির্মূল করতে পেরেছে। না, রাধানাথকেও আর শত্রু ভাবতে পারছে না। উল্টে সেও প্রিয়জন। একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ বলেই প্রিয়। সেই একজনের সঙ্গে যে যুক্ত সে-ই প্রিয়, যা-কিছু যুক্ত তাই প্রিয়। এই নতুন অনুভূতিটা বড় আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ।

শ্রীনাথের দিকে মুখ তুলে তাকালো। অনুচ্চ কঠিন স্বরে বলল, এই কথা ফের তোমার মুখে শুনলে ফল ভালো হবে না।

শ্রীনাথেব মুখ কালো তৎক্ষণাৎ। গলার এই স্বর সে চেনে। এই মূর্তিও। ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বাইরে প্রকাশ পেল না। মুখের দিকে চেয়ে হাসতেই চেষ্টা করল। কথার সুরে চাপা ব্যঙ্গ ঝরল।—এই ব্যাপার!...কুলবতীর সঙ্গে যে ব্যবহারটা সেদিন করে ফেলেছ তুমি তাহলে তার জন্যেই অনুতপ্ত এখন...সেই অনুতাপেই গা-ঢাকা দিয়ে আছ?

মদনমোহন ঠাণ্ডামুখে মাথা নাড়ল। তাই।

তাহলে তো আমার ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। আচ্ছা, তুমি তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করো বসে বসে।

উঠে জ্বলতে জ্বলতে চলে গেল।

সেই জ্বলুনির মুখে মুন্কের সঙ্গে দেখা। দত্তপাড়ার কাছাকাছি খালের ধরে ভুঁড়ি ছড়িয়ে বসে আছে বিরস বদনে। দু'দিন হল সাহস করে আর প্রসন্নময়ীর ধারে কাছে যেতে পারে নি। ফলে ভালোমত আহারও জোটে নি। যাবে কি করে? বড়লোকের বাড়ির আগুনপানা রূপসী বউয়ের মেজাজ আর রঙ্গ বোঝা ভার। দেখতে পেলেই নিজেই সামনাসামনি এসে বিধবা বিয়ের কথা তুলবে কিনা কে জানে!

তাকে দেখে ভিতরটা আবার চিড়বিড় করে উঠল, ছিরে পাগলার। হনহন করে পাশ কাটিয়েও ঘুরে তাকালো। পেটুক বামুন ঘাড় বেঁকিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে ড্যাব ড্যাব করে। ওকে অব্যাহতি দিয়ে সত্যি চলে যাবে ভাবতে পারছেনা।

ছিরে পাগলা ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার তার দিকে এগিয়ে এলো। দুই ভুরুর মাঝে গম্ভীর ভ্রূকুটি। গলা দিয়ে উপোসী হাতির গরগর শব্দ বার করতে চেষ্টা করলে একটু। দেখছে নিরীক্ষণ করে।

রেগে না যাওয়া পর্যন্ত মুন্‌কে ওকে দেখলে তোয়াজ-তোশামোদই করে থাকে একটু। যথাসম্ভব মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করল, অমন হনহন করে চললে কোথায়?

খুব বিপদ! কেন তুমি শোন নি?

না তো। কি বিপদ?

আশ্চর্য! তোমার বিধবা বে'র দিন ঠিক হয়ে গেছে নাকি, কোন জগতে ছিলে?

কি যে বাজে বকো, কি হয়েছে তাই বলো না?

মাথা দ্রুত খেলছে শ্রীনাথের। তাদের দলের মাথার যখন এই হাল, এ-সুযোগে তার একটু যুতসই উপকার করা যেতে পারে। বলল, আমাদের মদনমোহন যায় যায় এখবর এক তুমি ছাড়া সকলেই রাখে।

ছিরে পাগলার কথায় বিশ্বাস করে অনেক জব্দ হয়েছে মুন্‌কে, তাই ভালো করে বুঝে নিতে চাইল। কিন্তু এই লোকের মুখ দেখে মন বোঝা তার সাধ্য নয়। মদনমোহন তিনদিন ধরে নিখোঁজ এ-খবর সেও জানে। উতলা মুখে জিজ্ঞাসা করল, কেন মদন ঠাকুরের কি হয়েছে?

তিনদিন হল জল স্পর্শ করে নি। এখন নাড়ি ধুকপুক, তবু কেউ এক ফোঁটা জল মুখে দিতে পারছে না। কনে সেজে তোমাদের বউমণির সঙ্গে অমন রসিকতার পর অনুতাপে মরে যাচ্ছে...মরে যাবেই ঠিক করেছে। দুপুরে মহাচণ্ডীর থানে খোঁড়ে, বিকেলে চুর্ণির ধারে গড়ায় আর ছটফট করে, রাত্রি থেকে ভোর পর্যন্ত তো ওই দত্তবাড়ির পিছনের আমবাগানেই কাটায়—রাধানাথের বউ ক্ষমা করেছে শুনলে হয়তা মুখে জল দিত, কিন্তু সে-ব্যবস্থা অমি করি কি রে বলো তা ভাই?

বলতে বলতে দু'চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম ছিরে পাগলার। সেটা সামলাবার জন্যেই আবার হনহন করে পা বাড়ালো সে।

নিজের সমস্যা ভুলে মুন্‌কে হাঁ করে সেদিকে চেয়ে রইল।

প্রায় রাত থাকতে ঘুম ভেঙে গেল চণ্ডীবউয়ের। ভোরেই ওঠে। কিন্তু এত ভোরে নয়। অথচ একটু বেশি রাতেই শুয়েছিল। শুতে প্রায়ই রাত হয় আজকাল, কারণ রাধানাথের জন্য অপেক্ষা করে। মত্ত অবস্থায় সে ফেরে যখন ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রি-রি করে ওঠে। সে ঘরে পা দেওয়ামাত্র ঘরের বাতাসসুদ্ধু দূষিত হয়ে ওঠে যেন। ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যায় না। নিশ্চল বসে থাকে। স্থির চোখে চেয়ে থাকে। লোকটার নেশা অনেকখানি চটে যায় তাতে, বুঝতে পারে। মেরুদণ্ডশূন্য কাপুরুষের মতো শয্যার আশ্রয়ে মুখ আড়াল করে সে।

তার এই অপেক্ষা করাটা, বসে থাকাটা চাবুকের কাজ করে। প্রতীক্ষার এই চাবুক দিনে দিনে কঠিন হয়ে উঠছে রাধানাথ তাও অনুভব করতে পারে।

তখনো অন্ধকার চারদিক। পাখির দুই-একটা কিচিরমিচির ডাক শোনা যাচ্ছে। চণ্ডীবউ চোখ মেলে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে রাতের কি একটা দূরে ঠেলা ভাবনা মাথার দিকে এগিয়ে আসার উপক্রম করল। ঘুমের ফাঁকে সেটা যেন খুব কাছাকাছি এসে অপেক্ষা করছিল।

উঠেই পড়ল। ঘুমের পরেও স্নায়ুগুলো টান ধরে থাকে আজকাল। নিঃশব্দ ভ্রূকুটিতে ভাবনার প্রসঙ্গটা মুহূর্তের মধ্যেই দূরে ঠেলে দিল আবার।

মুখ-হাত ধুতে গিয়ে আধা স্নান সেরে বাসি শাড়ি বদলে ফের ঘরে এলো যখন, বাইরের অন্ধকার অনেকখানি ফিকে হয়েছে। চিরুনি হাতে মাথা আঁচড়াতে গিয়ে আয়নার ভিতর দিয়ে দু'চোখ দেয়ালে টাঙানো কালীর ছবিটার ওপর থমকালো। মুখে কঠিন রেখা পড়ল গোটাকতক, যেন ওই মূর্তিরই অপরাধ কিছু। আয়নার ভিতর দিয়েই চোখ দুটো পালঙ্কের দিকে ঘুরল। চিৎপাত হয়ে নাক ডাকাচ্ছে লোকটা, 'বুক-পেট হাপরের মতো উঠছে নামছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা অপ্রিয় চেনা গন্ধ এখনো যেন আয়নার ভিতর দিয়ে তার মুখে এসে লাগছে। সেদিক থেকে আয়নার দু'চোখ আবার কালীর ছবির দিকে ফিরল। কৈফিয়ত একদিন সে ছবির ওই মূর্তির থেকেই আদায় করে ছাড়বে যেন।

মাথায় সামান্য একটু চিরুনি বুলিয়ে পালঙ্কের মানুষটার দিকেই ফিরে দাঁড়াল প্রথম। তারপর ভূমি-শয্যা তুলে ফেলল। মেরুদণ্ডশূন্য ওই মানুষের অপরাধ-প্রবণ ধড়ফড়ানি বাড়িয়ে দেবার জন্য পালঙ্কের শুতেও আপত্তি হত না চণ্ডীবউয়ের। কিন্তু ওই কটু গন্ধটাই তাকে ঠেলে সরায়, ওটা কিছুর বরদাস্ত করতে পারে না।

পায়ে পায়ে ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিঝুম পুরী এখনো। ভোরের প্রথম আলো ধূসর তখনো। আকাশের আধখানা চাঁদের সোনার রং রূপোর দিকে ঘেঁষছে। সামনের আম বাগানের উঁচু মাথায় গাছগুলোর মাথায় খানিকটা করে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে।

সেদিকে তাকানো মাত্র রাতের দূরে-ঠেলা ভাবনার প্রসঙ্গটা সমস্ত বাধাবন্ধ পেরিয়ে হুড়মুড় করে সামনে এগিয়ে এলো বুঝি। চণ্ডীবউ এবার আর কেন যেন বুঝতেও চেষ্টা করলো না।

...গত সন্ধ্যায় প্রসন্ন মুখপুড়ি ইনিয়ে-বিনিয়ে খবরটা বিস্তার করেছে তার কানে। শ্রীনাথের পাশা ছোঁড়াটা একেবারে বিফল হয়নি। তার ফলাফল ঠিক জায়গা মতো এসে পৌঁছেছে। পেটুক বামুনের আহারের চিন্তাটা তখনকার মতো শিকেয় উঠেছে। মদন ঠাকুরের অমন অদ্ভুত মানসিক প্রতিক্রিয়া দত্তবাড়ির বউয়ের কতটা আনন্দের কারণ হতে পারে, প্রসন্নর সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত মুনুকে ঠাওর করে উঠতে পারে নি। তেমন কিছুই ঘটেছে আভাস দিয়ে সাঁঝের আঁধারে প্রসন্নময়ীকে সে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ির পিছনে টেনে আনতে পেরেছে। সমাচার শুনে প্রসন্নরও দু'চোখ কপালে। বিশ্বাস করবে কি করবে না জানে না। একেবারে অবিশ্বাসই বা করে কি করে? মজা জমে ওঠার মুখে তিন দিন ধরে মদনঠাকুর নিখোঁজ হবার খবরটা শোনাই ছিল। তবে বিস্ময়ের ফাঁকে বিটলে বামুন যে একটু করে দিব্বি গায়ে-পিঠে হাত বুলোচ্ছে তাও খেয়াল ছিল না। এক ঝটকায় হাত ঠেলে সরিয়ে প্রসন্নময়ী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ফিরেছে আবার।

চটকদার খবরটা বউমণির কানে না তুলতে পারলে পেট ফুলে মরবে প্রসন্নময়ী। তার মতে বউমণি জব্দ হয়েও জিতেছে, কিন্তু ভিতরে কোথায় খচখচ করে লাগছেও আবার। যে গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ মদন ঠাকুর, সত্যি সত্যি আত্মঘাতী হয়ে বসবে নাকি শেষ পর্যন্ত!

যতখানি সম্ভব নিস্পৃহ মুখে শুনেছে চণ্ডীবউ, আর মাঝে মাঝে আড়চোখে প্রসন্নর চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করেছে। শেষে তার যা রীতি তাই করেছে, সবটুকু শোনার পর ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, তা এ খবর ঘটা করে আমাকে শোনাতে এসেছিস কেন—যা দূর হ্ এখান থেকে!

না, এক বর্ণও বিশ্বাস করে নি চণ্ডীবউ।...ওই লোক মহাচণ্ডীর থানে মাথা খুঁড়ছে, ডুবে মরার মতলবে মরা চুর্ণির ধারে বসে থাকছে, অনুশোচনায় তিন দিন তিন রাত জলস্পর্শ করে নি, সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত জলস্পর্শ করবেও না—এর একটা কথাও বিশ্বাস করে নি চণ্ডীবউ। চন্দনের ফোঁটা-পরা, মাথায় ওড়না-টানা মানুষটার সেই নিস্পলক আয়ত চোখের দৃষ্টি মন থেকে তাড়ানো শক্ত। যতবার মনে পড়েছে এরপর, ততবার রাগ হয়েছে, আবার সেই রাগের মুখেও না হেসে পারে নি।

তবু জানে মানুষটা ইতর নয়। ওই ঘটনার পর মানসিক প্রতিক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটেও থাকতে পারে। রাতের আঁধারে বাড়ির আশপাশে ওই লোক ঘুরঘুর করে, সেটা আগেও অনেক সময় টের পেয়েছে। ভোরের খবর রাখে না। কি একটা অস্বস্তি যেন ওই সিঁড়িটার দিকে ঠেলে ঠেলে দিতে লাগল তাকে। চণ্ডীবউ পায়ে পায়ে সেদিকে এগোলো। নীচে নামল। এই সকালে বড়লোকের বাড়ির দাসদাসীরাও ঘুমে অচেতন।

পিছনে খিড়কির দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। তারপর ভিতরের সমস্ত বাধা ঠেলেই যেন দরজার খিল খুলে ফেলল। দেউড়ি ডিঙিয়ে বাইরে এলো। প্রথমে ঘাস-জমি একটু, তারপরেই মস্ত আমবাগান। সেটাকে চাঁদোয়ার মতো ঘিরে সরু রাস্তা ষষ্ঠীচরণের বাড়ির দিকে চলে গেছে। ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে রাস্তা বরাবর কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাড়িয়ে গেল চণ্ডীবউ।

গজ-তিরিশেক দূরে রাস্তাটা যেখানে সবে বাঁক নিয়েছে, সেখানে নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ঘোষালবাড়ির মদনমোহন। গায়ে ফতুয়ার ওপর একটা পাতলা চাদর জড়ানো।

মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিতে গিয়েও দিল না চণ্ডীবউ। স্থির দাঁড়িয়ে রইল। নিস্পলক চেয়ে রইল। স্তব্ধ মুখে কঠিন রেখা। কঠিন কিন্তু উগ্র নয়।

তেমনি চেয়ে আছে মদনমোহনও। কিন্তু চেয়ে যে আছে সেও যেন জানে না।

চণ্ডীবউয়ের ঠাণ্ডা চোখে নীরব ভর্ৎসনা। নিষেধ।

কটা মুহূর্তের জন্য ভোরের বাতাসও থমকে রইল বুঝি। চণ্ডীবউ ফিরল। দেউড়ির এধারে এলো। দরজা বন্ধ করল। এবারে পা দুটো অবসন্ন। দোতলায় উঠে এলো। তারপর তেমনি স্তব্ধ মুখে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

অস্বস্তিতে ভিতরটা ছেয়ে যাচ্ছে। মানুষটার মূর্তি দু'চোখের তারায় যেন আটকে আছে!...মাথার চুল উস্কো-খুস্কো, ক'দিন তেল জল পড়ে নি বোধ হয়। শুকনো ফ্যাকাশে মুখ। নিদ্রাশূন্য ক্লান্ত চোখ। তিন দিন সত্যিই উপবাস চলেছে কিনা জানে না, কিন্তু সমস্ত অস্তিত্বে একটা আত্মনিগ্রহের ছাপ যেন সমাহিত।

হঠাৎ বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল চণ্ডীবউ। এই রাগ নিজের ওপর কি বাইরে যে দাঁড়িয়ে তার উপর, সেটা নিজেও জানে না।

পাঁচ-ছজন লোক মিলে ধরাধরি করে রাধানাথকে দোতলায় তুলল। বাড়ির মানুষেরা তটস্থ। চণ্ডীবউ সেই দৃশ্য দেখে নিস্পন্দ বিমূঢ় একেবারে। দেখছে চিত্রার্পিতের মতো। প্রায় অচেতন অবস্থায় তারা তাকে বারান্দা দিয়ে ঘরে নিয়ে এলো। তারপর পালঙ্কে শুইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ বিকৃত করল রাধানাথ। যন্ত্রণায় বার বার কুঁকড়ে যেতে লাগল। ফর্সা মুখে কে বুঝি কালি লেপে দিয়েছে।

এতগুলো বাইরের লোকের সামনেও মাথার ঘোমটা টানতে ভুলে গেল চণ্ডীবউ। বিহ্বল চোখে যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট মূর্তিটা দেখছে।...গত রাতে ঘরেই ফেরে নি, আজ এই অবস্থা। বিশেষ কিছুই ঘটেছে, কিন্তু কি ঘটতে পারে?

যারা নিয়ে এসেছে, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে তারাই জানিয়ে গেল কি হয়েছে।...সন্ধ্যার পর থেকেই পেটে কেমন ব্যথা উঠেছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাও এমন বাড়তে থাকল যে আর ঘরে ফেরাই সম্ভব হল না। যন্ত্রণায় সমস্ত রাত বলির পশুর মতো ছট্‌ফট্ করেছে। সকাল হতে একদল তাকে বাড়ি নিয়ে এসেছে, আর দুজন গেছে বদ্যিকে ধরে আনতে।

লোকগুলো চলে যেতে খুব ধীরে ধীরে আত্মস্থ হল চণ্ডীবউ। রাধানাথের দিকে নয়, দু'চোখের শাণিত দৃষ্টি সামনের দেয়ালের কালীর ছবিটার ওপর ঠিকরালো।

প্রাণভয়ে বদ্যির কাছে সত্য গোপন করল না রাধানাথ। যন্ত্রণায় পেটের ভিতরটা কাটছে তখনো। স্বীকার করল, বেশ কিছুদিন ধরেই পেটের ব্যাথা টের পাচ্ছিল। কিন্তু 'ও-জিনিস' একটু-আধটু খেতে থাকলে তখনকার মতো যন্ত্রণা কমত। তারপর আবার বাড়ত। কিন্তু গত রাত্রে একেবারে অসহ্য ব্যাপার হয়ে গেল। সেই থেকে যাতনার উপশম নেই।

চেনা বদ্যি। যত্ন করেই পরীক্ষা করল।...তারপর বাইরে এসে চণ্ডীবউয়ের কাছে ব্যাধির কারণ এবং গুরুত্ব ব্যক্ত করল। পানদোষে দুর্বল যকৃতের পচন-দশা।

বিশদ করে না বোঝালেও চণ্ডীবউ এর ফলাফল অনুমান করতে পারে। সে নির্বাক।

ঘটা করে চিকিৎসা শুরু হল। প্রথম দিনকতকের অবস্থা দেখে মনে হল এযাত্রা বুঝি রাধানাথকে টেকানোই গেল না। মুখ বুজে চণ্ডীবউ যথাকর্তব্য করে যাচ্ছে। বদ্যির নির্দেশ এতটুক নড়চড় হতে দেয় নি। কিন্তু রাধানাথের মনে হয়েছে তার ব্যধির প্রকোপের থেকেও সেবারত বউয়ের নির্বাক কঠিন মুখখানা বেশি অস্বস্তিকর।

দিন-পনের বাদে আশা করা গেল এ-যাত্রার মতো ফাঁড়া কাটল। এ কদিন রোজই রাধানাথের সাঙ্গোপাঙ্গরা বাড়ি এসে রোগীর খবর নিয়েছে, ঘন্টার পর ঘন্টা নীচে বসে থেকেছে।

...সেই সঙ্গে কখনো সকালে কখনো সন্ধ্যায় বাড়ি এসে আর একজনও রোগীর খবর নিয়ে যাচ্ছে। মদনমোহন। চণ্ডীবউয়ের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা হয়নি একদিনও। সে-রকম নির্লজ্জ চেষ্টাও করে নি। এসে খবর নিয়ে যায় শুধু। আর সে-খবর চণ্ডীবউয়ের কানে আসে। কথায় কথায় সেদিন বদ্যিও বলছিলেন, ঘোষালবাড়ির ছেলে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করে রোগীর খবর-বার্তা নেয়।

শুনে মুখ বিকৃত করে রাধানাথ বলে উঠেছিল, ওঃ শকুনের দরদ একেবারে!

বদ্যির সামনে এই কটূক্তি শুনে চণ্ডীবউয়ের মুখ লাল হয়েছে শুধু। একটি কথাও বলে নি।

সেদিন চাকর এসে জানালো, বাবুর বন্ধুরা সব আজ ওপরে আসতে চাইছেন।

বিশ দিন হল রাধানাথ ঘর-বন্দী। সাগরেদদের মুখ দেখতে পেলেও আনন্দ। হুকুম করল, যা নিয়ে আয়—

না! বউমণির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে চাকর আর মনিব দুজনেই সচকিত।

আমতা আমতা করে রাধানাথ বলল, কেন, এখন তো ভালই আছি, ওরা দেখতে চায়—

সে-কথায় কান না দিয়ে চণ্ডীবউ হুকুম করল, বলে দাও এখন অনেক দিন কারো সঙ্গে দেখা হবে না।

একটু ইতস্তত করে চাকরটা ফস করে বলেই ফেলল, ঘোষালবাড়ির দাদা ঠাকুরও খবর নিতে এয়েছেন—

শোনামাত্র রুগ্ন দেহও চাঙ্গা হয়ে উঠল রাধানাথের। বউয়ের দিকে ফিরে সশ্লেষে বলে উঠল, সে কি করবে, দেখতে আসবে?

কানের কাছটা গরম ঠেকছে চণ্ডীবউয়ের জবাব দিতে যাচ্ছিল কি, কিন্তু চাকরটা তখনো দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল হতে থমকে গেল। বন্ধুদের আসতে দেওয়া হল না বলেই রাগ আরো চড়ল রাধানাথের। সরোষে চেঁচিয়ে উঠল, একদঙ্গল চাকর-দারোয়ান পিণ্ডি গিলতে বসে আছ তোমরা, কেমন? দেব সব চাবকে দূর করে—ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিস নি কেন?

উদ্গত বিরূপ অনুভূতিটা সামলে নিল চণ্ডীবউ। চাকরকে নির্দেশ দিল, তুমি যাও, কাউকে কিছু বলতে হবে না। ঘুরে দাঁড়াল, প্রসন্ন!

প্রসন্নময়ী দরজার কাছেই অপেক্ষা করছিল। ডাক শুনে গোচরে এসে দাঁড়াল।

নীচে যাঁরা এসেছেন, বলে দে বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।...আর যিনি এসেছেন তাঁকে বলবি, বাবু এখন ভালো আছেন, আর বাড়ি এসে খবর নেবার দরকার নেই—আমার নাম করে বলবি।

প্রসন্ন চলে যেতেই রাধানাথ চাপা উত্তেজনায় আধা আধি উঠে বসল, আর খবর নেবার দরকার নেই মানে? আগেও তিনি খবর নিয়ে গেছেন নাকি?

চণ্ডীবউ সোজা তার মুখের ওপর চোখ রেখে জবাব দিল, হ্যাঁ।

কবে এসেছিলেন?

প্রায় রোজই।

বা-বা-বা! তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

আবারও একটা ঝাঁজালো জবাব ঠেলে তল করল চণ্ডীবউ।—না।

তবু রাগ চড়েই থাকল রাধানাথের। বলে উঠল, ওই শয়তান আমাকে দেখতে চায় কি কাকে বুঝতেই তো পারছ—শকুনের দরদ, বুঝলে, এক তুমি ছাড়া এই দরদ দেখে গাঁ-সুদ্ধু লোকে মনে মনে হাসছে—বুঝলে?

চণ্ডীবউ জবাব দিল না। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তার পর ঘর ছেড়ে চলে গেল। অসুস্থ মানুষটার এই বিকৃত যাতনা সে আঁচ করতে পারে। কিন্তু তার বোবা-যন্ত্রণা কে টের পায়? এই যাতনার সমস্ত বিদ্বেষ দক্ষিণপাড়ার ওই মানুষের মাথার ওপরেই ঝরতে থাকল। যদিও জানে, গাঁ সুদ্ধু মানুষ যাই বুঝুক, শকুনের দরদ নিয়ে এই একজনই শুধু রোগীর খবর নিতে আসে নি।

এই পুরুষাকারের জাত আলাদা, এ বোধ হয় তার থেকে বেশি আর কেউ অনুভব করতে পারে না। সে পুরুষের মতই লোভী, পুরুষের মতই বেপরোয়া, আবার পুরুষের মতই উদার।

তবু, এই মুহূর্তে চরম শত্রু সে-ই। পরম শত্রু।

কাঁচা টাকা ছড়ানোর চমকে প্রতিবেশীর চোখ ধাঁধায়, সেই সঙ্গে অনেক দুর্জনের চোখে আগুনও জ্বলে। মহেশ্বর দত্তর টাকা ছড়ানোর মধ্যে বনেদী চটক ছিল, কিন্তু এমনিতে মানুষটার চালচলন ছিল সাদাসিধে। ছেলের বেলা তার উল্টো হয়েছে। কটা মাস ধরে সেএক মত্ত আবেগে টাকা উড়িয়েছে। ফলে সাধারণ লোকেরও কৌতূহল, দত্তবাড়ির ঘরে না-জানি কত টাকা মজুত আছে!

চণ্ডীবউয়ের ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। রাত্রি তখন গভীর। কি-রকম একটা অস্বস্তিকব চাপা আওয়াজ এলো বাইরের দিক থেকে। খুব চাপা অথচ মোটা গলায় কেউ যেন কিছু নির্দেশ দিচ্ছে কাউকে। কিন্তু এত বড় বাড়িতে বাইরের লোকের কথা কানে আসবে কি করে?

উঠে বসল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় গা ছমছম করে উঠল। খুব সন্তর্পণে ঘরের পিছনের ফালি বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার পরেই বুকের ভিতরটা ছাঁত করে উঠল।

জামাইকোঠাব ছাদের কার্নিশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে একটা লোক। ওদিকটায় চাঁদের আলো পড়ায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নীচের কাউকে সে-ই নির্দেশ দিয়েছে কিছু। লোকটার গলা ভয়ানক মোটা, আর টেনে টেনে কথা বলছিল বলেই চণ্ডীবউয়ের কানে এসেছে।

কি হতে পাবে তক্ষুনি অনুমান করে নিল। অন্য লোক নিশ্চয় জামাইকোঠার গা বেয়ে নীচে নেমে সদর দরজা খুলে দেবার মতলবে এগিয়েছে। তাই যদি হয়, বাইরে সশস্ত্র লোক অপেক্ষা করছে তাতেও সন্দেহ নেই।

বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

কি করবে এখন চণ্ডীবউ?

ঘরে এসে মুহূর্তের জন্য পালঙ্কের ঘুমন্ত লোকটাকে দেখল একবার। ডেকে লাভ নেই। এখনো দশ মিনিট হাঁটা চলা করতে পারে না। ছুটে বেরিয়ে এলো। দোতলার সিঁড়ির দরজায় খিল আঁটা আছে। এটা ভাঙতে সময় লাগবে। আবার ছুটে গেল প্রসন্নকে ডাকতে।

কিন্তু ততক্ষণে নীচে চাপা শোরগোল শুরু হয়ে গেছে।

একটু বাদেই চণ্ডীবউয়ের এবং তার পাশে আলুথালু বেশে প্রসন্নর দুই চক্ষু স্থির। নীচের দাওয়ায় ছোট মশাল হাতে কম করে আট দশটা লোক, তাদের হাতে লাঠি ছোরা বর্শা। এদিকে সিঁড়ির দরজায় ধাক্কা পড়ছে।

ওগো কে কোথায় আছ—বাঁচাও! বাঁচাও—বাড়িতে ডাকাত পড়েছে!

প্রসন্নর গলা-ফাটানো তীক্ষ্ণ আর্তনাদে রাত্রির স্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের দলও তৎপর হয়ে উঠল। নীচের লোকগুলোকে তারা ঘুমের মধ্যেই বেঁধে কাবু করে রেখেছে, কয়েকজনকে জখমও করেছে। ডাকাতরা চাপা গর্জন করে উঠল, খবরদার! টুঁ শব্দ বার করলে কেটে দুখানা করে ফেলব!

সিঁড়ির দরজায় ঘা পড়ছে। সেই সঙ্গে হুমকিও শোনা যাচ্ছে, দরজা খুলে দাও নইলে কেউ বাঁচবে না।

চেঁচামেচিতে রাধানাথের ঘুম ভেঙে গেছে। ভিতরের ঘেরা বারান্দায় সমস্ত রাতই একটা ঝাড়বাতি জ্বলে। সেই আলোয় নীচের দৃশ্য দেখে তার রক্ত জল। কাঁপছে থর থর করে।

এদিকে এসো। চণ্ডীবউ হাত ধরে একরকম হিড়হিড় করে টেনেই শ্বশুরের ঘরের দিকে নিয়ে গেল। হাতের চাবি দিয়ে নিজেই সিন্দুক খুলল। নিজে একটা টাকার থলে তুলে নিল আর রাধানাথকে একপাঁজা নোট তুলে নিতে বলল।

তাই করে যন্ত্রচালিতের মতো রাধানাথ বউয়ের পিছনে বেরিয়ে এলো। আবার বারান্দায় এসে কি করতে হবে তাও বলে দিল।

প্রাণের দায় বিষম দায়। দোতলার কার্নিশের সামনে দাঁড়িয়ে রাধানাথ আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, টাকা চাও তোমরা? এই নাও! টাকা নাও। কত নেবে নাও। দোহাই তোমাদের, কারো ওপর অত্যাচার কোরো না।

চণ্ডীবউ ওপর থেকে টাকার থলে উবুড় করে দিল। সেই ঝনঝন শব্দে কয়েক মুহূর্ত মন্ত্রবুগ্ধ সকলে। তার পরেই চাপা উল্লাসে ডাকাতদের মধ্যে টাকা কুড়োবার কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সেই সঙ্গে রাধানাথ মুঠো মুঠো নোট বৃষ্টি করে চলেছে। চুপিসাড়ে বড় বাড়িতে ডাকাতি করতে এসেছে ডাকাতরাই তা ভুলে গেল। ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি করে টাকা কুড়োবার হিড়িকে তারা নিজেরাই চেঁচামেচি করতে লাগল। ছোটখাটো একটা বিচিত্র উৎসব যেন।

তখনো ছাদের কার্নিশে বসে আছে একজন। ডাকাতদলের সর্দার। জামাইকোঠার দিক থেকে উঠে এসে সে এদিকে এসে বসেছে। বসে বসে দুলছে আর দু'চোখ ভরে দেখছে কিছু। নীচে মশালের আলো আর দোতলায় ঝাড়ের আলোয় সব কিছু দিনের মতই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে আর কিছুই দেখছে না, দলের লোকের কাণ্ড দেখছে না বা তাদের কিছু নির্দেশও দিচ্ছে না। সে শুধু একদিকেই চেয়ে আছে, হাসছে অল্প অল্প, আর দুলছে বসে বসে। সে দেখছে চণ্ডীবউকে। লোকটা মদে চুর হয়ে আছে। এই রূপ দেখে তার চোখে ঘোর লেগেছে। এমন রূপ সে কি তার জন্মে দেখেছে! ওরা টাকা কুড়োচ্ছে কুড়োক, তার ভাগ তো সে পাবেই—কিন্তু এমন রত্নের ভাগ সে আর কাউকে দেবে না।

ওদিকে সিঁড়ির দরজার ধাক্কা বন্ধ হয়েছে। নীচে কী হচ্ছে বুঝতে পেরে তারাও ছুটে গিয়ে টাকা কুড়োবার উৎসবে যোগ দিয়েছে। এইজন্যেই তো আসা—এ পেলে আর মেহনত করে কে?

এ-ব্যাপার আর কতক্ষণ চলত আর তারপরে কি হত কেউ জানে না। আচমকা পট-বদল হয়ে গেল। এমন আচমকা যে ডাকাতের দলও দিশেহারা কয়েক মুহূর্ত।

কার্নিশে বসে দুলছিল ডাকাতের সর্দার—নির্নিমেষ চোখে রমণীর রূপ দেখছিল। হঠাৎ পিছন থেকে লোহার মতো দুটো শক্ত হাতে কে তাকে সবলে জাপটে ধরল। এত জোর যে পঙ্গু অবস্থা! হকচকিয়ে গেল প্রথম। গায়ের জোরে তারও কম নয়, কিন্তু মদে চুপসানো শরীরে সবগুলো স্নায়ু শিথিল তখনো। টানা হেঁড়ে গলায় সে চিৎকার করে উঠল, ওরে, আমি মশার হাতে পড়েছি রে, তোরা সাবধান!

আর তখনি বাইরে অনেক লোকের চিৎকার শোনা গেল। দূর থেকে কারা ছুটে আসছে।

মাতাল লম্পট দুর্ধর্ষ ডাকাতের সর্দার শিবেশনীকে জাপটে ধরেছে মদনমোহন। যার নাম শুনলে আতঙ্ক সকলের।

জামাইকোঠার ছাদে চণ্ডীবউ একাই একটা লোককে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে দেখে নি। দেখেছে মদনমোহনও। আমবাগানের ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় বসেছিল চুপচাপ। কখন তন্দ্রা নেমে এসেছে। ঘুম ভাঙতে অলস মন্থর পায়ে পিছন দিক দিয়েই ঘরে ফিরছিল। নিজের এই আচরণের জন্য নিজেকেই এক একসময় ধ্বংস করতে চায় মদনমোহন। কিন্তু এই এলাকার অমোঘ হাতছানি কিছুতে এড়াতে পারে না।

অত রাতে দত্তবাড়ির জামাইকোঠার ছাদে মানুষ দেখামাত্র শিথিল স্নায়ুগুলো সব টান-টান হয়ে উঠেছে। তক্ষুনি বুঝেছে কি হতে পারে। দত্তবাড়ির বিশাল এলাকা ছাড়িয়ে তবে অন্যান্য বাড়ি। খুব কাছে নয়। সদর ফটকের দিকে এগোনোই যাবে না। ডাকাতদলের লোক সেদিকে ওত পেতে আ হ সন্দেহ নেই।

তীরের মতো পিছনদিকে ছুটেছে মদনমোহ । তারপর সামনে যে বাড়ি পেয়েছে ডাকাডাকি করে সেই বাড়ির লোককে তুলেছে। বিপদের কথা জানিয়ে লোক সংগ্রহ করে সত্বর আসতে বলে আবার তেমনি দত্তবাড়ির দিকে ছুটেছে।

ডাকাতের দল ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছে বোঝা যাচ্ছে। প্রসন্নর আর্তনাদ কানে আসছে। পায়ে পায়ে ফটকের সামনে এগিয়েছে মদনমোহন। লোহার ফটক হাঁ-করা খোলা। মোটা শেকল আর পেল্লায় ভাঙা তালাটা মাটিতে পড়ে আছে।

চকিতে ভেবে নিল মদনমোহন। নিঃশব্দে তালা আর শেকলটা হাতে তুলে নিল। নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে লোহার ফটক বন্ধ করল। তারপর ফটক বেয়ে মাথার ওপব উঠে এতটুকু শব্দ না করে শেকলটা ফটকের দু'দিকের দু'টো করে ত্রিশুল-মাথায় জড়িয়ে দিল। তালার মুখটা শেকলের ফাঁকে গলিয়ে ঝুলিয়ে দিল। অন্ধকারে চট করে ফটক কি-ভাবে বন্ধ করা হেয়েছে বোঝা যাবে না, আর এমনিতে টানাটানি করে খোলাও যাবে না।

ভিতরে ডাকাতদের মধ্যে তখন টাকা কুড়োবার ধুম পড়েছে। তার চেঁচামেচি কানে আসছে। ফটক থেকে নেমে মদনমোহন পিছনদিকে এসে ওই জামাইকোঠার দেয়াল বেয়েই ছাদে উঠে গেছে। ডাকাতের সর্দার তখন সামনের দিকে কার্নিশে পা ঝুলিয়ে বসেছে আর রমণীর রূপ গিলছে আর মনের আনন্দে দুলছে।

ডাকাতের দল দিশেহারা হঠাৎ। ওপরে সর্দার চিৎকার করছে, মশা ধরেছে, সাবধান! ওদিকে বাইরে থেকে বহু লোক ছুটে আসার চেঁচামেচি কাছে এগিয়ে আসছে। নীচের ডাকাতেরা মাঝের ঝাড়ের আলোর দরুন ওপরের দিকে চেয়েও সর্দারের অবস্থাটা বুঝতে পারছে না। সে কার্নিশে বসেই মোচড়ামোচড়ি করছে, মদনমোহন সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে আছে তাকে। বেশি জোর খাটাতে গেলে ঠেলে নীচে ফেলে দিলেই হল। মাতাল শিবেশনী সেই অবস্থাতেই টেনে টেনে শাসাচ্ছে, শালা তোর বাপকে ধরেছিস বুঝছিস না—ছাড়্ বলছি শীগগীর, এরপর তোর ঘাড়ে আর মাথা থাকবে না—শিবেশনী তোর রক্ত খাবে।

দিশেহারা ডাকাতের দল ফটকের দিকে ছুটল। ফটক বন্ধ দেখে তারা আরো হতচকিত। এখন আর তাদের হাতে মশাল নেই, এই উত্তেজনার মাথায় ঠাওর করতে পারল না কি-ভাবে ফটক বন্ধ করা হয়েছে। একসঙ্গে চার-পাঁচজনে মিলে ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল।

ওদিকে মশাল আর দা-লাঠি সড়কি হাতে বহু লোক হৈ-হৈ করতে করতে ছুটে এসেছে।

সদলবলে শিবেশনী ডাকাত ধরা পড়েছে এ যেন চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত। তাকে নরখাদক বলে জানে সকলে। তার প্রতি অন্তত কারো একটুকু মায়া দয়া থাকার কথা নয়।

অন্য ডাকাতদের আধমরা করে বেঁধে-ছেঁদে বাড়িব বাইরে এনে ফেলা হয়েছে। কোমরে দড়ি বেঁধে শিবেশনীকে চার-পাঁচজন ধরে আছে। তখনো মত্ত ক্রোধে সে বিড়বিড় করে বলছে, শালা মেয়েমানুষের দিকে চোখ দিতে গিয়ে এমনটা হল, এরপর আর একটা মেয়েমানুষ আস্ত রাখব না।

ক্রুদ্ধ জনতার বিচার নৃশংসই হয়ে থাকে। তার একখানা হাত কুপিয়ে কেটে ফেলা হল। দুর্ধর্ষ শিবেশনী তখনো বলেছে, এই হাত আছে, দেখে নেব।

সেই হাতও কাটা পড়ল। শিবেশনী মরল।

এই ফয়সালার দিকে একজনেরই শুধু চোখ নেই। মদনমোহনের। একজনের গা থেকে একটা চাদর টেনে নিয়ে ডাকাতদের কাছ থেকে সে সমস্ত টাকা আর নোট উদ্ধার করে আবার দত্তবাড়িতে ঢুকেছে। নীচের বাঁধানো উঠোনে তখনো কিছু টাকা আর নোট ছড়ানো ছিল। খুঁটিয়ে দেখে সে-সবও কুড়িয়ে চাদরে রাখল। ওপরের বারান্দায় নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে দেখেছে রাধানাথ আর চণ্ডীবউ। ছাদের কার্নিশে ডাকাতের সর্দারকে কে জাপটে ধরেছিল তাও দেখেছে তারা।

ডাকাতের দল ধরা পড়তে সিঁড়ির দরজা প্রসন্নময়ী আগেই খুলে নীচে ছুটেছিল। মদনমোহন দোতলায় উঠে এলে। ধীরে পায়ে এগিয়ে এলো।

চণ্ডীবউ নির্বাক। চেয়ে আছে তার দিকে। রাধানাথও। এখনো যেন ভালো করে হুঁশ ফেরে নি তাদের, স্নায়ু বশে আসে নি।

স্তব্ধ মুহূর্ত গোটাকতক। টাকার পুঁটলি-বাঁধা চাদরটা চণ্ডীবউয়ের সামনে ধরল মদনমোহন।

নির্বাক চণ্ডীবউ হাত বাড়াল। তার আগে মাথার কাপড়টাও তুলে দিতে ভুলে গেছে। টাকার পুঁটলি সমর্পণ করে মদনমোহন ফিরে চলল।

চণ্ডীবউ চেয়ে আছে। চেয়ে আছে রাধানাথও।

এরপর কটা দিন গাঁয়ের উল্লাস যে-খাতে বইল, এক-কথায় তাকে বীরপূজা বলা যেতে পারে। ঘটনার আদ্যোপান্ত জেনেছে সকলে। জেনে কন্টকিত, মুগ্ধ। ওপর থেকে চণ্ডীবউয়ের টাকা ছড়ানোর বুদ্ধির প্রশংসাও লোকের মুখে মুখে। তাইতেই সময় মিলেছে, অমন দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল শায়েস্তা হয়েছে।

বীর-রসের সঙ্গে একটু-আধটু হৃদয়-রসের যোগ ঘটলে সেটা আরো দ্রুত জমে

ওঠে।...অত রাতে মদনমোহন দত্তবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি করছিল! রসিকজনের এই কৌতূহলও চাপা ছিল না খুব। বিশেষ করে ক্ষমাযোগিনীর উক্তির ফলে সেটা আরো মুখর হয়ে উঠল। ঘোষালবাড়ির ছেলের তারিফ করে সে নাকি বলেছে, ও ছোঁড়া তো আরো বড় ডাকাত দেখি...তা অত রাতে ও সেখানে কি করতে গেছল?

বিপদ কেটে গেলে তার ত্রাস ভুলতেও খুব সময় লাগে না বোধ হয়। রাধানাথের অন্তত লাগে নি। ঘটনামৃত থেকে সে শুধু বিষের ভাগটুকুই টেনে নিয়েছে। দুর্বল শরীরে সেই [illegible] ক্রিয়া প্রবল হয়ে উঠেছে। সন্দেহের বিষ। শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে পারে নি। বউকে বলেছে, লোকে কি বলছে আর তোমার ক্ষমাযোগিনী কি বলেছে শুনেছ?

চণ্ডীবউয়ের থমথমে মুখ। একটা বিদ্বেষ যেন ভেতর থেকে ঠেলে উঠছে তবু সংযত করেছে নিজেকে।—লোকের কথা থাক্, তুমি কি বলছ?

রাধানাথ চিৎকার করে উঠল, আমিও ওই কথাই বলছি। ডাকাত না পড়লে আর একটা ডাকাতি হতে পারত, ও-শয়তান [illegible] রাতে বাড়ির সামনে ডাকাত ধরার জন্য ওত পেতে বসেছিল ভাবো তুমি?

...অত রাতে মানুষটা সত্যিই কেন ছিল এখানে তার কেনো যুক্তি নেই, জবাব নেই। এই মুহূর্তে চণ্ডীবউ সে-যুক্তি বা জবাবের ধারও ধারে না। সামনের বিকৃত মূর্তির দিকে চেয়ে আছে। এই মানুষ কত ছোট, কত নির্বীর্য তাই শুধু দেখছে। দু'চোখে শুধু ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপচে উঠছে চণ্ডীবউয়ের।

জবাব দিল না। ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল রাধানাথ। তার মাথায় যে বিষের কুণ্ডলী পাকাচ্ছে সেটা সে প্রকাশ করতে পারে নি।...ডাকাতের দ্বারা সম্ভব হলেও, ওই শত্রু অমন অনায়াসে ছাদে উঠল কি করে? এ মোহড়া এই প্রথম না আরো হয়ে গেছে?

এখন আর কিছুই অসম্ভব ভাবতে পারছে না রাধানাথ। তার এই অসুখের কিছুদিন আগে রঙ্গ করে বউই তাকে বলেছিল, তোমার বন্ধু ঘোষালবাড়ির ছেলে প্রায়ই আজকাল সকালটা ওই আমতলার দিকে আর বিকেল থেকে সন্ধ্যা বাড়ির সামনের রাস্তায় কাটায়...তুমি টের পাও?

সেই দাঁড়ানোটা যে এখন রাতদুপুর পর্যন্ত গড়িয়েছে বউ সেটা অস্বীকার করতে পারবে!

যুগটা যেন ঘোড়ায় চেপে এক লাফে কালের খাল পার হয়ে গেল। রাতারাতি কলকাতা কাছে, তাই তামাম দুনিয়া কাছে। কলকাতা থেকে রাণাঘাট রেল চলাচল শুরু হয়ে গেছে। গোড়ায় গোড়ায় গাঁয়ের মানুষ ভয় পেত রেলগাড়িতে চড়তে। দুটো লোহার লাইনের ওপর দিয়ে অত বড় এক যন্ত্র-জানোয়ার ছুটবে! একটু এদিক-ওদিক হলেই তো পৈতৃক প্রাণ খাঁচা-ছাড়া!

একটু একটু করে সাহস বাড়তে থাকল। গাঁয়ে গাঁয়ে নিত্য নতুন মুখ দেখা যেতে লাগল। কোথাকার মানুষ গো? কোত্থেকে এলে? কলকাতা থেকে, ব্যারাকপুর থেকে, নৈহাটি থেকে। সব কাছে। দূর বলে আর কিছু নেই এখন। সাহসে ভর করে ক্রমে গাঁয়ের মানুষও ট্রেনে চেপে এই দূরত্ব লঙ্ঘন করতে লাগল।

এ ব্যাপারেও করণের প্রথম নায়ক মদনমোহন। মাস দুই-তিনের মধ্যে ছিরে পাগলাকে সঙ্গে করে সে কলকাতা পাড়ি দিয়ে এলো। ক্রমে অতি সাধারণ মানুষও সেই বীরত্ব দেখালো। কলকাতা ঘরের কোণে, কলকাতার খবর বাতাসে ঘুরছে, কলকাতার বেসাতি হাত বাড়ালেই মেলে।

কিন্তু কলকাতা যে দূরে সেই দূরে শুধু একজনের কাছে। রাধানাথের কাছে কলকাতায় যাবার ব্যাপাবে বউয়ের তাগিদটা সে বিপরীত রাস্তা ধরে বাতিল করে চলেছে। বউয়ের সমস্ত চলন বাঁকা দেখছে সে এখন। ডাকাত শিবেশনী খতম হওয়ার পর থেকেই মনের তলায় যে-সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল, সেটা পুষ্ট হয়েছে, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাধানাথও চিন্তা করেছে বৈকি। প্রায় না-বালিকা বউ যেদিন মহাচণ্ডীর থানে ভিরমি খেয়ে ওই শয়তানের কোলে ঢলে পড়েছিল, সেই দিন থেকে এই দিন পর্যন্ত কোনো ঘটনাই নতুন করে ভাবতে বাকি নেই তার। এত সবের পরেও, আর কিছু না হোক, বউয়ের মনের খবর জানতে বাকি থাকে তার? সে কি ঘাস খায়?

শরীরের উপর অত্যাচার অল্প-বিস্তর করেই চলেছে। আগের মতো অতটা করে না, কারণ অতটা সয় না। যকৃতের যন্ত্রণায় ভোগে প্রায়ই। তখন ঠাণ্ডা হয়ে থাকে দিনকতক। একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই আবার পুরনো পথে পা বাড়ায়। বাধা দিতে গেলে ক্ষেপে ওঠে। চিৎকার করে বলে যত তাড়াতাড়ি এই দেহ নিপাত যায় ততো মঙ্গল, কে কেমন সতী আমার জানা আছে।

শোনামাত্র চণ্ডীবউয়ের সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। সে কলহ করে না, জবাব দেয় না। দুই চোখের ঘৃণা ওই মুখের ওপর আছড়ে পড়ে শুধু। তারপর দেয়ালে টাঙানো কালীর ছবির দিকে ফেরে। মনে হয় চোখের আগুনে ওটাকেই ভস্ম করবে। রাধানাথের তখন ইচ্ছে করে ওই ছবিটাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে, ফেলে বউয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই আরক্ত মুখ দাঁতে-নখে ফালা ফালা করে দিতে।

সেদিন একটা চূড়ান্ত ফয়সালাই হয়ে গেল যেন। এইগোছের ফয়সালা করতে পেরে রাধানাথ মনে মনে নিশ্চিন্ত খানিকটা। এই রকমই কিছু হোক সে চেয়েছিল।

দিন চারেক বাদে সেদিন আবার মদ গিলে ঘরে ফিরেছে। দেহ আগের তুলনায় আধখানা। অল্পেতেই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ঘরে ঢুকেই দেখে বউ দেয়ালে টাঙানো কালীর পটের সামনে দাঁড়িয়ে। আজকাল এই দৃশ্য ঘন ঘন দেখছে। ঠাণ্ডা মাথায় বউয়ের এই মুখ দেখে তাকে ঘাঁটাতে সাহস করত কিনা সন্দেহ। কিন্তু একটা নতুন সঙ্কল্পে মগজ তপ্ত এখন।

ঘরে ঢুকেই ধুপ করে শয্যায় বসে পড়ে বলল, ঢং করে আর ওদিকে চেয়ে থাকতে হবে না, কি প্রার্থনা করো কে জানে—এদিকে ফেরো, কথা আছে—

চণ্ডীবউ আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল। কালীর পটের সামনে দাঁড়ানোটা মর্মান্তিক পরিহাস মনে হল তারও। আর শাশুড়ীর অপমানের জ্বালায় এরই সামনে দাঁড়িয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল একদিন, তাও।

হেসে হেসে টেনে টেনে রাধানাথ বলল, কলকাতা থেকে ছ'ছটা তাগড়াই লেঠেল নিয়ে আসব ঠিক করেছি। এখানকার লোকগুলো কোনো কাজের নয়। তিনজন সমস্ত রাত বাড়ির বাইরে সামনের দিকটায় টহল দেবে আর তিনজন পিছনের আমতলার দিকটায়। রাতবিরেতে বাড়ির সামনে পিছনে কেউ হাওয়া খেতে এলে আমার হুকুমে ওরা তার মাথা ছাতু করে দেবে। বাছাই করা লেঠেল আনার জন্য দুই সাগরেদকে কলকাতায় পাঠাচ্ছি—বুঝলে?

জবাব না দিয়ে চণ্ডীবউ নিষ্পলক চেয়ে রইল।

কি, মতলবটা পছন্দ হল না বোধ হয়?

হয়েছে। তুমি কলকাতা যাচ্ছ কবে?

আগে এই প্রশ্ন উঠলে দেখি-দেখি করে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছে রাধানাথ। আজ তেতে উঠল। বিকৃত বিদ্রূপের সুরে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে কলকাতায় পাঠাতে পারলে তোমার খুব সুবিধে হয়, কেমন? তুমি কি করবে, এইখানেই থাকবে তো?

এর পরেও চণ্ডীবউ সংযমে বেঁধে রাখতে পারল নিজেকে। জবাব দিল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

বিপদের ছায়া দেখে যেন আরো বেশি ক্ষেপে উঠল রাধানাথ। চিৎকার করে বলল, আমি যাব না, যাব না, কোনদিন যাব না! কেন যাব? কেন যেতে চাও তুমি? আমার চিকিৎসা করাবে? ছেলে চাই তোমার, কেমন? কেন এমন অদৃষ্ট আমাদের, নিজে জানো না তুমি? ঢং করে তো রোজ ওই কালীর পটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকো, ওটা ছুঁয়ে তুমি বলতে পারবে আমার থেকে ওই শয়তান মদন ঘোষালকে বড় ভাবো না তুমি, বড় করে দেখো না?

মুখে রক্তকণার বিচরণ শুরু হয়েছে চণ্ডীবউয়ের। তবু ঠাণ্ডা, তবু সংযত। জবাব দিল, ওটা ছুঁয়ে বলার দরকার নেই, সে তোমার থেকে ঢের বড়ো।

ও! ঢের ঢের ঢের বড়ো, কেমন? রাগে আর নেশায় গলার স্বর বিকৃত রাধানাথের। শ্লেষের সব থেকে বড় চাবুকটাই ওই মুখের ওপর বসিয়ে দিতে চাইল।—তাহলে মনেপ্রাণে সব ওই বড়োর পায়ে ঢেলে দাও নি—মনের দিক থেকে অন্তত আজও সতীর শিরোমণি হয়ে বসে আছ—পট ছুঁয়ে সে-কথাও বলতে পারো না নিশ্চয়? পারো? পারো?

চণ্ডীবউ দেখছে তাকে। চোখের ঘৃণা উপচে উঠতে দিচ্ছে না। মুখের রক্তকণা গুলোকে ফেটে পড়তে দিচ্ছে না। শুধু দেখছে।

পারি। পারলে তুমি ওই পট ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করবে, কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করে ভালো হবে? প্রতিজ্ঞা করবে আর মদ ছোঁবে না?

না না না না! আমি কিচ্ছু প্রতিজ্ঞা করব না। তোমার কলঙ্ক তুমি নিজের মুখে স্বীকার করেছ—পরপুরুষকে বড় ভাবো, তোমার সতীপনা বোঝা গেছে—এই মুখ দেখাতে তোমার লজ্জা করে না! বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি আমার সমুখ থেকে।

চণ্ডীবউ আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছে। আরো খানিক ওই মুখ দেখেছে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সেই রাতেই ঘর বদল করেছে।

না, রাধানাথ আর ফিরে ডাকে নি তাকে। কলকাতা যাবার ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে গেল বলে ভিতবে ভিতরে নিশ্চিন্ত একটু। আরো দাপটের ওপর চলেছে দিনকতক। বউ আলাদা ঘরে সরে যেতে আদিম লোভ নামে বস্তুটা মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে উঠেছে ভিতর থেকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাপটের মুখেই বউকে দেখেছে চেয়ে চেয়ে। পরপুরুষের চোখ নিয়ে পরস্ত্রীকে দেখেছে যেন। তুলনা নেই, এই রূপের তুলনা নেই। নৃশংস ব্যভিচারের আওতায় এনে ওই রূপ সংহারেব জাদুশক্তি আয়ত্ত করতে চেয়েছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জোব গলায় বলেছে, এই বাড়ি আমার, ঘর আমার, যেদিন খুশি আসব, যেদিন ইচ্ছে আসব—আমাকে ঠেকাবে কে?

কিন্তু এ পর্যন্ত সেই খুশির দাপট দেখা যায় নি, সে-রকম ইচ্ছে হয় নি।

পুজো আসছে। দশভূজার আসন্ন অবির্ভাবে করণে সাড়া জেগেছে।

সেই সাড়া জাগানোর নায়ক রাধানাথ। সাজ-সাজ রবে দত্তপাড়ার বারইয়ারী এবারে করণের আবালবৃদ্ধবণিতার মন কেড়েছে। এই বারইয়ারীর সমারোহের ছটায় দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারী এতদিনে অস্তিত্বশূন্য নিষ্প্রভপ্রায়। গাঁয়ের মানুষের রসের যোগানদার একমাত্র দত্তপাড়ার বারইয়ারী। রসের কাঙাল মদনমোহনের অনেক ভক্ত এখন রাধানাথের স্তাবক।

এবারে সেই রসের আসরে পদার্পণ ঘটতে চলেছে রক্তমাংসের জলজ্যান্ত এক উর্বশীর। কলকাতা থেকে মুজরো নিয়ে আসছে রতনবাঈ। পরীর মতো দেখতে নাকি, কিন্নরপণ্ঠি। আর নাচ? সশরীরে সগ্‌গে যাবে সব, চোখের ভেলায় চেপে সগ্‌গে যাবে—রোসো, বায়না করা হয়ে গেছে, রেলগাড়ি চেপে ষষ্ঠীর দিনই হুস্ করে এখানে এসে হাজির হবে। সেই উপলক্ষে দত্তপাড়ার বারইয়ারীর সামনের জমিতে বড় করে মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে। রক্তমাংসের উর্বশীর সম্পর্কে তরুণ মহল নানারকম গবেষণায় মুখর। কেউ বলছে রমনীটি লক্ষৌয়ের মুসলমান, কলকাতায় এসে রতনবাঈ হয়ে বসেছে, কারো অভিমত সে হিন্দুঘরের বউ ছিল, লম্পট সোয়ামীকে ছেড়ে বাঈজি হয়েছে। এই আসন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে করণের মেয়ে-বউরাও কম উৎসুক নয়।

খবরটা চণ্ডীবউয়েরও কানে এসেছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রসন্নই কানে তুলেছে। ভিতরে ভিতরে সে খুশি কম নয়। কিন্তু বউমণির ভয়ে সেটা প্রকাশে সংকোচ। আগে হলে চণ্ডীবউ বাধা দিতে চেষ্টা করতে পারত। কলকাতা থেকে না হোক, আশপাশ থেকে পেশাদার নাচিয়ে মেয়ে আগেও দুই-একবার এসেছে। সে নাচ গান অবশ্য চণ্ডীবউ স্বচক্ষে দেখে নি কখনো। তবু, যে নোংরামির বাতাস বয় তখন সেটুকুই ঘেন্না ধরে যাবার মতো।

খবরটা শুনেও চুপ করে থাকতে হয়েছে কারণ রাধানাথের সঙ্গে বাক্যালাপ একরকম বন্ধ। নিজে থেকে সেধে একটি কথাও বলে না। তার সমস্ত আশা, সমস্ত সঙ্কল্প, সমস্ত সম্বল খোয়া গেছে। ভিতরে ভিতরে ধিকি ধিকি জ্বলছে আর দেখে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডহীনের মতো ব্যভিচারের রসাতলে ডুবতে দেখছে। একটু সুস্থ থাকলে রাতে বাড়িও ফেরে না রোজ। শক্তি নেই, সামর্থ্য নেই, তবু ব্যভিচার যেন সত্তায় বাসা বেঁধেছে। মদের মাত্রা সামান্য বেশি হয়ে গেলে যকৃতের যন্ত্রণা শুরু হয়, তখ-ই শুধু বাড়ির শয্যায় শুয়ে ছটফট করে দিনকতক। দু'বেলা বদ্যির ছোটাছুটি পড়ে যায়।

না, চণ্ডীবউয়ের শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই।

পূজোর দিনতিনেক বাকি তখন। এই কটা দিন দস্তুরমতো ভালো ছেলে হয়ে আছে রাধানাথ। মদ খাচ্ছে না, রাতেও ঘরেই থাকছে। এটা কোন্ প্রত্যাশার প্রস্তুতি চণ্ডীবউ জানে। ওই মুখের দিকে একনজর তাকালেই বুঝতে পারে। ঘৃণা ঘৃণা ঘৃণা—রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে বসে আছে চণ্ডীবউ।

সকলেই উগ্র গলা শুনে ঘব ছেড়ে বারান্দায় এলো। একটা চাকরের প্রতি রাধানাথ মারমুখী। চিৎকার করে বলছে, তোদের সব ক'টাকে চাবকে তাড়াব আমি, দাঠাকুর পূজোর নেমন্তন্ন করতে এসেছে সেই খবব দিতে এলি? গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার করে দিলি না কেন?

পূজোর নেমন্তন্ন করতে কে এসেছে চণ্ডীবউ বুঝে নিয়েছে। ওপরের এই বীরত্বও নীচে শোনা যাচ্ছে হয়তো। মুহূর্তের মধ্যে কানেব ডগা পর্যন্ত লাল তাব। চাকরকে হুকুম করল, তুমি নীচে যাও। প্রসন্ন!

একগলা ঘোমটা টেনে প্রসন্ন হাজির।

নীচে যিনি এসেছেন বসতে বল, আমি আসছি।

ঘরে চলে এলো। কেন এলো জানে না। দু'চোখ জ্বলছে। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে উঠেছে। একটু বাদেই মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে দিয়ে বেবিয়ে এলো। রাধানাথের দিকে ফিরেও তাকালোনা। সিঁড়ির দিকে এগলো।

রাধানাথেব দু'চোখে দুটো জ্বলন্ত কয়লা।

নীচে নেমে চণ্ডীবউ থমকে দাঁড়াল একটু। একখানা বাহু আস্তে আস্তে মাথার দিকে উঠল। মাথার ঘোমটা খাটো করে দিল একটু। বাইরের ঘরে চিকের এধারে এসে প্রসন্নকে শুধু ইশারা করল। সে-ইশারার তাৎপর্য বুঝে অবাক মুখে প্রসন্ন হুকুম তামিল করল, দড়ি টেনে চিকটা তুলে দিল।

সামনে মদনমোহন দাঁড়িয়ে। গায়ে ফতুয়ার ওপর চাদর জড়ানো। চোখে মুখে মুহূর্তের বিভ্রম। চাকর মারফৎ রাধানাথকে খবর পাঠানের পর প্রসন্ন এসে বসতে বলায় অবাক হয়েছিল।

চণ্ডীবউ নিষ্পলক চেয়ে আছে। অপেক্ষা করেছে।

শান্ত সবিনয় আমন্ত্রণ জানালো মদনমোহন। প্রতিবারের মতই বাড়িতে মায়ের আবাহনের আয়োজন। রাধানাথকে নিয়ে বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলে কৃতার্থ হব।

অন্তঃপুরের রমণীর পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার নিতান্ত প্রয়োজন হলে তৃতীয় মানুষের মারফৎ বলার রীতি। সেও চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে। চিক্ তুলে দেওয়া হয়েছে, পরের রীতিরও ধার ধারল না চণ্ডীবউ। এটুকু পুরুষকারের পুরস্কার কিনা জানে না। মৃদু অথচ স্পষ্ট গলায় জবাব দিল, ব্রাহ্মণের বাড়িতে অব্রাহ্মণ পায়ের ধুলো নিতে যায়। আর কেউ যাবেন কিনা বলা সম্ভব নয়, আমি চেষ্টা করব।

অবাধ্য চোখ দুটোকে শেষ পর্যন্ত সামলে রাখতে পারল না মদনমোহন। ওই মুখের ওপর থমকালো একটু। চণ্ডীবউও চেয়েই আছে। স্থির, কঠিন, নিষ্পলক।

শান্তপায়ে মদনমোহন চলে গেল। চণ্ডীবউ তখনো চেয়ে আছে।

হাঁ করে প্রসন্নময়ী বউমণিকে দেখছে। চণ্ডীবউ অপাঙ্গে তার দিকে তাকালো একবার।

দোতলার বারান্দায় রাধানাথ দাঁড়িয়ে তখনো। তার চোখের আগুন বউকে স্পর্শও করল না। সরাসরি একবার তার দিকে তাকিয়ে বউ ঘরে ঢুকে গেল।

অনেক দিন বাদে পূজোর প্রথম সন্ধ্যায় করণের পথে আবার দত্তবাড়ির লাল পাল্কি চোখে পড়ল অনেকের। চোখে যাদের পড়ল তারা বিস্মিত, বিভ্রান্ত। পাল্কির পাশে চলেছে প্রসন্নময়ী, তাকে আর না চেনে কে! পাল্কির ভিতরে কার অবস্থান তাও অনুমান করতে পারে সকলে।

কিন্তু ওই পাল্কি চলেছে দক্ষিণপাড়ার দিকে!

নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পাল্কি থামল। বলা বাহুল্য সেটা মদনমোহনের বাড়ি। ভিতরের আঙিনায় পূজার মণ্ডপ। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল লাল পাল্কি দেখে মন্ত্রমুগ্ধ তারা। ইয়ার-বকসিদের এই সময় খিস্তিখেউড় আর অশ্লীল রসিকতা চলে। কিন্তু মদনমোহন এবারে কড়া হুমকি দিয়ে রেখেছে, গলা দিয়ে একটি অভদ্র শব্দ বার করলে সেই গলা সে টিপে ধরবে। লাল পাল্কি দেখে এমন নির্দেশের হেতু বোঝা গেল।

সব থেকে বেশি ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠল ছিরে পাগলা। ছুটে গিয়ে মদনমোহনকে খবর দিল। মদনমোহন যেন জানতই কে আসবে। শান্তমুখে সে এগিয়ে এলো। তার পরনে পট্টবস্ত্র। খালি গায়ে তসরের চাদর জড়ানো। লম্বা ধপধপে পৈতেটা তার ফাঁক দিয়ে নীচে ঝুলে পড়েছে।

চণ্ডীবউ পাল্কি থেকে নেমেছে তৎক্ষণে। মাথায় বড় করে ঘোমটা টানা। মদনমোহন হাত জোড় করে দাঁড়ালো সামনে, তারপর পূজামণ্ডপে নিয়ে চলল।

দাঁড়িয়ে প্রতিমা দেখল চণ্ডীবউ। তারপর সেখানেই আস্তে আস্তে হাঁটু মুড়ে বসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। একটি মানুষেরও প্রতিমার দিকে চোখ

এক মালসা প্রসাদ এনে তার সামনে ধরল। হাত বাড়িয়ে চণ্ডীবউ মালসাটা নিল, তারপর সেটা প্রসন্নর হাতে দিয়ে বাইরের দিকে পা বাড়াল।

লাল পাল্কি ফিরে চলল আবার। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে তেমনি। ছিরে পাগলার চোখে দুটো শুধু মদনমোহনের মুখের ওপর।

বাড়ি ফিরে চণ্ডীবউ সোজা আগে যে ঘরে থাকত সেই ঘরে চলে এলো। যে-ঘরে একলা রাধানাথ থাকে। কতদিন বাদে এই ঘরে ঢুকল হিসেব নেই। মাথার ঘোমটা খসা। আরক্ত মুখ। চোখের দৃষ্টিও স্বাভাবিক নয় খুব।

ঘরে পা দিয়ে সোজা দেয়ালে টাঙানো সেই কালীর পটের সামনে দাঁড়াল। ছবিটা এই ঘরেই আছে, এতদিনের মধ্যে এর দিকে আর ফিরেও তাকায় নি। যে প্রতিমা দেখে ফিরল, তার একই সত্তা, শুধু ভিন্ন রূপ। কিন্তু রূপ ভিন্ন হলেই সব কিছু যেন তফাৎ হয়ে যা। এই রূপ ভয়াল, করাল। এই মুহূর্তে চণ্ডীবউয়ের ভিতরটাও তেমনি। দুই চোখের তপ্ত শলাকা দিয়ে এই মূর্তি বিঁধছে। মাথার মধ্যে দামামার মতো বেজে চলেছে কি!...এই মূর্তির দিকে চেয়ে কি যেন প্রতিজ্ঞা করেছিল একদিন! হঠাৎ শাশুড়ীর কর্কশ গলা খনখন করে উঠল কোথা থেকে: "—তুমি এখানে কেন? তুমি এ-ঘরে এসেছ কোন্ সাহসে? আঁটকুড়ী অলপ্পেয়ে মেয়ে—সংসারটাকে একেবারে খানখান করে দিতে না পারলে শান্তি হবে না তোমার, কেমন? যাও যাও, বেরোও বলছি এখান থেকে!"

মাথার মধ্যে আরো জোরে বাজছে সেই দামামা। তারপর স্তব্ধ। নিজেরই কণ্ঠস্বর কানে আসছে চণ্ডীবউয়ের। ওই মূর্তি দু'হাতে আঁকড়ে ধবে যে কথাগুলো বলেছিল। বলেছিল, "আমি যদি সতী মায়ের মেয়ে হই তাহলে সন্তান আসবে। আমি যদি অসতী না হই তাহলে সন্তান আসবে। আসবে আসবে আসবে! সে এসে এই অপমানের জবাব দেবে দেবে দেবে।"

ঘর থেকে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলো। অস্তিত্বের অসম্পূর্ণতা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে তাকে। সেটাকে প্রতিরোধ করার তাড়নায় এখনো দু'চোখ জ্বলছে তার।

বাইবে এসে কি ভেবে প্রসন্নকে ডাকল। সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবার পর থেকেই প্রসন্নর ছটফটানি বাড়ছে। হন্তদন্ত হয়ে কাছে এলো। চণ্ডীবউ তার আপাদমস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।—তোর ওই বামুন আজ এসেছিল?

এই চোখ দেখে আর এই প্রশ্ন শুনে প্রসন্ন মনে মনে প্রমাদ গুনল।—ওই পেটুক বামুনের কথা জিজ্ঞেস করছ বউমণি, খাবার পিত্যেশে সে তো রোজই দুপুরে আসে, আব রোজ দু'হাত তুলে তোমাকে আশীবাদ করতে করতে—

থাম্! আমি জানতে চাই রাতে তাকে তুই আবার আসতে বলেছিস কিনা?

প্রসন্নময়ীর যথার্থ হৃৎকম্প এবারে। বউমণি মন্ত্রতন্ত্র জানে কিনা ভেবে পেল না।...একটু রাত হলেই খিড়কির দোরে মুন্কে আসবে, তারপর দুজনে যাবে কলকাতার বাঈজীর নাচ দেখতে—এই ব্যবস্থা আজ দুপুরেই পাকা হয়ে আছে। ক'দিন ধরে এই দিনটির জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে প্রসন্নময়ী।

অনুচ্চ কঠিন স্বরে ফাঁসির হুকুম দিয়ে বসল যেন চণ্ডীবউ।—খবরদার, কারো সঙ্গে বেরুলে এ-বাড়িতে আর তোকে ঢুকতে হবে না। রাতে তোকে আমি ডাকব আবার, যা—

দোহাই বউমণি, আজকের দিনটি যেতে দাও, না-হয় একলা যাব—গাঁয়ের কত মেয়ে-বউ যাবে—চিকের আড়ালে মেয়েদেরও বসার ব্যবস্থা হয়েছে—

চণ্ডীবউ অসহিষ্ণু মুখে ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমার কথা তোর কানে গেছে!

প্রসন্নময়ী সভয়ে সরে গেল। বউমণির হঠাৎ এমন গোঁ কেন ভেবে পেল না। তার যা স্বভাব, চাকরির পরোয়া না করেও নাচ দেখতে চলে যেতে পারে। জীবনে এই সুযোগ কবার আসবে? কিন্তু মনিব বউমণি বলেই আগের দিনের সে-সাহস উবে গেছে। ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা শুরু করে দিল, শেষ পর্যন্ত যেন একটু দয়া হয় বউমণির, কারো সঙ্গে না হোক, একলাই যেন তাকে যেতে দেয়।

বিরসবদন মুন্‌কে চলে যাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বউমণির ডাক এলো আবার। আশা-নিরাশার ঢেউয়ের ঝাপটা খেতে খেতে প্রসন্ন সামনে এসে দাঁড়াল। তার এই মুখ দেখে চণ্ডীবউ ভ্রুকুটি করে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বলল, ওই চাকর-দরোয়ানগুলো সব মরতে ছোটার জন্য তোর মতই হাঁ করে আছে, কেমন? যারা যেতে চায় ছেড়ে দে, সদরে অন্তত দু'তিনটে তালা লাগিয়ে যায় যেন।...আর আমার খাবারটা দিয়ে যা, তুইও খেয়ে নে—

অন্যেরা যাবে, অথচ তার বেলা এই হুকুম! শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করল প্রসন্ন। জবাব দিল তোমার খাবার আনছি, আমার খিদে নেই।

কিন্তু বউমণির রাগ দেখে আবার ভীতত্রস্ত সে। বলে উঠল, দেখ্‌ প্রসন্ন, এক কথা দুবার বলতে হলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!

প্রসন্ন তাড়াতাড়ি সরে গেল। বউমণির মতিগতির আজ কুল-কিনারা পাচ্ছে না যেন। খানিক বাদে বউমণির খাবার দিয়ে গেল। তারও অনেকক্ষণ বাদে আশার শেষ আকুতি ফুটিয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

তারপরেই অবাক, বিমূঢ় একেবারে।

পরনের দামী শাড়ি ছেড়ে বউমণি আটপৌরে শাড়ি পরেছে একটা। ঝকমকে গয়নাপত্র চারভাগের তিনভাগ খুলে রেখেছে। হাতে কালো চাদর একটা। মাথা থেকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত মুড়ে নিল সেই কালো চাদরে। এক হাত প্রমাণ ঘোমটায় মুখ দেখা যাচ্ছে না।

চল!

বিস্ময়ে আর উত্তেজনায় একেবারে প্রসন্নময়ী কন্টকিত। বুকের ভিতরটা ঠকঠক করছে তার। এতক্ষণে বউমণির মতলব বুঝতে পেরেছে সে।

নিঃশব্দে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে এলো দুজনে। বউমণির ইশারায় বাইরে থেকে খিড়কির দরজা তালাবন্ধ করল প্রসন্ন। তারপর নীরবে এগোতে লাগল। প্রসন্নর বুকের কাঁপুনি থামে নি তখনো। পাছে অন্ধকারে অনভ্যস্ত পথে বউমণি হোঁচট খায়, সেই ভয়ে বার বার তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াচ্ছে।

চণ্ডীবউ থমকে দাঁড়াল একবার। অস্ফুট তর্জনের সুরে বলল, দেখ্‌, তোর ব্যস্ততা দেখে কেউ যদি চিনতে পারে আমাকে রক্ষে রাখব না বলে দিলাম!

চিকের এধারে মেয়েদের গিসগিস ভিড়। একমাত্র নাচের ওই মঞ্চ ছাড়া আলো সর্বত্রই অপেক্ষাকৃত কম। একটু জায়গা করে চণ্ডীবউ এবং তার পাশে প্রসন্ন বসে

পড়ল। নাচগান শুরু হয়ে গেছে তখন। কারো দিকে কারো চোখ নেই। এই ভিড়ের মধ্যে ভদ্রঘরের মেয়ে-বউও অনেক আছে, চণ্ডীবউয়ের তাতে একটুও সন্দেহ নেই। তারা কেউ কারো মুখ দেখতেও চায় না, মুখ দেখাতেও না। তারা সকলেই প্রায় তারই মতো আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে।

নাচের মদিরায় পুরুষগুলোর মত্তদশা। মঞ্চের ওপরে প্রধান আসনে রাধানাথ বসে দুলছে, আর থেকে থেকে বাঈজীর নাচের তারিফ করছে। তার পাশের পারিষদজনেরাও দ্বিগুণ বাহবা বাহবা করে উঠছে। আকণ্ঠ মদ গিলেছে সকলে বোঝা যায়।

...চণ্ডীবউ দেখছে। বাঈজিকে দেখছে আর সুরাসিক্ত লোলুপ ঘরের মানুষকে দেখছে। বাঈজির মুখখানা সুশ্রী, মুখে চন্দনের অলকা-তিলকা। আসরে প্রধান মধ্যমণিটি কে, বাঈজি তাও জানে। নাচের তালে তালে গানের ফাঁকে ফাঁকে সে যেন যৌবনের ডালি সাজিয়ে এক-একবার তারই পায়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর তক্ষুণি তরল হৈ-হৈ রব উঠছে।

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিকের বাইরের মানুষগুলোকেও দেখছে চণ্ডীবউ। আজই সন্ধ্যায় এক বাড়ির পূজামণ্ডপে দেখা অনেক চেনা মুখও চোখে পড়ছে। অদূরের এক কোণে হরবোলা শ্রীনাথকে পর্যন্ত দেখা গেল। দেখল না শুধু পট্টবস্ত্রপরা তসরের চাদর গায়ে সেই একজনকে। প্রায়-ব্যভিচারের এই আসরে অনুপস্থিত শুধু ঘোষালবাড়ির ছেলে নাম যার মদনমোহন।

প্রসন্ন খানিকক্ষণ পর্যন্ত তটস্থ হয়ে বসে ছিল, তারপর নাচগানে বিভোর সে-ও। হঠাৎ আঙুলোর খোঁচা খেয়ে সচকিত। ওঠার নির্দেশ। প্রসন্ন নিরুপায়।

সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলো দুজনে।

দ্বিতীয় রাতে প্রসন্নময়ী নিশ্চিন্ত কিছুটা। বউমণি তাকে বলেছে, যে-চুলোয় খুশি গিয়ে মরগে যা—

অর্থাৎ এই রাতে বউমণি ঘরেই থাকবে।

কিন্তু তৃতীয় রাতে অর্থাৎ শেষ রজনীর আসরে আবার সেই বিড়ম্বনা। আজকের আসর সব থেকে বেশি জমজমাট হবে, অথচ আজ আবার চিকের আড়ালে পাশে কালো চাদর মুড়ি দিয়ে বউমণি বসে। আজ থেকে থেকে প্রসন্নও লজ্জা পাচ্ছে। পুরুষগুলো সব যে কাণ্ড করছে, কান গরম হবার দাখিল। দু'দিনে তাদের লজ্জা-সঙ্কোচ অনেক কমেছে। তরল নাচ আর তরল গানের এক-একটা জমজমাট মুহূর্তে বাঈজির গায়ে ফুল আর পায়ে কাঁচা টাকা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে সকলে। হাসিমুখে নাচের ছন্দে বাঈজি অভিবাদন জানাচ্ছে সুরসিক স্তাবকদের। অলঙ্কারের ছটায় সর্বাঙ্গ জ্বলজ্বল করছে তার। নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে অকৃপণ হাতে সে যেন যৌবন বিলোচ্ছে সকলকে। হায় হায়, হায় হায়, গেলাম গেলাম রব উঠছে এক-একবার।

শেষের মাথায় তরল আনন্দের বন্যা নেমে এলো যেন। বাঈজির পদমূলে তখন টাকার স্তূপ আর ফুলের স্তূপ। টলতে টলতে আসরের মধ্যমণি রাধানাথ উঠে দাঁড়াল। নেশার চোখে বাঈজির দিকে দু'পা এগোতে গিয়ে তিনবার পাক খেল। এই ক'দিন আর বাড়িমুখো হয় নি, সকাল-সন্ধ্যা মদে চুর্ হয়ে আছে। টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে নিজের গলা থেকে এক ছড়া মুক্তোর মালা খুলে বাঈজির গলায় পরিয়ে দিল।

পুরুষদের মধ্যে যেন কাড়াকাড়ি করে অশ্লীল-ইতর রসিকতা শুরু হয়ে গেল। মঞ্চের রসিকজনদের অনেকেই তখন নানা ছলে বাঈজির অঙ্গ স্পর্শ করার লোভে এগোচ্ছে আর পিছোচ্ছে। এই ব্যাপারের ফলে সকলের থেকে বড় বাহাদুরি দেখিয়ে ফেলল রাধানাথ। চিকের আড়ালে মেয়েরা বসে, সেই খেয়ালও থাকল না। দু'হাতে বাঈজিকে জড়িয়ে ধরে তাকে নিয়েই ধুপ করে মঞ্চের ওপর বসে পড়ল, তারপর একখানা মত্ত হাত তুলে নিজের উরুদেশ চাপড়াতে লাগল।

মূর্ত নরক। চিকের এধারে মেয়েরা মুখ ঢাকছে, আবার এই দৃশ্য না দেখেও পারছে না।

পরদিন।

বউমণির মুখের দিকে দিনের আলোতেও তাকাতে পারে না প্রসন্নময়ী। এমন লাল মুখ আর বোধ হয় শীগ্‌গির দেখে নি।

এই দিন আর রাতেও বাড়ির কর্তার দেখা নেই। বাঈজি চলে গিয়ে থাকলে সে-খবর কানে আসত। অনেক টাকার বিনিময়ে এই রাতের জন্যেও তাকে ধরে রাখা হয়েছে সন্দেহ নেই। রাতে বারইয়ারীতে ঘরোয়া আসর বসবে।

তার পরদিন বাঈজির চলে যাবার খবর শুনল চণ্ডীবউ। সেই সঙ্গে আমতা আমতা করে আর একটা খবরও না জানিয়ে পারল না প্রসন্ন। গাঁয়ের আরো তিনটে মেয়ে রাতারাতি নিখোঁজ। দুজন অল্পবয়সী বিধবা এবং একজন এক লম্পট সোয়ামীর বউ। প্রসন্নসহ সকলেরই ধারণা, বাঈজির এত টাকা অত গহনা আর অত কদর দেখেই ঘর ছেড়েছে তারা। এমন লোভনীয় রাস্তা খোলা থাকতে কষ্ট করবে কেন!

প্রসন্নর দিকে ফিরে চণ্ডীবউ ঝাঁজিয়ে উঠল হঠাৎ।—তুই-বা পড়ে আছিস কি করতে, তোরও তো ওইরকমই লোভ!

প্রসন্ন পালিয়ে বাঁচল।

রাধানাথ সেইদিনও ঘরমুখো হল না, তার পরদিনও না। কিছু একটা চূড়ান্ত ফয়সালার পথ খুঁজছে চণ্ডীবউ। কিন্তু এ দুনিয়ায় শুধু তারই চারি দিকে অববোধ যেন।

সকাল থেকেই সেদিন বাঁ চোখটা কাঁপছে থেকে থেকে।

একটু বেলা হতে ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল, চাকরগুলো ছোটাছুটি করে কোথায় যাচ্ছে আর আসছে।

চূড়ান্ত ফয়সালার ব্যবস্থা ওপরওয়ালা এভাবে করে রেখেছে চণ্ডীবউ কল্পনাও করে নি!

এবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় বারইয়ারীর লোকেরা রাধানাথকে দোতলায় তার ঘরে এনে তুলল। জ্ঞান নেই, কিন্তু ভিতরের যাতনায় বিকৃতমুখ। সর্বশরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। পরশু সন্ধ্যা থেকেই তার রোগের প্রকোপ বেড়েছিল। গতকাল বারইয়ারীতেই তিনবার করে বদ্যি এনে দেখানো হয়েছে। আজ সকালে বদ্যি অবিলম্বে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে।

রাধানাথের জ্ঞান আর ফেরে নি। সেই অবস্থায় আরো দু'দিন অসহ্য কষ্ট ভোগ করেছে সে। তারপর চোখ বুজেছে।

চণ্ডীবউয়ের করার কিছু ছিল না। নিস্পন্দ মূর্তির মতো ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে সে শুধু দেখেছে। বারইয়ারীর ভক্তরা এ'দিন অজস্রবার দোতলার এই ঘরে আনাগোনা করেছে। প্রসন্ন তখন তার মাথার ওপর কাপড়টা তুলে দিয়েছে। সেই ঘোমটা কখন আপনা থেকেই খসে গেছে আবার, তার হুঁশ নেই।

মৃত্যুর খবর ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের আনাগোনা চারগুণ বেড়েছে। চণ্ডীবউ তখনো ঘরের সেই কোণটিতে দাঁড়িয়ে। তেমনি নিস্পন্দ, তেমনি নিষ্পলক।

যারা এলো তাদের একজন ঘোষালবাড়ির মদনমোহন। সে ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীবউ ছাড়া বাকি সকলে সচকিত। মদনমোহন পায়ে পায়ে শয্যার সামনে এসে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ধরে দেখল চুপচাপ। তারপর ফিরল।

বেদনাভরা আয়ত গভীর দু'চোখ চণ্ডীবউয়ের মুখের ওপর স্থির খানিকক্ষণ। চণ্ডীবউ তাকেও দেখছে, কিন্তু দেখছে যে হুঁশ নেই।

যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে ঘবে ছেড়ে বেরিয়ে গেল মদনমোহন।

॥ ৩১ ॥

কলকাতা আরো কাছে এসেছে। কলকাতার বাতাসও। আগে রেলগাড়িতে কলকাতা থেকে রাণাঘাট আসতে যে সময় লাগত, এখন তার থেকেও কম সময় লাগছে। রেলগাড়িতে যাতায়াতের ব্যবস্থাদি আগের থেকেও সুসংবদ্ধ হয়েছে। স্টেশন থেকে গাঁয়ে যাতায়াতের সুবিধের জন্য ঘোড়ার গাড়ির ব্যবসাও ফেঁপে উঠছে। তাই কলকাতা এখন ঘরের কোণে, কলকাতার খবর টাটকা খবব।

গাঁয়ের মানুষগুলের রুচি বদলাচ্ছে একটু একটু করে। লোভের হাতছানি বাড়ছে। বাইরে থেকে কিছু অতিসভ্য আর শিক্ষিত মানুষ এসে সভা করে ধর্মের নতুন কথা শোনাতে লেগেছে। তারা নতুন সমাজের কথা বলছে। ব্রাহ্মধর্মের কথা, ব্রাহ্মসমাজের কথা। তাদের বিনয় আচরণ অনেককে কাছে টেনেছে। অনেকে ক্ষমা আর উদারতার আশ্রয় পেয়েছে। গত দু'মাসে গাঁয়ের তিন-তিনটি ভদ্রঘরের রমণী কুলত্যাগিনী হয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন সধবা, একজন বিধবা। এমন অঘটনের নজির নতুন কিছু নয়। কলকাতা কাছে বলে ঘটনার সংখ্যা কিছু বেড়েছে হয়তো। সামান্য খেমটাউলিরও যে সমাদর আর কদর, কলকাতার নাগাল পেলে তারাও সুখের মুখ দেখবে না কেন? আগে এরকম হলে কুলত্যাগিনীদের স্বজন-পরিজনেরা মুখ দেখাতে চাইত না, নীতির রক্ষকরা তাদের প্রকাশ্যে টেনে এনে বিঁধত, প্রায়শ্চিত্তের কাঠগড়ায় ফেলে দেউলে করে ছাড়ত। কিন্তু এই নতুন সমাজের লোকেরা এত বড় ব্যাপারেও এই প্রথম নতুন কথা শোনালো। বলল, তুমি নিজেকে দুষে কি করবে ভাই, সব ওই এক আর অদ্বিতীয়ের ইচ্ছে—যারা গেছে তাদের মঙ্গল হোক, কল্যাণ হোক।

গেল গেল রব উঠেছে, প্রচীনকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টায় রব আরো বেশি উঠেছে হয়তো। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক তরুণ ওই নতুন সমাজে নাম লিখিয়েছে এমন কি আগ্রহের আতিশয্যে তাদের ঘরের দুই-একটি বউও শাঁখা-সিঁদুর ছেড়েছে।

বয়স্ক ব্রাহ্মণরা করণের বুকেও অনাগত দুর্দিনের ছায়া দেখছে। তারা ব্যভিচার বরদাস্ত করতে পারে কিন্তু আচার-নিয়মনিষ্ঠার ত্রুটি সহ্য করতে পারে না। বাইরের এই নতুন বাতাসে তাদের গায়ে ছুঁচ ফুটছে। বিধবা একটি-দুটি প্রায় প্রতি ঘরেই আছে। ওদিকে কলকাতায় বিধবা বিয়ে নিয়ে যে-কাণ্ড শুরু করেছে বিদ্যাসাগর নামে লোকটা—ঘরের প্রৌঢ় বিধবাটিরও যে বুকের তলায় বাসনার তাপ ছড়াচ্ছে না কে হলপ করে বলতে পারে? একে একে তো কতগুলো বিধবা বিয়ের খবর এলো কলকাতা থেকে! পশ্চিম প্রান্তের যে সাধুটিকে সাধু বলতেও নারাজ করণের ব্রাহ্মণরা, তারই একটা উক্তি তাদেরও মুখে মুখে ছড়াতে লাগল। পশ্চিম প্রান্তের নয়নচাঁদ সাধু নাকি বলেছে করণের পাপ বড় ভারী হয়ে উঠেছে, দুর্দিন আসছে।

দুর্দিনের মূর্তিমান নজির অঘোরী নিবাসের ভয়াল তন্ত্রসাধক হৃদয় অঘোরী। ক্ষমাযোগিনীর ভাই হৃদয়অঘোরী। ইদানীং বাড়িতে আর থাকতই না সে, শ্মশানে তন্ত্রসাধনের আসনে বসে দিবা-রাত্র কেটে যেত। মানুষটাকে ভয় করত সকলে, এখন আরো বেশি ভয় করে। কারণ এখন মড়ার মাথার খুলি নিয়ে লোকালয়ে ঘোরাঘুরি করছে। তাকে দেখলেই গৃহস্থরা বাড়ির দরজা বন্ধ কবে দেয়। কিনতু হৃদয়অঘোরী সেই বন্ধ দরজায় ঘা বসালে দরজা ভয়ে-ত্রাসে খুলতেই হয় আবার। হৃদয়অঘোরী হাঁক দেয়, দরজা খোলো! দুধ চাই! তৃষ্ণায় সব শুকিয়ে গেল! দরজা খুললেই হাতের মড়ার মাথার খুলি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, এখানে দুধ ঢালো, নইলে সর্বনাশ হবে! দুধ ঢাললে সেই দুধ চোঁ-চোঁ করে খেয়ে ফেলে হৃদয়আঘোরী, তারপর বীভৎস মুখের সব দাঁত বার করে হেসে ওঠে খট-খট করে, বলে, দুধ পেলে মড়ার মাথার খুলি কেমন হাসে দেখেছ!

গৃহস্থ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপে। হৃদয়অঘোরী হাসতে হাসতে চলে যায়। সেই লোকই চিৎকার করে সকলকে শোনাচ্ছে, নয়নচাঁদ সাধু নিজের মুখে তাকে বলেছে, করণের পাপ বেড়েছে—সর্বনাশের দিন আসছে।

দুর্দিন যদি না আসবে তাহলে এমন ঘোর তন্ত্রসাধক পাগল হয়ে গেল কি করে? আর নয়নচাঁদ সাধুই বা এমন কথা বলে কেন?

করণের এই নতুন বাতাস বা কোনো নতুন খবর ঢুকতে পায় নি কেবল যেন একটা বাড়িতে। দত্তবাড়িতে। এ বাড়ির যে রূপসী মেয়েটিকে নিয়ে সমস্ত কারণবাসীদের সজাগ কৌতূহল, গত এক বছরে তাতে মরচে ধরে গেছে। বিগত এক বছর ধরেই সেই রমণী অসূর্যম্পশ্যা।

বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে চণ্ডীবউ। এই এক বছর ধরেই তার যেন নিভৃতের সাধনা চলেছে। বাড়ির কটা দারোয়ানকে তিনগুণ মাইনে আগাম দিয়ে বিদায় করেছে। সে-জায়গায় চারটে জোয়ান-সমর্থ দারোয়ান আনিয়েছে পালোয়ান ষষ্ঠীচরণকে দিয়ে। মুন্‌কের পর্যন্ত এ বাড়িতে খাওয়ার বরাদ্দ ঘুচে গেছে। তার

বদলে মাসের শেষে প্রসন্নর মারফৎ তাকে কিছু বাড়তি টাকা পাঠায় চণ্ডীবউ। তার কড়া হুকুম বাইরের মানুষ কেউ এ বাড়িতে ঢুকবে না।

গত এক বছরে বাইরের মানুষ এ বাড়িতে দুই দফা ঢুকেছিল। রাধানাথ চোখ বোজার মাস ছয় বাদে ঘোষালবাড়ির মদন ঘোষাল এসেছিল। চণ্ডীবউ দোতলা থেকে নীচে নামে নি, দেখাও করে নি। প্রসন্নর মুখে তার আরজি শুনেছিল। দত্তপাড়ার বারইয়ারীর অত বড় দালানটা যত বাজে লোকের আড্ডা আর মদ খাওয়ার আখড়া হয়ে উঠেছে—চণ্ডীবউ অনুমতি দিলে সেখানে একটা ছেলেদের ইস্কুল বসানোর ব্যবস্থা হতে পারে।

প্রসন্নর মারফৎই জবাব পাঠিয়েছে চণ্ডীবউ, বারইয়ারীর দালানে আগে যা হত এখনও তাই হচ্ছে। ওটা যেমন আছে তেমনি থাকবে। দ্বিতীয় দফায় ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি কলকাতাবাসী ভদ্রলোক আর দুজন ভদ্রমহিলা এসেছিল দেখা করতে। করণে এসে তারা এ বাড়ির রূপসী বধূটির কথা অনেকের মুখে শুনেছিল। অতএব তাকে দলে টানার চেষ্টা।

সে-চেষ্টাও ব্যর্থ। প্রসন্ন এসে তাদের জানিয়েছে বউমণি কারো সঙ্গে দেখা করেন না।

রক্তমাংসের একটা মানুষ হঠাৎ কি-রকম কঠিন পাথর হয়ে যেতে পারে, বউমণির দিকে চেয়ে প্রসন্ন তাই শুধু দেখে আসছে।

...সত্যিই পাথর হতে পারলে চণ্ডীবউ বাঁচত। পাথর হবার চেষ্টার ক্রটি নেই তার। যোঝাযুঝির শেষ নেই।

প্রথম কটা মাস নিজের অস্তিত্ব বিনাশ করার মতই সমস্ত অনুভূতি বিলোপ করে দিতে পেরেছিল। কিন্তু মদনমোহন যেদিন স্কুল করার প্রস্তাবে বিমুখ হয়ে ফিরে গেল, সেই দিনই আবার নিজের অস্তিত্বের সাড়া পেল চণ্ডীবউ। সেটা নির্মূল করার সে কি প্রাণান্তকর চেষ্টা তার। সমস্ত দিন সমস্ত রাত উপোস থেকে ভূমিশয্যায় রাত কাটিয়েছে। দিনে দিনে তারপর আরো কঠিন করে তুলেছে নিজেকে।

প্রসন্ন শুধু সেই বাইরের দিকটাই দেখেছে। দেখছে। ভিতরের খবর রাখে না।

ভিতরে এখনো অক্লান্ত যোঝাযুঝি চলেছে চণ্ডীবউয়ের। অহরহ মনে হয় কে যেন তাকে ডাকছে। অবুঝের মত ড়েকেই চলেছে, এসো এসো এসো। চণ্ডীবউ শক্ত হাতে নিজের দুই কান চেপে ধরে, ওই ডাকটাকে পায়ে করে মাড়িয়ে শেষ করে দিতে চায়। তবু অনুক্ষণ ওই ডাকই শোনে। ঘুমের ঘোরে শোনে।

তার ঘরে শুধু সেই মহাকালীর পট ভিন্ন আর কেনো আসবাবপত্র নেই। এটাকে তার ভেঙে টুকরো টুকরে করে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবার কথা। দুর্নিবার আক্রোশে অনেকবার তাই করতে চেয়েছে। কিন্তু ওটাকে স্পর্শ করতে গেলেই সর্বাঙ্গে কি একটা শিহরণ অনুভব করে। তার ভিতর থেকেই কে যেন নিষেধ করে। মনে হয় ওই ছবির ভিতরেও কে হাসছে আর নিষেধ করছে।

অথচ আজও ওই পটটা জিইয়ে রাখা মানে তো পাপের সাক্ষী জিইয়ে রাখা। ওই মূর্তি ছুঁয়ে চণ্ডীবউ প্রতিজ্ঞা করেছিল, সতী মায়ের সন্তান হলে তার জঠরে সন্তান আসবে, সে অসতী না হলে সন্তান আসবে—আসবে আসবে আসবে—সেই সন্তান শাশুড়ীর অপমানের জবাব দেবে।

তাহলে? মা-গো! কি তাহলে? ছবিটা দেখে সেই প্রতিজ্ঞার কথা আজ মনে হলেও তো পাপ! কিন্তু সেটা ভুলবে কেমন করে? ছবির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি হেসো না, তোমাকে আমি বার বার সাবধান করছি, হেসো না—হেসো না! তুমি শুধু বলে দাও তাহলে কি—তাহলে কি করব আমি?

ওই ছবির পায়েই আত্মসমর্পণ করতে চায়। নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দিতে চায়। কিন্তু তাও পারে না। অহরহ ডাকছে কে, এসো এসো এসো। দিবানিশি ডাকছে কে, এসো এসো এসো। সকালে দুপুরে বিকেলে রাত্রিতে সর্বক্ষণ ডাকছে। ঘুমের ভিতর ডাকছে, জাগরণে ডাকছে। ডেকে ডেকে দিশেহারা করে তুলছে তাকে। যত পাগল করছে, পটের ওই সর্বনাশী ততো হাসছে যেন।

শোবার ঘরের পিছনের ফালি-বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল চণ্ডীবউ। শুকনো চুলের বোঝা পিঠের ওপর ছড়ানো। দু'চোখ দূরের দিকে। ভিতরটা বিমনা।

হঠাৎ বিষম চমকে উঠল চণ্ডীবউ। ঠিক নীচে একটা বাইরের লোক দাঁড়িয়ে। বীভৎস ভয়াল মূর্তি। হাতে মড়ার মাথার খুলি। ঘাড় উঁচিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। সর্বাঙ্গ অবশ করে দেবার মতো চাউনি। ওই দৃষ্টি থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য চণ্ডীবউ পিছনে সরে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারা গেল না। তার আগেই লোকটার কর্কশ গম্ভীর হাঁক শোনা গেল, দুধ চাই, দুধ নিয়ে এসো—মড়ার মাথার খুলি হাসতে পারছে না, দুধ নিয়ে এসো শীগগির!

লোকটাকে আগে আর না দেখলেও চিনল চণ্ডীবউ। ক্ষমাযোগিনীর ভাই হৃদয়-অঘোরী। তবু অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল কেন চণ্ডীবউয়ের জানে না। ওই অবশ-করা কঠিন দৃষ্টি থেকে নিজেকে টেনে এনে ঘরের ভিতর দিয়ে অন্দরের বারান্দায় এলো। প্রসন্নকে হুকুম করল বাইরে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তাকে দুধ দিয়ে আসতে।

ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে প্রসন্ন দুধ নিয়ে গেল। তাকে দেখামাত্র হৃদয় অঘোরীর বজ্র-হুংকার।—তুই এলি কোন্ সাহসে, দূর হ্ দূর হ! ওই দোতলায় যে দাঁড়িয়ে ছিল তাকে ডাক্—বল্‌গে না এলে সর্বনাশ হবে!

পড়িমরি করে ফিরে এলো প্রসন্নময়ী।—কি হবে গো বউমণি, তোমাকে ডাকছে, তোমার হাত থেকে দুধ নেবে, তুমি না গেলে সর্বনাশ হবে বলছে!

চণ্ডীবউ স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাত বাড়ালো, দে—।

দুধের ঘটি হাতে নীচে নেমে এলো। ইশারায় প্রসন্নকেও সঙ্গে আসতে বলেছে। নীচে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে হৃদয় অঘোরীর ক্রুদ্ধ হুংকার কানে এলো, ছাড় বলছি, এত সাহস তোর, অ্যাঁ? সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে—

দুধের ঘটি হাতে চণ্ডীবউ দ্রুত ছুটে এলো। সে ভেবেছে নতুন দারোয়ানরা তান্ত্রিককে বাড়ির বার করে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু এসে যে দৃশ্য দেখল, সেটা কল্পনার অতীত। নির্বাক হতচকিত একেবারে। শক্ত দুই হাতে হৃদয় অঘোরীর দুই হাত ধরে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে মদন ঘোষাল। হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে তাকে যেন জ্যান্ত গিলতে চাইছে হৃদয়অঘোরী।—ছাড় বলছি! সর্বনাশ হবে! গলা দিয়ে রক্ত উঠে মরবি! তোর মরা শব শকুনে খাবে! এত সাহস!

চণ্ডীবউ এসে দাঁড়াতে মদনমোহনের বজ্রমুষ্টি একটু শিথিল হয়েছিল বা। মড়ার

মাথার খুলিসুদ্ধ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ওই খুলি দিয়েই মদনমোহনকে প্রচণ্ড আঘাত করতে গেল ক্রোধোন্মত্ত হৃদয়অঘোরী। কিন্তু চোখের পলকেই আবার সেই হাতটা মুচড়ে ধরে ফেলল মদনমোহন।

ছাড়, ছাড়! আজই মরবি! আজই সর্বনাশ হবে!

হোক। তুমি বাইরে না এলে এই হাত ভেঙে দেব।

ছাড়ুন! ছেড়ে দিন! তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দিশেহারার মতো ঝাঁজিয়ে উঠল চণ্ডীবউ।

মাথায় ঘোমটা খসে গেছে। সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ চণ্ডীবউয়ের ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে ফেলছে।

হাতের কঠিন মুঠো আপনা থেকেই ঢিলে হয়ে গেল আবার। মদনমোহন তার দিকেই চেয়ে আছে। সেই অবকাশে উন্মাদ তান্ত্রিকের হাতের খুলির আঘাতে মাথা ফেটে যেতে পারত মদনমোহনের। কিন্তু বিপদ সম্পর্কে কোনো চেতনা নেই যেন।

লালচোখে রোষারক্ত রমণীর দিকে ঘুরে তাকিয়েছিল হৃদয়অঘোরীও। হঠাৎ হা-হা শব্দে হেসে উঠল সে। সেই অট্টহাসি শুনে প্রসন্ন ভয়ে কাঠ। অদূরে দারোয়ানগুলোও মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। সেই হাসির মুখেই হুংকার ছাড়ল হৃদয়অঘোরী। দু'চোখ চণ্ডীবউয়ের মুখের ওপর। তোর সর্ব অঙ্গে সর্বনাশের আগুন, হাঃ হাঃ হাঃ! মদনমোহনের দিকে ফিরল, তোর চোখেও সর্বনাশেব আগুন, হাঃ হাঃ হাঃ! জ্বলে মরবি, পুড়ে মরবি—দুজনেই জ্বলেপুড়ে মরবি তোরা—এত সাহস তোদের, তান্ত্রিকের অপমান! বলতে বলতে হাতের খুলিটা সজোরে মাটিতে আছড়ে মারল। মড়ার মাথার খুলি ভেঙে চৌচির।—সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে! জ্বলে মরবি তোরা, পুড়ে মরবি তোরা—

অভিশাপ দিতে দিতে আর অট্টহাসি হাসতে হাসতে ছুটে বেরিয়ে গেল হৃদয়অঘোরী।

অগ্নিদৃষ্টিতে মদনমোহনের দিকে তাকালো চণ্ডীবউ। স্থানকাল বিস্মৃত। মাথার কাপড়টাও তুলে দেয় নি। লজ্জা নেই, ভয় নেই, দুই চোখে শুধু ক্রোধ পুঞ্জীভূত।

চেয়ে আছে মদনমোহনও।

হঠাৎ যেন কশাঘাতেই নিজেকে আত্মস্থ করল চণ্ডীবউ। সমস্ত মুখ আরো বেশি রক্তবর্ণ। হাত তুলে অদূরের দারেয়ানদের ডাকল। একসঙ্গে চারজন ছুটে এলো তারা। চণ্ডীবউয়ের গলা দিয়ে আগুন ঝরল যেন।—কেন বাইরের লোককে ঢুকতে দিয়েছ তোমরা? কেন তাড়িয়ে দাও নি? ফের দেখলে গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে! বাড়ির আশপাশে দেখলেও তাড়িয়ে দেবে— আমার হুকুম!

মদনমোহনের মুখের ওপর আর এক পশলা আগুন ছড়িয়ে চণ্ডীবউ ভিতরে চলে গেল।

বাইরের লোকটা কে দারোয়ানরাও বুঝেছে। একটু আগে যে পাগলাটা মড়ার মাথার খুলি আছড়ে ভেঙে শাপ-শাপান্ত করতে করতে চলে গেছে, সে নয় নিশ্চয়। কারণ বাড়ির কর্ত্রী তার জন্যেই দুধের ঘটি হাতে নেমে এসেছিল। অতএব এই যে আর একজন দাঁড়িয়ে আছে, অপরাধী সে-ই। কর্ত্রীর হুকুম মতো গলাধাক্কা দিয়ে না হোক, গায়ে-কাঁধে হাত দিয়েই তাকে গেটের বার করে দেবার জন্য এগিয়ে এলো তারা।

কিন্তু তার আগেই সজোরে হাত নেড়ে তাদের বাধা দিল প্রসন্নময়ী। তারা থমকে দাঁড়াল।

সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মদনমোহন ফটকের দিকে পা বাড়ালো। কয়েক পা গিয়েই আচমকা ঘুরে দাঁড়াল আবার। ঘাড় উঁচিয়ে সোজা ওপরের দিকে তাকালো।

দারোয়ানদের হুকুম দিয়ে চণ্ডীবউ সোজা ওপরে চলে এসেছে। তারপর শোবার ঘরের পিছনের এই ফালি-বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ আরক্ত তখনো, চোখে ক্রোধ পুঞ্জীভূত তখনো।

নীচে মদনমোহন ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখ তুলতেই আবার চোখোচোখি।

সঙ্গে সঙ্গে কি যে হল চণ্ডীবউয়ের জানে না; রেলিং-এর কাছ থেকে ছিটকে সরে এলো। নিজের ঘরে চলে এলো। নীচের ওই একজোড়া পুরুষের চোখ থেকে কি বারতা সোজা তার চোখের ওপর আর মুখের ওপর এসে আঘাত করেছে জানে না। অনাগত এক অমোঘ পরিণাম শুধু অনুভব করছে। রাজ্যের অস্বস্তি, আর বুকের তলায় কি এক অফুরন্ত যন্ত্রণা।

...সর্বনাশী হাসছে। দেয়ালের ওই পটের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে ওই সর্বনাশী যেন হেসেই চলেছে। আজও চণ্ডীবউ ওই পটটা টেনে এনে ভেঙে দুমড়ে তছনছ করে ফেলতে পারছে না কেন? এখনো দুর্বার আক্রোশে দেখছে ওটা, কিন্তু স্পর্শ করতে পাবছে না।

...পুরুষের ওই চোখে ক্ষেপা তান্ত্রিক সর্বনাশের আগুন দেখেছিল। আর সেই চোখেই একটু আগে চণ্ডীবউ নিজেব সর্বনাশ দেখে উঠল।

কিন্তু তাই যদি সত্যি হবে, পটের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই সর্বনাশী এমন করে হাসছে কি করে? হাসতে পারছে কেমন করে?

হঠাৎ দু'হাতে নিজের কান দুটো চেপে ধরল চণ্ডীবউ। ওই ছবির ভিতর থেকে কি নিজের ভিতর থেকে জানে না—কৌতুকমাখা একটা ব্যাঙ্গোক্তি কানের পর্দায় আঘাত হানতে চাইছে। বলতে চাইছে ওই এক দুরন্ত পুরুষকে শুধু আঘাত দিয়ে বেপরোয়া করে তোলা যায়, আঘাত দিয়ে কাছে টানা যায়—আঘাত পেলেই ওই পুরুষের পুরুষকার তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে ওঠে—এত কাল ধরে এই সত্যটা জেনেও তুমি ওই বিপরীত রাস্তা ধরলে কেন? তাকে আঘাত দিতে গেলে কেন?

না না না না! চণ্ডীবউ কিচ্ছু স্বীকার করবে না, কেনো কথা শুনবে না, কারো কোনো দুঃসাহস বরদাস্ত কববে না। চণ্ডীবউ আজও পারল না বটে, কিন্তু একথা ঠিক, কালীর ওই পটের পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে।

সমস্ত দিন বউমণির লালমুখ দেখে প্রসন্নময়ী কাছে এসে নিজে থেকে দুটো কথাও বলতে পারে নি। বিকেলের দিকে বউমণির তিন কথার একটা হুকুম শুনে প্রসন্নময়ী মনে মনে বিস্মিত একটু। আর কিছু বলবে না বুঝেই তাড়াতাড়ি হুকুম তামিল করতে ছুটল সে। আধ ঘন্টার মধ্যে পালোয়ান ষষ্ঠীচরণকে সঙ্গে করে ফিরে এলো।

চণ্ডীবউ তাকে ঘরে ডাকল, আর প্রসন্নময়ীকে বলল, তুই যা এখন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রসন্নময়ী ষষ্ঠীচরণকে নেমে যেতে দেখল আবার। প্রসন্নময়ী কিছুই ঠাওর করতে পারছে না, অথচ ভিতরে কি যেন এক অজ্ঞাত আশঙ্কা।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। রাত বাড়তে থাকল। দত্তবাড়ি নিঝুম একসময়।

চণ্ডীবউ ভূমিশয্যায় শয়ান। ঘরের কোণে একটা লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে। সামনের চাঁদোয়া বারান্দার ঝাড়বাতি নিভিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু ঘরের ওই লণ্ঠনের মৃদু আলো ভিন্ন সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে আছে। চণ্ডীবউয়ের বুকের তলায় তার থেকেও ঢের বেশি অন্ধকার। চোখের পাতায় ঘুম নেই। অস্বস্তিতে ছটফট করছে। কেবলই মনে হচ্ছে সে যেন নিজেরই মৃত্যুর পরোয়ানা লিখে দিয়েছে।

বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে অবিশ্রান্ত। প্রথম প্রহরে দূরে একপাল শিয়াল ডেকে উঠল। স্তব্ধ রাতটা যেন নাড়াচাড়া খেল একপ্রস্থ। তারপর নিঝুম আবার।

দ্বিতীয় প্রহরের মুখে সামনের বারান্দায় একটা শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল চণ্ডীবউ। ধুপ করে কেউ যেন ছাতের কার্নিশ বেয়ে বারান্দায় নামল। তারপরেই আঘাতের শব্দ আর অস্ফুট আর্তনাদ একটু। কেউ যেন কারো ওপর লাঠির ঘা বাসিয়েছে একটা। সেই সঙ্গে ধস্তাধস্তির শব্দ।

চোখের পলকে শয্যা ছেড়ে উঠল চণ্ডীবউ। লণ্ঠনের আলো বাড়িয়ে দিয়ে সেটা হাতে করে ঘরের দরজা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীচরণের চাপা হুংকার কানে এলো, আমি থাকতে মায়ের বাড়িতে ডাকাতি করবি, তোর যম বসে আছে এখানে জানিস না—

অন্ধকারে লোকটাকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলতে চেষ্টা করছে ষষ্ঠীচরণ। তার আগে আচমকা লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়েছে। লণ্ঠনের আলোয় হঠাৎ যেন ভূত দেখে তাকে ছেড়ে দিল ষষ্ঠীচরণ। বিমূঢ়, দুই চক্ষু বিস্ফারিত।

...এ কি! দাঠাকুব তুমি! ছি ছি ছি, দাঠাকুর তোমার এমন মতি! ছি দাঠাকুর, ছি! ঘৃণায় ধিক্কারে ষষ্ঠীচরণ ছুটেই চলে গেল।

চণ্ডীবউ নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে। চেয়ে আছে। দেখছে। লাঠির ঘায়ে কপালের একটা দিক ফেটে রক্ত ঝরছে। সেই রক্তে গায়ের জামাটা ভিজে চুপসে যাচ্ছে। সর্বাঙ্গ সিবসির কবছে তার, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। তবু দেখছে চোখ টান করে...কবে কোথায় যেন এমনি টকটকে তাজা রক্ত দেখেছিল।

রক্তমাখা মুখের ওপর থেকে ঝাঁকড়া চুল পিছনে ঠেলে দিয়ে নির্নিমেষে তাকেও দেখছে মদনমোহন। একদিকের গাল বেয়ে রক্ত চুঁয়ে পড়ছে। কিন্তু যন্ত্রণার এতটুকু প্রকাশ নেই। বলল, আমি আবার আসব। যতক্ষণ আমার এই শরীরে একবিন্দু রক্ত আছে, ততক্ষণ আমার আসা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

চলে গেল।

রেলিংএ ভর দিয়ে সেদিকে চেয়ে চণ্ডীবউ নির্বাক দাঁড়িয়ে। তার মুখেই যেন রক্ত নেই একফোঁটা।

॥ ৩২ ॥

দত্তবাড়ির এক রূপসী বউকে কেন্দ্র করে করণে এযাবৎ অনেক রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটে গেছে। কিন্তু এবারে যা ঘটল তার আর তুলনা নেই। রাত পোহাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে-খবরটা ছড়িয়ে পড়ল, শুনে করণের অতি রসিক জনেরাও বিমূঢ় বিভ্রান্ত।

প্রসন্নময়ী রাতের খবর রাখে না। সকালে উঠে দেখে বউমনি তার ঘরে নেই। এ-ঘর ও-ঘর খোঁজাখুঁজি করে দেখল। নেই। এসময় কোনদিন নীচে নামে না বউমণি, আজ কোনো কারণে নেমেছে ভেবে সেও নীচে এসে খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু চাকরবাকররা জানালো বউমণিকে নীচে দেখে নি তারা। প্রসন্নময়ী অবাক, এই সাতসকালে গেল কোথায় মানুষটা! ওপরের এসে আর একপ্রস্থ খোঁজাখুঁজি করল। ছাতেও ঘুরে এলো একবার।

কি কাণ্ড! জলজ্যান্ত মানুষটা হাওয়ায় উবে গেল! ফের নীচে নেমে আসতে বামুনঠাকুর জানালো খিড়কির দরজায় ওপর-নীচে হুড়কো বা ছিটকিনি লাগানো ছিল না। দরজা দুটো এমনি ভেজানো ছিল শুধু। কিন্তু রাতে শুতে যাবার আগে সে নিজের হাতে ওই দরজায় হুড়কো আর ছিটকিনি লাগিয়েছিল।

এইবার ভয় ধরল প্রসন্নময়ীর। তক্ষুনি মনে পড়ল ষষ্ঠীচরণেরও গতরাতে এই বাড়িতে থাকার কথা ছিল। ছিলও। সেও যখন নেই, বউমণি নিশ্চয় তার সঙ্গেই বেরিয়েছে কোথাও।

কিন্তু এত সকালে কোথায়ই বা যেতে পারে? তাছাড়া তার সঙ্গে কোথাও গেলে পিছন-দরজা দিয়ে এভাবে লুকিয়ে যাবে কেন?

ষষ্ঠীচরণের ডেরার দিকে ছুটল প্রসন্নময়ী।

দাওয়ায় বসে ষষ্ঠীচরণ গায়ে তেল মাখছিল। থম্থমে মুখ। বউমণি কোথায় জিজ্ঞাসা করতে সে অবাক।—কেন, ঘরে নেই?

প্রসন্নময়ী মাথা নাড়ল। ঘরে নেই, বাড়ির কোথাও নেই। পিছনের খিড়কি-দরজা খোলা ছিল শুনে সে ভেবেছিল বউমণি তার সঙ্গেই কোথাও বেরিয়েছে। ষষ্ঠীচরণ জানালো, খুব ভোরে সে সদর-দরজা দিয়েই বেরিয়েছে, দারোয়ানরা তাকে ফটক খুলে দিয়েছে।

প্রসন্নময়ী ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটল আবার। ভাবল, এবারে হয়ত বউমণিকে তার ঘরেই দেখবে।

নেই। বাড়ির আনাচে কানাচে কোথাও নেই। হাউমাউ করে কেঁদেই উঠল প্রসন্নময়ী। কিছু একটা অঘটন ঘটেছে নিশ্চয়, নইলে কি হতে পারে, কোথায় যেতে পারে?

সত্রাসে প্রথমেই মনে পড়ল উন্মাদ তান্ত্রিক হৃদয় অঘোরীর কথা। রক্তবর্ণ চোখ করে যেভাবে দেখছিল বউমণিকে, ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। সে অভিসম্পাত করেছিল সর্বনাশ হবে—মড়ার মাথার খুলি মেঝেতে আছড়ে ভেঙেছিল। তবে কি তার শাপেই সর্বনাশ হয়ে গেল কিছু?

প্রসন্নময়ী আর একবার বউমণির ঘরে ছুটে এলো। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সব কিছু। সব যেমন থাকে তেমনি আছে।

দেয়ালের গায়ে কালীর পটটা শুধু নেই।

যে পটের সামনে অনেক দিন ধরেই বউমণিকে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আসছে সে।

প্রসন্নর মাথার মধ্যে আবার যেন তালগোল পাকিয়ে গেল সব। তান্ত্রিকের অভিশাপে সর্বনাশই যদি কিছু হয়ে থাকে তো মা-কালীর পটটা যাবে কোথায়?

করণের বাতাসে খবর ছড়াতে সময় লাগে না। দত্তবাড়ির বিধবা রূপসী বউয়ের উধাও হবার খবর তো হাওয়ার বেগেই ছড়ালো। গতদিন সকালে ক্ষেপা তান্ত্রিকের ওই বাড়িতে হানা দেবার সংবাদ এবং তার পরের ঘটনাও জানে সকলে। মাথার খুলি আছড়ে ভেঙে দুজনকেই অভিশাপ দিয়ে গেছে হৃদয় অঘোরী—ঘোষালবাড়ির মদনমোহনকে আর দত্তবাড়ির চণ্ডীবউকে।

কিন্তু একটা খবরই অজ্ঞাত সকলের। রাত্রি দ্বিপ্রহরের নিভৃতে যা ঘটে গেছে সেই খবর। অথচ গত সন্ধ্যায়ও মদনমোহনকে যারা দেখেছে—দিব্বি সুস্থই দেখেছে। কিন্তু ভোরে দেখে তার মাথায় ফেটি বাঁধা। বেশ জোরালো আঘাত না পেলে ও রকম ফেটি কেউ বাঁধে না। কিন্তু কে আঘাত করল, কখন আঘাত করল শত প্রশ্ন করেও তার মুখ থেকে এ খবরটা বার করা গেল না। বিরক্ত মুখে বাড়ি থেকে একরকম ঠেলে সরালো মদনমোহন।

এদিকে ভীত-ত্রস্ত প্রসন্নময়ীর মুখ থেকে একটা গোপন সংবাদ ফাঁস হয়ে গেছে। গতকাল কর্ত্রী অর্থাৎ তার বউমণির আদেশে পালোয়ান ষষ্ঠীচরণ দত্তবাড়িতে রাত কাটিয়েছে। সকালে সে যখন নিজের ডেরায় ফিরেছে তখনো জানে না চণ্ডীবউ নিখোঁজ।

কৌতূহল যাদের ধরে না, তারা ষষ্ঠীচরণের বাড়িতে হানা দিয়েছে। কিন্তু পালোয়ানজীর মুখ যেন সেলাই করা। সেই মুখ মুখে কেউ বিশেষ ঘাঁটাতেও সাহস করল না।

জটলা আর জল্পনা-কল্পনা চরমে উঠতে লাগল। আত্মঘাতিনী হল দত্তবাড়ির রূপসী বউ? কিন্তু তাহলে মা-কালীর পট সঙ্গে নেবে কেন, আর দেহটাই বা যাবে কোথায়? কুলত্যাগ করল? কিন্তু মদনমোহন তো ওদিকে কপাল ফাটিয়ে বসে আছে—তার টিকির দেখা না পেলে এই সন্দেহ যথার্থ ভাবা যেত। তাছাড়া ইদানীংকালের মধ্যে কুলত্যাগিনী যারা হয়েছে তারা সকলেই টাকার লোভে গয়নার লোভে আর পুরুষের স্তুতির লোভে ওই পথে গেছে। কিন্তু দত্তবাড়ির বউয়ের তো কোনকিছুরই অভাব ছিল না। তার সমস্ত গয়নাপত্র এমন কি সিন্দুকের চাবিটা পর্যন্ত বাড়িতে পড়ে আছে—শুধু সে নেই।...তবে কি পাগল তান্ত্রিকের ভয়াবহ অভিশাপের ফল কিছু? কিন্তু অভিশাপের ফলে রক্তমাংসের একটা জলজ্যান্ত মানুষ বাতাসে মিশে যেতে পারে?

খুব ঠাণ্ডা মাথায় একলা ঘরে বসে ভাবতে চেষ্টা করছে মদনমোহনও। কিন্তু মাথার আঘাতজনিত অসুস্থতার দরুন চিন্তা-ভাবনাগুলো কি-রকম এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আজ সে একটিমাত্র সঙ্কল্পের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এ-সঙ্কল্পের আর নড়চড়

হবে না। আর সকলে যা ভাবছে, মদনমোহন তা ভাবছে না। খ্যাপা তান্ত্রিকের অভিশাপে সে বিশ্বাস করে না। ওই রমণী আত্মঘাতিনী হতে পারে সে-সম্ভাবনাও তার চিন্তায় বাতিল। সে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু এই করণে তার চোখকে ফাঁকি দেবে এমন স্থান কোথায়?

বিকেলের দিকে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল মদনমোহন। যে জংলাপথে লোক-চলাচল কম সেই পথ ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমের উঁলুখড়ের বিশাল প্রান্তর পেরিয়ে উলুবনের বটমূলে প্রতিষ্ঠিত শিলাময়ী মহাচণ্ডীর থানে এসে ঢুকল। চারদিক খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। শেষে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল।...ঢালের দিকে ওই অশ্বত্থ গাছের সামনে বলির রক্ত দেখে এক রমণী মূর্ছা যাচ্ছিল।...পতনের পূর্বক্ষণে মদনমোহন তাকে ধরে ফেলেছিল। কত বছর হয়ে গেল, কিন্তু মাত্র সেদিনের কথা যেন। মনোনিবেশ করলে সেই স্পর্শটুকু এখনো অনুভব করতে পারে।

অনামনস্কের মতো পায়ে-পায়ে পশ্চিমপ্রান্তের দিকে চলল। যেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সেটা নয়নচাঁদ সাধুর ডেরা। ভিতরে এসে দাঁড়াল। সাধু নেই। ভক্তরা নামগান করছে। হঠাৎ ওদিক থেকে খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল কে। ঘুরে তাকালো। এক কোণে বসে ক্ষ্যাপা তান্ত্রিক হৃদয় অঘোরী ভাঁড়ে করে কারণ গিলছে আর তার দিকে চেয়ে হাসছে। চোখাচোখি হতে আরো জোরে হেসে উঠল। বলে উঠল, সর্বনাশ হবে, করণের পাপের ভার শেষে এসে ঠেকেছে—সর্বনাশ হবে, কারো নিস্তার নেই।

মদনমোহন ধীরপায়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরগুলোর ভিতরটা দেখে নিয়ে আবার বেরিয়ে এলো।

কতক্ষণ ধরে কোন্ পথে হেঁটেছে খেয়াল নেই। সাঁঝের আঁধার নেমে আসছে। যেখানে থমকে দাঁড়াল সেটা দত্তবাড়ির ফটক। ফটকের সামনে বেজার মুখ করে দাঁড়িয়ে মুন্কে। আর বন্ধ ফটকের ওধারে লাঠি হাতে চার-চারটে দারোয়ান। মুন্কে গোমড়া মুখে যে সংবাদ জানালো তার সারমর্ম, সকালেই দুজন শুভানুধ্যায়ী প্রতিবেশী ভিনগাঁয়ে রাধানাথের দুই দিদির বাড়িতে গিয়ে সব জানিয়ে এসেছে। স্বামীসহ দুই দিদিই ছুটে এসে বাড়ি আর সিন্দুকের দখল নিয়েছে। চণ্ডীবউ নাকি নিজের একখানা গয়নাও নিয়ে যায় নি, সব তার দেরাজে ছিল। এ খবর জানিয়েছে প্রসন্নময়ী। কিন্তু এখন আর তারও দেখা মিলছে না—দারোয়ানগুলোর ওপর আদেশ হয়েছে ফটক বন্ধ করে তারা যেন বাড়ি পাহারা দেয়। ভিতরের হুকুম ভিন্ন বাইরের কোনো লোক ভিতরে ঢুকবে না, ভিতরের কোনো লোক বাইরে বেরুবে না।

মাথাটা বড় বেশি ভার-ভার লাগছে। অল্প অল্প যন্ত্রনাও হচ্ছে। দক্ষিণের রাস্তা ধরল মদনমোহন। বিকেল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। সাঁঝের আঁধার তাই আরো দ্রুত ঘন হয়েছে। সেই আঁধার ফুঁড়ে মদনমোহন ঘরের দিকে চলেছে। ঘরে গিয়েই শুয়ে পড়বে। ঘুমুবে। সকালের আলোয় মাথাটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পায়ে পায়ে অন্দরের দিকে যাচ্ছিল, পিছন থেকে বাধা পড়ল হঠাৎ। বিষম চমকে ফিরে তাকালো।

কি রে, মদনমোহন নাকি?

রমণীর গলা। অন্ধকারে মুখ ঠাওর করা গেল না, কিন্তু ওই হাল্কা গলার স্বরটা চেনা-চেনা।

দ্রুত ফটকের দিকে এগিয়ে এলো। তারপরেই বিষম অবাক। তার সামনে ক্ষমাযোগিনী দাঁড়িয়ে। মনে হল তার ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসিও লুকনো আছে।

ঈষৎ রাগত সুরেই ক্ষমাযোগিনী বলে উঠল, এত সাহস তোর যে আমার ভাইকে অপমান করিস? তার শাপের ফল দেখলি তো, একদিনেই তো কপাল ফেটেছে—আরো কি আছে অদেষ্টে তোদের কে জানে—যাই এখন, তোদের মঙ্গলের জন্য সমস্ত রাত ধরে শ্মশানে গিয়ে বসে থাকি—আচ্ছা হাড়জ্বালানে ছেলে বাপু তুই!

ক্ষমাযোগিনী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মদনমোহন নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে। যে সত্যটা মগজে তড়িৎবেগে অনাবৃত হয়ে গেল, তারই আলোড়নে নিশ্চল, নিস্পন্দ।

তারপরেই মাথার মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কি। ফেটি-বাঁধা কপালে হাত ছোঁয়ালো মদনমোহন। রক্ত চুয়ে পড়ছে কিনা পরখ করল। না। মাথার মধ্যে আর কিছু জ্বলছে। বাসনা জ্বলছে।

রাত তখন অনেক।

করণ ঘুমিয়ে। দিনমানে যে বাড়ির ধারেকাছে কেউ ঘেঁষে না, অন্ধকার ফুঁড়ে হনহন করে সেই অঘোরী নিবাসের দিকে চলেছে মদনমোহন। ফটকের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। তীক্ষ্ণ চোখে বাড়িটা দেখে নিল একবার। একটা মাত্র ঘরে আলো জ্বলছে। সে আশা করছে উন্মাদ তান্ত্রিক হৃদয় অঘোরী বাড়ি নেই। থাকলে ক্ষমাযোগিনী সমস্ত রাতের জন্য শ্মশানে চলে যেত না, বা তাকেও ওই খবরটা দিয়ে যেত না। তাছাড়া হৃদয় অঘোরী বাড়িতে থাকেও না বড় একটা।

সামনের দরজা ভেজানো ছিল। ঠেলতে খুলে গেল। অন্ধকার হাতড়ে এগিয়ে চলল মদনমোহন। লক্ষ্য কোণের ওই ঘরটা, যে-ঘরে আলো জ্বলছে।

একটা চৌকিতে বসে ছিল চণ্ডীবউ। স্থির, নিশ্চল। আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকালো। দোর গোড়ায় মদনমোহন দাঁড়িয়ে।

চণ্ডীবউ চেয়েই আছে। পাষাণমূর্তির মতো দুটি অপলক চোখ।

চেয়ে আছে মদনমোহনও। মাথার মধ্যে এতক্ষণ যে আগুন জ্বলছিল, নিজের অগোচরে সেটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। চৌকির দু'হাতের মধ্যে। দু'জোড়া চোখ দুটি মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে।

বিড়বিড় করে মদনমোহন বলল, আমি আসব বলেছিলাম...এলাম। তুমি কোন্ আশ্রয়ে আছ ক্ষমাযোগিনী নিজেই আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেছে।

তেমনি চেয়ে আছে চণ্ডীবউ। এ চাউনিতে বিস্ময় নেই, অভ্যর্থনা নেই, আবার রূঢ় বিদ্বেষও নেই। অনুভূতিশূন্য নিশ্চল চাউনি।

আরো একটু এগিয়ে এলো মদনমোহন। প্রথম দর্শনমাত্রে যে আগুন ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল হঠাৎ যেন দ্বিগুণ বেগে সেটা মাথার দিকে ধাওয়া করল। একটা হাত তুলে কপালের ফেটি স্পর্শ করল মদনমোহন। না, রক্ত চুয়ে পড়ছে না। ওটা ভিতরের তাপ।

আদিমতম প্রবৃত্তির দখলে হঠাৎ নিজেকে সঁপেই দিল মদনমোহন। এবং সেই মুহূর্তে হিংস্র হয়ে উঠতে পারল। চৌকিতে বসে দু'হাত বাড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে ওই

রমণী-দেহ নিজের বুকে টেনে নিয়ে এলো। নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে ওই দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিতে চাইল। সেই সঙ্গে অস্ফুট স্বরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে গেল, নিজের আগুনে নিজে আর কত জ্বলব আমি,...বলির রক্ত দেখে যেদিন এই কোলে মাথা রেখেছিলে সেদিন থেকে এত বছর ধরে এই চাওয়ার আগুনে জ্বলছি আমি...কারো ঘর ভাঙতে চাই নি তাই একলাই জ্বলেছি কেবল জ্বলেছি। তুমি তা জানতে, তুমি তা বুঝতে...কিন্তু তখন তোমার নির্দয় হওয়া ছাড়া গতি ছিল না...আজও তুমি নির্দয় কেন? বলির পশুর জন্যে তোমার মায়া হয়, আমার জন্যে হয় না কেন? তুমি আমাকে শাসন করে কাছে টেনেছ, তুমি আমাকে আঘাত করে কাছে টেনেছ, তুমি দয়া চেয়ে কখনো আমাকে দূরে ঠেলে দাও নি—তাহলে এই পরিণামের জন্য নিজেকে আমি একলা দায়ী করব কেন—বছরের পর বছর এভাবে জ্বলে পুড়ে মরব কেন?

চণ্ডীবউ নির্বাক, নিস্পন্দ। একটা নিশ্চল দেহকে যেন ছিন্নভিন্ন করে গ্রাসের আওতায় টেনে নিয়ে চলেছে লোকটা। কিন্তু তার দু'চোখ শুধু পাষাণের চোখ নয় এখন। সে বাধা দিচ্ছে না, এতটুকু যুঝতে চেষ্টা করছে না—সে শুধু দেখছে। অসহিষ্ণু পুরুষের চোখের পাতায় জলের আভাস দেখছে, পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত আকৃতি দেখছে, আর তার বুকের তলার জমাট-বাঁধা আগুন দেখছে।

সচেতন হবার সময় এগিয়ে আসছে চণ্ডীবউ সেটা অনুভব করতে পারছে। এর পর আর বাধা দেবার শক্তি থাকবে না, অবকাশ থাকবে না। নিশ্চল দেহে একটু একটু করে প্রাণসঞ্চার হল যেন। ধীর অথচ অমোঘ হাতে অতনুসান্নিধ্য থেকে লোকটাকে ঠেলে সরালো আস্তে আস্তে। নিজেকে মুক্ত করে নিল। চৌকিতে উঠে বসল। বেশ-বাস সম্বৃত করে ঠাণ্ডামুখে চৌকি থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়াল।

দু'চোখ পুরুষের মুখের ওপর নিবদ্ধ সমস্তক্ষণ।

বাসনায় জ্বলজ্বল করছে মদনমোহনের সমস্ত চোখ-মুখ। তবু এই স্পষ্ট বাধা আর স্পষ্ট নিষেধ অমান্য করতে পারল না। সেও চেয়ে আছে। প্রতীক্ষা করছে।

এসো।

মুহূর্তের মধ্যে মদনমোহন সচকিত। এই আহ্বানও তেমনি অমোঘ তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য যেন। চৌকি থেকে মাটিতে নেমে দাঁড়াল মদনমোহন।

ধীরপায়ে দরজার দিকে এগোলো চণ্ডীবউ। নির্বাক মদনমোহন অনুসরণ করল তাকে।

দরজায় পিঠ দিয়ে চণ্ডীবউ দাঁড়াল। আঙুল দিয়ে বাইরেটা দেখিয়ে তেমনি অনুচ্চ সংযত সুরে বলল, এইখানে—।

বিমূঢ় মদনমোহন তার পাশ কাটিয়ে ঘরের বাইরে ঠিক সেইখানে এসে দাঁড়াল। তার চোখে চোখ রেখে চণ্ডীবউ আস্তে আস্তে দরজা দুটো ভিতর থেকে বন্ধ করল। ছিটকিনি তুলে দিল। তারপর পাশের খুপরি জানলার সামনে এসে দাঁড়াল। যন্ত্রচালিতের মতো মদনমোহনও দরজার দিকে এলো।

নিষ্পলক দু'চোখ তার মুখের ওপর ফেলে রেখে ঠাণ্ডা অনুচ্চ স্বরে চণ্ডীবউ বলল, কাল সন্ধ্যায় ক্ষমাযোগিনী বাড়ি থাকবে না, কাল আসতে পারো—।

খুপরি জানলা দুটোও মুখের ওপর আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।

আর ঠিক তক্ষুনি সম্বিৎ ফিরে পেল যেন মদনমোহন। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল মাথায়। একটা স্পর্শের আকুতি আর তৃষ্ণা যেন অস্থিমজ্জায় হাহাকার করে উঠল। এত বছরের, যেন অনন্তকালের সংযমের বাঁধ ভেঙেছে। ওই কণ্ঠস্বর ওই নির্দেশ শুনে কেন সে মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ল? কেন একটু আগে সচেতন হতে পারল না? এখন সে কি করবে? ওই বন্ধ দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? অবরোধ ভেঙে তছনছ করে দেবে?

না, কিছুই করা গেল না। চুপচাপ খানিক দাঁড়িয়ে রইল শুধু। তারপর হনহন করে বাইরে এসে অন্ধকারে মিশে গেল।

ঘরের মধ্যে চণ্ডীবউ নিশ্চল দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ। সমস্ত মুখ নির্মম, কঠিন। পুরুষের স্পর্শে সর্বাঙ্গে জ্বলছে। আজ এই রাতে সমস্ত পরিস্থিতি চণ্ডীবউয়ের দখলে ছিল। ইচ্ছে করলে দরজা আগে থেকেই বন্ধ রাখতে পারত। ইচ্ছে করলেই ওই জ্বালাময়ী স্পর্শযাতনা থেকে নিজেকে আগলে রাখতে পারত। ইচ্ছে করলেই ওই লোককে অনেক! আগেই ঠেলে সরাতে পারত। কিন্তু চণ্ডীবউ তা করে নি। আগে দরজা বন্ধ করে নি, নিজেকে আগলে রাখে নি, পুরুষের নিবিড় স্পর্শ গ্রাসোদ্যত হয়ে ওঠার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে ঠেলে সরায় নি।

কারণ চণ্ডীবউ যা চেয়েছে তাই হবে। তাই হতে হবে। ওই লোক কাল আবার আসবে। কাল আবার তাকে আসতে হবে।

আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। ঘরের কোণে সেই কালীর পট বসানো। পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে গেল। তার সামনে মুখোমুখি বসল মেঝেতে। পটের মূর্তি যেন আজও হাসছে তেমনি। খরখরে দু'চোখ মেলে চণ্ডীবউ সেই হাসি দেখছে। চাউনি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। মুখ বুজে আছে, কিন্তু বুকের তলায় কেউ কিছু বলছে ওই মূর্তির দিকে চেয়ে।—যা কিছু সব তুমি করিয়েছ, নিজের পা ছুঁইয়ে আমাকে দিয়ে শপথ করিয়েছ, সতী মায়ের মেয়ে হলে আমার কোলে সন্তান আসবে—আমি অসতী না হলে সন্তান আসবে—আসবে আসবে আসবে—সেই সন্তান শাশুড়ীর অপমানের জবাব দেবে। শপথের সেই পথ ধরে আজ তুমি আমাকে এইখানে নিয়ে এসেছ—তুমি তুমি সব তুমি—সব তুমি করিয়েছ। এর পরে আমি ভ্রষ্ট হলে তুমি ভ্রষ্ট হবে। যদি একদিন এক মুহূর্তের জন্য এরপর নিজেকে অশুচি মনে হয়, পাপী মনে হয়, নিজেকে শেষ করে দেব আমি—তোমার ওই পায়ে রক্তবন্যা বইয়ে দেব—আজ তুমি হাসছ হাসো—

একটা রাত আর তার পরের একটা দিন এমন অসহ্য রকমের দীর্ঘ হতে পারে মদনমোহন জানত না। এই রাত পোহালে আর তারপরে সন্ধ্যার জঠরে দিনের আলো নিঃশেষ হয়ে গেলে কি হবে মদনমোহন তাও জানে না। ওই রাত তার জীবনের প্রথম রাত না শেষ রাত? সে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু মৃত্যুর প্রতীক্ষা, না জীবনের? মদনমোহন জানে না। মদনমোহন কিছু ভাবতেও পারছে না। প্রথম হোক বা শেষ হোক, ওই রাত আসুক। জীবন বা মৃত্যুর ফয়সালা হয়ে যাক।

রাত পোহালো। সকালে কাঁচা আলো যেন অনন্ত পলের পরমায়ু নিয়ে শেষে

আগুন ছড়াতে ছড়াতে অমোঘ বার্ধক্যের দিকে পা বাড়ালো। সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার ছায়া ঘন হতে লাগল।

রাত্রি।

আশ্চর্য, মদনমোহনের সমস্ত ভিতরটা স্থির, শান্ত এতক্ষণে। জীবন-মৃত্যুর টানাপোড়েন এতক্ষণে স্তব্ধ।

সন্ধ্যা পার হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোটার কথা তার। কিন্তু সন্ধ্যা পার হবার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত বাড়িতেই চুপচাপ বসে কাটাতে পারল।

তারপর উঠল একসময়।

অঘোরী নিবাসের ধারে কাছে লোকজন থাকে না এসময়। নেইও, বাইরে দাঁড়িয়ে গতকালের মতই বাড়িটা দেখল একটু। আজ অন্য ঘরেও আলো জ্বলছে।

ভিতরে ঢুকল। প্রথম দুটো ঘর ছাড়িয়ে তৃতীয় ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াল। মেঝেতে বসে ক্ষমাযোগিনী কিছু একটা অনুষ্ঠানের উপচার সাজাচ্ছে। তাকে দেখামাত্র ঝাঁঝিয়ে উঠল, আয় ছোঁড়া আয়, আমাকে বিয়ে করবে আশা দিয়ে কোন যুগ থেকে ঝুলিয়ে রেখে এখন তোর রূপসীতে মজা বার করছি, বেইমান নেমকহারাম, বোস্ এখানে—

দু'দিকে মুখোমুখি দুটো আসন পাতা, বড় আসনটা দেখিয়ে দিল।

এ কিসের আয়োজন মদনমোহন সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করেছে। বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে রইল তবু। এ বিস্ময় শুধু মানসিক প্রস্তুতির অভাবের দরুন। ক্ষমাযোগিনী আবারও ধমকে উঠল যেন, সঙয়ের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কি, আজ তোকে হাঁড়ি-কাঠে ফেলে তবে আমার নাম। বোস্ শীগগির—

আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে আসনে বসল মদনমোহন। সবই বুঝছে, অনুভব করছে, তবু সে যেন এই জাগতিক অস্তিত্বের তটে দাঁড়িয়ে নেই।

ক্ষমাযোগিনী এবারে হাঁক দিল, কই লো ছুঁড়ি, আয় এদিকে, তোদের দুটোকেই খেয়ে বসে থাকি, এতকাল যাগজজ্ঞ করলাম তার ফল পাব না!

বুকের তলায় নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত থেমে আছে মদনমোহনের, সামনে এই বাস্তব অথচ সে যেন ঘুমের ঘোরে আছে।

দরজার সামনে ছায়া পড়ল। ছায়া এগিয়ে আসছে। ধীরপায়ে চণ্ডীবউ দোরগোড়ায় এলো। পরনে লালপাড় পট্টবস্ত্র। মাথায় অল্প ঘোমটা। কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ। সম্পূর্ণ নিরভারণা। মদনমোহন সেই মুহূর্তে স্থানকাল বিস্মৃত যেন। একখানা আগুনের শিখা বুঝি দেহের আধার আশ্রয় করে স্নিগ্ধ আলোয় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

বোস্।

আসনে বসল। ক্ষমাযোগিনী তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। গম্ভীর। আসন ছেড়ে উঠল। কোণের তোরঙ্গ খুলে, তার থেকে ছোট একটা পুঁটলি বার করে নিয়ে আসনে ফিরে এলো। পুঁটলির মধ্যে দুটো বালা, এক ছড়া হার, কানের দুল, আংটি। নিজে হতে সব একে একে পরিয়ে দিল ক্ষমাযেগিনী। আড়চোখে মদনমোহনের ভাবলেশ শূন্য মূর্তিখানা দেখে নিচ্ছে এক-একবার।

গয়না পরানো হতে ক্ষমাযোগিনীর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল চণ্ডীবউ। ওই পা থেকে আর যেন উঠবে না। গভীর মমতায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ক্ষমাযেগিনী।

ওঠ্।

উঠল। ক্ষমাযোগিনী এবারে মদনমোহনের ডান হাতটা টেনে নিল, চণ্ডীবউয়ের বাঁ হাতখানা তার হাতে ধরাই ছিল। সেই হাত মদনমোহনের হাতে রাখল। তার পর এক জোড়া হাত ফুলের মালা দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে নিয়ে দুটি হাতই নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর মালা-বদল করালো। মদনমোহনের হাতে খোলা সিঁদুরের কৌটো দিয়ে বলল, বউয়ের মাথায় বেশ করে সিঁদুর মাখিয়ে দে।

বউ! শোনামাত্র কেমন সিরসির সিরসির করে উঠল মদনমোহনের।

নীরবে আদেশ পালন করল।

ব্যস, এর বেশি আমি আর কিছু জানি-টানিনে। ছদ্মকোপে মদনমোহনের দিকে তাকালো ক্ষমাযোগিনী, তুই ছোঁড়া শুভদৃষ্টি তো কতবার করেছিস ঠিক নেই, ইচ্ছে থাকে তো আরো বারকয়েক করে নে—আমি তোদের খাবার যোগাড় দেখি।

অনুষ্ঠানের সরঞ্জাম সরিয়ে সেই ঘরেই একথালায় খেতে দিল দুজনকে। চণ্ডীবউকে নিজেই জোর করে কিছু খাওয়ালো ক্ষমাযোগিনী। তারপর মুখ ধুইয়ে দুজনকে পাশের ঘরে এনে ছেড়ে দিল।—এবারে যে যার বুঝে নে, আমার আর রস করার সময় নেই তোদের নিয়ে, পরকালের কাজ করিগে—

ক্ষমাযোগিনী চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাতাসও থেমে গেল বুঝি। সময় থমকে রইল। নিশ্চল নীরবতা।

নীরবতার না হোক, নিশ্চল স্থিরতার অবসান ঘটল একসময়। একটুও শব্দ না করে খুব শান্তহাতে ঘরের দরজাটা বন্ধ করল চণ্ডীবউ। তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াল।

মদনমোহন চেয়ে আছে।

চেয়ে রইল চণ্ডীবউও। খানিকক্ষণ পর্যন্ত চোখের পলক পড়ল না কারো।

ধীরপায়ে চণ্ডীবউ ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গেল। মদনমোহন দেখছে। দেয়ালে টাঙানো কালীর পট একখানা। সেই পটে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে দেখছে। প্রণাম করছে তো করছেই।

শেষে মাথা তুলল। ফিরে দাঁড়ালো।

মদনমোহন পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো এবার। দু'হাতে দুই গালে হাত দিয়ে তার মুখখানা নিজের দিকে তুলে ধরল। তারপর এক অনুভূত আবেগে ওই মুখখানা নিজের বুকে টেনে নিল। বুকের সঙ্গে চেপে ধরে থাকল। মনে হল কত কাল ধরে কত যুগ ধরে কি এক অভিশাপে যেন আপন রমণীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। সেই অভিশাপ ঘুচল। এ স্বপ্ন নয়। এ সত্যি। গতকালের থেকেও এই স্পর্শ কত যে তফাৎ সে সেটা সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছে।

...চণ্ডীবউ একটুও নড়তে চাইছে না। কিন্তু সর্বাঙ্গ তবু কেঁপে কেঁপে উঠছে। এই প্রথম যেন...এই প্রথমই বটে, পুরুষের নিবিড় স্পর্শে সমর্পিতা কুমারীর থরথর শিহরণ।

সর্বনাশ হবে! সর্বনাশ হবে! সব শ্মশান হয়ে যাবে! করণ পাপে ডুবেছে, আর মুক্তি নেই! নয়নচাঁদ বলেছে করণের যমদণ্ড ঘনিয়েছে। মর্ মর্ মর্—সব মর্। সব রসাতলে যা, সব জাহান্নমে যা!

দু'বছর হয়ে গেল ক্ষ্যাপা তান্ত্রিক হৃদয়অঘোরী হাহা-হাহা শব্দে অট্টহাসি হাসছে আর অভিসম্পাত দিচ্ছে। তবু রাতদুপুরে বা ভরাদুপুরে তার অট্টহাসি শুনলে করণে ছেলে-বুড়োর বুক কাঁপে। তার সেই অট্টহাসি আর অভিশাপ এক বাড়ির সামনেই বেশি শোনা যায়। সেটা দক্ষিণপাড়ার মদন ঘোষালের বাড়ি। সেই অট্টহাসি আর অভিশাপ শুনে সে-বাড়ির দু'বছরের এক শিশু ঘুমের মধ্যেও চমকে উঠে তার মাকে আঁকড়ে ধরে—মায়ের বুকে মুখ গোঁজে।

করণের সব থেকে বড় পাপের নজির যেন ওই বাড়িটা। ওই বাড়ির একটি পুরুষ এবং একটি রমণী। গাঁয়ের লোকে আস্ত উন্মাদ তান্ত্রিকের অভিশাপ আর ভবিষ্যৎ-বাণী শুনে মনে মনে তাই ভাবে। অনেকে বিশ্বাসও করে।

সেই পুরুষ আর রমণীটির সঙ্গে গাঁয়ের মানুষের কোনরকম সামাজিক যোগাযোগ নেই বললেই চলে। এত বড় অনাচারের পরে ক্ষমাযোগিনীর ভয়েও গাঁয়ের মানুষ তাদের ক্ষমা করতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই পুরুষ আর রমণী যেন নিজেদের এক পৃথক জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে মনের আনন্দে বাস করছে। বাইরের সমাজের প্রতি এই উপেক্ষাও সকলের চক্ষুশূল। তাদের সেই নিজস্ব সমাজে আরো দুটি বাসিন্দা আছে। তাদের একজন মুন্কে ভটচায, অপরজন প্রসন্নময়ী। করণের সমাজে তারাও বিচ্ছিন্ন এবং পরিত্যক্ত। মনের আনন্দে তারাও ওই বাড়িতেই বাস করছে। দু'বছর হল, চারটে মানুষের সেই ছোট্ট জগতে নতুন আগন্তুক এসেছে। তাকে কেন্দ্র করে আনন্দের হাটের খবর রাখে।

উন্মাদ তান্ত্রিকের অভিসম্পাতে ওই বাড়িরই শুধু কারো বুকের তলায় অনাগত আশঙ্কা থিতিয়ে ওঠে না। ওঠে না বিশেষ করে ওই বাড়ির এক বিচিত্র রমণীর বুকের পাটা দেখে। উন্মাদ সাধকের অভিশাপ শুনে অনেক সময় সে প্রসন্নময়ীকে বলেছে, করণের পাপ কোনদিন যদি কেউ দূর করে তো এই বাড়ির বংশধরই দূর করবে, দেখে নিস।

কিন্তু করণের মানুষের বুকের তলায় সর্বনাশের ছায়া পড়ছে। সর্বনাশের এক-একটা চকিত আভাস দেখছে তারা। সৎ ব্রাহ্মণ ঘরের কয়েকটি বিধবা বউও পরপুরুষের সঙ্গে গাঁ ছেড়ে চলে গেছে। যাবে না কেন, গাঁয়ের যারা মাথা, তাদের এত বড় ব্যভিচার দেখলে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষ প্রলুব্ধ হবে না কেন? কিছুদিনের মধ্যে গাঁয়ের জনাতিনেক সোমত্ত ছেলে চূর্ণির বানে মারা গেল। মরা চূর্ণীতে হঠাৎ এমন মরণ-বান ডেকে উঠল কেন? গাঁয়ে একজাতের পাখি দেখা যাচ্ছে, আগে কেউ ও-রকম বিদঘুটে পাখি দেখে নি—দিনে-দুপুরে ওরা বিচ্ছিরি ঠক-ঠক শব্দ করে, আর রাতে কি-রকম অদ্ভুত ডাক ডাকে—সকলে স্পষ্ট শোনে, ওরা ডাকছে

আয় আয় আয়। নয়নচাঁদ সাধু নাকি বলেছে, ওগুলো যমঘুঘু, করণের দুর্দিন আসছে।

হঠাৎ দুর্যোগের রাত না পোহাতে গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সচকিত। ...তবে কি করণে সব থেকে বড় পাপীর বলি হয়ে গেল! দক্ষিণপাড়ার ওই অপাঙক্তেয় বাড়ির মালিক অপঘাতে মরেছে। যে মরেছে তার নাম মদনমোহন। ঝড়ের রাতে বাইরে বেরিয়েছিল। কালে না ডাকলে অমন ঝড়ে সে বাইরে ছিল কেন? বিকেল থেকেই তো আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়েছিল। সন্ধ্যার পর সমস্ত আকাশটাই বুঝি মাটিতে ভেঙে পড়েছিল। গাঁয়ে নয়, দূরের শহরে ব্যবসা শুরু করেছিল মদনমোহন। দেখতে দেখতে সে-ব্যবসা নাকি ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। রোজ খুব ভোরে যেত, বেশি রাতে ফিরত। ঘোড়ার গাড়ির কল্যাণে দূরের শহরও আর দূর নয় এখন। ঘোর দুর্যোগ দেখেও সেই রাতে ঘরে রওনা হয়েছিল। রূপসী বউয়ের সঙ্গে এক রাতের ছাড়াছাড়িও সহ্য হয় না বুঝি! অনাচারের ফল ফলেছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে অপঘাতে মরেছে। মাথায় গাছ ভেঙে পড়েছিল। ভোর না হতে মুনকে তার গাছচাপা থেঁতলানো শরীরটা প্রথম দেখেছে।

ওই পাপীর দেহ কে শ্মশানে টেনে নিয়ে যাবে? কার সাহস আছে? তখনো তার রূপসী বউয়ের দেমাক কত! পাথরের মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির আঙিনায় তুলসীতলায় তার শব দাহ করিয়েছে। কারো সাহায্যভিক্ষা করে নি। বাইরের লোক বলতে একমাত্র ক্ষমাযোগিনী সেখানে উপস্থিত ছিল। অত বড় অঘটনের পরেও ওই রূপসী বউয়ের মনে পাপের ভয় ঢোকে নি, তার দেমাক কমে নি। প্রসন্নময়ীর আস্ফালন থেকে সেটা বোঝা যায়। করণে যদি পাপের অভিশাপ লেগেই থাকে সেটা দূর করবে ও-বাড়ির বংশধর—ঘরে বসে দেমাকী বউ এখনো সে কথা বলে।

কিন্তু দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়—উন্মাদ হৃদয় অঘোরী এখনো সর্বনাশের ডাক দিয়ে বেড়াচ্ছে কেন? করণের বুকে দুর্দৈবের ছায়া আরো ঘন হয়ে চেপে বসছে কেন? যমঘুঘুরা আরো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে কোথা থেকে? অনেকেই তখন স্থির বুঝেছে আসল পাপী মদনমোহন নয়, সে পাপের ভাগীদার মাত্র। সত্যিকারের পাপিষ্ঠা তো ওই রূপসী বউ—চণ্ডীবউ। আগুন দেখলে পতঙ্গ মরতে ছোটে এ তো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। মদনমোহন অন্ধ পতঙ্গের মতই এক রূপসীর আগুনে পুড়েছে—এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আসল দোষ ওই রূপের ডালির, কায়েতের বিধবা বামুনের ছেলের সর্বনাশ করেছে, তন্ত্রমতে বিয়ে না করলেও কথা ছিল। এত পাপ সইবে?

কিন্তু আবার একটা বছর না ঘুরতে হতচকিত সকলে। সকালে উঠে দেখে উন্মাদ তান্ত্রিক হৃদয়অঘোরীর লাশ কাজলদীঘিতে ভাসছে। শকুনি-গৃধিনী আকাশে চক্কর দিচ্ছে। ভোরবেলায় এই দৃশ্য দেখা গেছে যখন, অঘটনটা ঘটেছে তাহলে রাত্রিতে কোনো সময়। গত রাতটা অশুভ রাত ছিল, অশুভ তিথি ছিল। ফলে মৃতের পুষ্কর দোষ খণ্ডাবে কে? সেই দোষের ফল কোন্ আকারে নেমে আসবে কে জানে!

আরো একটা বছর না যেতে বহু আশঙ্কার সেই দুর্দৈব এসেই গেল।

মহামারীতে একটা গ্রাম উজাড় হয়ে যাবার সেই ইতিবৃত্তি নথিপত্রে লিপিবদ্ধ আছে। বর্ধিষ্ণু গ্রামের চার ভাগের তিন ভাগ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এত বড় মহামারী বাংলা দেশে আর হয়েছে কিনা সন্দেহ।

...সুস্থ মানুষ, হঠাৎ প্রচণ্ড কম্প দিয়ে জ্বর এলো। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ। পরমায়ুর খুব জোর যার, সে বড় জোর দু'তিন দিন টিকেছে। প্রথমে দশ-পনের জন করে মরতে লাগল। তারপর দিনে শতেকের ওপর। ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে গেল। বাড়িতে বাড়িতে শব। পথে-ঘাটে শব। বাতাসে শবের গন্ধ। শব নিয়ে শকুনি-গৃধিনীর কাড়াকাড়ি। তার মধ্যে ভৌতিক আতঙ্ক।...গুরু এসেছে শিষ্যবাড়িতে, কিন্তু শিষ্যবাড়ির একটি প্রাণীও বেঁচে নেই। মৃত শিষ্য গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে গুরুর সেবায় তৎপর হল। তার চিঁড়েগুড়ের সঙ্গে লেবু চাই—গুরু দেখে চাদরের ভিতর থেকে বিরাট এক কঙ্কালের হাত গাছ থেকে নেবু পেড়ে আনল। কেউ বলছে, প্রেতিনী রাতে তার কাছে মাছ চেয়েছে, আবার কেউ নাকি কোন্ বাড়িতে অতিকায় সচল মূর্তি দেখেছে।

কে কার চিকিৎসা করে, কে কার সেবা করে? কম্প দিয়ে জ্বর আসামাত্র একঘটি জল নিয়ে শুয়ে পড়ে, নইলে জল দেবারও লোক নেই। ঘটির জল শেষ হবার আগেই সব শেষ। এমন শত শত মরেছে। এই ধ্বংসলীলার মধ্যেও বেঁচে আছে যারা, তারা দলে দলে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল। করণ জনশূন্য শ্মশান হয়ে উঠল।

কিন্তু মরার জন্য বুক বেঁধে বসেও থাকল অনেকে। তারা চিৎকার করে আর বুক চাপড়ে তখনো পাপের কথাই বলছে। পাপের ভারে করণে এই যমদণ্ড নেমে এসেছে। তারা ক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত। পাপের মূর্তিমতী নজির ঘোষালবাড়ির রূপসী ডাকিনী। শুধু ওই বাড়ি থেকেই অঘটনের খবর আসে নি এখনো। পাপ ডেকে এনেছে বলেই পাপের অধিষ্ঠাত্রী তাকে অব্যাহতি দিয়েছে। কিন্তু তারা অব্যাহতি দেবে কেন? তারা প্রতিশোধ নেবে না কেন? মৃত্যুর এই তাণ্ডব দেখে কারো মাথায় সুস্থবুদ্ধি বলে কিছু নেই। অসম্ভব কথাও পাঁচবার উচ্চারণ করলে সেটা অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্ত বেপরোয়া লোকগুলোর ঘোষালবাড়ির দিকে চোখ পড়েছে এবার। ওই রূপসী পাপিষ্ঠাকে আর তার পাপের সন্তানকে আর তার সঙ্গে যারা আছে তাদের সকলকে নির্মূল করে দিলে দোষ কি! বরং না করলেই দোষ।

রোষ দিনে দিনে উদগ্র হয়ে উঠতে লাগল। সেই মৃত্যুর হিড়িক একটা অস্বাভাবিক সঙ্কল্প অনেকের মুখে এঁটে বসতে লাগল।

কিন্তু তারপর শীগগিরই একদিন ক্রূর বিস্ময়ে সকলে জানল, ওই ঘোষালবাড়িতে জনপ্রাণী নেই—আগের দিন প্রায় রাত থাকতে ক্ষমাযোগিনী এসে সকলকে তার বাড়ি নিয়ে গেছে। যত হিংস্রই হয়ে উঠুক, তার বাড়িতে হানা দেবার সাহস নেই কারো।

ছ'বছরের একটা ছেলে ভয়েভয়ে তার মায়ের দিকে তাকায়। সাহস করে কাছে যেতে পারে না, জড়িয়ে ধরতে পারে না। মা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে হঠাৎ। বিষম অস্বস্তি নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে ক্ষমাযোগিনী আর প্রসন্নময়ীও। সমস্ত মুখ

টকটকে লাল সর্বদা। চোখ লাল। সকলের মুখের দিকে ঘোরালো চোখে তাকায়। বিড়বিড় করে বলে কিছু। বলে, পাপ নয়...আমাদের পুণ্যের সন্তান...ওর বাপ করণের মাথা-মণি ছিল একদিন, তার বংশধর করণের পাপ দূর করবে, করণের মুখে হাসি ফোটাবে।

হঠাৎ তারও কম্প দিয়ে জ্বর এলো এক সন্ধ্যায়। পাষাণমূর্তির মতো ক্ষমাযোগিনী তার শয্যার পাশে এসে দাঁড়াল। ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে চাইল প্রসন্নময়ী, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না। পাংশুমুখে মুন্‌কে নিজের পেটে হাত বোলাতে লাগল। ছ'বছরের ছেলেটা দূরে দাঁড়িয়ে সভয়ে মাকে দেখছে সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ বিষম চমকে উঠল সকলে। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে নাকি চণ্ডীবউ?

কিন্তু এরকম ভুল বকা তো কেউ কখনো শোনে নি, লাল চোখ মেলে ক্ষমাযোগিনীর দিকে স্থির চেয়ে আছে। স্পষ্ট করে বলছে, শোনো—একদিন আমি মা-চণ্ডীর পা ছুঁয়ে বলেছিলাম, যদি আমি সতী মায়ের মেয়ে হই, যদি আমি সতী হই—আমার কোলে সন্তান আসবে। সন্তান এসেছে।...আজ আবার বলছি, যদি আমি সতী হই, যদি ওই ছেলে পাপের সন্তান না হয়, তাহলে যার হাতে তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তারই বংশের কেউ-না-কেউ করণের পাপ দূর করবে, করণের অভিশাপ ঘোচাবে, করণের মুখে হাসি ফোটাবে।

পরদিন।

ভোরের আলো জাগার সঙ্গে সঙ্গে এক অবাক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করল মহামারী বিধ্বস্ত গ্রামের মুষ্টিমেয় জীবিত মানুষেরা। হাঁক-ডাক করে ক্ষমাযোগিনীই সকলকে ডেকে ডেকে দৃশ্যটা দেখালো। গতরাত্রে ঝড়জল হয়ে গেছে খুব জোরে। এদিকে অঘোরী নিবাস থেকে ঘোষালবাড়ি দেড় ক্রোশেরও ওপর পথ। মহামারীর জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়েও ওই দুর্যোগের রাত্রে কখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে চণ্ডীবউ কেউ জানে না। ক্ষমাযোগিনী না, প্রসন্নময়ী না, মুন্‌কে না। ঠিক একই সময়ে যেন কালঘুমে পেয়েছিল সকলকে। ঘুম ভেঙে দেখে চণ্ডীবউ শয্যায় নেই। বাড়ির কোথাও নেই। তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর এই ঘোষালবাড়িতে ছুটে এসেছে সকলে। এখানেও বাড়িতে নেই। তারপর তুলসীতলায় মদন ঘোষালের অন্ত্যেষ্টি বেদীর দিকে চোখ গেছে। যেখানে মদন ঘোষালকে দাহ করা হয়েছিল, সে জায়গাটা উঁচু বেদি করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছিল।

মাটিতে বসে সেই বেদীতে মাথা রেখে যেন পরম শান্তিতে ঘুমুচ্ছে মদন ঘোষালের বউ চণ্ডীবউ। রাতের জলে পরনের শাড়িটা ভেজা তখনও। কিন্তু তাতে তার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে না। বাইরের এত লোকে দেখছে বলেও তার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে না।

ক্ষমাযোগিনী চেঁচিয়ে বলছে, দ্যাখ্ দ্যাখ্, দেখে চক্ষু সার্থক কর, সব—তাতেও যদি তোদের বুকের পাপ হালকা হয়!

বিমূঢ় বিস্ময়ে তারা দেখছে। শান্তির ঘুম দেখছে।

অনেকবারের বিলেত-জার্মান ফেরত এঞ্জিনিয়ার বসন্ত ঘোষাল স্টেশনের দিকে রওনা হবার আগে দু'চোখ ভরে তাঁর তিন বছরের কাজ দেখছেন। তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর মডেল ভিলেজ সুসম্পূর্ণ। সমস্ত কাগজে এই আদর্শ গাঁয়ের ছবি বেরিয়েছে। ছবির মতই দেখতে হয়েছে বটে করণ এখন। কোথাও ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল নেই, এঁদোপুকুর বা নালা নেই—ধ্বসে পড়া বাড়িও নেই।

পুকুরে স্বচ্ছ জল টলটল করছে, প্ল্যান-করা বাড়িগুলো ঝকঝক করছে, আঁকা বাঁকা বাঁধানো রাস্তাগুলো তকতক করছে। গাছে গাছে ফুল ফুটে আছে, অল্প বাতাসে একটু একটু দোল খাচ্ছে।

বসন্তবাবুর চোখে জলের আভাস, ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি। দাদুর সেই চিঠিখানার অক্ষরগুলো যেন চোখের সামনে ভাসছে।—'দাদুভাই, এযাবৎ লক্ষ কথার বুনটে মুড়ে আমার সেই রূপবতী মাকে তোমার চোখের সামনে হাজির করতে চেষ্টা করেছি। তুমি কখনো হেসেছ, কখনো ভেবেছে দাদুটা পাগল। কিন্তু দেখতে যে পাও নি জানি। আমার বিশ্বাস একদিন পাবে। যেদিন মনে হবে করণের আকাশে হাসি লেগেই আছে, যেদিন মনে হবে করণের গাছে-পাতায়-মাটিতে-বাতাসে প্রাণের খেলার জোয়ার নেমেছে, যেদিন দেখবে করণে আর শুকনো কিছু নেই—বন-জঙ্গল খাল-বিল পথ-ঘাট ঘর-বাড়ি সব আবার জীবন্ত নতুন হয়ে উঠেছে, আর যেদিন দেখবে করণে মানুষগুলোর চোখে-মুখে কারণে-অকারণে খুশির আলো ঠিকরে পড়ছে—আর, করণে এত রূপ দেখে যেদিন তোমার চোখে পলক পড়বে না—তখনই জেনো আমার মা ফিরেছে, আমার সেই রূপসী মাকেই গোটাগুটি দেখছ তুমি।'

তাই দেখছেন বসন্ত ঘোষাল। নিজের কৃতিত্ব ভাবছেন না। দাদুর মা যা ঘোষণা করেছিল তাই সত্যি হয়েছে দেখছেন—পাপ নয়, তাঁর পুণ্যে করণের পাপ মুছে গেছে। চোখে পলক পড়ছে না বসন্ত ঘোষালের। করণ হাসছে। করণ খুশিতে ঝলমল করছে। তাঁর মনে হচ্ছে, দাদুর সেই রূপসী মা-ই খুশিতে আটখানা হয়ে মিটিমিটি হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

শেষ

নগরপারে রূপনগর

তৃতীয় পর্ব

পঁয়ত্রিশ

"...মহাভারতে একটি বই চরিত্র নেই। চরিত্র অর্থাৎ পুরুষের চরিত্র। সেই মহাযুগে মেয়েরা পাঁচ হাত ঘুরলেও মহাসতী। অতি আধুনিকা বহুবল্লভারা কি দোষ করল আমার মাথায় আসে না। তাদের দুর্ভাগ্য, একালের আইনে মহাভারতের নজির অচল। পরাশর-মৎস্যকন্যা ভোগসংযোগের ফলে আবির্ভাব স্বয়ং মহাভারতকারের। সেই কুমারী মাতা অদূরকালের কুরুকুললক্ষ্মী মহাসতী সত্যবতী। আবার ওই মায়ের নির্দেশে মহাভারতকারই প্রয়োগ-জনক পরের কুরু-পাণ্ডবকুলের। অতএব তাঁর রচনার শত-সহস্র মহাসতীরা মহাভোগ্যা, শুধু—রমণী-চরিত্র নিয়ে এর বেশী তিনি মাথা ঘামাননি। তবু এরই মধ্যে গান্ধারীকে নিয়ে আমার একটু খটকা লাগে। অন্ধ রাজার হাতে তাঁকে দিতে আপত্তি করেছিলেন তাঁর বাবা সুবল আর নিরেনব্বুইটি ভাই। কুরু-রোষে কারাগারে তাঁদের নিধনযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল। গান্ধারী নিজের চোখ বেঁধেছিলেন স্বামী অন্ধ বলে না তাঁর মুখ দেখতে চাননি বলে?

"যাক রমণীচরিত্র নিয়ে টানাটানিতে আমারও রুচি নেই। বলছিলাম, গোটা মহাভারতে একটি বই পুরুষ-চরিত্র মেলা ভার। তিনি পরম কুরুপ্রিয় অবশিষ্ট সুবল-নন্দন শকুনি। তুলনা নেই, তাঁর তুলনা নেই। এ-রকম লক্ষ্যভেদ অর্জুন করেছেন না এ-রকম প্রতিজ্ঞা ভীষ্ম করেছেন? কর্ণকে এলাউ করলে সে-ই অনায়াসে মাছের চোখ ফুটো করে দিতে পারত, আর, সে-কাল ছেড়ে এ-কালেও কত ভীষ্ম বাপের বিয়ে দিয়ে ভেরেণ্ডা ভাজছে ঠিক নেই। কিন্তু শকুনি? তুলনা নেই, তুলনা নেই! উভয়কুলের ইষ্ট করতে এসে স্বয়ং কেষ্ট ঠাকুরের চক্ষু ছানাবড়া হয়েছিল কার অভীষ্ট টের পেয়ে? এই শকুনির, শুধু শকুনির। শকুনিকে মহাভারতের সহস্র বিশিষ্ট পুরুষদের একজন ভাবলে তাঁর চরিত্রে দাগ পড়বে। আকাশের শকুনিকে পাখি বললে যেমন পাখি আর শকুনি দুয়েরই চরিত্র খোয়া যায়, তেমনি। অমন অমোঘ লক্ষ্য যার সেই শকুনি। আ-হা, চরিত্র বটে একখানা। তাঁর বাপের হাড়ের তৈরি ক্ষুধিত পাশার দান খটখট করে পড়ছিল আর পাণ্ডবসর্বস্ব গ্রাস করছিল, খটখটিয়ে হাড়ের পাশার দান পড়ছিল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের উল্লাস লেগেছিল—সেই উল্লাস ছাপিয়ে শকুনির অট্টহাসির অর্থ সেদিন কেউ বোঝেনি। শুধু রক্ততৃষাতুর ওই হাড়ের পাশারা ছাড়া। কুরুকুলের শেষ রক্তবিন্দু পানের পর সুবলের অস্থির তৃষ্ণার শান্তি আর শকুনির পিতৃতর্পণ, ভ্রাতৃতর্পণ সাঙ্গ। পাণ্ডব-অপমানের খড়্গো সেই লগ্ন আসন্ন।

"কুরুপ্রিয় শকুনি, তোমার তুলনা নেই। তোমাকে নমস্কার।"

জ্যোতিরাণীর হাতে কালীনাথের সেই কালো বাঁধানো নোটবই। মনের এক ঝড়ের মুখে, তিন রাস্তার ত্রিকোণ জোড়া বাড়িটা ছেড়ে আসার আগে কালীদার কাছ থেকে জ্যোতিরাণী এই জিনিসটি চেয়ে বসেছিলেন। কালীদা বলেছিলেন, সময়ে পাবে।

...কালীদার সময়ের বিচারও বিচিত্র বটে। সেই সময় আজ হয়েছে। এই তিন বছর বাদে।

মাঝে একটানা তিনটে বছর কেটে গেছে। এই তিন বছর ধরে জীবন যে নতুন রাস্তায় গড়িয়ে চলেছে তার গতি শিথিল। দিনের অবকাশ জীবিকা সংগ্রহের রুটিনে বাঁধা, রাতের রঙ বর্ণশূন্য। স্থির সহিষ্ণুতার এই দিনগুলি আর রাতগুলি বহন করে চলেছে জ্যোতিরাণী। তাবই মধ্যে আঘাত আসছে এক-একটা, কিন্তু জীবনের তটে সে আঘাত নতুন করে ভাঙন ধরাতে পারেনি কিছু। স্নায়ু ছিঁড়ে দিয়ে যেতে পারেনি। অমনি অবিচল সহিষ্ণুতায় সে-আঘাত তিনি গ্রহণ করেছেন, তারপর একপাশে সেটা সরিয়ে রেখে দিনের কাজে নিবিষ্ট হয়েছেন, বাতের চিন্তা থেকেও সেটা তফাতে রাখতে চেষ্টা করেছেন।

তিন রাস্তার ত্রিকোণজোড়া অর্ধচন্দ্র আকারের বিরাট বাড়িটার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিধিবদ্ধভাবে ঘুচেছে মাত্র তিন দিন আগে। এই বিচ্ছেদের বারতা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে জানানো হয়েছে। এটাও আঘাত কিছু নয়। তিন বছর আগে এ সম্পর্ক নিজেই তিনি ছিঁড়ে দিয়ে এসেছেন। সেই ফিরে আবার জোড়া লাগানোর তাগিদও কখনো অনুভব করেননি। যে আঘাতে তাঁর আহত সত্তা বিমুখ হয়ে ঘর ছেড়েছে, সে-ক্ষত আজও তেমনি আছে। পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁকে ফেরানোর চেষ্টা অবশ্য হয়েছে। পরোক্ষ চেষ্টা করেছেন কালীদা আর মামাশ্বশুর। প্রত্যক্ষ চেষ্টাটা যার ঘর ছেড়ে আসা হয়েছে তার।

শিবেশ্বরের। কিন্তু তাঁর চেষ্টাটা ক্ষিপ্ত বাঘের ফসকানো শিকার ধরার মতই হিংস্র নির্মম। তিনি আপস করতে আসেননি, দীর্ঘ অপরাধের বোঝায় পিঠ নুইয়ে আসেননি, বিবেকের যাতনায় দগ্ধ হয়ে আসেননি! না, মোটে আসেনইনি তিনি। ঘরে বসেই অপমানের চাবুক চালিয়ে ঘর-পালানো জীবের মতই তাঁকে ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। অধিকার দখলের চরম ব্যবস্থার হুমকি দিয়েছেন, সময় জানিয়েছেন।

তার আগেই জ্যোতিরাণী জবাব পাঠিয়েছেন। সেটা এমনই জবাব যে, শিবেশ্বর চাটুজ্যে আর ফেরানোর চেষ্টা করা দূরে থাক, আক্রোশে একেবারেই ঘেমে গেছেন তিনি। বিচ্ছিন্নতার যে সাময়িক অধিকার জ্যোতিরাণী লাভ করেছেন তাতে কোন রকম বাধা পর্যন্ত পেশ করেননি। দুর্বার ক্রোধে তার বদলে আরো প্রকাশ্য নগ্নতায় মেতে উঠেছিলেন তিনি। শুধু ধারণা নয়, জ্যোতিরাণীর বিশ্বাস—বাড়ির মালিকের রোষের ইন্ধন যুগিয়ে মৈত্রেয়ী চন্দর সেখানে অবাধ প্রতিপত্তি লাভে বাদ যদি কেউ সেধে থাকে তো সেটা কালীদার কাজ। মেঘনার মুখ থেকে সেই গোছেরই আভাস পেয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু এ নিয়ে কালীদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেননি তিনি। অপ্রয়োজনীয় একটা গ্লানির প্রসঙ্গ মন থেকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছেন শুধু।

সম্পর্ক ঘোচার শেষ পর্ব সম্পন্ন হয়েছে মাত্র তিন দিন আগে। আনুষ্ঠানিক সংবাদও তাঁর কাছে এসেছে। আসবে তার জন্য মাসকতক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। এসেছে যখন, অদরকারী কাগজপত্রের মতই একপাশে সরিয়ে রেখেছেন। অস্বাচ্ছন্দ্য যদি একটুও বোধ করে থাকেন তো সেটা অন্য কারণে।...এখানকার স্কুলের খাতায় তাঁর নাম লেখানো হয়েছিল জ্যোতিরাণী দেবী। চাকরি বিভাস দত্ত সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁর পরিচিত। জ্যোতিরাণী চাকরির বাজারের খবর রাখেন না, নইলে এত সহজে চাকরি পেলেন কি করে ভেবে অবাক হতেন। বিভাসবাবু বলেছিলেন, চেনা-জানা ছিল, তায় অনার্স গ্র্যাজুয়েট বলে আর একটু সুবিধে হল। জ্যোতিরাণী সেটাই সত্যি ধরে নিয়েছেন।

জীবনের সঙ্কট-মুহূর্তগুলিতেই যেন এই ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ যোগ তাঁর।...নতুন বয়সের সেই নতুন সংসারে একজনের বিকৃতির ফলে জীবনের আশা আলো তাপ সব যখন নিঃশেষে ক্ষয় হতে বসেছিল, তখন থেকে। শাশুড়ীর সঙ্গে কালীঘাট মন্দিরে তাঁকে দেখে বিভাস দত্তর মনে হয়েছিল গরদে আর সিঁদুরে সেজে বলির পশুর মতই কোন অন্তিম সমর্পণের দিকে পা বাড়িয়েছেন তিনি।. পড়াশুনার রাস্তাটা তিনিই দেখিয়েছিলেন, লিখেছিলেন, মন না টানলে মন্দিরের দরজা খোলে না, কিন্তু আর এক মন্দিরের দরজা সামনে খোলা আছে। আর লিখেছিলেন, ভয়ের মুখোশে যত বিশ্বাস করবেন ভয়ের পীড়নও ততো সত্যি হয়ে উঠবে। ভয় করবেন না। সেই চিঠি তাঁকে জীবন দিয়েছিল, তিনি পথ পেয়েছিলেন। না পেলে এই স্কুলের দরজাও আজ খোলা পেতেন না।...তারপর সেই দাঙ্গার বিভীষিকা। সেই দুঃস্বপ্ন ভোলবার নয়। সব বিপদ তুচ্ছ করে সেদিনও এই ভদ্রলোকই ছুটে এসেছিলেন, মৃত্যুর তাণ্ডব থেকে জীবন উদ্ধার করে নিয়ে গেছলেন। আর, সব শেষে নিজের দু পায়ে দাঁড়ানোর এই চরম বিপর্যয়ের মুখেও এই একজনই তাঁকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অপমানের এত বড় বোঝা মাথায় নিয়ে আবার তাঁকে দরজায় দরজায় ঘুরতে হয়নি।

প্রত্যাশা হয়ত ছিল। হয়ত আছে। সবল পুরুষের প্রত্যাশা হলে আগেই কোন্ জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হত কে জানে। সে প্রত্যাশা কোনদিন অবাধ্য হয়ে ওঠেনি বলেই নিষেধের আবরণটা জ্যোতিরাণী শক্ত-পোক্ত করে তোলার অবকাশ পেয়েছিলেন। কোন রকম দুর্বলতার আঁচ পেলে প্রকারান্তরে চোখ উল্টে বরং তিনি রাঙিয়েছেন। কিন্তু স্কুলের এই চাকরির বেলায় এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন ভদ্রলোক। তাঁর নাম লিখিয়েছেন জ্যোতিরাণী দেবী। মুখ দেখানো গোছের ইন্টারভিউ একটা হয়েছে, কেউ কোন রকম জেরা করেনি। এমনি কি অনার্স পাসের সার্টিফিকেটের তলব পর্যন্ত পড়েনি। মুখে বলাতেই কাজ হয়েছে। চাকরিটা যেন তাঁর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। তিনি এসেছেন আর বসে গেছেন। বাড়ি ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মালিকের পদবীসুদ্ধ বর্জন করে এসেছেন কিনা সেটা মাথায়ও ছিল না।

তাই পদবীশূন্য নিজের নামটা দেখে সচকিত হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। চাকরি যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের কাছে বিভাস দত্ত কি বলেছেন বা কতটা বলেছেন জানেন না। পরে সহশিক্ষয়িত্রীদের কেউ কেউ কৌতূহলী হয়েছে, জিজ্ঞাসা করেছে, দেবী বলতে কোন দেবী, পদবী কি?

জ্যোতিরাণী পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছেন, বলেছেন, ওটাই পদবী।

এ-রকম পদবী হয় কি হয় না, তা নিয়ে লঘু গবেষণায় মেতে ওঠেনি কেউ। সেটা জ্যোতিরাণীর ব্যক্তিত্বগুণেও হতে পারে, এখানে হাল্কা অবকাশ বিনোদনের সময় কম বলেও হতে পারে। স্কুল চলে এক লোকহিত সংস্থার দাক্ষিণ্যে। শিক্ষা বিস্তারের আদর্শই বড় লক্ষ্য, আর পাঁচটা সাধারণ স্কুলের মত নয় এখানকার বিধিব্যবস্থা। এখানে মেয়ে বেশি, সে তুলনায় শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা কম। মাইনে ভালো বটে কিন্তু কাজের চাপও তেমনি। কিছুদিনের মধ্যেই জ্যোতিরাণী এখানে মিসেস দেবী হয়েছেন। খটকা যাদের লেগেছিল, তাদেরও মনে হয়েছে এই দেবী মানিয়েছে বটে! মেয়েদের কানও অভ্যস্ত হতে সময় লাগেনি। তারা বলে, অমুক ঘণ্টায় মিসেস দেবীর ক্লাস বা অমুক সাবজেক্টের খাতা দেখবেন তো মিসেস দেবী, নম্বর দেবার হাত কেমন কে জানে।

সম্পর্ক ছেঁড়ার আনুষ্ঠানিক বার্তা আসার সঙ্গে সঙ্গে অলিখিত পদবীটা বাস্তবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। স্কুলের খাতায় চ্যাটার্জি কেটে দেবী বসানোর বিড়ম্বনার মধ্যে পড়তে হবে না তাঁকে। নিঃশব্দে কত বড় এক দায় থেকে যে অব্যাহতি পেয়েছেন তিনিই জানেন। তবু খবরটা পাওয়া মাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন অন্য কারণে। তাঁর নাম থেকে চ্যাটার্জির অস্তিত্ব ঘোচানো হয়েছিল যখন, হিন্দু বিয়ে নাকচ বিধি তখনো আইনের আলোর কাছাকাছি আসেনি। আসতে পারে সে সম্বন্ধে জ্যোতিরাণীর অন্তত কোন ধারণা ছিল না। চাকরির খাতায় তাঁর নাম থেকে চ্যাটার্জি উঠে যেতে দেখে তিনি সচকিত হয়েছিলেন, কারণ তাঁর জীবনে এক পুরুষের আবির্ভাবের চিহ্নটুকুও মুছে দেবার ইচ্ছা দেখেছিলেন তিনি আর একজনের মুখের দিকে চেয়ে। সেই একজনের প্রত্যাশা এখনো দাবির আকারে হাত বাড়ায়নি। সে-প্রত্যাশা এখনো দুর্বল। কিন্তু আগের মত অস্পষ্ট নয় অত। সেটা প্রকাশেব রাস্তা খুঁজছে অনুভব কবতে পারেন। ভদ্রলোক ভুগছেন ক্রমাগত। অসুস্থতার আড়ালে মান-অভিমান আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পদবী বিলুপ্তির পরোয়ানা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছে এই দিনের আশায় সকলের অগোচরে একজনই শুধু দিন গুনছিলেন। এর পর তাঁর দুর্বল প্রত্যাশা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।

কিন্তু ঠিক এই সময়টায় নোটবই পাঠাবার মত সুসময় বেছে নিলেন কেন কালীদা? এটার কথা তো তিনি ভুলেই গেছলেন প্রায়।

আজ আর এই কালো নোটবই খুব এক বৃহৎ বস্তু নয় তাঁর কাছে। ডাকে এসেছে। প্যাকেট খোলার আগেও বুঝতে পাবেননি জিনিসটা কি। খোলার পর বুঝেছেন। এখন আব ওটাব থেকে নতুন করে কিছু সংগ্রহ করার তাগিদ নেই। কি পাবেন বা কি হারাবেন সেই দুর্ভাবনাও নেই আর।...এজন্যেই কি কালীদা এ-সময়ে পাঠালেন এটা? স্মৃতির কোন দুর্বলতার ছিটে-ফোঁটাও যদি থেকে থাকে এখনো, তাও নির্মূল কবা সহজ হবে বলে?

তবু আগ্রহভরেই খুলেছিলেন ওটা। কালো বাঁধানো এই বস্তুটার সঙ্গে অনেক দিনেব কৌতূহল জড়িত। গোড়াতেই ছোটখাটো একটা ধাক্কা খেযে উঠলেন।

শকুনি-স্তুতি পড়ে হতভম্ব।

গোড়াতে কটা পাতা সাদা, এই লেখাটাব পরেও কটা পাতা সাদা। পবেব সব লেখায় তারিখ আছে, এটাতেই শুধু নেই। জ্যোতিরাণীব কেমন মনে হল পরে কোন একসময়ের লেখা ভূমিকা এটা। ভূমিকা সচরাচর পরেই লেখা হয়ে থাকে। একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি নিয়ে জ্যোতিরাণী পাতা উল্টে চলেছেন।

"...মৌমাছি যদি কথা দেয় ফাল্গুনের নেমন্তন্ন শুনবে না, ফুলে ফুলে ঘুরবে না —বৈশাখের চাঁদটা যদি কথা দিয়ে বসে পূর্ণিমা বুকে করে বসে থাকবে, জ্যোৎস্না ঢালবে না—আর বসন্তের কোকিল যদি কথা দেয় ভরা সবুজের দিকে তাকাবে না, ডেকে ডেকে প্রেমিক-প্রেমিকার বুকের তলায় ঋতুর খবর ছড়াবে না—তাহলে? তাহলে এ-রকম কথা যে আদায় করে সে একটি বদ্ধ পাগল। আর আদায় করার পর সে-কথার খেলাপ হবে না এমন বিশ্বাস নিয়ে যে বসে থাকে সে পাগল ছাড়াও আরো কিছু। সে বোধ হয় গাধার মত গরু। কালীনাথ ঘোষাল, আয়নায় নিজের মুখখানা ভাল করে দেখো।

"মিত্রা কথার খেলাপ করেছে। মৈত্রেয়ী মজুমদার মৈত্রেয়ী চন্দ হয়েছে। বামুনের মেয়ে কায়েতের ঘরনী হয়েছে। তাতে কি? তোমার মত চাল-কলা-মার্কা বামুন ধুয়ে জল খেতে চায় এ-কালের কোন্ মেয়ে? বিয়ে শুনে জ্বলতে জ্বলতে গিয়ে সটান মিত্রাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, রাগের মুখে তার মা এই গোছেরই কি যেন বলছিল। আমার অদেখা-বাপের চাল-কলার যজমানির খবরটা শিবুই মিত্রার কানে তুলেছে মনে হয়। আর তার বাপের খড়ম নিয়ে তাড়া করার খবরটাও। মিত্রার সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হওয়ার কথা শিবুই বলেছিল। কিন্তু এ শর্মা কার কাছে কোন্ খবরটা চেপে গেছল, চাল-কলার খবর, না চালচুলো নেই সে-খবর? শিবুটা ওই রকমই। আমাকে ছাড়া তার চলে না, আবার কোন ব্যাপারে তার ওপর টেক্কা দেওয়াটাও বরদাস্ত করে না। যার সঙ্গে জলজ্যান্ত এক চকচকে মেয়ের হৃদয়ের কারবার সে যে নিতান্ত করুণার পাত্র তাদের; এটুকু শুনিয়ে নিজের মর্যাদা বড় করার লোভ ছাড়তে পারেনি, শিবুর আর কোন উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয় না। যাক, বেশ করেছে। চন্দর জয় হোক। বিয়েটা চুকিয়ে ফেলে মিত্রা টেলিফোনে জানিয়েছে কারো সংসারে অশান্তি আনতে চায় না, তাই অন্য পথ বেছে নিয়েছে। আর তার নিজের লেখা চিঠিগুলো ফেরত চেয়েছে। সে ধন পোড়ানো সারা, ছাইটুকুও ধরে রাখিনি, যে ফেরত দেব। ভাবছি, রেস্তোরাঁর ক্যাবিনে আর সন্ধ্যার নিরিবিলি গঙ্গার ধারে, এমন কি কথা দেবার দিনেও যা সে দিয়েছিল তা আর ফেরত নেবে কি করে? তবু চন্দর জয় হোক। ঝকঝকে গাড়ি দেখিয়ে সে যে তার মন জয় করতে পেরেছে সেজন্য কৃতজ্ঞ। পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ার থেকে আগে পড়লে ক্ষতি কম।

"কিন্তু ক্ষতটা আপাতত আর একদিক থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। বাড়ির ন্যায়নিষ্ঠ আচারনিষ্ঠ প্রাচীন কর্তাটির দিক থেকে। তোমাকে শ্রদ্ধা করি, ভয় করি, ভক্তি করি, আর মনে মনে ভিক্ষুকের মত তোমার ছেলের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করি! আশ্রিতের চরিত্রশোধনের কর্তব্যে তুমি নির্মম কড়া শাসন করেছ, বেশ করেছ। কেবল জানতে ইচ্ছে করে আমার বদলে তোমার ছেলে যদি কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে ঘরে আনার জন্য আমার মত এমনি অবিরাম মাথা খুঁড়ত, তাহলেও তুমি ঠিক এমনি কড়া শাসনই করতে কিনা...।"

* * *

"...বাল্মীকির বুকে প্রথম কবিতার বান ডেকেছিল ক্রৌঞ্চমিথুন বধ দেখে। হতেই পারে। সেদিন কোথায় যেন পড়লাম না শুনলাম, চব্বিশ বছর বয়সের এক বোবা ছেলের ফট করে মুখ দিয়ে কথা বেরুলো নদীর ধারে সুইমিং কস্টিয়ুম পরা এক যুবতী মেয়েকে দেখে। রমণী-কাণ্ড এমনি অবাক কাণ্ডই বটে। আমাদের শিবুবাবুও প্রেমে পড়েছেন জ্যোতিরাণীকে দেখে। অবাক হব, না হাসব, না কাঁদব! পরীক্ষার প্রশ্ন আর পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাড়া আর কোন দ্রষ্টব্য বা লক্ষ্যের বস্তু ভূভারতে আছে তাই জানত না যে, সেই শিবুবাবু প্রেমজ্বরে অজ্ঞান। ইদানীং অবশ্য বিলিতি ছবির নায়িকাদের দেখে রমণীরহস্য নিয়ে একটু-আধটু মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল সে, আর তাই দেখেই ওকে জ্যোতিরাণী-দর্শনে নিয়ে আসা আমার—তবুও সতের বছরের একটা মেয়েকে দেখামাত্র এতটা ঘায়েল হবে সেটা এই পাষণ্ডও কল্পনা করেনি। শরবিদ্ধ জন্তুর মত সেই ছটফটানি দেখলে ডাক্তারেরও ঘাবড়াবার কথা। কিন্তু এরকম কিছুই তো আশা

করছিলাম আমি।...প্রভুজী মানিকরামের সন্ত্রাধবজী প্রবীণ প্রাজ্ঞ ন্যায়াধীশ, তোমার এবারের বিচারখানা কেমন হবে? আশ্রিত দূরাত্মীয়ের চরিত্রশোধনের কঠিন কর্তব্যে পায়ের থেকে খড়ম খুলতে চেয়েছিলে, চাবকে লাল করতে চেয়েছিলে, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে সম্পর্ক না ঘোচালে এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না বলে শাসিয়েছিলে। কিন্তু এবারে কি হবে? এবারে যে স্বয়ং যুবরাজের রোগ! খড়ম খুলবে, না চাবুক তুলবে, না সম্পর্ক ছাড়বে —নাকি পুরুত ডাকবে?"

* * *

"কালীনাথ, তোমার কালি মুখের হাসি সামলাও! ন্যায়াধীশের অমন অসহায় মূর্তি দেখে তোমার হাসার কি হল? নিতান্ত আশ্রিত দূরের আত্মীয়ের চিকিৎসা আর যুবরাজের চিকিৎসা এক-রকম হবে আশা করেছিলে? হলই বা এক রোগ। তোমার বেলায় খড়ম খোলা হয়েছিল, চাবুক তোলা হয়েছিল, ওইতেই রোগ ছেড়েছে। কিন্তু যুবরাজের যে পুরুত ডাকা ছাড়া উপায় নেই, উপায় নেই! মজা দেখার আসরে নেমেছ, চুপচাপ বসে মজা দেখো। হেসো না, কাঙালপনা কোরো না। অজ্ঞান বয়েস থেকে এ বাড়ির আশ্রয়ে এসে পিসীকে মা ভেবে আর পিসেকে মনে মনে যুবরাজের মতই বাবা ডেকে মা-বাবা না চেনার ঘাটতি পূরণ করতে চেয়েছ, তাঁদের ব্যবহারে এতটুকু তারতম্য দেখলে তোমার বুকের হাড়-পাঁজর টনটন করে উঠেছে, যুবরাজেব একচ্ছত্র দাবির আসনে মনের মত ভাগ বসাতে না পেরে হিংসেয় কত সময় তাকে তুমি মনে মনে উৎখাত করেছ—তোমার কপালে খড়ম আর চাবুক জুটবে না তো কি শানাই বাজবে? হেসো না, আর কাঙালপনা কোরো না, চুপচাপ বসে মজা দেখো।"

যন্ত্রণার মত এই রাগ, চাপা বিদ্বেষ কার ওপর জ্যোতিরাণী অনুমান করতে পারেন। শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপর। বিশেষ করে শ্বশুরের ওপর।...না, একদিন যিনি শ্বশুর ছিলেন তাঁর ওপর।

"মামু, তুমি একটি নরাধম, তুমি একটি পাষণ্ড, তুমি তার থেকেও যাচ্ছেতাই, তুমি একটি বর্ণচোরা কলির কেষ্ট! ওইটুকু মেয়ে, আমি তবু ফ্রক-পরা থেকে দেখে আসছি—তুমি তো তারও আগে থেকে। এতদিন প্রেমের ফাঁদ পাতা কবির পিণ্ডি চটকেছি, এখন যে তোমার পিণ্ডি চটকাতে ইচ্ছে করছে! এত লেখা-পড়া শিখে, এত স্বদেশী করে বীরদর্পে সাহেব ঠেঙিয়ে আর একের পর এক চাকবি ছেড়ে শেষে নদী যথা সাগরে ধায় তুমি তথা জ্যোতিরাণীর প্রেমে? তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো উচিত, না পাগলা-গারদে চালান করা উচিত, নাকি ব্রজধামে নির্বাসন দেওয়া উচিত? রাধাকে নিয়ে কেষ্ট-কংসের মধ্যেও তো লেগেছিল বলে শুনিনি। তুমি বর্ণচোরা কলির কেষ্ট হলেও তোমাকে কংস-বধ করাই উচিত বোধ হয়। শিবুর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে জ্যোতিরাণীর মা আর জ্ঞাতি দাদাদের হাবভাব দেখে আর সকলেই তারা তোমার খোঁজ করছে দেখে খটকা লেগেছিল, বাড়ি ফিরে খবরটা তোমার কানে ঢুকিয়ে মুখের দিকে চাওয়া মাত্র ব্যাপার জল। সতের বছরের জ্যোতিরাণীর রূপের জোর বুঝতেই পারছি, জল ঘোলা করতে আপত্তি না হলে প্যাঁচ কষে এখনো তাকে তোমার সঙ্গে জুড়ে দিতে রাজী আছি। ছেলের ভাবী বউ দেখে এসে বুড়ো আনন্দে ডগমগ, এই গোছের একটা ম্যাজিক ঘটিয়ে তাঁর মুখখানা দেখার বড্ড লোভ। কিন্তু তুমি পাষণ্ড উদারতার

আগুনে ঝাঁপ দেবে জানা কথাই। তাহলে কি আর করবে। জ্যোতিশূন্য হয়ে তুমি নরকে পচে মরো, আমি স্বর্গে বসে হাসি।"

পড়তে পড়তে দু কান লাল হয়েছে জ্যোতিরাণীর। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে গেছেন।

... ...

"সন্ধ্যে থেকে বাড়িতে আনন্দের হাট লেগে গেছে। বাড়ির একমাত্র ছেলের বউভাত ফুলশয্যা, ঘটা হবেই তো। ওঘরে সেই সতের বছরের জ্যোতিরাণী সিঁদুর পরে ঘোমটা দিয়ে মুকুট পরে বসে আছে যেন বালিকা রাজেশ্বরী। মামু পাষণ্ডের দোষ দেব কি, আজ আমিও চোখ ফেরাতে পারছি না। বউয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ সকলে। বুড়ীর মুখে হাসি ধরে না, বুড়োর গম্ভীর মুখের ফাটল দিয়ে খুশি ঝরছে। সকলকে ছেড়ে চেয়ে চেয়ে আমি শুধু কর্তার মুখখানাই দেখছি। আমার ওপর কর্তার আজ বড় স্নেহ, এত খাটতে দেখে বার বার করে বলেছেন, পাখার নিচে ঠাণ্ডা হয়ে বোস্ একটু, দুদণ্ড জিরিয়ে নে, ছোটাছুটি করে অস্থির হলি যে একবারে। আমি ব্যস্ত হয়ে সরে গেছি, আবার দূরে দাঁড়িয়ে তাকেই দেখেছি।

"এমন একটা সুন্দব মেয়ে ঘরে এলো, আনন্দ আমারও হওয়া উচিত। অনেক তো হেসেছি আর অনেক কাজও করেছি। মামুর পিছনেও কম লাগিনি। কিন্তু হাসি আর আনন্দ এক জিনিস? উৎসবের এত হৈ-চৈ হট্টগোলের মধ্যে আমার ভিতরটা সারাক্ষণ কেবল চিনচিন করেছে। বাড়িতে খুশির বাতাসে আর ফুলের বাতাসে একাকার, সে বাতাস বুক ভরে টানতে পারিনি। কর্তার খুশি-মুখ সামনে পড়া মাত্র আমার মেকী হাসির মুখোশ খসে পড়তে চেয়েছে।...এ বাড়ির ছেলে তো নই-ই আমার আত্মজন কেউ হলেও এত বড় না হোক ছোটখাটো একটু খুশির উৎসবের মধ্যে দিয়ে আর একটি মেয়ে কপালে সিঁদুর মাথায় ঘোমটা দিয়ে এই বাড়িতে এসে দাঁড়াতে পারত। তাহলে পিঠময় দগদগে চাবুকেব দাগ নিয়ে আজ তাকে প্রাণের দায়ে পালিয়ে বেড়াতে হত না। সে দাগ আমি নিজেব চোখে দেখিনি, বড় গলা করে চন্দ আমাকে বলেছিল। মিস্টাব চাণ্ডা। সেদিন আমার অফিসে এসে হাজির। বিকেলেই বেশ গিলে এসেছিল। পা টলছিল, মুখ তেল-তেলে লাল। মিত্রার নামের আগে একটা অশ্লীল গালাগাল জুড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, হোয়্যার ইজ সী, ডু ইউ নো? আগে আপনার নাম করত আর দাঁত বার করে হাসত, বাট আ-অ্যাম সিওর সী সুন রিপেনটেড ডেসার্টিং ইউ—দ্যাট ফাইন বীচ—সী রিকোয়ার্স সাম মোর ল্যাশেস—ইজী সী উইথ ইউ নাউ। আমার হতভম্ব মূর্তিও চাণ্ডা সাহেবের হাসির কারণ হয়েছিল, বলেছিল, ইয়েস সার, ইওর লেডি —সে আমাকে মাতাল বলেছিল লম্পট বলেছিল, জোচ্চোর বলেছিল, আরো অনেক মধুর কথা বলেছিল—অ্যাণ্ড সী গট সামথিং ফ্রম মি। আমি তার মুখ বেঁধে নিয়ে পিঠে হাণ্টার বুলিয়েছিলাম, এচড সাম ফাইন আর্ট ওয়ার্ক অন হার ব্যাক—ভেরি ফাইন ইনডিড, পিঠময় সে দাগ আর জীবনে উঠবে না। অ্যাণ্ড সী বিকেম অ্যাজ মীক অ্যাজ বাটার অ্যাণ্ড টুক মি দ্যাট ভেরি নাইট অ্যাজ এ উওম্যান সুড—ওনলি দ্যাট ব্লাডি আর্ট-ওয়ার্ক অন হার ব্যাক ডিস্টার্বড হার ইমেনস্লি। বাট আ-অ্যাম এ সোয়াইন, ওর মতলব বুঝিনি। এক মাস হয়ে গেল আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে, মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে গেছে—বাট হোয়্যার? নাউ কাম, ডোণ্ট প্লীড সাচ ভার্জিন ইনোসেন্স —ইজ সী উইথ ইউ?

"দারোয়ান ডেকে লোকটাকে ঘাড় ধরে বার করে দিতে বলেছিলাম।"

"তার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দম আটকে আসছিল। গাড়ির ফাঁদে পা দিয়ে মিত্রা ঠকেছে জানতাম, সুখে নেই তাও জানতাম, তবু এতটা জানতাম না। মিত্রা বলেছিল তার শ্বশুরবাড়ির সকলে উৎকট সাহেব, পিঠে হান্টারের দাগও বসায় বলেনি।...অল্প বয়সে চাকরিতে নেমে তার সুখের লোভ বেড়েছিল আর পুরুষের ওপর বিশ্বাস কিছু কমে গেছল। তবু সিঁদুর পরে ঘোমটা দিয়ে এ বাড়ির উঠোন পেরিয়ে আসতে পেত যদি, জ্যোতিরাণীর মত অত সুন্দর না হোক খুব কি কুৎসিত লাগত। ওটুকু লোভ আর অবিশ্বাস থেকে সহজ সুস্থ একটা মেয়েকে টেনে তোলা যেত না? সে কি মস্ত অনাচারের কিছু হত? যাক, জ্যোতিরাণী তুমি সুখেই থেকো। তোমার মুখ চেয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে, যার কাঁধে ঝুলেছ সেও সুখেই থাকুক। কিন্তু ওই সুখ আর কারো মুখে ছড়ালে নরাধম কালীনাথের চোখে সেটা কাঁটা হয়ে বিঁধবে।"

জ্যোতিরাণীর হাত থেমে গেছল, খানিকক্ষণ পাতা ওলটাতে পারেননি। তাঁর মত এত ক্ষতি মৈত্রেয়ী চন্দ আর কারো করেননি। তবু মৈত্রেয়ী চন্দর নয়, কালীদার মুখখানাই সামনে দেখছিলেন জ্যোতিরাণী। এই একজনের মনের হদিস এখনো ঠিকমত পেয়েছেন কিনা জানেন না।

... ...

"পুরুষ প্রেমের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু বিয়ের পরেই জেগে ওঠে। শুরু থেকেই শিবুবাবু বড় কড়া রকমের জেগেছেন। অহংকারের শুনি তিন আবাস, প্রথমে স্বর্গ পরে মর্ত্য শেষে পাতাল। শিবুবাবু অহংকারে স্বর্গ থেকে আছাড় খেয়ে মর্ত্যের চাকরি চেখে বেড়াচ্ছিল, এখন সেটা পাতালের দিকে ঝুঁকেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর সেই পাতালের নিঃশ্বাস সইছে না বোধ হয়, তার সোনার রঙে কালচে ছোপ লেগেছে। ...কোনো এক ক্লাউনের সঙ্গে এক রুচিশীলা মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। দুদিন না যেতে খটাখটি। হতাশ হয়ে মেয়েটি এক অভিজ্ঞজনের উপদেশ নিতে গেছল। সে পরামর্শ দিয়েছিল, বিয়ে যখন হয়েই গেছে, উঠে পড়ে নিজের চরিত্রে ক্লাউনের স্থূলতা আনতে চেষ্টা করো। যদি আসে তো বাঁচলে, না যদি আসে—ঝড় আসবে। অর্থাৎ পুরুষ যেমন তার রমণীটিও তেমনি না হলে গোল। কিন্তু জ্যোতিরাণীকে এই পরামর্শটা দেয় কে? মামু পাষণ্ড তো কলকাতা থেকেই গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে। মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়, সন্দেহের বিষে-বিষে একেবারে কালী করে দিলে। ছেলেপুলে হবে, কিন্তু চেহারার যা হাল টিকলে হয়। হঠাৎ দুপুরে সেদিন মৈত্রেয়ী একেবারে বাড়ি এসে হাজির। পিঠের দাগ আর কি করে দেখব, মুখে হাসির চটক দেখলাম। তখনই শুনলাম তার স্বামী ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত যাব-যাব করছে। মিত্রা নাকি তাকে ব্যারিস্টারি পাস করে প্রথমেই তার সঙ্গে মামলা করতে বলেছে। স্বামীর সম্পর্কে যে-কটা কথা বলেছে বেশ মিষ্টি করে হেসে হেসে বলেছে। মিত্রা নতুন অফিসে চাকরিও করছে শুনলাম। নতুন অফিসের ঠিকানা দিয়ে গেল, যেতে বলল, দরকারী পরামর্শ আছে নাকি। যদি পিঠের দাগ দেখতে হয় আর দরকারী পরামর্শটা যদি তাই নিয়েই হয়—সেই ভয়ে যেতে পারিনি। কিন্তু মিত্রার পালানোর মিয়াদ শেষ হল কি করে, ভাবী ব্যারিস্টার সাহেবটি কোথায় এখন?

"...শিবুবাবুর সন্দেহের ধাক্কায় এবার আমারও পালাই-পালাই অবস্থা। উঠতে বসতে

চলতে ফিরতে অবিশ্বাসী দুটো চোখ আমাকে ছেঁকে ধরে আছে টের পাচ্ছি। বউ আমার সঙ্গে তার রুগ্‌ণা মাকে দেখতে যায়, তাতেও সন্দেহ আর অবিশ্বাস। মহিলা শেষ পর্যন্ত মরে প্রমাণ করলেন তিনি অসুস্থই ছিলেন। সন্দেহ সকলের আগে নিজেকে বিষোয়, তারপর অন্যকে। এই নোটবইয়ের খোঁজে শিবু আমার ট্রাঙ্ক খুলেছিল। পায়নি। না যাতে পায় আমার সেদিকে চোখ ছিল। পার্কে সেদিন ডাকলাম ওকে, হাত ধরে বললাম, এরকম পাগলের মত করে বেড়াচ্ছিস কেন? শিবু কেঁদেও ফেলতে পারত, বিড়বিড় করে বলল, আমার মাথাটাই বোধ হয় খারাপ হয়ে যাবে কালীদা। হঠাৎ হাত ধরে অনুনয় করে জানতে চাইল, তার আগে আর কার সঙ্গে জ্যোতিরাণীর বিয়ের কথা হয়েছিল—বলল, শুধু এটুকু জানতে পারলেই তার মন ঠাণ্ডা হবে, সুস্থির হবে, স্বাভাবিক হবে—গোপনতা চলে গেলে ওদের দুজনের মন হাল্কা হবে। আমি মামুর নাম কবে দিলাম, সন্দেহটা আমার দিক থেকে মামুর দিকে চালান হয়ে গেল তাও বুঝলাম। মামু তখন এখানেই, মামুকেও বলেছি। কি কবব, মামুর সহ্যগুণ আমার থেকে বেশি, এবারে মামু সামলাক।

"এদিকটা নিরানন্দের বটে, কিন্তু আনন্দের দিকটা আমার কাছে একটুও ছোট নয়। আমি দেখছি কর্তার মুখের হাসি গেছে, দুর্ভাবনাব ছটফটানি বেশ ভালো রকম শুরু হয়ে গেছে। কর্ত্রীর মনেও শান্তি নেই। আমি নিজেকেই নিজে পাষণ্ড বলি, কারণ তাদের দিকে তাকালে আমার কেবল হাসি পায়। কর্তা এক-একদিন আমার কাছে এসে বসেন, জিজ্ঞাসা কবেন, কি করা যায় বল তো? আমার কেবল হাসিই পায়, বলতে ইচ্ছে করে, কেন, তোমার আচাব-নিষ্ঠার জোরে সব কিছু ঠিক করে ফেলতে পারছ না?"

জ্যোতিরাণী পাতা উল্টে গেলেন। এরপর অনেকগুলো লেখা একজনের সন্দেহের সেই ঘাত-প্রতিঘাত নিয়েই। সবটাই মামাশ্বশুরকে কেন্দ্র করে। তার ফলে কালীদাকে নিয়ে শ্বশুরের ডাক্তারের কাছে ছোটা, জ্যোতিবাণীদের বাড়ি ছাড়া। এই লেখাগুলো এসে থেমেছে শ্বশুরের মৃত্যুতে এসে। মৃত্যুর পর কালীদা লিখেছেন, মৃতের সঙ্গে মানুষের বিবাদ নেই, আর যেন এই কালো খাতায় মনের কালী ছড়াতে না হয়।

কিন্তু একটানা বছর দুই বাদে ওই কালো খাতা নিয়ে তিনি আবারও বসেছেন।

... ...

"শিবু টাকা করেছে। অনেক টাকা। ওর মাথা আছে, যা ধরছে তাতেই সোনা ফলছে। মাথা আছে বলেই ধরার বাহাদুরি। এই যুদ্ধটা ওব কাছে আশীর্বাদ। কিন্তু শিবু টাকা করছে বলেই এই কালো খাতায় টান পড়ার কথা নয়। সন্দেহ রোগের জন্যেও নয়, আমাকে আর মামুকে অব্যাহতি দিয়েছে, এখন ওর সামনে বিভাস দত্ত। তা নিয়েও আমার কোনো মাথা-ব্যথা নেই। কিন্তু হঠাৎ মিত্রার সঙ্গে ওদের এত সদ্ভাব হয়ে গেল কি করে বুঝতে পারছি না। তার স্বামী নাকি ব্যারিস্টারি পড়তে চলেই গেছে বিলেতে, ফিরবে কি ফিরবে না ঠিক নেই। খোঁজ নিয়ে জেনেছি মিত্রা চাকরিও করে না এখন, অথচ আছে বেশ বহাল তবিয়তেই।

"সন্দেহটা ছোঁয়াচে রোগের মত। শিবুকে দুষতাম। কিন্তু সেটা এখন আমাকেই ছেঁকে ধরছে। ধরে আছে। শিবু আরো বড় বাড়ি ভাড়া করেছে, আরো বড় গাড়ি হয়েছে তার। আর সেই বাড়ি আর গাড়ির সঙ্গে মিত্রার যোগও বাড়ছেই। সংস্কৃতির

অনুষ্ঠানে প্রায়ই ডাক পড়ে নাকি দুজনেরই। খোঁজখবর আরো নিয়েছি। মিত্রার সংস্কৃতি-প্রীতির লক্ষ্য কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু শিবুর সংস্কৃতি-ভক্ত হওয়া আর কষাইয়ের বুকে জীব-প্রেম উথলে ওঠা প্রায় এক ব্যাপারই। মিত্রাই তাকে এই আনন্দের রাস্তায় টানছে অনুমান করতে পারি। মোটা টাকার চাঁদা আদায় করে দিলে কে না মস্ত সংস্কৃতি-রসিক বলে দু হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাবে।

"কিন্তু ব্যাপারটা এর থেকেও জটিল ঠেকছিল আমার কাছে। কেন ঠিক বলতে পারব না। এই যোগাযোগটাই আমার কাছে ঠিক স্বাভাবিক লাগছিল না হয়ত। জটিলতার রেখাপাত বাড়তেই থাকল। অনেক কিছুই বিসদৃশ ঠেকতে লাগল। শিবুর চেক বই খুলে মিত্রার নামে কাটা কয়েকটা চেকের হদিসও পেয়েছি। একেবারে তুচ্ছ অঙ্কের চেক নয়। রাতের ফাংশনে ডাক পড়লে খোঁজ নিয়ে দেখেছি মিত্রা সেখানে আছেই। নতুন করে আবার অশান্তির আগুন জ্বলেছে আমার মাথায়। আমি কেবল খুঁজে বেড়িয়েছি চন্দ গেল কোথায়। বিলেত যদি গিয়েই থাকে, ব্যারিস্টার যে হয়নি বা হবার জন্যে সেখানে বসে নেই তাতে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না। মিত্রার কপালে সিঁথিতে সিঁদুরের টিপের ওপরেও আমার বিশ্বাস ছিল না। বিশ্বাস ছিল কেবল ওর পিঠের চাবুকের দাগগুলোর ওপর—যা আমি চোখে দেখিনি কখনো। সেই চাবুক যেন আমার পিঠেও পড়ে আছে। তার যাতনাও আছে, রাগও আছে। ভিতরটা আমার আজও সেই দাগ মুছে দেবার জন্য লালায়িত, কিন্তু কেমন করে যে তা সম্ভব ভেবে পাইনে। ওর স্বামীর অস্তিত্ব যদি মুছে গিয়েই থাকে ও আমাকে জানায় না কেন? আজ তো খড়ম নিয়ে তাড়া করার কেউ নেই। কিন্তু কিছু বলা দূরে থাক, আমাকে দেখলেই ও কেমন সচকিত হয়ে ওঠে, সব থেকে বেশি আমাকে এড়িয়ে চলতে চায়। কেন? কেন?

"চিন্তাটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তাই একদিন জানাও গেল সব কিছু। দিন কয়েকের জন্য শিবু বাইরে গেছে। পরে শুনলাম মিত্রাও কলকাতায় নেই, বাইরের কি এক ফাংশনে কর্তৃত্বের ভাব নিয়েছে। সেই রাতেই বিক্রমকে ধরলাম আমি, বিক্রম পাঠক। শিবুর গুণমুগ্ধ ভক্ত, আবার বিলক্ষণ ভয়ও করে তাকে। হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাকে আকণ্ঠ মদ গেলালাম। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাড়ির অশান্তির কথা তুললাম। বলা বাহুল্য, সেই কল্পিত অশান্তি শিবু আর মিত্রাকে নিয়ে। বললাম, এবারও দুজনে এক জায়গাতেই গেছে কে আর না জানে। মদের নেশায় বিক্রম হোঁচট খেল যেন, সন্ত্রস্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, ভাবীজী জানে? ছেলেটা ভালো, ভাবীজীর ওপর তার টানও আছে। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, দেখো তো, ঘরে এমন বউ থাকতে, এরকম নচ্ছার মেয়েমানুষের পাল্লায় কেউ পড়ে, দাদার এত বুদ্ধি, কিন্তু চোখ নেই। ভাবীজীর দুঃখে এরপরে গলগল করে অনেক কথাই বলেছে সে। তার প্রত্যেকটা কথা আমার কানে আর মাথায় এক-একটা বিষাক্ত তীরের মত ঢুকেছে। বিক্রম সব জানে বলে, আর এবাড়ির সঙ্গে তার একটু-আধটু যোগ আছে বলে শিবুর অগোচরে মিত্রার সাদর আপ্যায়ন থেকে সেও একেবারে বাদ পড়েনি। জানার যেটুকু জানা হয়েছে, ওঠার আগে বিক্রমকে শাসিয়ে এসেছি এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে শিবু জানতে পারলে তার বিপদ হবে।

"না শিবু যা করেছে তা আর কেউ করেনি। পিসেমশায়ের খড়ম মিত্রাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি, চন্দর চাবুক তাকে বরং আরো আমার কাছে এগিয়ে দিয়েছিল। জীবনে তাকে পাব না জানতুম, তবু সে আমার কাছেই ছিল। কত কাছে

সে শুধু আমিই জানি। কিন্তু এ বাড়ির সুরেশ্বর চাটুজ্যের ছেলে শিবেশ্বর চাটুজ্যের টাকা তার সব নিয়েছে, সব নিয়ে তাকে ভোগের সঙ্গিনী করেছে। অপমানের সব থেকে বড় চাবুকটা শিবু আমারই মুখের ওপর মেরে দিয়ে গেছে। মনে পড়ছে, ওর বাবার ভয়ে মিত্রাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারছিলাম না বলে ও বলেছিল, অত যদি ভয় তো ছেড়ে দাও, আমি চেষ্টা-চরিত্র করে দেখি বিয়েটা করে ফেলতে পারি কিনা। শুনে সেদিনও আমার ভালো লাগেনি, কিন্তু বুঝতে পারিনি মিত্রাকে ঘিরে তখন থেকেই ওর ভিতরে বাসনার খেলা চলছিল।...জ্যোতিরাণী, তোমাকে সাবধান করার সময় পেলে সাবধান করতাম, আর করে লাভ নেই। যে কদিন পারো সুখেই থাকো। পাপ এলে বিনাশ আসবেই, সেটা এবার কেমন করে কার হাত দিয়ে আসবে আমি জানি না। আমি সেই প্রতীক্ষায় আছি।"

সর্বাঙ্গ সিরসির করছে জ্যোতিরাণীর। রুদ্ধশ্বাসে পাতা উল্টে চলেছেন। পর পর কটা লেখায় হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও প্রতিশোধের একটা নীরব সঙ্কল্প যেন ঝিলিক দিয়ে গেছে। এমন কি ছেলেটারও যেন অব্যাহতি নেই তা থেকে। বিভাস দত্তকে ঘিরে টীকা-টীপ্পনীও কম নেই।

... ...

"ওরা বিলেতে চলে গেল। আমি হাসিমুখে ওদের প্লেনে তুলে দিয়ে এলাম। মিত্রা গেল তার ব্যারিস্টার স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে আর টাকা আনতে। আর শিবেশ্বরবাবু যাবেন আমেরিকায়। ভালো ভালো, জমুক নাটক জমে জমে শেষ অঙ্কে আসুক। আমি যে ওদের মুখের ওপর হা হা শব্দে হেসে উঠিনি আমার বাবার ভাগ্যি। যাবার আগে শিবু আমাকে আড়ালে ডেকে বলল, জ্যোতির ওপর যেন একটু চোখ রাখি। অর্থাৎ বিভাস যেন এই ফাঁকে আবার বেশি না এগোয়। আমি আশ্বাস দিয়েছি চোখ রাখব। চোখ রাখবার জন্যে সে যে সদাকে মোতায়েন করে গেছে তাও জানি। তবু সাবধানের মার নেই বোধ হয়। আমি তো হাবা-গোবা ভালোমানুষ, আমাকে নিয়ে ওদের নিজেদের ভয় নেই। টাকা হলে তবে লোক চালাক হয়। শিবেশ্বর ভারী চালাক, আর জ্যোতিরাণীর মিত্রাদিও। জ্যোতিরাণীকে বলব সব? বললে বিভাস এগোয় কিনা দেখব? কিন্তু তুমি একটি রামমূর্খ কালীনাথ, জ্যোতির এগোনোর সম্ভাবনা দেখলে বলতে পারতে, বিভাস এগোলে কি লাভ। তার থেকে হাতে ছুরি, বুকে ছুরি, চোখে ছুরি, মগজে ছুরি নিয়ে যেমন বসে আছ তেমনি বসে থাকো। গলা যারা বাড়াবার তারা ঠিক একদিন গলা বাড়াবে।"

জ্যোতিরাণীর মনে আছে, যেদিন রওনা হয়ে গেল দুজনে, সেই রাতেই ফিরে এসে কালীদা এই কালো খাতা খুলে বসেছিলেন। আর তিনি অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, এই রাতে ভদ্রলোক লেখার মত কি পেলেন আবার। পরের তারিখটা অনেকদিন পরের...দুজনে বিলেত থেকে ফিরে আসারও পরের।

"...মিত্রার কথাবার্তায় চালচলনে, হাসিখুশিতে বিলেতের রঙ লেগেছে। ফেরার পরেও ওর গায়ে যেন বিলেতের বাতাসই লেগে আছে। মোটা শরীর বেশ আঁট হয়েছে। কি কাণ্ড, আমার চোখেও লোভ লাগছে নাকি। কালীনাথ সাবধান। মনের আনন্দে জ্যোতিরাণীকে বিলেতের গল্প শোনাচ্ছে। ওর স্বামীর সঙ্গে মোক্ষম বোঝাপড়া করে আসার গল্পও। জ্যোতিরাণী হাঁ করে শুনছে। হায় গো জ্যোতিরাণী, তুমি একালে জন্মালে

কেন?...থেকে থেকে আজকাল প্রায়ই একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে আমার। বাড়ির কর্তা সুরেশ্বর চাটুজ্যে অনেকদিন বলেছেন, জ্যোতিরাণীকে দেখে দেখে নাকি নিজের মা-কে মনে পড়ত তাঁর, সেই রকমই মনে হত। সুরেশ্বর চাটুজ্যের মা মানে তো সেই তেজস্বিনী হৈমবতী। আমারও আজকাল সে-রকম ভাবতে একেবারে মন্দ লাগে না। কিন্তু শিবু তাহলে কে? আদিত্যরাম? আদিত্যরাম আর যাই হোক, নমস্য বীর্যবান। শিবু তার প্রেত হবে। কিন্তু আমিই বা তাহলে কে? নীলগোপাল নয় তো? আর মিত্রা সৌদামিনী? নীলগোপালের কাছ থেকে আদিত্যরাম সৌদামিনীকে কেড়ে নিয়েছিল বলেই তো আদিত্যরামের কাল হয়েছিল! মিলছে মন্দ না। কালীনাথ তুমি শুধু অপেক্ষা করো, ব্যস্ত হয়ো না।...মৈত্রেয়ী চন্দ ঝকঝকে একটা নতুন বাড়িতে উঠেছে, কোন এক মুসলমান বাড়িঅলার কাছ থেকে মওকায় লীজ নিয়েছে নাকি। আমি শুধু শুনছি আর অপেক্ষা করছি।”

জ্যোতিরাণীর সব দীর্ঘনিঃশ্বাস এখনো কি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি? বড় নিঃশ্বাসই বেরিয়ে এলো একটা। পাতা ওলটানো মাত্র উদগ্রীব আবার।

... ...

“শিবেশ্বরের মুখের ওপর যেন আচমকা জোরালো সার্চলাইট ফেলা হল একটা। প্রথমে সচকিত তারপর বিমূঢ়।

“খাতাপত্র খুলে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, বালীগঞ্জের দোতলা বাড়িটা মৈত্রেয়ী চন্দর নামে কেনা হল, এর খরচাপত্র তো কিছু খাতাই নেই দেখছি।

“এটুকু সামলাতেই সময় লাগল বিলক্ষণ। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠার দাখিল। কিন্তু সত্যিই ফ্যাকাশে হলে মর্যাদা থাকে না। আমি তার অ্যাটর্নী অথচ চুপচাপ কাজটা কবিয়েছে অন্য অ্যাটর্নীকে দিয়ে। ঢোঁক গিলে গম্ভীর জবাব দিল, ওটা আমার পার্সোন্যাল অ্যাকাউন্ট থেকে গেছে, খাতায় আনার দরকার নেই। একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, তোমাকে কে বলল?

“জানলাম যে অ্যাটর্নী কাজ করেছে, তার সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। শুনে শিবেশ্বর মন্তব্য করল, মৈত্রেয়ীর চেনা-জানা অ্যাটর্নী, তাকে দিয়েই করালে। এও যথেষ্ট নয়, আরো একটু কৈফিয়ৎ দেবাব তাগিদ বোধ করল। হাসতে চেষ্টা করে বলল, এমন ধরল যে টাকা না দিয়ে পারা গেল না, একতলাটা ভাড়া দিয়ে শোধ করে দেবে...সস্তার বাড়ি, হাতছাড়া হয়ে যায়, বিলেতে ওর স্বামীর কাছ থেকে তেমন বিশেষ কিছু তো আনতে পারেনি...।”

“নির্বোধ বিস্ময়ের কারুকার্য নিজের মুখে কতটা ফোটাতে পেরেছিলাম জানি না। হতভম্বের মতই আমি বলে উঠেছি, স্বামী! বিলেতে আবার তার স্বামী এলো কোত্থেকে? তার স্বামী তো সেই কবছর ধরে কোয়েমবেটোরের হাসপাতালে পড়ে আছে, মোটর অ্যাকসিডেন্ট থেকে প্যারালিসিস—”

“বড় আফসোস, শিবুবাবুর সেই মুখ আমি ছাড়া আর কেউ দেখল না। আমার ভয় ধরেছিল ও বোবা হয়ে গেল কিনা। না, তারপরেও ও আমার হাতে-পায়ে ধরে নি। আগের দিন হলে ধরত বোধ হয়। শুধু মুখের দিকে চেয়ে থেকে যেটুকু পারে বুঝিয়ে দিয়েছে। ধনপতি শিবেশ্বর চাটুজ্যের মুখের দিকে চেয়ে থেকে শুধু দুটো চোখ

দিয়েই যেটুকু বলতে পারে—বলেছে। আমি বোকা কালীনাথ তেমনি নিঃশব্দেই তাকে আশ্বাস দিয়েছি।"

"এর পর দিনে দিনে আমার কদর বেড়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে মাইনে বেড়েছে। ওর টাকা-পয়সার ওপর অধিকার বেড়েছে। দরকারে ওর ওপর কর্তৃত্বও বেড়েছে। ও নির্বোধ না, মিত্রাকে ও কিছু বলবে না আমি জানতাম। আমার মুখ যদি সেলাই করা থাকে তাহলে মিত্রার না জানাই ভালো। জানলে পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হবে।...কিন্তু মিত্রা কি আভাস কিছু পেয়েছে? আমার সঙ্গে সেই ব্যবহারে আবার সেই ঘনিষ্ঠতার সুর কেন? একটু হাতছানি পেলে ও ছুটে আসতে পারে বোধ হয়। সে কি অনেক টাকা নাড়াচাড়া করি বলে, নাকি আর কিছু?"

জ্যোতিরাণী উদগ্রীব হয়ে পাতা ওলটাচ্ছেন, মাঝের এই তিনটে বিচ্ছিন্ন বছরও বুঝি মন থেকে মুছে গেছে।

... ...

"চাবুক মেরে মেরে ছেলেটার ছাল-চামড়া তুলে দিয়েছে। বসার ঘরে বিভাস আব জ্যোতিরাণী ছিল, বিভাস পড়ছিল আর জ্যোতিরাণী শুনছিল—ছেলেটা তখন ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে পালিয়েছিল। এই অপরাধ। নাটক জমছে বইকি, বেশ দ্রুত তালে জমছে। শিবু খবরটা শুনেছে চন্দননগরে মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে। সেখানকার ফাংশান শেষ করে সেই রাতেই কলকাতায় ফিরেছে দুজনে। কালীনাথ, ছেলেটার জন্যে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত, তার ঠাকুমাকে কাঁদতে দেখে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত, জ্যোতিরাণীর জন্যেও দুঃখ হওয়া উচিত। স্বাধীনতার সকালে মামুর মুখে রাণীর নয়জন ফাঁসির আসামীর গল্প শুনে সক্কলের মুখে আলো দেখেছিলে, সেটা এভাবে নিভল বলে তোমার দুঃখ হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখ না হলে জোব করে আর দুঃখ করবে কি করে। ছেলেকে চাবুক মারার পরেও বাবুর রাগ পড়েনি। সদাকে চাবকে লাল করবে বলে শাসিয়েছে। বাড়ি থেকে দূর করে দেবে বলেছে। তারও অপরাধ কম নাকি! সে সঠিক করে বলতে পারেনি আলো নেভাব আগে বিভাস দত্ত কতক্ষণ ধরে বসার ঘরে ছিল, সঠিক বলতে পারেনি আলো নেভার কতক্ষণ পরে সে গেছে, তার বউদিমণি কতক্ষণ বাদে উপরে উঠেছে। এই ব্যাপারে চোখ রাখাই সদার আসল কাজ এখন, আসল কাজে গাফিলতি হলে রাগ হবে না? এর কিছু দিন আগে সদাকে জ্যোতিরাণী কি বই না কি একটা লেখা আনার জন্যে বিভাসের কাছে পাঠিয়েছিল। সদাকে সোজা তিনতলায় বিভাসের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার বাড়ির লোক। সে-ঘরে বউদিমণি আর সিতুর সঙ্গে শুধু বিভাসবাবুর ছবি টাঙানো দেখে সদা খবরটা তার দাদাবাবুকে দিয়ে পুরস্কার পেয়েছিল, এ-বেলায় তিরস্কার মিলবে না? কিন্তু সদা সেই থেকে গজরাচ্ছে, এ বাড়িতে সে আর থাকবে না, এসব ঘেন্নার কাজ তার দ্বারা আর হবে না। ও আর থাকবে না।...চল্লিশ বছরের সদা, গেলে মন্দ হয় না বটে। নাটকের এই অঙ্ক সদার বিদায় চাইছে।"

চোখের সামনে দিয়ে পর্দায় এক-একটা ছবি সরে সরে যাচ্ছে যেন জ্যোতিরাণীর। তাঁর চোখ লাল, মুখ লাল। পাতার পর পাতা উল্টে চলেছেন। থামলেন, শুরুতে সিতুর কথা।

... ...

"ছেলেটা এক নম্বরের বিচ্ছু। কখনো মনে হয় মায়ের ছেলে, কখনো বাপের। মায়ের ছেলে মনে হলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শিবুর ছেলে মনে হলে আমার ভেতরের ছুরিগুলো ওর দিকেও উঁচিয়ে উঠতে চায়। বাপের মত বই নিয়ে পড়ে থাকার ধৈর্য নেই, অথচ বাপের মতই মাথা। ওইটুকু ছেলে, পুরুষের চোখ নিয়েই যেন ওই ছোট মেয়েটার দিকে তাকায়—শমীর দিকে। নাকি, ওর বাপের ওপর রাগে এমন মাথা খারাপের মত দেখি ওকে! শেষ পর্যন্ত মায়ের মত হবে কি বাপের মত, ঠিক বুঝতে পারি না। ছোট দাদুর পেলোরাস জ্যাকের গল্প শুনে ওর চোখে জল আসে। আবার ডাকাতদের সামনে মানুষ মারতে দেখলেও বীরত্বের উদ্দীপনা—তখন মনে হয় এও আর একটি খুদে শিবু। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি। কেন দেখি কে জানে। এক-একসময় মনে পড়ে, এই ছোঁড়ার মাথায় পাকা চুল দেখেই না ওর ঠাকুমা কাঁপতে কাঁপতে আর্তনাদ করে উঠেছিল, প্রভুজী এলো!"

... ...

সামনে কালো নোটবই পড়ে আছে। জ্যোতিরাণী নিস্পন্দের মত বসে। কোনো যোগ নেই আর, অগোচরের কি একটা অস্বস্তি ভেতরে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। গোড়ার লেখাটা মনে পড়ছে থেকে থেকে। শকুনি-স্তুতি। আরো বার দুই পড়েছেন ওটা তিনি। শকুনির অট্টহাসির জায়গাটায় এলে প্রত্যেকবার থমকেছেন। অস্বস্তি বেড়েছে। থেকে থেকে মনে হয়েছে, অট্টহাসি না হোক অমনি একটা সর্বধ্বংসী নিঃশব্দ হাসি যেন ছড়িয়ে আছে কালীদার লেখা এই কালো খাতাটার পাতায় পাতায়।

মাসী!

হাঁপাতে হাঁপাতে শমী ঘরে ঢুকল। নীচের কম্পাউণ্ডে মেয়েদের সঙ্গে খেলছিল, ছুটে এসেছে। চৌদ্দ বছর বয়েস আন্দাজে, এখনো একটু মোটার দিক ঘেঁষা, তাই হাঁপ ধরেছে।

মাসী, আজও সিতুদা গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আজ আবার ট্যাক্সি চেপে এসেছিল। আজ কিন্তু আমি ভয় পাইনি, ও-রকম গম্ভীর মুখ করে গেটের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও খেলার দানটা শেষ হলেই ঠিক গেটের সামনে যাব ভেবেছিলাম। তার আগেই ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেল—

ছত্রিশ

শমী আগেও লক্ষ্য করেছে, সিতুদার এ-রকম হঠাৎ আসা আর কারো সঙ্গে দেখা না করে কথা না বলে চলে যাওয়ার খবর শুনলে মাসীর মুখখানা কি রকম হয়ে যায়। দিনকয়েক আগেও এই কাণ্ড হয়েছিল। সেই সকালেই মাসীর মুখে সিতুদার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভালো খবরই শুনেছিল। শুনে শমী খুব যে খুশি হয়েছিল তা নয়। কারণ পরীক্ষার ফল নিয়ে তারও আজকাল মাথা ঘামাতে হচ্ছে। মাসী যেভাবে লেগে থাকে, কোনো বিষয়ে খারাপ করে পার পাবার উপায় নেই। খারাপ হোক না হোক খারাপ হবার ভয় লেগেই থাকে। সেদিন সকালে খুব মন দিয়ে মাসী স্কুল ফাইন্যালের রিপোর্ট দেখছিল। শমীর ধারণা, স্কুলের মেয়েরা কে কেমন করল তাই দেখছে। রিপোর্ট দেখা শেষ করে মাসী বলল, তোর সিতুদা ভালো পাস করেছে,

স্টার পেয়েছে দেখছি।

সিতুদা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে সেটা শমীর আর স্মরণের মধ্যে ছিল না। একে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তায় মুখ ফুটে মাসীকে সিতুদার কথা কখনো বলতে শোনেনি। গোড়ায় গোড়ায় সিতুদার সম্পর্কে এটা-সেটা বরং সে-ই জিজ্ঞাসা করত। আর মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবত, যত দুষ্টুই হোক, নিজের ছেলেকে মাসী এভাবে ভুলে গেল কি করে। আর এই কারণে মাসীকে একটু ভয়ও করতে শুরু করেছিল, পাছে নিজের পরীক্ষার ফল-টল খারাপ হলে তার ওপরেও বিগড়ে যায়। বাইরে যত নরম-সরমই দেখুক, ভিতরে ভিতরে তাঁকে কড়া ভাবার অনেক নজির দেখেছে। অত বড় বাড়ি, অমন গাড়ি, অত টাকা-পয়সার মায়া, কেউ এভাবে ছেড়ে আসতে পারে—এ তার কাছে এখনো এক প্রচণ্ড বিস্ময়।

সিতুদাব ব্যাপারে মাসীর চাপা আগ্রহ শমী সেইদিনই শুধু টের পেয়েছিল। আর সেদিনই সিতুদা স্কুল গেটে এসে হাজির। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়নি তখনো। কি একটা ব্যাপারে স্কুল ছুটি। মাসীর চোখে ধুলো দিয়ে শমী নিচে নেমে এসেছিল। বোর্ডিং-এর আরো গোটাকতক মেয়ে এদিক-সেদিক ঘুরছে শমীকে বোর্ডিং-এর প্রায় পুরানো বাসিন্দাই বলা চলে এখন। আড়াই বছর ধরে এখানে মাসীর কাছে আছে। তাই অদূরের ওই অত বড় গেটটা আব ভালো লাগে না এখন। ফাঁক পেলে ওব বাইরে পা দেবার জন্য ভেতর উস্‌খুস করে। কিন্তু সেদিন ওই গেটের ভেতর দিয়ে চোখ চালাতেই পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছল। গেটের ওধারে সিতুদা দাঁড়িয়ে। গম্ভীর মুখে এদিকেই চেয়ে আছে।

আনন্দের ঝোঁকে তাবপর কয়েক পা এগিয়ে গেছল শমী। কিন্তু তারপব সভয়ে দাঁড়িয়ে গেছল আবারও। এগিয়ে এসে সিতুদা গেটের গরাদ ধবে দাঁড়িয়েছিল। আর তার মুখের দিকে চেয়ে শমীর বেশ ভয় ধরেছিল। একবারও মনে হয়নি পরীক্ষা-পাসের ভালো খবব নিয়ে এসেছে। এতদিন পরে ওকে দেখে একটুও হাসেনি। আর এমন করে তাকাচ্ছিল যে শমীর কাছে আসার সাহস উবে গেছে। তার কেবল মনে হয়েছে মাসীকে ও একলা দখল করে বসে আছে সিতুদার চোখে-মুখে সেই রাগ ঠিকরে বেরুচ্ছে। তাকে হাতের কাছে পেলে গণ্ডগোলের ব্যাপার হতে পারে। চৌদ্দ বছর হল শমীর, ওখানে যে দাঁড়িয়ে আছে নাগালের মধ্যে পেলে তাকে সে খাতির করবে বলে মনে হল না।

সে এগোচ্ছে না বলে সিতুদা হাত তুলে তাকে কাছে ডেকেও ছিল। আর তক্ষুনি খুব মুশকিলে পড়ে গেছল শমী। কিন্তু ইতিমধ্যে ওধার থেকে মালীর তাড়া খেয়ে সিতুদা আস্তে আস্তে গেট ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছে। আক্রোশভরে মালীটাকে দেখেছে, তারপর তাকে দেখেছে, তারপর চলে গেছে।

শমী সেদিনও মাসীর কাছে ছুটে এসেছিল, খবর দিয়েছিল। মাসীর আগ্রহ শমীর চোখে খুব স্পষ্ট করে ধরা পড়েছিল। মাসী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায়? ডাকলি না কেন? চলে গেল?

শমী বলেছিল, ডাকব কি করে, যে মুখ করে তাকাচ্ছিল হাতের কাছে পেলে আমাকে ধরে ঠিক মারত—

বিরক্তির সুরেই মাসী সেদিন বলেছিল, তোকে শুধুমুদু মারতে যাবে কেন?

কিন্তু আজ আবার তার আসার খবর শুনে মাসী একটা কথাও বলল না। শমীর কেবলই মনে হল খবরটা শোনার পর কি রকম যেন হয়ে গেল মাসীর মুখখানা।

শমী কাছে কাছে ঘুরঘুর করল খানিক। বার দুই নীচ-ওপর করে এলো। তারপরেও মাসীকে একভাবে বসা দেখল। শেষে ভয়ে ভয়ে বলেই ফেলল, আজ কাকুর ওখানে যাবে বলেছিলে...যাবে না?

আত্মস্থ হতে চেষ্টা করলেন জ্যোতিরাণী। কালীদার নোটবই পড়ার ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তার ওপর এই দিনেই ছেলের আসার আর ট্যাক্সি করে চলে যাওয়ার খবর শুনে ভিতরের কি এক অজ্ঞাত অস্থিরতা আরো বেড়েছিল। আজ আর মুখ ফুটে বলতে পারেননি, ডাকলি না কেন। তিন বছর আগের বিচ্ছেদ গত তিন দিন আগে সুসম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তফাতটা জ্যোতিরাণী এখন অনুভব কবতে পারেন। ছেলে এত বড় খবরটা জানে না মনে হল না। উল্টে জেনেই এসেছিল মনে হল।

শমীর কথা কানে আসতে নিজেকে গোটাতে চেষ্টা করলেন আবার। বেরুবার আগ্রহ একটুও নেই। থাকেও না বড়। তবু বেরুতে হয়। যে বাস্তবেব মধ্যে এসে পড়েছেন তার মুখোমুখি না দাঁড়ালেও অব্যাহতি নেই। যাবেন বলে না গেলে বিভাস দত্ত রাগ করেন না, অসুস্থ শরীর অভিমান নিয়ে বসে থাকেন। এড়াতে চেষ্টা করলেই বরং গণ্ডগোল বাড়ে দেখেছেন। আজ বছর আড়াই হল, বাড়ি ছেড়ে দু ঘরের একটা আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছেন তিনিও। বাড়িতে একসঙ্গে থাকা পোষালো না নাকি। সেই সমস্যার মুখেই জ্যোতিরাণী শমীকে চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন। আপত্তি করা দূরে থাক, বিভাস দত্ত উল্টে বরং খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, একটা দুর্ভাবনা গেল।

কিন্তু জ্যোতিরাণীর দুর্ভাবনা বেড়েছিল। পোষালো না বলে এতকালের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে আসাটা খুব সাদা মনে নিতে পারেননি তিনি। শরীর তখন থেকেই ভালো যাচ্ছিল না ভদ্রলোকের, তবু বাড়িতে থাকা নাকি আর চলেই না বলেছিলেন। বলেছিলেন শমীকে নিয়ে সমস্যায না পড়লে ও-বাড়ি আরো অনেক আগেই ছাডতেন। কিন্তু মুখের কথা আর মনের কথা এক ভাবার দিন গেছে জ্যোতিরাণীর। তাই সদা সংশয়। নিজে তিনি বাড়ি ছেড়ে আসার পর প্রথম ছমাসের মধ্যে একদিনও আর বিভাস দত্তর পৈতৃক বাড়িতে যাননি। শমীর রাগ-অভিমান বায়না সত্ত্বেও না। তারপর বিভাস দত্ত বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাট নিলেন। তখন আর না গিয়ে উপায় ছিল না। মাঝে শমী আছে, কৃতজ্ঞতার ব্যাপারও আছে কিছু। আর, বিভাস দত্তর এখানে এই মেয়েদের হোস্টেলে ঘন ঘন আসা বন্ধ করার তাগিদও আছে।

পরের দু-আড়াই বছরে ভদ্রলোকের শরীর আরো বেশি ভেঙেছে। ভেঙেছে সত্যিই। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। অসুখটা কি বার করতে জ্যোতিরাণীর সময় লেগেছিল। মুখ ফুটে সহজে বলতে চাননি। ডায়বেটিস। এরই ওপর খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম। জ্যোতিরাণীর মনে মনে ধারণা অসুখটাকে ভদ্রলোক প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ওটা তাঁর দুর্বলতার দিকও বটে, আবার জোরের দিকেও বটে। রবিবার বা ছুটির দিনের প্রত্যাশার জবাবে শমীকে সঙ্গে করে তাঁকে যেতে হয়, বসতে হয়, কথাবার্তা কইতে হয়। তাঁর এই ফ্ল্যাটে টেলিফোন নেই যে না এসেও কর্তব্য সারা যেতে পারে। টেলিফোনের কথা জ্যোতিরাণী বলেও ছিলেন। একা মানুষ, অসুখ লেগে আছে, টেলিফোন একটা থাকা

দরকার। বিভাস দত্ত বলেন, লাইন ট্রান্সফারের অনেক ঝামেলা আজকাল, চাইলেই মেলে না। তাছাড়া ওটা থাকলেই বড় উত্ত্যক্ত করে সব—নেই এই বেশ আছেন। কতটা সত্যি জ্যোতিরাণী জানেন না। আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকার ফলে খরচ অনেক বেড়েছে, ফোন সম্পর্কে নিস্পৃহ হওয়ার সেটাও একটা কারণ হতে পারে।

শমী হ্যাঁ শুনবে কি না, সেই অপেক্ষায় আছে। বললেন, যাবো, তুই তৈরি হয়ে নে। মুখ-হাত ধুয়ে নে, চান করবি নে।

শমী ছুটল। তারপরেই জ্যোতিরাণী অন্যমনস্ক আবার।...ছেলে আজও এসেছিল। আজও এসে চলে গেছে।

গত তিন বছরের মধ্যে মাত্র দুটিবার চোখে দেখেছেন তাকে। সেই দেখার দাগ থেকেই গেছে। প্রথম দেখা বাড়ি ছেড়ে আসার দিনকতকের মধ্যে। বীথির কাছে থাকার ইচ্ছে নিয়ে তিনি আসেননি। পরদিনই জায়গা খুঁজতে আরম্ভ করেছিলেন! বীথি অসহায়, ছাড়তে মন চায় না, আবার থাকতেই বা বলে কি করে। উল্টে জায়গা খোঁজার কাজে মুখ বুঁজে সহায় না হয়ে পারেনি। আন্দাজে ঘোরাই সার হচ্ছিল কেবল। এই বাস্তবে দুজনে কেউ কোন দিন পা দেয়নি, জানবে কি করে কোথায় কি আছে। অনেকক্ষণ দিশেহারার মত ঘোরাঘুরির পর একটা ছোট রেস্তরাঁ. ঢুকেছিলেন চা খেতে। সেখানকার একটা ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করতে সে একটা আস্তানার হদিস দিয়েছিল।

বড় রাস্তা থেকে দূরে নোংরা গলির মধ্যে একটা বাড়ি। স্বল্প আয়ের মেয়েরা থাকে সেখানে। স্কুল মাস্টার, হাসপাতালের নার্স, টেলিফোন অপারেটার, গানের শিক্ষয়িত্রী—এঁরা পদস্থ বাসিন্দা সেখানকাব। একতলায় ধাত্রী ঝিয়েব পর্যায়েব বাসিন্দাও আছে। পরে জেনেছেন কিছু করে না এমন মেয়েছেলেও আছে সেখানে। খাওয়া-থাকার মাশুল যোগায় কি করে সেটা বুঝতে সময় লেগেছিল। দু-চারজন মাত্র এক-একখানা ঘর নিয়ে আছে, বেশির ভাগ ঘরেই তিন-চারটে করে মেয়ে। জ্যোতিরাণীও আলাদা একটা ঘরই নিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ ঘর নেওয়াটা কারো বিস্ময় কারো বা কৌতূহলের কারণ হয়েছিল। তারা প্রথম হতবুদ্ধি এই চেহারার একজন এখানে থাকতে চায় শুনে। পরের বিস্ময়, এখানে থেকে চাকরি খুঁজে নেবাব আশা, অথচ আলাদা একটা ঘরের মাশুল গুনতে প্রস্তুত শুনে। ঘর দেবার মালিক যে, সে আগাম এক মাসের খাওয়া-থাকার নগদ-মূল্য হাতে না নিয়ে কথা কয়নি।

সে-ঘর দেখে শুধু বীথির বুকেই মোচড় পড়েছে! বলেছিল, দিদি, সত্যিই এখানে আপনি থাকবেন কি করে?

ঘর পেয়ে জ্যোতিরাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তখনকার মত। চুপচাপ কয়েক মুহূর্ত দেখেছিলেন বীথিকে। তারপর ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি একাই থাকব বলছ?

প্রশ্নটা বীথির মাথায় ঢোকেনি, অবাক মুখে জিজ্ঞাসা করেছে, আর কে থাকবে?

জ্যোতিরাণী পুনরুক্তি করেননি, শুধু চেয়েছিলেন মুখের দিকে। অপেক্ষা করেছিলেন। বীথি বুঝেছে। হঠাৎ-খুশির ঢেউ লেগেছে বুকের তলায়। চোখে মুখে সেটা উপচে ওঠার আগেই মিলিয়েছে আবার। আমন্ত্রণের এই লোভ নাকচ করার জন্য যুঝতে হয়েছে খানিক। ফলে ফ্যাকাশে বিবর্ণ দেখিয়েছে মুখখানা। আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে। বলেছে, তা আর হবে না দিদি। বীথি আবারও হারাবে...কথা দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

জ্যোতিরাণীর চাউনি তীক্ষ্ণ ধারালো হয়ে উঠেছিল। মুখে বিতৃষ্ণা জমাট বাঁধছিল। সাদা কথায় ভোগের প্রতিশ্রুতির মধ্যেই ফিরে যাবে ও। সেই চাউনি আর বিতৃষ্ণা বীথিকে আরো বেশি আঘাত করেছিল বোধ হয়। আস্তে আস্তে অনেক কথা বলেছিল সে। বলেছিল, আমি আপনার কাছে মিত্রাদির বিচার চেয়েছিলাম। আমার যা গেছে তা আর ফিরবে না।...বিশ্বাসঘাতকতা আমার সঙ্গে আর একজনের করার কথা ছিল। বিদেশে সে বিশ্বাসঘাতকতার চেহারা আমি দেখেছি। হাড়জমানো শীতে, হিমে, মাঝরাতেও অলিতে-গলিতে তারা দাঁড়িয়ে থাকে, বাঁচার চেষ্টায় দু চোখ দিয়ে কেমন করে মানুষ টানতে চায় দেখলে আপনার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। সে-রকম পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, একজন ইউ পি'র, একজন করাচীর, একজন সীলোনের আর দুজন ইন্দোনেশিয়ার। সীলোনের মেয়েটা বলেছিল, তারা তিনজন ছিল, দুজন মরে গেছে। ওই দেশেরও এ-রকম কত আছে ঠিক নেই। মিত্রাদি আমাকে এই বিশ্বাসঘাতকতার মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু এ লোকটা তা করেনি। উল্টে আমাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরতে আপত্তি ছিল পাছে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি। আমি তাকে আজও ঘৃণা করি, কিন্তু মিত্রাদির থেকে বেশি শ্রদ্ধা করি। আপনার কাছে ফেরার ভাগ্য যদি হয় কোনদিন, বলে আসব, পালিয়ে আসব না।

জীবন নিয়ে এই বিচার জ্যোতিরাণীর বুঝতে পারার কথা নয়। সে চেষ্টাও আর করেননি। বিতৃষ্ণা আর ছিল না। ওর মুখের দিকে চেয়ে সত্তার ক্ষতটাই শুধু অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন।

নতুন বাসস্থানে আসার দ্বিতীয় দিনে কালীদা এসে হাজির। জ্যোতিরাণী অবাক। এখানে আছেন সেই হদিস পেলেন কি করে। বীথির কাছ থেকে নিশ্চয়। কিন্তু বীথির নাগালও তাঁর পাবার কথা নয়। সেই রকমই কৌতুক-ঠাসা গম্ভীর মুখ কালীদার। দুনিয়া একভাবেই চলছে বোঝানোর চেষ্টা। বললেন, ড্রাইভারটার দোষ নেই, যে রাতে তুমি চলে এলে সেই সন্ধ্যায় ঘন্টাখানেক ধরে বীথির সঙ্গে তুমি কোন্ হোটেলে বসে গল্প করেছিলে জিজ্ঞাসা করলে সেটা আর না বলে পারে কি করে। আর তুমি আবার ঘরে ফিরবে সেই আশায় বীথিও শেষ পর্যন্ত ঠিকানাটা না দিয়ে পারেনি।

আধ ঘন্টা ছিলেন কালীদা। যেন গল্প করতে এসেছিলেন, গল্প করে চলে গেলেন। যাবার আগে শুধু বলেছিলেন, যে জায়গায় এসে উঠেছ রাগ পড়তে সময় লাগবে মনে হচ্ছে।

জবাবে জ্যোতিরাণী বলেছিলেন, পারেন তো একটা কাজ দেখে দিন, এখানে থাকার ইচ্ছা নেই।

চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে কালীনাথ উঠে গেছেন। তার মনে হয়েছে, আপসে আপসে বছর দুই যে মেয়েটা ঝিমিয়ে পড়েছিল, তার মধ্যে নতুন করে স্ফুলিঙ্গ দেখছেন আবার।

তার পরদিন এসেছেন বিভাস দত্ত। তাঁকে দেখা মাত্র কালীদার ওপর যথার্থ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন জ্যোতিরাণী। কালীদা সত্যিই মজা দেখছেন কিনা ঠাওর করে উঠতে পারেননি। কথা তাঁর সঙ্গেও বেশি হয়নি। চুপচাপ বসে থেকে এই দুর্যোগের ভাগ নিতে চেয়েছেন যেন। শেষে বলেছেন, এভাবে তো থাকা যায় না, কি করবেন এখন?

এই সহানুভূতির ওপর জ্যোতিরাণীর সেদিন অন্তত বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তাঁর

তির্যক দৃষ্টি ঘুরে ফিরে ভদ্রলোকের মুখের ওপর এসে পড়েছিল। যা ঘটে গেছে তার ফলে খুশি মাত্র একজনেরই হওয়া সম্ভব। এই একজনের। জবাব দিয়েছিলেন, দেখা যাক। আপাতত খবরের কাগজ দেখে কয়েকটা চাকরির দরখাস্ত করছি। সব কটাই কলকাতাব বাইরে।

চিন্তিত মুখে বিভাস দত্ত মন্তব্য করেছিলেন, দরখাস্ত করে কবে চাকরি হবে সে আশায় বসে থাকা...ওতে সহজে হয় না।

তাহলে কি করতে বলেন?

প্রশ্নটা নিজের কানেই ঝাঁজালো ঠেকেছিল জ্যোতিরাণীর। কিন্তু বিভাস দত্ত কিছু মনে করেননি, ওটুকু সমস্যাজনিত অসহিষ্ণুতা ধরে নিয়েছিলেন হয়ত।

বাড়ি ছাড়ার ঠিক তের দিনের দিন অ্যাটর্নীর কড়া নোটিস পেয়েছেন জ্যোতিরাণী। অ্যাটর্নী কালীনাথ। তাঁর সম্মানী ক্লায়েন্ট শিবেশ্বর চ্যাটার্জীর নির্দেশমত তাঁকে জানানো হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের সুনাম ব্যাহত করে আর গৃহ-শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়ে তিনি যে ইচ্ছে মত বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস করছেন, সম্মানী ক্লায়েন্টেব পক্ষে তা বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। এই নোটিস হস্তগত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে তিনি যদি শান্তিমত গৃহে বসবাস করার জন্যে স্বেচ্ছায় ফিরে না আসেন তাহলে স্বামীর অধিকারে সম্মানী ক্লায়েন্ট আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁকে ফেরবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন। সম্মানী ক্লায়েন্ট আশা করছেন, এই অপ্রীতিকর ব্যবস্থায় অগ্রসর হবার আগে জ্যোতিরাণী চ্যাটার্জি উক্ত সময়ের মধ্যে তাঁর স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন।

জ্যোতিরাণীব প্রতিক্রিয়া যা হয়েছিল সেটা কালীনাথ ঘোষালের নাম সই দেখে। কালীদা আর অ্যাটর্নী কালীনাথকে আলাদা করে দেখতে অভ্যস্ত নন বলেই। টাকা যার আছে তার উকিলের অভাব নেই—এ কাজ কালীদা নিজের হাতে না করলেও পারতেন। জ্যোতিরাণীর সেই রূপ আর সেই সঙ্কল্প এখন। সেই আঠারো-উনিশের রূপ আর সঙ্কল্প। যে রূপ আর যে সঙ্কল্প নিয়ে অনমিত বলে একনজরে বিকৃত স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে যুঝেছিলেন, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নিজেকে উদ্ধাব করেছিলেন, আপন সত্তার ওপর ভর করে নিজের দু পায়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফিবে আবার আপসের রাস্তায় হাঁটার চিন্তা আগেও মনে ঠাঁই দেননি। কিন্তু অপমানকর পত্রাঘাতের ফলেই রুখে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও দ্বিগুণ হয়ে উঠল বুঝি।

বিকেল পর্যন্ত ভাবলেন। চারটের আগেই বেরিয়ে পড়লেন। একটা টেলিফোন করার জন্যে বাইরে বেরুতে হয়, অনভ্যাসের ফলে সেটাও কম বিরক্তিকর নয়। মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা দোকান থেকে টেলিফোন করার সুযোগ পেলেন। অফিসে কালীদাকে ধরলেন। বললেন, আমি জ্যোতি, অফিস-ফেরত একবার আসতে হবে।

ওধারে কালীদার গলার সুরে দুশ্চিন্তা, কি ব্যাপার, খুব জরুরী?

হ্যাঁ।

অফিস-ফেরত যেতে বলছ, খাওয়াবে তো?

না। খেয়ে আসবেন।

খেয়ে এসেছিলেন কিনা জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করেননি। নবাগত বেকার কিন্তু পরম রূপসী বাসিন্দার ঘরে মাঝে মাঝে পুরুষেব পদার্পণ দেখে অন্য মেয়েদের বক্র কৌতূহল বাড়ছে, জ্যোতিরাণী তাও অনুভব করছিলেন। কালীদা আসতে অনেকে উঁকিঝুঁকি দিল।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রেজিস্ট্রি নোটিসটা হাতে নিয়ে কালীদার সামনে বসলেন। —এটা আজ পেলাম।

ও। কালীনাথ যথাসম্ভব নির্লিপ্ত।

এটা পাঠাতে রাজী না হলে আপনার চাকরি যেত?

ছদ্ম বিস্ময়ে দু চোখ কপালে তুলতে চেষ্টা করলেন কালীনাথ, আমি আবার কে? ও তো পাঠিয়েছে শিবেশ্বর চ্যাটার্জির অ্যাটর্নী!

সমস্ত মুখ ছেড়ে জ্যোতিরাণীর দৃষ্টিটাও গনগনে। অপেক্ষা করলেন একটু।—আমি এরপর শিবেশ্বর চ্যাটার্জির অ্যাটর্নীর সঙ্গে কথা বলব, না দাদার সঙ্গে?

কালীনাথ এবারে হাসলেন মুখ টিপে। জবাব দিলেন, বিপক্ষের অ্যাটর্নীকে ডাকলেই সে ছুটে আসে না।

অর্থাৎ দাদার সঙ্গেই কথা বলছেন জ্যোতিরাণী। এই জবাবই চেয়েছেন। এই জবাবই বিশ্বাস করতে চেয়েছেন।—আমি এখন কি করব?

একটুও না ভেবে কালীনাথ তক্ষুনি জবাব দিলেন, আমি ট্যাক্সি ডাকি আর তুমি ফেরার জন্য রেডি হও, আমার মতে ওটাই সব থেকে সোজা কাজ।

অনুচ্চ কঠিন সুরে জ্যোতিরাণী বললেন, অত সোজা কাজ করার ইচ্ছে নেই।

তাহলে তুমিও এক পাল্টা হুমকি দাও।

কিছু যদি না করি?

তাহলে শিবু তো কেস করবে বলে শাসিয়েছে। কেসে হারলে যেতে হবে।

না গেলে?

যাতে যাও, কোর্ট সেই চেষ্টাই করবে।

জ্যোতিরাণী তেতে উঠলেন, কি চেষ্টা করবে, ঘাড়ে করে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে?

কালীনাথ হেসে চুপচাপ চিন্তা করলেন একটু।—জুডিসিয়াল সেপারেশন কি ব্যাপার? এই প্রশ্নটার জন্যও বিভাস দত্তর কাছেই কৃতজ্ঞ তিনি। তার কোন্ বইয়ে পড়েছিলেন হিন্দু বিয়েতে তখনো ডাইভোর্স নেই, কোর্টে নায়ক-নায়িকাদের জুডিসিয়াল সেপারেশনের কেস্ উঠেছে।

কালীনাথের হাসিমুখে বক্র আঁচড় পড়তে লাগল। দৃষ্টিও বদলাল একটু। জবাবে সেটা প্রকাশ পেল না।—শব্দ দুটোর অর্থ যা তাই ব্যাপার, আইনের আশ্রয় নিয়ে পৃথক থাকা। কিন্তু এ আবার তোমার মাথায় কে ঢোকালে?

কেউ না। জুডিসিয়াল সেপারেশন পেতে হলে আমাকে কি করতে হবে?

কোর্টে স্যুট ফাইল করতে হবে। মুখ গাম্ভীর্যের আবরণে ঢাকলেন কালীনাথ।—শিবু ঢিল ছুঁড়েছে, বদলে পাটকেল না ছুঁড়ে তুমি একেবারে বন্দুক ছুঁড়বে?

আপনি সেই ব্যবস্থা করে দিন।

কালীনাথ ফাঁপরে পড়লেন যেন।—আমি এ পক্ষের অ্যাটর্নী আর ব্যবস্থা করব বিপক্ষের হয়ে?

খুব ঠাণ্ডা গলায় জ্যোতিরাণী জবাব দিলেন, একটু আগে আপনি বলেছেন, আমি কারো অ্যাটর্নীর সঙ্গে কথা বলছি না। যাকে ভার দেওয়া দরকার আপনি দিন, আর কি করতে হবে তাও তাকে বুঝিয়ে দেবেন।

কালীনাথ চুপ খানিক। তারপর বললেন, অত তাড়াহুড়ো করার দরকার কি, দিনকয়েক ভেবে নাও না।

ভাবা হয়েছে। যদি সম্ভব হয় কালই আপনি কেস্ ফাইল করার ব্যবস্থা করুন।...

পরদিন না হোক, তিন দিনের মধ্যে কেস্ ফাইল করা হয়েছিল। কাগজপত্র রেডি করে জ্যোতিরাণীর উকিলসহ কালীনাথ আবার এসেছেন। বিচ্ছেদ প্রার্থনার অনুকূলে শিবেশ্বর চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে, তাতে মৈত্রেয়ী চন্দর অথবা অন্য কোনো মেয়েছেলের নাম নেই বটে, তবু পড়তে পড়তে জ্যোতিরাণীর কান-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সইটা করে দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছেন যেন তিনি।

এর দুদিন বাদে বিভাস দত্ত আবার এসেছেন। এসেই বলেছেন, শরীরটা ভালো ছিল না বলে এ কদিন খবর নিতে পারেননি। জ্যোতিরাণী আগের দিনও খুশী হতে পারেননি, এই দিনেও না। এখানে ঘন ঘন খবর নিতে এলে সেটা অসুবিধের কারণ হতে পারে ফাঁক পেলে এই আভাসও দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাঁর আসার উদ্দেশ্য শুনে অপ্রস্তুত একটু। একটা স্কুলে তাঁর চাকরির ব্যাপারে কথাবার্তা হয়ে গেছে। ভালো স্কুল। জ্যোতিরাণীর আপত্তি না হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেখানে গিয়ে দেখা করতে হবে।

জ্যোতিরাণী তখনো আশা করতে পারেননি। তবু ভদ্রলোকের সুতৎপর চেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করতে চেষ্টা করেছেন। গেছেনও। বিভাস দত্তই সঙ্গে করে এই স্কুলে নিয়ে এসেছেন। হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আর, দু-চার কথার পর জ্যোতিরাণীর চাকরি হয়েছে। হবে যে, সেটা যেন স্থির হয়েই ছিল। হেডমিস্ট্রেস তাঁকে কি কি বিষয় পড়াতে হবে জানালেন, অনার্স গ্রাজুয়েট শিক্ষয়িত্রীর মাইনে কত জানালেন, আর পরদিনই তাঁকে কাজে জয়েন করতে বললেন। ব্যস, আর কিছু না।

হেডমিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলে স্কুল-বোর্ডিং-এ তাঁর থাকার ব্যবস্থাও বিভাস দত্তই করেছেন। তাতেও আপত্তি ওঠেনি। হেডমিস্ট্রেস শুধু জানিয়েছেন, আলাদা একটা ঘরের ব্যবস্থা করতে দিনকতক সময় লাগবে।

বাইরে এসে বিভাস দত্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যাক্, কিছুটা নিশ্চিন্ত তো?

তখনকার মত কৃতজ্ঞতাব অন্ত ছিল না জ্যোতিরাণীর। নিশ্চিন্ততার এই স্বাদ ভোলার নয়। অনেক হীনমন্যতা আর অনেক তিক্ত সম্ভাবনার থেকে নিশ্চিন্ত। দুদিন আগেও তাঁর নতুন ঘরে এই একজনের পদার্পণে মন বিরূপই হয়েছিল। সেই হেডমিস্ট্রেস যে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না, বা তাঁর ঘরবাড়ি নিয়ে দুটো মৌখিক আলাপসুলভ প্রশ্নও তুললেন না, সেটা স্বাভাবিক ঠেকেনি। ভদ্রলোক কতদূর কি জানিয়ে রেখেছেন জানেন না, কিন্তু যন্ত্রণার মত একটা বিড়ম্বনা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বলে কৃতজ্ঞ তিনি। একটু চুপ করে থেকে জবাব দিয়েছেন, আপনাকে কি আর বলব...।

খুশিমুখে বিভাস দত্ত তাড়াতাড়ি মাথা নেড়েছেন, বলে কাজ-নেই, উক্ত কথার থেকে অনুক্ত কথার সার বেশি।

যেখানে ছিলেন, দিনকতক আরো সেখানেই থাকতে হয়েছিল। সেখানকার প্রতিটি দিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বাড়ির গলি থেকে বেরিয়ে হাঁটাপথে বেশ খানিকটা পেরিয়ে

ট্রামে ওঠা পর্যন্ত আসতে যেতে পুরুষদের প্রতীক্ষারত বা অনুসরণরত লোভাতুর দৃষ্টির সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল। ওই একটা বাড়িতে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে অনেকগুলো মুখ সজাগ হতে দেখেছিলেন তিনি। এলাকাটা খুব ভালো না বুঝেছিলেন, বাড়িটাও না। বাড়ির যত কাছে এগোতেন তাতে যেন দম বন্ধ হয়ে আসত। তখন বিভাস দত্তকে দেখে যথার্থ খুশি হতেন তিনি, মনে বল পেতেন। আর স্কুলে আসতে আসতে রোজই আশা করতেন, হেডমিস্ট্রেস ডেকে বলবেন—তাঁর ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে।

...দুর্যোগের দিন সেটা। সেদিনটা শুধু নয়, পর পর কয়েকটা দিনই। তুচ্ছ কারণ থেকে কলকাতার শান্তি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, আগুন জ্বলে উঠল। বাহান্ন সালের কথা, প্রায় তিন বছব আগের কথা। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়ানো নিয়ে ইংরেজ মালিকানার ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে দেশের মানুষের তুমুল লেগে গেল। দেখতে দেখতে পবিস্থিতি চরমে গড়ালো। স্বাধীন দেশের শান্তিরক্ষকরা অস্ত্রহাতে তার মোকাবিলা করতে এলো। একদিকে ট্রাম জ্বলতে লাগল, সরকারী সম্পদ বিনষ্ট হতে লাগল। অন্যদিকে লাঠি চলল, টিয়ার গ্যাস ছুটল, বুলেট ছুটল। কাগজে তেরটি মৃত্যুর খবর বেরুলো আর তার কয়েকগুণ আহতের। শহর তখনকার মত মিলিটারীর দখলে ছেড়ে দেওয়া হল।

শহরের জীবন-যাত্রা স্তব্ধ। পথে জনমানব নেই। বিকেল তখন চারটে। অন্যমনস্কের মত জ্যোতিরাণী জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়ির পিছন দিকে বিশ-তিরিশ গজ দূরে ছাল তোলা উঠোনের মত ছোট্ট পার্ক একটা। সেদিকে চোখ পড়তে আচমকা বিষম এক ঝাঁকুনি খেলেন জ্যোতিরাণী। একটা বেঞ্চির গায়ে ঠেস দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে সিতু। চারিদিকের থমথমে নির্জনতার মধ্যে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। ঠিক দেখছেন কি ভুল দেখছেন, জ্যোতিরাণীর প্রায় সেই বিভ্রম। ঠিক যে দেখছেন সন্দেহ নেই। এই জানলার দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে আছে সিতু। দু হাত বগলে গোঁজা চৌদ্দ বছরের ছেলের দৃপ্ত ভঙ্গি।

আবারও একটা ঝাঁকুনি খেয়েই যেন সচেতন হলেন জ্যোতিরাণী। দুশ্চিন্তায় অস্থির, ব্যাকুল পরমুহূর্তে। এইদিনে বেরুলো কি করে? বাড়ি থেকে? কম করে আড়াই মাইল পথ, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি কিছুই নেই—এলো কি করে? ফিরবে কি করে? বন্দুক উঁচিয়ে রাস্তায় মিলিটারী টহল দিচ্ছে, কি বিপদ ঘটবে কে জানে!

বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়ছে, কি করবেন ভেবে না পেয়ে জ্যোতিরাণী জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ইশারায় ডাকলেন তাকে। ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে আসতে বললেন। সিতু তেমনি চেয়ে আছে, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোতিরাণী তক্ষুনি বুঝলেন ও আসবে না, বিপদ হতে পারে জেনেই ও এইদিনে এসেছে। বিপদের মধ্যে দাঁড়িয়ে অবাধ্য হবার জন্যেই এসেছে। বাড়ির লোকের ওপর এমন কি মেঘনার ওপর পর্যন্ত আগুন হয়ে উঠলেন জ্যোতিরাণী। এইদিনে তো কেউ বেরুতে পারেনি, ছেলেটা বাড়ি নেই—চোখে পড়ল না কারো! অসহিষ্ণু তাড়নায় প্রায় শাসনের মত করেই আরো জোর হাত নেড়ে চলে আসতে ইশারা করলেন তাকে।

আর একটু সময় পেলে জ্যোতিরাণী হয়ত বেরিয়েই ছুটে যেতেন। দুই গালে দুই চড় বসিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসতেন। কিন্তু সিতু সে সুযোগ দিল না। বগল থেকে হাত নামাল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে পার্ক পেরিয়ে ফিরে চলল।

জ্যোতিরাণী নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে এখানকার ঠাকুরকে এক টাকা বখশিশ দিয়ে বাইরে থেকে বাড়িতে কালীদার ঘরে ফোন করিয়েছেন। সিতু ফিরেছে। কিন্তু এই খবর পাওয়ার পরেও সমস্ত রাত ঘুমুতে পারেননি জ্যোতিরাণী।

বোর্ডিং-এ যাওয়ার আগের সন্ধ্যায় গৌরবিমলকে সঙ্গে করে কালীনাথ এসেছিলেন। এসেই বলেছেন, মামুর আর ফুরসতই হয় না, আজ ধরে নিয়ে এলাম।

ফুরসত না হওয়ার কারণ জ্যোতিরাণী অনুমান করতে পারেন। এখনো ধরে নিয়ে আসতে হয়েছে শুনে খুব খুশি হতে পারলেন না। অথচ বাড়ির থেকে বেরুবার পর কিভাবে দিন চলতে পারে ভেবে না পেয়ে এই একজনের কথাই সবার আগে মনে হয়েছিল তাঁর। বিভাস দত্ত ইতিমধ্যে চাকরির ব্যবস্থা না করে দিলে আলোচনার জন্য হয়ত তাঁকেই একবার আসতে অনুরোধ করতেন।

ভিতরে ভিতরে বিরূপ কিনা বা কতখানি বিরূপ গৌরবিমলের মুখে তা প্রকাশ পেল না। হেসেই বললেন, সময় পেলাম কোথায়, প্রভুজী ধাম গোটানোর তাড়ায় তো অস্থির করে মেরেছিল এ কদিন। জ্যোতিরাণীর দিকে তাকালেন।—পারলে ওখানকার মেয়েগুলোকে সুদ্ধই তালা আটকে চলে আসে, আর রোজই শাসায় দেরি হলে খরচা বন্ধ করে দেবে।

জ্যোতিরাণী সঙ্কোচ ভুলে উৎসুক হয়ে উঠলেন। কম মেয়ে নেই সেখানে, আশ্রয়চ্যুত হয়ে তারা কি করতে পারে ভেবে পেলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, সব চলে গেছে?

কালীনাথ জবাব দিলেন, প্রভুজী ধামের পরমায়ু শেষ জেনে প্রাণের দায়ে অনেকে নিজেরাই সরেছে। জনা-কতকের সদগতি মামু করেছে। আর যে কজন আছে, তারা যদি এ মাসের মধ্যে না যায় তো মামুর কাঁধে ঝুলিয়েই বিদেয় করব।

জ্যোতিরাণীর মুখে কথা সরল না। যেতে যারা পারছে না জোর করে আর তাড়াহুড়ো করে তাদের তাড়ানো দরকার কি, এ কথাও মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। কত ধকল কত যত্ন কত দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়ে একটা জিনিস গড়ে উঠেছিল, কিন্তু ভাঙতে সময় লাগল না। ভিতে টান পড়েছে, আর সবই হুড়মুড় করে ভেঙেছে।

প্রভুজী-প্রসঙ্গ সাঙ্গ করে দিলেন কালীনাথ। জ্যোতিরাণীর উদ্দেশে বললেন, তোমার ব্যাপার যথাসময়ে যথাস্থানে পেশ করা হয়েছে, মাননীয় ক্লায়েন্টের কাছে নোটিসও এসেছে কোর্ট থেকে। ক্লায়েন্ট এবারে কি করবেন তাঁর অ্যাটর্নীর কাছে সে নির্দেশ এখনো আসেনি। এলে যথাসময়ে তুমিও আবার কোর্টের নির্দেশ পাবে।

কথা কটা কালীদা জলভাতের মত সহজ করে বললেও কানের কাছটা গরম ঠেকেছে জ্যোতিরাণীর। মামাশ্বশুরও সবই জানেন সন্দেহ নেই, তবু তাঁর সামনে এ আলোচনা উঠুক, চাননি। কোর্টের নির্দেশ এলে ঠিকানায় পাবেন না জানানো দরকার। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল থেকে আমি আর এখানে থাকছি না।

স্কুলের চাকরির খবর জ্যোতিরাণী কালীদাকে বলেননি। মাঝে দেখা হলে বলতেন হয়ত। দেখা হয়নি। কিন্তু খবর কালীদা রাখেন দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, স্কুল-বোর্ডিং-এ ঘরের ব্যবস্থা হয়ে গেছে? ঠিকানাটা দাও তাহলে, তোমার কাগজপত্রে তো এখানকার ঠিকানা লেখা হয়ে আছে।

বিভাস দত্তর সঙ্গে কালীদার দেখা এবং কথা হয়েছে বোঝা গেল। হওয়াটা

অস্বাভাবিক নয়, তবু জ্যোতিরাণীর মনে হল এই দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ আগে কমই হত। ঠিকানা লেখার জন্য কাগজ-কলম নিলেন। কালীদা মামাশ্বশুরের দিকে ফিরলেন, জ্যোতি কোন্ একটা স্কুলে কাজ নিয়েছে তোমাকে বলেছিলাম?

গৌরবিমল মাথা নাড়লেন। বলা হয়েছে। জ্যোতিরাণীর ঠিকানা লেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে থাকার ব্যবস্থা-ট্যবস্থা ভালো?

জ্যোতিরাণী ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, এখান থেকে ভালো।

গৌরবিমল চিন্তাচ্ছন্ন একটু। কিছু বলার ইচ্ছে। বললেন, ছেলেটার মুখ চেয়েও বাড়ি ফেরা চলে না?

আর কেউ প্রস্তাব তুললে বিরক্তি ছেড়ে বিতৃষ্ণার কারণ হত। যিনি বললেন তাঁর মনের গভীরতা জানেন বলেই চুপ একটু।...দুর্যোগের দিনে ছেলের পার্কে এসে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা মনে লেগে আছে। চৌদ্দ বছরের ছেলের সেই অবাধ্য বেপরোয়া মুখ ভোলার নয়। ঠাণ্ডা সংযত জবাব দিলেন, ছেলের মুখ চেয়ে কিছু যদি করতে চান, তাহলে আমাকে ফিরতে না বলে ওকে আমার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমি ফিরলে ওর মুখ চাওয়া হবে না। এরপর আরো ক্ষতি হবে।

গৌরবিমল বলতে যাচ্ছিলেন, মেয়েদের বোর্ডিং-এ ওই বয়সের ছেলে নিয়ে থাকতে দেবে না হয়ত। বললেন না। কারণ ছেলে এলে তাকে নিয়ে কোথায় থাকবে সেটা কোনো সমস্যা 'নয়। এই ব্যবস্থায় তার বাপকে রাজী করানো যাবে না জানা কথাই। গেলে গৌরবিমল সেই চেষ্টাও করে দেখতেন হয়ত।

এই আলোচনার মধ্যে কালীনাথ অনেকটা নির্লিপ্ত। গৌরবিমল তাঁকে বললেন, চল্ ওঠা যাক—। নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ দু চোখ জ্যোতিরাণীর দিকে ফেরালেন —তোমাদের ব্যাপার যে-দিকে গড়িয়েছে কি যে বলি কিছুই মাথায় আসছে না। এরপর আমিও কলকাতায় বিশেষ থাকব না। ছেলেটার জন্যই ভাবনা। যাক, যা অদৃষ্টে আছে হবে।

চলে গেলেন। শেষের উক্তিটুকু ক্ষোভের মত। ক্ষোভ ছেলের বাবা-মা দুজনেব ওপবেই হতে পারে, আবার অদৃষ্টের ওপরেও হতে পারে। কিন্তু জ্যোতিরাণী হঠাৎ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন অন্য কারণে। প্রভুজী ধামে তালা লাগানো হয়ে গেলে মামাশ্বশুরের কলকাতায় বসে থাকার কথা নয় বটে। এ অবস্থায় তাঁরও না থাকাটা ছেলেকে গোটাগুটি অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দেওয়ার মতই। এই শূন্যতা আগে অনুভব করেননি, এখন করছেন। কিন্তু নিজে বাড়ি ছেড়ে এসে ছেলের জন্য তাঁকে বরাবর এখানে থেকে যেতে বলা সম্ভব নয়।

স্কুল-বোর্ডিং-এ আসার মাস-কয়েকের মধ্যে পৃথক বাসের একতরফা ডিক্রি পেয়েছেন কোর্ট থেকে। এব মধ্যে কালীদার হাত কতখানি জানেন না। শিবেশ্বর চাটুজ্যের রুখে দাঁড়ানো দূরে থাক, জ্যোতিরাণীর আবেদনের প্রতিবাদও করেননি। বিভাস দত্তর ধারণা অ্যাটর্নীর চিঠির জবাবে তিনি যে সোজা কোর্টে হাজির হবেন মানী ভদ্রলোক সেটাই নাকি কল্পনা করেননি। বিভাস দত্তর ধারণা শোনার ব্যাপারে জ্যোতিরাণী এতটুকু উৎসাহ দেখাননি। তাঁর চাপা আগ্রহও ভালো লাগেনি। ইদানীং কালীদার সঙ্গে যে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ বেড়েছে কথাবার্তার ফাঁকে তাও টের পান। কেস্ সম্পর্কে

জ্যোতিরাণী নিজে থেকে তাঁকে একটি কথাও বলেননি। যা শুনেছেন কালীদার কাছেই শুনেছেন।

যাই হোক, জ্যোতিরাণী যেমন চেয়েছিলেন তেমনি হয়েছে, নিঃশব্দে মিটেছে।

এক ছুটির দিনের দুপুরে হঠাৎ মেঘনা এসে হাজির। দোরগোড়ায় তাকে দেখে জ্যোতিরাণী চমকে উঠেছিলেন, সাগ্রহে ঘরে ডেকেছেন তারপর। মাদুর পেতে তাকে বসতে দিয়েছেন, নিজেও সামনে বসেছেন। দেখে খুশি হবে কিনা ভেবে মেঘনা ভয়ে ভয়ে এসেছিল। বউদিমণির এই আপ্যায়নে চোখে জল এসে গেল তার। হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। বলল, কালীদার থেকে ঠিকানা নিয়ে লুকিয়ে এলাম. বাবু শুনলে আবার কোন্ মূর্তি ধরবে কে জানে!

এত ভয় তো এলি কেন?

না এসে থাকতে পারলাম না যে গো। সেই কবে থেকে আসার ফাঁক খুঁজছি। তুমি ফিরে চলো বউদিমণি, কি যে লক্ষ্মীছাড়া বাড়ি হয়ে গেল না দেখলে বুঝতে পারবে না।

মুখরা মেঘনার এই মুখও দেখার বস্তু যেন। আজ তিনি বাড়ি গাড়ি আর লক্ষ লক্ষ টাকার কর্ত্রী নন বলেই যেন এই মেঘনাও অনেক কাছের মানুষ। চোখ মুছতে মুছতে বলল, সেই ক'বছর আগে সদাদাদাকে সাবধান করেছিলাম, এ বাড়ির ভালো চাও তো বউদিমণির কাছে সব খুলে বলো, বাবুর মাথার ঠিক নেই—পরে আর সামলানো যাবে না। সদাদাদা তখন ভয় পেল, সমিস্যেয়ও পড়ল, দাদাবাবুর সঙ্গে বেইমানী করবে কি করে। এখন কি হয়ে গেল জানলে চোখের জল রাখতে পারত!

সঙ্কোচ সত্ত্বেও একটু স্বস্তি বোধ করলেন জ্যোতিরাণী। কেন এত বড় ব্যাপারটা ঘটে গেল মেঘনা সঠিক জানে না মনে হল। না জানলেও দু-দশ কথার পর মিত্রাদির সম্পর্কে তপ্ত অভিযোগ শুনলেন।

যথা, বউদিমণি বাড়ি ছেড়ে আসার কদিন পর থেকেই 'ঠাক্‌রোণে'ব আনাগোনা বাড়ছিল। ইদানীং তো সকালে এসে রাতে যেতে শুরু করেছিলেন। বউদিমণির গাড়িখানা পর্যন্ত আগলে বসেছিলেন। যেন তেনারই ঘর-বাড়ি, তেনারই সব। কালীদাদা একদিন কি বলতে আগুন-পানা মুখ করে বেরিয়ে গেলেন। সেই রেতেই কালীদাদাব সঙ্গে বাবুরও কি সব চটাচটির কথাবার্তা হল যেন, বাবুর রাগ দেখে ওরা ভাবল এবারে কালীদাদার এখানকার বাস উঠল বুঝি। তারপর থেকে ঠাক্‌রোণের আসাযাওয়া একটু কমেছে দেখা যাচ্ছে। বউদিমণির গাড়ি গ্যারেজে তালাবন্ধ রেখে কালীদাদা ড্রাইভারকে একেবারে বিদেয় করে দিয়েছেন।

মেঘনার মুখ থেকে এসব শুনতে সঙ্কোচ জ্যোতিরাণীর, তবু সন্তর্পণ আগ্রহেই শুনছেন। কালীদার প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত নেই। মৈত্রেয়ী চন্দকে কি বলেছেন বা ওদের মনিবের সঙ্গে চটাচটির কি কথা হয়েছে না শুনলেও অনুমান করতে পারেন। কালীদা কোন্ প্রয়োজনে কাকে কি বলতে পারেন তাঁর জানা আছে।

মনিবের মেজাজ থেকে মেঘনার সমাচার বিস্তার ছোট মনিবের অর্থাৎ সিতুর প্রসঙ্গে ঘুরেছে। বলেছে, দিনকে-দিন কি যে হচ্ছে বউদিমণি, সামনে এসে দাঁড়ালে পর্যন্ত ভয়ে বুকের ভেতর গুড়গুড় করে। ভাত খেতে এসে একটু এদিক-ওদিক হল কি থালা-বাসন ছুঁড়ে মারবে, শুতে গিয়ে বিছানার চাদর একটু কোঁচকানো দেখল কি অমনি

সব তুলে ঘরের বাইরে ফেলে দেবে। এক কালীদাদাকে যা একটু সমীহ করে, আর সকলের ওপর মারমুখো হয়েই আছে। স্কুলের আগে সময়মত খেতে আসে না, শেষে আধপেটা খেয়ে ছোটে, ফিরে এসেও যে ঠাণ্ডা হয়ে বসে খাবে পেট ভরে তা নয়। কিছু বললে তেড়ে মারতে আসে। মেঘনা তবু বলতে ছাড়ে না বলে তার ওপরেই সব থেকে বেশি রাগ। ধুমসী বলে, কানে আঙুল দেবার মত গালাগালি করে ওঠে এক-একসময়, দিনে কবার করে যে বাড়ি থেকে বার করে দেয় ঠিক নেই। সর্বদা রাগে গনগন করছে, সেদিন আবার বাইরের কার সঙ্গে মারামারি করে চোখ-মুখ ফুলিয়ে এসেছিল। বড হলে কি যে হবে ওই ছেলে, ভাবতে বড় খারাপ লাগে বউদিমণি।

জ্যোতিরাণীর বুকেব তলায় একের পর এক মোচড় পড়েছে মেঘনা সেটা টের পাচ্ছে না। ছেলের কথা মনে হলেই সেই দুর্যোগের দিনে মাঠে এসে দাঁড়াবার মূর্তি চোখে ভাসে। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওর ছোট দাদু কোথায়?

তিনি তো দু মাস ধরেই বাড়ি ছাড়া, কোথায আছেন এক যদি কালীদাদা খবর রাখেন।

মাঝে একটা কোর্টের ব্যাপার হয়ে গেছে মেঘনার তা জানাব কথা নয়। আবারও অনুনয় করল, বাড়ি-ঘর ছেড়ে আর কতকাল রাগ করে থাকবে বউদিমণি, ভালয় ভালয় এবারে ফিরে এসো। তুমি চাকরি করছ শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না। এ-রকম ইস্কুল করে নিজেই ইচ্ছে করলে কত লোক পুষতে পারো!

আবেদন বা স্তুতিতে ফল হবে না মনে হতে মেঘনারও মেজাজ বিগড়োবাব উপক্রম। বলল, আর দিনকতক দেখে আমিও যেখানে হোক একটা কাজ জুটিয়ে নেব, এত ধকল পোহানো আমাকে দিয়ে আর পোষাবে না।

ভিতরে ভিতরে জ্যোতিরাণীর আবার সেই শূন্যতা আব সেই চাপা অস্থিরতা। মামাশ্বশুর কলকাতায় কমই থাকবেন শুনে যেমন হয়েছিল। তিনি নেই, মেঘনারও না থাকাটা বুকের ওপর চেপে বসছে। তাঁকে যা বলতে পারেননি মেঘনাকে তাই বললেন।—পাগলামি কবিস না মেঘনা, আমাকে সত্যি ভালবাসিস তো ও-বাড়ি ছেড়ে নড়বি না।...আর এক কাজ কর, সিতুকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দে, বলিস আমি ডেকেছি।

মুখ ভার কবে মেঘনা মাথা নাডল।—ও ছেলেকে আমি কিছু বলতে-টলতে পারব না, একবার বলে প্রাণে বেঁচেছি। প্রাণে বাঁচার সমাচারও গোপন রাখল না মেঘনা। কালীদা বাড়িতে না থাকলে ছোট মনিব আজকাল ঘরে বসেই সিগারেট খায়—বাপের ভয় করবে কি, তার সঙ্গে তো দেখা একরকম হয়ই না। বেশি দিনেব কথা নয়, সেই তখন একসময়ে রাগ করে মেঘনা বলেছিল, বউদিমণি ফিরলে তোমার পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেট খাওয়া বার করবে। তাই শুনেও ছোট মনিব হেসে জিব ভেঙচে বলেছিল, তোর বউদিমণি এখানে আর ফিরছে না, ফিরলে তাকে দেখিয়ে তোর মাথার ওপর পা তুলে সিগারেট খেতাম। ছোট মনিবকে হাসতে দেখে মেঘনা একটু নরম হয়েই পরামর্শ দিয়েছিল, চুপি চুপি গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে জোরজার ধরে নিয়ে আসতে। শোনামাত্র মুখখানা যা হয়ে উঠল ছোট মনিবের, বলার নয়। মাথায় যেন খুন চাপল। সিগারেটের ছাই-ফেলা পাত্রটা তুলে এমন ছুঁড়ে মারল যে লাগলে রক্ষা ছিল না। কান ঘেঁষে ওটা গিয়ে দরজায় লাগতে দরজার কাচ খানখান।

জ্যোতিরাণী নির্বাক। বাতাস নিতে ফেলতে লাগছে কোথায়। মাঠে দাঁড়ানো সেই রাগত মূর্তি মনে দাগ কেটে আছে। আর, এই রাগের বার্তাও তেমনি দাগ কেটে বসেছে। ওকে আসতে বলার জন্য মেঘনাকে আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ করতে পারলেন না। মায়ের ওপর এমনি রাগ এমনি বিদ্বেষ তো স্বচক্ষেও দেখেছেন। বাপের চাবুকের ঘায়ে জ্বর এসে গেছল যে-রাতে, সেই জ্বরের ঘোরেও তাঁকে দেখে ন বছরের ছেলের দু চোখের যে ঝাপটা খেয়ে নিজের ঘরে পালিয়ে এসেছিলেন, ভোলেননি। তাঁর ধারণা, মেঘনা না জানলেও কোর্টের ব্যাপারটা সিতু জানে। চৌদ্দ বছরের ছেলেকে আর চৌদ্দ বছর ভাবেন না তিনি। অনেক আগে থেকেই ভাবতেন না। সিতু জানে বলেই ওই মূর্তিতে সেদিন মাঠে এসে দাঁড়িয়েছিল, আর কোর্টের ফয়সালাও জানে বলেই মেঘনাকে বলেছিল, মা আর ফিরবে না।...না, মা বলেনি বলেছিল, তোর বউদিমণি আর ফিরবে না।

তবু, এই ছেলেকে নিয়েই সব থেকে বেশি বিভ্রান্ত তিনি। মেঘনা চলে যাবার পরেও থেকে থেকে কেবলই মনে হয়েছে, রাগ ছাড়াও ওর ভিতরে ভিতরে আরো কিছু আছে যা তিনি ধরতে ছুঁতে পারছেন না। তক্ষুনি শমীকে নিয়ে ওর হিংসের ব্যাপারটা মনে পড়েছে। মায়ের ওপর ভাগ বসালে ও যে হিংসেয় জ্বলত, অনেক দিনই লক্ষ্য করেছেন।

মনে পড়া মাত্র দুর্বোধ্য একটা অস্থিরতা ভোগ করেছেন।

ওকে আবার দেখেছেন গেল বছব, ...ান্ন সালে। সেও এক দুর্যোগেরই দিন। সেকেণ্ডারি স্কুলের টিচারদের মাইনে ক...' যা পায় তাতে গ্রাসাচ্ছাদন চলে না। অনেকদিনের অনেক জটলা আর আবেদন ...বেদনের পর মাইনে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তারা শান্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছিল—পীসফুল ডাইরেক্ট অ্যাকশন। ছাত্ররা যোগ দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিণামও আগুন জেল লাঠি বুলেট। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী সাত জন নিহত বহু আহত।

এই সংগ্রামের সঙ্গে জ্যোতিরাণীদের প্রতিষ্ঠান-চালিত স্কুলের কোন যোগ ছিল না। এখানকার শিক্ষকরাও কোনরকম দাবি ঘোষণা করেনি। শহরের সব স্কুল যখন বন্ধ, দূরের বিচ্ছিন্ন এই স্কুলের শান্তি খুব ব্যাহত হয়নি। অর্ধেক মেয়ে কম্পাউণ্ডের ভিতরে বোর্ডিং-এ থাকে, তাই গোলযোগের আশঙ্কা আরো কম।

কিন্তু গণ্ডগোল হল। কোথা থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশটি ছেলে এসে স্কুল-গেট খোলার দাবি জানালো, স্কুল বন্ধ করার দাবি জানালো। হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি বাড়তে টিচাররা বেরিয়ে এসেছে, মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে। হেডমিস্ট্রেস ছেলেদের জানালেন স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছেলের দঙ্গল নড়ল না, তারা চায় গেট খোলা হোক, টিচাররা তাদের সঙ্গে বেরিয়ে আসুক। জনকয়েক পাণ্ডার উত্তেজনার ইন্ধন পেয়ে বাকি ছেলের দঙ্গল মারমুখী হয়ে উঠতে লাগল।

পাণ্ডাদের একজন সাত্যকি! সিতু!

বিচ্ছিন্ন করে শুধু জ্যোতিরাণী দেখছেন তাকে। দেখছেন। শমী ভয়ে এধারে আসেনি, তার চোখে পড়েনি।

সিতুর হাতে ফ্ল্যাগ। রক্তবর্ণ মূর্তি। পারলে শুধু স্কুল-গেট নয়, পারলে ও স্কুলের এই ঘর-বাড়ি পর্যন্ত ভেঙে গুঁড়িয়ে একাকার করে দেয়। বড় একটা পাথর তুলে নিয়ে

শেকলে ঝোলানো গেটের পাল্লায় তালার ওপর ঘা বসাতে লাগল।

হঠাৎ ছেলেরা দেখল ধীর পায়ে গেটের দিকে এক মহিলা এগিয়ে আসছেন। টিচাররা আর সামনের দিকের বড় মেয়েরা দেখল ওই মারমুখী অবুঝ ছেলেদের দিকে এগিয়ে চলেছেন তাদের মিসেস দেবী।

সিতুর হাতের পাথর হাতে থেকে গেল। ক্ষিপ্ত আক্রোশে মায়ের দিকে চেয়ে আছে সে। মা-কে একেবারে গেটের গায়ে এসে দাঁড়াতে দেখে সরোষে দু পা সরে দাঁড়িয়েছে। জ্যোতিরাণী নিষ্পলক চেয়ে আছেন তার দিকে। অবাধ্য বেপরোয়া আক্রোশে সিতুও। ব্যাপারটার ফলে হকচকিয়ে যাওয়ার দরুন ছেলের দলের চেঁচামেচিও শমে নেমেছে।

তারপর যে কাণ্ডটা হল সেটা তাদের কাছে আরো অপ্রত্যাশিত। এত করে উদ্দীপনা যুগিয়ে আর খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে যে-খোদ পাণ্ডাটি তাদের নিয়ে এই হামলায় এসেছে—হঠাৎ সে হাতের পেল্লায় পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে ফিরে চলল।

একবার করে গেটের ওধারে নিঃশঙ্ক গম্ভীর-রঙা মহিলাকে দেখে আর ফিরে ফিরে এক-একবার পাণ্ডাটিকে পায়ে পায়ে মাটি আছড়ে চলেই যেতে দেখে তারাও আস্তে আস্তে সরতে লাগল।

এধারে টিচাররা আর মেয়েরা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে যেন দৃশ্য দেখছে একটা। গেট ধরে স্থির একখানা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন মিসেস দেবী। ছেলের দঙ্গল চলে যাচ্ছে।

ছেলের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের মানসিক ধকল কাটিয়ে উঠতেও সময় লেগেছিল জ্যোতিরাণীর। কোর্ট থেকে পৃথক থাকার অনুমতি পাবার পব সেই প্রথম আবার তিনি ভেবেছেন, কালীদাকে ডেকে পাঠিয়ে নিজের কাছে রাখার প্রস্তাব আর একবার দিয়ে দেখবেন কিনা। লাভ হবে না জানেন, ছেলের বাপ রাজী হবে না। তবু জ্যোতিরাণী ভেবেছেন। শুধু ভেবেছেন।

তারপব এই পঞ্চান্ন সাল।

নির্লিপ্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে গোড়ার দিকটা মন্দ কাটেনি। স্কুলেব সহকারী হেডমিস্ট্রেস অন্য স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের চাকরি পেয়ে চলে যেতে জ্যোতিরাণী সহকারী হেডমিস্ট্রেস হয়েছেন। তিনি অনার্স গ্র্যাজুয়েট, কাজেব রিপোর্ট অনবদ্য। তবু দু-তিনজনকে ডিঙিয়ে ওই শূন্য আসন পেলেন বলে নিজেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাস হয়ে গেল। আর তার কিছুদিনের মধ্যেই কোর্টে আইনগত বিচ্ছেদ দাবি করেছেন একজন, জ্যোতিরাণী সে খবর পেলেন কোর্টের নোটিস আসার আগেই। খবরটা দিলেন বিভাস দত্ত। তারপর যথাসময়ে কোর্টের নোটিস এসেছে, শিবেশ্বর ডাইভোর্সের মামলা রুজু করেছেন।

পৃথক থাকার মামলায় শিবেশ্বর যা করেছিলেন, জ্যোতিরাণীও এবার ঠিক তাই তাই করলেন। তিনি জবাব দিলেন না, উকিল দিলেন না, মামলায় যুঝলেন না। তিন দিন আগে একতরফা ডিক্রী পেয়েছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে। নিয়মমাফিক তাঁকে কোর্টের ফয়সালা জানানো হয়েছে।

এরই দিনকতক আগে, স্কুল ফাইন্যালে ছেলের পরীক্ষার ফল দেখে যেদিন তিনি অবাক হয়েছিলেন, সেদিনও সিতু স্কুল-গেট-এ এসে দাঁড়িয়েছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে সেদিনও শমী এসে খবরটা দিয়েছিল। জ্যোতিরাণী হঠাৎ-ঝোঁকে বলে উঠেছিলেন, ডাকলিনে কেন! তারপরেই মনে হয়েছে, ছেলে পরীক্ষা-ফলের সুখবর দিতে আসেনি। এসেছিল হয়ত পরীক্ষার ফল ভালো করে তাঁকে জব্দ করার আক্রোশ মেটাতে। সেটা শুনিয়ে যাবে বলেই হাত তুলে শমীকে কাছে ডেকেছিল সেদিন।

...কিন্তু আজ কেন এসেছিল? বিচ্ছেদের রায় বেরুবার ঠিক এই তিন দিনের মুখে আজ কেন এসেছিল?

...শুধু সিতু নয়, কালীদার এতদিনের রহস্য-ছোঁয়া ঝকঝকে কালো চামড়া মোড়া ডায়েরীও রেজিস্ট্রী-ডাকে আজই এসেছে। যা পড়ার পব দুর্বোধ্য অস্বস্তি আর আশঙ্কায় ভিতরটা ছেয়ে আছে।

শমীকে নিয়ে ট্যাক্সিতেই উঠতে হল। কম করে সাড়ে তিন টাকা খরচ হবে। কিন্তু কি করা যাবে, ট্রাম-বাসেব এই ভিড়ের চাপ এখনো বরদাস্ত করে উঠতে পারেন না।

শমীর দরকারী জিনিসপত্র কিনে, ওব মাইনে দিয়ে, বোর্ডিংয়েব চার্জ মিটিয়ে আর এই ট্যাক্সি ভাড়া গুণে মাসের শেষে ফাঁপরে পড়েন জ্যোতিরাণী। স্কুল থেকে যে টাকা হাতে পান গোড়ায় গোড়ায় সেটা টাকাই মনে হয়নি। অন্য আর দশজন তাইতেই দিব্বি চালাচ্ছে ভেবে তিনিও নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু মাসের শেষে একই হাল। সহকাবী হেডমিস্ট্রেস হবার পরেও। টাকা কটা কি ভাবে যে নিঃশেষ হয়ে যায় ঠাওর করে উঠতে পারেন না। অথচ খবচ যখন করেন নিতান্ত দরকার ভেবেই করেন। কিছু সঞ্চয় হওয়া দূরে থাক, গয়না যা ছিল, সংগোপনে তার থেকে দু-চারখানা কমেছে।

সপ্তাহে একদিন অন্তত শমীকে নিয়ে বিভাসবাবুর ফ্ল্যাটে যেতে হয়। সুস্থ থাকলে বিভাস দত্তর আসতে আপত্তি ছিল না। গোড়ার দিকে ঘনঘনই আসতেন। শমীকে আনার পবেও। এটা স্কুল। জ্যোতিরাণী অসুবিধেতেই পড়তেন। শেষে এই অসুবিধের আভাস বিভাস দত্তকে না দিয়ে পারেননি। ঘুরিয়ে আর মোলায়েম করেই বলেছিলেন, ফাঁক পেলে শমীকে নিযে তিনিই যাবেন—অসুস্থ শরীর নিয়ে এতদূর আসা, তাছাড়া—স্কুলেরও কে কি ভাবে ঠিক নেই—।

আগে হলে বিভাস দত্ত অভিমানের একটা দেয়াল খাড়া করাতেন সামনে। কিন্তু আগের সঙ্গে অনেক যেন তফাৎ হয়ে গেছে। রাগ করা দূরে থাক, উল্টে হেসেছেন। বলেছেন, বুঝি তো, আবার না এসেও পারি না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একলা কাটে—

তাঁর ওখানে যাওয়া-আসাব জন্যেই জ্যোতিরাণীর ট্যাক্সি-খরচ। এও বাঁচাবার চেষ্টাই করেন তিনি। কিন্তু ট্রাম-বাসের অত ভিড় অসহ্য লাগে। সেই চাপাচাপির মধ্যে অনেক নীরব হ্যাংলামিও দেখেছেন তিনি। গা ঘিন ঘিন করে। এখন অন্তত জ্যোতিরাণী চান এই রূপের বাঁধন ভেঙে পড়ুক, মুছে যাক। এরই জন্যে পায়ে পায়ে অসুবিধে এখন। এ আর না থাকলে অনেক দিক থেকে স্বস্তির কারণ হতে পারে এখন। কিন্তু তিনি চাইলে কি হবে। বয়স চৌত্রিশে গড়ালো, হ্যাংলামি যারা করে তারা চব্বিশের বেশি

দেখে না তাঁকে। স্কুলের এক সহ-শিক্ষয়িত্রীও চৌত্রিশ শুনে ঠাট্টা করে নিজের বয়েস বলেছিল চৌষট্টি।

দোতলায় ফ্ল্যাট। তর তর করে উঠে শমী আগে ঘরে ঢুকেছে। একটু বাদে জ্যোতিরাণী। ঘরে ঢুকে দেখলেন উঠে বসে বিভাস দত্ত বালিশের তলায় রাখলেন কি। বালিশজোড়া উঁচিয়ে রইল। তারপর হাসিমুখে সেই বালিশে ঠেস দিয়ে এদিকে ফিরলেন।

আজ এত দেরি দেখে ভাবলাম এলেন না।

শমী জানান দিল, আরো দেরি হত, মাসী দুপুর থেকে কেবল বসেই কাটালো, আমি ঠেলে তুলে নিয়ে এলাম।

হালকা টিপ্পনীর সুরে বিভাস দত্ত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ট্যাক্সিতে এলি তো?

ঠেসটা যে মাসীর উদ্দেশে শমী ভালই জানে। মাসীর খরচের হাত নিয়ে কাকুকে মাঝে-সাজে ঠাট্টা করতে শোনে। তাই মাসীর হয়ে সে পাকা মেয়ের মত জবাবদিহি করল, কি করব, যে ভিড় ট্রামে-বাসে, আর লোকগুলোও যে আদেখলের মত চেয়ে থাকে মাসীর দিকে—

মাসীর রুষ্ট চোখ দেখে শমী থেমে গেল। কিন্তু চৌদ্দ বছরের শমীরই বা দোষ কি, তারও তো চোখ বাঁধা নেই।

শমীর কথায় ঠোঁটে হাসি নিয়ে বিভাস দত্ত তাঁর দিকে ফিরেছেন। জ্যোতিরাণী ভদ্রলোকের চোখেমুখে চাপা খুশি দেখছেন আজ।...এক নজর তাকিয়েই জ্যোতিরাণী বুঝে নিয়েছেন কোর্টের রায় তাঁরও জানা হয়ে গেছে। কেস্ ওঠার আগে যে খবরটা তিনিই প্রথম দিয়েছিলেন, এই তিন দিন ধরে তার ফল না জেনেও তিনি বসে নেই। জ্যোতিরাণীর হঠাৎ মনে হল, অনেক দিন ধরে কে যেন তাঁর চারদিকে একটা জাল ফেলে রেখে প্রায় অলক্ষ্য কিন্তু ধীর অমোঘ গতিতে গোটাতে শুরু করেছে এখন।

গম্ভীর। চিন্তাটা সবলে ঝেড়ে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন ছিলেন এ কদিন?

বেশ ভালো।

এই জবাবটুকুর মধ্যেও কি আলগা ব্যঞ্জনার ধাক্কা খেলেন জ্যোতিরাণী?

এদিকে চার দিন আগেও রক্ত পরীক্ষা করিয়েছেন বিভাস দত্ত, ব্লাড-সুগার হাই। যা শুনলে ফিরে আবার পরীক্ষা না করা পর্যন্ত মেজাজ বিগড়েই থাকে তাঁর। অথচ জবাব দিলেন বেশ ভালো।

জ্যোতিরাণী বললেন, বেশ ভালো তো বিকেলে হেঁটে চলে বেড়ালেও পারেন, বন্ধ ঘরের মধ্যে একলা শুয়ে বসে কাটান কেন?

বিভাস দত্তর ঠোঁটের হাসি আর একটু বিস্তৃত হয়েও হল না, শিথিল আলস্যে আর একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর হাল্কা গোছের জবাব দিলেন, একেবারে একলা ছিলাম না।

বিভাস দত্তর দু চোখ শমীর বিস্মিত মুখের দিকে ঘুরল। আর সেইটুকু নড়াচড়ার ফলে বিছানার বালিশ জোড়া সামান্য সরেছে।

তার ফাঁক দিয়ে ওমর খৈয়ামের একটু অংশ দেখা যাচ্ছে।

...বিভাস দত্ত ওমর খৈয়াম পড়ছিলেন না। তাহলে ওটা বালিশ-চাপা দেওয়ার দরকার হত না। ওতে জ্যোতিরাণীর দুটো ফটো আছে।

...বিভাস দত্ত একা ছিলেন না।

সাঁইত্রিশ

মৃতদেহ বিভাস দত্তর।

জ্যোতিরাণী সামনে বসে আছেন। দেখছেন চেয়ে চেয়ে। কাঁপছেন। তাঁর দিকে দেখছেন তিনি। অভিযোগ তাঁরই, তাঁরই প্রতি। দুর্বহ নিঃসঙ্গতার অভিযোগ, সত্তাসুদ্ধ কাঁপছে। মৃত বিভাস দত্ত তাঁর সামনে শয়ান। শবের জীবন্ত অভিযোগ অপরিপূর্ণ বাসনার অভিযোগ, জীবনের বহু ব্যর্থতা বহু সঙ্কট থেকে তাঁকে টেনে তোলার বিনিময়ে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ত অবজ্ঞার অভিযোগ, উত্তর-যৌবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা আকুতি আমন্ত্রণ উপেক্ষার অভিযোগ—অসময়ে এই জীবনান্ত ঘটানোর অভিযোগ। আভাসে আচরণে এই অভিযোগ বিভাস দত্ত গত ছ মাস ধরে করে আসছেন। কোর্টের বিবাহবিচ্ছেদ ঘোষণার তৃতীয় দিনে বালিশের তলায় ওমর খৈয়াম চাপা দিয়ে বলেছিলেন, ঘরে তিনি একলা ছিলেন না। প্রত্যক্ষভাবে সেটাই শুরু। তারপর এই ছ মাস ধরে কখনো অসুস্থতার আড়াল থেকে নির্বাক ব্যথাতুর আবেদনে তাঁকে বিচলিত করতে চেয়েছেন, কখনো বা কঠিন দুর্ভেদ্য অভিমানের আড়াল থেকে। কখনো কালীদার মুখে শোনা তিন রাস্তার ত্রিকোণ দালানের মালিকের অনেক ব্যভিচারের নগ্ন-বার্তা সামনে তুলে ধরে বিগত স্মৃতি নির্মূল করে দিতে চেয়েছেন, কখনো বা কলমের ডগায় ক্ষোভ ঢেলে রমণীর ছিন্ন-ভিন্ন ভগ্ন জীবনের আত্মবঞ্চনাকারী অন্ধ অবুঝ সংস্কারের প্রতি নির্দয় আঘাত হানতে চেষ্টা করেছেন।

জ্যোতিরাণী কাঁপছেন থরো-থরো, আর সত্তা-দুমড়ানো শবের অভিযোগ দেখছেন। দেখছেন, ওই অব্যক্ত অভিযোগ কানেও শুনছেন। তিনি দেখতে চান না, শুনতে চান না। তবু দেখতে হচ্ছে, তবু শুনতে হচ্ছে। অভিযোগের এই রূপ এই বাণী তিনি কল্পনাও করেননি। চিৎকার করে তিনি ওই ঘুম ভাঙাতে চান, ওই নিষ্প্রাণ দেহ ঠেলে তুলে দিতে চান, আত্মহননের এই মর্মান্তিক দায় থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিতে বলতে চান। কিন্তু বাইরে তিনি পাথর হয়ে গেছেন, টুঁ শব্দটিও করতে পারছেন না। তিনি শুধু দেখছেন। অভিযোগ দেখছেন। চরম প্রতিশোধ দেখছেন।

...আরো কি যেন দেখছেন জ্যোতিরাণী। আরো কাদের দেখছেন। দেখছেন না, ওই নিশ্চল দেহ তাঁর দু চোখ আগলে রেখেছে—দেখার মত করে অনুভব করছেন। শমীটা আর্তনাদ করে কাঁদছে, অথচ কান্নার এতটুকু শব্দ তাঁর কানে আসছে না। কারা সব কথা বলছে, কিন্তু জ্যোতিরাণী কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। শব্দ এখানে অনুভূতির গ্রাসের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, স্পর্শবাহী নৈঃশব্দ্যের গভীরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

নিষ্পলক চেয়ে চেয়ে জ্যোতিরাণী দেখছেন শুধু। দেখছেন আর কাঁপছেন থর-থর করে। কাঁপুনিটা সত্তার এত গভীরে যে বাইরে তারও প্রকাশ নেই। কিন্তু আর পারছেন না তিনি দেখতে, আর পারছেন না এই শব্দশূন্য অভিযোগ শুনতে।

প্রাণপণে একবার ডেকে দেখবেন ওই নিস্পন্দ দেহে সাড়া জাগানো যায় কিনা? শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখবেন ওই আত্মবিনাশী দেহটাকে ডেকে তোলা যায় কিনা?

ধড়মড় করে উঠে বসলেন জ্যোতিরাণী। কোথা থেকে কোথায় উঠে বসলেন ঠাওর করতে পারলেন না। ঘরভর্তি আবছা অন্ধকার। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। বুকের কাঁপুনি ধপ্-ধপ্ করে কানে বাজছে এখন। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। সত্রাসে সামনে খুঁজছেন কি। না, কিছু না, শমী ঘুমুচ্ছে। তিনি শয্যায় বসে আছেন।

বোর্ডিং-এ, নিজের ঘরে। আঁচলে করে কপালের আর গলার ঘাম মুছে নিলেন। তারপর চোখ বড় করে চারদিক দেখলেন আবার। কাঁপুনির রেশ লেগেই আছে তবু।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চোখ গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ছাঁত করে উঠল ভিতরটা। পূবের আকাশের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। একটু বাদে ভোর হবে। ভোর রাতে এ কি দেখে উঠলেন তিনি। ভোরের স্বপ্ন সম্পর্কে ছেলেবেলার সংস্কার ভয়াবহ চিত্রটা মুছে যেতে দিল না। কিছু ঘটে গেল?

সকাল হয়েছে। মেয়েদের ঘুম ভেঙেছে। বোর্ডিং-এ সাড়া জেগেছে। চা-টা খেয়ে শমী পড়তে বসে গেছে। দিনের আলোয় স্বপ্নের বিভীষিকা মুছে ফেলতে চেষ্টা করছেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু মোছা যাচ্ছে না। ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনলে চমকে উঠছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সচকিত হয়ে উঠছেন। একটা কিছু দুঃসংবাদ আসতে পারে যেন। আসা সম্ভব নয়। বিভাস দত্তর ভাল-মন্দ কোন খবর এখানে পৌঁছে দেবার মত পরিচিত কেউ নেই। তাঁর বাড়ির বাদ-বাকী ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা সব অবাঙালী। তেমন মুখ-চেনাও নেই কারো সঙ্গে! কিন্তু এ আবার কি ভাবছেন জ্যোতিরাণী? স্বপ্ন স্বপ্নই—খবর আবার কি আসবে?

কিন্তু ভাবনার কারণ আছে। তাই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও বাড়ছে। স্বপ্নটা বাস্তবের মতই ভিতরের ছায়া বিস্তার করে চলেছে।

...দিন আঠার-কুড়ি আগে একটা বড় রকমের বোঝাপড়া হয়ে গেছে বিভাস দত্তর সঙ্গে। কোনরকম শোরগোলের বোঝাপড়া নয়, প্রত্যাশা বিলোপের বোঝাপড়া। আর মাত্র গত সন্ধ্যায় বিভাস দত্তর কিছু অব্যবস্থিতচিত্ত হাবভাব কার্যকলাপ দেখে এসেছেন।

কোর্ট থেকে বিচ্ছেদের রায় বেরুবার পরে একটানা ছ মাস ধরে যথার্থই যুঝে আসছিলেন জ্যোতিরাণী। এই একজনের অবুঝ প্রত্যাশার সঙ্গে। নিবিড় প্রতীক্ষার সঙ্গে। প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা দিনে দিনে উন্মুক্ত হয়ে উঠছিল। কথায়-বার্তায়, মানে-অভিমানে অসহিষ্ণুতায়-অস্থিরতায়, কলমের আঘাতে-আবেদনে বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর সেই তাড়নায় ভদ্রলোক আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

কোন কোন ছুটির দিনে জ্যোতিরাণী শমীকে নিয়ে আসা বন্ধ করতে শুরু করেছিলেন। তার জবাবে বিভাস দত্ত নিজেই পর-পর কদিন বোর্ডিং-এ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্কুল ছুটির পরে গেছেন, শমীর পড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে সেই আভাস ব্যক্ত না করা পর্যন্ত ওঠার নাম করেননি। ওঠার সময় বলে গেছেন পরদিন আবার আসবেন। তখন পর্যন্ত জ্যোতিরাণী মুখ ফুটে বলেননি কিছু। কারণ এবারের এই আসাটা তাঁর অসুবিধের কথা না জেনে না বুঝে আসা নয়। জেনেই আসা, বুঝেই আসা। প্রতিরোধ ভেঙে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে আসা।

তবু বলার সময় এলো। দিন কুড়ি আগের কথা। সেদিন শমীকে নিয়ে জ্যোতিরাণী এসেছিলেন তাঁর ফ্ল্যাটে। একটা ছুটির দিন এড়িয়ে গেলে সপ্তাহের মধ্যে কম করে তিন-চারদিন নিজে হাজির হয়ে তার শোধ তুলবেন।...দু পাঁচ মিনিট থেকে শমী ওধারের ফ্ল্যাটে চলে গেছল। পাশের ফ্ল্যাটের সমবয়সী অবাঙালী মেয়েটার সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরাণীর মনে হয়, ইদানীং এই মেয়েটার চোখেও কিছু ব্যতিক্রম ধরা পড়ছে বলেই পালায়—ঠায় সামনে বসে থাকতে পারে না।

ও বেরিয়ে যেতে বিভাস দত্ত নিস্পৃহ গাম্ভীর্যে বলেছিলেন, ট্যাক্সি খরচ করে

আসার কি দরকার ছিল, খানিক বাদে আমি তো যেতাম।

জ্যোতিরাণী তক্ষুনি অনুভব করেছিলেন—বলার সময় এলো। চুপচাপ চেয়েছিলেন একটু, তারপর বলেও ছিলেন, সেটা ভাল হত?

মুহূর্তে অশান্ত মুখ বিভাস দত্তর।—কেন? কেউ কিছু ভাববে? ভাবলেও লজ্জা পাওয়ার মত এমন কি অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে সেটা?

হবে না?

না। অশান্ত হাতে পকেট হাতড়ালেন, বালিশ ওল্টালেন। সিগারেটের প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরালেন।

জ্যোতিরাণী সেইটুকু সময় অপেক্ষা করলেন।—আপনার ব্লাড সুগার কত এখন?

বিভাস দত্ত সচকিত। অনুকূল ফয়সালার তাড়নার মুখে প্রশ্নটা আঘাতের মত। চঞ্চল দৃষ্টিটা জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর দু-চার মুহূর্তে নড়েচড়ে বেড়াল।—শিগ্‌গীর দেখাইনি।...বেশি হলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন?

আমি নিশ্চিন্তই আছি, দুর্ভাবনা যেটুকু তা আপনাকে নিয়ে। জীবনে আপনি যত উপকার করেছেন ততো আর কেউ করেনি, আপনার ভাল ছাড়া আর কি চাইতে পারি?

সিগারেটে অসহিষ্ণু টান পড়েছে বারকয়েক। তেমনি অশান্ত গাম্ভীর্যে সমানে ঝুঁকেছেন হঠাৎ।—ভাল চান? সত্যি ভাল চান?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি কি চাই সেটা না বোঝার এত চেষ্টা কেন?

ধীর ঠাণ্ডা মুখে জ্যোতিরাণী জবাব দিয়েছেন, না বোঝার চেষ্টা নয়, বুঝতে আমি চাই না। আপনার ভাল চাই বলেই চাই না।

বিভাস দত্ত বসে থাকতে পারেননি। উঠে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা করেছেন বারকয়েক। অসুস্থ মুখের কালচে ছোপ ঘন হয়েছে। সিগারেট ফেলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।—ভাল চাওয়ার এটাই লক্ষণ তাহলে?

হ্যাঁ। আমি ঘর করব বলে কারো ঘর ছেড়ে আসিনি। সেই ভাঙা-জীবন জুড়তে চেয়ে আপনি নিজেও কষ্ট পাবেন না, আমাকেও কষ্ট দেবেন না।

...চোখের দৃষ্টি তখনই অস্বাভাবিক উদগ্র হয়ে উঠেছিল বিভাস দত্তর। পায়চারি করছিলেন। অস্থিরতা বাড়ছিল। সিগারেট ফেলে নতুন সিগারেট ধরিয়েছিলেন। ফিরে আবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন যখন, দুই চোখ ঘোলাটে, প্রায় ক্রূর।—আপনার নিজের কথা থাক, আমার সম্পর্কে আপনার এটাই শেষ চিন্তা?

হ্যাঁ।

আর আজকের আসাটাও এটা জানাবার জন্যেই বোধ হয়?

হ্যাঁ, যত দেরি হচ্ছিল ততো আপনার ক্ষতি হচ্ছিল।

আমার ক্ষতি, আমার ক্ষতি! বিভাস দত্ত হেসে উঠেছিলেন। হাসি ঠিক নয়, হাসির মতই কিছু। তাও তক্ষুনি মিলিয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, আচ্ছা, ক্ষতি আর তাহলে করব না।

প্রত্যাশা বিলোপের ওই আঘাত মুছে দেবার জন্য জ্যোতিরাণী আরো কিছু বলতে পারলে বলতেন, অশান্ত অবুঝ ক্ষোভ দূর করার হাত থাকলে করতেন। কিছুই বলতে

পারেননি, কিছুই করতে পারেননি। শমী ফিরতে নিঃশব্দে উঠে এসেছিলেন।...

সময় ভোলায়। তাই সময়ের প্রতীক্ষা করেছেন। আঘাত দিতে হয়েছে, কিন্তু সব থেকে উপকারী মানুষকে পরিত্যাগ করে অপমান করতে চাননি। বরং দুই-একবার আসা-যাওয়ার পর ফিরে আবার প্রত্যাশাশূন্য সহজ যোগাযোগ স্থাপন করার আশা পোষণ করেছেন। তাই শমীকে নিয়ে পরের সপ্তাহে আবার যথারীতি এসেছিলেন। না আসার মত তাঁর দিক থেকে অন্তত বড় কিছুই ঘটেনি বোঝাবার চেষ্টা।

কথা বিভাস দত্ত কমই বলেছেন। মুখে কালচে ছোপ, চোখ বসা। ক'রাত ধরে ভাল ঘুমোননি মনে হয়। সেদিন শমীকে আর অন্য ঘরে যেতে দেননি জ্যোতিরাণী। বলেছেন, কাকুর শরীর ভাল না দেখছিস, বোস্।

এতেও বিভাস দত্তর অসহিষ্ণুতা গোপন থাকেনি। শমীর সামনেই ঘোলাটে দু চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকেছে।—শরীর ভাল না আপনাকে কে বললে?

দেখতে পাচ্ছি।

জ্যোতিরাণীর মনে হয়েছিল ভদ্রলোক এবার বলবেন, কর্তব্যের দায় সারার জন্য কষ্ট করে আসার আর প্রয়োজন নেই। বললেন না। একটু বাদে উঠে টেবিলের ড্রয়ার খুলে কি একটা ছাপা কাগজ বার করলেন। ইশারায় শমীকে কাছে ডেকে কলম এগিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে নাম সই কর।

বিমূঢ় মুখে শমী আদেশ পালন করল। কাগজ আর কলম বিভাস দত্ত জ্যোতিরাণীর সামনে ধরলেন। ছাপার অক্ষরে গার্জেন লেখা জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, আপনি এখানটায় সই করুন।

ছাপা ফর্মের উল্টো দিকে সই করার ঘর। ছাপার অক্ষরে কি সব লেখাও আছে। কিন্তু ভদ্রলোকের সহিষ্ণুতা আরো চিড় খাবার ভয়ে জ্যোতিরাণী পড়ে দেখার অবকাশ পেলেন না।—কি এটা?

বিড়বিড় করে বিভাস দত্ত জবাব দিলেন, শমীর গার্জেন হিসেবে নামটা শুধু সই করুন, ভয়ের কিছু না। অবশ্য গার্জেন হতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তাহলে আলাদা কথা—

জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি সই করে দিয়ে বাঁচলেন। যত দূর মনে হল ভদ্রলোক শমীর ব্যাপারে বৈষয়িক কিছু চিন্তা করছেন।

তার পরের সপ্তাহেও এসেছেন। দেখা হয়নি। ঘর তালা-বন্ধ ছিল।

গতকাল স্কুলে তাঁর টেলিফোন।...স্কুল ছুটির পর সন্ধ্যার দিকে একবার এলে ভাল হয়, দরকারী কথা আছে। টেলিফোনে বিভাস দত্তর গলায় হাসির রেশও কানে এসেছে একটু, বলেছেন, আপনার ভয় পাওয়ার বা ঘাবড়ে যাওয়াব মত কোন কথা নয়, নিশ্চিন্ত মনেই আসতে পারেন।

জ্যোতিরাণী তক্ষুনি কথা দিয়েছেন যাবেন।

যেতে যেতে সন্ধ্যা গড়িয়েছিল। শমীকে পড়তে বসিয়ে একাই বেরিয়েছিলেন। একলা যেতে অস্বস্তি বোধ করেছেন, কিন্তু দরকারী কথা আছে শুনেও ওকে সঙ্গে নেওয়াটা আর একজনের চোখে নিশ্চিন্তে যেতে না পারার নজির হবে।

বিভাস দত্ত বুক পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়েছিলেন। পাশের অ্যাশপট সিগারেটের টুকরোয় ভরে গেছে। মাঝে ডাক্তারের সতর্কতায় সিগারেট খাওয়া কমাতে হয়েছিল।

অন্যদিন হলে অত খাওয়া সিগারেট দেখে জ্যোতিরাণীও বলতেন কিছু। আগে বলেছেন। কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হয়েছে ওসব সতর্কতার যেন দিন ফুরিয়েছে। ঝড়ের পরে ঠাণ্ডা মূর্তি।

শুয়ে যে, শরীর কেমন?

ফ্যাকাশে মুখে বিভাস দত্ত হাসতে চেষ্টা করেছেন একটু। জবাব দেননি। অর্থাৎ শরীর সম্পর্কে আগ্রহ নেই। জিজ্ঞাসা করেছেন, এ-সময়ে ডেকে অসুবিধেয় ফেলেছি বোধ হয়?

না, অসুবিধে আর কি!

ট্যাক্সিতে এলেন?

জ্যোতিরাণীরও সহজ হবার চেষ্টা। হেসে জবাব দিয়েছেন, শেষের অর্ধেকটা—ট্রাম বদল করতে নেমে আর ওঠা গেল না।...রোববার কোথায় ছিলেন, এসে দেখি ঘর তালা-বন্ধ!

বিভাস দত্তর মুখে সেই রকমই নিষ্প্রভ নির্লিপ্ত হাসি। পাবলিশারদের বাড়ি-বাড়ি পাওনা কুড়োবার নোটিস দিতে গেছলাম।

জ্যোতিরাণী প্রাচুর্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিন বছরের ওপর হয়ে গেল। তবু অনটনের কথা বলা বা শোনাব ব্যাপারে সহজ হতে পারেননি। হঠাৎ বেশি টাকার কেন দরকার হল জানেন না। এই দরকারে আরো কিছু গয়না অনায়াসে বার করে দিতে পারেন। কিন্তু আভাসেও তা ব্যক্ত করলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। কোন্ দরকারী কারণে ডাকা হয়েছে শোনার প্রতীক্ষা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিভাস দত্ত আঙুলের ইশারায় ঘরের কোণের সুটকেসটা দেখিয়ে বলেছেন, ওটা খুলুন একটু, ওপরেই একটা খাম আছে দেখুন—

জ্যোতিরাণী অবাক, ভিতরে ভিতরে সচকিতও। কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা করা থেকেও যা বললেন সেটা করা সহজ। উঠে সুটকেস খুললেন। কাপড়-জামার সঙ্গে আরো কি এক একটা চোখে পড়ল। ওষুধের ফাইল। মন বাদামী রঙের লম্বাটে খামটার দিকে, তাই দেখেও খেয়াল করলেন না। খাম হাতে নিয়ে ফিরলেন।

আপনার কাছে রেখে দিন, ওটা শমীর। দরকার মত ভাঙাবেন, নয় তো বছর-বছর বদলে নেবেন।

জ্যোতিরাণীর দ্বিগুণ বিস্ময়। কিছু না বুঝে খামে হাত ঢোকালেন। কিছু দিন আগে কি একটা ফর্মে সই করেছিলেন মনে পড়ল।

খামের মধ্যে ছাপা-কাগজসহ তিন হাজার টাকার সরকারী বণ্ড একটা শমীর নামে। তিনি তার গার্জেন।

কি ব্যাপার?

সামান্যই। ওর দায় তো সব আপনিই নিলেন। মেয়েটার ভাগ্য ভাল, সব গেলেও শেষ পর্যন্ত আবার মা পেয়েছে। তবু নিজের সান্ত্বনার জন্য যেটুকু করা গেল...আমার ক্ষমতা তো আপনি ভালই জানেন।

কিন্তু এই সান্ত্বনার ব্যবস্থাও পরে করলে চলত না? সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল?

বিভাস দত্তর নির্লিপ্ত হাসি নরম মনে হয়নি একটুও। জবাব দিয়েছেন, যাচ্ছে না এই গ্যারান্টিই বা কে দেবে। কিছু হয়ে বসলে তো মেয়েটা এক পয়সাও পাবে

না।...শিগগীরই কোথাও পাড়ি দেবার মতলব আছে, কবে আর দেখা হবে না হবে ঠিক কি।

সেই বোঝাপড়ার পর গত পনেরো দিন ধরে ভদ্রলোককে সুস্থ ঠাণ্ডা মেজাজে ফিরিয়ে আনার তাগিদ বোধ করেছিলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু এই শুনে নিজের মেজাজই তেতে উঠেছিল। এও আর এক ধরনের প্রতিশোধ ভিন্ন আর কিছু ভাবা সম্ভব হয়নি। কোথায় যাচ্ছেন?

দূরেই বোধ হয়, তবে কত দূরে এক্ষুনি ঠিক বলতে পারব না।

এও পুরুষের জবাব মনে হয়নি জ্যোতিরাণীর। প্রতিশোধের ছকে-বাঁধা দুর্বল অস্ত্র ভিন্ন সেই মুহূর্তে আর কিছু ভাবেননি। নিজেকে সংযত করে কিছু বলতেন হয়ত। হাতের খামটা তাঁর শয্যায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলেও যেতে পারতেন। কিন্তু তার আগেই দোরগোড়ায় অচেনা আগন্তুকের সাড়া পাওয়া গেল। বিভাস দত্ত ভিতরে ডেকে বসতে বসলেন তাঁকে। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে অপ্রস্তুত একটু।

জ্যোতিরাণীর তক্ষুনি মনে হল এযাবৎ তাঁর উপস্থিতিতে ঘরে পরিচিত বা অপরিচিত কোনো আগন্তুকের পদার্পণ ঘটেনি। বিভাস দত্তর আচরণে আরো একটু ব্যতিক্রম অনুভব করলেন। গম্ভীর মুখেই তাঁব দিকে ফিরে বলেছেন, রাত হল, অনেক দূর যাবেন, আপনার আর দেরি করা উচিত নয়।

অর্থাৎ তাঁর দরকারী কথা ফুবিয়েছে। নিজে থেকে কখনো যেতে বলেছেন মনে পড়ে না। অগত্যা খামটা হাতে করেই উঠতে হয়েছে।—আপনি কবে যাচ্ছেন?

শিগগীরই বোধ হয়। যাবার আগে জানাব।

রাজ্যের বিরক্তি নিয়েই জ্যোতিরাণী ঘরে ফিরেছিলেন। আত্মপীড়নের এই রাস্তা বেছে নেওয়া হবে ভাবেননি। শরীর সুস্থ নয় বলেই দূরে যাওয়াব অনড অভিমান, আর টাকা-পয়সার অবস্থা সচ্ছল নয় বলেই শমীর নামে তিন হাজার টাকার বণ্ড কিনে দিয়ে তাঁকে বেঁধার চেষ্টা। এই করে তাঁকেই শুধু আক্কেল দেওয়া হল। এর থেকে আর একটু বলিষ্ঠ আচরণ অন্তত জ্যোতিরাণী আশা করেছিলেন।

কিন্তু ঘরে ফেরার পর বিরক্তি আর ক্ষোভের তলায় কি এক অজ্ঞাত অশান্তি উঁকিঝুঁকি দিতে চেয়েছে। রাতের নিবিবিলি শয্যায় সেই অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ আরো বেড়েছে। অথচ তিনি ধরতে পারেননি এ-রকম লাগছে কেন। জীবনেব গোড়া থেকে একটা লোক উপকারের বিনিময়ে অবুঝ আক্রোশে যে আত্মপীড়নের পথে চলেছে তার নির্মম ফলাফলের সম্ভাবনা চিন্তা করে?

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তারপর রাতেব এই স্বপ্ন। রাতের নয়, ভোর রাতের।

বেলা বাড়ার পরেও অস্থিরতা দূর হয়নি। স্বপ্নের দৃশ্য যতবার মনে পড়েছে ততবার কেঁপে উঠেছেন তিনি। কিছু ঘটেই গেল? খবর পাবেন কী করে?...থেকে থেকে মানুষটার বিগত সন্ধ্যার কথাবার্তা হাবভাব মনে পড়েছে। অশান্তির তাড়নায় শমীকে আড়াল করে এক-একবার জানলার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছেন তিনি। যেন ওই জানলা দিয়েই কাউকে দেখতে পাবেন, কিছু একটা খবর পাবেন।

...বলছিল কবে আর দেখা হবে না হবে ঠিক কি! এ কথার অর্থ তো অনেক কিছুই হতে পারে।

...কোথায় যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিল; দূরেই বোধ হয়, তবে কত দূরে এক্ষুনি ঠিক বলতে পারব না।

এ-কথারই বা অর্থ কি? দূরে মানে কত দূরে? এক্ষুনি ঠিক বলতে পারব না বলার অর্থ আরো কি হতে পারে?

যা হতে পারে ভাবতে গিয়ে চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া ঘন হয়ে উঠল আরো। সঙ্গে সঙ্গে আবার কি মনে পড়তে চমকেই উঠলেন। বগু-এর খাম বার করার জন্য ভদ্রলোকের সুটকেস খুলতে প্রথমে যে জিনিসটা চোখে পড়েছিল তা ঠিক এই মুহূর্তেই মনে পড়ল কেন? ঘুমের ওষুধের ফাইল একটা। অত ঘুমের ওষুধ কেন? ওটা সুটকেসেই বা কেন? বিলিতি বইয়ে স্লিপিং পীল্-এর অনেক মর্মান্তিক ভূমিকার কথা পড়া আছে। বিভাস দত্তর কি মতলব?

স্কুলে যেতে পারলেন না। গেলেন না। শমীকে বললেন—শরীরটা ভালো লাগছে না। ও স্কুলে চলে গেল। যত ভাবছেন রাতের দৃশ্য ততো কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে। খবর দেবার কেউ নেই, থেকে থেকে তবু উৎকর্ণ সচকিত হয়ে উঠলেন জ্যোতিরাণী। কেউ যেন কিছু একটা খবর দিয়ে যেতে পারে। অঘটন কল্পনা করে বেদনা বা অনুকম্পায় অস্থির হয়ে উঠছেন না তিনি। উল্টে চোখেমুখে শুকনো কঠিন ছাপ পড়ছে একটা। এত বড় আঘাতের বোঝা যদি কেউ তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয় তাকে তিনি কোনদিন ক্ষমা করবেন না।

একটায় শমী টিফিন থেকে আসবে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। টিফিন খেয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। দুপুরে ভিড় কম, অনায়াসেই ট্রামে-বাসে যেতে পারতেন। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ট্যাক্সিতে উঠলেন।

ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায় বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াবার পর এতক্ষণের আচ্ছন্ন ভাব কেটে আসতে লাগল। না, কিছু হয়নি। যা দেখেছেন তা স্বপ্নই। অবচেতন মনের নানা ভাবনা-চিন্তার প্রতিক্রিয়া। এবারে সঙ্কোচ। যেমন নিঃশব্দে এসেছেন তেমনি ফিরে যাবেন কিনা ভাবলেন একবার। কিন্তু অস্বস্তি একেবারে মিলিয়ে যায়নি। আর দেখা না হতে পারে বলেছেন, অনেক দূরে পাড়ি দেবার কথা বলেছেন, সুটকেস-এ একগাদা ঘুমের ওষুধ রেখেছেন।...আর ভোর রাতের ওই স্বপ্ন। ওটা পূর্বগামিনী ছায়া কিনা কে জানে?

দরজার কড়া নাড়তে হবে ভেবেছিলেন। তার আগে ঠেলে দেখলেন। ভেজানো ছিল, খুলে গেল।

বিভাস দত্ত অপ্রস্তুত। অবাক।

তাঁকে দেখলেই বোঝা যায় ভিতর সুস্থির নয় একটুও। ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন। উসকো-খুসকো মূর্তি। চোখের কোণে কালি। ভিতরে ভিতরে অশান্ত কিছুর বোঝাপড়া চলছিল। মানসিক অস্থিরতার মুখে হাতে-নাতে ধরা পড়লেন যেন।

জ্যোতিরাণীর মনে হল তিন সপ্তাহ আগে সেই প্রত্যাশা নাকচের দিনেও অনেকটা এই গোছের অসহিষ্ণুতা, এই রকম উদভ্রান্ত মুখ দেখেছিলেন। আজ তার থেকে বেশি দেখছেন। গতকাল তিনি আসবেন জেনেই নিজেকে তিনি সংযত রেখেছিলেন, এই চেহারাটা গোপন রেখেছিলেন।

কি ব্যাপার, এ সময়ে যে...স্কুল নেই?

যাইনি।

ও. আমারই ভাগ্য বলতে হবে, বসুন।

বললেন বটে, কিন্তু স্নায়ুর যে নিপীড়নে মানুষ দোর বন্ধ করে একলা থাকতে চায় সেই গোছের বিরস মুখ এখনো। জ্যোতিরাণীর মনে হল স্বপ্নের অঘটন এই মানুষই শুধু ঘটাতে পারে। ঘরের চেয়ার দুটো দেয়ালের কোণে সরানো, শয্যার একধারে বসলেন তিনি। বললেন, কাল লোক এসে যেতে আপনার মনে কি আছে শোনা হল না। তাই এলাম।

বিভাস দত্ত হাসতে চেষ্টা করলেন একটু। হাসির বদলে মুখে বিদ্রূপের দাগ কেটে বসল। বালিশ উল্টে সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিলেন। সিগারেট ধরালেন। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করার তাগিদ। কিন্তু পেরে উঠছেন না। কয়েক পা এগিয়ে একটু খেয়াল না করেই দরজা দুটো ঠেলে ভেজিয়ে দিলেন। ঘরে একলা থাকলে যা করতেন। তারপর বললেন, আপনার অশেষ অনুকম্পা।

জ্যোতিরাণীর নিষ্পলক দু চোখ তাঁর মুখের ওপর থেকে নড়েনি। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল তো মোটামুটি ভালই দেখে গেছলাম, আজ খারাপ দেখছি কেন?

বিড়বিড় করে বিভাস দত্ত জবাব দিলেন, ও কিছু না, রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

জ্যোতিরাণীর দৃষ্টি ওই মুখের ওপর আরো এঁটে বসেছে। বললেন, না ঘুমিয়ে শরীর খারাপ করার থেকে এক-আধটা ঘুমের ওষুধ-টষুধ খেয়ে ঘুমুলেও তো পারতেন।

ঘরের কোণ থেকে চেয়ার মাঝখানে টেনে এনে বসলেন বিভাস দত্ত। সহজতার বিবরে ঢোকার চেষ্টার ত্রুটি নেই। বললেন, খেয়েছিলাম, কাজ হয়নি। খেয়ে খেয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে বোধ হয়—

ভিতরের একটা জমাট-বাঁধা শঙ্কা হাল্কা হতে থাকল। বললেন, তাহলে ওসব না খাওয়াই ভাল।

সিগারেট মুখে তুলতে গিয়েও তোলা হল না। সহিষ্ণুতায় চিড় খেল হঠাৎ। —আপনি আমার ভাল-মন্দ নিয়ে উতলা হতে চেষ্টা করছেন কেন?

উক্তিটা কানে লাগার মত। জ্যোতিরাণী চুপচাপ চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন?

জবাব দেবার আগে আবার ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা। চেষ্টাই শুধু। কিন্তু ক্ষোভের জবাবটা আপনিই ঠেলে বেরুলো।—যাবার ইচ্ছে তো অনেক দূরে, এত দূরে যে ভাবতে নিজেরই খারাপ লাগে, বুঝলেন?

জ্যোতিরাণী কি ভিতরে ভিতরে নাড়া খেলেন একপ্রস্থ? বাইরে বোঝা গেল না। দু চোখের আওতা থেকে ওই মুখের একটা রেখাও অলক্ষ্যে নেই। বললেন, আপনি পুরুষমানুষ, তার ওপর এত বড় লেখক, একথা আপনার সাজে?

এই সামান্য কথা-কটার মধ্যে কি যে ছিল জ্যোতিরাণী জানতেন না। নিজের ওপর দখল আনার শেষ ঐকান্তিক চেষ্টাও হঠাৎ ধূলিস্যাৎ বুঝি। কালি-পড়া দু চোখের গভীরের এক অনাবৃত তপ্ত যাতনা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। আসছেই। সিগারেট ফেলে বিভাস দত্ত উঠে এসেছেন। কাছে। ঈষৎ ঝুঁকে তাকিয়েছেন। স্নায়ুর তাড়নায় দুই ঠোঁট কাঁপছে।—পুরুষমানুষ...এত বড় লেখক...সাজে না...না? গলার স্বরও হিসহিস শব্দের মত।—সাজে না বলেই তাকে আমি ক্ষমা করতে চাই না, তাকে আমি শাস্তি

দিতে চাই...এক-একসময় এত কঠিন শাস্তির কথা মনে হয় যা শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন। কিন্তু পারি না কেন? কেন পারি না? কেন পারি না? তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি, শেষ হয়ে যাচ্ছি, বুকের হাড়-পাঁজর সব বরফ হয়ে গেল, তবু কেন পারি না?

জ্যোতিরাণী নিশ্চল নিস্পন্দ।

আরো কাছে এগোলেন বিভাস দত্ত, আরো ঝুঁকলেন। দু হাত তাঁর দুই কাঁধে উঠে এলো। ঠোঁট দুটো শুধু নয়, ওই হাতের স্পর্শে মানুষটার সর্বাঙ্গ কাঁপছে টের পেলেন। গলার স্বর, কথাগুলো কানের পর্দায় বিঁধেই চলল।—আজ থেকে নয়—সতেরো বছর ধরে এই যন্ত্রণা পুষছি আমি। শিবেশ্বরের ছোট বাড়িতে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম, সেইদিন থেকে—কালীঘাটের মন্দিরে যেদিন দেখেছিলাম, তখন থেকে—। যেদিন চিঠি লিখেছিলাম, তখন থেকে—দাঙ্গায় কাটাকাটির মধ্যে ত্রাসে হিম হয়েও যখন ছুটে না গিয়ে পারিনি তখন থেকে—প্রতিদিন প্রত্যেক দিন। এ যন্ত্রণার খবর তুমি জান না? বোঝ না? যখন উপায় ছিল না তখন জেনেও জানতে চাওনি কেন বুঝি, কিন্তু এখনো চাও না কেন?

কাঠ হয়েই ছিলেন জ্যোতিরাণী। কিন্তু সচকিত হঠাৎ। হাত দুটো তাঁর কাঁধে, কিন্তু মানুষটা টলছে। চোখে অন্ধকার দেখেছেন যেন। বাতাসের অভাবে যেন চেহারা কি রকম হয়ে যাচ্ছে। মনে হল মাটিতেই পড়ে যাবেন। সামলাতে চেষ্টা করে শয্যায় বসে পড়লেন বিভাস দত্ত। তারপর শুয়ে পড়লেন। মুখ ঘেমে জবজবে হয়ে গেছে। ইশারায় পাখাটা দেখালেন।

ত্রস্তে উঠে জ্যোতিরাণী সুইচ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিলেন। তারপর কাছে এসে সামনে ঝুঁকলেন। বিবর্ণ মূর্তি দেখে বিষম ভয় পেয়েছেন। বুকে হাত রাখতে গিয়েও পারলেন না। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল?

জবাব দেবার আগে বিভাস দত্ত বড় করে দম নিতে চেষ্টা করলেন একটা। এবারে নিতে পারলেন। তারপর এক হাত বাড়িয়ে জ্যোতিরাণীর ঝুঁকে-পড়া কাঁধের দিকটা সজোরে আঁকড়ে ধরলেন, অন্য হাতে তার হাত ধরে তাঁকে কাছে টেনে বসালেন। তেমনি অসহিষ্ণু উত্তেজনায় বললেন, ও কিছু না, কদিন ধরে মাঝে মাঝে এ-রকম হচ্ছে। আমার কথার জবাব দাও, এই যন্ত্রণা নিয়ে আমি থাকব কেন? বাঁচতে চাইব কেন? শিবেশ্বরের ঘর ছাড়তে হল বলে আমি দুঃখিত হতে চেষ্টা করেছি, তোমার দুঃখটা বড় করে দেখা উচিত বলে নিজেকে আমি চোখ রাঙিয়েছি—পারিনি। এতকাল ধরে ভিতরে যার তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, সে পিপাসার জল দেখে উল্টে লাফিয়ে উঠেছে। এখনো তুমি তাকে ফেরালে সে কি করবে? কি করবে?

শুধু কথায় নয়, তপ্ত নিঃশ্বাসের ঝাপটা লাগছে জ্যোতিরাণীর চোখে-মুখে। সর্বাঙ্গ অবশ পঙ্গু যেন। দুটো নয়, এক উদ্‌ভ্রান্ত তপ্ত বুভুক্ষু যাতনা অমোঘ আকর্ষণে তাঁকে কাছে ধরে রেখেছে। টেনে রেখেছে। অপ্রকৃতিস্থ জ্বলজ্বলে দুটো চোখ আধ হাতের মধ্যে তাঁর মুখের ওপর স্থির হতে চেষ্টা করছে। বিচলিত আবেগে গলার স্বর কাঁপছে। —জ্যোতিরাণী, আমাকে তুমি বাঁচাতে পার না? আমাকে দয়া করতে পার না? আমি কেমন বড় লেখক জান তুমি? বই বিক্রি অর্ধেকের বেশি নেমে গেছে, প্রকাশকরা এখন আর দৌড়ে আসে না, সকলে বলে আমার লেখা পড়ে গেছে। আমি জানি

মিথ্যে বলে না, ঠাণ্ডা মাথায় আমি দু ঘণ্টা বসে লিখতে পারি না, ভাল লিখব কি করে? তোমার জন্যে আমার লেখার এই হাল, শরীরের এই হাল, শুধু তোমার জন্যে! তোমার শুকনো কৃতজ্ঞতা দিয়ে আমি কি করব? কৃতজ্ঞতার কোন কাজ আমি করিনি, যেটুকু করেছি নিজের প্রাণের দায়ে করেছি—তোমার ওই স্কুলের চাকরির ব্যবস্থাও আমি করিনি, সব করেছে তোমার মামাশ্বশুর গৌরবিমল—তাদেরই প্রতিষ্ঠানের স্কুল ওটা। আমাকে বলতে নিষেধ করেছিল—আর তোমার কৃতজ্ঞতা চাইনে বলেই বললাম। আমি শুধু তোমাকে চাই, বাঁচতে চাই, তুমি রক্ষা কর, আমাকে বাঁচতে দাও—

দুই হাতের প্রবল তাড়নায় আধ হাতের ব্যবধান ঘুচে গেল। জ্যোতিরাণী নিস্পন্দ তেমনি। বাধা দেননি, বাধা দিতে পারেননি। নিজের অস্তিত্বের বৃন্ত থেকে এক অন্ধ আবেগের আবর্তের মধ্যে খসে পড়েছেন। যে আবেগ এই অস্তিত্বের অণুতে-অণুতে আশ্রয় খুঁজছে, কাঁপছে থরো-থরো। ওই কাঁপুনি জ্যোতিরাণী টের পাচ্ছেন, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করছেন। অধরে, বক্ষপঞ্জরে, কটিদেশে। তৃষ্ণার এই উদভ্রান্ত নিপীড়নে সব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে মানুষটা আর কাঁপছে।

জ্যোতিরাণী অসহায়।

কতক্ষণ কেটেছে, একটা যুগের অবসান হয়ে গেল কিনা জানেন না। কাঁপুনি থেমেছে, কিন্তু আশ্রয় পেল কিনা সেই সংশয় এখনো ঘোচেনি। দুটো চোখ তার মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে দেখলেন, স্থির কিন্তু সেই দৃষ্টির গভীরে অস্থিরতার ঢেউ। ফিসফিস কথাগুলো বুঝি কানের পর্দা কুরে-কুরে মগজে ঢুকল।

জ্যোতিরাণী, তোমাকে ছেড়ে আমি কোনদিন দূরে যাইনি, এই সতেরো বছরের মধ্যেও যেতে পারিনি। আমি দূরে যেতে চাই না, আমি কোথাও যেতে চাই না। আমি তোমাকে চাই, তোমাকে নিয়ে সংসার গড়তে চাই—গত তিন বছর ধরে এই সংসারের তৃষ্ণা আমাকে পাগল করেছে। এই সংসার পেলে আমি আবার সুস্থ হব, আবার লিখতে পারব, তুমি বলো, বলো—

আস্তে আস্তে উঠে বসেছেন জ্যোতিরাণী। নিজের অগোচরে স্রস্ত বসন সংবৃত করেছেন একটু। তবু আত্মস্থ হতে সময় লেগেছে। আচ্ছন্নতার ঘোর কাটতে সময় লেগেছে। এখনো কেটেছে কিনা জানেন না। দুটো ব্যগ্র চোখ তাঁর মুখের ওপর আটকে আছে। তাঁকে আগলে রেখেছে, ব্যাকুল তৃষ্ণার তাপ ছড়াচ্ছে।

অনেক—অনেকক্ষণ বাদে কিছু বলেছেন তিনি। কি বলেছেন সঠিক জানেন না। নিজের জ্ঞাতসারে বলেননি যেন। বলেছেন, সে সংসার থেকে কি পাওয়া যাবে...আমাতেই শেষ, নতুন কেউ আসবে না...

কোন কথা তলিয়ে বোঝার মত মানসিক অবস্থা নয় বিভাস দত্তর। কিন্তু এই উক্তির তাৎপর্য মুহূর্তের মধ্যেই বুঝে নিলেন। প্রথম সন্তান আসার পর অপারেশনের খবরটাও অজ্ঞাত ছিল না তাঁর। জ্যোতিরাণীর এই কথা কটাই সব সংশয় ঘোচার মত, হাতের মুঠোয় অপ্রত্যাশিত ছাড়পত্র পাওয়ার মত। নিবিড় আগ্রহে দু হাত বাড়িয়ে আবার তাঁর কাছ থেকেই তাঁকে ছিনিয়ে আনলেন যেন। বলে উঠলেন, চাইনে, তোমার বাইরে আর কি-চ্ছু চাইনে আমি—কিছু না—বুঝলে?

সদ্য-পাওয়া আশ্রয়ের উৎস দু হাতে আগলে রেখে তার মধ্যে নিঃশেষে ডুবে

যাবার তাড়না, নিঃশেষে হারিয়ে যাবার আকুতি।

জ্যোতিরাণী তেমনি অসহায়। ভবিতব্যের হাতের তিনি কি পুতুল একখানা?

ডান চোখটা কাঁপছে থেকে থেকে। মাঝের কতগুলো দিন একটা আচ্ছন্নের ঘোরে কেটেছে। আজ হঠাৎ ডান চোখটা কাঁপছে কেন বিকেল থেকে। তিন রাস্তার ত্রিকোণ জোড়া বড় দালানের এক বৃদ্ধা বলতেন, মেয়েদের ডান চোখ কাঁপলে অশুভ। মন বলে নিজস্ব কিছু আর তো ধরে রাখতে চান না জ্যোতিরাণী, তবু মনে পড়ল কেন?

কাগজে-কলমে সই হয়ে গেছে। লোকে তাঁকে মিসেস দত্ত বলবে। এখনো কেউ বলেনি। বলবে। খুব নিঃশব্দে মিসেস বিভাস দত্ত হয়েছেন তিনি। জনা-দুই সাক্ষী ভিন্ন বাড়তি কেউ ছিল না। বাড়তি কাউকে চাননি, সেটা মুখ ফুটে বলতেও হয়নি। যাঁর বোঝবার তিনি বুঝে নিয়েছেন। কিন্তু গোপন থাকার ব্যাপাব নয়। যাঁর ঘরে এসেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ কেউ আছে জানতেন না। দেখা গেল আছেই দু-দশজন। অন্তত এই ব্যাপারের পর সানন্দ আগ্রহ দেখাবার মত কেউ কেউ আছে। তাদের ডেকে একদিন আপ্যায়নের ব্যবস্থা না করলে বিসদৃশ দেখায় শুনেছেন।

বিভাস দত্ত অনুমতি নেবাব মত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জ্যোতিরাণী আপত্তি করেননি। তাঁব যাই হোক, একজনের জীবনের উৎসব যে, সেটা অস্বীকার কববেন কি কবে?

লেখকের অন্তরঙ্গজনেবা রাত্রিতে আসছেন। শমী ব্যস্ত, তার কাকু ব্যস্ত। কিন্তু বিকেল থেকে ডান চোখটা কাঁপছে!

তিনি মিসেস দত্ত, জ্যোতিরাণী দত্ত...এ সত্যটায় অভ্যস্ত হতে আব কত দিন লাগবে? অভ্যস্ত হতে হবে ভাবতেও অদ্ভুত লেগেছে। বসন্ত প্রাঙ্গণের দ্বিতীয় বাসরে পুরুষ এসেছে। তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। একজনের হাসি মিইয়ে যায় দেখেই তাঁকে হাসতে হয়েছে। অতনু-সান্নিধ্যের প্রথম পুরুষ হিংস্র নগ্ন নির্দয় অত্যাচারী ছিল, তুলনায় দ্বিতীয় বাসরের দ্বিতীয় পুরুষের অনেক ভদ্র অনেক সদয় ভীরু সচেতন পদক্ষেপ। অথচ এই দ্বিতীয় অধ্যায়টাই ব্যভিচারেব মত লেগেছিল। বিলিতি উপন্যাসে পড়া যুদ্ধ-অঙ্গনের এক নার্সের কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। অকরুণ শীতের হিমেল রাত্রিতে পর্যাপ্ত আচ্ছাদনশূন্য এক আহত সৈনিককে সমস্ত রাত নিজের নগ্ন দেহেব তাপ ছড়িয়ে জিইয়ে বাখতে চেষ্টা কবেছিল। সেখানে কোনো নীতির প্রশ্ন আঁচড় ফেলেনি। এও তাই। জীবন-যুদ্ধের এক মুমূর্ষুকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার মতই।

কিন্তু আজ আবার ডান চোখটা কাঁপছে কেন থেকে থেকে?

...তিন রাস্তার ত্রিকোণ জোড়া বাড়ির কজন জেনেছে খবরটা? কালীদা জানেন? মাঝে তাঁরই সঙ্গে শমীর কাকা প্রীতির সম্পর্কটা আগের থেকে বেশি পুষ্ট হয়ে উঠেছিল। কালো নোটবইয়ে কালীদার সেই লেখাগুলো পড়ার পর এই প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখাটা একেবারে উদ্দেশ্যশূন্য মনে হয়নি জ্যোতিরাণীর।...কালীদার সঙ্গে নাকি কোথায় দেখা হয়ে গেছল, বিয়ের খবরটা তাঁকে জানানো হয়েছে। বিভাস দত্তর কাছে সবার আগে ও-বাড়িতে পৌঁছে দেবার মতই খবর বটে এটা। জ্যোতিরাণী দোষ ধরেননি। আজকের প্রীতির অনুষ্ঠানে কালীদারও নিমন্ত্রণ হয়েছে নাকি? জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করেননি। তবে মনে হয় না, অতটা নির্দয় হবার সম্ভাবনা কম।

অতীতের যোগ সবই ছিঁড়েছে, তবু কালীদার ওই লেখাগুলো আর তাঁর শকুনিস্মৃতি পড়ার অস্বাচ্ছন্দ্য মনের কোথাও লেগেই আছে। খবরটা কালীদা ও-বাড়ির কার কার কানে দিয়েছেন? বাবার আগে ও-বাড়ির মালিকের কানেই দেবার কথা। গম্ভীর মুখে কালীদার সেই খবর দেবার প্রহসন জ্যোতিরাণী কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করছেন কেন?

সেখানকার আর একজনের জানাটা জ্যোতিরাণী বড় আচমকা অনুভব করেছিলেন। তার আগে ঐ ভদ্রলোকও কালীদার কাছ থেকেই শুনেছিলেন নিশ্চয়।...মামাশ্বশুর গৌরবিমল। কি আশ্চর্য! এখন আবার মামাশ্বশুর ভাবছেন কেন! সেই অসহ্য বিড়ম্বনার ছাপ এখনো মুছে যায়নি।

দিন দশেক আগের কথা।

টানা দু মাসের ছুটি নিয়েছিলেন স্কুল থেকে। বিশ দিনও কাটেনি। কপালে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে কেমন করে আবার ওই স্কুলে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন সেই অস্বস্তি মনের তলায় গোপন ছিল। তিনি লম্বা ছুটি নিলেও শমীর স্কুল আছে। ওকে নিয়েই সমস্যা। মাঝে ট্রাম বদল করা আছে। এই কদিন জ্যোতিরাণী ওকে পৌঁছে দিয়ে আসছিলেন। একেবারে স্কুল গেট পর্যন্ত নয়। ট্রাম থেকে নেমে স্কুলের রাস্তার মোড়ে ওকে ছেড়ে দিতেন। ছুটি হলে বিভাস দত্ত নিয়ে আসতেন।

ঘটনাটা ঘটল বিয়ের ঠিক দশ দিনের মাথায়। শমীকে ছেড়ে দিয়ে ডিপো থেকে ফাঁকা ট্রামেই উঠেছিলেন জ্যোতিরাণী। পাঁচ-সাতজনের বেশি লোক ছিল না ট্রামে। পরের স্টপেজে যিনি উঠলেন, দেখা মাত্র জ্যোতিরাণীর হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম।

গৌরবিমলবাবু।

লেডীস সীট ছাড়িয়ে সামনে বসেছেন, তারপর খেয়াল হতে ফিরে তাকিয়েছেন। ধরণী দ্বিধা হলেও জ্যোতিরাণী তখন বাঁচতেন বোধ হয়।

গৌরবিমল চেয়েই রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরে বসলেন আবার। গম্ভীর ঠাণ্ডা দু চোখ সামনের দিকে ফেরালেন। তাঁর এত গম্ভীর নিস্পৃহ মুখ জ্যোতিরাণী আর দেখেননি।...টিকিটের পয়সা দেবার জন্য ভদ্রলোক পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন দেখলেন। পয়সাও বার করলেন। কিন্তু সামনেই স্টপেজ আর একটা।

গৌরবিমল উঠে পড়লেন। দু সারির সরু ফাঁক দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন। আর ফিরেও তাকালেন না। চেনেন না কাউকে। চেনার ইচ্ছেও নেই। কণ্ডাক্টরের হাতে পয়সা গুঁজে দিয়ে ট্রাম ভাল করে থামার আগেই নেমে গেলেন।

জ্যোতিরাণীর সমস্ত মুখ লাল। কানের দু পাশ গরম ঠেকছে। নিশ্চল বসেছিলেন তিনি। তার পরেই মনে পড়েছে, ওই ভদ্রলোকের অনুকম্পাতেই সাড়ে তিন বছর ধরে স্কুলের চাকরি করছেন তিনি। অনায়াসে সহকারী হেডমিস্ট্রেস হতে পেরেছেন। ছুটির পরে আবার তাঁরই দেওয়া অনুগ্রহের মধ্যে ফিরে যেতে হবে।

সেই দিন আর তার পরের পাঁচ-সাত দিনের জন্য আচ্ছন্নতার ঘোর কেটে গেছল জ্যোতিরাণীর। আবার তিনি সজাগ হয়ে উঠেছিলেন, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন। ধমনীতে উষ্ণ স্রোত অনুভব করেছিলেন।

ফ্ল্যাটে ফিরেই বিভাস দত্তকে বলেছেন, ওই স্কুলের চাকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কালই। আর শমীকেও দু-চার দিনের মধ্যে এদিকের কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিভাস দত্ত বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। বক্তব্য শুনে নয়, তাঁকে দেখেই।—কি ব্যাপার?

কিছু না। চেষ্টা করলে এদিকের কোন স্কুলে কাজ পাওয়া অসম্ভব হবে না বোধ হয়, একটু সময় লাগতে পারে। অসুবিধে হবে?

আমার! আমার কি অসুবিধে! ওই তপ্ত মুখ দেখে তিনি শঙ্কা বোধ করেছিলেন, কিন্তু ভালও লেগেছিল। কিছু যে হয়েছে বুঝেছেন, কিন্তু আর জেরা করেননি। বলেছেন, এ-সময়ে স্কুল ছাড়লে শমীর অসুবিধে হবে না?

আমি ঠিক করে নেব। আর বাস আছে এ রকম একটা ভাল স্কুলে দেব তাকে। ওর ক্ষতি হতে দেব না।

পরদিনই চাকরি ছাড়ার চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। তার দুই-এক দিনের মধ্যে বিভাস দত্ত গিয়ে শমীর ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছেন।

কটা দিন একটু চাঞ্চল্যের মধ্যে কেটেছে জ্যোতিরাণীর। নিজে গিয়ে দেখাশুনা করে শমীকে একটা ভাল স্কুলেই ভর্তি করতে পেরেছেন। স্কুলের বাসের ব্যবস্থাও হয়েছে। বিভাস দত্ত সানন্দে লক্ষ্য করেছেন, তাঁর এই পক্ষকালের স্ত্রীটি কিছু করার সঙ্কল্প নিয়ে সশরীরে গিয়ে হাজির হলে দুরূহ কাজও সহজে সম্পন্ন হয়।

জ্যোতিরাণীর মনের তলায় এবারে চাকরি সংগ্রহ করার সঙ্কল্প। নতুন ব্যবস্থার ফলে শমীর জন্যেই দ্বিগুণের বেশি খরচ হবে। তাছাড়া নিজস্ব একটা অবলম্বনের তাগিদও আছে। চাকরি করতে না পারলে বড় বেশি ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে। কাগজের বিজ্ঞাপন পড়া শুরু করেছিলেন আবার। এই তাগিদে হঠাৎই একজনের কথা মনে পড়েছে। যে মহিলা অন্য স্কুলে হেডমিস্ট্রেস হবার ফলে তিনি সহকারী হেডমিস্ট্রেস হতে পেরেছিলেন, তাঁর কথা। ভদ্রমহিলা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, কাজের নিষ্ঠা দেখে তাঁর ওপর খুশিও ছিলেন।

জ্যোতিরাণী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছলেন। প্রত্যাশার থেকেও বেশি ফল পেয়েছেন। তাঁর স্কুলে আসতে চান শুনে ভদ্রমহিলা খুশি। কিন্তু পাকা পোস্ট কিছু খালি নেই। এক টীচার সবে ছুটিতে গেছেন, তাঁর জায়গায় তক্ষুনি তাঁকে নেবার ব্যবস্থা করলেন। আশ্বাস দিলেন হামেশাই কেউ-না-কেউ ছুটিছাটায় যাচ্ছে, তাদের জায়গায় কিছুদিন লেগে থাকলে পাকা ব্যবস্থা একটা তিনিই করবেন।

নতুন স্কুলে সামনের সপ্তাহ থেকে কাজে লাগা স্থির।

আগের স্কুলের চাকরি ছাড়ার খবরটা ইতিমধ্যে যথাস্থানে অর্থাৎ বিভাস দত্তর মারফৎ যিনি চাকরি দিয়েছিলেন তাঁর কানে পৌঁছবার কথা। কেন চাকরি ছেড়েছেন, বুঝবেন। এই নতুন চাকরির খবরও ওই একজনকে জানাতে পারলে ভাল লাগত।

কিন্তু তাপ কমেছে। অসহিষ্ণু চাঞ্চল্য কমেছে। দুদিন ধরে ফিরে আবার এই নতুন বাস্তবের আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটছে। সন্ধ্যা পেরুলেই অভ্যাগতরা আসবেন। নতুন জীবনের নতুন অভ্যাগত। তাদের মধ্যে গিয়ে বসতে হবে, হাসতে হবে, নতুন জীবনের শুভেচ্ছা নিতে হবে। আমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি নয়। খাওয়া-দাওয়ার ভার কেটারারের হাতে দেওয়া হয়েছে। শমী আর তার কাকা ওপাশের ঘরটা গোছগাছ করে তোলার উৎসাহে ব্যস্ত। তাঁরও সরে থাকা ভাল দেখায় না। এইদিনেই ডান চোখটা কাঁপছে কেন এত?

হাসিমুখেই ঘরে ঢুকলেন জ্যোতিরাণী। শমীর উৎসাহ দেখে ভ্রূকুটিও করলেন একটু। শমী লজ্জা পেল। মাসীমা কাকীমা হয়েছে, খুশিও যেমন ওর লজ্জাও তেমনি। লজ্জায়

প্রথম দু দিন কাছে ঘেঁষতে চায়নি। আজও দুপুরে বলছিল, কাকীমা ডাকতে বড় বেশি লজ্জা করছে, আগের মত মাসী ডাকলে কি হয়।

জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, কি ডাকবি ঠিক করলি?

শমী লজ্জা পেয়ে শাড়ি সামলাতে সামলাতে পালাল। মাঝে মাঝে শখ করে শাড়ি পরছে এখন। শাড়ি পরলে দিব্যি বড়-সড় দেখায়। বিভাস দত্ত হাসছেন। শুধু তাঁকে খুশি করবার জন্য এভাবে নিজের সঙ্গে যুঝে জ্যোতিরাণীর সহজ হবার চেষ্টা। গত কদিনের মধ্যে অনেক সময় লক্ষ্য করেছেন তাঁকে, বলেছেনও, এত বছরের মধ্যে তোমার মুখের হাসি আমার বরাতে কমই জুটেছে, দেখা যাক আর কতকাল অপেক্ষা করতে হয়।

শমী চলে যেতে হাসিমুখে আলমারি খুলে কাগজে মোড়া কি একটা বার করলেন বিভাস দত্ত। কাগজ সরাতে দেখা গেল হাজারিবাগের সেই বাঁধানো ফোটো। নিজের, সিতুর আর জ্যোতিরাণীর। নতুন ফ্লাটের কোন দেয়ালে ওটা আর চোখে পড়েনি বটে।

জায়গা বেছে বিভাস দত্ত দেওয়ালে টাঙালেন ওটা। তারপর ছদ্মগাম্ভীর্যে ফিরলেন তাঁর দিকে।—যেই যা ভাবুক এখন এটা টাঙাতে আপত্তি নেই তো?

আবার একটা বড় যোঝা যুঝতে হল নিঃশব্দে। যোঝার অবকাশ কম বলে আরো মুশকিল। ততোখানি চেষ্টা করেই ঠোঁটের ডগায় হাসি ফোটাতে পারলেন জ্যোতিরাণী। মাথাও নাড়লেন একটু। আপত্তি নেই। বললেন, এর পর ওমর খৈয়ামের লুকোনো ফটো দুটো টাঙাবে নাকি?

বিভাস দত্ত অপ্রস্তুত কয়েক মুহূর্ত। বিস্ময় আর খুশির আতিশয্যে আটখানা তারপর। —ও ছবির খবর তুমি কি করে জানলে? এর মধ্যে বইটা খুলেছিলে বুঝি?

এর মধ্যে নয়, বছর আটেক আগে। ওই ফটো যেদিন দেয়ালে দেখেছিলাম, সেদিনই।

কি কাণ্ড! আর আমি বোকার মত ও দুটো তোমার চোখের আড়ালে রাখার জন্য আগলে আগলে বেড়াচ্ছিলাম।

বোকামির অবসান করে নেবার আগ্রহেই যেন আলমারি খুলে ওমর খৈয়ামের ফাঁক থেকে ফটো দুটো বার করলেন। তারপর নির্নিমেষে একবার দেখে নিয়ে তাঁর সামনে ধরলেন। ওই ফটো দুটোর নীচে লিখে রেখেছেন কিছু, তাই দেখালেন।

জ্যোতিরাণী দেখলেন। পড়লেন। একটার নীচে লেখা "বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে, মাধুরীর রূপে।" অপরটার নীচে লেখা, "আমার মন চুরি গেছে, মন চুরি যাবার পর দু' চোখ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি কোথায়?"

ফটো দুটো হাতে নেননি জ্যোতিরাণী, বিভাস দত্তর হাত থেকেই দেখেছেন, পড়েছেন। শরীরের ভিতরটা কেমন সিরসির করছে তাঁর। নিজের অগোচরে এখনো বুঝি কোথাও একটা প্রতিরোধ বাসা বেঁধে আছে—সেটাতে ধাক্কা লাগছে।

হাল্কা মেজাজে বিভাস দত্ত আবার বললেন, সত্যি এই চুরির কথা এতদিন ধরে জানতে তুমি?

জ্যোতিরাণী হাসলেন। হাল্কা কথার হাল্কা জবাবই দিলেন।—শুধু আমি কেন, শমীও জানত। ছেলেমানুষ, এত দিনে ভুলে গেছে। লজ্জা পেতে না চাও তো আর কোথাও সরিয়ে রেখে দাও, টাঙিয়ে কাজ নেই।

লঘু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন বিভাস দত্ত। বাধা পড়ল।

মাসী, মাসী!

শমীর এই উত্তেজিত গলা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে কি এক ষষ্ঠ চেতনা তাঁকে বলে দিল কি হতে পারে, কেন ওভাবে ডাকতে ডাকতে এমন হন্তদন্ত হয়ে আসছে শমী। এতটা উত্তেজিত না হলেও ওর এই গোছের আচমকা ডাক আগে আরো বারকয়েক শুনেছেন। কিন্তু আজ বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে জ্যোতিরাণীর।

মাসী, সিতুদা! সিতুদা নীচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে!

বিমূঢ় মুখে বিভাস দত্ত শমীর দিকে তাকালেন, তারপর জ্যোতিরাণীর দিকে। তার পরেই কর্তব্য স্থির করে তাড়াতাড়ি বললেন, কই? চল ডেকে নিয়ে আসি—

বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পিছনে শমীও।

জ্যোতিরাণী স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে। শুধু তিনিই জানেন, এ বাড়িতে ঢোকার জন্যে ও এসে দাঁড়ায়নি। ডাকলেও আসবে না। কাছে গিয়ে ডাকার সুযোগও দেবেই না।

আটত্রিশ

সিতু জ্বলতে জ্বলতে ফিরে গেল।

নেমে এসে কলা দেখবে। দোতলা থেকে বিভাস কাকা তাকে দোতলায় চলে আসতে বলছিল। অশ্লীল গোছের একটা কটূক্তি করে রাগের মুখে সিতু হঠাৎ নিজের মনেই হেসে উঠল একটু।...বিভাস কাকা বলবে না বিভাস বাবা বলবে এখন? মরুক গে। বিভাস কাকার হাসি-হাসি মুখ দেখেই তার পিত্তি জ্বলে উঠেছিল। তার ওপর কিনা তাকে ওপরে ডাকার সাহস! ওই বজ্জাত মেয়েও বেড়ালের মত মুখ করে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল আর দেখছিল তাকে। ওর ওই ড্যাবডেবে চোখ দুটোও গেলে দিতে ইচ্ছে করছিল। কাকাকে ডেকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, যেন ওদের দেখতেই গেছল সিতু। শমীকে যাও সহ্য করতে পারত ওর কাকাকে সহ্য করা অসম্ভব। সিতু আসছে না দেখে বিভাস কাকা হাত তুলে তাকে অপেক্ষা করতে বলে নীচে নেমে আসছিল নিশ্চয়। আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে যাবার ইচ্ছে। এই ইচ্ছের মনের মত জবাব দেওয়া সম্ভব নয় বলেই সিতু চলে এসেছে। সামনে পেলে কি আবার করে বসত রাগের মাথায় কে জানে। বয়েস সতেরো পেরোতে চলল, আই. এসসি. পড়ছে, আর দুদিন বাদে সেকেণ্ড ইয়ার হবে—তবু সব তছনছ করে ওলট-পালট করে দেবার সেই ছেলেবেলার আক্রোশ যেন মাথায় উঠে দপদপ করতে থাকে।

...শমীটা একলা থাকলেও কিছুক্ষণ দাঁড়াত হয়ত। দেখতে এসেছিল অবশ্য মা-কেই—না মা ভাবছে কেন, দেখতে এসেছিল 'ওই একজনকে'। বিয়ের ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝার পর মাকে চিন্তার মধ্যেও 'ওই একজন' বলা শুরু করেছে। ছ মাসে ন মাসে বছরে হঠাৎ-হঠাৎ যেমন এক-একদিন হয়, তেমনি হয়েছিল। মাথায় আগুন জ্বলে। তখন মা-কে দেখতে ছোটে। ভস্ম করতে ছোটে। কিছুই করতে না পেরে দ্বিগুণ আক্রোশে ফেরে। আবার হাসিও পায় এক-একসময়ে। বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি পেকেছে, তাই নিজেরই মনে হয় মা-রোগে পেয়েছে ওকে। কিন্তু রোগটা চাগিয়ে ওঠে যখন তখন আর বয়েস বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নিজের বশে থাকে না। তখন

আর ছুটে না বেরিয়ে পারেই না।

আজকের আসার তাড়নাটা আগের থেকে অনেক বেশীই ছিল। তবু শমীটাকে খারাপ লাগেনি খুব। বাদামী ডুরে শাড়ি পরেছে আজ। শাড়ি-পরা শমীকে এই প্রথম দেখল। বেশ মেয়ে-মেয়েই লাগছিল। কোঁকড়া চুলের একদিক গলার পাশ দিয়ে বুকের যেখানটায় এসে ঠেকেছিল, সেদিকটা বেশ ভাল করে দেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একটু হাঁ করে চেয়ে থেকেই পাজী মেয়ে ছুটে গিয়ে কাকাকে ডেকে নিয়ে এলো। তোর কাকা সব করবে আমার! ছুটে যখন চলে গেল তখনও খারাপ লাগেনি, শাড়ির আঁচল খসে গেছল—ওদিকে ফিরে দৌড়েছিল বলেই ভাল দেখতে পারেনি।

মেয়েদের নিয়ে এখন তার বিশ্লেষণ অনেক পাকা-পোক্ত। শাড়ি পরে এখনই যেমন দেখাচ্ছিল, আর একটু বড় হলে ওটা না ধুমসি হয়। ওই একজনের কাছে একলা আদর পাচ্ছে, দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, মোটা হবে না কেন? মায়ের ওপর ওর একলার দখল মনে হতেই রক্ত আবার গরম হয়ে উঠল সিতুর। মাকে নির্মম রকমের কিছু একটা আক্কেল দেবার সুযোগ পেলে ও আর কিছু চায় না। গেল কটা বছর ধরে এই আক্রোশই পুষছে সে। এত বড় হয়েছে, পাড়ার সমবয়সীরা ছেড়ে বড়রাও সমীহ করে তাকে এখন। কলেজের ছেলেরা তাকে তোয়াজ-তোষামোদ করে চলে, মাথা খেলানোর ব্যাপারে ওস্তাদ ভাবে তাকে। কিন্তু মায়ের ওপর আক্রোশ মেটাবার রাস্তাটা অনেক মাথা খাটিয়েও পেরে ওঠে না। আজ হঠাৎ একটা বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে গেল মাথায়। ওই শমীটার কিছু একটা প্রচণ্ড রকমের ক্ষতি করে বসতে পারলে মা জব্দ হতে পারে। শমীর তো শাস্তি পাওনাই, একলা আদর খাওয়ার শোধ নেবার সঙ্কল্প সেই ক'বছর আগে থেকেই ঠিক করা ছিল—সিতুকে যখন স্কুল-বোর্ডিং-এ পাঠানো হয়েছিল, তখন থেকে। ওকে শাস্তি দিতে পারলে মায়ের ওপরেও মোক্ষম শোধ নেওয়া হবে মনে হতেই বেশ একটা ক্রূর উদ্দীপনা বোধ করল। এই উদ্দীপনার মুখে বড় হবার কথা, বুদ্ধি-বিবেচনার কথা কিছুই আর মনে থাকল না। ছেলেবেলায় পায়ের তলার চেয়ার সরিয়ে নিয়ে ওর থুতনি কেটে দুখানা করে দিয়েছিল, সেই কাটা দাগ চিবুকটাকে এখনও দু ভাগ করে রেখেছে। এবারে আর চেয়ার সরিয়ে নয়, হাতে পেলে দাঁতে করেই ওখানটা আবার ডবল করে ছিঁড়ে দিতে পারে সে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধের নেশাটা মগজ থেকে নেমে শরীরের পেশীর ভিতর দিয়ে, শিরাগুলোর ভিতর দিয়ে হাড়ের ভিতরে ছড়াতে লাগল। ট্রাম-বাসে উঠতে ভুলে হেঁটেই চলেছে। রাস্তার এত লোকজন গাড়ি-টাড়ি কিছু চোখেও পড়ছে না, তার সামনে শুধু দুটো মুখ। মায়ের আর শমীর। শাড়ি পরা শমীর।

গত কয়েকদিন ধরে বাড়ির বাতাসের রকমফের টের পাচ্ছিল সিতু। ও যে কি করে টের পায় বাড়ির কারও ধারণা নেই। এমন কি অত সেয়ানা জেঠুরও না। একটা সুবিধে বাড়ির সকলে তেমনি ছেলেমানুষই ভাবে ওকে। জেঠুও বাবাও, আর ছোট দাদুর তো কথাই নেই। আবও সুবিধে, ওই মেঘনা বজ্জাত আর ছোট দাদু ছাড়া কারও চোখ নেই তার ওপর। চোখ থাকলেও এখন কাউকে পরোয়া করে না। তবু নেই যে সেটা আরো ভাল। তাছাড়া ছোট দাদু বছরে কটা মাসই বা থাকে এখানে। যাই হোক, কুকুরের মত বাতাস টেনে বাড়ির বাতাস বুঝতে পারে সে। অন্তত গণ্ডগোল কিছু হলে টের পায়। তারপর কি গণ্ডগোল সেটা বার করতে আর কতক্ষণ? ঠিক-

ঠিক কিনা জেনেছে সে, মা বাবার নামে উকীলের নোটিশ পাঠিয়েছিল জেনেছে, মা কখন কোথায় বাস করছে জেনেছে, বাবার ডাইভোর্সের মামলার খবর জেনেছে, কোর্টের রায়ের খবর জেনেছে—আর এখন কি নিয়ে বাড়ির বাতাস অন্যরকম তাও ঠিক টেনে বার করেছে।

কদিন ধরে জেঠু ছোট দাদুকে কি যেন ফিস-ফিস করে বলে লক্ষ্য করছিল। এখন আর ছেলেমানুষটি নয় যে আড়ি পেতে শুনবে। শোনার ব্যাপারে অনেক রকম বয়সোচিত ছল-চাতুরির রাস্তা নিতে হয়। ভোলা তার খুব পেয়ারের লোক হয়েছে এখন। এজন্যে ব্যাটা কম পয়সা খায় ওর থেকে? কাজের অছিলায় হঠাৎ হঠাৎ ঢুকে কি ঘটছে না ঘটছে ও-ই অনেক সময় সুতো ধরিয়ে দেয়। এই শেষের ব্যাপারটা অন্তত দিয়েছিল। জেঠুকে একরকমই দেখত সিতু, কিন্তু ছোট দাদুকে হঠাৎ বড় বেশীরকম গম্ভীর মনে হয়েছিল তার। আর বাবার মুখের চেহারাও হঠাৎ কি রকম যেন হয়ে গিয়েছিল। কদিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি, হঠাৎ মৌনী নিয়েছে মনে হচ্ছিল।

সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে সিতু আবার সময় আর সুযোগের প্রত্যাশায় ছিল। এরকম হলেই সে অবধারিত ধরে নেয় মায়ের ব্যাপারে বা মাকে নিয়ে কিছু ঘটেছে। জেঠু বাড়ি না থাকলে তখন নিরিবিলি অবকাশে তার ঘর তল্লাসী শুরু করে দেয় সে। আলমারি খোলে, তালা-বন্ধ ড্রয়ার খোলে, সুটকেশ খোলে। এই বাড়ির সব কিছুই তার নখদর্পণে এখন। অফিসে বেরুবার সময়ই শুধু জেঠু এ-পকেট ও-পকেট বা বিছানার তলা থেকে হাতড়ে চাবি নিয়ে যায়। বিকেলের দিকে বা অন্য সময় বেরুলে একজায়গায় রাখা চাবি স্বাভাবিক আব এক জায়গায় সরিয়ে রাখলেই হল। তখন আর খোঁজ পড়বে না। তাছাড়া ফিরতে দেরি হলে জেঠু যাকে সামনে পায় তাকে বলেই যায় দেরি হবে। কখন আবার বাবার ডাকাডাকি শুরু হবে সেই জন্যেই জানান দিয়ে বেরোয় বোধ হয়। আর বাবার চাবির গোছার বাসস্থান তো বিছানার তলায়। ওটা বাবার সঙ্গে সঙ্গে কমই ঘোরে। তবে চাবি বলতে জেঠুর চাবির ওপরই লোভ সিতুর। বিশেষ করে বাড়ির এই গোছের হাওয়া বদল দেখলে। বাবার চাবির প্রয়োজন শুধু টাকার দরকাব হলে। সিন্দুকে বোঝাই নোট আছে, আলমারিতেও কম নেই। টাকা দেখলে এখন আর সিতুর সে-রকম একটা উত্তেজনা হয় না। দু-চারখানা কবে নোট সরাতে হাতও কাঁপে না।

জেঠুর ড্রয়ার বা সুটকেস খুলে এবারে একটা জিনিসেরই সন্ধান পেতে চেষ্টা করেছিল। সেই কালো মোটা বাঁধানো ডায়েরী বইটা। মাস আষ্টেক আগে যেটা হাতে পেয়ে তার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। সেটা পড়ে জেঠুকে ভারী মজার মানুষ মনে হয়েছিল তার। জেঠুর হাতে ওই বস্তুটা অনেকদিনই দেখেছিল। আর ওটার সম্পর্কে একটু যেন কৌতূহলও ছিল বাড়ির লোকের। জেঠু যে ওটা খুব সাবধানে রাখত তাও টের পেত। কিন্তু মা চলে যাবার পর আর সব কিছু ছাড়া-ছাড়া হয়ে যাবার পর জেঠু আর ওটা সেভাবে আগলে রাখার দরকার বোধ করেনি বোধ হয়। নইলে ডাই-ভোর্সের কাগজপত্র দেখার লোভে তাঁর দেয়াল-আলমারি খুলেই ওটা হাতে পেয়েছিল কেন? হাতে পেয়েও অত লেখা পড়ার ধৈর্য থাকত কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রথমেই মহাভারতের শকুনির ওপর জেঠুর অত টান দেখে অদ্ভুতই লেগেছিল। আর তারপর যত পাতা উল্টেছে ততো চমক। একের পর এক গোগ্রাসে গিলেছে। এক-একটা লেখা ভাল করে বোঝার জন্য

অনেকবারও পড়তে হয়েছে। বাবা যে মাকে বিয়ের আগে দেখেছিল আর তারপর বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল সেটা তার কাছে একটা খবরের মত খবর। ছোট দাদুর সম্পর্কে কি সব লিখে রেখেছে জেঠু, সেটা তেমন স্পষ্ট হয়নি। মাকে বিয়ের আগেও ছোট দাদুর ভাল লাগত বোঝা যায়, সে তো এখনো লাগে নিশ্চয়—কিন্তু সেজন্যে ছোট দাদুকে জেঠু মরতে লিখেছে কেন ঠিক বোঝা গেলই না। সবই বোঝার মত পাকা-পোক্ত সে ঠিকই হয়েছে, কিন্তু এই দুজনকে কাছাকাছি আনার চিন্তাটা তার মনে আসেনি। তারপর যত এগিয়েছে ততো বিস্ময়, ততো রোমাঞ্চ। মিত্রা মাসীর সঙ্গে জেঠুরই তাহলে দিব্যি জট-পাকানো ব্যাপার ছিল একটা! আর তারপর মা-কে নিয়ে বাবার এ কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত সন্দেহের কাণ্ড! জেঠু, ছোট দাদু, বিভাস কাকা কাউকে সন্দেহ করতে বাকি রাখেনি বাবা! এমন সন্দেহ যে দাদু বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিল বাবাকে! ও হবার আগে আর পরে মায়ের ওপব বাবার অত অত্যাচারের ফিরিস্তি পড়ে বাবার ওপর রাগ হয়েছিল, আর নিজের অজ্ঞাতেই মায়ের ওপর সদয় হয়ে উঠেছিল সিতু। ও জন্মাবার আগে মা তো মরেই যেতে পারত দেখছে! কিন্তু তার পরেই মনে পড়েছে, মা নেই, মা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—আর আসবে না। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ। বাবা ঠিক করেছে, আরো করা দরকার ছিল।...কিন্তু তারপর মিত্রা মাসীর এ কি কাণ্ড!. কাণ্ডটা ষোল আনা ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নয় তবু যতটুকু বুঝেছে তাতেই অদ্ভুত অস্বস্তি। মিত্রা মাসীকে কোনদিন দুচক্ষে দেখতে পারে না সে। মা চলে যাবার পর আরও চক্ষুশূল হয়েছিল। হাসিমুখে আসত, ওকে আদর করতে চেষ্টা করত, বাবার ঘরে ঢুকত। একদিন মায়ের ঘরেও গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল যখন তখন তো ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে ইচ্ছে করেছিল সিতুর! নোটবইটা হাতে পাবার অনেক আগেও বাবাব সঙ্গে মিত্রা মাসীর সেই হঠাৎ-ভাব দেখে রাগ হত সিতুর। মিত্রা মাসীকে আরো খারাপ লাগত তখন। জেঠুর এই লেখা পড়েছে যখন তার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া সারা, মা-কে ঠকিয়ে বাবার সঙ্গে মিত্রা মাসীর বিলেতে যাওয়ার তাৎপর্য খুব দুর্বোধ্য ঠেকেনি তাই। আরো স্পষ্ট হয়েছে জেঠুর পরের লেখাগুলো থেকে। মায়ের প্রতি সমবেদনা এসেছে আবার। আর তক্ষুনি সেটা নির্মূল করেছে। যাই করুক বাবা, মা কেন যাবে এখান থেকে, কেন আসবে না? জেঠুর শেষ লেখাটা পড়ে খুব মজা লেগেছে তার। যেটাতে তার কথা আছে। বাপের ছেলে ভাবলে রাগ হয়, মায়ের ছেলে ভাবলে ভাল লাগে নাকি। আর সেয়ানা বটে জেঠু, শমীটার দিকে ও ওই বয়সে কিভাবে তাকাতো তাও লক্ষ্য করেছে! কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য লেগেছিল তার জেঠুর লেখাগুলোই। সেগুলোর ভিতরে যেন জেঠুর কি একটা মন ছড়িয়ে আছে যার অনেকখানি ধোঁয়াটে তার কাছে, অথচ বেশ ধারালো গোছের কিছু একটা আছে তার তলায়। প্রত্যেকটা লেখার পিছনে দাঁড়িয়ে জেঠু যেন হাসছে মুখ টিপে অথচ সে হাসির সবটুকুই কৌতুক নয়।

বাড়ির এবারের হাওয়া-বদল অনুভব করে সিতু হদিস মেলার মত অন্য কাগজপত্র না পেয়ে ওই ডায়েরীটাকেই খুঁজল তন্নতন্ন করে। কি ঘটেছে জেঠু হয়ত ওতেই লিখে রেখেছে। ওটা যে ততদিনে মায়ের কাছে চালান হয়ে গেছে তার ধারণা নেই। ওর চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় ওটা রাখা সম্ভব ভেবে পেল না। ফলে কৌতূহল বাড়ল আরো। ওদিকে বাবার ঘরের টেলিফোন ধরেও সেদিন কম অবাক হয়নি। ওধারে কথা

বলছিল মিত্রা মাসী, বাবা নেই শুনে জেঠুর খোঁজ করল মিত্রা মাসী। জেঠু ছিল। ডাকবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে তাড়াতাড়ি বলল, ডাকতে হবে না। তারপরেই হেসে জিজ্ঞাসা করল, তোদের নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন হয়নি কোথাও?

সিতুর মাথায় ঢোকেনি কিছু জবাব দেবে কি। মা চলে যাবার পরে গোড়ায় গোড়ায় মিত্রা মাসী তার সঙ্গেই সব থেকে বেশী ভাব করতে চেষ্টা করেছে। বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছে পর্যন্ত। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মায়ের সম্পর্কে কত কথা জিজ্ঞাসা করেছে ঠিক নেই। তখনো অকারণেই গা জ্বলত সিতুর। জেঠুর ওই লেখাগুলো পড়ার পর তো সামনাসামনি দেখা হলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফোনের কথাগুলো শুনে সেদিন মনে হয়েছিল, ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মিত্রা মাসীর কিছু খবর জানার ইচ্ছে। হেসে নেমন্তন্নের কথা বলার পরেই গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করেছে, হ্যাঁ রে, তোর মায়ের কিছু খবর-টবর এসেছে? সিতু চুপ করে ছিল, আর মিত্রা মাসী আরো আপনজনের মত বলেছে, বল্ না, মাসীর কাছে লজ্জা কি—

কিছু একটা ঘটেছে সিতু তক্ষুনি ধরে নিয়েছে। জানার কৌতূহলও কয়েক গুণ বেড়েছে। তবু মিত্রা মাসীর মুখে মায়ের নাম শুনেই তার মাথা গরম। সেও যে কলেজে পড়ছে, ছেলেমানুষ নয়, সেটা বুঝিয়ে দেবার ই... । জবাব দিয়েছে, আমি কিছু জানি না, অত করে জানতে চাও যখন, ধরে থাকো জেঠুকে ডেকে দিচ্ছি।

যা আশা করছিল তাই ঘটল তক্ষুনি। জেঠুকে যে কতখানি ডরায় সিতুব জানতে বাকী নেই। নইলে এতদিনে নিজের বাড়ি ছেড়ে হয়ত এ বাড়িতেই থাকা শুরু করত মিত্রা মাসী। ফোন ছাড়তে পারলে বাঁচে।—না না, ডাকতে হবে না, অনেকদিন খবর-টবর পাই না তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম। তুই তো ভুলেও আসিস না আজকাল, আসিস একদিন, বুঝলি?

ফোন ছেড়ে সিতু হাসতে গিয়েও হাসতে পারেনি।...মায়ের কি খবর জানতে চায়? তার আগে নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন কথা কি বলছিল? ছোট দাদুর সঙ্গেই বা জেঠুর চুপি চুপি এত কি কথাবার্তা চলছে? জেঠু সেদিন বাবার ঘরে গিয়েও খানিকক্ষণ ধরে কি কথাবার্তা বলে মিটিমিটি হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছিল। আর তারপর থেকেই বাবাকে বেশ অন্যরকম দেখছে সিতু। অনেক রাত পর্যন্ত খুব মদ চালাচ্ছে। ভোলাকে ততক্ষণ পর্যন্ত দোরগোড়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। মোট কথা, বাড়ির বাতাস রীতিমত গোলমেলে লেগেছে আবার।

তারপর গত সন্ধ্যার পরে ভোলার দৌলতে ব্যাপারটা টের পেয়েছে। ইশারায় তাকে ডেকে ভোলা নীচের এক নিরিবিলিতে চলে গেছল। চাপা উত্তেজনায় তার দু চোখ কপালে। বলেছে, বউদিমণি আবার বিয়েয় বসেছে গো ছোট মালিক, বিভাসবাবুর সঙ্গে—আমি নিজের কানে শুনলাম—

ফ্যাল-ফ্যাল করে সিতু ভোলার মুখের দিকে চেয়ে ছিল খানিক। আর তারপরেই যা ঘটে গেল তার জন্য ও নিজেও প্রস্তুত ছিল না, ভোলাও না। আচমকা প্রচণ্ড একটা চড় খেয়ে 'ও বাবা গো' বলে ভোলা তিন হাত দূরে গিয়ে বসে পড়ল। তার পরও ছোট মালিক আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এগিয়ে আসছে দেখে চোখের নিমেষে উঠে প্রাণ নিয়ে পালাল সে।

সিতু দোতলায় উঠে এলো। সামনেই মেঘনা। এধারের ঘরে ছোট দাদু আর জেঠু।

বাবার ঘরে এতক্ষণ যে লোকটা বসেছিল চলে গেছে, কিন্তু বাবা ঘরেই আছে। মাথায় হঠাৎ যে আগুন জ্বলে উঠেছে সেটা নেভাবার মত নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজছে সিতু। এই তিন বছর ধরে সে বাবার পাশের ঘরে অর্থাৎ মা যে ঘরে থাকত সেই ঘরে থাকে। কিন্তু ওদিকে যেতেই ভাল লাগল না। ঠাকুমার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বসল। ভোলা কি বলল ভাবতে চেষ্টা করল।

ঘণ্টাখানেক বাদে মেজাজ বশে এলো। হঠাৎ মাথার মধ্যে এ-রকম হয়ে গেল কেন নিজেই জানে না। ভাল করে শোনা বা জানার আগে ভোলাটাকে মেরে বসল। এ বাড়িতে ও-ই সব থেকে অনুগত। আর বলবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করে না জানা পর্যন্ত স্থির থাকে কি করে। আবার তারই খোঁজে চলল।

দূর থেকে তাকে দেখেই ভোলা সচকিত। পালাবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তার আগেই ভরসার কারণ ঘটল। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিযোগের আশ্বাস। ছোট মালিক তাকে দশ টাকার একটা নোট দেখাচ্ছে। এক টাকা দু টাকা পেয়ে অভ্যস্ত, দশ টাকা অবিশ্বাস্য।

তার কাছ থেকে যেটুকু শোনাব সিতু শুনেছে। সন্ধ্যায় বিক্রমবাবু এসেছিল। কয়েক গেলাস করে দুজনেই সাবাড় করেছে। ভোলা দরজার ধারে মোতায়েন ছিল, আর দরকার মত সোডার বোতল খুলে দিয়ে আসছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভোলা বাবুকে বলতে শুনেছে, বউদিমণি বিভাসবাবুকে বিয়ে করেছে।

রাতটা ভাল ঘুম হয়নি। বাবা ঘরে না থাকলে বোতলের জিনিস সেও খানিকটা গলায় ঢেলে আসত। মাঝে-সাঝে এই কর্ম করেও থাকে। প্রথমে বিচ্ছিরি লাগে, গলা বুক জ্বলে। তারপরে মন্দ লাগে না। সজারু-মাথা সুবীরের সেই নেশার পর্ব এখনো আছে। হোমিওপ্যাথি শিশির নস্যির কাল গেছে, বিড়ি-সিগারেট ছেড়ে পয়সা হাতে থাকলে মাঝে মাঝে গাবদা চুরুট টেনে দেখায়। তার কাছে জাহির করার জন্যেই বাবাব বোতল থেকে সিতুর প্রথম মদ গলায় ঢালা। শুনে প্রায় হার মেনে তাকেও একটু খাওয়াবার জন্য ধরেছিল সুবীর। সিতু বাবার বোতল থেকে খাওয়াতে না পারলেও দোকানে নিয়ে গিয়ে দুই-একদিন খাইয়েছে। সেই প্রসাদ থেকে চালবাজ দুলুও বাদ পড়েনি।

পরদিন কলেজ পালিয়ে মায়ের আগেব স্কুলে এলো সে। গেটের বাইরে দারোয়ানকে ডেকে খোঁজ নিয়ে জানল মা এখানে নেই। কি এক ঝোঁক বেড়েই চলল সিতুর। ভেবে-চিন্তে বিভাসকাকার পুরনো বাড়িতে এলো। সেখান থেকে তার ফ্ল্যাটের সন্ধান মিলেছে।

তারপর ওই ফ্ল্যাটের সামনে এসেও না দাঁড়িয়ে পারেনি। যাকে দেখতে এসেছিল তার দেখা মেলেনি। শমী আর তার কাকাকে দেখে এসেছে। ওকে ডাকার অর্থই মা ভিতরে আছে। অর্থ হোক না হোক, ভিতরে যে আছে তাতে একটুও সন্দেহ নেই। বাড়ি ফেরার পরেও দুর্বার আক্রোশটা ঘুরে-ফিরে শমীর ওপর। শাড়ি-পরা শমীর ওপর। ওকে টিট করতে পারলে মায়ের ওপর শোধ নেবার সাধ মেটে।

স্কুল ফাইনালে স্টার পেয়ে পাস করার পর সিতু নিজস্ব একটা ছোট গাড়ির দাবি পেশ করেছিল। দাবিটা বাবা আর জেঠুর কানে তোলার জন্য জানানো হয়েছিল ছোট দাদুকে। খেতে বসে ছোট দাদু জেঠু আর বাবার কানে কথাটা তুলেছিল বটে,

কিন্তু সে-রকম গুরুত্ব দিয়ে নয়। ভাল পাস করার জন্য এদের সকলকেই একটু খুশি-খুশি দেখেছিল সিতু। কিন্তু সিতু কাউকে খুশি করার জন্য পরীক্ষার এক বছর আগে থেকে আদা-জল খেয়ে লাগেনি। ভাল পাস করে শুধু একজনকেই জব্দ করার ইচ্ছে ছিল, যে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তাকে দেখানোর ক্রুদ্ধ তাগিদ ছিল, ভাল সে ইচ্ছে করলেই করতে পারে। তাই দেখিয়েছে। এদের খুশি হবার কথা ভাবেওনি। তবু হলই যখন, সেটা কাজে লাগানোর ইচ্ছেটাই প্রথমে মনে এসেছিল।

বাবা আপত্তি করত না হয়ত। করবে কেন, কত টাকা আছে বাবার সে আর তার জানতে বাকী নেই। কিন্তু জেঠু সাফ না করে বসল, বলল, গাড়ির সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না। অ্যাক্সিডেন্ট লেগেই আছে—

মুণ্ডু আছে। মনে মনে জেঠুর মুণ্ডপাতই করেছিল সিতু। ভিতরটা অবিরাম ছোটাছুটি করছে। আধ ঘণ্টা এক জায়গায় একভাবে থাকতে ইচ্ছে করে না। নিজের একটা গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটিয়ে বেড়াতে পারলে ভাল লাগত। ছোট দাদু ঠাট্টা করেছিল, হাত তো কম বাড়ায়নি দেখি, এরই মধ্যে গাড়ি চাই!

তার হাত বাড়ানোর সঠিক খবর এঁরা কেউ রাখে না। গাড়ি চোখে ধুলো দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব হলে কাউকে না জানিয়েই কিনে ফেলার কথা ভাবত সে। মা চলে যাবার পর রাগের বশেই একদিন তার আলমারি খুলেছিল। থাকে-থাকে অত টাকা দেখে প্রথম দু'দিনই যা দোটানার মধ্যে পড়েছিল। খরচ করতে করতে খরচের হাত বেড়েছে। ঝোঁকের মাথায় টাকা নিয়ে খরচ করেছে, যে নেই তার ওপর আক্রোশেও। শেষে আলমারির সব টাকাই অন্যত্র সরিয়ে রেখেছে পাছে বাবা বা আর কেউ সন্ধান পায়। তখন মনে হয়েছিল ও টাকায় সারা জীবনের হাতখরচ চলে যাবে। কিন্তু এই ক'বছরের মধ্যে অর্থাৎ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার আগেই সে টাকা শেষ। পরীক্ষার পর টাকা আরো বেশী দরকার হয়েছে। মায়ের এক বাক্স গয়না আছে দেখে রেখেছে। ওগুলোকেও নির্মূল করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কি যে হল, পারা গেল না শেষ পর্যন্ত। ওগুলো যেমন ছিল তেমনি আছে।

চাইলে জেঠুর কাছে যা পায় সে টাকা নস্যি। অতএব তাঁর অনুপস্থিতিতে সুযোগ মত একদিন সরাসরি বাবাকে বাজিয়ে দেখেছিল। সুফল পেয়েছে। বাবা তখন নীচে তাঁর বসার ঘরে কি কাজে ব্যস্ত। সোজা গিয়ে বলেছিল, জেঠু বাড়ি নেই, আমার কয়েকটা টাকা দরকার।

সেই প্রথম টাকা চাওয়া আর সেই শেষ। শিবেশ্বর চাটুজ্যে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত কি ভেবেছিলেন তিনিই জানেন। ওর প্রতি মনোযোগের অভাবের কথা মনে হয়েছিল কিনা বলা যায় না।

কত টাকা?

গোটা পঞ্চাশেক।

দেবার ব্যাপারে পঞ্চাশ ছেড়ে পাঁচশ হাজারও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তবু জানার কর্তব্য হিসেবে জিজ্ঞাসা করেছেন, কি হবে?

দরকার আছে, পছন্দমত দুই একটা বইটইও কিনব। সিতুর আসার উদ্দেশ্য তখনো শেষ হয়নি। বলেছে, আজই নয়, প্রায়ই এরকম অসুবিধেয় পড়তে হয়।

দাবির এই স্মার্ট মূর্তিটাই শিবেশ্বর মনে মনে পছন্দ করেছিলেন বোধ হয়। অসুবিধেয়

পড়তে হয় শুনে খারাপ লেগেছে। নিঃসঙ্গ ছেলেটা হঠাৎ যেন বড় হয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যে কারণেই হোক, যা চাওয়া হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি উদার হবার তাড়না অনুভব করেছেন তিনি। বলেছেন, বিছানার তলায় সেফ-এর চাবি আছে, যা লাগে নিয়ে নাও। বুঝে শুনে খরচ কোরো।

ঠিক এত বড় পরোয়ানা আশা করে আসেনি সিতু। পেল্লায় সিন্দুক খুলে দু চোখ স্থির তার। একসঙ্গে এত কাঁচা নোট দেখেনি। ওর থেকে খাবলা খাবলা সরালেও কেউ টের পাবে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া এর থেকে টাকা যাচ্ছেও যেমন, আসছেও হয়ত তেমনি। অতএব নিশ্চিন্ত। জেঠুর আলমারি খুলে এরপর আরো অবাক হয়েছিল। সিতুর নিজের নামের পাসবই কটাতে যে এত টাকা আছে তাও কি কল্পনা করা যায়! মায়ের নামের পাসবইতেও কম নেই, আর বাবার নামে যে কত, ধারণাই করা যায় না।

অতএব সিতুর একটা গাড়ি চাওয়ার হাত হবে সে আর বেশি কি? ওর ভিতরের ছোটার তাড়নাটা কেউ অনুভব করতে পারে না। অন্য নেশা গিয়ে সিতুর এখন ছোটার নেশা। শাড়ি-পরা শমীকে দেখার পর নতুন করে আবার নিজের গাড়ির কথা কেন মনে হয়েছে, সিতু জানে না।

সুবীরের উস্কানিতে সিগারেট-বিড়ি-চুরুটের স্বাদ দুদিনে পুরনো হয়েছে। বাবার বোতলের জিনিস গলায় ঢালার বৈচিত্র্যও। কিছুদিন হল আর এক নেশায় মেতেছে। ছাপার অক্ষরের সরু চটি বই। বিশ-তিরিশ পাতার বেশি নয়। কোন্ অন্ধকার থেকে ওগুলো আসে, আবার পড়া হয়ে গেলে কোন্ অন্ধকারে মিলিয়ে যায়, সিতু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এ বইয়ের যোগানদার সাইকেলের দোকানের নিতাইদা। সিতুর স্কুল ছুটির দরখাস্তয় তার বাবার নাম সই করত যে। প্রত্যেকটা বই পড়ার জন্যে তাকে এক টাকা করে দিতে হয়। ওরকম বই একসঙ্গে তিনটে-চারটে করেও হাতে আসে। নিতাইদার কাছ থেকে সংগ্রহ করে সুবীর সেগুলো সিতুর হাতে দেয়। দুজনেই গোগ্রাসে পড়ে। পড়ার দামটা শুধু সিতু একা দেয়।

ফেরত-বই আর টাকাই নয়, নতুন বইয়ের ঘন ঘন তাগিদ আসে নিতাইদার কাছে। মুচকি হেসে নিতাইদা বলে, এসব বই ধীরে সুস্থে রসিয়ে-টসিয়ে পড়তে হয়, এ বইয়ের কি আড়ত আছে যে কাঁড়ি-কাঁড়ি এনে হাজির করব! যেরকম লাভের ব্যবসা, ছাপাখানা থাকলে কি আর এ শালা সাইকেলের দোকানে পড়ে থাকতুম! নিজেই ওর থেকে ঢের ঢের ভালো বই লিখতাম, ছাপতাম আর বেচতাম।

বাবার বোতলের জিনিস গলায় ঢেলে যা হয়নি, গোড়ায় গোড়ায় এই বই হাতে পেয়ে তার থেকে বেশি কাজ হতে লাগল। ভোগের এক বিচিত্র স্বাদের কল্পনায় রক্ত ফোটে, মাথার ঘিলুগুলি গরম হয়ে হয়ে শেষে অসাড় হতে চায়। পাতায় পাতায় লাইনে লাইনে মেয়ে-পুরুষের কি বিষম নগ্ন ভোগের মাতামাতি। মেয়েদের নিঃশেষে ধ্বংস করে করে পুরুষের ভোগের উল্লাস। মেয়ে দেখলে এই গোছের একটা ধ্বংসের আগুন সিতুর শিরায় শিরায় আর মগজের মধ্যেও জ্বলে জ্বলে ওঠে। সে-মেয়ে দেখতে ভালো হলে কথাই নেই। না হলেও ভালো আর সুন্দর কল্পনা করে নেয়। ওর ভিতরের ধ্বংসের ওই জ্বলন্ত কামনা কেবল সুন্দরকে ঘিরে।

কিন্তু বই পড়ার উত্তেজনা স্বাভাবিক নিয়মেই ঠাণ্ডা হতে লাগল। একই ব্যাপারের

চর্বিত-চর্বণ। শেষে আবার এক-একটা পড়ে গা ঘুলোয়ও। ভালো লাগে না। ফেলে দিতে ইচ্ছা করে। অথচ সিতুর মাথার আগুন উদগ্র আক্রোশের মত জ্বলতেই থাকে। বইয়ের টান কমে আসছে দেখে নিতাইদা এবারে ছবি সংগ্রহ করে দিতে লাগল। ছবি দেখার খরচা বই পড়ার থেকেও বেশি। এই দেখার ব্যাপারেও একমাত্র সুবীরই দোসর, নীলিদির ভাই চালিয়াত দুলু নয়। তৃতীয় বিভাগে স্কুল ফাইনাল টপকে কোন্ এক ফ্যাক্টরিতে অ্যাপ্রেন্টিস হয়েছে, কলেজের মুখ দেখার রসদ জোটেনি। দুলুর সঙ্গে খাতির কমেনি কিছু, কিন্তু সিতু অন্তত এখন আর সম পর্যায়ের ভাবে না ওকে। ভাবে না কারণ, নীলিদির ও অনেক ছোট। নীলিদি তলায় তলায় সিতুকে দস্তুরমতো খাতির করে এখন। টাকা-পয়সার দরকার হলে নীলিদি চুপি চুপি এসে ওর কাছেই চায়। হলে কেন, টাকার দরকার নীলিদির প্রায়ই হয়। কোনো ভালো সিনেমা এলে নীলিদি ফাঁক খুঁজে এসে জিজ্ঞাসা করে, দেখবি নাকি, খুব ভালো হয়েছে শুনেছি।

সিতু টিকিট কেটে রাখে। পাশাপাশি বসে দেখে। থিয়েটারের খরচা অনেক বেশি। তাও দেখে। নিতাইদার বই পড়ে বা ছবি দেখে এই নীলিদিকে নিয়েও মনে মনে কিছু বিশ্লেষণ করেছে সে। কিন্তু মগজের ধ্বংসের আগুনে তাতেও যেন ঠাণ্ডা জলের ছিটে পড়ে। তার থেকে ভীতু অতুলের দিদি রঞ্জুদির ওপর বরং আক্রোশ কিছুটা তাতিয়ে তুলতে পারে। পঁচাত্তর না একশ টাকা মাইনের কোনো এক বিদেশী কোম্পানীতে প্যাকিং আর কি সব জোড়া-টোড়ার চাকরি করে নাকি। ওই পঁচাত্তর একশর দেমাকেই এখনো আগের মতই গম্ভীর মেজাজ রঞ্জুদির। নীলিদির মুখেই সিতু শুনেছে, এ পর্যন্ত বারতিনেক মেয়ে অর্থাৎ রঞ্জুদিকে দেখানো হয়েছে। কারো পছন্দ হয়নি, কারো সঙ্গে বা টাকায় বনেনি। শেষে রঞ্জুদি নাকি তার মাকে সাফ বলে দিয়েছে, আর সে সঙের মত নিজেকে দেখাতে বসতে পারবে না।

সিতু গম্ভীর মুখে ঠাট্টা করেছে, আমার থেকে যে বছর চারেকের বড় রঞ্জুদি, নইলে আমিই ভেবে দেখতে পারতাম।

নীলিদি প্রথম চোখ পাকিয়েছে, পরে হি-হি করে হেসেছে।—তুই ভয়ানক দুষ্টু, দাঁড়া রঞ্জুকে বলে দিচ্ছি।

বললে সিতু অখুশি হত না। কিন্তু রঞ্জুদিকে কিছু বলার সাহস যে নীলিদির হবে না, সেটাও খুব ভালো করেই জানে।

চুপি চুপি সুবীর একদিন এক বিচিত্র প্রস্তাব কানে দিল। এত বিচিত্র যে সিতু চমকেই উঠেছিল। নিতাইদা তাদের এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। খুব ভালো আর ভদ্র ঘরের। মেয়েটা অভাবে পড়ে দিনকতক মাত্র এই রাস্তায় এসেছে। তাই টাকা কিছু বেশি লাগবে।

তখনকার মত প্রস্তাব নাকচ করেছে বটে, কিন্তু দুই বন্ধুর আলাপ-আলোচনায় বাসনা দানা পাকিয়ে উঠতে লাগল। সেকেণ্ড ইয়ারে উঠবে এবার, বয়েস আঠারো। ভয়-ডর আরো কমেছে। শেষে সুবীর একদিন হেসে জানালো, নিতাইদা এখনো আশা ছাড়েনি। নিতাইদা নাকি ঠাট্টা করেছে, বলেছে, বাপ হয়ে ছুটির দরখাস্ত সই করার পর থেকে সিতুর ওপর কেমন মায়া পড়ে গেছে তার, তাই ওর সামনে হেঁজি-পেঁজি কিছু ধরে দেবে না।

বাপ হয়ে ছুটির দরখাস্ত সই করার কথাটা শোনামাত্র মাকে মনে পড়েছে। ধরা

পড়ার পর মায়ের ব্যবহার মনে পড়েছে। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে ওকে স্কুল-বোর্ডিং-এ ঠেলে পাঠানো হয়েছিল। ওর ভালোর জন্য পাঠিয়েছিল নাকি। মনে পড়তে মাথায় আগুন জ্বালা শুরু হয়েছে। যাবে।

নিতাইদার হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে। গেছে।

কিন্তু সত্রাসে পালিয়ে এসেছে সিতু। কোথাও থেকে এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে আর বুঝি কখনো পালায়নি। ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটা মেয়ের সামনে বসেছিল এক সন্ধ্যায় মনে পড়ে। একা নয়, তিনজন। কিন্তু সিতু একাই পঙ্গু হয়ে গেছল বোধ হয়। শরীরের রক্ত সিরসির করে জল হয়ে যাচ্ছিল। কেবল মনে হচ্ছিল, কে বুঝি তাকে গ্রাস করতে আসছে। সিতুর সর্বাঙ্গ অবশ। নিতাইদার ইশারায় হেসে মেয়েটা তার হাত ধরেছিল। আর তক্ষুনি সিতু যেন মুহূর্তের জন্য প্রাণ বাঁচানোর শক্তি খুঁজে পেয়েছিল। উঠে ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে গেছল। তারপরেও কাঁপুনি থামেনি। গা ঘুলনো থামেনি। একধার থেকে চান করেছে। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে হাড়সুদ্ধ ঠাণ্ডা করতে চেয়েছে। আর তারপরেও এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছে। বুকের তলা থেকে জমাট-বাঁধা একটা অচেনা কান্না গুম্‌রে গুম্‌রে ওপরের দিকে আসতে চেয়েছে।

কদিনের মধ্যে এ ভাবটা আবার কেটে গেল বটে। কিন্তু মারমূর্তি দেখে সুবীরও তার পালানো নিয়ে ঠাট্টা করতে ভরসা পেল না। এই বন্ধু বিগড়োলে তাব অনেক লোকসান।

বই না, ছবি না, বাবার বোতলের জিনিস না, সুবীর আর নিতাইদার পাল্লায় পড়ে যেখানে গিয়েছিল সেই জায়গাও না—কিছুই উত্তেজনার ইন্ধন যোগাতে পাবেনি। অথচ উত্তেজনাশূন্য জীবন এক মুহূর্তও ভালো লাগে না। মগজের মধ্যে বাসনার একটা ক্রুর আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছেই। সেই ধ্বংসেব আগুনেই টেনে আনতে চায কাউকে। কিন্তু কাকে? একখানা মুখ আবছা থেকে স্পষ্ট হযেছে ক্রমশ। যত স্পষ্ট হয়েছে রক্ত ততো উত্তেজনার খোরাক পেয়েছে। চোদ্দ-পনের বছরের একটা মেয়ের মুখ। তার পরনে বাদামী ডুবে শাড়ি, একদিকের কোঁকড়া চুলের গোছা সাপের মত এঁকেবেঁকে গলা ঘেঁষে বুকে এসে পড়েছিল। যে মেয়েটাকে 'ওই একজন' এখন খুব ভালবাসে—খুব।

পড়ার বইপত্রগুলোতে ধুলো পড়ে গেল। সেকেণ্ড ইয়ার গডিয়ে চলেছে, এবারে ওগুলো ঝেড়ে-মুছে নিয়ে বসা দরকার। খোলা দরকার। বসেছে, খুলেছে। কিন্তু দু চোখ বইয়ের অক্ষরে আটকে রাখা দায়। ঘরে হাঁপ ধরে, বাডিতেও। বেরিয়ে পড়ে। অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা করে। কল্পনায় অদৃশ্য মানুষ হয়ে যায়। সেই অদৃশ্য মানুষের অবধারিত গন্তব্যস্থল ওই ফ্ল্যাট বাড়ি। যেখানে 'ওই একজন' আছে আর কোঁকড়া চুল, ডুরে-শাড়ি পরা একটা আদুরে মেয়ে আছে। অদৃশ্য মানুষ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে কত কি দেখে ঠিক নেই, হাসে মুখ টিপে, হিংস্র ক্ষিপ্ত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দের চিত্রটাকে রক্তাক্ত করে দেবার মুহূর্ত কল্পনা করে।

কিন্তু কাল্পনিক মুহূর্ত নিয়ে কতক্ষণ তুষ্ট থাকা যায়? কল্পনা ভাঙে যখন, বাস্তব খোরাক না পেয়ে হিংসা তখন নিজেকেই বিধ্বস্ত করতে চায়।

অদৃশ্য মানুষ হতে না পারুক, নিজে অদৃশ্য থেকে কিছু সন্ধান-পর্ব সম্পন্ন করেছে। যেমন, মা আর আগের স্কুলে যায় না, ঠিক সাড়ে নটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে উল্টোদিকের ট্রামে উঠে মাইলটাক দূরের এক নতুন স্কুলে যায়। বাড়ি ফেরে পৌনে পাঁচটা থেকে

পাঁচটার মধ্যে। শমী বাসে চেপে স্কুলে যায়, বাড়িতে বাস আসে সকাল পৌনে নটায়। ফেরে সাড়ে চারটার মধ্যে। সেও মাইল খানেকের মধ্যে একটা নতুন স্কুল। বাসটা একগাদা মেয়ে নিয়ে স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শমী স্কুলে আসে স্কার্ট ফ্রক পরে, কোমরে টাইট করে রিবন-বাঁধা মাথার ঝাঁকড়া চুলও সেই রং-এর রিবনে টেনে হর্স-টেল করে বাঁধা। চুলের বিন্যাস বোধ হয় 'ওই একজনই' করে দেয়।

অদৃশ্য থেকে দৃশ্যে আসার তাগিদ ঠেকিয়ে রাখা গেল না। স্কুলে ঢোকার মুখে বাসটা প্রায় থেমেই যায়। দু-তিন দিন সে-সময় ওখানটায় ঘোরাঘুরির পর শমী দেখল ওকে। সিতুর ভাবখানা যেন স্কুলের গা-ঘেঁষা ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাচ্ছিল, বাসটা ফটকে ঢুকছে বলে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তাকে দেখামাত্র শমীর দু চোখ উৎসুক হয়ে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সিতু যা করেছে আর কোনদিন তা করেনি। হাসিমুখে তার উদ্দেশে হাত নেড়েছে। আর অপ্রত্যাশিত খুশির ব্যস্ততায় শমীও হাত নেড়েছে। তার সত্যিকাবের আনন্দ হয়েছে। কম্পাউণ্ডের মধ্যে বাস আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সাগ্রহে এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে ছিল। তার মনে হয়েছিল, সিতুদার শুধু খুশিমুখ দেখেনি, হাত নেড়ে কিছু যেন একটা আশ্বাসও সিল।

এর দুদিন বাদে স্কুল-কম্পাউণ্ডের ভিতরে ঢুকেছে সিতু। দুপুরে, ঠিক টিফিন টাইমে। ভিতরের কম্পাউণ্ডে গাদা গাদা মেয়ে ঘুরছে মাঠে বাগানে এদিকে ওদিকে। চারদিকে চোখ চালিয়ে একজনকে ছেঁকে তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল তার বোন শমী বোসকে ডেকে দিতে পারে কিনা। তারপরেই ফ্যাসাদ, দরোয়ান প্রশ্ন করেছে, কোন্ ক্লাসের মেয়ে? মেয়েদেব একটা দঙ্গলেব দিকে ফিরে সিতু যেন কোনো চেনা মেয়েকেই দেখে নিচ্ছে, কিন্তু আসলে সে দ্রুত চিন্তা করছে কোন্ ক্লাস হতে পারে। প্রথমে যে ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল মনে আছে, কিন্তু কোন্ বছরে ভর্তি হয়েছিল সঠিক মনে পডছে না। এই ফাঁকে মুশকিল আসান হয়ে গেল। কোথা থেকে তাকে দেখে শমীই ছুটতে ছুটতে আসছে। অতএব দরোয়ানের প্রশ্নের আর জবাব দেবার দরকার হল না।

আনন্দ আর উত্তেজনায় এত জোবে ছুটে এসেছে যে শমীর মুখ লাল। একটু মোটা-সোটা বলে হাঁপ ধরেছে।—সিতুদা তুমি!

সমান তালে চোখে-মুখে খুশি ছড়ালো সিতুও। দীর্ঘ অদর্শনের পর সামনাসামনি দেখার আনন্দের মতই। বলল, আমি তো প্রায়ই এই রাস্তা দিয়ে যাই, সামনেই এক ইয়ং প্রোফেসারের বাড়ি, তার সঙ্গে পড়াশুনার আলোচনা হয়, আড্ডা হয়। তা তুই আজকাল এই স্কুলে পড়িস?

ওকে বুঝতে না দিযেই কথার ফাঁকে সামনের গাছটার আড়ালে এসে দাঁড়াল। শমী বলল, হ্যাঁ, মাসী আর আমি দুজনেই আগের স্কুল ছেড়ে দিয়েছি। আনন্দে কি যে বলবে শমী ঠিক পাচ্ছে না, মুখে লজ্জা-মেশানো সঙ্কোচ।—আমি আগের মতই মাসী ডাকি, মাসী বলে দিয়েছে কাকীমা ডাকতে হবে না।

বেড়াল নখ গোটায় কি করে সিতুর দেখা আছে। সেও সেই চেষ্টাই করছে। খুশিতে টান ধরতে দেবে না। শব্দ করেই হাসল, হোয়াট্ ইজ্ ইন এ নেম্—বুঝলি কিছু? কোন্ ক্লাস হল তোর?

নাইন, এবারে টেন-এ উঠব। তুমি স্কুলে এলে যে?

পকেটে হাত ঢুকিয়ে মস্ত বড় একটা দামী চকোলেট বার করল সিতু—নে খা। ...সেদিন বাসে তোকে দেখে আজ ঢুকে পড়লাম। কেন, কেউ কিছু বলবে নাকি তোকে?

শমী চকোলেট পেয়ে খুশি, ওটা সিতুদার দেওয়া বলে খুশি, আর সিতুদার এমন অপ্রত্যাশিত ভব্যসভ্য হাসিমুখ দেখে আরো খুশি। ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, কে আবার কি বলবে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি বলব আমার দাদা। হ্যাঁ সিতুদা, আমার ওপর আর তোমার একটুও রাগ নেই আর, না?

হাসি বজায় রাখা এত কঠিন সিতু জানত না। চেষ্টার ত্রুটি নেই। বলল, রাগের বয়স আছে? তাছাড়া তোর ওপর রাগতে যাব কেন? সেই একবার অন্য স্কুল গেট থেকে তোকে ডেকেছিলাম, তুই এলিই না।...বাস থেকে আমাকে পরশু দেখলি, বাড়ি গিয়েই মা-কে বলেছিস তো?

ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখ করে শমী মাথা নাড়ল। বলেছে। সিতুদা তাকে দেখে হাসিমুখে হাত নেড়েছিল—সেটা তার কাছে আনন্দের দিনই তো।

মা শুনে কি বলল?

কিছু বলেনি। শমীর উৎসুক আগ্রহ।—তুমি বাড়িতে আস না কেন? যতবার দেখা হয় পালিয়ে যাও। এজন্যে মাসীর কত কষ্ট হয় জানো?

সিতু প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করছে এটা স্কুল। মাসীর ওপর দরদের কথা শুনে দু হাত নিশপিশ করছে, রক্ত মাথার দিকে ধাওয়া করতে চাইছে। যে বলছে, এক চড়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। আবার নিজেই ভাবছে, শমীর এতটুকু সন্দেহ হলে সেটা গাধার মত কাজ হবে। দুর্বার রাগ সত্ত্বেও মাথা দ্রুত কাজ করছে তার। বড় নিঃশ্বাস ফেলল, আমারই কি কম কষ্ট হয় ভাবিস? মায়ের কষ্ট হয় জানলি কি করে, কিছু বলে?

শমী মাথা নাড়ল, বলে না। কিন্তু পাছে মাসীর কষ্টের ব্যাপারে সিতুদার সন্দেহ হয় তাই তাড়াতাড়ি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেষ্টা করল।—না বললেও আমি ঠিক বুঝতে পারি। মাসী যে এখনো তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি একবারটি বাড়িতে এলেই বুঝতে পারবে। আসবে?

ভালবাসার কথা শোনামাত্র আবার নিজেকে সংযত করার জন্য মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে ঢোকাতে হল। ভিতরের ক্রূর তাপ মুখের মেকী হাসিটুকু শুষে নিচ্ছে বুঝি। অতএব বিমর্ষ মুখ করে ভাবতে হল একটু। জবাব দিল, যেতে পারি, কিন্তু তোর জন্যেই যাওয়া হবে না।

কেন, কেন? শমীর মুখে শঙ্কা।

আজও তুই বাড়ি গিয়েই মাকে বলবি তো সিতুদা স্কুলে এসেছিল?

প্রশ্ন শুনে শমী হকচকিয়ে গেল কেমন। কি জবাব দেবে ভেবে পেল না।

সিতু বড় করে নিশ্বাস ফেলল একটা, বলল, তোর জন্যেই বোধ হয় মায়েতে ছেলেতে আর এ জীবনে দেখা হবে না।

শমী রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন?

আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, এক ভয়ানক জায়গায় গিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। নইলে গিয়ে গিয়েও কেন ফিরে আসি বুঝতে পারিস না? আর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতিজ্ঞার সময় ফুরোবে, তখন যেতে পাব। কিন্তু তার আগে যদি মা জেনে ফেলে

আমি দেখা করার জন্য হাঁকপাঁক করছি, তোর এখানে এসেছি, বা শিগগীরই যাব ভাবছি, —তাহলে এ জীবনে আর দেখা তো হবেই না, উল্টে আমার মরা মুখ দেখতে হবে তোদের।

শমী পনেরোয় পা দিয়েছে বটে কিন্তু সিতুর তুলনায় অনেক সরল। তার বড় বড় চোখে রাজ্যের বিভ্রম। দুর্বোধ্য ভয়ও। শেষে উদগ্রীব মুখে মাথা ঝাঁকালো, তাহলে আমি বলব না, মাসীকে কিছু বলব না—বুঝলে?

হুঁঃ, তোর পেটে আবার কথা থাকবে, কোনো একটা কথা উঠলেই গলগল করে বলে ফেলবি।

কখখনো না! বলছি তো বলব না, কিন্তু তুমি কতদিনের মধ্যে যাবে?

খুব শিগগীরই। তার আগে এক-আধদিন তোর এখানে এসে বুঝে যাব মাকে কিছু বলেছিস কিনা।...হঠাৎ একদিন তোর সঙ্গে গিয়ে হাজির হব, মা একেবারে আকাশ থেকে পড়বে, খুব ভালো হবে না? আর আমাকে নিয়ে যাওয়ার ক্রেডিটটাও তো তোরই হবে। আগে কিচ্ছু বলবি না তো?

শমী সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে আশ্বাস দিল, কিচ্ছু বলবে না।

হাসিমাখা দু চোখ আর একবার ওর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিয়ে সিতু বিদায় নিল। দুটো দিন ধৈর্য ধরে কাটালো কোনরকমে। দুটো দিন দুটো বছরের মত। তৃতীয় দিনে সেই টিফিন টাইমে আবাব এলো। শমীকে খুঁজে বার করতে হল না। টিফিন হতে এ দুদিন ও-ই দশবার করে গেটের দিকে তাকিয়েছে।

বলিসনি তো কিছু?

শমী বিশ্বাসযোগ্যভাবেই মাথা নাড়ল। বলেনি তো বটেই, মাসীর সামনে সিতুদার কথা মনে হলেও বুকের ভিতরটা ধুকপুক করেছে।

হৃষ্ট মুখে সিতু এদিনও পকেট থেকে দামী চকোলেট বার করে ওর হাতে দিল। প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে আবারও সাবধান করল। আবার ফেরার আগে আশ্বাস দিল, আর তিন-চার দিনের মধ্যেই হুট করে একদিন ওকে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হবে।

আবারও একে একে তিনটে দিন বাড়িতে বসে কেটেছে সিতুর। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কি এক অস্থির তাড়না। নিতাইদার বই পড়ে, ছবি দেখে বা তার সঙ্গে এক জায়গায় যাবার সময়ও এরকম হয়নি। এই দুনিয়াটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করার মত মেজাজ। অথচ বাইরেটা একেবারে স্তব্ধ।

ঠিক চার দিনের দিন শমীর স্কুলে এলো আবার। টিফিন টাইমে নয়। ঘড়ি দেখে টিফিন টাইমের আধ ঘণ্টা বাদে। ফিরে আবার স্কুল বসেছে তখন। শুকনো খরখরে মুখ সিতুর। গেটের দরোয়ানের কাছে গিয়ে স্কুল-অফিসের খোঁজ করল। দরোয়ান অফিস-ঘর দেখিয়ে দিল।

...মিনিট পাঁচ-সাত বাদে ক্লাস থেকে অফিস-ঘরে ডাক পড়ল শমীর। দরোয়ানের মারফৎ তাকে বইখাতা নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। বিলক্ষণ অবাক হয়েই এসেছিল শমী, অফিস-ঘরের লেডি ক্লার্কের সামনে সিতুদাকে দেখে ভয়ে বিস্ময়ে বুক দুরু দুরু।

লেডি ক্লার্ক অর্থাৎ ওদের কনকদি জিজ্ঞাসা করল, এ তোমার দাদা?

বিমূঢ় মুখে শমী মাথা নাড়ল। তাই। সিতু বলল, বাড়ি চল, মায়ের শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে।

আকাশ থেকে পড়ার মুখ শমীর। কনকদি গেট পাস সই করে তার হাতে দিতে হতভম্ব মুখে সিতুদার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সিতুদা হনহন করে আগে আগে গেটের দিকে চলেছে। একবার ফিরে তাগিদ দিল, তাড়াতাড়ি, এক্ষুনি ট্যাক্সি ধরতে হবে—

দ্বিগুণ ঘাবড়ে গিয়ে শমী হন্তদন্ত হয়ে এগোলো, তবু বাইরে আসার আগে সিতুদার নাগাল পেল না।

গেট পেরিয়েই চলন্ত ট্যাক্সি থামালো সিতু। দরজা খুলতে আগে শমী উঠল, পরে ও। ঠাস করে দরজা বন্ধ করল। সিধা।

শমীর বুকের কাঁপুনি বেড়েই চলেছে। ঘুরে বসল।—মাসীর কি হয়েছে?

খুব অসুখ।

তোমাকে কে বলল?

বিভাস কাকা বাড়িতে ফোন করেছিল। আমি বললুম, তোকে নিয়ে যাচ্ছি। আমার প্রতিজ্ঞার সময়ও শেষ হয়েছে, যেতে আর বাধা কি।

কিন্তু মাসী তো সকালেও ভালো ছিল, কাকুরই শরীর ভালো ছিল না।

সিতু তেতে উঠল, তোর মাসীর শরীর কি মা-দুগ্‌গার শরীর, খারাপ হতে পারে না?

শমী চুপ মেরে গেল। এই মুখ দেখেও ভয়-ভয় করছে তার। মাসীর হঠাৎ এমন কি সাঙ্ঘাতিক অসুখ করতে পারে ভেবে পাচ্ছে না।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি জোরে ছুটেছে। এই রাস্তা শমীর চেনার কথা নয়, চিনলেও না। নির্দেশমত ট্যাক্সি আর একটা বড় রাস্তার বাঁক ধরে চলেছে। বেশ খানিক চুপচাপ থাকার পর সিতু বিরক্ত মুখ করে বলে উঠল, পনের বছর বয়েস হল, এখনো ফ্রক পরিস কেন, শাড়ি পরতে পারিস না?

শমীর বড় বড় দু চোখ তার মুখের ওপর, এই পরিস্থিতিতে ফ্রক-পরা হেতু বিরাগ কল্পনাও করতে পারে না। এ দুদিন টিফিন টাইমে যে সিতুদাকে দেখেছে, সে-রকম লাগছে না একটুও।

খোলা চুলে শাড়ি পরে সেদিন বাড়ির রেলিং-এ দাঁড়িয়েছিলি—এর থেকে ঢের ভালো লাগছিল দেখতে।

তাকে খুশি করার জন্যেই শমী হাসতে চেষ্টা করল একটু, স্কুলে ওরকম আসা যায়!

ও-রকম না হোক শাড়ি পরে তো আসা যায়!

খানিক বাদে এক বড় রাস্তায় ফুটপাতের পাশে ট্যাক্সিটা দাঁড় করানো হল। আর সিতুদা সেখানে নেমে তাকেও নামতে বলল দেখে শমীর বিস্ময়ের অন্ত নেই। গম্ভীর মুখে ট্যাক্সি-ভাড়াও মেটাতে দেখল। শমী চারিদিকে তাকাচ্ছে। সামনেই ঝকঝকে মস্ত দালান একটা, তার দেয়ালে সাহেব মেমসাহেবের বড় বড় রঙিন ছবি। দালানের মাথায় নাম পড়ে বুঝল এটা একটা ইংরেজি সিনেমা হল। সামনের বারান্দায় লোকের ভিড়।

ঘুরে এতক্ষণে সিতুদার চোখে-মুখে চাপা হাসি দেখল। তবু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞাসা করল, এখানে নামলে যে?

এবারে সিতুদা হেসে উঠল। দুদিন স্কুলে যেমন দেখা গেছে তেমনি হল মুখখানা।

সস্নেহে তার একখানা হাতও ধরল, বলল, তুই ভারী বোকা তো, এতক্ষণ তোর দিকে চেয়ে কি মজাই না লাগছিল।

শমী অপ্রস্তুত, কিন্তু শঙ্কার ছায়া মিলায়নি।

তোকে বলেছিলাম না, হুট করে একদিন তোকে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হব। স্কুলে ওরকম না বললে তোকে আনতে পারতুম? ঘড়ি দেখল, আয়, তিনটে বাজে—

সিতু এগিয়ে গেল। উদ্দেশ্য না বুঝে বিমূঢ়ের মতই শমী তার পাশে এলো আবার। —মাসীর কিছু হয়নি?

মনে মনে একটা কটূক্তি করে সিতু হেসেই মাথা নাড়ল। কিছুই হয়নি।

তাহলে বাড়ি যাচ্ছ না কেন, এখানে কোথায় যাচ্ছ?

চাপা অসহিষ্ণুতা দানা বেঁধে ওঠার আগেই সিতু আবার হাসল, কি যে বুদ্ধি তোর, দুদিন বাদে না ক্লাস টেন-এ উঠবি? এখন বাড়ি গেলে মা-কে পাব? মা স্কুলে না এখন!

শমীর মনে হল, তাই বটে। কিন্তু এভাবে অসুখের কথা বলে কেউ তাকে স্কুল থেকে নিয়ে আসতে পারে, সেটা যেন এখনো কল্পনা করতে পারছে না।

সিতু বলল, তার থেকে ফুর্তি করে সিনেমা দেখি চল্, ইংরেজী ছবি তো দেখিস না কখনো, দুজনের টিকিট আমি কেটেই রেখেছি। তোকে কি-চ্ছু ভাবতে হবে না, মা বাড়ি ফেবার সময়-সময়ই ফিরব'খন, দুজনকে একসঙ্গে দেখে একেবারে হাঁ হয়ে যাবে।

হাঁ আপাতত শমীই হচ্ছে। লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গালচে পাতা তকতকে সিঁড়ি ধরে তাকে দোতলায় এনে তোলা হল। তার একখানা হাত তখনো সিতুদার হাতে ধরা। চারিদিকের চোখ-ঠিকরানো সাজ-সজ্জা আর আলো দেখেই কিনা বলা যায় না, শমী বিহ্বল।

একটা লোক টিকিট দেখে হলের এক কোণে নরম তুলতুলে দুটো গদি আঁটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। চেয়ার যে তখনো বোঝেনি। সিতুদা হাতে করে টানতেই ও-দুটো চেয়ার হয়ে গেল। পাশাপাশি বসল দুজনে। পিছনের সারি, সামনে আর আশপাশে জোড়া জোড়া আর কতগুলো মেয়ে পুরুষ, সাহেব-মেমসাহেবই বেশি। সামনের সাদা পর্দা থেকে সুন্দর বাজনা আসছে।

তবু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে তেমন মন বসছে না শমীর। গলা খাটো করে বলল, বাড়ি ফিরে আমাকে না দেখলে কিন্তু মাসী ভাববে—

চাপা রাগে সিতু বলে উঠল, কিচ্ছু ভাববে না।

একটু বাদেই চঞ্চল হয়ে উঠল সে। মাথায় আরো কিছু এসেছে। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চুপ করে বসে থাক একটু, আমি তোর ভাবনা দূর করে আসছি—

হন হন করে তাকে হলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখল। কোথায় যেতে পারে শমীর মাথায় ঢুকল না। একলা থাকার অস্বস্তিতে উন্মুখ হয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল।...ওমা, দরজা যে বন্ধ হয়ে গেল, লাইট নিভে ঘর অন্ধকার হচ্ছে—একেবারে ঘুটঘুটি অন্ধকারই হয়ে গেল—তাকে ফেলে রেখে সিতুদা গেল কোথায়?

আর একটু দেরি হলে ঘাবড়ে গিয়ে শমী চেয়ার ছেড়ে উঠেই পড়ত হয়ত। ওদিকে অর্থাৎ দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল, হঠাৎ কাঁধে হাত দিয়ে পাশে কে বসে পড়তে আঁতকে উঠল।...যাক সিতুদাই। খুশিমুখে ফিস-ফিস করে সিতুদা বলল, মা-কে ফোন করে জানিয়ে এলাম, দেরি হলেও আর ভাববে না। নিশ্চিন্ত?

ফোন করলে। কোথায়?

আস্তে! ওই ইয়ে—স্কুলে।

মাসী কি বলল?

বলবে আবার কি, তোকে নিয়ে যাচ্ছি শুনেই আনন্দে আটখানা। বললাম, সিনেমা ভাঙলে রেস্টুরেন্টে খেয়েদেয়ে ফিরতে একটু দেরিই হবে। কলকাতার বড় রেস্টুরেন্টে তো খাসনি কখনো। এই দিনে একটু ফুর্তি করে বাড়ি ফিরছি শুনে মা খুশিই হল—

অন্ধকার চোখে সয়েছে খানিকটা, তবু সিতুদার মুখ দেখা গেল না ভালো। রেস্টুরেন্টে খাবার লোভ যে নেই তা নয়, কিন্তু সিতুদার কাণ্ড দেখে ও আপাতত খাবি খাচ্ছে। সবদিকেরই ফয়সালা হল বলে নিশ্চিন্ত একটু বটেই, তবু ভয়ানক অদ্ভুত লাগছে তার। এতদিন বাদে ছেলেকে পাবে, মাসীর আনন্দে আটখানা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। যে গোঁয়ার ছেলে, কিছু বললে পাছে বিগড়োয় সেইজন্যেই হয়ত টেলিফোনে যা বলেছে, তাতেই রাজী হয়েছে।

প্রথমে হিজিবিজি কি সব দেখানোর পর আলো জ্বলেছে, তার খানিক বাদে আবার আলো নিভেছে—এবারে আসল ছবি শুরু নাকি। ছবি চলেছে, শমী এক বর্ণও বুঝছে না, হাঁ করে দেখছে শুধু। মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক থেকে হাসির শব্দ কানে আসছে। এক শমীই বোকার মত দেখে চলেছে। এক জায়গায় ছবির সাহেবটা মেমসাহেব মেয়েটাকে জাপটে ধরে চুমু খেতে লাগল। শমী মনে মনে বলে উঠল, কি অসভ্য!

তার পরেই সচকিত। সিতুদার একখানা হাত তার কাঁধে, আঙুলে করে অল্প অল্প চাপ দিচ্ছে। খানিক বাদে ছবিতে আর একবার ওই রকম হতে কাঁধ ছেড়ে হাঁটুর ওপর সিতুদার হাতের চাপ টের পেল। অন্ধকারে শমীর মুখ লাল, কি রকম একটা অস্বস্তি লাগছে তার।

ছবি শেষ হল একসময়। আলো জ্বলল। অত আলোর জন্যে কিনা বলা যায় না, সিতুর মুখখানাও লালচে ঠেকছে। সিঁড়ি ধরে নীচে নামল, বাইরে বেরিয়ে এলো। বিকেল পেরিয়ে আবছা অন্ধকার নেমেছে।

চল্, এবার খেয়ে নিই ভালো করে।

খাওয়ার স্পৃহা কেন যেন কমে গেছে শমীর। বইয়ের ব্যাগটা একবার হাতে দুলিয়ে বলল, এখন আর দেরি না করে একেবারে বাড়ি গিয়েই খাবে চলো না...

বাড়িতে তো পোলাও-কালিয়া রেঁধে বসে আছে তোর জন্যে, অমন জায়গায় কখনো খাসনি, চল্—

যেতে হল। লোকের ভিড়, তবু সিতুদা হাত ধরে আছে বলে কেমন কেমন লাগছে। বড় রেস্তোরাঁই বটে। শমীর হাঁ হয়ে যাবার দাখিল। তার মধ্যে একটা খুপরি ঘরে ওরা দুজনে গিয়ে বসল। অর্ডার মত অনেক খাবার এলো। ভালও লাগছে খেতে, কিন্তু ও যত চটপট খাচ্ছে, সিতুদা ততো নয়। মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে,

দুচোখ অত চকচক করছে কেন, বুঝছে না। সিতুদা কথাও বেশি বলছে না এখন।

প্রায় তিন-পো-ঘণ্টা বাদে পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে খাবারের দাম দিল সিতুদা। বেরিয়ে এলো যখন সন্ধ্যা পার। কোন্ দিকে যেতে হবে শমী জানে না, তার হাত ধরে সিতুদা সামনের বড় রাস্তা পার হল। তারপর ট্রাম লাইন ছাড়িয়ে ময়দানের দিকে পা বাড়ালো।

ওই মাঠে একটু বসব।

এই অন্ধকারে! শমী আঁতকেই উঠল, না না, রাত হয়ে গেল, বাড়ি চলো। তাছাড়া শীত-শীত করছে।

শীত করবে না, চল্ না। আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে, একটু খোলা হাওয়ায় বসব। টেলিফোন তো করা হয়েছে, তোর ভয় কি?

হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে, শমীর বাধা দেবার শক্তি নেই। অথচ এখনো বাড়ি না ফেরাটা তার ভয়ানক খারাপ লাগছে। নির্জন অন্ধকারের মাঝে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল আবার—আর হাঁটতে পারি না, এবার চলো।

সিতু থমকালো। হাত ছেড়ে দিল। তাহলে একাই যা, আমি যাব না।

একা যাওয়ার নামে শমী চমকে উঠল। ব্যাগে অবশ্য টাকা আছে একটা, মাসী দিয়ে রাখে, আর কত নম্বর বাসে যেতে হয় তাও জানে। কিন্তু একা কোনদিন ট্রামে-বাসে ওঠেনি। তাছাড়া এরপর সিতুদা সত্যি না গেলে কি হবে?

অগত্যা আরো খানিক এগিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসতে হল। সিতুদাও গা গেঁষে বসল। এত বেশি গা ঘেঁষে যে শমীর অস্বস্তি। কাঁধ ধরে আছে, নড়ার উপায় নেই।

খানিক চুপচাপ থেকে সিতু বলল, আমার কি ইচ্ছে করছে জানিস?

ভয়ে ভয়ে শমী তার দিকে তাকালো।

খুন করতে।

মুখ শুকিয়ে আমসি শমীর।—কাকে?

তোকে আমাকে মা-কে সক্কলকে।

সক্কলকে শুনে তবু স্বস্তি। কি গণ্ডগোলের মধ্যে পড়েছে বুঝছে না।

ওদিকে সরতে চাস কেন, কাছে আয় না। জোর করেই আরো কাছে টানল। —বিয়ে হলে তখন তো কাছে আসতেই হবে, অত লজ্জাই বা কি, ভয়ই বা কি।

ধেৎ। ভয়ে সঙ্কোচে শমী সরতে চেষ্টা করল।

সঙ্গে সঙ্গে কি যে হল নিজেও বোঝার অবকাশ পেল না। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল শমী। প্রথমে ভাবল সিতুদা খুন করার জন্যেই তাকে ভুলিয়ে এনেছে। পরক্ষণে আরো ত্রাস, গালে ঠোঁটে তার দাঁত বসে গেল। যেভাবে ধরেছে নড়তে পারছে না। অসহ্য যন্ত্রণা। শমী প্রাণপণে চেষ্টা করছে ছাড়াতে। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গর্জন, চুপ করে থাক্, নইলে খুনই করব তোকে আজ—

ভয়ে ত্রাসে দুই চোখ বিস্ফারিত শমীর। বুঝতেও পারছে। শুধু গালে ঠোঁটে দাঁত বসে যাচ্ছে না, গায়ের মাংসও যেন ছিঁড়ে খুবলে নিচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠতে গিয়েও পারছে না, দাঁত দিয়ে ঠোঁট দিয়ে তার মুখ চেপে রেখেছে। আর দু হাতে তাকে টেনে টেনে নিজের শরীরটার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছে।

ছাড়ো সিতুদা, ছাড়ো, মরে গেলাম।

. জোর করলে মরবি, ছাড়ব বলে তোকে এ পর্যন্ত এনেছি!

এলোমেলো টানা-হেঁচড়ার ফাঁকে এক ঝটকায় তাকে ঠেলে শমী উঠে দাঁড়াল। দিশেহারা হয়ে এক মুহূর্তের জন্য তাকে দেখল। তারপরেই ব্যাগটা তুলে নিয়ে অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে ছোটা।

ছোটাছুটি বাড়িতেও শুরু হয়েছে। স্কুলে হাসপাতালে খোঁজাখুঁজি করে বিভাস দত্ত এবার থানায় গেছেন। তারপর কি করবেন জানেন না। আর দুর্ভাবনায় ত্রাসে জ্যোতিরাণী ক্রমাগত ঘর-বার করছেন। স্কুলে যখন খোঁজ করা হয়েছে তখন সেখানে কেউ নেই। তারপর থেকে প্রতি মুহূর্তেই এই পাগল-করা ছটফটানি।

দরজা ঠেলে শমী ঘরে ঢুকল। ওর দিকে চোখ পডতে উঠে দাঁড়াতে গিয়েও পারলেন না। অজানা আশঙ্কায় স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। টলতে টলতে শমী এগিয়ে এলো। ঠোঁটে গালে ক্ষতচিহ্ন। হাতের ব্যাগ ফেলে শমী দু হাতে জ্যোতিরাণীকে জড়িয়ে ধরল।

সম্বিৎ ফিরল যেন।—কি হয়েছে? কোথায় ছিলি এতক্ষণ? এই চেহারা কেন? বল না?

সিতুদা...!

আর্তনাদের মত শুধু এই একটা শব্দই বেরুলো মুখ দিয়ে। দু হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কোলে মুখ গুঁজে শমী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

জ্যোতিরাণীর সর্বাঙ্গ অবশ সেই মুহূর্তে। এক অকল্পিত আঘাতে বুকের স্পন্দনও থেমে এলো বুঝি।

উনচল্লিশ

ঘটনার আয়নায় সর্বদা দুর্যোগ চেনা যায় না।

শমী সময়মত স্কুলে গেছল, সময়মত ফেরেনি, বিকেলে গিয়ে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত গড়াতে চলেছিল—এটা একটা ঘটনা। আর জ্যোতিরাণী ছটফট করছিলেন, আর বিভাস দত্ত তিনবার করে ছুটে ছুটে খবর করতে বেরিয়েছিলেন। শমী ফিরল কিনা খবর নেবার জন্য ঘুরে এসে আবার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এও ঘটনার ফল। কিন্তু শমী ফেরার পর সেই রাতেই দুর্যোগের যে চেহারা জ্যোতিরাণীর মনের তলায় ছায়াপাত করে গেল, তার সঙ্গে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ যোগ নেই।

এই ছায়া বিভাস দত্তকে নিয়েই।

জ্যোতিরাণী স্কুল থেকে ফিরলেন যখন, বিভাস দত্ত তখন বুক পর্যন্ত চাদর টেনে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। পাশের ঘরে শমীকে না দেখে জ্যোতিরাণী ধরে নিয়েছিলেন ওধারের ফ্ল্যাটের সমবয়সী অবাঙ্গালী মেয়েটার সঙ্গে গল্পে মেতেছে। চা-জলখাবার করে ওকে ডাকতে গিয়ে শোনেন ওখানে নেই। বিভাস দত্তকে জিজ্ঞাসা করেছেন, শমীকে দেখছি না, ওধারের ফ্ল্যাটেও নেই বলল, স্কুল থেকে ফেরেনি?

গত চার পাঁচ দিন ধরে স্কুল থেকে ফিরে জ্যোতিরাণী তাঁকে এইভাবে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে দেখেছেন। সাধারণত সকালে লেখেন, দুপুরেও খানিকক্ষণ লিখে বেরোন, বিকেলে শমীর বাস আসার আগে বাড়ি ফেরেন, সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আবার

লেখা। এককালে নিজের পছন্দমত এটা-সেটা রাঁধতেন জ্যোতিরাণী। সেটা কোনরকম নিষেধের মধ্যে ছিল না। এখন নিয়মে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য ঝামেলা সামান্যই। দুটো ইলেকট্রিক হিটারে চটপট কাজ চুকে যায়। তবু বিভাস দত্ত লোক রাখতে চেয়েছিলেন। জ্যোতিরাণী বলেছেন দরকার নেই। তিনি অবকাশ চান না। অবকাশ নেইও। রান্না ছাড়া শমীকে দুবেলা পড়ানো আছে। স্কুলের খাতাপত্তরও নিয়ে আসতে হয়। বিড়ম্বনায় পড়েন রাত দশটার পরে। সময়টা তখন আর একজনের দখলে। তাঁর লেখা পড়তে হয়, লেখা শুনতে হয়, লেখা নিয়ে আলোচনা করতে হয়, আর তারও পরে নিভৃতের বিরামে এক ভীরু-চঞ্চল প্রত্যাশার দোসরের ভূমিকায় নিজেকে সঁপে দিতে হয়। দ্বিতীয় জীবনে সব থেকে অমোঘ অবাঞ্ছিত অধ্যায় এটাই।

কিন্তু গত চার-পাঁচ দিন ধরে এর ব্যতিক্রম দেখছিলেন। লেখা বন্ধ, বাইরে বেরুনোয় সাময়িক ছেদ পড়েছে, আলোচনার অবকাশ কম, আর কদিনের নিভৃতের বিরামও বিঘ্নশূন্য। পড়ায় অখণ্ড মনোযোগ। শিয়রের কাছে মোটা মোটা বই খানকতক। কি বই জ্যোতিরাণী উল্টে দেখেননি, তবে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জিজ্ঞাসার আগ্রহটুকুও দেখালে মন খারাপ হয়, তাই। বিভাস দ· হাসিমুখে জানিয়েছিলেন, দিনকতক এখন কলম ধরবেন না, ভালো করে কতগুলো বিষয়ে আগে পড়াশুনা করে নেবেন।

শমী স্কুল থেকে ফিরেছে কিনা প্রশ্নটা কানে গেলেও নিবিষ্টতায় ছেদ পড়েনি। বই না সরিয়ে জবাব দিয়েছেন, দেখিনি তো।

স্কুল থেকে ফেরার পরে তাঁর থেকেও বইয়ের প্রতি মনোযোগটা নতুন ঠেকেছিল জ্যোতিরাণীর। সেটা অখুশির কারণ নয় একটুকুও। এই মনোযোগের আড়াল পান যদি, উল্টে স্বস্তি। চা-জলখাবার খেতে খেতেও বইয়ের পাতা উল্টেছেন।

কিন্তু বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, মেয়েটার দেখা নেই। এরকম একদিনও হয় না, হয়নি। ঘরে ফিরে বারান্দায় এসেছেন, রাস্তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছেন। এখনো ফিরছে না, কি ব্যাপার? স্কুল তো ছুটি হয়েছে দু ঘণ্টারও আগে, কি হল একটু খোঁজ করা দরকার না?

বই সরিয়ে বিভাস দত্ত তাকিয়েছেন তাঁর দিকে, বিকেল পেরুতে চলল অথচ এখনো ফিরল না বলে চিন্তিতও হয়েছেন। কিন্তু উঠে খোঁজখবর করার সে-রকম আগ্রহ দেখা গেল না। বলেছেন, স্কুলেরই কোনো ব্যাপারে মেতে আছে নিশ্চয়, নইলে যাবে আর কোথায়। বাসেই তো আসবে, ভাবনা কি—

একটু বিরক্ত হয়েই জ্যোতিরাণী আবার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাবতে চেষ্টা করেছেন, হয়ত স্কুলের কোনো উৎসব আছে যার জন্য দেরি। কিন্তু দিনের আলোয় টান ধরার পরেও বাস আসছে না দেখে আর স্থির থাকা গেল না।

ঘরে ফিরে দেখেন, ওপাশে নিশ্চিন্তে পড়াশুনা চলছে। চুপচাপ অপেক্ষা করেছেন একটু, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছেন। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরেছেন। বিবর্ণ মুখ—বই রেখে উঠবে এখন একটু।

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচিত নন বিভাস দত্ত। বই ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে বসেছেন।

ওদের স্কুলে এইমাত্র ফোন করে এলাম, সেখানে এক দরোয়ান ছাড়া আর কেউ নেই। স্কুল ঠিক সময়েই ছুটি হয়েছে, মেয়েদের সব বাড়ি পৌঁছে দিয়ে স্কুল-বাসের ড্রাইভারও বহুক্ষণ আগে বাড়ি চলে গেছে।

বিভাস দত্ত বিমূঢ়, তাহলে শমী কোথায় গেল?

উত্তেজনায় দুশ্চিন্তায় জ্যোতিরাণী বলে উঠেছেন, সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করলে কাজ হবে, না এক্ষুনি বেরিয়ে খোঁজ করতে হবে?

বিভাস দত্ত জামাকাপড় বদলে আর চাদরটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও বেরুনোর তাড়াটা জ্যোতিরাণীর চোখে মন্থর ঠেকেছিল। তিনি যেন ঠেলে মানুষটাকে ঘর থেকে বার করেছেন। যতবার ঘুরে ঘুরে এসেছেন, ততোবার ওই মুখ বিবর্ণ পাংশু দেখেছেন। এসে খোঁজ নিয়েছেন শমী ফিরল কিনা, তারপর আবার ছুটে বেরিয়েছেন। শেষবার ফিরেছেন যখন, রাত মন্দ নয়। শ্রান্ত অবসন্ন ভগ্নোদ্যম। টলতে টলতে বিছানায় এসে বসেছেন, বড় বড় গোটাকয়েক দম নিয়ে বলতে চেষ্টা করেছেন, সব থানায় থানায়, হাসপাতালে আর ওদের স্কুলের—

ফিরেছে।

বিভাস দত্ত থমকে তাকিয়েছেন। জ্যোতিরাণী মূর্তির মত শয্যার একপ্রান্তে বসেছিলেন, তিনি ঘরে ঢুকতে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

কে ফিরেছে? শমী ফিরেছে? কোথায় ছিল? ডাকো ওকে—

এই মাত্র ঘুমোলো।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন বিভাস দত্ত, সমস্ত মুখে কালচে ছাপ, হাঁপাচ্ছেন। কোথায় ছিল সমস্ত দিন? ঘুমুতে হবে না, এক্ষুনি ডাকো ওকে—

নিজেকে সংযত করতে সময় লাগল একটু জ্যোতিরাণীর। বললেন, ওর দোষ নেই, স্কুল থেকে সিতু ওকে ধরে নিয়ে গেছল। ওর শরীব ভালো না, এখন ডাকা ঠিক হবে না—

বিভাস দত্ত কি শুনছেন খেয়াল করলেন না হয়ত। আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে গেলেন, আমি জানতে চাই ও কি বলে—

শেষ করতে পারলেন না। ধুপ করে শয্যায় বসে পড়লেন আবার। কাঁপছেন অল্প অল্প। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। গায়ে জড়ানো চাদরটাও টেনে খুলতে সময় লাগছে। জামা গায়েই শুয়ে পড়লেন, তারপর দম নিতে চেষ্টা করে ইশারায় পাখাটা দেখালেন।

ঘাবড়ে গিয়ে জ্যোতিরাণী তাড়াতাড়ি পাখা খুলে দিলেন, অথচ পাখার গরম আর নেই এখন। কাছে এগিয়ে এলেন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে স্পষ্ট বোঝা যায়।

কি হল?

জবাব পেলেন না। কষ্ট বাড়ছে। পাখা চলছে তবু বাতাসের অভাব যেন। ইশারায় বালিশ উঁচু করে দিতে বললেন। জ্যোতিরাণী আর একটা বালিশ মাথার নীচে গুঁজে দিলেন। খানিক বাদে জল চেয়ে খেলেন। কিন্তু ছটফটানি কমছে না। জ্যোতিরাণী পাশে বসলেন, বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। ভয়ই পেয়েছেন তিনি। মাস কয়েক আগের আর এক দুপুরের দৃশ্য মনে পড়ল। তিনি মিসেস দত্ত হবার আগের। যে সাক্ষাতের ফলে এই একজনের জীবনে আসতে হয়েছে তাঁকে। ভোর রাতে যে বীভৎস স্বপ্ন দেখার পর দুপুরে না এসে পারেননি। উত্তেজনার মুখে সেদিনও এমনি কাঁপতে দেখেছিলেন, এমনি ঘাম দেখেছিলেন, শেষে এমনি শ্বাসকষ্ট দেখেছিলেন। আজ সবই আরো বেশি দেখছেন।

বিভাস দত্ত একসময়ে বললেন, শরীরটা কদিন ধরে খারাপ যাচ্ছে, হঠাৎ শমীর

ব্যাপারটা এই ধকলে...মাস কয়েক আগেও মাঝেসাঝে এ-রকম হত, তখনো হার্টের ব্যাপার বলে সন্দেহ হয়নি...ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু ঠিক চট করে হল না। সুস্থ-স্বাভাবিক বোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে জ্যোতিরাণী অনুভব করতে পারেন। বিকেলেও চোখ-মুখ এমন কালচে শুকনো দেখেননি। ওষুধ কবে এনে রাখা হয়েছে জানেন না। নিজেই চেয়ে খেলেন। কিন্তু তার পরেও থেকে-থেকে চাপা ছটফটানি একেবারে গেল না।

বিভাস দত্তর পরিচিত ডাক্তার কাছে থাকে না। জ্যোতিরাণী অন্য ডাক্তার ডাকার কথা বললেন। কিন্তু ডাকবেন কাকে? বাড়িতে ফোন নেই, কাউকে চেনেনও না। এ অবস্থায় ছেড়ে ফোন করার জন্য বাইরেও বেরুতে পারছেন না। অগত্যা জ্যোতিরাণী পাশের ফ্ল্যাটের অবাঙালী ভাড়াটের শরণাপন্ন হলেন। সেই ভদ্রলোক নিজে বেরিয়ে পাড়ার এক ডাক্তার ধবে নিয়ে এলেন। রাত তখন কম নয়।

ডাক্তারের কাছে বিভাস দত্ত গত পাঁচ-ছ দিনের অসুস্থতার যে ফিরিস্তি দিলেন, জ্যোতিরাণীও সেটা এই প্রথম শুনলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট তখন থেকেই অল্প অল্প শুরু হয়েছে। হার্টের দিকে কি-রকম অস্বস্তি। সেটা অনেক আগে থেকেই ছিল, তবে বেশি নয়। দিন পাঁচেক আগে হঠাৎ একটু অসুস্থ বোধ করার দরুন ওমুক ডাক্তারকে দেখানো হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ডায়বেটিসের উপসর্গ থেকে হার্টের গোলযোগ দেখা দেয় অনেক সময়, সেই সন্দেহই করেছেন। দিনকতক সম্পূর্ণ বিশ্রামে থেকে এবং ওষুধ খেয়ে শ্বাসকষ্ট কমলে হার্টের প্লেন এক্স-রে আর ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ করবার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

রোগী পরীক্ষা করে এই ডাক্তার আগের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের সঙ্গে আরো কিছু যোগ করলেন, আর একটু সুস্থ বোধ করলেই অন্য নির্দেশগুলো যথাযথ পালন করতে বললেন। যাবার মুখে বারান্দায় জ্যোতিরাণীকে বলে গেলেন, হার্ট একটু বেশিই ড্যামেজ মনে হচ্ছে—এক্স-রে, কার্ডিওগ্রাফ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করানো দরকার।

পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটে ভদ্রলোকটিই ওষুধ এনে দিলেন। তারও বেশ খানিকক্ষণ বাদে কিছুটা স্বাভাবিক বোধ করলেন বিভাস দত্ত।

জ্যোতিরাণী বললেন, পাঁচ-ছ দিন ধরে কষ্টটা টেব পাচ্ছ, আমাকে কিছু বলোনি তো?

ভাবনার মধ্যে না ফেলে নিজেই সামলে নিতে পারব ভেবেছিলাম।

জ্যোতিরাণী আর কিছু বলেননি, বলতে পারেননি। নিজে সামলে নেবার এই চেষ্টাটা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করছেন এখন। নিঃশব্দে সামলাতে চেয়েছেন বলেই পাঁচ-ছ দিন আগে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ আনার কথা জানাননি। নিঃশব্দে সামলাতে চেয়েছেন বলেই দিন-রাত শয্যার আশ্রয়ে বই পড়ে কাটছিল। আর নিঃশব্দে সামলাতে চেয়েছেন বলেই শমী বাড়ি ফিরছে না দেখেও চট করে নড়তে চাননি। জ্যোতিরাণীর তাড়ায় নড়তে হয়েছে, ক'ঘণ্টা উত্তেজনা আর ছোটাছুটির ধকল গেছে। তার পরেও নিঃশব্দেই সামলাতে চেয়েছেন। কিন্তু পারা গেল না।

রাত বাড়ছে। বিভাস দত্ত ঘুমুচ্ছেন। ওষুধ খাওয়ার পর ঘুম একটু বেশি হবে ডাক্তার বলেই গেছলেন। জ্যোতিরাণী শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘুমন্ত মানুষটাকে দেখছেন। শ্রান্ত ফ্যাকাসে মুখ দেখছেন। শমী বাড়ি ফেরার পর যে ধাক্কা খেয়েছেন,

ভিতরে ভিতরে তার দুর্বহ ক্ষয় চলেছে। সত্তার ক্ষয়। তার ওপর এই অঘটনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভাগ্যের বিড়ম্বনার কথা ভাবছেন না তিনি। এই মানুষের প্রতিও অভিযোগ নেই। তাই প্রথমেই মনে হয়েছে মানুষটা শয্যা ছেড়ে নড়তে চাননি, তিনি ঠেলে পাঠিয়েছেন। অভিযোগের বদলে মায়া হয়েছে তাঁর। সঙ্গোপনে নিজেকে রক্ষা করার তাগিদে যে মানুষ অস্থির তাঁকে এই বিপর্যয়ের মুখে টেনে এনেছে সিতু। সব ছাড়িয়ে এই সত্যটাই বড় হয়ে উঠেছে। সত্তাক্ষয়ী সত্য শুধু এটুকুই।

দিন কয়েকের মধ্যেই জ্যোতিরাণী এক্স-রে আর কার্ডিওগ্রাফ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরদিনই একজন বড় ডাক্তার আনা হয়েছিল। তিনিও একই কথা বলেছেন। এক্স-রে, কার্ডিওগ্রাফ ছাড়াও ব্লাড কোলেস্টিরাল নাকি করাবার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিভাস দত্ত গা করছেন না খুব। বলছেন, হবে, যাক কটা দিন।

কেন বলছেন জ্যোতিরাণী বুঝতে পারেন। সবই খরচার ব্যাপার। এরই মধ্যে চুপচাপ দুই-একখানা চিঠিও লিখতে দেখেছেন। কি চিঠি বা কাকে চিঠি, জানেন না। অনুমান করতে পারেন। প্রকাশকদের কাছে টাকার তাগিদে চিঠি সম্ভবত। জনা দুই প্রকাশক বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। মনে হয় টাকাও কিছু কিছু দিয়ে গেছেন। কিন্তু মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছায়া সরার মত টাকা নয় বলে ধারণা। জ্যোতিরাণী ভাবতে চান না কিছু, তবু মনে পড়ে শোকার্ত অহঙ্কারে ছ মাসও হয়নি এই মানুষ শমীর নামে তিন হাজার টাকা আটকে রেখেছেন। জ্যোতিরাণী ভাবতে চান না, তবু মনে পড়ে, জীবনের কটা ধাপ আগে এই দুটো হাত দিয়েই লক্ষ লক্ষ টাকা নাড়াচাড়া করেছেন। ...আশ্চর্য!

সেদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরতে দেরি হল একটু। এসেই জানালেন, পরদিনই এক্স-রে হবে, আর যা-কিছু করা দরকার তাও দু-চার দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে, তিনি ব্যবস্থা করে এসেছেন।

বিভাস দত্তর সঙ্কোচ বিরক্তির আকার নিয়েছে।—কালই কি দরকার, কটা দিন সবুর করলে হত না?

মুখের দিকে চেয়ে জ্যোতিরাণী জবাব দিয়েছেন, টাকার জন্যে ভাবনা নেই, আমার কাছে যা আছে তাতেই হবে।

মুখ বুজেই একটা যন্ত্রণা সামলেছেন বিভাস দত্ত। জ্যোতিরাণী তাও অনুভব করেছেন। কিন্তু আপত্তি শোনার জন্য অপেক্ষা না করে কাজের অছিলায় সরে এসেছেন। এত বড চিকিৎসা করার মত উদ্বৃত্ত টাকা তাঁর হাতে থাকার কথা নয়। গয়নার খবর রাখে না বলেই পরিত্রাণ, সামনে দাঁড়িয়ে জেরায় পড়তে চান না।

এক্স-রেতে দেখা গেল হার্ট ডায়েলেটেড—বেশি মাত্রায় জখম। দীর্ঘদিনের টানা বিশ্রাম নির্দেশ। ওষুধপত্র আর আনুষঙ্গিক খাওয়া-দাওয়ার চার্টও ছোট নয়। ডাক্তারের কাছে অনুনয় করে সমস্ত দিন-রাতে মাত্র দু-তিন ঘণ্টা করে লেখার অনুমতি আদায় করেছেন বিভাস দত্ত। পরে বরং জ্যোতিরাণীই বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, সেরে গেলে তো সবই চলতে পারবে, এত ব্যস্ত হবার দরকার কি।

বিভাস দত্ত জবাব দেননি। এই ভাগটার ওপরই বোধ করি সব থেকে বেশি অভিমান তাঁর। শেষে বলেছেন, তুমি বিশ্বাস করো, হার্টের এইরকম ব্যাপার আমি জানতুম না।

জ্যোতিরাণী বাইরে স্থির, কিন্তু ভিতরে ভিতরে মুহূর্তের জন্য অস্থির আলোড়ন একটা। অর্থাৎ, জানলে নিজের জীবনে এভাবে তাঁকে টেনে আনতেন না। পরক্ষণে হাসতে চেষ্টা করেছেন।—তুমিও বিশ্বাস করো, এ নিয়ে আমি কিছু ভাবছি না।

তার একটু বাদেই বিভাস দত্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জ্যোতিরাণী আবার সেই অসহায় ঘুমন্তমূর্তি দেখেছেন। কেন তিনি অমন আলোড়ন অনুভব করেছিলেন সেটা নিজেরও অগোচর নয়। এই জীবনে তাঁকে টানা হয়েছে বটে, কিন্তু কতটা আসতে পেরেছেন তিনিই শুধু জানেন। তিনি মিসেস দত্ত হয়েছেন এটা বাস্তব সত্য, অনুভবের সত্য নয়। এ কি মিথ্যাচার? তাই যদি হয়, এত বড় মিথ্যের বোঝা তিনি বইবেন কি করে। সত্য হোক না হোক, মিথ্যেটাকেও অস্বীকার করতে চান জ্যোতিরাণী। তাঁকে দয়া করতে বলা হয়েছিল, রক্ষা করতে বলা হয়েছিল। তিনি তাই করেছেন। রণাঙ্গনের সেই নার্সের কথা ভাবতে চেষ্টা করেছেন তিনি। হিম-শীতে মুমূর্ষু সৈনিকের দেহে যে তাপ ছড়াতে চেষ্টা করেছিল, তাঁরও সেই ভূমিকা।

কিন্তু বড় কঠিন ভূমিকা।

মুমূর্ষু সৈনিকের জ্ঞান ছিল না, বিচার ছিল না, দাবি ছিল না। এই আহত মানুষের সঙ্গে তাঁর এইখানেই তফাৎ। দিন গেছে, মাস গেছে, বছর ঘুরেছে। চিকিৎসায় আর বিশ্রামে বিভাস দত্তর শরীর কিছু ফিরেছে, কিন্তু স্নায়ুর পীড়ন বেড়েছে। আত্মাভিমানে আঁচড় পড়েই চলেছে। তিন ঘণ্টার জায়গায় এখন দশ ঘণ্টা লিখতে চান। বাধা দিলে বিরক্ত হন, বলেন, কিছু যদি হয়ই তো এমন কি ক্ষতি? আর কতকাল এভাবে টানবে?

জ্যোতিরাণী সহজভাবেই বলেন, চলে তো যাচ্ছে—

কি-ভাবে কেমন করে চলছে আমি জানি না?

এই গোছের বিরক্তির মুখেই গভীর আগ্রহে হাত বাড়িয়ে তাঁকে কাছে টেনে এনেছিলেন একদিন। জিজ্ঞাসা করেছেন, কত বড় অবস্থার মধ্যে ছিলে একদিন আর কি অবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছ—একথা সত্যি তোমার মনে হয় না? সত্যি না?

জবাব দিতে সময় লেগেছে একটু। জ্যোতিরাণী বলেছেন, টাকার সুখ আগেও বড় করে দেখিনি, এখনো দেখি না। তুমি বড় করে দেখতে শুরু করেছ বলে আমার অসুবিধে হচ্ছে।

তখনকার মত নিশ্চিন্ত বোধ করেছেন বিভাস দত্ত। বিশ্বাসও করেছেন। কিন্তু নিজের ভিতর থেকেই যোগ্যতার প্রশ্ন উঠেছে আবার। বাস্তবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। শুধু অর্থ রোজগারের বাস্তব নয়। এক সামগ্রিক ব্যর্থতার ছায়া দেখেছেন তিনি। সেটা ঠেকাবার জন্যে এত যোঝাযুঝি, সেই কারণে অসহায় আক্রোশ। লেখা বাড়িয়েছেন, কিন্তু তার ফল তেমন আসছে না। তাঁর লেখার প্রতি পাঠকের অনুরাগ তিলমাত্র কমেছে এটা তিনি বিশ্বাস করতে চান না। প্রকাশকদের নিস্পৃহতার প্রতি মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ তিনি। বলেন, খেলো যুগের বাতাস এসেছে, সস্তার চটকদার জিনিস ছেপে দাঁও মারার লোভ ওদের।

সমালোচকের বিরূপ সমালোচনা চোখে পড়লে ফুঁসে ওঠেন, স্নায়ু ঠাণ্ডা হতে সময় লাগে। শ্রুতিকটু মন্তব্য করে বসেন এক-একসময়। লেখার প্রসঙ্গ জ্যোতিরাণী সন্তর্পণে পরিহার করে চলতে চান সেটা টের পেলে আত্মাভিমানে অস্থিরই হয়ে ওঠেন।

লেখার কদর কেন গেছে, কেন বিরূপ সমালোচনা, জ্যোতিরাণী ভালো করেই অনুভব করতে পারেন। প্রতিটি লেখায় এই স্নায়ু আর এই ক্ষোভের ছাপ পড়ছে। নিজের ব্যক্তি-জীবনের ন্যায্য প্রাপ্তির ঘোষণা প্রতি ছত্রে উঁকিঝুঁকি দেয়। স্বামী-স্ত্রীর বিরোধকে স্বতঃসিদ্ধ বিদ্বেষের দিকে টেনে আনার ঝোঁক। হিন্দু বিয়ের অবিচ্ছেদ্য অনুরাগের প্রতি তাঁর অবিরাম কটাক্ষ আর অকরুণ আঘাত।

জ্যোতিরাণী অনেক সময় বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, অনেক সময় বলেছেন, এসব নিয়ে গবেষণা না করে সাদাসিধে গল্প লেখো না?

সঙ্গে সঙ্গে আত্মাভিমানে ঘা পড়েছে। তর্ক তুলেছেন, নিজের মতটাকে লেখার মতই অকরুণ করে তুলতে চেয়েছেন। শেষে রাগ করে লেখা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। আর তেমনি মানসিক অস্থিরতার মুখে একদিন বলেই ফেলেছেন, পাঁচটা খেলো বইয়ের মত কাটতি না দেখে আমার লেখার ওপর তোমারও আস্থা গেছে তাহলে...।

সেই থেকে পারতপক্ষে জ্যোতিরাণী আর বলেন না কিছু। কিন্তু না বলার ক্ষোভও পুঞ্জীভূত হতে থাকে অনুভব করতে পারেন। ক্ষোভের থেকেও বিভাস দত্তর হৃত-মর্যাদার যাতনা বেশি। আজকাল বাইরে বেরোচ্ছেন একটু-আধটু। কিন্তু খুব খুশি মনে ফেরেন না। কিছুদিন আগের ঘটনা। বাইরে থেকে ফেরার পর থমথমে মুখ। তারপর কটা দিন এক চাপা ছটফটানি লক্ষ্য করেছেন জ্যোতিরাণী। খেদ গোপন রাখতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। এই কলকাতায় মস্ত একটা সাহিত্য অধিবেশন হয়ে গেল। অধিবেশন না বলে উৎসব বলা যেতে পারে। জ্যোতিরাণী কাগজ পড়ার অবকাশ কম পান বলেই খবর রাখেন না। সেই উৎসবে বিভাস দত্তর সম্মানেব আসন মেলেনি, সাদর আহ্বানও না। কর্মকর্তারা ডাকে একখানা আনুষ্ঠানিক ছাপা আমন্ত্রণ পাঠিয়েই খালাস। এই অবজ্ঞা অপমানের নামান্তর। বুকের মধ্যখানে এসে লেগেছে।

আঘাতটা ব্যক্ত করে ফেলার পর ক্ষোভ আর যাতনা বাড়তেই দেখেছেন জ্যোতিরাণী। রাগের কথা সঙ্কল্পের কথা পরিতাপের কথা শুনেছেন। আর বুকের তলায় জমাট বাঁধা কান্নার স্তূপ দেখেছেন। এই মানুষকে তিনি সুস্থ জীবনের আলোয় ফেরাবেন কি করে জানেন না। তিনি শুধু অসহায় বোধ করেছেন।

ওদিকে শমীর মধ্যেও কিছু পরিবর্তন এসেছে অনুভব করতে পারেন। এখন নয়, সেই এক রাতের পর থেকেই। অপরিণত, হাসিখুশি সরল মনের ওপর লোলুপতার এক বীভৎস থাবা পড়েছে। রাতারাতি তার ভিতরের দৃষ্টি সজাগ হয়েছে, বাইরে তাই আগের তুলনায় ঠাণ্ডা। সামনে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা। পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত। মাসীকে কাছে পেলে আগের মতই খুশি হয়, পড়াশুনার ব্যাপারে সাহায্যের প্রত্যাশায় দশবার করে এ-ঘরে উঁকিঝুঁকি দেয়। কিন্তু সে-রকম আনন্দের মুহূর্তেও একটা নাম আর তাকে উচ্চারণ করতে শোনেননি। সাদামাটা ভাবে গেল বছর সিতু আই. এসসি. পাস করেছিল, তখনো জ্যোতিরাণী ছাপা রেজাল্ট বুক না এনে পারেননি। শমীর সামনেই সেটা উল্টে দেখেছিলেন মনে পড়ে। তখনো মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি, সিতুদার কি হল? পরে নিজে দেখেছে কিনা তাও জানেন না।

অবকাশ নেই বললেই চলে। শমীকে পড়ানো, দুবেলার অল্পস্বল্প রান্না, স্কুল, বিভাস দত্তর ওষুধপত্র-পথ্য যোগানো, আর তাঁর হতাশার নানা প্রতিক্রিয়ার জের সামলানোর ফাঁকে বিরাম নেই। তবু জ্যোতিরাণীর মনে হয়, তিনি থেমে আছেন। তিনি ভবিতব্যের

এক অমোঘ গহ্বরে প্রবেশ করেছেন। তার কোনো একটা ধাপে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আরো কিছু বাকি। হয়ত অনেক বাকি।

তাঁর এই আপাত-শান্ত দিন যাপনের মধ্যে অকস্মাৎ স্নায়ুগুলো সব কেঁপে ওঠার মতই ঘটনা একটা। এর সঙ্গে নিজের ভবিতব্যের যোগ নেই। এই মাশুল আর একজন দিল।

স্কুল থেকে ফিরে দোতলায় ওঠার আগেই দু চোখ কপালে তুলে শমী ছুটে এসে জানালো, মাসী, মিত্রামাসী মারা গেছে। কালী জেঠু তাকে নিয়ে এসেছিল।

জ্যোতিরাণী বিমূঢ় হঠাৎ। ফ্যাল ফ্যাল করে কয়েক নিমেষ চেয়ে থেকে শেষে সিঁড়ি থেকে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন।

রুদ্ধশ্বাসে শুনলেন তারপর। দুপুরে ও-ঘরে কাকু ঘুমুচ্ছিল আর শমী পাশের ঘরে পরীক্ষার পড়া পড়ছিল। হঠাৎ রাস্তা থেকে কাকুর নাম ধরে কাকে ডাকতে শুনে রেলিং-এ এসে দেখে ট্রাকের মত ছোট একটা খোলা গাড়িতে মিত্রামাসী শোয়া, গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা—দেখলেই বোঝা যায় মরে গেছে। আর তার পাশে শুধু কালী জেঠু, আর কেউ নেই। ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, মাসী কোথায়, স্কুলে শুনে বলল, ফিরলে বলিস আমি এসেছিলাম। গাড়ি থেকে কালী জেঠু নামেওনি, তক্ষুনি চলে গেল। কালী জেঠুর একটুও মন খারাপ মনে হয়নি শমীর, বলল হাসি-হাসি মুখেই কথা কইল, তারপর চলে গেল।

জ্যোতিরাণী তেমনি বিমূঢ়, নির্বাক। মিত্রাদি তাঁর অনেক নিয়েছে, তাঁর সত্তাসুদ্ধু কাটা-ছেঁড়া করেছে। তবু এ-রকম একটা খবর কানে আসবে কখনো কল্পনাও করেননি। সব থেকে আশ্চর্য, কালীদার তার মৃতদেহ এখানে নিয়ে আসা। কি দেখাতে এনেছিলেন তিনি? কেন এনেছিলেন—শেষ দেখে জ্যোতিরাণী সান্ত্বনা পেতে পারেন ভেবে? ...মিত্রাদিকে ট্রাকের মত খোলা গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, দেহ ছাই করার জন্যে পাশে শুধু কালীদা, আর কেউ না। শুরুতে কালীদা আর শেষ-যাত্রায় কালীদা।

গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে আত্মস্থ হলেন একটু। ঘরে পা দেওয়ামাত্র বিভাস দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, শুনেছ? কালীদা আবার তাকে এখানে আনতে গেল কেন!

জবাব দেবার নেই কিছু। জ্যোতিরাণী নিজেই জানেন না কেন। খানিক চুপ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, একবার শ্মশানে যাব?

তুমি? না।

চিন্তার অবকাশ না দেবার মত করেই বললেন বিভাস দত্ত। আপত্তি না করলেও জ্যোতিরাণী যেতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

নিঃশব্দে স্মৃতি মুছে মুছে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু স্মৃতি মোছে, না মরে? রাতের বিনিদ্র শয্যায় তারা ভিড় করে এসেছে। মিত্রাদি প্রভুজী ধাম বীথি, আর সব মেয়েরা। মিত্রাদি আর কালীদা, মিত্রাদি আর তিনি নিজে, মিত্রাদি আর বীথি, মিত্রাদি আর ত্রিকোণ রাস্তার বড় দালানের কজন...মিত্রাদি মিত্রাদি মিত্রাদি...কি হয়েছিল মিত্রাদির? হঠাৎ তাঁর কপালে এই শাস্তি কেন? বিয়ে নাকচের আইন পাসের সঙ্গে সঙ্গে ডাইভোর্সের নোটিশ পেয়ে তিনি ধরে নিয়েছিলেন, ওই ত্রিকোণ রাস্তার বড় বাড়ির দালানে মিত্রাদির পাকাপাকি অধিষ্ঠানের সূচনা ওটা। তিনি ঠিক ধরে নেননি, কালীদার মুখে বিভাস দত্ত

এই গোছের আভাস পেয়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন। জ্যোতিরাণী অবিশ্বাস করেননি, কারণ তিনি বাড়ি ছাড়ার পর থেকে মিত্রাদির এই আশার কথা শুনে এসেছেন। কিন্তু সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল?

পরদিন বিকেলে ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরাণীর মুখে রক্ত উঠল এক ঝলক। ঘরে কালীদা বসে খুশি মেজাজে শমীর সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁকে দেখে হাসিমুখে ডাকলেন, এত দেরিতে ছুটি কেন তোমার?

জ্যোতিরাণী কি যে করবেন ভেবে পেলেন না। পায়ে পায়ে সামনে এসে দাঁড়াতে হল। মৃদু প্রশ্ন করলেন, কতক্ষণ এসেছেন?

অনেকক্ষণ। প্রথমে বিভাসকে একহাত নিয়েছি, বাইরের কি কাজ দেখিয়ে ও পালাতে এখন শমীকে নিয়ে পড়েছি।...বিভাসের শরীর তো যাচ্ছেতাই খারাপ হয়েছে দেখলাম, চেনা যায় না। ভালোমত চিকিৎসা-টিকিৎসা করাচ্ছে?

এই সাক্ষাতের ধাক্কা সামলাতে চেষ্টা করে জ্যোতিরাণী সামান্য মাথা নাড়লেন। ডাইভোর্সের নোটিশ পাওয়ার পর এই প্রথম দেখা কালীদার সঙ্গে। মুখ দেখে বা স্বাভাবিক কথাবার্তা শুনে মনে হবে জ্যোতিরাণী বরাবরই মিসেস দত্ত, আর দিনকতক অনুপস্থিতির পর তিনি হঠাৎ এসে হাজির হয়েছেন। এই আসার পিছনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু কালীদা যা পারছেন, জ্যোতিরাণী তা পারছেন না। সহজ হবার চেষ্টা করতেও বিসদৃশ লাগছে তাঁর।

মিত্রাদির কি হয়েছিল?

বলব'খন, তুমি মুখ-হাতে জল দিয়ে এসো।

জ্যোতিরাণী চলে এলেন। মুখ-হাতে জল দেবার তাড়ায় নয়, একটু আড়াল দরকার। একটু প্রস্তুতি দরকার। কালীদা হাসতে পারছেন সহজ হতে পারছেন অন্য কারণে। তিনি গৌরবিমলবাবু নন। জ্যোতিরাণী মিসেস দত্ত হবার ফলে খুশি যদি কেউ হয়ে থাকেন, এই একজনই হতে পারেন। কালো নোটবইয়ে তাঁর শকুনিস্মৃতি ভোলবার নয়। সব থেকে বড় আক্রোশ তাঁর যেখানে বাস করেন সেই বাড়ির মালিকের উপর। ওই একজনের সব কিছু ধূলিসাৎ দেখার আশায় বসে আছেন কালীদা, বুক ভাঙতে দেখার আশায় বসে আছেন।

তবু বিভাস দত্তর স্ত্রী হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ানোর বিড়ম্বনা কম নয়!...কাল মিত্রাদি মারা গেছে, কালীদা কালও এসেছিলেন। আজও এলেন আবার। কিন্তু কেন?

একটু সময় নিয়ে চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকলেন। কালীদা হাত বাড়ালেন, এসো, চায়ের কথাই ভাবছিলাম।

পেয়ালা হাতে নিয়ে পর পর গোটাকয়েক চুমুক দিলেন। সহজ হাসিমুখের তলায় শান্তির ছাপ লক্ষ্য করলেন জ্যোতিরাণী। চুলে তেল পড়েনি বোধ হয় কয়েকদিন। শমী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিকে চেয়ে কালীদা বললেন, মেয়েটা দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল। বোসো...

বসলেন।

চায়ের পেয়ালা রেখে তাঁর দিকে ফিরলেন।—তোমাকেও তো বেশ শুকনো শুকনো দেখছি, শরীর ভালো তো?

হ্যাঁ।

সহজ বাক্যালাপের সুরে কালীদা বললেন, তুমি আগের স্কুল ছেড়েছ শুনেছিলাম, অন্য স্কুলে ঢুকেছ শুনেছি কি না মনে নেই। আর মিত্রাকে নিয়ে অত ধকলের পর খেয়ালও ছিল না।...হাসপাতালে চোখ বোজার আগে দু-তিনবার তোমার নাম করেছিল, বোধ হয় দেখতে চেয়েছিল, তাই যাবার সময়ে কোন্ মূর্তিতে গেল একবার দেখিয়ে যাই ভাবলাম।

নিজের অগোচরে জ্যোতিরাণী উদগ্রীব। কথার সুর শান্ত, নিস্পৃহ।—খবর দিলেন না কেন?

হ্যাঁ। অর্থাৎ খবর দেওয়ার প্রসঙ্গ বিবেচনাযোগ্যও ভাবেননি। বললেন, তাছাড়া মারা যাবার আগেই সতের ঝামেলা, মারা যাবার পর তো কথাই নেই। পুলিশের টানা-হেঁচড়া, পোস্ট-মর্টেম। সকালে মরেছে বডি পেতে পেতে বিকেল—

মুহূর্তের মধ্যে ভিতরে বুঝি তোলপাড় হয়ে গেল জ্যোতিরাণীর। মিত্রাদি কেমন, মিত্রাদি তাঁর কোন স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে আব কত ক্ষতি করেছে, কয়েক নিমেষেব জন্যে তাও যেন ভুলে গেলেন জ্যোতিরাণী।—কেন? মিত্রাদির কি হয়েছিল?

হয়নি কিছু, পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়ে গলার এই জায়গাটা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছিল। আঙুল দিয়ে নিজের কণ্ঠনালীর কাছটা দেখালেন কালীদা।

জ্যোতিরাণী শিউরে উঠলেন। অস্ফুট আর্তনাদের মত একটা শব্দ বেরুলো গলা দিয়ে। স্তব্ধ খানিকক্ষণ। পরক্ষণে মনে পড়ল কি।...মিত্রাদির আশা ছিল—ত্রিকোণ রাস্তার বড় বাড়িব খালি জায়গা দখল করবে, বাড়ির আর অঢেল ঐশ্বর্যের কর্ত্রী হবে। আত্মহত্যা করল কেন বাড়ি আর ঐশ্বর্যের মালিক তাকে বিয়ে করতে রাজী হল না শেষ পর্যন্ত—সেই দুঃখে? কিন্তু কালীদার দিকে চেয়ে সেই রকমও মনে হল না, ওই সহজতার আড়ালে দু চোখ চকচক করছে একটু, আর মুখখানাও অকরুণ দেখাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা না কবে পারলেন না।—এ-রকম করল কেন? কি হয়েছিল?

শুনলেন কেন, আর কি হয়েছিল।

দিন চারেক আগে সন্ধ্যাব পর মিত্রাদি ত্রিকোণ রাস্তার বাড়ির দোতলায় উঠেছিল। বাড়ির মালিক ঘরে ছিলেন। খুশি মুখেই দোতলায় উঠেছিল মিত্রাদি। দুজনে একসঙ্গে রাতের কোনো ফাংশনে যাওয়ার কথা ছিল বোধ হয়। কালীদা তখন নিজের ঘরেই ছিলেন। একটু বাদে সেদিনের খবরের কাগজটা শুধু শামুকে দিয়ে কর্তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। কর্তার যদি দেখার দরকার হয় বা আর কেউ যদি দেখে। কাগজের প্রথম পাতাব কোণের দিকের একটা খবরে লাল পেন্সিলে গোল করে দাগ দেওয়া ছিল।

হঠাৎ মেয়ে-গলার কানের পর্দা-ছেঁড়া চিৎকারে বাড়ির সকলে চমকে উঠেছিল। কেবল না-না-না-না আর্তনাদ একটা। বুকে অস্ত্র-বেঁধা প্রাণীর শেষ আর্তনাদের মত। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার মত। সিতু মেঘনা শামু ভোলা ছুটে এসেছিল, কালীদাও বেরিয়ে এসেছিলেন। রাস্তায়ও লোক দাঁড়িয়ে গেছল।

...ঘরেব মধ্যে বাড়ির মালিক কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে, আর মিত্রাদি শর-বেঁধা পশুর মতই মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর কেবল সেই আর্তনাদ, না-না-না-না। খবরের কাগজটা তার পাশে মাটিতে লুটোচ্ছে।

কালীদাই প্রথম ঘরে ঢুকেছেন। মিত্রাদিকে মাটি থেকে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁকে দেখে মিত্রাদির হুঁশ ফিরেছে, চোখের পলকে নিজেই উঠে দাঁড়িয়েছে, তারপর পাগলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেছে। আর তারপরেও বাড়ির মানুষগুলোর সম্বিৎ ফিরতে সময় লেগেছে।

বিবর্ণ-পাংশু বাড়ির মালিক শিবেশ্বর চাটুজ্যে কালীদাকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, কি হয়েছে, কাগজ দেখেই ওরকম করল কেন? কি খবর বেরিয়েছে?

মাটি থেকে কাগজটা তুলে কালীদা লাল দাগ দেওয়া অংশটুকু তাঁকে দেখিয়েছেন।

ছোট খবর। অমুক নামের দার্জিলিংবাসিনী কুড়ি-একুশ বছরের সুশ্রী এক বাঙালী ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা ছিল। সেখানকার দুজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং এখানকার এক-জোড়া আধবয়সী হাতুড়ে দম্পতি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। নির্বিঘ্নে সঙ্কটত্রাণের আশ্বাস দিয়ে মেয়েটিকে ওই দম্পতিটির বাড়িতে এনে তোলা হয়েছিল। বিপদ উদ্ধারের স্থূল নৃশংস প্রচেষ্টার ফলে এই শোচনীয় মৃত্যু। জেরায় প্রকাশ, ওই প্রচেষ্টার আগে মেয়েটির হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রাণঘাতী যাতনা কল্পনাসাপেক্ষ। মেয়েটির মৃতদেহ সরকারী হেপাজতে চালান দেওয়া হয়েছে।

পড়ার পরেও প্রায় দুর্বোধ্য ঠেকছিল শিবেশ্বর চাটুজ্যের কাছে। কালীদা জানিয়েছেন, মেয়েটি মৈত্রেয়ীর।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মিত্রাদি নিজের গলায় ছুরি চালিয়েছিল পরদিন সন্ধ্যায়। তার আধ ঘণ্টার মধ্যে চাকরের টেলিফোন পেয়ে কালীদা গেছেন। আয়নার সামনে মেঝেতে পড়েছিল মিত্রাদি। ঘর রক্তে ভাসছিল। সেখান থেকে হাসপাতাল। ডাক্তার বলেছে, আত্মহত্যার এমন আসুরিক চেষ্টার নজির কমই দেখা যায়। হাসপাতালে প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা বেঁচে ছিল মিত্রাদি। কথা বলতে পারেনি, কিন্তু অনেক সময় জ্ঞান ছিল। যতবার খেয়াল হয়েছে কালীদা পাশে বসে আছে, ততোবার তাঁর দিকে চেয়ে দু হাত জোড় করেছে। আর শেষের দিকে বারকয়েক জ্যোতিরাণীর নাম করেছে।

স্তব্ধ নির্বাক খানিকক্ষণ। সর্বাঙ্গ সিরসির করছে জ্যোতিরাণীর। কালীদার দিকে চোখ পড়তে সচকিত একটু। কালীদা তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন। তাঁর দু চোখ আগের থেকেও বেশি চকচক করছে এখন। ঠোঁটের ফাঁকে আর গালের ভাঁজে ধারালো ছুরির ফলার মতই একটুকরো হাসি।

বললেন, তোমার আর যত লোকের যত ক্ষতি মিত্রা করেছে, তার সবটা না হোক কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে...কি বলো?

চল্লিশ

মাইলের কাঁটা যে দাগে উঠলে সিতুর ছোটার সঙ্গে মেলে, দুনিয়ার কোনো গাড়ির স্পিডোমিটারে সে-দাগ নেই।

তার এই তেইশ বছর বয়েসটা এখনো পিছনের নানা বাঁকে আটকে আছে। সেই দশ বছরের বাঁকে, চৌদ্দ বছরের বাঁকে, আঠারোর বাঁকে। আরো বহু বাঁকে। ক্ষয়ের সহজ পথ না পেয়ে সেই সব রুদ্ধ আবেগ শুধু জমাট বেঁধেছে। জমাট বেঁধে বেঁধে

এই তেইশের রূপ নিয়েছে। তেইশের এ যৌবন ক্ষ্যাপার মত তার কাঁধে চেপে আছে। কখন ওটা চাবুক চালায় ঠিক নেই। ও কেবল ছোটে ছোটে আর ছোটে। দুর্বার উচ্ছৃঙ্খল ছোটার তাড়না রক্তের ভিতর দিয়ে তাপ ছড়াতে ছড়াতে মাথার দিকে ধাওয়া করে। ছোটার নেশা ততো বাড়ে।

সিতুর গাড়ি হয়েছে অনেকদিন আগেই। ছোট অস্টিন। এমনি হয়নি, ও আদায় করেছে। কারো ইচ্ছে-অনিচ্ছে বা মতামতের পরোয়া করেনি। সব ব্যবস্থা করে বাবাকে বলেছে, তার গাড়ি আসছে, টাকা লাগবে।

গাড়ি আসার পনের দিনের মাথায় পাশে ড্রাইভারও রাখেনি। গাড়ি নিয়ে বেরোয় যখন কোথায় যাচ্ছে জানে না, ফিরবে কখন তাও না। ছোটার তাগিদে ছোটে। ছোটাটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে এখন। কলকাতার বেষ্টনী ছাড়িয়ে বাইরেও কতবার বেরিয়ে পড়েছে ঠিক নেই। বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ মাইল নয়, পাঁচশ হাজার মাইলও পাড়ি দিয়েছে। একা, সঙ্গে শুধু টাকা সম্বল। বেরোয় যখন, মনে হয় আর ফিরবে না। কদিন না যেতে আবার কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ তাকে ঘাড় ধরে টেনে আনে।

বি. এসসি. পাস করেছে তিন বছর আগে। পরীক্ষার আগে মাসখানেক বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখেছিল। পাস-ফেলের ভাবনা ছিল না। পরীক্ষা একটা দিতে হবে, তাই দিয়েছিল। ধরেই নিয়েছিল সেটাই শেষ পরীক্ষা। পাস কোর্সে ঠেকেঠুকে উতরে গেছে। উতরে গেছে কিনা সেটা জানারও আগ্রহ ছিল না। তারপর কিছুই আর করছে না দেখে জেঠুই একদিন ডেকে বলেছিল, তার সঙ্গে অফিসে আসতে, কাজ-কর্ম দেখতে।

কথাটা যে তার নয়, বাবার—জেঠু স্পষ্ট করে না বললেও সিতু বুঝেছিল। বাবার বাইরেটা তেমনি, কিন্তু ভিতরের একটু পরিবর্তন বুঝতে পারে। মিত্রামাসী আত্মহত্যা করার পর থেকে কি...? না, তারও অনেক আগে থেকেই। সেই মা চলে যাবার পর থেকেই বোধ হয়। তবু কটা বছর বাবা মেজাজ আর ঝোঁকের ওপর কাটিয়েছে। সিতুর চোখ-কান খোলা সর্বদা। আর মাথার ভিতরে সারাক্ষণের এক বিশ্লেষণের যন্ত্র বসানো। টাকার আমদানি আগের থেকেও বেড়ে চলেছে মনে হয়। তবু তার বরাবরই ধারণা, মা চলে যাবার পর থেকেই বাবার শক্তি অনেক ক্ষয় হয়ে গেছে। বাবার মেজাজ, রাগ-বিরাগ, ক্ষিপ্ততা সব কিছুর লক্ষ্য ছিল একজন। সেই একজন লক্ষ্যচ্যুত হতে বাইরের মেজাজ আর বাগ-বিরাগের খোলসটা তেমনি আছে বটে, ভিতরে যেন শাঁস নেই, শেকড় নেই। এখন আগের থেকে আরো গম্ভীর, কিন্তু সেও দাপটশূন্য।

তার প্রতি অলক্ষ্য বাবার মনোযোগ সিতু বিশেষ করে টের পেয়েছিল মিত্রা মাসী মারা যাবার পর থেকে। জেঠুর কালো নোটবইয়ের সেই লেখাগুলোর এক বর্ণও দুর্বোধ্য নয় এখন। ক-বছর ধরে জেঠু নোটবইটা কোথায় সরালো কে জানে। ওটার প্রতি সিতুর কৌতূহল আগের থেকেও ঢের বেশি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। না পেলেও মনে আছে সবই। মায়ের ওপর ওর অমন দুর্বার আক্রোশের হেতু নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় খুব। অনেক সময় নিজেরই বিস্ময় জাগে, অহেতুক প্রতিহিংসার এই তাপ বাবার থেকে পেলো কিনা। অথচ আশ্চর্য, বাবার উপরে তার বিতৃষ্ণা একেবারে স্পষ্ট। সিতু আগেও তাকে পছন্দ করত না। এখন সেটা বিতৃষ্ণায় দাঁড়িয়েছে। মা চলে যাবার পর বাবা অনেক সময় তার পড়ার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, নয় তো দূরে দূরে পায়চারি করেছে আর মাঝে মাঝে তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে।

কিন্তু সিতু কখনো কাছে ঘেঁষেনি, বাবা কাছে আসুক তাও চায়নি। তার আই. এসসি. পরীক্ষার ফল দেখে বাবা অবাক। অত অবাক হতে দেখেই সিতুর মনে হয়েছিল পাস না করে ফেলটা করলে আরো ভালো হত। বি. এসসি.-তে পাস-ফেলের চিন্তাই করেনি। তবু উতরেই গেছে। তারপর থেকে বাড়িতে শুধু থাকা-খাওয়ার সম্পর্ক। তাও কমে আসছে। শুধু টাকার সম্পর্কটা আছে। বাবা সেটা লক্ষ্য করেনি তাও ভাবে না। বেশি রাতেও বাড়ি ফেরার পর বাবার ঘরের আলো নিভতে দেখে। আর সেরকম দরকার হলে বিছানার তলা থেকে চাবি নিয়ে সিতু তার সামনেই সিন্দুকও খোলে। কোনরকম অনুশাসন আর চলবে না সেটা বুঝেছে বোধ হয়, ও বোঝাতেই চায়।

জেঠু অফিসের কাজকর্ম দেখার কথা বলতে সাদাসিধে জবাব দিয়েছে, তার দ্বারা ওসব হবে না। মুখের ওপর তাকে অমান্য করে না, তা বলে পরোয়াও আর তেমন করে না। জেঠুর বলার সুরে হুকুমের আভাস ছিল না, তারও জবাবের সুরে ঝাঁজ কিছু ছিল না। তার পরেও জেঠু হেসে বলেছিল, তোর দ্বারা কি হবে তাই ঠিক কর তাহলে, তোব বাবাকে জানিয়ে দিই।

সিতু তক্ষুনি ধরে নিয়েছিল তাকে নিযে দুশ্চিন্তাটা জেঠুর নয়, বাবার। জবাবের সুরও বদলেছে তখন—কিছু না করলে বাবা কি করবে জানতে পারলে তখন বলব।

এরই মধ্যে একটু ভালো লাগে ছোট দাদু যখন হঠাৎ-হঠাৎ এসে হাজির হয়। ছেলেবেলার গল্পের আসরেব কাল গেছে। কিন্তু ভারী মিষ্টি স্মৃতির মত সেই সব গল্প মনের তলায় ছড়িয়ে আছে। আগের থেকে গম্ভীব হযেছে ছোট দাদু। তাও শ্রীশূন্য নয়। ভালো লাগে। আবার এই ছোট দাদুর ওপবেও বাগ হয় তার। এটা অন্য বকমের রাগ। মনে হয়, ছোট দাদু কিছু একটা সুখেব সন্ধানে আছে, কোনো শান্তির উৎস খুঁজছে, কি সুখ, কোন শান্তি, সিতুব ধারণা নেই। কিন্তু ও দুটোর সঙ্গে আপসও নেই। কি মনে পড়লে নিজেই কৌতুক বোধ করে। কালো ডায়েরিতে ছোট দাদুর সম্পর্কে জেঠুর লেখা মনে পড়লো। জেঠু কেন ছোট দাদুকে পাষণ্ড বলেছিল আর মরতে উপদেশ দিয়েছিল সেটা বোঝার মত বুদ্ধি বছর কয়েক আগেই হয়েছে। কল্পনার লাগাম টানার অভ্যেস নেই। একটা সম্ভাবনার চিত্র চোখের সামনে দাঁড় করাতে গিয়ে হেসেই ফেলেছিল। মনে মনে ছোট দাদুর রসজ্ঞানের তারিফ করেছে। জেঠুর ভাষায় ছোট দাদু কতটা মরেছিল জানতে ইচ্ছে করছে। দশবছরের সিতু কত সময়ে হাঁ করে মা-কে চেয়ে চেয়ে দেখত মনে পড়ে। কেমন দেখত তাও। ষোল বছরের সেই মা-কে ছোট দাদু কেমন দেখত? মা যখন কারো বউ হয়নি, কারো মা হয়নি—তখন?

হাসি মিলোবার আগেই চোয়াল শক্ত হয়েছে। খবখরে চোখের তাপে আগে নিজের ভিতরটা ভস্ম করতে চেয়েছে। নিজের উদ্দেশে অস্ফুট গালাগাল করে উঠেছে। বিস্মৃতির তন্ময়তা থেকে সরোষে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে।

ছোট দাদু এলেই ওকে নিয়ে পড়ে। অনুযোগ করে, বকা-ঝকাও করে একটু-আধটু। এবারেও এসে বলেছিল, এ-রকম বাউণ্ডুলে হয়ে গেলি কেন?

সিতু হাসিমুখে পাল্টা প্রশ্ন করেছে, তুমি যা হয়েছ তার নাম কি?

বিব্রত মুখে ছোট দাদু চোখ পাকাতে চেষ্টা করেছে, আমাকে বাউণ্ডুলে বলিস! ডাকব তোর বাবাকে?

মুখের হাসিতে টান ধরেছিল সিতুর। একটা স্মৃতির ধাক্কা সামলাতে হয়েছে।

আগেও ছোট দাদু এমনি চোখ পাকাতো, বাবাকে ডাকার কথা কখনো বলত না, সর্বদাই শাসাতো, ডাকব তোর মাকে?

পায়ের চাপে গাড়ির গতি বাড়ে, স্পীডের কাঁটা ঘোরে। বেপরোয়া গাড়ি চালানোর দায়ে গোটাকতক ওয়ার্নিং খেয়েছে, বারকয়েক জরিমানা দিয়েছে। পথনীতির সেসব গণ্ডগোল সামলাবার দায় সিতুর নয়। জেঠু সামলায়, বাবা তাকে সামলাতে বসে। বার দুই ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হতে বসেছিল। সিতু বাবাকে জানিয়ে খালাস। বাবা জানে লাইসেন্স বাতিল হলেও ও গাড়ি চালাবে। তখন আরো মুশকিলের সম্ভাবনা। অতএব ব্যবস্থা যা করার বাবাই করুক, দুর্ভাবনা সিতুর নয়।

তাব এই ছোটাছুটিটা যৌবনের উদ্দীপনা কিছু নয়, সবটাই উত্তেজনা। দুটো আলাদা জিনিস। উদ্দীপনা ভিতর থেকে পুষ্টির রসদ পায়, উত্তেজনা দোসর খোঁজে। সিতুর দোসর নেই। ছেলেবেলার বন্ধুরা নাগালের মধ্যেই আছে, ফাঁক পেলে তারা কাছে আসতেই চায়। কিন্তু সিতুর ভিতরটা দূরে সরেছে। কারণ, ও থেমে নেই, বাদবাকি সকলে যেন এক জায়গাতেই থেমে আছে। দেখা হলে ভীতু অতুল তিন কথার পরেই নিজের বুকের ব্যথাটার কথা তোলে, আর অত জোরে গাড়ি চালানো উচিত নয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই উপদেশ দিতে চেষ্টা করে। চালবাজ দুলুর ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকলে আগের মতই আড্ডা জমাতে চায়। ফ্যাকটরিতে কোন্ ওপরওলার মুখের ওপব কবে কি বলল, আর ওর কোন্ কাজে সকলের তাক লাগল—ঘুরে ফিরে এই গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ তার। ক্লাসের সেই ভালো ছেলে সমর--উত্তর বলাব জন্যে যে হাত তুলে ঘোড়ার মত লাফাতো—কলেজ ছাড়ার পর তার সঙ্গেও মাঝে-মধ্যে দেখা হয়। গেলবারে এম. এ. পাস করে এখন রিসার্চ করছে। জ্ঞানের কোন্ দুরূহ সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ও, আর কত কি জানে, সেটা জানাবার জন্যে সেই ছেলেবেলার মতই উদগ্রীব। আর নেশা-গর্বী সজারুমাথা সুবীর, কলেজে পড়ার সময় বন্ধুত্ব যার সঙ্গে সব থেকে বেশি জমে উঠেছিল--সে এখন সামান্য কি একটা চাকরি করছে, নিতাইদার সঙ্গে তার ভাবটা এখন বাংলা-মদে এসে ঠেকেছে। সেদিনও সাগ্রহে চুপিচুপি সিতুকে এসে জানিয়েছিল, সিনেমায় গোপন ছবি দেখানো হয় এমন একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছে, তবে সেসব দেখতে এমনি সিনেমার অনেক গুণ বেশি টাকা লাগে...

ওরা সব সেই এক জায়গাতেই থেমে আছে, ছুটছে শুধু সিতু একা। তাই তার দোসর নেই।

গাড়ি চালাতে চালাতে সিতুও হঠাৎ থেমে যায় এক-এক সময়। কিন্তু সেটাকে ঠিক থামা বলে না। উল্টো দিক থেকে আসছে হয়ত চোখে পড়ার মত কোনো মেয়ে বা বউ। অথবা কোনো অচেনা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে তেমনি কেউ। বেগের মুখেই সিতুর গাড়িটা আচমকা থেমে যেতে পারে। যে-কারণে থামল, বেপরোয়া দুই চোখ সেদিকে ধাওয়া করবে। সেটা এত স্পষ্ট যে অপর দিক থেকে বিরক্তি অথবা বিতৃষ্ণার ঝাপটা আসবেই। তারপর নিজেই ঘাবড়ে গিয়ে বা অস্বস্তি বোধ করে তরুণী বা মহিলা পাশ কাটাবে অথবা বারান্দা থেকে সরে যাবে। এই নিয়ে ছোটখাটো এক-আধটা বিপদের সূচনাও হয়ে গেছে। আত্মস্থ হয়ে তখন আরো বেপরোয়া গাড়ি চালিয়েছে। নির্জন পথে একবার এমনি এক অবাঙালী মেয়ে ট্যাক্সির আশায় দাঁড়িয়েছিল। সিতুর গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে তার পাশেই দাঁড়িয়ে গেছল। পাশের দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল,

ট্যাক্সি এখানে চট্ করে মিলবে না, লিফট্ দিতে পারে।

ঠাণ্ডা ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়েটা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছিল। কিন্তু গাড়িটা দাঁড়িয়েই থাকল দেখে আবার ফিরে তাকাতে হয়েছে। দরজাও তেমনি খোলা। চালকের শ্যেন-চক্ষু দুটো শিকারীর চোখ। ক্রুদ্ধ মেয়েটা ঝাঁজিয়ে উঠে তাকে নিজের রাস্তা দেখতে বলেছিল। জবাবে সিতু ধীরেসুস্থে নেমে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি রাস্তায় গাড়ি নিয়ে দাঁড়াব, তুমি আমাকে যেতে বলার কে?

মুখ লাল করে মেয়েটি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল, তুমি দূর হবে কিনা আমি জানতে চাই।

সিতুর চোখে হাসি, চোয়াল শক্ত। বলার ইচ্ছে, এখনো দিনের আলো আছে, ভগবানের দয়ায় আর একটু অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত ট্যাক্সি না পেলে গাড়িতে তুলতে পারে কিনা দেখে যাওয়ার বাসনা। কিছুই বলা-কওয়ার ফুরসত মেলেনি। কলকাতায় নির্জন রাস্তা কত আর নির্জন। পাঁচ-সাতজন লোক এসেই গেল। ভরসা পেয়ে উত্তেজিত মেয়েটা তাদের কাছে অভিযোগের মর্ম স্পষ্ট করে তোলার আগেই সিতু বাধা দিয়ে উঠেছিল, ওয়েট্ ওয়েট্—গোইট টু ফার মাই ডিয়ার! তারপর উপস্থিত মানুষ-কটির দিকে ফিরে ঠোঁটে হাসি টেনে বলেছিল, ব্যাপার বুঝতেই পারছেন মশাইরা, কপাল মন্দ, বিরাগের অধ্যায় শেষ হয়নি এখনো—গুড বাই!

সকলের বিমূঢ় মুখের ওপর দিয়ে গাড়ি হাওয়া।

ঠিক এই তালেই সিতুর সাহস বেড়ে চলেছিল। পরশুরাম নাকি জগৎ নিঃক্ষত্রিয় করেছিল কতবার। ওরও বুঝি জগৎটাকে রমণী-শূন্য করার তাড়না এই ধ্বংসের রূপটা অবশ্যই ভিন্ন।

স্বেচ্ছা-দোসর একজন আছে। দুলালের দিদি নীলিদি। গাড়িতে ওঠার জন্য পা বাড়িয়েই আছে। তাকে আবার এড়িয়ে চলা দায় সিতুর। তাকে দেখলে ধ্বংসের তাপ জুড়োয়। টাকা দিয়ে অনুকম্পা দেখাতে আপত্তি নেই। গাড়িতে উঠতে চাইলেই মেজাজ বিগড়োয়। তার থেকে মাথা-উঁচু রঞ্জুদি বরং এখনো বেশি চোখ টানে তার।

সেদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

দিনটা এই ষাট সালের ষোলই জুলাই। আসামের বাঙালী নিধন যজ্ঞের প্রতিবাদে কলকাতার বাতাস গরম। হরতালের দিন। গৌহাটি শিবসাগর জোড়হাটের পাল্টা কিছু এখানেও ঘটে কিনা কলকাতার অবাঙালী মহলে সেই ত্রাস। কিছুই ঘটেনি। বিকেলের ফাঁকা রাস্তায় সিতু গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছিল। রাস্তা ফাঁকা হলেও ফুটপাত ফাঁকা ছিল না। বিকেল চারটের পরে বাস ছাড়ার কথা। সেই বাসের প্রত্যাশায় এক-এক জায়গায় পঞ্চাশ-ষাটজন করে লোক দাঁড়িয়ে। ময়দানের মিটিং-এ যাবে। পাঁচটা মেয়ে অপেক্ষা করছিল এক বাসস্টপে। স্বভাবতই সিতুর চোখ সেদিকে গেছে। তারপরেই ব্রেক কষে গাড়িটা থেমে গেছে। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জুদি।

মুখে নয়, প্রশ্ন সিতুর চোখে—আসবে?

গাড়িসহ সিতুকে দেখে রঞ্জুদি এই প্রথম খুশি বোধ হয় একটু। ঘণ্টা দুই দাঁড়িয়ে থাকলেও এমন অভদ্র ভিড় ঠেলে উঠতে পারত না হয়ত। এগিয়ে এলো। সিতু দরজা খুলে দিতে রঞ্জুদি পাশে বসল। তারপর নিজেই দরজা বন্ধ করে হাসিমুখে তার দিকে তাকালো। গাড়ি ততক্ষণে স্টার্ট নিয়ে এগিয়ে গেছে।

রঞ্জুদি বলল, খুব পেয়ে গেলাম তোমাকে, আজ আর ওঠার আশা ছিল না।

তুমি বলেছে, সিতুর কান এড়ালো না। গাড়ির বেগ বাড়ছে। এই রঞ্জুদি ডানা ধরে হিড়হিড় করে মায়ের কাছে তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, ভোলেনি। সিতু যখন বি. এসসি. পড়ে তখনো ছোট ভাইয়ের বন্ধু হিসেবে ছেলেমানুষই ভেবেছে। এখনো তাই ভাবে বোধ হয়, এই আলগা সম্মানটুকুও হয়ত গাড়ির দৌলতে। এই কারণেই পাশের রঞ্জুদিকে একটু বেশি ভালো লাগছে সিতুর, কিছু তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার বাসনা। —এই হরতালের দিনে বেরিয়েছিলে যে?

অনেক কাজ। অফিস থেকে জিপ পাঠিয়ে চুপিচুপি তুলে নিয়ে গেছে, বাইরে ফটক বন্ধ, ভিতরে কাজ চলছে, এখন আর জিপ দেবে কেন, বলে দিল, বাস চলছে, নিজেরাই যাও।

রঞ্জুদি কি চাকরি করে সিতু জানে, রেডিও পার্টস জোড়ে, প্যাকিং-এর কাজ করে। সাদামাটা প্যাকিং নয়, এর জন্যেও আগে ট্রেনিং নিতে হয়েছিল শুনেছে। মন্তব্যের সুরে সিতু হাল্‌কা প্রশ্ন ছুঁড়েছে, হরতালের দিনে মেয়েদের জীপে করে নিয়ে এসে ফটক বন্ধ করে...বেশ রসিক কোম্পানী বলো তোমাদের।

রঞ্জুদি ঈষৎ বিস্ময়ে তাকালো তার দিকে। না হেসেও পারেনি একটু।—তুমিও তো বেশ রসিক হয়ে উঠেছ দেখছি। বলার সুরটা দিদি-জনের মত।

সিতুর ঠোঁটে পুরুষের হাসি দাগ কেটে বসেছে। কথা বেশি বলছে না। নীরবতা লক্ষ্য করুক, তাই চায়। কিন্তু রঞ্জুদির লক্ষ্য সামনের দিকেই। অতএব গম্ভীর মুখে দ্বিতীয় দফা রসিকতার নজির দেখানোর তাড়না সিতুর—অতুল বলছিল, দু-দুবার তোমার বিয়ে হব-হব করেও হল না...সেই রাগে এখন প্যাকিং বাক্সের কাজেই জীবন বিসর্জন দেবে ঠিক করলে?

রঞ্জুদির মুখখানা আবারও তার দিকে ফিরেছে। তেমন ফর্সা নয়, তবু মুখে চাপা লালের আভাস লক্ষ্য করেছে সিতু। একটু থেমে সংযত কিন্তু পাল্টা পরিহাসের সুরে রঞ্জুদি বলল, তুমি তো মস্ত ঘরের ছেলে, জীবন বিসর্জন দেবার মত আরো বড় কিছু তোমার হাতে আছে?

স্টিয়ারিং-এ চোখ রেখে সিতু জবাব দিল, থাকলেও আমার হাতে পড়তে কি তুমি রাজী হবে...।

রঞ্জুদির এবারের মুখ দেখার মত। সিতু আড়ে আড়ে দেখছে। পুরুষের পাশে বসে আছে টের পেতে শুরু করেছে মনে হয়। গাড়ির বেগ আরো বেড়েছে।

রঞ্জুদির হঠাৎ খেয়াল হল গাড়ি চেনা রাস্তা ধরে চলছে না। মাঠ ঘেঁষা ফাঁকা রাস্তা একটা। আর যাই হোক, বাড়ির পথ নয় এটা। সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এ কোন্‌দিকে যাচ্ছি?

সিতু জবাব দিল, আমি দিক-কানা, ফাঁকা রাস্তা পেলাম চালিয়ে দিলাম।

রঞ্জুদির মুখে দ্বিধার ছায়া নেমেছে, বলল, তুমি আর কোথাও যাবে জানতুম না, আমার এখনই বাড়ি ফেরা দরকার।

কেন, খিদে পেয়েছে?

না।

সামনে চোখ, সিতুর নির্লিপ্ত মুখ। কিন্তু ভিতরটা নির্লিপ্ত নয়, হেসে উঠে এ

বৈচিত্র্য পণ্ড করার ইচ্ছে নেই। জিজ্ঞাসা করল, বাসে গেলে দু ঘন্টার আগে বাড়ি ফেরা হত না বোধ হয়, তারও আগে ফেরা দরকার?

রঞ্জুদির মুখে জবাব যোগালো না। তার চোখেমুখে চাপা বিস্ময়, চাপা অস্বস্তি। এ-দিকের রাস্তা দেখার অছিলায় বারকয়েক তাকিয়েছে তার দিকে। সামনের রাস্তা আরো নির্জন, গাড়ির ভয়াল গতি। কিন্তু সিতু এটুকুতেও পরিতুষ্ট নয়। এক হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে অন্য হাত বুক-পকেটে ঢোকালো। সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করে নিজের কোলের উপর রাখল। এক হাতেই প্যাকেট খুলে ঠোঁটের ডগায় সিগারেট ঝোলালো একটা। এই গতির মুখে এক হাতে লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরানো সম্ভব নয় যেন। লাইটারটা কোল থেকে তোলার অবকাশ পেল না, দু হাতে স্টিয়ারিং ধরার দরকার হল।

ওটা জ্বালো তো!

রঞ্জুদি থমকে ফিরে তাকিয়েছে আবার। কোলের ওপর লাইটারটা দেখেছে। হাতে করে ওটা তুলেও নিতে হল। বার চারেক চেষ্টার পরে জ্বালাতে পারল। সিতু হেসে উঠে বলল, এই তো হয়েছে, এই এক জিনিস মেয়েদের শেখাতে হয় না।

মুখ বাড়ানোর আগেই আগুনটা নিবে গেল। অগত্যা বার দুই জোরে বোতাম টেনে লাইটারটা আবার জ্বেলে দুহাতে বাতাস আড়াল করতে হল। আর সিগাবেটের মুখে এগিয়ে দেবার জন্য পাশের দিকে না ঝুঁকেও উপায় নেই। অঘটন না ঘটিয়ে চট করে সিগারেটটা ধরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে সিতু তাড়াতাড়ি বেশি ঝোঁকার ফলে রঞ্জুদির কাঁধে কাঁধ ঠেকল। হাতে থুতনি ঠেকল। আর সিগারেট ধরাবার ওইটুকু ফাঁকে তার চোখে চোখ রাখল একবার। রঞ্জুদির দু চোখ আট-দশ আঙুলের মধ্যে।

যাক বোঝানোর পর্ব ভালো মতই শেষ হয়েছে। রঞ্জুদির হাত থেকে লাইটার ফেরত নিয়ে পকেটে পুরেছে। হাতের স্পর্শের, কাঁধের স্পর্শের, থুতনির স্পর্শের আর সব শেষে অব্যর্থ নিবিড় চাউনির স্পর্শেই প্রতিক্রিয়া দেখার লোভে ঘুরে বসে তাকাতে ইচ্ছে করেছে সিতুর। স্থির গাম্ভীর্যে শক্ত হয়ে আছে রঞ্জুদি। কিন্তু সিতু এখন যে কোনো বাজী রেখে বলতে পারে, চাক বা না চাক, পুরুষের পাশে বসে আছে ছাড়া আর কিছু এখন ভাবতে পারছে না। ইচ্ছে করলে সিতু রঞ্জুদির মুখের এই গাম্ভীর্যও রসাতলে পাঠাতে পারে, ভয়ের কাঁপুনি ধরিয়ে দিতে পারে। লোভ একটু-আধটু না হচ্ছিল তা নয়। কিন্তু থাক, অনেক হয়েছে। এইটুকুই মনে থাকবে বোধ হয়। গাম্ভীর্যের আড়ালে ভিতরের অস্বস্তি আর হতভম্ব বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারলেই ফিরতে বলবে জানা কথা। অতএব এবারও পুরুষোচিত কাজ করল সিতু। সামনে বাঁকের মুখে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল।

পঁচিশ মিনিটের মধ্যে বাড়ির সামনের গলি। গাড়িটা থামতে রঞ্জুদি আত্মস্থ। ঘড়ি দেখে সিতু বলল, বাসের থেকে কিছু আগেই ফিরেছ। আর প্রাণ নিয়েই ফিরেছ। তার গা ঘেঁষে হাত বাড়িয়ে দরজাটা খুলে দিল।

রঞ্জুদি নামতে সশব্দে দরজা টেনে দিল। হাসছে অল্প অল্প। রঞ্জুদিও তাকিয়েছে তার দিকে। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করেনি সিতু, গাড়িটা বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে শেষবারের মতই ঘাড় ফেরালো। এই রকমই আশা করেছিল, শুধু পুরুষ নয়, অবিশ্বাস্য এক পুরুষ-দেখা চাউনি রঞ্জুদির।

কিন্তু এ খেলার আর এক যাতনা আছেই। বাসনার স্ফুলিঙ্গ নিভিয়ে এ খেলায় নামা যায় না। খেলা দুদণ্ডে ঘোচে। বাসনার তপ্ত কণাগুলো তখন শিরায় শিরায় নেচে বেড়াতে থাকে। দশ বছর বয়সে যে মানসিকতা কৈশোরের বেড়ার ওধারে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছিল, তেইশে এসে সেটা নতুন যৌবনের গণ্ডীর মধ্যে বসে নেই।

...সঙ্কল্পটা মুহূর্তের মধ্যে মগজে ঘা দিয়ে গেল। এই রকমই হয়, প্রস্তুতির অবকাশ থাকে না। নিজের সঙ্গে বোঝার ফুরসত মেলে না।

গাড়ি বাড়ির দোরে থামি-থামি করেও এগিয়ে গেল খানিকটা, তারপর বাড়ি পিছনে ফেলে ছুটেই চলল আবার। একবার খালি মনে হয়েছে, কাজটা ঠিক হল না, ছোট দাদু বাড়িতে আছে, না খেয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে! ফেরা উচিত। কিন্তু অবাধ্য আবেগে ছুটে চলল যে সে আর একজন। তার আচরণে উচিত অনুচিত বলে কিছু নেই।

চলেছে হেলেন জোন্সের কাছে। স্টুয়ারডেস হেলেন জোন্স।

যৌবন-বাস্তবের প্রথম রমণী। মাত্র মাস কয়েকের অন্তরঙ্গতা তার সঙ্গে। সেটা যে-কোনদিন শেষ হতে পারে হেলেন জোন্সও জানে। হেসে বলে, তোমার মত পাগলা ঘোড়াকে টিট করার চাবুক হাতে পেতে ইচ্ছে করে।

হেলেন জোন্স চাবুক চালাতে জানে না। তার চাবুক চালাবার সম্বলও অনেকটাই নিষ্প্রভ। চাবুক চালানোর ছটা আছে, সম্বল আছে, এমন আরো দু-চারটে মেয়ের সন্ধান জানা আছে তার। তবু প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়নায় সিতু এখানেই ছুটে আসে। হেলেন জোন্স-এর কাছে। হেলেন জোন্স শক্ত মেয়ে নয়। শক্ত মেয়ের অভিনয়ও করতে পারে না। বলে, গেট আউট ইউ উইল কীল মি সাম ডে—

বলে বটে, আবার দু হাতে ওর ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে জোরে জোরে ঝাঁকায় আর হাসে।

সাহেবপাড়ায় থাকে। সিতুব গাড়ি সেই পথে ছুটেছে।

এই ছোটার মুখে যে মেয়ে-বউকে দেখে তার গাড়ি থেমে যায় লিফট্ দেবার জন্যে, যে মেয়েকে জোর করেই গাড়িতে তুলে নিতে চায়, বা রঞ্জুদির মত যে মেয়েকে পাশে বসিয়ে অশান্ত স্নায়ুর খেলায় মেতে ওঠে—দোসর তারা কেউ নয়। হেলেন জোন্সও নয়।

এরা উপলক্ষ্য। লক্ষ্য শুধু একজন। দোসর শুধু একজন। দু'ঘরের ফ্ল্যাট বাড়ির মেয়ে শমী বোস। আর কেউ না।

মাথার ভিতরে অবিরাম যে আগুন জ্বলে সেটা ছারখারের আগুন। নিজে পুড়বে। শমী বোস পুড়বে। সেই সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে আর একজন। ওই একজন। যে এখন মিসেস দত্ত। অব্যর্থ থাবা বাড়িয়ে তার বুক থেকে শমী বোসকে সে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে একদিন। যাবেই। কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

পাঁচ বছর আগের ময়দানের স্মৃতি ভোলেনি। সেই তাপ ভোলেনি। সেই ব্যর্থতার খেদ ভোলেনি। তবু ভালই হয়েছিল। শমী পালাতে পেরেছিল, ভালই হয়েছিল। তখনো সময় হয়নি। তৃষ্ণার এই পরিণত স্বাদ তখনো জানা ছিল না। গ্রাসের ক্রূর থাবা দুটোর ওপর এই আস্থাও ছিল না। লগ্ন আবারও আসবেই। শেষ লগ্ন। নিঃশেষের লগ্ন।

গত পাঁচ বছরের মধ্যে সিতু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। দোসর বদলাবার মত কোনো প্রলোভন মনের কোণে ঠাঁই পায়নি। সে শুধু প্রতীক্ষা করছে। একটি মাত্র শিকারের প্রতীক্ষা। ব্যাধের অব্যর্থ অমোঘ প্রতীক্ষা। গাড়ি হাঁকিয়ে আগে-ভাগে কখনো ওর কলেজ-গেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। কখনো বা বাসস্টপের সামনে। শমী চিনতে চায় না। দেখতে চায় না। গোড়ায় গোড়ায় ত্রস্ত হয়ে উঠত। চমকে কলেজে ঢুকে পড়ার জন্য ব্যস্ত হত। যে কোনো বাসে উঠে পড়তে চেষ্টা করত। এখন আর তা করে না। উপেক্ষার চাবুক দেখিয়ে চলে যায়। কখনো বা ঘাড় ফিরিয়ে ঠাণ্ডা দু চোখ তার মুখের উপর বুলিয়ে নেবার স্পর্ধা দেখায়।

সিতু হাসে মিটিমিটি। চাবুক চালানোর ছটা দেখে, সম্বল দেখে। ছটা বাড়ছে। সম্বল বাড়ছে। শমীর বয়েস কুড়ি এখন, হিসেবে ভুল হবার নয়। সেই মোটাসোটা আদুরে মেয়েটা কুড়ির মন্ত্রে লাবণ্যের এই আঁটসাট নিটোল ছাঁদে এসে স্থির হবে —সিতু কল্পনা করেনি। অথচ ছাঁদ-বদলের এই কারুকার্য বলতে গেলে তার চোখের ওপর দিয়ে ঘটে গেছে। ময়দানের সেই ব্যাপারের পর কটা বছর সিতু নিজে ওর লক্ষ্যের আড়ালে থাকতে চেষ্টা করেছে। তারপর আর পেরে ওঠেনি। পারার দরকারও বোধ করেনি। তাকে দেখে, তার দিকে চেয়ে শমী সেই শেষের আর নিঃশেষের অব্যর্থ ঘোষণা যদি দেখতে পায়—পাক। সেই দিন এগিয়ে আসছে। যখনই দেখে, প্রতীক্ষা অসহ্য হয়ে ওঠে। রক্তে আগুন লাগে। তবু যাক কটা দিন। অনেক—অনেক দিন তো গেছে। আরো কটা দিন যাক। সামনেই ওর বি-এ পরীক্ষা। সেইজন্যেই এখন আর বাস-স্টপে বা কলেজের গেটে দেখতে পায় না। পরীক্ষাটা হয়ে যাক। আরো ছটা বাড়বে, আরো সম্বল বাড়বে। কল্পনায় এই শমীর থেকেও অনার্স গ্র্যাজুয়েট শমীর মুখ লোভনীয় ঠেকেছে। তাড়া নেই। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসার মত সেই ময়দানের বয়েসও নেই আর। এবারের থাবা আর ঢিলে হবে না। কিভাবে কেমন করে অব্যর্থ গ্রাসের মধ্যে তাকে টেনে আনবে তা নিয়ে এখনো মাথা ঘামায়নি। সময় হোক, একভাবে না একভাবে আনবেই। এ বিধানের নড়চড় নেই। ওই ফ্ল্যাটের আর একজনের বুকের ভিতরটা একখানা আস্ত মরুভূমি করে না দিতে পারলে ওর নামে যেন ঘরে ঘরে কুকুর পোষে সকলে।...ওই একজনকে শমী এখনো মাসী ডাকে শুনেছিল। সাত বছর বয়েস থেকে মাসীর আদর খাচ্ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সেই পুষ্টিই বুঝি দেহের নানা ভাঁজে নানা ধাঁচে উপচে উঠেছে, জমাট বেঁধেছে। এরই ঠমকে সিতুর প্রতি ওর এখন এত উপেক্ষা এত অবজ্ঞা।

স্নায়ুতে আগুন ধরানোর এই আক্রোশ যে তেইশ বছরের কোন পরিণত বা সুস্থ চিন্তার ফল নয়, সেটা মনে আসে না। বয়েসটা তখন নিজের অজ্ঞাতে সেই দশ বা আঠারোর আশপাশ দিয়ে ছুটতে থাকে। নাবালক বালক, আর এই তেইশের সিতুর কিছু একটা করে বসার ঝোঁক তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মাস দুই আগে এমনি এক কাণ্ড করে বসেছিল। তার আগের বিকেলে শমীকে বড় বেশি ভাল লেগেছিল। বই বুকে করে বিকেলে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েই ছিল। পরনে হাল্কা গোলাপী পাতলা শাড়ি, গায়ে সিল্কের সাদা ব্লাউজ। তেল না পড়ার দরুন একপাশের কোঁকড়া চুলের গোছা বিন্যাসের বাধা ঠেলে দুলছে অল্প অল্প। দেহতটের চেনা রেখাগুলো সিতুর চোখ দুটোকে বড় বেশি টানছিল, বড় বেশি অবাধ্য করে তুলছিল। সেই একদিন শেষ পর্যন্ত

গাড়ি থেকে নেমে না এসে পারেনি। নিঃশব্দে একটা ঠাণ্ডা অপমানের ঝাপ্টা মেরে শমী মুখ ফিরিয়ে না নিলে হয়ত একটু উদার হতেও পারত। নিরিবিলিতে পেলে ঠাট্টার সুরে হয়তো জিজ্ঞাসা করত, দশ বছর আগে ওর বউ হবার প্রস্তাবটা এখন একেবারে বাতিল কিনা।

পাশে দাঁড়িয়ে গলা খাটো করে সিতু বলেছিল, এদিকে আসবে একটু কথা ছিল।

গাড়িতে আসার কথা বলেনি, আসবে না জানা কথাই। ওকে কাছে আসতে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, আর মুখ ফেরায়নি। আসা বা কথা শোনা দূরে থাক, ওকে চেনেও না। ফলে আশপাশের দু-চারজন লোক সকৌতুকে ঘাড় ফিরিয়ে সিতুকে দেখেছে। রমণীর ধীর গম্ভীর রূঢ় প্রত্যাখ্যানের আঁচ পেয়েছে তারা।

সিতু ফিরে এসেছে, তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেছে। স্নায়ুর পুঞ্জীভূত বারুদে তাপ লেগেছে। পরদিনই সেই কাণ্ড। বিকেলে ঘড়ি ধরে হেলেন জোন্স-এর কাছে হাজির। এখনি বেরুতে হবে, জাস্ট নাউ!

মোটরে হাওয়া খাওয়ার নামে হেলেন জোন্স লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু এ তাড়াটা ঠিক হাওয়া খাওয়ানোর তাড়ার মত লাগেনি। জিজ্ঞেসা করেছে, কোথায় যাওয়া হবে?

বাহু ধরে টেনে গাড়িতে তুলেছে তাকে। তারপর সেই বাসস্টপ। রাস্তার উল্টো ধারে শমীর ঠিক মুখ বরাবর ঘ্যাঁচ করে গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে। ওকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল যেন। আর ঠিক সেখানেই সিগারেট ধরানোর দরকার হল। ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে হেলেন জোন্সকে বলল ধরিয়ে দিতে। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দ্রষ্টব্যের দিকে চোখ ফেরালো। ঠিক যেমনটি আশা করেছিল তাই হয়েছে। শমীব দু চোখ ধাক্কা খেয়েছে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। বাস এসে ভাল করে দাঁড়ানোর আগেই উঠে পড়েছে।

বরাত ভাল সিতুর, মজা দেখা আর দেখানোর আক্রোশ তার পরেও মিটেছে খানিকক্ষণ ধরে। বাসের এদিকের জানলার ধারের লেডিস সীট-এ বসেছিল শমী। সিতুর গাড়ি ওই বাসের পাশ ঘেঁষে সঙ্গ নিয়েছে। এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে ছিল, বাঁ হাতটা তখন হেলেন জোন্স-এর কাঁধ বেষ্টন করে আছে। বাসের একজন ছাড়া আর কে দেখছে না দেখছে ভ্রূক্ষেপ নেই। উৎকট আনন্দে যে-রকম পাশ ঘেঁষে গাড়ি চালাচ্ছিল, লেগেও যেতে পারত। শমীর চোখে-মুখে ঘৃণা উপচে উঠতে দেখেছিল সিতু।

শমী বাস থেকে নামার পরেও কম করে বিশ গজ পর্যন্ত গাড়িটা ওর গা ঘেঁষে চলেছে। ফুটপাতের ও-মাথায় চলে যেতে হাসতে হাসতে বড় একটা শিস দিয়ে উঠে গাড়ির মুখ ঘুরিয়েছে।

কিন্তু এতক্ষণ ধরে পাশের একজন যে বেশ নিবিষ্ট আগ্রহে তাকে লক্ষ্য করছিল খেয়াল করেনি। গাড়ি অনির্দিষ্ট খোলা রাস্তা ধরতে হেলেন জোন্স বেশ আঁট-গম্ভীর সুরে প্রশ্ন ছুঁড়েছে, হু ইজ দ্যাট গার্ল?

সিতু মেজাজে ছিল, আলাপটা হাসাহাসির দিকে গড়িয়েছিল। আর হেলেন জোন্স মন্তব্য করেছিল, আই থিঙ্ক শি ইজ দি গার্ল ফর ইউ, দরকার হলে তোমার গালে চড় বসিয়ে দিতে পারে, ইউ রিকোয়ার দ্যাট স্ল্যাপিং ডোজ—

হেলেন জোন্স-এর সংস্রবে সিতুকে টেনে এনেছিল হালফিলের এক সিন্ধী সহচর। সিতুর আড্ডার বৃত্ত বদল হয়েছে অনেকদিন। অভিজাত আসনে বসে রেস খেলে, উঁচু মহলের তিন তাসের আসরে বসে, চটকদার সান্ধ্য ক্লাবেও হানা দেয়। টাকা খরচ

করতে পারলে সর্বত্র কদর। অতএব রাতের কলকাতার খবর রাখে এমন সহচরও জুটবে দুই-একজন এ আর বেশী কথা কি। সিন্ধী বন্ধু তাকে বলেছিল—শি ইজ নট চার্মিং, বাট শি ইজ সুইট—

আর ওকে টেনে এনে হেলেন জোন্সকে বলেছিল, হি ইজ এ গুড ফ্রেণ্ড, হ্যাজ মানি অ্যাণ্ড এ নাইস কার ট্যু।

হেলেন জোন্স হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তাকে। তারপর হেসেই জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমার আবার টাকা আর গাড়িঅলা গুড ফ্রেণ্ড জুটিয়ে দিয়ে সরে পড়তে কতদিন সময় লাগবে?

হেলেন জোন্স-এর দিকে চেয়ে প্রথম দিনই কি দেখেছিল সিতু, ঠিক ঠাওর করতে পারেনি। সুন্দরী নয়, সিন্ধী সহচরের মন্তব্য অনুযায়ী তেমন সুইটও নয়। তবু কিছু একটা ছিল যা সিতুকে আটকে রাখতে পেরেছে। পরে বুঝেছে কি। কথাবার্তার সরলতা আর হাসির আড়ালে এক ধরনের বিষণ্ণ কমনীয়তা। কথা শুনলে বা হাসি দেখলে লোভের ওপর মায়ার প্রলেপ পড়তে চায়। এ-পথে এই মেয়ের ভাগ্য তেমন প্রসন্ন হবার কথা নয়।

ভিতরের অশান্ত তাড়নায় এক-একদিন বিকেলের অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছে সিতু। দুটো নীল চোখ দূরের নীলের দিকে ছড়িয়ে জানলার পাশে পুরানো ময়লা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসে থাকতে দেখেছে তাকে। ও যেন কোন্ দূরের তন্ময়তায় বিভোর। দূবের তৃষ্ণায়ও। এর থেকে ওকে ছিনিয়ে আনতে সময় লাগে, এক-একদিন বিরক্তিও ধরে। তখন আবার মেয়েটার খুশি করার তৎপরতা দেখে হেসেও ফেলে।

হেলেন জোন্স বিলিতী মেয়ে। সমুদ্র পেরিয়ে এদেশে এসেছে বছর তিনেক আগে। সিতুর সমবয়সী হবে। বাংলা বা হিন্দী বোঝে না, বলতেও পারে না। বাঁধা বুলি যা দু-একটা বলতে চেষ্টা করে, তাও হাসির ব্যাপার হয়। এদেশের কোন কিছুতে রপ্ত হওয়ার আগ্রহ নেই। একটু অন্তরঙ্গ হতেই বোঝা গেছে দেশে ফেরার ফিকিরে আছে। টাকা অনেক লাগে। সিতুর মনে হয় সেই জন্যেই টাকার অত খাঁই। থাকে সাদামাঠা ভাবে। টাকা জমায় বোধ হয়। ইংলণ্ডের গাঁয়ের দিকে থাকত। সেখানকার প্রসঙ্গ উঠলে আর কথা নেই, উচ্ছ্বাসে চোখমুখ অন্য রকম হয়ে যায়। সমুদ্র সাঁতরে ও বুঝি একেবারে দেশে গিয়েই হাজির হয় তখন। গাঁ ছেড়ে ইংলণ্ডের শহরে এসেছিল চাকরির খোঁজে। চাকরি না পেয়ে হতাশ হয়েছিল। শেষে এদেশের এক ভদ্রলোকেব সঙ্গে যোগাযোগ। ভদ্রলোক সপরিবারে ইংলণ্ডে থাকত। দুটো ছেলে-মেয়ে আর রুগ্ণা স্ত্রী। সেখানে মোটামুটি ভাল মাইনের স্টুয়ারডেসের চাকবি পেয়েছিল। দেশে ফেরার সময় ভদ্রলোক আগ্রহ করে তাকে সঙ্গে করে এদেশে নিয়ে এলো। আগ্রহ তার স্ত্রীরও ছিল। ছেলে-দুটোও ওকে ভালবাসত। মা বার বার নিষেধ করেছিল, ও শোনেনি। তখন নতুন দেশে আসার ভূত মাথায় চেপেছিল। তার ওপর চাকরির মায়া, আরো অনেক বেশী মাইনের মায়া। সেই সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াবার তাগিদ। মায়ের নিষেধে কান দেয়নি।

বোম্বাইয়ে পা দিতে না দিতে চাকরিটা গেল। ভদ্রলোকের বউ ওকে জবাব দিয়ে দিলে। বউটার দোষ নেই। হেলেনকে জাহাজে তোলার পর থেকেই ভদ্রলোকের মতি-গতি বদলাতে থাকল। আত্মরক্ষার দায়ে তখন ওকে পালিয়ে বেড়াতে হত। চাকরিটা

যেতে লোকটার সুবিধেই হল। এক নামকরা হোটেলে এনে তুলল ওকে। আশ্বাস দিল, সে-ই তাকে দেখবে আর স্টুয়ারডেসের থেকে অনেক ভাল হালে রাখবে।

কিন্তু ও-রকম ভাল হালে থাকার ইচ্ছে তখন হেলেন জোন্স-এর ছিল না। সেই রাতেই ম্যানেজারের সঙ্গে ভাব করে আর এক জায়গায় স্টুয়ারডেসের চাকরির সন্ধান পেল। বোম্বাইয়ে আরো দুটো বাড়িতে স্টুয়ারডেসের চাকরি করেছিল। কিন্তু টিকতে পারেনি। এদেশের ভদ্রলোকেরা স্টুয়ারডেসকে মিসট্রেস ভাবে। ওদেশেও এ-রকম লোক নেই তা নয়। কিন্তু স্টুয়ারডেসেরও স্বাধীনতা আছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে এভাবে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহস করে না। বোম্বাইয়ে তারপর এক গোয়ান দস্যির পাল্লায় পড়েছিল হেলেন জোন্স। প্রাণটা যেতে বসেছিল। বম্বে থেকে তার চোখে ধুলো দিয়ে একদিন কলকাতায় পালিয়েছিল। শুনেছিল, ক্যালকাটা গ্রেট সিটি। ভেবেছিল এখানে আসতে পারলে একটা হিল্লে হবে।

হেসে-হেসেই বলেছিল হেলেন জোন্স, এখন দেখছ তো কেমন হিল্লে হয়েছে?

সিতু অবাক হয়ে শুনেছে। হাসিটা ঠিক হাসির মত লাগেনি। এ ভাবটা অবশ্য বেশীক্ষণ থাকেনি। ভদ্র সংস্থান খুঁজলে কি আর পেত না? সহজ রাস্তাই বেছে নিয়েছে।

তবু সময় সময় ওর থেকেও ওর কথাবার্তাগুলো বেশ ভাল লাগে সিতুর। একদিন ওকে বলেছিল, তুমি এ-রকম বুনো কেন?

সিতু রসিকতা করে জবাব দিয়েছিল, মেয়েরা বুনো পুরুষ পছন্দ করে।

ননসেন্স, দ্যাট গোয়ান বাফেলো অলমোস্ট টুক মাই লাইফ। তারপরেই কি ভেবে জিজ্ঞাসা করেছে, তোমাদের তো নামের মানে থাকে, হোয়াট ডু ইউ মীন বাই সাটকি?

মানে নেই। আমাদের ক্ল্যাসিকের একটা লোকের নাম, এ রেচেড ফেলো।

হেলেন অবাক, তাহলে তোমার এ-রকম নাম কেন, আর ইউ রেচেড?

তা না হলে তোমাদের এই স্বর্গে এসে হাজির হব কেন?

হেলেনের মুখ মলিন হয়েছিল, হতভাগা ভিন্ন কেউ এ-পথ মাড়ায় না এ যেন অস্বীকার করতে পারেনি। খানিক চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ কি ভেবে আবার বলে বসেছে, আই লাইক ইউ, আই ডোণ্ট নো হোয়াই।...তোমার মা আছে?

ওকে চমকে দেবার মত করেই ঝাঁজিয়ে উঠেছিল সিতু, নো—নেই! হঠাৎ মায়ের খোঁজ কেন?

রাগের কারণ না বুঝে হেলেন বিমূঢ় মুখে চেয়েছিল খানিক। তারপর বলেছে, এই জন্যেই তুমি এ-রকম।...আমার মাকে বড় মনে পড়ে, মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করে।

এই ছেলেটার সঙ্গে মনের কথা বলতে পারে বলেই তাকে পছন্দ। এখানে কেউ মনের কথা বলতে বা মনের কথা শুনতে আসে না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। দু চোখ ঘোরালো করে সাটকি চ্যাটার্জি লক্ষ্য করছে তাকে খেয়াল করেনি।

মায়ের কথার পরেই এ তন্ময়তা দেখে সিতুর মেজাজ বিগড়েছে। ও যেন হিংস্র হয়ে উঠেছিল, ওই তন্ময়তা থেকে ওকে ছিঁড়ে আনার আক্রোশে হ্যাঁচকা টানে কাছে টেনে এনেছে, রূঢ় নিষ্পেষণে ওকে সজাগ করে দিতে চেয়েছে।

উঃ!

পাঁজরের দিকটা চেপে ককিয়ে উঠেছিল হেলেন জোন্স। ব্যথাটা সামলে নেবার চেষ্টায় কয়েক নিমেষের জন্য সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছল।

সিতু অপ্রস্তুত। কি হল?

ইউ আর এ রাস্‌কেল। হেসে সামলে নিয়েছে ততক্ষণে, বলেছে, ও কিছু নয়, একটা পুরোনো ব্যথা, বড় জ্বালাচ্ছে। হঠাৎ লেগে গেছে—

কি রকম যে জ্বালাচ্ছে সিতু একটু আগেই দেখেছে।—পাঁজরের ব্যথা ভাল কথা নয়, চিকিৎসা করাও না কেন?

সে-রকম চিকিৎসা করাতে একগাদা টাকা খরচ, একসঙ্গে অত টাকা পেলে তো বম্বে গিয়ে জাহাজের টিকিট কেটে বসতাম। এক বড় ডাক্তারের কাছে গেছলাম, সে তার নার্সিং হোমে রেখে চিকিৎসা করাতে আটশ টাকা চাইলে।

সিতুর হঠাৎ কি ঝোঁক চেপেছিল মাথায়। চিকিৎসার থেকেও সত্যিই দেশে যাওয়াটা বড় কিনা যাচাইয়ের ইচ্ছে। অত টাকার খাঁই কেন তাও বুঝে নেবার চেষ্টা। মাত্র আটশ টাকা জুটিয়ে দেশে যেতে পারছে না বিশ্বাস হয় না। বলেছিল, আটশ টাকা দিতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।

হেলেন জোন্স-এর মুখে আশার আলো।—কি? কি শর্ত?

নার্সিংহোমে থেকে খুব মন দিয়ে চিকিৎসা করাবে।

আশার আলো নেভেনি তখনো, বলেছে, কেন, অত টাকা পেলে অনায়াসে দেশে গিয়েও তো চিকিৎসা করাতে পারি?

তুমি দেশে চলে গেলে আমি অত টাকা দিতে যাব কেন?

অবাস্তব আশাই যেন করেছিল কিছু হেলেন জোন্স। মায়া হবার মতই মুখ। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলেছে, তাও তো বটে।

অবাক লেগেছিল সিতুর, অস্বস্তিও বোধ করেছিল। প্রত্যাশা যেন একেবারেই ফুরিয়েছে। টাকার প্রসঙ্গ আর তোলেনি। চিকিৎসা করবে বলেও টাকার লোভে হাত বাড়ায়নি। আটশ টাকার বিনিময়ে কেউ ওকে আটকে রাখবে, তাও চায় না যেন। এমন কি চিকিৎসাই করবে বলে টাকা চেয়ে বসতে পারত, তারপর টাকা হাতে এলে যা খুশি করতে পারত। কিন্তু সিতু লক্ষ্য করেছে, সে-চিন্তার দিকেও যায়নি মেয়েটা।

চিকিৎসাই যে আগে দরকার, এর পর সিতুর সেটা অনেকদিনই মনে হয়েছে। পাঁজরের পুরনো ব্যথা বেড়েই চলেছে। দিনকে-দিন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, গালের হাড় উঁচিয়ে উঠছে। ঠিক মত খাওয়া-দাওয়া করে কিনা সন্দেহ। টাকা সিতুই মন্দ দেয় না তাকে। আর কোন আগন্তুক বরদাস্ত করতে রাজী নয় বলেই বেশী দেয়। কিন্তু এ মেয়ে সেটা খরচ করে, না আধপেটা খায়, তার থেকে দেশে যাবার রসদ জমায়, কে জানে। কিছু বললে বিমনা জবাব দেয়, চেষ্টা করছে ভাল থাকতে, কিন্তু এখানকার ক্লাইমেটটাই সুট করছে না তার।

পরক্ষণে খেয়াল হয়েছে বোধ হয়, যে সম্বলের ওপর নির্ভর, সেই দেহ পুরুষের চোখে এ-রকম অসুস্থ ঠেকলে বিপদ। হেসে দু হাত বাড়িয়ে চুলের মুঠি ধরে ওর মাথা বুকের কাছে টেনে এনেছে। বেশী খুশির কারণ ঘটলে এই করে।—সব ঠিক আছে, তোমাকে অত মাথা ঘামাতে হবে না।

রঞ্জুদিকে নামিয়ে দিয়ে এতটা পথ আসতে আসতে মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছিল। তাই হয় আজকাল। বিস্মৃতির তিমিরে টানার জাদু জানে না হেলেন জোন্স। বিপুল

সম্ভোগের আমন্ত্রণ কিছু নেই তার মধ্যে। সেই কারণে সিতুর আসাটাও কিছু কমেছে। তবু যখন আসে, ভালো লাগে। কথা বলতে ভালো লাগে, ওর কথা শুনতেও ভালো লাগে, এলে তাপ জুড়োয়।

হেলেন জোন্স-এর ঘর তালাবন্ধ দেখামাত্র মেজাজ চড়ল। ও আসুক না আসুক, এরকম হবার কথা নয়। গত কটা মাসের মধ্যে এরকম হয়নি। ঘর তালাবন্ধ দেখেই ধরে নিল নতুন কোনো লোভের হদিস পেয়েছে। শরীরের ওই হাল, তবু লোভের শেষ নেই। ওর চোখে ধুলো দিয়ে তলায় তলায় বাড়তি খদ্দের জুটিয়ে জাহাজভাড়া তোলার চেষ্টায় আছে বলেই শরীরের এই হাল কিনা কে জানে! যাওয়াচ্ছে ওকে দেশে! সম্পর্ক ছেঁটে দেবার সঙ্কল্প নিয়েই গাড়ি ছোটালো আবার।

বাড়ি ফিরে চলেছে। বেইমানী যদি করে থাকে তার সাজাও হেলেন জোন্স পাবে। তবু মনে হল, দেখা না হয়ে ভালই হয়েছে। ফিরতে রাত হত। ছোট দাদু অপেক্ষা করে বসে থাকত। এত রাত হল কেন, জিজ্ঞাসা করত। এই একজনের কাছেই সিতু মাঝে মাঝে মুশকিলে পড়ে যায়।

বাড়ি ফিরে জেঠুর ঘরে উঁকি দিল একবার। সেখানে ছোট দাদু একা বসে। তাঁকে একটু বেশি গম্ভীর আর চিন্তাচ্ছন্ন মনে হল। সিতুকে দেখেও লক্ষ্য করল না যেন। বারান্দায় মুখোমুখি বাবার সঙ্গে দেখা। তারও চোখমুখ অন্যরকম। পাশ কাটিয়ে পায়ে পায়ে জেঠুর ঘরের দিকে এগোতে দেখল বাবাকে। নিজের ঘরের দোরে এসে সিতু ফিরে তাকালো। জেঠুর ঘর পর্যন্ত না গিয়ে কি ভাবতে ভাবতে বাবা আবার নিজের ঘরের দিকেই ফিরছে।

ঘটেছে কিছু। কিছু ঘটলে সিতু গন্ধ পায়। গন্ধ পেল।

ঘরের মধ্যে মেঘনা তার শয্যাবিন্যাস করছে। এই বাড়িতে সিতু একজন প্রবল পুরুষ এখন। তাকে সামনে দেখলে ভোলা শামু তটস্থ হয়ে ওঠে। হুকুম শেষ করার আগেই তা পালন করতে ছোটে। ব্যতিক্রম শুধু মেঘনা। ছোট মনিবকে ভয় সেও বিলক্ষণ করে। কিন্তু বাইরের আচরণে সেটা প্রকাশ করতে আপত্তি। কথার পিঠে গজগজ করে কথা বলে ওঠে, চলে যাবে বলে শাসায়। আরক্ত চোখে সিতু ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালে ভয়ে ভয়ে দু-পাঁচ হাত সরে দাঁড়ায় বটে, সঙ্গে সঙ্গে রসনার জোর বাড়িয়ে ভয়টা ঢাকতেও চেষ্টা করে। দিনকয়েক আগেও গোল গোল দু চোখে রাগ ছড়িয়ে ও বলে উঠেছিল, শিগগীরই তোমার মায়া যাতে ছাড়তে পারি সেজন্যে কালই কালীঘাটে গিয়ে মা-কালীর কাছে মানত করে আসব—বুঝলে?

পরদিন সিতুই ওকে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে তাড়াবে বলে শাসিয়েছিল—তার জবাবে এই। মানত করার মেজাজে দুমদাম পা ফেলে ও চলে যাবার পর সিতু হেসে বাঁচেনি।

ওকে তাড়াতে চাওয়াটা যেমন সাময়িক রাগের ব্যাপার, ওর মায়া ছাড়ার তম্বিও তাই। নইলে দুজনের অসহায় অবস্থা দুজনেই জানে। ছোট ছেলের বিয়েতে একটু আমোদ-ফুর্তি করবে বলে কালীদাদার থেকে সাত দিনের ছুটির আর্জি মঞ্জুর করে নিয়েছিল মেঘনা। সাত দিন বাড়িতে থাকবে না শুনে ছোট মনিব খাপ্পা। একেবারেই চলে যেতে বলেছিল প্রথম। তারপর ছোট ছেলের বউকে ভালো একটা সোনার গয়না উপহার দেবার জন্য ওর হাতে মোটা টাকা দিয়ে বলেছিল, দিন তিনেকের মধ্যে ফিরে আসতে চেষ্টা করিস।

অতগুলো টাকা হাতে পেয়েই যেন আনন্দে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করেছে মেঘনা। কিন্তু যেতে যেতে শাড়ির আঁচলে ওকে চোখ রগড়াতে দেখেছে সিতু। তিন দিন নয়, দ্বিতীয় দিনের বিকেলেই ফিরে এসেছিল। তারপর ওর গজগজানিও কানে এসেছে, কোথাও গিয়ে কি দুদিন তিষ্ঠোবার জো আছে, ওর হাতে-পায়ে বেড়ি।

জামাটা খুলে আলনায় ফেলে শয্যার দিকে এগোতে চাপা ভীত গলায় মেঘনা বলল, বাড়িতে কোনো খারাপ খপর এলো নাকি গো ছোট মনিব...সব যেন কেমন কেমন দেখছি।

খবরের গন্ধ সিতুই পেয়েছিল। থমকে তাকালো।—কি কেমন কেমন দেখছিস?

মেঘনা জানালো, বিকেলে অফিস থেকে ফেরার মুখে কালীদাদা কিছু একটা খবর এনেছে আর সেটা ভাল খবর নয় বলেই ওর ধারণা। নিজের ঘরে না ঢুকে বাবুকে কি বলল কালীদাদা, তারপর থেকেই বাবুর হাবভাব অন্যরকম। আর মামাবাবুর সঙ্গেও কালীদাদার কিসব কথাবার্তা হল খানিকক্ষণ ধরে। মেঘনা শুনেছে, কালীদাদা শ্মশানে না কোথায় যাবে বলছিল মামাবাবুকে।

মেঘনার শেষের কথাগুলো কানের পর্দা কাটা-ছেঁড়া করে মগজে গিয়ে ঢুকল যেন। সিতু নির্বাক কয়েক মুহূর্ত। ঘর ছেড়ে পায়ে পায়ে ছোট দাদুর কাছে এলো আবার। ছোট দাদু একভাবেই বসে আছে।

গৌরবিমল ডাকলেন, আয়, কখন ফিরলি?

তোমার নাকের ডগা দিয়েই ফিরেছি, দেখতে পাওনি।...কি ব্যাপার বলো তো, কি হয়েছে?

একটু চুপ করে থেকে গৌরবিমল বললেন, বিকেলে বিভাস দত্ত মারা গেল। ...অনেকদিন ধরে ভুগছিল, কালী প্রায়ই দেখতে যেত। আজ হয়ে গেল!

সিতু কি এর থেকেও বড় কিছু বিপর্যয় শোনার আশঙ্কা নিয়ে এসেছিল? যদি এসে থাকে তো সেটা গেছে। কিন্তু খবর শোনার প্রতিক্রিয়া মুখে দাগ কেটে বসছে। অপ্রত্যাশিত বটে, প্রায় অসম্ভব গোছের। সিতুর কাছে এটা কোন খবরও নয়, নিরানন্দেরও নয়। এ খবরের সঙ্গে বাড়ির কারো কোনো সম্পর্ক আছে ভাবতেও রাজী না। তবু চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, চাউনিটা কঠিন।

ছোট দাদুকেই দেখছিল। ঠোঁটের ডগায় হাসি চিকিয়ে গেল, এক মর্মান্তিক রসিকতার লোভ সামলে বেরিয়ে এলো। বলতে পারলে বলে আসত, বিভাস দত্ত মরেছে শুনে খুশী না হয়ে অত ভাবনায় পড়ার কি হল ছোট দাদুর, মায়ের বয়েস সবে তো চল্লিশ—

বলতে না পারার তাপ মুখে নিয়ে ঘরে ফিরল। সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। সিতুর মাথা ঘামাবার মত কিছু ঘটেনি। তবু মাথার মধ্যে কাটা-ছেঁড়া করে চলেছে কি।...কত দিনের জন্য মিসেস দত্ত হয়েছিল? বড় জোর পাঁচ বছর কি ছ বছর। এই ছটা বছর কালের অস্তিত্ব থেকে মুছে গেলে কি হয়?

না, সেটা মুছে যাবার নয়। বিভাস দত্ত মুছে গেলেও না।

দোরগোড়ায় মেঘনা উঁকি দিল। কি হয়েছে জানার ইচ্ছে। কিন্তু ঘরে ঢুকতে ভরসা পেল না। দূর থেকে দেখল—ছোট মনিব চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। আর তার গনগনে চোখ দুটো যেন ঘরের ছাদটাকে ভস্ম করছে।

একচল্লিশ

ছোট গাড়িটা মাসখানেকের ওপর টানা ছুটি ভোগ করল। সিতু বাইরে বেরোয় না, দোতলা থেকে একতলায়ও কমই নামে। খায়-দায়, ঘরে শুয়ে-বসে কাটায়। দুই-একটা বই পড়ে।

কালীনাথ এক-আধ সময় ঘরে এসে জিজ্ঞেস করেন, কি রে, এ সময়ে শুয়ে যে, শরীর ভালো তো?

বিরক্তি চেপে সিতু একটু বেশিই মাথা ঝাঁকায়। অর্থাৎ খুব ভালো। একদিন জবাব দিয়েছিল, ঠিক বলতে পারি না, পাঞ্জা লড়ে দেখবে ভালো কি খারাপ? বছর কয়েক আগে জেঠু মাঝে মাঝে পাঞ্জা লড়ে ওকে জব্দ করত।

এই একজনকে এখন কতটা পছন্দ করে, আর কতটা করে না, সিতুর নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। তার প্রচ্ছন্ন-গম্ভীর কৌতুক এখনো ভালো লাগে। এত সব ওলট-পালটের পরেও জেঠু ঠিক তেমনি আছে। এই চরিত্রে কিছুই বুঝি দাগ কাটে না। আবার দাগ যে কাটে তার ভালোই জানে। তার শকুনি-স্তুতির নানা অর্থ মাথায় আসে আজকাল। ওগুলো দুর্বলের ব্যর্থ আক্রোশ কিনা তাও ভাবে। কিন্তু জেঠুকে দুর্বল ভাবা, লোহাকে নরম ভাবার মতই যেন। সিতুর সব থেকে অসহ্য তার বাবাকে। তবু তার সঙ্গে জেঠুর প্রীতির সম্পর্ককে সর্বদা সন্দিগ্ধ চোখে দেখে।

জেঠুকে নিয়ে সংশয়ের আরো কারণ আছে। তার ধারণা, জেঠু এখন গোটাগুটি বাপের ছেলেই ভাবে তাকে, মায়ের ছেলে ভাবার আর কোন কারণ নেই।...কালো ডায়েরীতে লেখা ছিল, ওকে মায়ের ছেলে মনে হলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, আর বাপের ছেলে মনে হলে ভিতরের ছুরি ওর দিকেও উঁচিয়ে উঠতে চায়। ফলে জেঠু এখন শরীরের খবর নিতে এলে তার দিকে চেয়ে সিতু অদৃশ্য ছুরি না খুঁজে পারে না।

কিন্তু খোঁজ কখনো পেয়েছে এমনও মনে হয় না। পাঞ্জা লড়তে চেয়েছিল, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি একদিন হতে পারে সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যই। কিন্তু তার মুখের হাসিতে টান ধরতে দেখেনি। মুখখানা চিরে দেখতে চেষ্টা করেও না।

ছেলেব এই পরিবর্তন শিবেশ্বর চাটুজ্যেও লক্ষ্য করেন। সময় সময় ওর ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ান তিনিও। তেমনি গম্ভীর, তেমনি বিরাট মর্যাদার মুখোশ আঁটা। বইয়ের প্রতি সিতুর তখনি সব থেকে বেশি মনোযোগ। নিঃশব্দে চলে যাবার পর বিরক্তিতে হাতের বই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাবার ব্যক্তিত্বের দাপট আগের থেকে দ্বিগুণ অত্যাচারী হয়ে উঠলেও এত বিরক্তির কারণ হত না বোধ হয়। জল্লাদেরও শৌর্য আছে। এটা শৌর্যের ছায়া।

লক্ষ্য ওকে মেঘনাও করে। সেদিন ঘরে এসে বলেছিল, গাড়িটা যে তোমার একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে পড়ে গো ছোট মনিব, আমাকেই না হয় ডেরাইভারিটা শিখিয়ে দাও—হাত-পায়ের আড় ছাড়াই।

নিঃসঙ্গতা শুধু সাধকের আসন নয়, দানবেরও। বিভাস দত্তর মৃত্যু হঠাৎ এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে ঠেলে দিল কেন সেটা সিতুরও অগোচর। ও বিশ্রাম চেনে না। তবু বিভাস দত্তর চোখ বোজার খবরটা এক সুনির্দিষ্ট বিরতি ঘোষণার মত। সাময়িক বিরতি। সিতু সেটা মেনে নিয়েছে, তাই স্নায়ু আপাতত ঠাণ্ডা। এই বিরতিতে শক্তি সঞ্চয়ের

স্বাদ পাচ্ছে বলেই ভালো লাগছে। খেলার হাফটাইমে দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়রা যেমন মাঠে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। তখন যে যত বেশি নিস্তেজ নিষ্প্রাণ, প্রস্তুতির সঞ্চয় তার ততো জোরালো। এই বিশ্রাম সিতুকে নিষ্ক্রিয়তার দিকে টানছে না একটুও, শক্তি যোগাচ্ছে। সেটা কোন্ ভাবে কোন্ কাজে লাগবে জানে না। শুধু জানে, লাগবেই।

এই বিরতি থেকে তাকে টেনে বার করল হেলেন জোন্স। অন্য লোক মারফৎ টেলিফোনে তাগিদ পাঠালো, দেখা হওয়া দরকার, অবশ্য যেন আসে।

মাস দেড়েকের অদর্শনের ফলে মায়া কমে এসেছিল। যাবার তাগিদ বোধ করেনি, কিন্তু হেলেন জোন্সের দরকারটা কি জানে। গেল মাসের শেষে টাকা দেওয়া হয়নি, আর এ মাসে তো যায়ইনি। সিতুর মত টাকা দেবার লোক জোটানো ওই চেহারায় আর হবার নয়। টানাটানিতে পড়েছে।

গিয়ে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেল। হেলেন জোন্স শয্যায় মিশে আছে। দেড় মাস আগেও যাকে দেখেছিল, এ তার প্রেত। জীবনটা যেন শুধু দুটো চোখে এসে ঠেকেছে। ওকে দেখে অভিমানে সেই চোখও ফিরিয়ে ছিল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, তুমি তো অন্যের মত আনন্দ করতে আসতে না, তুমিও ছেড়ে যাবে ভাবিনি। তবু কদিন ধরে বড় দেখতে ইচ্ছে করছিল, ভেবেছিলাম খবর পেয়েও আসবে না।

বুকের একটা দিক চেপে উঠে বসতে চেষ্টা করল। পারল না। যন্ত্রণায় মুখটা কুঁচকে গেল। সিতু তাড়াতাড়ি তাকে ধরে শুইয়ে দিল। নিজেও পাশে বসল।—এ কি চেহারা হয়েছে!...ব্যথাটা এত বেড়ে গেল কি করে?

বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে বড় বড় নীল দুটো চোখ সার। মুখের দিকে চেয়ে এই উদ্বেগ কৃত্রিম কিনা তাই যেন দেখে নিল আগে। খুশির ছোঁয়া লাগল একটু। বলল, আমার স্বামীর উপহারের জোর দেখো একবার, শেষ পর্যন্ত শেষ করেই ছাড়ল একেবারে।

সিতু বিমূঢ়, কিছুই বোধগম্য হল না। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত হেলেন জোন্স নিজের হাতে তুলে নিল। এই স্পর্শে সিতু শিউরে উঠল কেন জানে না। খানিক চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে হেলেন জোন্স বলল, পাছে বাতাসে খবর পেয়ে লোকটা বোম্বাই থেকে কলকাতা চলে আসে সেই ভয়ে কাউকে বলিনি। এখন আর ভয়ের কিছু নেই, তবু এখনো রাতে ঘুমের মধ্যে ওকে স্বপ্নে দেখে আঁতকে উঠি, জানো...।

নির্বাক বসে সিতু শুনল লোকটা কে, কি উপহার দিয়েছিল। হেলেন জোন্স যেন আজ গল্প করতেই চায়। নালিশ নয়, জীবনের এত বিড়ম্বনা বুঝি কৌতুকের মত ঠেকছে।

বোম্বাইয়ের সেই গোয়ান্ দস্যিকে ও বিয়ে করেছিল। বিয়ের পর শিগগীরই সে তাকে বিলেতে নিয়ে যাবে বলে লোভ দেখিয়েছিল। দেশে ফেরার লোভে আর মাকে পাবার লোভে লোকটা কেমন জেনেও তার ফাঁদে পা দিয়েছিল। বিয়ের দু মাসের মধ্যে সে যখন তাকে দেহ-বেসাতির মধ্যে টেনে আনার ষড়যন্ত্র করছিল, হেলেন জোন্স গোপনে তখন আর একজনের সঙ্গে সমুদ্র পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। কিন্তু নিজের সামান্য ভুলে ধরা পড়ে গেল। জাহাজ ছাড়ার আগের রাতে ও তার গোয়ান্ স্বামীর চোখে ধুলো দিয়ে পালালো। লোকটা ঠিক তাকে খুঁজে বার করল। তারপর? এ ড্যাম্ ব্লো! বেশ হাল্কা সুরেই বলল হেলেন জোন্স, সেই ঘুঁষি দেখলে জো লুই ওকে ধরে নিয়ে যেত বোধ হয়। ঠিক মত লাগলে এই দু-আড়াই বছর জীবনটাকে

নিয়ে আর এত মেহনত করতে হত না। তখনই সব চুকে-বুকে যেত। হেলেনের প্রাণে বাঁচার তাগিদে ওটা মুখ ফসকে পাঁজরে এসে লাগল। তক্ষুনি অজ্ঞান। জ্ঞান হতে দেখে সে স্বামীর ঘরে শুয়ে আছে। যে লোকটার সঙ্গে সমুদ্রপাড়ি দেবার মতলব করেছিল, প্রাণের ভয়ে সে নিখোঁজ। হয়ত একাই চলে গেছে। আর জানোয়ারের মত হেসে ওর গোয়ান্ স্বামী শাসিয়েছে, বিলেত ছেড়ে কবরের তলায় গিয়ে ঢুকলেও তার হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

হেলেন জোন্স বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। প্রায় মরে যাচ্ছে এমনি ভান করে দু দিন বিছানায় পড়েছিল। ফলে নিশ্চিন্ত হয়ে সে যখন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছে, হেলেন জোন্স সোজা স্টেশনে এসে কলকাতার গাড়িতে চেপে বসেছে। গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত তার সে কি কাঁপুনি।

...কলকাতায় আসার দিনকয়েকের মধ্যে চীনাবাজারের এক চমৎকার লেডির সঙ্গে যোগাযোগ তার। প্রথম আলাপ-সালাপে এত মিষ্টি এমন সহৃদয় মহিলা আর দেখেনি। সস্নেহে সে তার সমস্ত ভার নিয়েছিল, ভালো রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবে আশ্বাস দিয়েছিল। কৃতজ্ঞতায় উপ্‌চে উঠে হেলেন জোন্স তার মনের বাসনা ব্যক্ত করেছিল, সে আর কিছু চায় না, দেশে তার মায়ের কাছে ফেরার মত রোজগারটুকু তাড়াতাড়ি করে উঠতে পারলেই চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। মহিলা হাসিমুখে আশ্বাস দিয়েছিল, দু চার মাসের মধ্যে সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।...কিন্তু মেয়েমানুষ যে এত নীচ এত হিংস্র হতে পারে তার ধারণা ছিল না। একটানা ছ মাস সে তাকে বন্দী করে রেখেছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তিন-চার দফাও নতুন নতুন লোক আনত। হেলেনের চেহারা তো তখন ভালই ছিল। প্রত্যেকের কাছ থেকে কুড়ি টাকা করে নিত, তার থেকে ওকে দিনে পাঁচ টাকা করে দিত। টুঁ শব্দ করলে তাও দেবে না বলে শাসাতো। কিছু বলতে গেলে মারধর করত পর্যন্ত।

...ছ মাস বাদে পালাতে পেরেছিল। সেই নরক থেকে এই নরক।

একটানা কথা বলার ফলে হাঁপ ধরেছে, বুকের ব্যথায় বার কয়েক কুঁকড়েছে। হাসতে চেষ্টা করার ফলে শুকনো ঠোঁট কেঁপেছে বার কয়েক। চোখের কোণ সিরসির করেছে। অস্ফুট স্বরে বলেছে, দেশে মায়ের কাছে ফেরা আর হল না...আসার আগে কতবার করে নিষেধ করেছিল, তখন শুনলাম না।

অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

মাথার মধ্যে কি যে হয়ে যাচ্ছে সিতুর, জানে না। দুই চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। দেখছে ওকে। বিলেতের এক মেয়ে জীবন ভরে তোলার আশা নিয়ে অর্বাচীনের মত ভেসে এসে কি পেল দেখছে। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। কথার আকারে একটা অসহিষ্ণু যাতনাই বুঝি গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো।—হেলেন জোন্স। তুমি দেশে যাবে, তুমি তোমার মায়ের কাছে যাবে হেলেন জোন্স! আমি ব্যবস্থা করে দেব, আর দেরি করব না, আমার দিকে ফেরো হেলেন জোন্স, শুনছ—?

কথাগুলো তার ভিতরে পৌঁছে দেবার অব্যক্ত তাড়নায় দু হাতের প্রবল আকর্ষণে তাকে এদিক ফেরাতে চেষ্টা করেছে। তার হাতের মধ্যে হেলেন জোন্স কাঁপছে থর থর করে।

কিন্তু যা বলেছে তা আর হবার নয়।

একটা করে দিন গেছে, ক্ষ্যাপার মত দু হাতে নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে চেয়েছে সিতু। কেন, কেন এত দেরি করে ফেলল ও!

শেষের দুদিন বিকারের ঘোরে কেটেছে। নীল দু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে তাকিয়েছে হেলেন জোন্স। শিশুর ভীতত্রস্ত দিশেহারা দৃষ্টি। সিতুকেও চিনতে পারেনি। বিড়-বিড় করে একধার থেকে বলেছে, দেশে যাব...মা...মায়ের কাছে যাব...মা কোথায়...।

গাড়ি নিয়ে ছুটতে ছুটতে কলকাতা থেকে দেড় হাজার দু হাজার মাইল দূরে চলে গেছে সিতু। দুঃসহ একটা গণ্ডি থেকে ছুটে বেরুনোর উদ্‌ভ্রান্ত তাগিদ। কিন্তু যত ছুটছে গণ্ডিটা ততো আঁট হয়ে ছেঁকে ধরছে তাকে চারদিক থেকে। কাঁটার গণ্ডি। কাঁটায় ছাওয়া। তীক্ষ্ণ ধারালো। কেবল বিঁধছে। বিঁধছে বিঁধছে বিঁধছে।

বেরুনো গেল না। পনের দিনের মধ্যেই ফিরল। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত। এবারে সময় হয়েছে। এখন সব পারে। হেলেন জোন্স তার মাকে ছেড়ে এসেছিল। মাকে আর পাবে না। সিতু পেলে এই দুটো হাতে করেই ঐ মায়ের কলজে ছিঁড়ে দিয়ে আসতে পারে। তার অপরাধ? অপরাধ-টপরাধ সিতু জানে না—পারে। সব মায়েরই পারে।

...আর একজনেরও পারে। পারার সময় হয়েছে।

এরপর দিনে-দুপুরে এই কলকাতা শহরেই এক রাস্তায় ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেল একটা। সেই কাণ্ড নিয়ে রাস্তার দশ হাত দূরে দূরে সন্ধ্যে পর্যন্ত উত্তেজিত জটলা। এরকম তাজ্জব দুঃসাহসের কাণ্ড কলকাতা শহরেই শুধু ঘটতে পারে।

যাতায়াতের পথে পাড়ার ছেলে-ছোকরারা মেয়েটাকে তো ভালো করেই লক্ষ্য করে। যতক্ষণ দেখা যায় চোখের আওতায় আগলে রাখতে চেষ্টা করে। শুধু লক্ষ্য করা কেন, পাড়ার লোকে খবরও কিছু রাখে। অমুক কলেজ থেকে এবারে বি-এ পাস করল, এম-এ পড়ার তোড়জোড় চলছে। লেখক আত্মীয় মারা যাবার পর ফ্ল্যাটে শুধু দুজন থাকে—ওই মেয়ে আর তার মাসী। মাসী স্কুলে চাকরি করে মাসীর বয়েস কিছু হল বোধ হয়, এখনো এত রূপ যে চোখ ফেরানো যায় না। ফ্ল্যাটের ভদ্রলোক মারা যাবার পর ও ফ্ল্যাটের প্রতি দৃষ্টি অনেকেরই উৎসুক হয়েছে। কিন্তু বড় অমিশুক দুজনেই।

—ওই মেয়েকে নিয়েই দুপুরে খোলা রাস্তায় বিষম ব্যাপার হয়ে গেল।

গাড়িটা মোড়ের মাথায় অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল, চোখে পড়লেও লক্ষ্য কেউ করেনি। মেয়েটা পাশ কাটানোর আগেই গাড়ি থেকে নেমে এক ফিটফাট চেহারার লোক পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। এপাশ-ওপাশ দুই একটা বাড়ির আর রাস্তারও কেউ কেউ দেখেছে লোকটা কি বলছে আর মেয়েটাকে গাড়িতে তুলতে চাইছে। গনগনে মুখে মেয়েটা চলে যেতে চেষ্টা করতেই আচমকা তার মুখে কি একটা চেপে ধরে চোখের পলকে আল্‌তো করে তুলে তাকে গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। আর বিশ সেকেণ্ডের অবকাশ পেলে গাড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে যেত।

কিন্তু তার আগে হৈ-হৈ করে গোটাকতক লোক ছুটে এসেছিল বলে রক্ষা। তারা ব্যাপার বুঝে বাধা দিতে দাঁড়াতেই লোকটা ক্ষ্যাপার মত তাদের ওপর দিয়ে গাড়ি চালাতে চেষ্টা করেছিল। আর মেয়েটা দরজা খুলে পালাতে চেষ্টা করতে গিয়ে এক চড় খেয়ে উল্টেই পড়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক লোক এসে গেছে। লোকটা এমন

বেপরোয়া যে গাড়ি থেকে নেমে একা অতগুলো মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছে। ত্রাসে ওষ্ঠাগতপ্রাণ মেয়েটাকে সেই ফাঁকে গাড়ি থেকে নামানো হয়েছে। ক্রুদ্ধ উন্মত্ত জনতা ততোক্ষণে দিন-দুপুরে গাড়িতে মেয়ে তুলে নেওয়ার দুঃসাহসিক চেষ্টার ফয়সালায় মত্ত হয়েছে। যে রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ধরে মেয়েটাকে গাড়িতে তোলা হয়েছিল তাতে অজ্ঞান করার ওষুধ মেশানো ছিল। গাড়ি তল্লাস করে আরো কিছু মিলেছে। দশ না বারো হাজার নগদ টাকা। আরো পরে জমার ঘরে বিশাল অঙ্ক বসানো সাত্যকি চ্যাটার্জির নামে ব্যাঙ্কের গোটা দুই পাসবই মিলেছে।

কিন্তু সেসব পরের ব্যাপার, ক্রুদ্ধ জনতা যখন গাড়িটাকে গুঁড়িয়ে ভাঙার উদ্যমে মেতেছিল তখনকার। তার আগে লোকটাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত থেতলে থেতলে মাটিতে শুইয়েছে তারা। কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আর যখন নড়ছে না তখন থেমেছে। মেয়েটা ভিড় ঠেলে দু-একবার সেদিকে যেতে চেষ্টা করেছে, পারেনি। তারপর, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে জনাকতক মিলে ধরাধরি করে তাকে অদূরের এক ডিস্‌পেনসারিতে নিয়ে তুলেছে।

পুলিস এসেছে। লোকে লোকারণ্য। ক্ষিপ্ত উত্তেজনায় হাত পাথর আর লাঠি যারা চালিয়েছে, লোকটা মরেই গেল ভেবে তারা সরে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর ঘটনা বলা আর ঘটনা শোনার জনতার চাপই বেশি। তাদের ভিতর থেকে উদ্ধার করে পুলিস ভাঙাচোরা একটা দেহের কাঠামো ট্রাকে তুলে নিয়ে গেছে। ভাঙা গাড়ি টাকা আর পাসবইয়ের দায়ও তারাই নিয়েছে।

এক ঘন্টা যেতে না যেতে দিশেহারার মত বাড়ি ফিরেছে শমী বোস।

পুলিস তার এজাহার চেয়েছিল, তাকে থানায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। শমী যেতে পারেনি। যেতে চায়নি। পুলিস তার বাড়ির ঠিকানা নিয়ে গিয়ে তাকে সুস্থ হবার অবকাশ দিয়েছে।

বাড়িতে একা। মাসী তখনো ফেরেনি। তার চোখের সামনে সব কিছু ঘুরছে তখনো। বাড়িটা সুদ্ধ ঘুরছে। চৌকিতে বসে আছে কিন্তু মনে হচ্ছে উল্টে পড়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে চোখে অন্ধকার দেখছে।...রক্ত রক্ত রক্ত, কত রক্ত দেখল শমী। মাথা ফেটে রক্ত, সর্ব অঙ্গে রক্ত। কি হয়ে গেল? শমীর গা ঘুলিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব ঘুলিয়ে কি যেন গলা দিয়ে উঠে আসতে চাইছে। এক-একবার বাথরুমের দিকে ছুটে যাচ্ছে সে, আবার টলতে টলতে এসে বসছে।

স্নায়ুর ধকল শুরু হয়েছিল সিতুদা গাড়ি থেকে নেমে পথ আগলানোর সঙ্গে সঙ্গেই। অনেকদিন দেখেনি, ওই মুখ আর ওই চাউনি দেখে ভয়ই ধরেছিল। ও-রকম অস্বাভাবিক মূর্তি বুঝি দেখেনি। পথ আগলে বলেছিল, তাকে গাড়িতে উঠতে হবে, বিশেষ দরকার আছে। শমী সরোষে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেও পারেনি, সাঁড়াশির মত এক হাতে তার হাত চেপে ধরেছে। বলেছে, জোর করলে বিপদ হবে, চুপচাপ গাড়িতে এসে উঠতে হবে। সেই মুহূর্তে শমীর মনে হয়েছে, গাড়িতে নয়, কেউ বুঝি মৃত্যুর অব্যর্থ ফাঁদে নিয়ে গিয়ে ফেলতে চাইছে তাকে। এমন অপ্রকৃতিস্থ ধক্-ধকে দুটো চোখ শমী কল্পনাও করতে পারে না। একটু জোরেই বকাবকি করে উঠে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু চোখের পলকে রুমালে মুখ চেপে ধরে আলতো করে তুলে তাকে গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ভিজে রুমালের

গন্ধ নাকে-মুখে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শমীর সবগুলো স্নায়ু ঝিমঝিম করে উঠেছে। আর একটু বাদে একটা চড় খেয়ে উল্টে পড়েছিল মনে আছে। আর তার একটু বাদে সে গাড়ি থেকে মাটিতে নেমেছে। নিজে নেমেছে কি কেউ নামিয়েছে জানে না। তারপর যে দৃশ্য দেখেছে, গা ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠেছে, বার বার চোখ বুজে ফেলেছে, চেতনা যেতে বসেছে। একটা মানুষের দেহকে এভাবে ভেঙেচুরে একাকার করে দিতে পারে কেউ! অস্ফুট আর্তনাদ করে ওদের থামতে বলতে চেয়েছে, গলা দিয়ে শব্দ বেরোয়নি! ভিড় ঠেলে বার দুই ওদিকে এগোতে চেষ্টা করে চোখে রাশি রাশি অন্ধকার দেখেছে। সম্বিৎ ফিরেছে ডিস্‌পেনসারিতে আসার পর।

কিন্তু ওদিকে কি হয়ে গেল? কি সর্বনাশ হয়ে গেল ওদিকে?

সন্ধ্যা পেরিয়েছে। রাত্রি।

জ্যোতিরাণী শমীর শয্যায় বসে আছেন। স্থির, নিশ্চল। মাঝে মাঝে শমীর মাথায় হাত বুলোচ্ছেন। থেকে থেকে চোখে-মুখেও জল দিচ্ছেন। সেই থেকে শমী তাঁর কোলে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। এত কেঁদেছে যে আর কাঁদার শক্তিও নেই বুঝি। নিস্পন্দের মত পড়ে আছে। থেকে থেকে এক-একবার সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ঠিক এই অবস্থায় পাড়া-প্রতিবেশিনীরা অনেকে এসে দেখে গেছে। এ বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটের মেয়েরাও এসেছে। শমী তখনো বলতে কিছুই পারেনি। জ্যোতিরাণী আসামাত্র পাগলের মত দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠেছে, মাসী গো, সিতুদার কি হল শিগ্‌গীর খোঁজ করো, ওরা বোধ হয় মেরেই ফেলে দিল সিতুদাকে!

জ্যোতিরাণী নির্বাক নিশ্চেতন তখন। কারণ মোড় থেকে এটুকু রাস্তা হেঁটে আসতে আসতে চার-পাঁচজন এগিয়ে সাগ্রহে তাঁকে সম্ভাব্য বিপদের বার্তা জানিয়েছে। ঘটনা বলতে বলতে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসেছিল তারা। জ্যোতিরাণী কি তখনো আশা করছিলেন? তখনো কোনো অসম্ভব প্রাণান্তকর আশা নিয়ে দোতলায় উঠেছিলেন?

শমীর আর্তনাদ শোনামাত্র স্তব্ধ নির্বাক তিনি। ভদ্রবেশী মেয়ে ধরা ডাকাতের কথা আর গাড়ির কথা শোনামাত্র বুকের ভিতর দুমড়ে মুচড়ে উঠেছিল। লোকগুলোকে বিদায় দেবার জন্য এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে দোতলায় উঠতে উঠতে তবু প্রার্থনা করেছিলেন, আর কেউ হোক, সিতু না হয়ে আর কেউ হোক।

শমীকে দেখে আর শমীর আর্তনাদে আশা নির্মূল।

কোলে মুখ গুঁজে শমী কেবল কেঁদেছে আর কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়েছে। বার বার জলের ঝাপটা দিয়েও ওকে সুস্থ করা যায়নি। ভয় পেয়ে শমী যাই বলুক, জনতার ক্ষিপ্ত আঘাত সম্পর্কে জ্যোতিরাণীর কোন ধারণা নেই, তাই সিতুর প্রাণের আশঙ্কাটাই তখনো সব থেকে মর্মান্তিক যাতনার ব্যাপার নয় তাঁর কাছে। তার থেকে দ্বিগুণ যাতনা, শমীকে যে অজ্ঞান করে মোটরে তুলে নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল সে সিতু—এই সত্যটা। শমীর কান্না আর অস্থিরতা অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে সামলাতে চেষ্টা করে হঠাৎ একবার মাত্র জ্যোতিরাণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, তুই এত কাঁদছিস কেন? তোর এত অস্থির হবার কি হল? যা হবার তাই হয়েছে, লোকের মার তুই ঠেকাবি কি করে?

শমী আরো বেশি ডুকরে উঠেছিল, সিতুদা পাগল হয়ে এ কাজ করেছিল মাসী,

তুমি জানো না ওরা তার কি করেছে!

ঘরের দরজায় অন্য ফ্ল্যাটের মেয়েরা আর আশপাশের বাড়ির কয়েকজন মহিলা দোরগোড়ায় উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। তারপর ভিতরে এসেছে। তাদের তখনো ধারণা, মেয়েটা ভয়েই এরকম করছে। কথার ফাঁকে শোনা বৃত্তান্ত বা আধা-শোনা বৃত্তান্ত ফাঁপিয়ে ব্যক্ত করেছে তারা, আর আশ্বাস দিয়েছে, এত বড় দুঃসাহস আর শয়তানীর ফল হাতে হাতে পেয়েছে লোকটা, প্রাণে বাঁচবে কিনা সন্দেহ, বাঁচলেও মেয়ে চুরির সাধ এজন্মে আর হবে না বোধ হয়। দুজন বয়স্কা সরোষে বলে উঠেছিলেন, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ারই বা অবস্থা রাখল কেন, একেবারে শেষ করে দিল না কেন!

জ্যোতিরাণী নির্বাক, হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ। আলুথালু মূর্তিতে তাঁর কোল থেকে শমী ছিটকে উঠে বসতে বসতে প্রায় চিৎকার কবে উঠেছিল, আপনারা যান এখান থেকে, যান —যান বলছি! মাসী ওদের যেতে বলো।

অপ্রত্যাশিত বিস্ময় নিয়েই তারা প্রস্থান করেছে। শমী আবার কোলে মুখ গুঁজেছে।

সন্ধ্যার পর আবার থানা থেকে লোক এসেছে। এই অবস্থায় কেউ বাঞ্ছিত নয়। কিন্তু ঠেকানো যাবে কি করে। তাছাড়া তারা কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছে। বাড়ির নম্বর আর ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের নাম ঠিকানা ধরে খোঁজ নিতে জানা গেছে আসামী নিজেই সাত্যকি চ্যাটার্জি—প্রতিপত্তিশালী ধনী শিবেশ্বর চ্যাটার্জির ছেলে। আসামী হাসপাতালে অজ্ঞান, তখনো চিকিৎসা পর্যন্ত শুরু হয়নি। বাড়ির লোক এসে তাকে সনাক্ত করার ঘন্টাখানেক পরে হাসপাতাল আর পুলিসের লোকের টনক নড়েছে। পুলিসের আর শাসনপর্যায়ের এমন সব হোমরাচোমরাদের তত্ত্ব-তল্লাসী শুরু হয়েছে যে, সকলকেই তৎপর হতে হয়েছে। আসামীকে হাসপাতালের সব থেকে ভালো ক্যাবিনে সরানো হয়েছে। আর ওপরঅলাদের বিশেষ অনুমোদনে সেই ক্যাবিনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের হাট বসে গেছে। এই আসামী নিয়ে কারবার, থানার মানুষেরা তৎপর না হয়ে করে কি।

পুলিসের লোক জেরা করেছে, সাত্যকি চ্যাটার্জিকে এবা জানে কিনা, চেনে কিনা, আগে কখনো দেখেছে কিনা।

জেরার জবাব জ্যোতিরাণী দিয়েছেন। জবাব বলতে মাথা নেড়েছেন, জানেন চেনেন দেখেছেন।

পরের জেরা স্বতোৎসারিত। কেমন করে আর কতদিন ধরে জানেন চেনেন, কতদিন আগে দেখেছেন।

খানিক চুপ করে থেকে সব প্রশ্নের জবাবে জ্যোতিরাণী ধীর ঠাণ্ডা সুরে শুধু বলেছেন, সে আমার ছেলে।

পুলিসের মাথা ঘুলিয়ে গেছে। তারা এলোমেলো প্রশ্ন করেছে। বিকেলের ঘটনার বিবরণ জানতে চেয়েছে শমীর কাছ থেকে। কিন্তু শমীর অসুস্থতার কথা বলে শান্ত মুখে জ্যোতিরাণী আপাতত অব্যাহতি চেয়েছেন। পুলিস কেস-এর ব্যাপার, অব্যাহতি চাইলেই সেটা মেলে না। দুজনকেই থানায় নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল তাদের। কিন্তু শমী বোসের অসুস্থতার বিবেচনায় হোক বা এই মহিলার শান্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হোক, তখনকার মত তারা বিদায় নিয়েছে।

দরজার কাছে এসে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করেছেন, ও কেমন আছে?

তারা জানিয়েছে, ভালো না, বাঁচবে কিনা বলা যায় না।

তাদের মুখে এই খবরটা পাওয়ার পর জ্যোতিরাণীর নীরব যাতনার রূপ বদলেছে। না, প্রাণ সংশয়ের কথা তিনি আগে ভাবেননি। শমীর এত অস্থিরতার কারণ এবারে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পারছেন। শমীর চোখে মুখে মাথায় এখনো জলের হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বাইরে এখনো তেমনি নির্মম রকমের স্থির। কিন্তু বুকের তলায় এবারে অন্য ঝড় উঠেছে।

অন্ধকার অন্ধকার অন্ধকার। অন্ধকারের সমুদ্র। সেই অন্ধকারের সমুদ্রে ডুবছে কেউ, ভাসছে কেউ। সাঁতার কাটতে চেষ্টা করছে কেউ। ডুবছে ডুবতে ভাসছে, ভাসতে ভাসতে ডুবছে। অন্ধকারের অনন্ত সমুদ্র, শেষ নেই তল নেই কূল নেই। কিন্তু সেই অন্ধকারে একটু একটু করে লাল আলো মিশছে। লালচে অন্ধকার। সেই লাল একটু একটু করে সাদার দিকে ঘেঁষছে।

...মা-গো!

ঘরের সব কটা লোক একসঙ্গে চমকে উঠলেন। চব্বিশ ঘণ্টা ডাক্তার মোতায়েন। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ঝুঁকলেন। নার্স দৌড়ে এলো। শিবেশ্বর চ্যাটার্জি গৌরবিমল কালীনাথ. জ্যোতিরাণী সকলেই সচকিত। অদূরে শমীব বুকের ভিতরটাও ধড়াস করে উঠেছে।

সতের দিন সতের রাত পরে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজমোড়া একটা দেহে প্রথম চেতনা সঞ্চারের সূচনা। সূচনার প্রথম কাতরোক্তি, মা-গো!

জ্যোতিরাণীর একাগ্র দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে স্থির হয়ে রোগীর শয্যা থেকে ওপাশের দেয়ালের একটা চেয়ারের দিকে ঘুরল। সেই চেয়ারে বসে শিবেশ্বর। নিজের অগোচরে তাঁরও দুচোখ জ্যোতিরাণীর মুখের ওপরে উঠে এসেছে। তাব পরেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে। সতের দিনের মধ্যে চোখে চোখে এই প্রথম বিনিময়। ঘরেব আর তৃতীয় কেউ বোধ হয় জানলো না, শিবেশ্বর চাটুজ্যের সতের দিনের একটানা অব্যক্ত নীরব অসহিষ্ণুতার একটা নিঃশব্দ জবাব সেই মুহূর্তে সারা।

গত সতের দিনের প্রতিটি দিন শমীকে নিয়ে জ্যোতিরাণী বিকেল চারটে থেকে ছটা হাসপাতালের এই ক্যাবিনে এসে বসে থাকছেন। স্কুল থেকে দু ঘণ্টা আগে ছুটির ব্যবস্থা করতে হয়েছে এজন্যে। ঠিক চারটে বাজলে আসেন। চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে থাকেন। আবার ঠিক ছটার ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে শমীকে নিয়ে উঠে চলে যান। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ারস্ চারটে থেকে ছটা। কেউ তাঁকে আসতে বলে না, কেউ তাঁকে যেতেও বলে না। সর্বব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থার ক্যাবিন, চব্বিশ ঘণ্টা ডাক্তার থাকেন, চব্বিশ ঘণ্টা নার্স থাকে, আর পালা করে দিন-রাতের বেশির ভাগ সময়ই হয় কালীনাথ থাকেন, নয়তো গৌরবিমল থাকেন। অতএব জ্যোতিরাণীরও আসা-যাওয়াটা হাসপাতালের নিয়মরক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু ঠিক চারটেয় নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢোকেন তিনি আর ঠিক ছটায় তেমনি নীরবে উঠে চলে যান। একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেন না। কালীদা শুধু নিজের থেকে রাত্রির আর দিনের খবর জানান তাঁকে।

সতের দিন আগে শিবেশ্বর চাটুজ্যে বিকেল চারটের সময় টানা প্রায় দশ বছর

বাদে প্রথম দেখেছিলেন জ্যোতিরাণীকে। ঠাণ্ডা দুচোখ তুলেই দেখেছিলেন। জ্যোতিরাণী তাঁর দিকে তাকাননি। কিন্তু তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলেন।

পরনে চওড়া কালোপেড়ে শাড়ি, দু-হাতে দুগাছা সরু রুলি, গলায় খুব সরু হার একছড়া, কানে সাদা দুটো ছোট পাথর—চোখে পড়ে না প্রায়, এত ছোট। সিঁথি খরখরে সাদা। তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন এক অখণ্ড নীরবতা জমাট বেঁধে আছে।

দেখা শেষ করে শিবেশ্বর আর সরাসরি তাকাননি। তাঁর চোখেমুখে চাউনিতে নীরব হাবভাব এক প্রচণ্ড অসহিষ্ণু বিরক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এত স্পষ্ট যে জ্যোতিরাণীও তা লক্ষ্য করেছেন। অনুভব করেছেন। তারপর থেকে প্রতিদিন লক্ষ্য করে আসছেন, অনুভব করে আসছেন। তিনি ঘরে ঢোকা মাত্র কালীদার দিকে যেভাবে তাকান, একটাই অর্থ। কেন আসে, আসার দরকার নেই বলে দিতে পারো না? কিন্তু মুখ ফুটে এযাবৎ কেউ তাঁকে আসতে নিষেধ করেননি। তাঁর উপস্থিতিতে কালীদাই শুধু স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় উসখুস করেন একটু, গৌরবিমল নির্লিপ্ত গম্ভীর—ভালো চেনেনও না যেন। আর, একজনের ওই চাপা অসহিষ্ণু মূর্তি, কেন আসে আসা কেন!

চেতনার সূচনায় স্তব্ধ ঘরে রোগীর শয্যা থে‌ে যে শব্দটা সকলকে সচকিত করল, সেটা বাবাকে নয় জেঠুকে নয় ছোট দাদুকে নয়—সেটা শুধু মাকে ডাকার কাতর-ধ্বনি।

রোগশয্যা থেকে তার নিজের অগোচরে শিবেশ্বর চাটুজ্যের দুচোখ ঘরের বিপরীত কোণে জ্যোতিরাণীর দিকে ফিরেছে। আর জ্যোতিরাণীর দৃষ্টিটাও আস্তে আস্তে তাঁর দিকেই ঘুরেছে। কেন আসেন, এই জবাবটাই যেন সম্পূর্ণ হয়েছে। জবাবটা জ্যোতিরাণী দেননি, শয্যার ওই যন্ত্রণাকাতর মুখ থেকে এসেছে।

পরদিন।

থানা থেকে তলব পেয়ে শমীকে নিয়ে থানায় এলেন জ্যোতিরাণী। থানা অফিসার ছাড়াও পুলিসের একজন কর্তাব্যক্তি উপস্থিত সেখানে। আর বসে আছেন কালীনাথ আর শিবেশ্বর চাটুজ্যে। থানা অফিসার তাঁদের কি জিজ্ঞাসা করছেন আর লিখছেন।

স্কুলের মাইনের খাতায়ও জ্যোতিরাণী এ পর্যন্ত দত্ত লেখেননি। জ্যোতিরাণী দেবী লিখে আসছেন। এখানে নাম জিজ্ঞাসা করতে স্পষ্ট জবাব দিলেন জ্যোতিরাণী দত্ত। অন্য প্রশ্নের জবাবেও শান্ত মুখে বললেন, বিবাহবিচ্ছেদের আগে তিনি মিসেস চাটার্জি ছিলেন, সাত্যকি চ্যাটার্জি তাঁর ছেলে। ছেলের স্বভাব এবং মতিগতি সম্বন্ধে প্রশ্ন হতে একটু থেমে জবাব দিলেন, এসব ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন, দশ বছরের মধ্যে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।

আসল এজাহার শমী বোসের। পুলিসের বড়কর্তা তাকে নির্ভয়ে যাবতীয় সত্য ঘটনা ব্যক্ত করতে বললেন। সঙ্কোচ কেমন করে মুছে গেছল শমী জানে না। সংক্ষিপ্ত ঘটনা বলল। কিন্তু গাড়িতে তুলতে চাওয়ার সময় সাত্যকি চ্যাটার্জিকে তার প্রকৃতিস্থ মনে হয়নি এই ধারণাটার ওপরেই বেশি জোর পড়ল। রাগে অন্ধ হয়ে এই কাজ করেছে, যারা এসে ওইভাবে মেরেছে ভুল তারাই করেছে জানাতেও দ্বিধা করল না। জেরার জবাবে জানালো, সাত্যকি চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায়ই হয় আর তার সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলেই এই ব্যাপার ঘটেছে। ওষুধ-মেশানো রুমাল চেপে অজ্ঞান

করে তুলে নিয়ে যাওয়ার মতই মনোমালিন্য কিনা জিজ্ঞাসা করতেও মাথা নেড়েছে। তাই।

তাদের আলাদা বসিয়ে পুলিসের কর্মকর্তারা আগের ডায়েরির সঙ্গে মিলিয়ে রিপোর্টের খসড়া ঠিক করার পরামর্শে বসলেন বোধ হয়। এ-ঘরে শমী জ্যোতিরাণী শিবেশ্বর আর কালীনাথ নির্বাক বসে।

একটু বাদে শিবেশ্বর উঠে বাইরে এসে পায়চারি করলেন খানিক। কি ভেবে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে তাকালেন। শমীকে ইশারায় কাছে ডাকলেন তারপর। ডেকে পায়ে পায়ে ঘরের লোকের দৃষ্টির আড়ালে চলে এলেন।

শমী এলো। শান্ত, ঈষৎ সঙ্কুচিত। ছেলেবেলায় এই একজনকে কি ভয়ই না করত। তাঁর কাছে আসা এই প্রথম। হাসপাতালে এতদিন দু ঘণ্টা করে এক ঘরে কাটালেও তাকে কাছে আসা বলা যায় না। কি মনে হতে শমী নত হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে উঠল।

গম্ভীর শিবেশ্বর চাটুজ্যে বিব্রত ঈষৎ। প্রণামে অভ্যস্ত নন, প্রণামের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। সেই ছোট ফ্রক-পরা মেয়েটাই এই মেয়ে কিনা, চোখে সেই গোছের সংশয় প্রায়। হাসপাতালেও দেখেছেন বটে, কিন্তু আর একজনের উপস্থিতিতে আর ছেলের সংকটে সেই দেখার প্রায় সবটুকুই আচ্ছন্ন।

ঠোঁটে একটু হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেও ঠিক পেরে উঠলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, সিতুকে বাঁচানোর জন্যে তোমাকে এভাবে বলতে বলা হয়েছিল?

এক মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে শমী প্রশ্নটা বুঝে নিল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানালো, মাসীমা এ সম্বন্ধে কিছুই বলেননি।

শিবেশ্বর চেয়ে রইলেন। এ চাউনি কোমল, যা সচরাচর হয় না।...অঘটনের পর এই মেয়েটার প্রতি ছেলেবেলা থেকে সিতুর অস্বাভাবিক ঝোঁকের কথা কালীদা কি যেন বলছিল সেদিন। কুশাগ্রবুদ্ধি মানুষ, মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখলেন তিনিই জানেন। এতখানি ব্যাপারের পরেও পুলিসের কাছে যা বলেছে নিজের তাগিদেই বলেছে, এটুকুই স্পষ্ট চোখে পড়ল বোধ করি। কি একটা উদগত অনুভূতি নিষ্পেষণ করলেন। জীবনের অনেক সহজ সুন্দর স্বাভাবিক সম্ভাবনা কঠিন হয়ে গেছে সেটাই অনুভব করলেন হয়ত। যা কখনো করেননি, আত্মচেতন মর্যাদাচেতন মানুষটা হঠাৎ তাই করলেন। ডান হাতখানা তুলে আলতো করে একবার শমীর মাথায় ছুঁইয়ে নামিয়ে নিলেন।

তুমি পড়ো?

হ্যাঁ।

কি পড়ো?

এবারে এম. এ-তে ভর্তি হয়েছি।

কোন্ সাবজেক্ট?

ইকনমিক্স্।

এই জবাবই যেন আশা করেছিলেন তিনি। হাসতে চেষ্টা করলেন একটু। ইচ্ছে করলেই তিনি হাসতে পারেন না, তাই হাসিটা অদ্ভুত দেখালো। বিড়বিড় করে বললেন, ও বিষয়টা এককালে আমিও একটু-আধটু জানতাম, এখন ভুলে গেছি।

শমীও চেয়েই ছিল তাঁর দিকে। কি রকম যেন লাগছে তার। আনন্দ হচ্ছে একটু, কিন্তু আনন্দটুকু ব্যথার মত।...বিষয়টা একটু-আধটু জানতেন বললেন, কিন্তু শমী খবর রাখে অত বড় স্কলার আজকের দিনেও কমই হয়।

আচ্ছা, তুমি খোসোগে।

অন্যমনস্কের মত পায়চারি করে বারান্দার ওধারে চলে গেলেন তিনি। শমী তবু দাঁড়িয়ে দেখল একটু। প্রায় কোটিপতি শিবেশ্বর চাটুজ্যের প্রৌঢ় নিঃসঙ্গতার কোনো একটা দিক শমীর চোখে ধরা পড়ার উপক্রম হয়েছিল? ও ঠিক বুঝল না।

থানার কাজ শেষ। সাত্যকি চ্যাটার্জির জবানবন্দি নেবার আগে তাদের রিপোর্ট সম্পূর্ণ হবে না। তার সে পর্যায়ে সুস্থ হয়ে উঠতে দেরি আছে। কালীনাথকে নিয়ে শিবেশ্বর চাটুজ্যে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। আর কাউকে চেনেনও না।

ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়। দূর বরং আর যারা এসেছিল তাদের বাড়ি থেকে। এই এলাকার ঘটনা বলেই এ থানার দায়িত্ব। রাস্তায় এসে শমী হঠাৎ প্রস্তাব করল, চলো মাসী হেঁটেই যাই, ভিড়ের সময় ট্রামে-বাসে উঠতে ইচ্ছে করে না—কষ্ট হবে?

না কষ্ট কি, চল্। জ্যোতিরাণীর ধারণা শমী কিছু বলার জন্য উসখুস করছে। ওকে বাইরে ডাকতে দেখে মনে মনে তিনিও কম বিস্মিত হননি।

যেতে যেতে শমী বলল, মেশোমশাই আমাকে বাইরের বারান্দায় ডেকেছিলেন।

আগে মেশোমশাই বলত, এখনো আর কি বলতে পারে শমী ভেবে পেল না। জ্যোতিরাণী নীরবে মাথা নাড়লেন। দেখেছিলেন।

বারান্দায় কি কথা হল শমী নিজের থেকেই বলল। কথা অল্পই হয়েছে। বলতে সময় লাগল না। জ্যোতিরাণী নিঃশব্দে শুনলেন। তারপর তেমনি নীরবেই চলতে লাগলেন। তিনি ফিরে তাকানওনি ওর দিকে, তবু টের পেলেন শমী ঘাড় ফিরিয়ে এক-একবার দেখছে তাঁকে।

...কি দেখছে?

আজ কি জ্যোতিরাণী প্রথম নিজেকে বিধবা ভাবতে চেষ্টা করলেন? শমী কি এর আগেও তাঁর ভিতরে এমনি করে চোখ চালিয়েছে? দ্বিতীয় জীবনে তাঁর ছয় বছর মেয়াদের বিয়ে আর এই বৈধব্য কতটুকু রেখাপাত করেছে, সে কি শমীর চিন্তার মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে কখনো?

কাকা চোখ বুজতে শমীর শোক কম হয়নি। কিন্তু সেই শোক তাকে তেমন বিড়ম্বিত করেনি। বিড়ম্বিত বোধ করেছিলেন তিনি নিজের কারণেই। বড় সূক্ষ্ম অথচ নিরুপায় অপরাধচেতন বিড়ম্বনার মত। দ্বিতীয় জীবনের শুরু থেকেই সেটা অনেকবার উঁকিঝুঁকি দিতে চেয়েছে। আর বড় নিঃশব্দে সেটা তিনি অস্তিত্বের বাইরে ঠেলে সরিয়ে রেখেছেন। ...তাঁর প্রথম জীবনের আগন্তুক হিংস্র বিকৃত অবুঝ অত্যাচারী, রমণীর দেহ-লোলুপ অন্ধকারের নৃশংস পুরুষ। প্রবঞ্চনাপটু, ব্যভিচারী, বিশ্বাসঘাতক। জীবনের শুরু থেকে তারই সঙ্গে অবিরাম দ্বন্দ্ব, আর তারই সত্তাগ্রাসী ক্ষুধা থেকে আত্মরক্ষার অবিরাম সঙ্কট। আইনগত বিচ্ছেদে সব কিছুর অবসান। তা নিয়ে পরিতাপ করেননি। কিন্তু আইনের বিচ্ছেদ সমস্ত স্মৃতি নির্মূল করবে কেমন করে। বিচ্ছেদ তিনি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অবিরাম সংঘাতের মধ্য দিয়েই প্রথম বয়সের টানা চোদ্দটা বছরের যুক্ত জীবনে

বিরূপতার আকারেও কিছু যদি পুষ্ট হয়ে থাকে, তাই বা মুছে দেবেন কি করে। থাকুক আর নাই থাকুক, পুরুষ তাঁর জীবনে একজনই। এই সত্যটা দ্বিতীয় বাসরে পদার্পণের মুহূর্তে বড় নির্মমভাবে উপলব্ধি করতে হয়েছিল তাঁকে। বিচ্ছেদের মুহূর্তে, তার আগেও বলতে গেলে মিত্রাদির বন্ধ দরজার আঘাত নিয়ে ফেরার পরক্ষণ থেকেই আপসশূন্য সঙ্কল্পে ওই পুরুষকে তিনি জীবন থেকে ছেঁটে দিয়েছেন। সঙ্কল্পের নড়চড় কখনো হয়নি। তবু সত্যটা থেকেই গেছে।...পুরুষ ওই একজনই।

বিভাস দত্তর জীবনে আসাটা বিধিলিপির এক বিচিত্র অধ্যায়। কালের আইনসিদ্ধির এক অদ্ভুত বলি যেন তিনি। কলের পুতুলের মত কেউ তাঁকে টেনে এনেছিল। ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন ছিল না, বিচার-বিবেচনার সামর্থ্যও ছিল না। ঘটবে বলেই ঘটেছে। পুরুষ জীবনে একজনই—এই অকারণ সত্যটা মোছেনি বলেই শুরু থেকে একটানা ছটা বছর রণাঙ্গনের সেই নার্সের ভূমিকা তাঁর—হিমেল দুর্যোগে আহত অর্ধমৃত সৈনিককে যে নিজের দেহের তাপের বিনিময়ে জীবনের তাপে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। দিনে দিনে এই ভূমিকাটা বড় হয়ে উঠেছিল। দেহ-চেতনার নিভৃত বিড়ম্বনার কাল দ্রুত নিঃশেষ হয়েছিল। সেবার এই ভূমিকাটাই সত্য ছিল শুধু, আর সবই মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল। দু হাতে একটা মানুষকে সর্বব্যর্থতার গ্রাস থেকে টেনে তোলার অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন তিনি। পারেননি। ছ বছরের ভবিতব্যের অধ্যায় শেষ হয়েছে।

শেষের সে-চিত্র ভোলবার নয়।

...বাঁচার এমন আকুতি আর কি কখনো দেখেছেন! বুকে বাতাস নেই, একটু বাতাসের জন্যে সে কি দারুণ ছটফটানি, মুখে কিছু বলতে পারেননি—শুধু দুই চোখ দিয়ে বলেছেন। বলতে চেয়েছেন—আমাকে বাঁচাও, বাঁচিয়ে রাখো। আবার বিপবীত প্রতিক্রিয়া দেখেছেন তারও আগে। তাঁকে নয়, কালীদাকে বলেছেন, যত ক্ষতি তিনি জ্যোতিরাণীর করে গেলেন, তেমন আর কেউ করেনি। তিনি অযোগ্য, বেঁচে থাকলেও অযোগ্য, স্বার্থে আর মোহে অন্ধ হয়ে এতকাল তিনি সেটা বোঝেননি। বুঝেছেন যখন ক্ষতি হয়েই গেছে। এখন তিনি চোখ বুজতেই চান, আর কিছু চান না।

কিন্তু জ্যোতিরাণীর কোনো অভিযোগ ছিল না। চলে যাবার পরেও না। আত্মপীড়িত মানুষকে মনে মনে শেষ নমস্কার জানিয়েই বিদায় দিয়েছেন। দুঃখও হয়েছে। কিন্তু সেটা স্বামী-বিয়োগের শোক নয়। সে-সময়ে প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলো তাই সূক্ষ্ম অপরাধচেতন বিড়ম্বনার কারণ হয়েছিল। অনুষ্ঠান হৃদয়ের বস্তু হয়ে উঠতে পারেনি।

অনুষ্ঠানের ছকগুলো শমীই বাতিল করে দিয়েছে। চওড়া কালা-পেড়ে শাড়ি এনে দিয়ে বলেছে, সাদা পরা চলবে না। নিজে জোর করে হাতের দুগাছা রুলি পরিয়েছে, আর গলায় সরু হার, কানে পাথর। বলেছে এ আজকাল সবাই পরে। জ্যোতিরাণী আপত্তি করেননি। আপত্তি করলেই বরং ছেলেমানুষি মিথ্যাচার হত ভেবেছেন।

কিন্তু আজ? অমন উৎসুক মুখে শমীকে ওই কথাগুলো বলতে শুনে আজ কি এই প্রথম নিজেকে বিধবা ভাবতে চেষ্টা করছেন তিনি? বিধবা ভেবে উদ্গত কোনো দুর্বল মুহূর্ত নির্মূল করে দিতে চাইছেন?

দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় বেহুঁশ অবস্থার মধ্যে সিতুর আরো তিন-চার দিন কেটে গেল। যাতনায় আর ওষুধের ঘোরে আচ্ছন্ন। ঘরে কে আসছে কে যাচ্ছে কারা

বসে আছে, ঠিক খেয়াল করতে পারে না। তবে চাউনির ঘোলাটে ভাবটা কেটে আসছে।

সেদিন বড় নিঃশব্দে দুঃসহ একটা আঘাত বুকে চেপে সিতুর ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলেন জ্যোতিরাণী।

সিতু ঘুমুচ্ছিল তখনো। ঘরের মাঝামাঝি পাশের দিকে জ্যোতিরাণী একটা চেয়ারে বসে। রোজ এসে ওই একটি জায়গাতেই বসেন। শিবেশ্বর চাটুজ্যে তখনো আসেননি। সিতুর ওপাশে বিছানার কাছে চেয়ার টেনে কালীদা বসে ছিলেন। শিয়রের দিকের দরজার কাছের টুলে শমী। এই কটা দিন ও আর সামনের দিকে আসছে না; শয্যা থেকে মাথা উঁচিয়ে পিছন দিকে না তাকালে ওকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সেভাবে দেখার সম্ভাবনা আপাতত নেই-ই।

অস্ফুট একটু যন্ত্রণার শব্দ করে সিতু চোখ খুলল। অল্প অল্প মাথা নেড়ে এদিক-ওদিক তাকালো। আচ্ছন্ন ভাব আজ অনেকটাই কম। গলা থেকে মাথা পর্যন্ত শুধু চোখ দুটোই দেখা যায়। আর সব ব্যাণ্ডেজের নীচে।

কালীনাথ সামনে ঝুঁকলেন। সিতু চেয়ে রইল একটু। চিনল বোধ হয়। খুব ধীরে মাথাটা এপাশে সরালো। দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে জ্যোতিরাণীর মুখে এসে থামল। জ্যোতিরাণী উঠে কাছে আসবেন কিনা ঠিক করে উঠতে পারছেন না। সিতু চেয়েই আছে কিন্তু কি দেখছে ঠিক যেন বুদ্ধির গোচর নয়।

তারপরেই কি বুঝি হয়ে গেল। কিছু বুঝি সরাসরি ওর মগজে গিয়ে ধাক্কা দিল। উত্তেজনা স্পষ্ট হয়ে উঠল। চাউনির ঘোলাটে ভাব সম্পূর্ণই কেটে আসছে। যাকে দেখছে ঠিক দেখছে কিনা নিঃসংশয় হবার অস্থির চেষ্টা। নিঃসংশয় হল বোধ হয়। ঘোরালো ধারালো প্রায় হিংস্র হয়ে উঠল বড় বড় দুটো চোখ। উত্তেজনায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাড়তে থাকল। দুই চোখের গভীর থেকে বুঝি নিদারুণ গলিত বিদ্বেষের ঝাপটা এসে লাগল জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর। মুখের যেটুকু আভাস মেলে, অসহ্য উত্তেজনায় তাও বিষম অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

জ্যোতিবাণী অবশ নিস্পন্দ একেবারে। ওই তীব্র তীক্ষ্ণ তপ্ত গলিত বিদ্বেষের ঝাপটা মুহূর্তে যেন পঙ্গু করে দিল তাঁকে। তারপরেও ওই ঝাপটা এসে লাগছেই—লাগছেই। বিদ্বেষ-ভরা এই চোখের চাউনি আগেও বারকয়েক দেখেছেন, দেখে আগেও ধাক্কা খেয়েছেন। কিন্তু সে-ও এত গভীর থেকে এমন উগ্রভাবে ঠিকরে বেরোয়নি। এর যেন শেষ নেই। উত্তেজনায় ওর চাদরে ঢাকা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, পারলে উঠে বসত। শক্তি থাকলে মুখে যা বলত দুটো চোখ দিয়ে তাই বলছে। অফুরন্ত আক্রোশ আর বিদ্বেষের ঝাপটা মেরে মেরে এই ঘর থেকে যেন তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাচ্ছে।

সম্বিৎ ফিরতে সময় লাগল। কোনরকমে চেয়ার থেকে দেহটাকে টেনে তুললেন জ্যোতিরাণী। সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য। পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগোলেন—ওই আঘাতের বিরাম নেই তবু, যতটা সম্ভব চোখ ফিরিয়ে তেমনি করেই যেন চেতনার অস্তিত্ব থেকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছে তাঁকে।

জ্যোতিরাণী বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

কালীদা লক্ষ্য করেছেন সবই। ঝুঁকে সিতুর ব্যাণ্ডেজের ওপর আল্‌তো করে হাত ছুঁইয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু শমী কিছুই বোঝেনি। অতি নিঃশব্দে

কিছু একটা উত্তেজনার কারণ ঘটে গেল এটুকুই শুধু অনুভব করেছে। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে শয্যার দিকে, কালীজেঠুর দিকে আর দরজার দিকে তকালো, তারপর আস্তে আস্তে উঠে সেও বাইরে এলো।

মাসীর এই মুখ দেখে ঘাবড়েই গেছে। ত্রস্তে কাছে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল, কি. হল?

একটা অস্ফুট শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না জ্যোতিরাণী। সামান্য একটু মাথা নাড়লেন শুধু। অর্থাৎ কিছু না।

কালীনাথ বাইরে এলেন। বিব্রত মুখে বললেন, হঠাৎ দেখেছে, তাই একটা ইমোশনাল ব্যাপার কিছু হয়েছে বোধ হয়...

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অস্ফুট স্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, আমি যাচ্ছি।

একটু অপেক্ষা করো না, এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। আমি ওর সঙ্গে দুই-একটা কথা বলি, তারপর তুমি ঘরে এসো।

তাতে ক্ষতি হবে। আমি আর আসব না। আপনি যদি পারেন মাঝে-মধ্যে একটু খবর দেবেন কেমন থাকে।

দ্বিতীয় অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে সিঁড়ির দিকে এগোলেন.। ভিতর থেকে কাতরোক্তি কানে আসতে কালীনাথ তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গেলেন। শমী হতভম্ব মুখে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে শেষে মাসীকে ধরার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

বাইরে এসেই উদগ্রীব মুখে জিজ্ঞাসা করল, আমি তো কিছুই বুঝলাম না, কি হয়েছে বলো তো?

কিছু না। একটা ট্যাক্সি ধর।

ট্যাক্সি কেন ধরতে চায় মাসীর মুখ দেখেই টের পাচ্ছে।—কিছু না তো ওভাবে উঠে এলে কেন? আর আসবে না বললে কেন জেঠুকে?

আমাকে চায় না।

কিন্তু কিছু তো বলেনি, চায় না তুমি বুঝলে কি করে?

বুঝেছি।

তবু বিস্ময়ের অন্ত নেই শমীর। একটু ভেবে বলল, এ-রকম একটা ধকল, রাগ করে হয়ত তাকিয়েছে তোমার দিকে, তা বলে সত্যি তুমি আর আসবে না?

রাগ নয়, আমাকে চায় না। দেখলেও ক্ষতি হতে পারে।...ইচ্ছে হয় তো তুই একা যাস।

শমী ঝাঁজের মুখে বলে বসল, তোমাকে চায় না আর দেখলে ক্ষতি হয়, আমারও সেখানে গিয়ে কাজ নেই—বুঝলে?

হাত তুলে ট্যাক্সি থামালো। মাসীকে আগে তুলে নিজে উঠল। দুজনেই চুপচাপ খানিকক্ষণ। শেষে আবারও মুখ না খুলে পারল না শমী। বলল, কিন্তু সিতুদা তো তোমাকে কিছু বলেনি, তোমার বুঝতেও তো ভুল হতে পারে!

ভুল হয়নি।

শমী চুপ। কিছু না বুঝুক, শুধু এই মুখ দেখেই অনুভব করতে পারে মাসীর ভুল হয়নি।

বিয়াল্লিশ

নাকে মুখে মাথায় বুকে পিঠে কোমরে পায়ে প্রবল বৃষ্টির ধারার মত আঘাত তখন পড়ছিল সেই যন্ত্রণায় শরীরটা কোন এক অতল গহ্বর থেকে ভেঙে দুমড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল বটে, তবু সেই অসহ্য যাতনাটা শুরুতে বিস্ময়কর রকমের অদ্ভুত লাগছিল সিতুর। দিনের খটখটে সাদা আলোর রং বদলাচ্ছিল। চোখের সামনে সব কিছুতে লালের ছোপ পড়ছিল। সেই লাল গাঢ় হয়ে হয়ে শেষে কালোর দিক ঘেঁষছিল। তারপর অন্ধকার একাকার সব কিছু। সৃষ্টিগ্রাসী অন্ধকারের বন্যা। সেই অন্ধকারের সমুদ্রে প্রায় অচেতন অস্তিত্বের মত সে ভাসতে শুরু করেছিল। আর শরীরের রক্তগুলো সব সির্‌সির্‌ সির্‌সির্‌ সির্‌সির্‌ করে নীচের দিকে—পাতালের দিকে নামতে লেগেছিল। কেবল নামছিল, কেবল নেমেই চলেছিল। রক্তেরও শেষ নেই, নামাবও বিরাম নেই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, কতক্ষণ বা কদিনের জন্য ঘুমিয়েছিল জানে না। কিন্তু তারপর সেই অন্ধকার বিস্মৃতির গহ্বরের মধ্যেই অবচেতনার কোনো স্তরে কেউ বুঝি জেগে উঠেছিল। তখন সেই সির্‌সির্‌ অনুভূতিটা আবার ওকে কোন্‌ পাতালের দিকে টেনে নিয়ে চলছিল। ও যেন অসীম উঁচু থেকে খসে প্রবল বেগে নীচের দিকে পড়ছিল। এ পাতালেরও শেষ নেই, তাই পড়ারও বিরাম নেই। অনন্তকাল ধরে কেবল বুঝি পড়বেই!

এই পতনও কতক্ষণ বা কতদিন ধরে চলেছে জানে না। সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেই একদিন বা একসময় মনে হয়েছে সিরসিব্‌ অনুভূতিটা কমে আসছে। আর সে নীচে নামছে না। ওপরেও উঠছে না। কিন্তু একটা ওঠার তাগিদ শুরু হয়েছে। তারপর খুব একটু একটু করে অন্ধকারের রং বদলাতে লেগেছে। খুব একটু একটু করে ফিকে হয়েছে। সাদাটে হয়েছে। শেষে সাদাই হয়েছে।

সিতু চোখ মেলেছে।

চেতনার প্রথম বিমূঢ় বিস্ময়। অনন্ত বিচরণের পর কোথা থেকে কোথায় এসে পৌঁছল ঠাওর করা গেল না।

সাদা আলো চোখে সয়ে আসছিল। কিন্তু জাগলেই যন্ত্রণা। ঘুমুতে চায়। ঘুমোয়। ঘুম ভাঙলে সব আবছা দেখে প্রথম। যা দেখে তার কোন্‌টা সত্যি কোনটা স্বপ্ন ঠাওর করতে পারে না।...জেঠুর মুখ। তারপর এপাশে আর একখানা মুখ। আচমকা উত্তেজনায় মাথায় রক্ত উঠতে থাকে। এ মুখ স্বপ্ন কি সত্য জানে না। স্বপ্ন বা সত্য কোনটাই চায় না। দুই-ই সরিয়ে দিতে চায়।...সরে যাচ্ছে। সরে গেল। তারপরেও অস্বস্তি। অস্বস্তি আর যন্ত্রণা। এক্ষুনি ঘুমুতে চায়। শুধু ঘুম চায়। আর কিছু চায় না।

ঘুমের মেয়াদ কমে আসছে। দেহের যন্ত্রণাও অত অসহ্য নয় আর। মাথা সক্রিয় হয়ে উঠছে। কেন এখানে এসেছে, কেন এখানে পড়ে আছে—সেই বিভ্রম কেটে গেছে। সবই মনে পড়েছে। দেহের যন্ত্রণা কমেছে বটে, কিন্তু কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণা ভিতর থেকে গুমরে গুমরে ঠেলে ঠেলে ওপরের দিকে উঠছে। সেই যন্ত্রণার অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। এক মাস দু মাস কেটে গেল, এই যন্ত্রণা কমা দূরে থাক, বাড়ছেই। আর সেটা বড় নিষ্ঠুরভাবে তাকে হালকা করে চলেছে, শূন্য করে চলেছে। জন্ম থেকেই সে বুঝি কিছু সঞ্চয় করা শুরু করেছিল। ইচ্ছে অনিচ্ছে রাগ আক্রোশ চিন্তা ভাবনা লোভ কামনা

প্রবৃত্তির অজস্র আবেগের সব ফলাফল তার ভিতরে জমছিল। জমে জমে তেইশের শেষে শক্ত নিটোল একটা মূর্তি ধরেছিল। সেটাই তার চরিত্র, সেটাই ও নিজে। ওটা তাকে ক্ষ্যাপার মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, আবেগ যোগাচ্ছিল, প্রেরণা যোগাচ্ছিল, শক্তি যোগাচ্ছিল। ওকে বাদ দিয়ে সিতুর আর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

কিন্তু ভিতর থেকে ঠেলে ওঠা যন্ত্রণার তাপে এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। ওই দুর্বার মূর্তির ইস্পাত-কঠিন জমাট বাঁধুনির ভাঙন ধরেছে। ওটা আকারভ্রষ্ট হচ্ছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে খসে পড়ছে। যেটুকু খসছে তা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। এই করে গত দুই মাস ধরে গোটা মূর্তিটাই যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেল। ভিতরটা নিদারুণ শূন্য, নিদারুণ খালি।

নিস্পন্দের মত পড়ে থাকে। দৃষ্টি সেই দারুণ শূন্যপথে।...ও তাহলে কে? সিতু কে? সাত্যকি চ্যাটার্জি কে? সে কি সদ্য ভূমিষ্ঠ হল? কিন্তু তেইশ বছরের সহজ সাদাসিধে দু-চারটে কথা বলতে পারবে না? দরকার হলে একটু হাসতে পারবে না? বাঁচবে কেমন করে?

ওই শূন্যপথে ডুব দিয়ে দিয়ে থমকেছে হঠাৎ। চমকেছে। দু চোখ বিস্ফারিত। নিজের সেই দারুণ শূন্যতলে বসে আছে একজন। তাকেই দেখছে। সে কোনো সম্বল নিয়ে বসে নেই। অস্তিত্বের শোক নিয়ে বসে আছে। অস্তিত্বের বিপুল শোক।

স্তব্ধ মূক যাতনায় দু চোখ টান করে সিতু তাকে দেখছে।

সেই একজনও সিতুকে দেখছে।

আড়াই মাস বাদে বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু পরস্পরকে দেখার বিড়ম্বনা ঘুচল না। আর বুঝি ঘুচবেও না। সিতু বাড়ি ফিরতে চায়নি। হাসপাতাল থেকে সোজা হাজতে যেতে চেয়েছিল। চেয়েছিল জেল হোক। হলে এই দুর্বহ শূন্যতার কিছু লাঘব হবে বোধ হয়। তাও হল না। পুলিসের দপ্তরে নিজের অনুকূলে একটি কথাও বলেনি। তবু জেল হল না। বাবার টাকার জোরে হল না। আর অপর তরফের এজাহারে অভিযোগ মুছে দেবার চেষ্টার দরুন হল না। সেটা আরো দুঃসহ।

বাড়ির বাতাস আর একদফা বদলেছে। ওকে ঘিরেই বদলেছে। বাবা ঘরে আসে। চুপচাপ বসে থাকে। নয় তো পায়চারি করে। ঘরে তৃতীয় কেউ থাকলে বাবা খুশি হয়। তখন যে কোনো প্রসঙ্গে ঔৎসুক্য দেখাতে চেষ্টা করে। নতুন হবার তাগিদ। নতুন করে শুরু করার চেষ্টা। সেটা কি সিতু ভেবে পায় না? গাড়িটা ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে শুনিয়েই বাবা একটা নতুন গাড়ির অর্ডার দিয়ে রাখতে বলেছে জেঠুকে। কোন্ গাড়ি পছন্দ সিতু বলবে আশা করে তার দিকে তাকিয়েছিল। ওর নামের ব্যাঙ্কের পাসবইগুলো আর যে হাজার কতক টাকা সিন্দুক থেকে নিয়ে শমী-হরণে বেরিয়েছিল, সেই পাসবই আর টাকা হাতে পেয়ে বাবা ওকে দেখিয়ে ঘরের আলমারিতে রেখে গেছে। আরো ঢের বেশি দিতে পারে এবং দেবে সেই প্রশ্রয়ের আভাসও অস্পষ্ট ছিল না একটুও।...শমীকে গাড়িতে তুলতে পারলে বাবা আর এ জীবনে তার মুখ দেখতে পেত কিনা সন্দেহ। নিজের সেই মূর্তি চোখে ভাসতে সিতু শিউরে উঠেছিল। সেই বীভৎস মূর্তিটা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে বটে কিন্তু স্মৃতি থেকে চেহারাটা মুছে

যায়নি। সিতু কি পাগল হয়ে গেছল?...এখনই বা তাহলে কি?

ঘরে জেঠু আসে, ছোট দাদু আসে। এই ঘরটাই যেন তাদের আড্ডার জায়গা এখন। এই আড্ডার মধ্যে ওকেও টানার বাসনা। চেষ্টা করেও সিতু যোগ দিতে পারে না। অর্থহীন প্রলাপ মনে হয়। তারা ভাবছে ও ভয়ানক কিছু খুইয়েছে। খুইয়েছে ঠিকই। চেতনার শুরু থেকে এ পর্যন্ত একটা পাগলামির বোঝা সরে গেছে। এ ধরনের পাগলামির বোঝা চেপে থাকলে শক্ দিয়ে সরানোর ব্যবস্থা আছে শুনেছিল। যার নাম শক-থেরাপী। যা ঘটে গেছে তাতে সত্তাসুদ্ধ প্রচণ্ড নাড়া-চাড়া খেয়ে ওই বোঝাটা ঝেড়ে ফেলেছে। আবার ওকে তার মধ্যে ফেরাতে চায় কেন এরা? ওর ভিতরের যে মূর্তিটা বাষ্প হয়ে মিলিয়ে গেছে সেই গোছের ছোটখাটো একটা করে মূর্তি এদের মধ্যেও বাসা বেঁধে আছে নাকি? তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে সিতু দেখে নিতে চেষ্টা করেছে। এই চাউনিটাই আবার অস্বাভাবিক ঠেকেছে ছোট দাদু আর জেঠুর চোখে। সিতু বুঝতে পারে বলেই হাসি পায়। যে প্রবল অনঢ় মিথ্যাটা সরে গেছে তার জন্যে একটুও ক্ষোভ নেই, খেদ নেই। তার হতাশা অন্য কারণে। তেইশ বছরের এই জীবনটা তন্ন-তন্ন করে দু পায়ে উঠে দাঁড়াবার মত এতটুকু সঞ্চয়, এতটুকু সম্বল চোখে পড়ছে না বলে।

কিন্তু কি সেটা? কি চায়? কি পেলে সেটা সম্বল ভাবতে পারত, সঞ্চয় ভাবতে পারত? অন্তস্তলে ওই যে একজন চেয়ে আছে তার দিকে—চেয়েই আছে, কি পেলে তার শোকার্ত দেউলে দৃষ্টিটা মুছে যাবে? কোন্ সম্বল পেলে সে উঠবে, দাঁড়াবে, কাছে এসে তার হাত ধরবে—তার সঙ্গে মিশে যাবে?

সিতু কেবল ভাবে ভাবে আর ভাবে। যত ভাবে ততো হতাশা। ততো রিক্ত দেউলে মনে হয় নিজেকে। নিজের নিভৃতের ওই অসহায় পঙ্গু সত্তার পুষ্টির রসদ সে খুঁজে পায় না। অজ্ঞাতে কখন তার হাহাকার সিতুর নিজের হাহাকার হয়ে ওঠে।

তার মাথার মধ্যে যেন বিশ্লেষণেব কল বসে গেছে একটা।...ঠিক কোন্ শক্তিতে নিজেকে পুষ্ট করে তুলতে পারলে এ-রকম হত না? বাবার প্রতিভা ছিল। মায়ের প্রবল শক্তি ছিল। সেই প্রতিভা আর শক্তি থেকে তার জন্ম। ওই পাগলামির বোঝা গোড়া থেকে ছেঁটে ফেলা সম্ভব হলে হয়ত বাবার থেকেও অনেক বড় অনেক সফল একজন কেউ হয়ে বসতে পারত। তাহলে কি হত?

নিজের নিভৃতে চোখ চালিয়েছে তক্ষুনি। না, অসহায় পঙ্গুর মত যে বসে আছে সে বসেই আছে—এই সার্থকতাও তার শক্তির রসদ নয়, পুষ্টির রসদ নয় একটুও।

কিন্তু বিশ্লেষণের শেষ নেই। ঘুম কমে আসছে, আহারে রুচি নেই, বিশ্রাম মৃত্যুর মত, তবু কোথাও ছুটে বেরুনোর তাগিদ নেই।

এরই মধ্যে যখন মেঘনা আসে, বসে, ভালো কথা বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মন্দ কথাই বেশী বলে, আর শেষ পর্যন্ত কান্না লুকোবার জন্য উঠে পালায়—তাকে একটু কাছের মানুষ মনে হয় সিতুর। সেদিন এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল। পরের সংসারের বেগার বোঝা ওর মাথায় চাপানো হয়েছে বলে মায়ের উদ্দেশে গাল-মন্দ করে উঠে মেঘনা হঠাৎ তার সামনেই কেঁদে ফেলেছিল। সিতু ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘনাকেও দেখেনি, নিজেকেও না। তারও নিভৃতে যে একজন বসে আছে তাকে দেখেছিল। মনে হয়েছিল অদ্ভুত তৃষ্ণার্ত দু চোখ মেলে সে মেঘনাকে দেখছে, মেঘনার বুকের ভিতরে

ঢুকে গিয়ে সেখানে হারানো কাউকে আবিষ্কার করতে চাইছে।

বাড়ি ফেরার পর সেই প্রথম নাড়াচাড়া খেয়েছিল সিতু। ভিতরে যে বসে আছে তাকে ভুলতে চেয়েছিল, নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলে আবার উঠে দাঁড়াতে চেয়েছিল।

পারেনি। আরো দেউলে হয়েছে। আরো হতাশার মধ্যে ডুবেছে।

সিতু আড়াল চায়। চারদিকের দরজা জানলা বন্ধ করে শুধু ভাবতে চায়, ভাবনার জাল ফেলে ফেলে হতাশার আবর্ত থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে চায়। কিন্তু কি ভাবে, কি বিশ্লেষণ করে, ক্ষণে ক্ষণে ভুল হয়ে যায়। তখন আবার নতুন করে আরো নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গতার বিবরে ঢোকার তাগিদ।

এই বিবর থেকে হয়ত বেরিয়ে পড়তই একদিন। তবু বেরুবার প্রত্যক্ষ কারণ ঘটল একটা। নিঃসঙ্গতা ঘুচল না, শুধু বিবরের আশ্রয়টুকুই গেল।

বেলা তখন দেড়টা-দুটো হবে। হন্তদন্ত হয়ে দরজা ঠেলে মেঘনা ঘরে ঢুকল। হাসির সঙ্গে চাপা উত্তেজনা।—ও ছোট মনিব, ওঠো ওঠো, কে এসেছে বলো দেখি?

অনুমান করা গেল না, কে। সিতুর মুখে বিরক্তির ছায়া ঘন হতে থাকল। মেঘনা তাড়াতাড়ি বলল, শমী—শমী এসেছে! সেই এতটুকু ফ্রক-পরা মেয়ে, এত বড়টি হয়েছে, এমন সুন্দর হয়েছে, আমি কি জানি! নিজে নাম বলতে তবে চিনলাম।...তা এখানেই ডাকি?

ডাকতে হল না। শমী নিজেই উঠে এসেছে। মেঘনা অনুমতি পাবার আগে তাকে দোরগোড়ায় দেখা গেল। চোখ থাকলে সিতু অনুভব করতে পারত, অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব আর মানসিক বাধা ঠেলে শমী এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে—আসতে পেরেছে। আস্তে আস্তে সিতু উঠে বসেছে, দেখছেও, কিন্তু চোখ নেই।

পাঁচ মাস আগে, সেই অঘটনের দিনে কোন্ দিক থেকে কে একজন তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে বসেছিল। ওকে দেখামাত্র আচমকা ঠিক সেখানটায় একটা যাতনা বোধ করল, সেখান দিয়ে বুঝি ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ হয়ে গেল এক প্রস্থ।

অনেকখানি প্রস্তুতির পরে আসা, ডাকের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে না থেকে শমী পায়ে পায়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল। কি করবে ভেবে না পেয়ে মেঘনা তাড়াতাড়ি ঘরের কোণ থেকে চেয়ারটা টেনে আনল। তারপর ব্যস্তসমস্ত মুখে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

শমী বসল।

এবারে সিতু কি করবে? প্রাণপণে চেষ্টা করলেও ওর চোখের সামনে থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারবে না? ও চেয়ার ছেড়ে আবার না ওঠা পর্যন্ত ব্যর্থ চেতনা তো আছে। এই চেতনাসহ সদ্য-ভূমিষ্ঠ হলে সে দাঁড়াবে কোন্ সম্বল নিয়ে?

এ সময়ে কোথা থেকে?

য়ুনিভার্সিটি থেকে।

এম. এ. পড়ছ?

হ্যাঁ।

এত তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল?

ছুটি করে নিয়ে এলাম।

কেন?

দেখতে।

কি দেখতে?

এই প্রশ্নটাই শুধু সংযমের সুরে ব্যাঘাত ঘটালো একটু। শমী চুপচাপ চেয়ে রইল তার দিকে।

সিতু হাসতে চেষ্টা করল।—কি দেখছ, তোমার ওই চিবুকের দাগ থেকে এই মুখে অনেক বেশি দাগ পড়েছে?...হঠাৎ কি দেখতে এলে?

কথাবার্তায় একটু আগের সুরটা বজায় রাখার চেষ্টা শমীর।—জেঠু বলছিল, হাসপাতাল থেকে ফেরার পর এই কমাসের মধ্যে একদিনও বাড়ি থেকে বেরোওনি?

আর কি বলেছে? সিতুটা পাগল হয়ে যাচ্ছে বলেনি?

তার দিকে চেয়ে থেকে শমী সামান্য মাথা নাড়ল। বলেনি।

তা তুমি হঠাৎ এলে কেন, আমাকে বাড়ি থেকে বার করার ইচ্ছে?

শমী নিরুত্তর।

সিতু চেয়ে আছে। সে কি উন্মাদের মত কাণ্ড করেছিল একদিন, আর তারপরেও এই মেয়ের আসাটা কত বড় ব্যাপার, তা একবারও মনে এলো না। তার ক্ষিপ্ত নৃশংস হাতের মুঠো থেকে ছুটে পালানোর তাড়নায় দু-দুবার যে ত্রাস আর আতঙ্ক দেখেছে এই মুখে, নিজে সে এই দুপুরে ঘরের দোতলায় এসে হাজির হয় কেমন করে তাও ভাবল না। বাস-স্টপে গাড়ি থামিয়ে পরিপুষ্ট রমণীদেহের সৌষ্ঠব তার চোখে আর শিরায় শিরায় যে গ্রাসের নেশা জাগাত—সেই সব কিছু নিয়েই সে তার কাছে বসে আছে। সিতু দেখছে, কিন্তু তার চোখ টানছে না। গ্রাসের নেশা জাগছে না। সে শুধু এই আসার মধ্যে, এই বসার মধ্যে, টুকটাক কথার মধ্যে, এমন কি এই চেয়ে থাকার মধ্যেও আর একজনের স্নেহের পুষ্টি দেখছে। স্নেহের প্রলেপ দেখছে। এই স্নেহের যোগ প্রায় নাড়ির যোগের মত মনে হচ্ছে তার।

তুমি এখানে নিজে এসেছ না আর কেউ পাঠিয়েছে?

এক মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে শমী জবাব দিল, নিজেই এসেছি...মাসী তো এখন স্কুলে।

কেউ তাকে পাঠায়নি বটে, কিন্তু সে যে আসবে এখানে মাসী জানে। সেটুকুই এড়িয়ে গেল।

সিতুর দুই চোখ শমীর মুখের ওপর ঘোরালো হয়ে বসছে।—আমি তাহলে এখন তোমাদের দয়ার পাত্র, খুব করুণার পাত্র হয়ে উঠেছি—দেখতে আসতে আর ভয় পাও না?

সুর চড়েনি, কিন্তু ধার বাড়ছে। সেই সঙ্গে চাউনিও বদলাচ্ছে দেখে শমী সক্রিয় হয়ে উঠল একটু। বলল, ভয় পেয়ে কত বড় ভুল করেছি দেখতেই তো পাচ্ছি।

কি ভুল? সিতুর চোখের ধার বাড়ছেই।

কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখ রেখে শমী ফিরে জিজ্ঞাসা করল, গাড়িতে টেনে তুলে তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলে?

জাহান্নমে।

শমী আস্তে আস্তে বলল, তাহলেও সঙ্গেই যখন ছিলে অতটা ভয় পেয়ে ভুল করেছি।

বিড়বিড় করে সিতু বলল, ভুল সেদিন করোনি, ভুল আজ করছ। সেদিনের

সে লোকটা মরে গেছে, একেবারে মরে গেছে...বুঝলে?

শমীর দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু চোখ দুটো যেন তার ভিতর দিয়েই তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। শমী ভিতরে ভিতরে ঘাবড়েছে একটু। তবু জোর দিয়েই বলতে চেষ্টা করল, সেটা অত সহজ নয়।

দূরের থেকে আবার কাছে ফিরল যেন সিতু। শান্তমুখে জিজ্ঞাসা করল, আমাকে দেখা হয়েছে?

এখন যেতে বলছ?

সিতু নিরুত্তর।

শমী চেয়ার ছেড়ে উঠল তক্ষুনি।—আবার আসি তাও চাও না বোধ হয়?

কে চাইবে?...যে চাইতে পারত, সে থাকলে আজও তুমি সাহস করে এভাবে আসতে পারতে না। সে নেই। যে আছে সে বাঁচার রাস্তা খুঁজছে। সে এত দুর্বল যে, তোমাদের দয়া আর করুণার আঘাত তার সহ্য নাও হতে পারে।

আরো কয়েক নিমেষ চেয়ে থেকে শমী নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ঘোরানো বারান্দার মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল একবার। চারদিকে দেখল। পিছন ফিরেও তাকালো একবার। এখানে শেষ এসেছিল ন-দশ বছর আগে, এগারো বছর বয়সে। আর কাকুর হাত ধরে প্রথম এসেছিল সাত বছর বয়সে। বাপ-মা ছেড়ে আসার দুর্বোধ্য একটা শোক বুকের তলায় গুমরে মরছিল যখন। ন-দশ বছর বাদে এখানে ঢোকামাত্র মনে হয়েছে, এটা সেই বাড়ি যেখানে আসতে না পারলে সেদিনের ছোট মেয়েটা কুঁকড়ে মরে যেত। আজও মনে হল এ-বাড়িটা তার কাছে তীর্থক্ষেত্রের মত। আর মনে হল, মাসী এখন তার খুব কাছে, ফ্ল্যাট বাড়ির একই ঘরে তার সঙ্গে থাকে বটে, কিন্তু ঠিক সেই মাসীকে সে যেন আর পায়নি। আজও মাসী বুঝি এখানকার এই শূন্যতার মধ্যে অনেক বেশি ছড়িয়ে আছে। যেন যে-কোনো ঘর থেকে বা যে-কোন কোণ থেকে বেরিয়ে এসে এখনো হাসিমুখে বলতে পারে, কি রে, এলি? খুব রাগ হয়েছে বুঝি মাসীর ওপর?...যে হাসি দেখলে শমীর চোখ জুড়োতো, মন জুড়োতো, বুক জুড়োতো।

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঈষৎ দ্রুত সিঁড়ির দিকে এগলো। একজন প্রকারান্তরে তাকে তাড়িয়েই দিল। আর যাতে না আসে ঘুরিয়ে তাও প্রায় স্পষ্ট করেই বলে দিল। দিক—এখনো তাকে প্রকৃতিস্থ ভাবতে রাজী নয় শমী। আসার সময় যেটুকু সঙ্কোচ ছিল, এই মুহূর্তে তাও নেই। যে যাই বলুক, এই বাড়িটার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘুচে গেল, এ সে কিছুতেই মেনে নিতে রাজী নয়। এই চিন্তাটাকে সে আমল দিতেও রাজি নয় যেন। সময় হলেই আবার আসবে, তাকে আসতে হবে—ঠেকাবে কে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ভিতরটা বুঝি দ্বিগুণ দেউলে, দ্বিগুণ রিক্ত হয়ে গেল সিতুর। দেহের প্রাচুর্য আর বুকের তলার প্রাচুর্য নিয়ে শমী এসেছিল তার কাছে। ভর-ভরতি একটি মেয়ে। যত বড় আঘাতের উপলক্ষ হয়ে বসেছিল, তার সবটুকু মুছে দেবার মত উদার হবার তাগিদ নিয়ে এসেছিল—এত সুস্থ, এত সরল ও। কিন্তু যার কাছে এসেছিল, তার ভিতরের নিঃস্ব পঙ্গু মূর্তিটা দেখেনি। ও চলে যাবার পর প্রায় হিংস্র আক্রোশে নিভৃতের সেই মূর্তির দিকে তাকিয়েছে সে, আঘাত দিয়েই তাকে সজাগ করে তুলতে চেয়েছে। অনুক্ত স্বরে বার বার শাসিয়েছে তাকে, দয়া চাও? করুণা

চাও? কি চাও?

চায় না, চায় না। সিতু জানে—চায় না। ওই পঙ্গুমূর্তির যত ক্ষোভ আর যত অভিযোগ আর যত নির্ভরতা তারই ওপর। তার তেইশ শেষের এই নিষ্ফল অস্তিত্বের ওপর। সে নিঃস্ব বলেই ও নিঃস্ব, সে দেউলে বলেই ও দেউলে। সে এত ব্যর্থ বলেই ওর এত হাহাকার।

সিতু ভাবে, ভাবে আর ভাবে। ভাবনা খুঁড়ে খুঁড়ে শক্তির উৎস খোঁজে। আবার এই ভাবনার থেকে মুক্তি পাওয়ার তাগিদেই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে শুরু করে। বেরুতে শুরু করার পর ফেরার সময়ের ঠিক থাকে না। পথ-চলতি মানুষের মুখগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে, ট্রাম-বাসের মুখগুলো খুঁটিয়ে দেখে। মনে হয়, প্রত্যেকের ভিতরে একটা করে জোরালো ভাবনা যন্ত্র বসানো। সেটাই তাদের ঠেলছে টানছে ঘোরাচ্ছে ফেরাচ্ছে। তবু সিতুর সঙ্গে সকলের এত তফাত কেন? এরা কি একজনও তার মত জ্বলছে পুড়ছে হাহাকার করছে? বোধ হয় না। ভাবনার যন্ত্রটা সঙ্গোপন নিভৃত থেকে কে ঘোরাচ্ছে, তার সঙ্গে বোধ হয় মুখোমুখি দেখা হয়নি এদের কারো। সেটুকুই ওপরঅলার আশীর্বাদ বোধ হয়। এইখানেই তফাত ওর সঙ্গে।

দিন যায়, একটা দুটো করে। সিতুর বিশ্লেষণ বেড়েই চলেছে। বিশ্লেষণের জাল ফেলে ফেলে নিজেকে উদ্ধার করার অবিরাম চেষ্টা। অথচ উদ্ধারের বদলে ওই জালে ক্রমশ আটকে পড়ছে। স্নায়ুর সঙ্গে স্নায়ুর অবিশ্রান্ত জটলা চলছে। সিতু টের পায়, ভাবে এটাই আবার এক ব্যাধি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তক্ষুনি সঙ্কল্প করে আর ভাবনা নয়, আর বিশ্লেষণ নয়। শূন্যতার ঘাটতি পূরণের অন্য রাস্তা দেখতে হবে। এভাবে হবে না। অন্য রাস্তার খোঁজে পরমুহূর্তে সেই একই তপ্ত দুর্বোধ্য বিশ্লেষণের জালে আটকা পড়ে যায়। সেই জাল ছিঁড়ে আবার ওঠার তাগিদ, উঠে আবার নতুন করে জাল বোনার তাগিদ।

হঠাৎ আত্মস্থ হল একদিন। দৃষ্টিটা নিজের গভীরে চালান করে দিয়ে দেখল। সেখান থেকে হতাশার বাষ্প তেমনি উঠছে, শূন্যতার হাহাকার তেমনি শোনা যাচ্ছে। —অথচ যাকে সে উদ্ধার করবে সেই আহত সত্তাটাকে ভালো দেখা যাচ্ছে না আর। এই ভাবনা আর বিশ্লেষণের বোঝার তলায় সে চাপা পড়ে গেছে, আরো তলিয়ে গেছে। আরো বেশি গুমরে উঠছে।

সিতু থমকেছে। তক্ষুনি মনে হয়েছে মাথাটা তার ঠিক রাস্তায় চলছে না। সর্বদা এত অস্বাভাবিক ভারী কেন মাথাটা? শিরার ভিতরে সর্বক্ষণ অমন দপদপ করে কেন? রাতে ঘুম নেই কেন? আর যেটুকু ঘুমোয়, তার মধ্যেও যে হিজিবিজি ব্যাপারটা চলতে থাকে—সেটা কি? ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়তে অবাক। একষট্টি সাল! ষাট সাল কবে গড়ালো, একষট্টি সালই বা কবে এলো? শুধু আসেনি, একটু হিসেবে তলিয়ে মনে হল জানুয়ারীর গোটা দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। তাই খবরের কাগজে একষট্টি সালের তৃতীয় সপ্তাহের তারিখ একটা।...এই জানুয়ারীর কবে যেন তার জন্মদিন। মনে পড়ছে না কেন? তার সাত্যকি চ্যাটার্জি নামটা মনে আছে তো? কেন মনে পড়ছে না? বয়েস কত হল তাহলে...চব্বিশ? কিন্তু কবে জন্মদিন?

তারিখ মনে করতে গিয়ে চকিত মনে উদয় হল কি।...চুলোয় যাক জন্মদিন, না জন্মালে কি হত? আদৌ না জন্মালে? আরো কবে যেন এই রকম ভেবেছিল,

কিন্তু না [illegible] এত বড় হয়ে ওঠেনি। সঙ্গে সঙ্গে ও কি [illegible] ইশারা উঁকিঝুঁকি দিয়ে [illegible] নিদারুণ হতাশা, ওই হাভগুভানো ব্যর্থতা আর শূন্যতা থেকে [illegible] ইচ্ছে করলেই তো এই যন্ত্রণার থেকে অব্যাহতি [illegible] পারে। [illegible]র ওপর তার হাত ছিল না। কিন্তু সেটা [illegible] আছে। [illegible] টেনে দিলে। একেবারে [illegible]

না! না-- না।

[illegible]ভের সময় [illegible] এক প্রচণ্ড [illegible] আচমকা [illegible] সেখানটা [illegible] উঠে আসছে। তারপর সোজা [illegible]

[illegible] দীর্ঘকালের জমাট-বাঁধা এক খ্যাপা [illegible] কিন্তু সেই নির্দয় নির্মম আঘাত বুক পেতে [illegible] যে তার এই দেহটাকে আশ্রয় করে আছে [illegible] একেবারে সর্বনাশী আঘাত হানার লালসার [illegible] আঘাত সে-ই শুধু অনুভব করতে [illegible]

[illegible] মাথা নাড়ছে অল্প অল্প। অস্ফুট [illegible] না [illegible] সে করবে না [illegible]

[illegible] কি করছে।

[illegible] লোকের [illegible] বিশেষ, [illegible] শামুকে [illegible] বুঝি কয়েক [illegible] আবার [illegible] পরামর্শ চলেছে একটা [illegible] নায়ে মাথা [illegible]। কি পরামর্শ [illegible]

[illegible] চলছিল। কি কথা, কোন পরামর্শ [illegible] করা [illegible] দুই পিছন ফিরে তাকিয়েছিল। [illegible] লক্ষ্য [illegible] লক্ষ্য করুক না করুক, [illegible] ঘুরে [illegible]।

ভোলা! [illegible] করেই ডেকে উঠল [illegible]।

ভোলা [illegible] থেকে আড়াল নেবার ফুরসত পেল না, [illegible] শক্তি থাকল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল সে।

পায়ে পায়ে সিতু তার সামনে এসে উপস্থিত হল। দেখল [illegible] করে। বিবর্ণ ভয়চকিত মুখ দেখে হেসে ফেলার দাখিল।-- এই কাম [illegible] চলছে?

ভয়ের চোটে ভোলা দু হাত জোড় করে ফেলল।

এ হুকুম তোকে কে দিয়েছে, জেঠু না বাবু?

মা-মামাবাবু।

সিতুর মনে হল ব্যাটা সেয়ানা, মিছে কথা বলল।—আচ্ছা, আয় বসি এখানে। ঘাসের ওপর নিজেই আগে বসে পড়ল।—বোস না, অত ভয় পাওয়ার কি হল তোর?

ভয় পেয়ে অদূরে গুটিসুটি হয়ে বসল ভোলা।

চিনেবাদাম খাবি?

মোলায়েম আপ্যায়ন শুনে আর হাসিহাসি মুখ দেখে ভোঁলা খাবি খাচ্ছে। মাথা নাড়ল, খাবে না। খাবে বললে বাদাম গলায় আটকাবে ভাবছে।

সিতু আবার একটু চেয়ে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আমাকে ভয় করিস খুব?

ভোলা তক্ষুনি মাথা নাড়ল, করে।

কেন? আমারও তো তোর মতই দুটো হাত, দুটো পা একটা মাথা—বেশি কি আছে, ভয় করিস কেন?

সাহস সঞ্চয় করে ভোলা জবাব দিল, আপনি যে মনিব।

ও...। সিতু ভাবল কি অন্যমনস্কের মত।—যা পালা, যে তোকে পাঠিয়েছে তাকে বলিস দাদাবাবু বলেছে আর এ কাজ করতে হবে না।

হাতের মুঠোয় প্রাণ ফিরে পেয়ে ভোলা চলে গেল।

মনিবের এই নতুন ভূমিকা দেখে সিতু নিজেও অবাক। হাসছে।

বাড়ি ফিরে গাইড হাতড়ে নামকরা একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের ঠিকানা বার করল। মাথার চিকিৎসা তারাই ভালো করে শুনেছিল। তাছাড়া এই চিকিৎসা গোপন রাখা সহজ। আগে সুস্থ হতে হবে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। তার আগে আর কোনরকম ভাবনা-চিন্তার ধারে কাছে ঘেঁষবে না।

ডাক্তার দেখালো। কি চিন্তা হয় আর কোন ব্যাধির আশঙ্কা করছে খোলাখুলি বলল। ওষুধ নিয়ে ফীস গুনে দিয়ে ভাবী নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরল। তিন-চার দিন নির্দেশমত ওষুধ খেল, সময়মত খাওয়া-দাওয়া করল। শরীর বাগাতে হলে একটু পরিশ্রম করা দরকার। পরিশ্রম করার তাগিদে পাচ মাইল সাত মাইল দশ মাইল করে হাঁটল। তার পরিশ্রমটা ঠিক মনের মত হয় না। আর হলেই বা কই? সকালে উঠে দেখে ফুটপাথের মানুষ ইঁট মাথায় দিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে- আর নরম গদিতে শুয়ে তার কেন ঘুম হয় না।

হোমিওপ্যাথির ওপর তিন-চার দিনের বেশি আস্থা থাকল না। আপাতত শরীর সারানোর সমস্যাটাই সব থেকে বড়।...কবিরাজী চিকিৎসা করাতে পারলে কাজ হত। তার অনেক ঝামেলা। কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ে নিজেই পেটেন্ট ওষুধ বাছাই করল। কিনেও আনল। আবার তিন চার দিন খেতে খেতে সব নিয়ে রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এলো।

এরপর নিজেকে সে একদিন আবিষ্কার করল কালীঘাট মন্দিরে আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে। অনেক লোক। মেয়ে-পুরুষ। আসছে যাচ্ছে পড়ছে উঠছে। একটু নিরিবিলিতে বসে চোখ বুজে জপ করছে কেউ। আর প্রার্থনা তো সকলেই করছে।

সিতু বিগ্রহ দেখছে, মন্দির দেখছে না। মানুষগুলোকে দেখছে। তার কেবল মনে হচ্ছে প্রার্থনার নামে জপের নামে সকলে দুঃখ জমা দিচ্ছে। কেউ দুঃখ [illegible] কেবল দুঃখ জমা দিতে আসছে, জমা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু জমা দিয়ে কেউ

বুঝি খালিহাতে ফিরছে না। আবার দুঃখ নিয়েই ফিরছে। আশার দুঃখ, চাওয়ার দুঃখ।

সিতুর জমা দেবার কিছু নেই। সে কেবল জানতে চায় জীবনটা এরকম হয়ে গেল কেন। গোড়া থেকে কিভাবে শুরু করতে পারলে ও এ-রকম নিঃস্ব দেউলে হত না। ভিতরে ওই রকম গুমরে কাঁদে কে? কি পেলে তার কান্না থামে?

কাতারে কাতারে লোক এসে কার পায়ে এভাবে ধরনা দিচ্ছে? কে সে? কেমন ধারা? সে কি দুঃখ দেবার আর দুঃখ টেনে নেবার মালিক? সে কি ভোলার মনিবের মত মনিবগোছের কেউ যে, ইচ্ছে হলে দুঃখ দেবে আবার ইচ্ছে হলেই দুঃখ দূর করবে? ভোলার মুখ দেখে সেদিন মনে হয়েছিল মনিব তুষ্ট থাকলে দুনিয়ার সব ভাবনার অবসান্।...সিতুরও মনিব আছে কেউ?

ঘোড়ার ডিম আছে। নিজেকে দিয়েই জানে, মনিব মানে খেয়ালে রুষ্ট, খেয়ালে তুষ্ট। ভোলাটা ভীতু। অমন মনিবের দেখা পেলে সে খেয়ালপনা ঘুচিয়ে ছাড়ত। হঠাৎ অবাক লাগছে সিতুর। ভিতরটা কেমন হাল্কা হাল্কা, সেদিকে চোখ চালালো। ভিতরের যে অবিচ্ছেদ্য অশান্ত মূর্তিটা কেবল হাহাকার করে আর কেবল হতাশা ছড়ায়, তাকে দেখা যাচ্ছে। তার মুখে আশার আলো, তুষ্ট মনিব দেখে ভোলার মুখখানা যেমন দেখেছিল, ঠিক সেই রকম। মনিব তুষ্ট হলে এরও যেন সব ভয়-ভাবনা ঘোচে। ওর মত অসহায়ের ভার নেবার আর যেন কেউ কোথাও নেই।

যত পাগলের কাণ্ড।

এই রাস্তা মাড়ানো ছাড়ল সিতু। কিন্তু ভিতরের ওই অবুঝ থেকে থেকে এক তুষ্ট মনিবের ডাক শোনার ইশারা যোগাতে চেষ্টা করছে তাকে।

অগত্যা সিতু বইপত্র যোগাড় করল কিছু। এই মনিবের কথা বলে এমন বই। খুব মন দিয়ে পড়া শুরু করেছিল, শেষে বিরক্ত হয়ে সব ঠেলে সরিয়েছে। নীরস নীতি আর তত্ত্বের বোঝা সব। আর মনিবের অনুগৃহীতরা যেন ম্যাজিসিয়ান এক-একজন।

সিতু কাগজ পড়ে না, কোনো খবরও রাখে না। কিন্তু সেইদিনের খবরটা কদিন আগে থেকেই বাতাসে ছড়িয়েছিল। তবু সে খবরে সিতুর একটুও আগ্রহ ছিল না। কদিন ধরে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া আর বিশ্লেষণ আবার চরমে উঠেছে। খরখরে লালচে মুখ, চোখে নিষ্ফল খোঁজার তাপ, খোঁজার তৃষ্ণা। কি খুঁজছে জানে না, শুধু খুঁজেই চলেছে।

দক্ষিণ থেকে উত্তর কলকাতার মাঝামাঝি হেঁটে চলে এসেছিল। তারপর পায়ে পায়ে বাধা। লোকের ভিড়। খানিক বাদে এক পা এগনো দায়। লোকে-লোকারণ্য। ফুটপাথে নয়, রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। রাস্তার ধারের বাড়িগুলোর একতলা দোতলা তিনতলার ছাদ কার্নিশ মেয়ে-পুরুষে ছেয়ে গেছে। রাস্তায় একটিও লোক নামতে দিচ্ছে না, পুলিস পাহারা দিচ্ছে।

রাণী আসছে। ইংল্যাণ্ডের রাণী। কলকাতার রাণীদিন এটা।

সিতুও দাঁড়িয়ে গেল। রাণী দেখবে।...রাণী কি সুখী?

রাণী আসছে, আসছে! জনতার উল্লাসে আকাশ ভরাট হয়ে গেল। ওই রাণী আসছে। ওই যে গাড়িতে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে জনসমুদ্রের শুভেচ্ছা নিতে নিতে আর হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাতে জানাতে এগিয়ে আসছে।

সিতুও রাণী দেখছিল। কিন্তু চোখের সামনে হঠাৎ এ কি কাণ্ড হয়ে গেল তার?

এ কাকে দেখছে?

...কবে যেন ছোট দাদু এক রাণীর গল্প বলেছিল। মনে পড়েছে, স্বাধীনতার দিনে বলেছিল। সেই রাণীর সঙ্গেই নাড়ির যোগ এই রাণীর। কিন্তু এই রাণীকে দেখতে গিয়ে সেই রাণীকে মনে পড়ে গেল সিতুর। আর তার নটি ফাঁসির আসামীকে ক্ষমা করার সেই গল্প।...সিতুর মনে আছে, শুধু ও নয়, শুধু জেঠু নয়—দরজার কাছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে আর একজনও সেই গল্প শুনছিল। কান দিয়ে, চোখ দিয়ে, মন ঢেলে দিয়ে গল্প শোনার পরের সেই মূর্তি।...ফ্যাল ফ্যাল করে ছোট দাদুর দিকে চেয়েছিল --মাথা থেকে তার শাড়ির আঁচল খসে পড়েছিল...লালচে মুখ...কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ।

রাণী মুছে গেল, জনতা মুছে গেল, শুধু সেই মুখখানাই জ্বলজ্বল করে উঠল সিতুর চোখের সামনে। সিতু তাকেই দেখছে, নিজের অগোচরে হাসছে একটু একটু। ...সেও রাণীর মতই।...রাণীর থেকেও বেশি।...জ্যোতিরাণী।

হঠাৎ পাগলেব মত ভিড় ঠেলে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল সিতু। নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে ছোটার তাড়না। কেউ ভুরু কোঁচকালো, ধাক্কা খেয়ে কেউ কেউ গালাগালও করে উঠল। সিতু ভ্রূক্ষেপও কবল না। ধ্বংসের মতই কোনো সর্ববিস্মৃতির আগুনের সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার তাগিদে শুধু ছুটে বেরুতে চায় সে।

নিরিবিলিতে এসে হঠাৎ ঠাণ্ডা খানিকক্ষণ। বাড়ি ফিরল, আরো ঠাণ্ডা। ঘণ্টা দুই নিঃশব্দে কাটল। নিশ্চল, ঠাণ্ডা।

সন্ধ্যা হয়-হয়। আলমারি খুলে কিছু টাকা নিল। কত টাকা গুনে দেখল না। পাঁচশ সাতশ যাহোক কিছু হবে। ছোট ব্যাগে দুটো কাপড় দুটো জামা আর একটা চাদব পুরে নিল। আব কিছু না। কি ভেবে প্যাড টেনে এক লাইন চিঠিও লিখল।

—কেউ কিছু ভেবো না, ভালো থাকাব চেষ্টাতেই বেরুলাম।—

সিতু।—

খামে পুরে ওটা আলমাবির গোছা গোছা নোটের ওপরে রেখে দিল। খোঁজ পড়লে কেউ না কেউ আলমাবি খুলবে। পারেও। ভাবাতে কাউকে চায় না। একটু অবকাশ চায় শুধু।

বাইবের বাতাস এই প্রথম বুঝি দু হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো তাকে।

স্মৃতিব গণ্ডির ওধারে পা না ফেলতে পারলে মুক্তি নেই। এই গণ্ডি ছাড়াবার জন্যে কোথায় কত দূরে যেতে হবে, সিতু জানে না।

তেতাল্লিশ

টানা সাড়ে তিন বছরের যবনিকাটা আবার সরবে বলেই একেবারে নিঃশেষে হারিয়ে গেল না।

মনিবের ডাক শুনেছে? জানে না।

মনিবের ডাক কানে এলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না, যেমন ভোলা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর, ডাকটা অদৃশ্য থেকে এলে সেটা অনুসরণ করে পড়ি-মরি করে ছুটতে হয়। সিতু ডাকের মালিককে দেখেনি, ডাকও

শোনেনি বোধ হয়। কিন্তু তার ভিতরে যে-একজন বাসা বেঁধে আছে, বার বার সে-ই তাকে চমকে দিয়েছে। সিতু অবাক হয়ে দেখেছে, তার ভিতরের ওই একজন নিষ্প্রভ নির্জীব পঙ্গু হয়ে বসে নেই আর। উল্টে সে-ই তাকে উৎসাহ যোগাচ্ছে, প্রেরণা যোগাচ্ছে, তাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর থেকে থেকে বলে উঠেছে, ওই শোনো, মনিব ডাকল। কখনো বলছে দেখো দেখি, মনিব ডাকছে! তারই ইশারায় শোনার জন্য দিকে দিকে ছুটেছে, তারই ইঙ্গিতে দেখার জন্য যেখানে সেখানে দাঁড়িয়েও গেছে।

কখনো নিঃসীম মৃত্যুর গভীরে ডুব দিয়ে, কখনো বা জীবনের স্রোতে ভেসে ভেসে, আর কিছু না হোক সিতু নিজেকে হারানোটা প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিল। অচেনা জনারণ্যের মধ্যে হারিয়েছে, ধূসর পাণ্ডুর মরুভূমির নির্জনতার মধ্যেও। কখনো অনাদি-কালের সমুদ্রগর্জন কান পেতে শুনেছে, কখনো বা পাহাড়-পর্বতে গুহা-কন্দরের স্তব্ধতার মন্ত্র। আকাশের আগুন হাড়ের মধ্যে শুষে নিয়েছে, আবার তার প্রলয় দুর্যোগ অস্তিত্বের গ্রন্থিগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে গেছে। তাপে দগ্ধ হয়েছে, হিমে পাথর হয়েছে। তবু বেঁচে থাকার অদ্ভুত একটা শক্তি নিহিত আছে বুঝি কোথাও। নইলে জঠরের আগুনেই ভস্ম হয়ে যেতে পারত, উপোসের হিমে নিস্পন্দ পাথর হয়ে যেতে পারত।

টাকা যতদিন ছিল, খরচ করেছে। আধা-আধি খরচ করার পরে বাকি টাকা হারিয়েছে কি চুরি গেছে জানে না। কখনো খেয়ালে বা অকরুণ প্রয়োজনে সিতু এরই মধ্যে কিছু কিছু উপার্জনও করেছে। কাজের মায়ায় মানুষ কোথায় না ছড়িয়ে আছে। কোথাও জঙ্গল বিদীর্ণ করে জীবনের রসদ সংগ্রহের অনুষ্ঠান চলেছে, কোথাও বা জড় পাহাড়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদীর্ণ করে। কাজ চাইতে হয়নি, গিয়ে দাঁড়ালেই কাজ মিলেছে। হিসেবের কাজ, তদারকের কাজ, তেমন দরকারে মেহনতী কাজও। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছে তেমনি নিঃশব্দেই সরে গেছে আবার একদিন।

জঠরের নিবৃত্তির তাগিদেও কাজ মেলেনি, এমনও হামেশা হয়েছে। জীবন [illegible] আশার উপক্রম হয়েছে, চোখে অন্ধকার ঘনিয়েছে। তখন শুধু একটু জলের জন্য [illegible] বাড়িয়েও মানুষের নির্লিপ্ত দৃষ্টি দেখেছে। আবার ওই অন্ধকারে একেবারে [illegible] মানুষেরই অযাচিত প্রসন্ন করুণা দেখেছে।

[illegible] চাটুজ্জ্যের একমাত্র ছেলে [illegible] চাটুজ্জ্যে নিজের সম্বন্ধে [illegible] শুধু নিজেদের সম্বন্ধে [illegible]।

[illegible] বাউল [illegible] বাউল—ছবির [illegible] করেছে ছ মাস আগে, ছবির সাক্ষাৎ মেলেনি। মিলবে আশাও করেনি। [illegible] চাল হয়নি বলে তাঁর সাক্ষাৎ মেলেনি। মহারাষ্ট্রীয় যোগী [illegible] এসে প্রথম দু মাসে সিতু গোটা চার পাঁচ আশ্রমে ঘুরেছে। [illegible] আধ্যাত্মিকতার থেকে তার অহমিকা বেশি প্রবল মনে হয়েছে, কোথাও বা [illegible] আড়ম্বর। অর্থ যশ প্রতিপত্তি এমন কি প্রবৃত্তিরও অনেক চাপা স্রোতের আবিল ছায়া চোখে পড়েছে। পড়ুক না পড়ুক সন্দেহ হওয়া মাত্র সরে গেছে।

চার মাস আটকে ছিল দাস মহারাজের আশ্রমে। দাস শব্দটাই সিতুকে মোহাচ্ছন্ন করেছিল কিনা জানে না। মহারাজের সদা-তিরিক্ষি ভক্ত-নির্যাতনও একটা বাড়তি আকর্ষণ বোধ হয়। মুখের দিকে চেয়ে চটকদার কথাবার্তা বলতে পারেন। সিতুকে দেখেই

[illegible], বড়ঘরের আরাম তো তোর পাতালে বাসা করেছে, ওর ক্ষয় অত সহজে হয় না—লেগে থাক। অর্থ বা সংস্থানের জন্য নয়, ওই আরাম সংহারের জন্যেই ভক্তদের ভিক্ষায় বেরুতে হত, দিবারাত্র পরিশ্রম করতে হত। আরাম [illegible], নিজেকে ক্ষয় করার তাগিদে সিতু লেগেই ছিল।

সব আশ্রমের মতই এখানেও দুঃখ জমা দেওয়ার [illegible] ভিড়। সিতুর স্থৈর্যচ্যুতি ঘটে মেয়েদের দেখলে। [illegible] ভিড় দেখেই পালিয়েছিল। এটা রোগ নিজেই [illegible] আশ্রমেও রমণী ভিন্ন রঙ ধরে না মনে হয়। [illegible] ক্ষমতা থাকলে সিতু এদের আসা বন্ধ করে [illegible]।

ক্ষমতা নেই। দাস মহারাজের [illegible] কথা [illegible] ভাবে। স্বামীর [illegible] সেই সব [illegible] থেকে বড় বড় শিষ্য আসে [illegible] আসে। এ-সব [illegible] ব্যস্ততা [illegible] আত্মপীড়নও।

[illegible] সেদিন ভিক্ষায় [illegible] এব বাড়িতে। বনেদী বড়লোকের বাড়ি। [illegible] প্রৌঢ় [illegible] দাস মহারাজের ভক্ত। তাঁর থেকেও বেশী ভক্ত [illegible] ছেলের বউয়েরা সঙ্গে নিজেদের তেজী ঘোড়ার টাঙ্গায় চেপে আশ্রমে [illegible] সিতুর ধারণা [illegible] কিছু সমস্যা আছে। কি সেটা জানে না। এই এলাকায় [illegible] ভিক্ষা মেলে। তবে আসে না বড়। অন্যের সঙ্গে এক-[illegible] সঙ্গে। বাড়িটা আশ্রম থেকে বহু দূরে।

[illegible] আরো কিছু বাড়বে বলেই হয়ত ঘুরতে ঘুরতে সেদিন ওদিকটায় [illegible], আর বাড়িটায় একবার ঘুরে যাবার কথা ভেবেছিল।

বৃদ্ধার দর্শন মিলল না। দর্শন মিলল আর একজনের। ছেলের বউয়ের। সুশ্রী, তারই সমবয়সী। বছর সাতাশ-আটাশ হবে বয়েস। আশ্রমে বারকয়েক সামনাসামনি দেখেছে শাশুড়ীর সঙ্গে। দেখলে সর্বদা যা করে তাই করেছে, মুখ ফিরিয়ে তক্ষুনি দূরে সরে গেছে। এই গোছের অভ্যর্থনায় অভ্যস্ত নয় বলে বউটিও তাকে লক্ষ্য করেছে কিনা জানে না। মহারাজের ঘরে [illegible] পাশে বসে দৃষ্টিটা দূরের দিকে প্রসারিত হতে হতে দুই-একসময় [illegible] ওপর এসেও থেমেছে। কিন্তু সিতুর চোখে পড়লে আরো আড়ালে সরেছে।

দোতলার রেলিং-এর কাছে এগিয়ে এসে মহিলা নীচের দিকে ঝুঁকল [illegible] ভিক্ষার্থী [illegible] চিনল হয়ত। তবু ওপরের আয়ত দুটো চোখ [illegible] ওপর থেকে সরে গেল না বলেই সিতুর বিরক্তি, অস্বস্তিও। [illegible] বউটি ইশারায় অপেক্ষা করতে বলল।

সিতু [illegible] আসল দিক না দিক, রোয়াকটিতে [illegible] বসল। বেশ কিছুক্ষণ আর সাড়াশব্দ নেই কারো। ভাবলে, অসময়ে [illegible] হয়নি, বৃদ্ধা হয়ত বিশ্রাম করছিলেন, তাই ভিক্ষা দিতে [illegible] দেরি।

[illegible] নয়, নেমে এল ওই বউটিই। সামান্য মাথা নেড়ে [illegible] ইশারায় [illegible] ভিতরে আসতে বলল। দাস মহারাজের প্রিয়জন [illegible] ডাকল

অভিব্যক্তিটুকুই নম্র নয় খুব। পাঁচ-সাত পা এগিয়ে সিতু দাঁড়িয়ে পড়ল। বউটি একটা ঘরের মাঝামাঝি এসে আবার ফিরে তাকাল। এবারে স্পষ্ট হিন্দীতেই আবার তাকে আসতে বলে এগিয়ে চলল। অগত্যা বিমূঢ় সিতু তাকে অনুসরণ করে একে-একে তিনটে ঘর পেরিয়ে চতুর্থ ঘরে এসে থামল।

ঝকঝকে তকতকে মেঝের মাঝখানে ছোট একটা শৌখিন গালচে পাতা। মহিলা তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল একবার। তার মাতৃভাষা হিন্দী। আঙুল দিয়ে পাশের ফালি বারান্দায় জলভরা বালতি আর ঘটি দেখিয়ে অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলল, কৃপা করে ব্রহ্মচারীজী মুখ-হাতে জল দিয়ে এসে বসলে ভাল হয়।

মা-জী নেই?

মহিলা জবাব দিল না, ঠাণ্ডা আয়ত দুটো চোখের কালো তারা মুখের ওপর আটকে রইল।

সিতু বিড়বিড় করে বলল, বেলা হয়েছে, ভিক্ষে পেলে চলে যেতাম।

ভিক্ষে দেবার জন্য মা-জী সর্বদা সব সাজিয়ে বসে আছে?

একটু থমকে সিতু ত্রুটি স্বীকার করল, বড় অসময়ে এসে পড়েছি, আজ থাক তাহলে—

ভিক্ষে মিলবে। তার আগে মুখ-হাতে জল দিয়ে এসে বসতে হবে।

সুর বদলেছে, নম্রতা কমেছে, নির্বাক সিতু তবু কয়েক নিমেষ দাঁড়িয়ে থেকে কলের মূর্তির মত এগিয়ে বালতির জলে হাত পা মুখ ধুয়ে এসেছে। মহিলা তোয়ালে এগিয়ে দিয়েছে, তারপর বসতে বলেছে।

সিতু বসল।

স্নানাহার হয়েছে?

স্নান হয়েছে, আহার কুটিরে ফিরে গিয়ে হবে।

চুপ একটু। রমণীর কালো চোখের তারা মুখের ওপর থেকে নড়ল না, সরল না।—এ রাস্তায় কত দিন আসা হয়েছে?

ভিক্ষে মাথায় উঠেছে। মেজাজ চড়ছে। তবু সংযত সুরে জবাব দিল, তোমার জন্মের আগে থেকে বোধ হয়।

অনেক সার্থক সাধকের আজীবন কচি-কাঁচা মুখ থাকে শুনেছিল।

রমণীর চোখে পলকের বিস্ময়, কিন্তু তারপর কি চাপা হাসি চিকিয়ে উঠতে দেখল একটু।

জিজ্ঞাসা করল, বয়েস কত তাহলে?

সিতু আরো গম্ভীর।—আড়াই-কুড়ি তিন-কুড়ি হবে।

সেটা তোমার বয়েস, না তোমার বাবার বয়েস?

মুখ লাল, গালচে ছেড়ে সিতু এবার উঠে দাঁড়াবে কিনা ভাবছে।

কোন্ দেশের লোক?

বাংলা দেশের।

গম্ভীর মুখে মহিলা বলল, কুটিরে ফিরে গিয়ে নয়, এখানেই আহার হবে। ভক্তবাড়ির সাত্ত্বিক আহারের অভাব হবে না, ব্যবস্থা করে নিয়ে আসছি।

তাতে দেরি হবে। মহারাজ রাগ করবেন।

মহিলা চেয়ে আছে। চাউনিটা সিতুর চোখের ভিতরে ছুরির ফলার মত বসে যাচ্ছে। ঠোঁটের ডগায় খুব সূক্ষ্ম হাসির দাগ। বলল, মহারাজ অন্তর্যামী হলে একটু ভাবনার কথা বটে, তা না হলে কিছুই বলবেন না, ভিক্ষের ঝুলি ভরে দেবে'খন, ভাববেন ঘুরে ঘুরে অত ভিক্ষে যোগাড় করতে বেলা বয়ে গেল। পরক্ষণে কথার সুর বদলালো, দেরি হয় হবে, অত ভয় নিয়ে এপথে আসা কেন—বোসো, আমি ব্যবস্থা করে নিয়ে আসছি।

যেতে যেতেও আর একবার ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে নিয়ে চলে গেল। আর সেই মুহূর্তে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল কেন সিতুর? ভিতর থেকে কে বলে উঠছে, পালাও পালাও—পালাবার ইচ্ছে থাকে তো এই মুহূর্তে পালাও। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা বাড়ি পড়ার মত করে আরো কি মনে পড়েছে তার। সঙ্গী ভক্তদের একদিনের রসিকতার কথা।...ভিক্ষে-টিক্ষে এখানে মেয়েরাই বেশি দেয়, তারা ঠাট্টা করেছিল, 'বংগালী' গুরুভাইয়ের ভিক্ষের বরাত ভালো, তার মুখখানা দেখেই এত বেশি বেশি ভিক্ষে দেয়। রসিকতার ছলেই পরে সাবধান করেছিল তারা। বলেছিল, এখানে অনেক পুরুষের বিবাগী মন বিয়ের পরেও বিবাগী হয়ে যায়, আবার অনেক পুরুষ অক্ষম ভোগবিলাসে দিন কাটায়। তাদের নিঃসন্তান যুবতী বউদের তখন অনেক সময় সুশ্রী চেহারার অল্পবয়সী সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর চোখ পড়ে—ভিক্ষে দেবার নাম করে ঘরে এনে আটকায়। আগে এরকম হামেশাই হত, এখনো একেবারে হয় না কেউ হলপ করে বলতে পারবে না। ঠিকমত খোঁজ করলে অনেক পরিবারে এরকম সন্ন্যাসীর ছেলের সন্ধান মিলতে পারে। আর অনেক পরিবার আছে যেখানে গোপনতার বালাই নেই, সেই সন্তান বাড়ির কর্তাটির কাছেও আদরের সন্তান। অতএব সাধু সাবধান।

এত বড় বাড়িটা খাঁ-খাঁ করছে, এখানে কোনো ছেলেপুলের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হল না সিতুর। আশ্রমেও এই মহিলাকে শুধু তার শাশুড়ী আর কখনো-সখনো স্বামীর সঙ্গে যেতে দেখা গেছে।

সিতুর সর্বাঙ্গ ঘেমে উঠেছে। রুদ্ধশ্বাসে হনহন করে হেঁটে চলেছে সে। পালাচ্ছে। যেন একটা সাপে তাড়া করেছে তাকে। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে এসে ঘুরে তাকালো একবার। মহিলা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে, স্থির নিশ্চল মূর্তি। তাকে পালাতে দেখছে। সিতু সভয়ে আরো দ্রুত চলল। যেন ওই চোখের আওতার মধ্যে পেলে ও আবার তাকে টেনে নিয়ে যেতে পাবে।

বাড়িটা একেবারে আড়াল হতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ জ্বালা-জ্বালা করেছে। নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস পড়েছে। পা আর চলতে চায় না, অবসাদে শরীর ভেঙে পড়ছে। কুটির এখনো অনেক দূর। এক জায়গা থেকে এক আঁচলা জল খেয়ে নিল। খালি পেটে জল খেয়ে হাঁটতে গিয়ে শরীরটা আরো ঘুলোচ্ছে। বড় রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে পায়ে-হাঁটা সরু ছায়ার রাস্তা ধরে চলতে লাগল। ক্লান্ত শ্লথ গতি।

আশ্রমে পৌঁছুতে বিকেল।

আঙিনায় পা দিয়েই প্রচণ্ড ধাক্কা খেল আবার একটা। মহারাজের ঘরের সামনের উঠোনে তেজী ঘোড়ার টাঙ্গা দাঁড়িয়ে একটা। কম্বল বিছানো তক্তাপোশে মহারাজ এদিকেই অর্থাৎ বাইরের দিকে মুখ করে বসে। তাঁর মুখোমুখি ওই মহিলার অবস্থান। যার কাছ

থেকে পালিয়েছিল। ওদিকে ফিরে আছে, শরীরের আধখানা দেখা যাচ্ছে।

সিতুর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে এপাশ-ওপাশের ভক্তরা সচকিত যেন। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ।

সাটকী! ইধার আও!

গর্জন শুনে সিতু চমকে উঠল। [illegible] ক্রোধে নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে মহারাজের মুখ। পায়ে পায়ে [illegible] দাঁড়াল।

ইধার আও।

ভিতরে ঢুকল। মহিলা ফিরে তাকালো একবার, থমথমে গম্ভীর চোখে প্রতিহিংসা। যে শাড়ি জামা বাড়িতে পরা ছিল সেই বেশবাসেই বেরিয়ে এসেছে।

সিতু স্থির দাঁড়িয়ে, কিন্তু দেহের [illegible]গুলো বুঝি ওঠা-নামা করছে। দাস মহারাজ রাগে কাঁপছেন, আর চিৎকার করে অকথ্য অশ্রাব্য গালাগাল করছেন। বাপ-মা চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে অন্ধ আক্রোশে হঠাৎ ঝুঁকে মাটি থেকে কাঠের খড়ম জোড়ার একটা তুলে নিয়ে সোজা মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। গলার পাশে কানের নীচের দিকটা ঘেঁষে প্রচণ্ড আঘাত একটা। সিতুর মাথা ঘুরে গেল, চোখে অন্ধকার দেখল।

বেইমান নীচ [illegible], নিকাল যা। নিকাল যা! নিকাল যা হিয়াসে

প্রভুজী শাস্তি দাও, শাস্তি [illegible]—কল্পিত প্রত্যাঘাতে এক বৃদ্ধের [illegible] দেহ দেখছে সিতু চোখের সামনে, কে বুঝি ওই বৃদ্ধের দেহ মাটিতে [illegible] সামনের দিকে ঠেলেছে [illegible]—প্রভুজী [illegible]

[illegible] করতে চেষ্টা [illegible] ভিতর থেকে এ কোন নাম স্মরণ [illegible]

[illegible]। [illegible] এখানে ওই রমণীর দিকে ঘুরল। বিস্ফারিত [illegible] মুখের দিকটা এরই মধ্যে বীভৎস রকম ফুলে উঠেছে। [illegible] দৃষ্টিটা [illegible] এসে আটকাতে হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত ভয়ের কাঁপুনি [illegible]। বিবর্ণ পাংশু মুখে মহিলা উঠে দাঁড়াল পরমুহূর্তে, মহারাজকে প্রণাম করতে ভুলে [illegible] ছেড়ে পালিয়ে গেল সে।

হঠাৎ তাকে এভাবে পালাতে দেখে মহারাজও রাগ ভুলে বিস্মিত এবার। সিতুর দৃষ্টি [illegible] দিকে ঘুরেছে। মহারাজও বিব্রত বোধ করলেন কেমন। ওই দৃষ্টি যেন তাঁরই [illegible] বা [illegible]চারের কোনো স্তরের এক রমণীর দাসকে টেনে বার করে দেখছে [illegible]। রমণীর নালিশ শুনে এই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য চণ্ডাল ক্রোধের আড়ালে দাস-মূর্তিটাই [illegible] দেখাতে চাইছে তাকে। ও যেন দাস মহারাজকে দেখছে না, রমণীর দাসকে দেখছে।

সিতু মাটি থেকে খড়মটা তুলে নিয়ে আর এক পাটির সামনে রাখল। তারপর আস্তে আস্তে ফিরে চলল।

[illegible], ইধার আও।

[illegible] দাঁড়াল। দেখল একটু। তারপর তেমনি শান্ত মুখে [illegible] পেরিয়ে দাস মহারাজের আশ্রম থেকে খোলা

ভিতরে আশ্চর্য অনভূতি একটা। রমণীর হিংসা মনে নেই, নিজের রাগ মনে নেই, দাস মহারাজের অপমান মনে নেই, আঘাত মনে নেই।...সেই মুহূর্তের সঙ্কটে সে কাকে ডেকেছিল? কাকে স্মরণ করেছিল? কার কাছে শক্তি আর সংযম ভিক্ষা করেছিল?

চোখের কোণ দুটো হঠাৎ সিরসির করছে কেন সিতুর?

সঙ্গে সঙ্গে কোন্ গোপন নিভৃত থেকে একখানা চেনা মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। সেও এক রমণীর মুখ। সেই মুহূর্তে আবেশের প্রলেপ মুছে গেল। শক্তি আর সংযম ধূলিসাৎ। ওই নামের সঙ্গে এই মুখ মনে পড়ল কেন? এই মুখ টেনে আনল কেন? কেন? কেন? কেন?

অশান্ত পা ফেলে ফেলে সিতু সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

... ...

গঙ্গার এদিকটার নাম নীলধারা।

এ নির্জনতা আগেও টানত। দাস মহারাজের আশ্রম থেকে পথে নেমে হাঁটতে হাঁটতে সিতু কখন এখানে চলে এসেছে জানে না। শান্তির অনভূতি আর নেই। সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি তাও মনে নেই।

সামনে এক দুরন্ত তাড়ায় নীল স্রোত ছুটে চলেছে। ওপারের কাছে দূরে নীলাভ পাহাড়। গঙ্গার খরধারা, ছোটার মত্ত তাড়নায় পাশে আরো বেশি মৌনী গম্ভীর মনে হয় পাহাড়গুলোকে। ওগুলোর নীল ছায়া এসে [illegible] এদিকটার জল এত নীলাভ। [illegible] নীলধারা নীল আকাশে মিশে [illegible]।

[illegible] সিতু [illegible] বিদায়ী সূর্য প্রতিক্ষণে পশ্চিমে চলেছে। নীল [illegible] [illegible]

[illegible] সিতু [illegible]

[illegible]

[illegible] চেতনায় [illegible] মন্ত্রজপা [illegible] তার ভাবনের [illegible]।

চমকে উঠল হঠাৎ [illegible] ধুতি, গায়ে সাদা ফতুয়ার ওপর সাদা চাদর [illegible] জিজ্ঞাসা করল সে সাত্যকি চ্যাটার্জি কিনা।

অচেনা মানুষ। সিতু মাথা নাড়ল, তারই নাম।

লোকটি জানালো, আনন্দবাবা ডেকেছেন, তার আখড়ায় একবারটি আসতে [illegible]।

সিতু অবাক। এখানে এসে আনন্দবাবার নাম শুনেছে বটে, চোখে দেখেনি। [illegible]

তাকে চিনলেন কি করে আর ডাকবেন কেন ভেবে পেল না। তার সংশয় লক্ষ্য করেই লোকটি হিন্দীতে আবার বলল, আনন্দবাবার কাছে আসতে ভাবনা কি ভাই, আসুন।

দুর্বোধ্য বিস্ময়ে সিতু সঙ্গ নিল তার। পথে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না। এটুকু সংযমে অনভ্যস্ত নয় এখন। আখড়া কাছেই। বাঁশের বেড়া দেওয়া জমিতে বিচ্ছিন্ন অনেকগুলো বড় বড় পাকা ঘর। আর মাঝে মস্ত একটা হলঘর। পঞ্চাশ-ষাটজন নানা বয়সের লোক বসে সেখানে। পরনে সকলেরই সাদা ধুতি সাদা ফতুয়া। হল-এর এমাথা-ওমাথা শতরঞ্জি ফরাস বিছানো। একধারে গান-বাজনার সরঞ্জাম কিছু। দেয়াল-ঘেঁষা সারি সারি কতগুলো আলমারি বইয়ে ঠাসা। পরিবেশ দেখলে মনে হয়, কোনো জলসা-টলসা বা সাংস্কৃতিক আলোচনা শুরু হবে। নরম গলায় অনেকের সঙ্গে কথা কইছে।

সিতু এসে দাঁড়ানো মাত্র ফরাসের প্রায় ওমাথা থেকে দরাজ গলায় স্পষ্ট বাংলায় একজন ডেকে উঠলেন, এই যে সাত্যকি মহারাজ, সোজা ইদিকে চলে এসো—থান, আদুড় গায়ে একটা তসরের চাদর জড়ানো। চাদরের নীচে তেমনি সাদা মোটা পৈতে। সমস্ত মাথাজোড়া চকচকে বাদামী রঙের টাক। কোনদিন ও মাথায় এক গোছা চুল গজিয়েছিল মনে হয় না। টাকের রঙ আর গায়ের লালচে আভা মিলেমিশে একাকার। বেঁটে মোটাসোটা মানুষ, বয়সে ষাট-পঁয়ষট্টির মধ্যে মনে হয়। সিতু পরে জেনেছে, বয়েস একাশী। যে লোক তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, এগোবার ফাঁকে সেই চুপিচুপি বলে দিয়েছে, উনিই আনন্দবাবা।

সামনে এসে তাঁর উদ্দেশে সিতু দু হাত জোড় করল শুধু, প্রণাম করল না। জবাবে আনন্দবাবা ডবল ভক্তিভরে দু হাত জোড় করে প্রণামের ভঙ্গিতে টাক মাথা প্রায় ভুঁড়িতে ঠেকালেন। সিতু ঈষৎ অপ্রস্তুত, কিন্তু গম্ভীর। অনেক দেখে ভিতর শক্ত হয়েছে, কি ব্যাপার না জেনে বা না বুঝে বিগলিত হবার কারণ নেই।

বসতে আজ্ঞা হোক মহারাজ, এই পুণ্য-পদার্পণ ঘটবে বলে টানা চার মাস বসে আছি। ছদ্ম গাম্ভীর্যে আনন্দবাবার মুখখানা আরো টস্‌টসে দেখালো।—দাস মহারাজের হাতে পালিশ হচ্ছ শুনে অপেক্ষা করছিলুম, আজ শুনলাম সেখানকার বন্দরের কাল শেষ, তুমি পাখা মেলেছ হেথা নয় হেথা নয় বলে। আর আমি? দেখব বলে বসে আছি আমি, 'ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি'। ভারী গালের ভাঁজে ভাঁজে চাপা তরল হাসির খেলা, দু চোখ কুঁচকে মুখখানা ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন একটু। হাল্‌কা মন্তব্য করলেন, পালিশের কারুকার্য তো দাস মহারাজ ভালই করেছেন দেখছি।

উপস্থিত প্রায় সকলেরই চোখ সিতুর দিকে। সরাসরি হাসছে না কেউ, কিন্তু হাসি-হাসি মুখ সকলেরই। আনন্দবাবার শেষের মন্তব্য সিতুর গলা আর গালের একদিকের আঘাত লক্ষ্য করে। ফুলে আছে, কালশিরেও পড়েছে মনে হয়। যে করেই হোক, এ আঘাতের বৃত্তান্ত সকলেই জানে বোঝা গেল। হয়ত ওখানকার শিষ্য-সামন্তদের সঙ্গে এখানকার লোকেদের যোগাযোগ আছে। এই পরিহাসের পরেও মেজাজ চড়বে না এ পর্যায়ের সংযম শিক্ষা হয়নি এখনো। কিন্তু তার প্রতি আনন্দবাবার আগ্রহ কেন সেটা অজ্ঞাত এখনো। ঠাণ্ডা প্রশ্ন করল, কৃপা করে আমাকে ডেকেছেন কেন, এবারে আপনারও একটু পালিশ করার ইচ্ছে?

· উৎফুল্ল আনন্দবাবা তৎক্ষণাৎ তুমি থেকে তুই-এ অবতরণ করলেন, ঠিক ধরেছিস রে ব্যাটা, ভালো জমি দেখলে আমারও হাত নিশপিশ করে।...থাকবি এখানে?

মনের অবস্থা যেমনই হোক, তার আঘাত নিয়ে কৌতুকের একটা কঠিন জবাব দেবার সুযোগ পেল এবারে। একটু চুপ করে থেকে ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, এখানে মেয়েছেলের যাতায়াত কেমন?

এরকম একটা প্রশ্ন আনন্দবাবার মুখের ওপর কেউ ছুঁড়ে দিতে পারে ভাবা যায় না। সকলের হাবভাবে অস্বস্তিকর চাপা বিস্ময়। কিন্তু আনন্দবাবার দু চোখ কপালে। দুর্মুখ ছেলেটাকে আগে ভালো করে দেখে নিলেন তিনি। তারপর অকস্মাৎ বিরাট হাসি যেন পাহাড়ের উঁচু থেকে ধাক্কা খেতে খেতে সমতলের দিকে গড়াতে লাগল। সিতুর এই মানসিক অবস্থাতেও মনে হল, এ হাসি দেখার জিনিস। ভারী গালের খাঁজে খাঁজে হাসি জমছে আর উপচে ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু মুখ কেন, আনন্দবাবার সর্বাঙ্গ দিয়ে হাসি ঝরছে যেন। শব্দের বিরাম ঘটলেও হাসির তরঙ্গ তাঁর মুখের সর্বত্র খেলা করে বেড়াতে লাগল। বড় করে দম নিয়ে বললেন, যাক, এখনো মেয়েছেলের মধ্যে আটকে আছিস বোঝা গেল। মেয়েছেলে ঢের আসে, তবে তোর রোগ সারানোর মত কেউ আসে কিনা, বলতে পারব না বাপু। তা তুমি দয়া করে থাকো এখানে কটা দিন, গৌরকে না হয় আমি একটা টেলিগ্রামই করে দিই, তার হারানিধি এই আস্তানায় এসেছে, আর রোগ যখন ধরাই পড়েছে আশা করা যাচ্ছে সারবেও—সে তো একধার থেকে চিঠির চাবুক চালাচ্ছে আমাকে, দাস মহারাজের কাছে পড়ে থাকতে দিচ্ছি কেন, ধরে নিয়ে আসছি না কেন। আমি যে পালিশ-করা মালের অপেক্ষায় বসে আছি, সে তো আর জানে না!

একটু একটু করে সিতুর সমস্ত বিস্ময়ের অবসান। গৌর কে প্রথম ধরতেই পারেনি। পরে বুঝেছে। ছোট দাদু। হরিদ্বারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগ জানত, সে যোগটা যে এই আখড়ার সঙ্গে সেটা কল্পনায়ও আসেনি। হাল্কা বোধ করছে হঠাৎ। সাড়ে তিন বছরের টানা একটা ক্লান্তির অধ্যায় যেন শেষ হয়ে গেল। বহু আঘাত সয়েও বুঝি এক আলোর উৎসব-প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে আলোর উৎস এই একজন —এই আনন্দবাবা।

এই প্রথম সিতুর মনে হল, এবারে ও একটু বিশ্রাম চায়, একটু অবকাশ চায়।

যে লোকটি তাকে নীলধারা থেকে ডেকে এনেছিল সে এখানে প্রেমভাই নামে পরিচিত। প্রেমচাঁদ বা প্রেমলাল গোছের নাম হতে পারে, আবার আনন্দবাবার দেওয়া নামও হতে পারে। পরে অন্তরঙ্গ আলাপের ফাঁকে সেই জানিয়েছে, ছোট দাদু আনন্দবাবার কাছে ওর ফোটো রেখে গেছে প্রায় তিন বছর আগে। ছোট দাদুকে ভারী ভালবাসেন আনন্দবাবা, তখনি নাকি বলে দিয়েছেন, ভাবনা নেই, ঘুরে-ফিরে একদিন এই আখড়াতেই আসবে। তারপরেও ছোট দাদু অনেকবার এখানে এসেছে, আর নাতির খোঁজ পাচ্ছে না বলে উতলা হয়েছে। আনন্দবাবা এক কথাই বলেছেন, সময় হলে আসবে। মাস চারেক আগে দাস মহারাজের আশ্রমে সিতুর হদিস পেয়ে ছোট দাদুকে খবর দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়েই ছোট দাদু আসার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। আনন্দবাবা নিষেধ করেছেন, বলেছেন, আসতে হবে না, নাতির ভার তিনি নিলেন, সময়ে এখানেও ডেকে নেবেন।

সিতু কান পেতে শুনেছে। শুনেছে আনন্দবাবার গল্পও। ওর ধারণা ছিল আনন্দবাবা বাঙালী। না, ইউ-পি'র মানুষ তিনি। তবে বাংলাদেশে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন। অনেকগুলো

ভাষা জানেন, যখন যে ভাষায় কথা বলেন তখন সেই দেশের মানুষ মনে হয় তাঁকে। পাণ্ডিত্যেরও শেষ নেই, কর্মজীবনে নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। তিন ছেলে আর বউ ছিল। এক পুণ্যস্নানের দিনে গোমতীর নীচেকার ঘূর্ণিস্রোত তিন ছেলেকেই টেনে নিল। বউ পাগল হয়ে গেল, আর শেষে ছেলে ফিরিয়ে দে, ছেলে ফিরিয়ে দে বলে ওই গোমতীর জলেই ঝাঁপ দিয়ে জ্বালা জুড়লো। সেইদিন থেকে হাসা শুরু করেছিলেন আনন্দবাবা, পঞ্চাশ বছরের বেশি হল, আজও হেসেই চলেছেন। প্রেমভাইরা এ গল্প নাকি গৌরবাবু অর্থাৎ ছোট দাদুর মুখে শুনেছে। ছোট দাদুরা কার কাছে শুনেছে জানে না, আনন্দবাবা পুরানো জীবনের কথা একটিও বলেন না। জিজ্ঞেস করলে হেসে জবাব দেন, রোজই তো নতুন করে জন্মাচ্ছি রে বাপু, পূর্বজন্মের কথা কার অত মনে থাকে, আর বাসি ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েই বা কাজ কি। হাসতে শুরু করার পর প্রায় তিরিশ বছর আনন্দবাবার আর খোঁজখবর মেলেনি। ঘুরে ঘুরে তামাম পৃথিবীটাকে দেখেছেন। বিদেশে বড় জায়গায় চাকরিও করেছেন, আবার পাহাড়ে-জঙ্গলে কত বছর কাটিয়েছেন ঠিক নেই। গল্পকথা কিনা প্রেমভাইরা জানে না, তারা শুনেছে আনন্দবাবা নামটা নাকি ওঁর গুরুজীর দেওয়া। রাগ করে গুরুজী একদিন তাঁকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন। ঘণ্টা দুই বাদে চোখ মেলে দেখেন, প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করে শিষ্য হামা দিয়ে তাঁর কাছে উঠে আসছেন—মুখখানা তেমনি হাসিতে ভরাট, সেখানে যাতনার চিহ্নও নেই। গুরুজীও নাকি তখন একগাল হেসে তাঁর দিকে ঘুরে বসে হাত জোড় করে বলেছেন, অপরাধ নিও না আনন্দবাবা, দেহজ্ঞান আমার থেকেও বেশি খুইয়েছ মনে হচ্ছে, আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই—দুনিয়ায় এবারে তোমার আনন্দমন্ত্র বিলোও গে যাও। সত্য কিনা যাচাই করতে গেলে আনন্দবাবা সত্রাসে আগে নাক-কান মোলেন, তারপর হেসে বলেন, ওই কথা বলে তোদের একে একে বিদায় করতে পারলে তবে আমার মুক্তি।

সিতু খুব মুগ্ধ বা অভিভূত কিছু হয়নি। শিষ্যমুখে গুরুস্তুতি শুনে দু কান অভ্যস্ত। দাস মহারাজ সম্পর্কেও তাঁর ভক্তদের মুখে অনেকরকম অলৌকিক ক্ষমতা আর গুণের কথা শুনেছিল। আনন্দবাবার মন-সাধনার সমাচার খারাপ লাগেনি, এই পর্যন্ত। দুদিন পরের কথা। আখড়ার সামনে শালগাছটাকে মজলিসের আসর বলা যেতে পারে, জীবনের সার্থক সম্পদ খোঁজা প্রসঙ্গে পাঞ্জাবী মেহেরবাবার একটি কবিতা গল্পের মত করে বসিয়ে বলছিলেন আনন্দবাবা। সিতুর মনে হয়েছিল, এই কৌতুককাহিনীর লক্ষ্য সে-ই। বাঙালীদের জন্য বাংলায় বলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার হিন্দীতে অন্যদেরও বক্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

যথা, বিধাতার সৃষ্টিকর্ম যখন সারা, সে পূর্ণতা দেখে দেবতারা সব আনন্দে আত্মহারা। একবাক্যে তারা বাহবা দিচ্ছে আর আনন্দ করে বলছে, পূর্ণতার এমন ছবিটি আর হয় না, ফাঁক কোথাও নেই। তাদের আনন্দ-সভার মধ্যে হঠাৎ কে একজন বলে উঠল, দেখো তো দেখো তো, জ্যোতির মালা থেকে একটা তারা যেন কোথায় খসে পড়েছে। ব্যস, তাদের গান গেল, আনন্দ গেল, সকলেরই মনে হল একটা তারা নেই বটে। আর তারপর মনে হতে থাকল, সেই তারাতেই স্বর্গ হত আলো—সেই তারাটাই সবার বড়, সবার চেয়ে ভালো। অতএব চলল সন্ধান, চলল খোঁজাখুঁজি, সেই হারা-তারা না পেলে ভুবন কানা। জগৎ সেই থেকে হারানো তারাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আনন্দবাবুর হাসিমাখা ঝকঝকে দৃষ্টিটা সিতুর দিকে ঘুরল, অল্প মাথা নেড়ে টেনে টেনে গানের কথা কটা যেন তারই গভীরে ছড়িয়ে দিলেন, 'শুধু গভীর রাত্রিবেলায় স্তব্ধ তারার দলে—"মিথ্যে খোজা, সবাই আছে," নীরব হেসে বলে।' জোরেই হেসে উঠলেন আনন্দবাবা, হারিয়েছে ভাবলে আর খুঁজে পাবিনে রে বাবা, খুঁজে পাবি নে—সবই আছে, বুঝলি? কিছু হারায়নি।

সেই মুহূর্তে সিতুর ভালো লেগেছিল আনন্দবাবাকে। দেখছিল তাঁকে। চকচকে টাকমাথা দেখছিল, ঝকঝকে মুখখানা দেখছিল, কি গালের ভাঁজে-ভাঁজে হাসি চুয়ানো দেখছিল, জানে না। তারপর দিনে দিনে ভালো লেগেছে, তাকে কাছে পেতে ভালো লেগেছে, তাঁর হাসি দেখতে ভালো লেগেছে, তাঁর কথা শুনতে ভালো লেগেছে। অথচ সকলের সামনে ওকে কম ঠেস দিয়ে কথা বলেননি তিনি। বলেছেন, আধুনিক যৌবন সাহসিক নয় একটুও, ভীরুতায় ঢাকা। বলেছেন, তারুণ্যের বিদ্রোহ অস্পষ্ট নয়, সবল নয়—তাই সে কেবল অবলম্বন খোঁজে, আশ্রয় খোঁজে, আর শেষে পালানোটাই সার্থক রাস্তা ভাবে। যে মুহূর্তে পালাল সেই মুহূর্তে আনন্দের বারোটা বাজাল, আনন্দ গেলে থাকল কি? দিনের আশ্রয় না পেলে লক্ষ্মী পালায়, পলাতকের ধারে-কাছে ঘেঁষে নাকি সে কখনো।

রাত দুটোর সময় তিনটের সময় উঠে এই মানুষেরই আবার আর-এক মূর্তি দেখেছে সিতু। পা টিপে উঠে গিয়ে ওঁর ঘরের বাইরে উঁকি দিয়েছে। ওমন ঘরের প্রদীপের মৃদু শিখা কি আনন্দবাবাকে দেখছে, জানে না। এমন ধ্যানস্থ মূর্তি আর বুঝি দেখেনি। সিতুর মনে হয়েছে, দেহ-আধারের একটা বাতি জ্বেলে রেখে আনন্দবাবা অনির্দিষ্ট বিচরণে বেরিয়েছেন, ফিরে এলে তবে ওই দেহে সাড়া জাগতে পারে—তার আগে নয়।

এখানে যারা আছে সকলেই কাজ করে। ক্ষেতের কাজ, বাগানের কাজ, পড়াশুনা। হঠাৎ-হঠাৎ অনেকে চলে যায়, আবার কোথা থেকে নতুন মানুষ আসে। সিতু শুধু শুনেছে, নানা জায়গায় আনন্দবাবার প্রতিষ্ঠান আছে, বেকার বসে থাকার জো নেই কারো। সিতু জিজ্ঞাসা করেছিল [illegible] আনন্দবাবা বলেছিলেন, আপাতত ফাঁকি [illegible] নাকি [illegible] চালে এসেছিলেন [illegible] মত [illegible] আনন্দবাবা হঠাৎ বললেন, একটা [illegible] কথা [illegible]

সিতু [illegible] হি-হি করে [illegible]

[illegible] আনন্দবাবা আমাদের দিকে ফিরলেন, লোকটার কথা শোন একবার, কান্না যেন পাপ হতে নেই।

প্রতি মুহূর্তে এমনি করেই সিতু যেন পাচ্ছে কিছু। কি বলতে পারে না, শুধু অনুভব করে।

পনের দিনের মাথায় হঠাৎ এক সকালে [illegible] এসে হাজির। তাঁকে দেখে সকলের [illegible] উৎসুক, উন্মুখ। আনন্দবাবার পায়ে মাথা

রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করতে দেখল ছোট দাদুকে। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবাবা আঙুল তুলে সিতুকে দেখালেন।—পৃথিবীটা কত গোল দেখলি?

দুপুরের নিরিবিলিতে সিতু তাকে কাছে পেল যখন, ভিতরটা তখন অনেক ঠাণ্ডা। জিজ্ঞাসা করল, তুমি চলে এলে যে?

গৌরবিমল জবাব দিলেন, তোকে নিতে।

সিতু সচকিত, কেন? আনন্দবাবা বলেছেন?

না, আমিই বলছি। তোর বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, গত তিন মাসের মধ্যে দুবার মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেছল—একবার গাড়িতে, একবার বাড়িতে। ব্লাডপ্রেসার চড়েই আছে।...তোর খবর পাওয়ার পর থেকে মনে মনে খুব আশা করছে তোকে—

সিতুর মনে হল, আলো থেকে কে বুঝি আবার তাকে সেই পুরানো অন্ধকারের মধ্যে টানতে চাইছে। ফেরার নামে অন্তরাত্মা বিমুখ। খানিক চুপ করে থেকে বলল, মাথার চাষ এত বেশি হয়েছে, না ঘোরাই আশ্চর্য। ভালো করে চিকিৎসা করাও, আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।...এখানে এদের সামনে টানা-হেঁচড়া করতে যেও না।

গৌরবিমল প্রকাশ্যে টানা-হেঁচড়া করেননি বটে, নিজেই তাকে ফেরাতে চেষ্টা করেছেন। না পেরে তিন-চার দিন বাদে একাই ফেরার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। তার আগের সন্ধ্যায় সিতু আবার তাঁকে নিরিবিলিতে পেয়ে হুকুমের সুরেই অনুরোধ করেছে, যাবার আগে আনন্দবাবাকে আমার জন্যে একটু ভালো করে বলে যেও দেখি—

কি বলে যাব, চট্ করে তোকে খাঁটি সন্ন্যেসী বানিয়ে দিতে?

ভাবল একটু।—জানি নে, এভাবেও ভালো লাগছে না।

ভালো না লাগে কে তোকে থাকতে বলেছে, আমার সঙ্গে চল্।

তুমি ছাই বুঝেছ। উৎসুক হঠাৎ, আচ্ছা ছোট দাদু, আনন্দবাবা সত্যি কি দিতে পারেন বলো তো?

গৌরবিমল হাসিমুখে জবাব দিলেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখ। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, ওঁকে দেখলে শোক পালায়, আর কিছু না হোক মানুষের শোক ভোলাতে পারেন বোধ হয়।

সিতুর বয়স প্রায় আটাশ, আর ছোট দাদুর ষাট ঘেঁষতে চলেছে। কিন্তু কাছাকাছি হলে বয়েস দুজনেরই আগের মত নেমে আসে খানিকটা করে। তার ওপর এই সাড়ে তিন বছরের নানা ধাক্কায় আর কিছু না হোক, সিতুর চক্ষুলজ্জার বালাই গেছে। শোনামাত্র কিছু না ভেবে ঝপ করে মুখের ওপর বলে বসল, তোমার শোক ভোলাতে পেরেছেন?

আমার আবার কি শোক?

সিতুর খুশির মাত্রা বাড়ল, দ্বিধাশূন্য মুখে আবার বলে বসল, তুমি ছোট দাদু না হয়ে বাবা হলে ব্যাপারখানা কেমন হত কলকাতায় বসে দুই-একবার ভাবতে চেষ্টা করে হেসে সারা আমি—সে যাক, তোমার অবস্থাটা কি বলো।...মা-কে ভুলতে পেরেছ?

এভাবে আক্রান্ত হয়ে গৌরবিমল ধড়ফড় করে উঠলেন একপ্রস্থ, মুখ লাল—ধরে দেব এক থাপ্পড়। অবাকও কম হননি, এসব তোর মাথায় কে ঢোকালে?

কেউ না, জেঠুর সেই কালো ডায়েরীতে কত যে মণিমুক্তো ছড়ানো তা যদি

জানতে। একবার হাতিয়ে নিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম। তা থাপ্পড় দাও আর যাই করো, জবাবটা দাও না, ভুলতে পেরেছ?

অর্বাচীনের পাল্লায় পড়ে গৌরবিমলের যেন হাল ছাড়ার দাখিল প্রথমে। তারপর মিটিমিটি হেসে বললেন, আনন্দবাবার মতে সুন্দর যা, তা ভোলার দরকার নেই।

নিজের অগোচরে সহজতায় টান ধরছে সিতুর। কথার সুরও নীরস। বিড়বিড় করে বলল, সুন্দরকে ভোলার দরকার নেই, কিন্তু এখন আবার সুন্দরের কি আছে —সবই তো অসুন্দর হয়ে গেছে।

হাল্‌কা ধমকের সুরে গৌরবিমল বললেন, তোর মাথা হয়েছে, আনন্দবাবা বলেন, দুর্যোগে চন্দ্র-সূর্য ঢাকা পড়ে, তা বলে তাদের রূপ খোয়া যায় না।

সিতু আর কথা বাড়ালো না। ভিতরটা এবই মধ্যে তিক্ত হয়ে গেছে তার। এ প্রসঙ্গ তুলেছে বলে নিজের ওপরেই বিরূপ সে। ছোট দাদুর কথাগুলো সান্ত্বনার মত তাই আরো খারাপ লাগল। উঠে চলে গেল সেখান থেকে। অনেকদিন বাদে আবার যেন সেধে গণ্ডগোলের রাস্তায় পা ফেলার ঝোঁক একটা। সেটাকে নির্মূল করার অসহিষ্ণু তাড়না।

মাঝরাত পর্যন্ত আনন্দবাবার ঘরে ছিল ছোট দাদু। সিতু লক্ষ্য করেছে কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করেনি কি এত কথা হল। সকালে তাকে বেশ খুশিমুখেই কলকাতায় রওনা হতে দেখল। সিতু নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না কেন?

চুয়াল্লিশ

শেষ ঘনালো?

বিভাস দত্তর চোখ বোজার অনেক আগেও জ্যোতিরাণীর মনে হত ভবিতব্যের এক অমোঘ বিবরে প্রবেশ করেছেন তিনি। মনে হত, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটাই শেষ নয়, সব নয়—আরো কিছু ঘটবে, আরো কিছু বাকি।

অনেক কিছুই ঘটেছে। তবু তখনো তা শেষ দেখেননি তিনি, শেষের ছায়া দখল নিতে আসেনি, বিবরের শেষের ধাপে পৌঁছেছেন ভাবেননি। কত কিছুই তো ঘটল। মিত্রাদি মুছে গেল। শেষের মাশুলের একটা দগদগে ক্ষত রেখে গেল, তবু মুছে যেতে পারল। বিভাস দত্তর চাওয়া ফুরালো, জ্যোতিরাণীর ভিতরের সেই যুদ্ধক্ষেত্রের নার্সের ভূমিকাও নিঃশব্দে শেষ হয়ে গেল। আবার এক সর্বনিঃশেষের মত দৃশ্য দেখেছেন। হাসপাতালে মুমূর্ষু ছেলের দিকে চেয়ে—আঘাতের সেই বীভৎস দৃশ্য বুঝি জ্যোতিরাণীর গলাতেই শেষ কুলুপ এঁটে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। কিন্তু দিয়েও দিল না। এক মাসের মর্মান্তিক প্রতীক্ষার পরে ওই ছেলেই আবার সে যাতনার ওপর দ্বিগুণ আঘাত দিয়ে মুখের ওপর দু চোখের গলগলে বিতৃষ্ণা-বিদ্বেষের ঝাপ্‌টা মেরে তাঁকে দূরে সরিয়েছে।...তারপর ছেলের নিরুদ্দেশের খবরও কানে এসেছে। কালীদার যাতায়াত আছে, তাঁর মুখেই শুনেছেন। দিনের পর দিন গেছে, একে একে তিন-তিনটে বছর ঘুরে গেছে, কোনো সন্ধান মেলেনি। কালীদা এলেই শমীর উদগ্রীব মুখ দেখেছেন, একটা খবরের আশায় ওকে উন্মুখ দেখেছেন। আড়ালে কাঁদে-টাদে কিনা সেই সন্দেহও হয়। চার-পাঁচ মাস আগে হরিদ্বারে আছে খবর আসতে শমীর চেহারাই বদলে গেছল।

ও আশা করেছিল, ত্রিকোণ রাস্তার বাড়ি তালাবন্ধ করে সকলে হরিদ্বারে ছুটবে। পারলে ও নিজেও ছুটত।

পরে কালীদা জানিয়েছেন, সেখান থেকে মামুর আনন্দবাবার নির্দেশ এসেছে কেউ যেন না যায়, সময় হলে তিনিই ডাকবেন। তারপরেও এই কমাস ধরে শমীর চাপা অস্থিরতা লক্ষ্য করছেন জ্যোতিরাণী। সম্ভব হলে শমীকে সান্ত্বনা দিতেন তিনি, বলতেন, ওটা শেষের ছায়া নয়, ভাবিস না। এত সবের পরেও সত্যিই জ্যোতিরাণীর মনে ওদিক থেকে কোন শেষের ছায়া ঘনায়নি।

ওটা এসেছে সম্পূর্ণ অন্যদিক থেকে। নিজের দেহের অভ্যন্তর থেকে, নিজের এই দেহকে কেন্দ্র করে। ওই ছায়ার সূত্রপাত বছর দেড়েক আগে, তখনো ওটার সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলেন না জ্যোতিরাণী। বছরখানেক হল সচেতন হয়েছেন। তারপর একেবারে যেন স্থির হয়ে গেছেন, স্তব্ধ হয়ে গেছেন তিনি। অথচ দীর্ঘদিন পর্যন্ত বুঝতে দেননি কাউকে, শমীকেও না। নিজের ভিতরে নিজেকে আগলে রাখার এক অদ্ভুত শান্ত শক্তি অর্জন করেছেন তিনি।

এই সর্বনিঃশেষের ছায়ার খবর শমী জেনেছে মাত্র মাসখানেক আগে। জেনে প্রথমে পাথর হয়েছে, তারপর দিশেহারা হয়েছে। এখনো প্রাণপণে ওটা ঠেলে সরাতেই চেষ্টা করছে, অস্বীকার করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু জ্যোতিরাণী জানেন ওই ছায়া শেষের ছায়া, এবারে সব ঢেকে দেবে ওটা। তাই আরও শান্ত আরও নির্লিপ্ত তিনি। মনে মনে কেবল নিজেকে প্রস্তুত রাখতে চেষ্টা করেছেন, প্রার্থনা কবেছেন, শেষের বিচারই সব—তাই শেষটুকু সুন্দর হোক শুধু আর তিনি কিছু চান না।

গোড়ায় গোড়ায় কিছু বুঝতেই পারেননি। বগলের গ্ল্যাণ্ড-এ অস্বস্তিকব একটা ব্যথার অনুভূতি। হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখেন, ব্যথাটা কোথায় ঠিক ধরতে পারেন না। কিছুদিনের মধ্যে সেটা কমে এলো, হয়ত বা সয়ে এলো। তারপর একদিকের বুকের নীচের নরম জায়গাটা কি রকম শক্ত-শক্ত লাগল একদিন। ব্যথা নেই, অথচ জায়গাটা একটু একটু করে শক্ত হচ্ছে। এদিকে জ্বব-জ্বর ভাব, মাথাটা ঘোরে, শরীরের ওজনও কমছে মনে হয়।

তখনো ডাক্তার দেখানো দরকার ভাবেননি বা শমীকে কিছুই বলেননি। মাস চার-পাঁচ বাদে মনে হল, নরম জায়গাটা শুধু শক্ত হয়নি, লালচেও হয়েছে। সেই সঙ্গে মাথা ঘোরা বাড়ছে, সর্বদা কেমন দুর্বল মনে হয়। শেষে শমীকেই ডেকে প্রথম বললেন, দেখ্ দেখি কি হল, পাঁচ-ছ মাস ধরে এ জায়গাটায় কি একটা হয়েছে বুঝছি না।

মাসীর শরীর খারাপ হচ্ছে, মুখ ফ্যাকাশে ও সাদা হয়ে যাচ্ছে সেটা শমী আগেই লক্ষ্য করেছিল। সেটা যে শারীরিক অসুস্থতার কারণেও হতে পারে ভাবেনি। শমী দেখল, কিন্তু কিছুই বুঝল না। তার ধারণা ফোঁড়া-টোড়া কিছু হচ্ছে। জায়গাটা ভাল নয়, সে জ্ঞান আছে। কিন্তু পাঁচ-ছ মাস ধরে এই অবস্থায় আছে শুনে অবাক। তাড়াতাড়ি এক লেডী ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল মাসীকে। সেই ডাক্তার কয়েকটা ইনজেক্শন দিল, ওষুধপত্র দিল। কিন্তু উপকার কিছুই হল না।

পরের মাসকতক মাসীর কথা শুনেই ব্যাপারটা ভুলে গেল। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ভালোই আছে। তবু এক-একসময় মনে হয়, মাসী বড় রোগা হয়ে যাচ্ছে, আর অমন কাঁচা সোনার রঙ কাগজের মত সাদা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু বললে মাসী কানে

তোলে না, বলে কিছু ভাবতে হবে না। ওর দুর্ভাবনা দেখলে মাসী বেশ ভালো আছে দেখাতে চেষ্টা করে। শমীর ফুরসত কেবল বিকেলের দিকে। ভালোভাবে এম. এ. পাস করার পর মেয়ে কলেজে চাকরি পেয়েছে। সকালে তাড়াহুড়োর মধ্যে খেয়ে-দেয়ে কলেজে যায়, মাসী স্কুলে। সন্ধ্যার পর শমীকে আবার রীতিমত পড়াশুনা করতে হয়, মাসীর স্কুলের খাতা আর কলেজের মেয়েদের খাতাপত্রও দেখতে হয়। এর ওপর নিরুদ্দিষ্ট একজনের জন্য সংগোপন দুশ্চিন্তার ফলেও অনেক কিছু চোখ এড়ায়। যেটুকু অবকাশ পায়, গল্পগুজব, হাসিখুশিতে মাসীকে ফুর্তিতে রাখতে চেষ্টা করে সে। এম. এ. পড়ার সময় থেকেই শমী তার সমবয়সী হয়ে বসেছে। মাসীকে বলতে পারে না এমন কথা নেই। কলেজের কোন্ ছোকরা প্রোফেসারের জ্বালায় অস্থির, আর কখন কি কাণ্ড করে সে—সেই গল্পও বাদ যায়নি। মাসী হেসে বলে, বাড়িতে ডাক না একদিন, কথা বলে দেখি।

শমী চোখ পাকায়, মুখের ওপর চটুল কিছু বলে বসে নিজেই হেসে গড়িয়ে মাসীর কোলে আগের দিনের মতই শুয়ে পড়ে। হাসিমুখেই ফস করে একদিন বলে বলেছিল, যতই চেষ্টা করো আমার হাত থেকে তোমার ছেলের নিস্তার নেই—সেই আট বছর বয়েস থেকে নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে, শোধ না নিয়ে ছাড়ব ভাবো?

জ্যোতিরাণী একটা কথাও বলতে পাবেননি, ওর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়েছেন শুধু। আর একদিন বলেছিল, তোমার ছেলের দোষ নেই বাপু, আমি তার মাকে এভাবে কেড়ে নিলাম, সইবে কেন! এবারে দেখা পেলেই দিয়ে দেব।

এই দিনযাপনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে মাসী যে কোনো শেষের ছায়া দেখছে, শমী কল্পনাও করেনি। খেয়াল হলে শরীর কেন এত খারাপ হচ্ছে সেই অভিযোগই করে শুধু। মাস দুই আগে এক সকালে মাসীকে বেরুতে দেখে তার মনে হল, বেশ কিছুদিন ধরে সপ্তাহের ওই একটা দিনই একই সময়ে মাসী কোথায় যেন বেরোয়। জিজ্ঞাসা করলে বলে—কাজ আছে। আর সেই দিনটাতে স্কুলও কামাই করে। ওদিকে পরদা-ঢাকা তাকে কিছু ওষুধপত্র জমছে লক্ষ্য করল একদিন। কিসের ওষুধ ঠিক বুঝে উঠল না। পরের সপ্তাহে জিজ্ঞাসা করল, প্রত্যেক সপ্তাহের এই দিনটাতে কোথায় যাও বল তো, কোনো ডাক্তারের কাছে নাকি?

জ্যোতিরাণী ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়লেন। তাই।

বেশ। শমী রেগে গেল, আর আমাকে কিছু বলোনি! আমি কি বাধা দেব?

জ্যোতিরাণী চুপ। জেরায় পড়তে হবে জানা কথাই। কি অসুখ, কোন্ ডাক্তার, কেমন ডাক্তার। জ্যোতিরাণী যতটা সম্ভব এড়াতে চেষ্টা করে জানালেন, বুকের ওই ব্যাপারটার জন্যেই একজন স্পেশ্যালিস্টের কাছে কিছুদিন ধরে যাতায়াত করছেন। একেবারে সারছে না শমী এটুকুই জানে কেবল, কিন্তু সেদিন দেখে বেশ ঘাবড়ে গেল। আগের থেকে অনেক শক্ত হয়েছে, লাল হয়েছে। তক্ষুনি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে সেও ব্যস্ত হল। কিন্তু জ্যোতিরাণী আমল দিলেন না, বললেন, অত ভাবতে হবে না, চিকিৎসা তো হচ্ছেই, পরে দেখা যাবে।

পরের সপ্তাহে ইচ্ছে করেই জ্যোতিরাণী ওর পরে বেরুলেন। তারপরের সপ্তাহেও তাই।

কিন্তু গোপন করা গেল না শেষ পর্যন্ত। ধরা পড়লেনই।

: শমীর দৃষ্টি সেই দিন থেকেই সজাগ ছিল। তার কেবলই মনে হয়েছে, বিশেষ কিছু না হলে গোপনে চিকিৎসা করার মানুষ নয় মাসী। আর মনে হল, শরীর কত খারাপ হয়েছে ঠিক নেই, অথচ জিজ্ঞাসা করলেই মাসী তার চোখে ধুলো দিতে চায়। শুধু তাই নয়, মাসী যখন নিজের মনে একলা থাকে, তখন যেন কোথায় কোন্ দূরে চলে যায়। আবার এক-একসময় কি এক দুর্বহ বেদনার সঙ্গে নিঃশব্দে যুঝতেও দেখে। হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত ভয় ছেঁকে ধরতে লাগল শমীকে। মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারল না। যে রোগের বিভীষিকা তার মগজ কাটাছেঁড়া করে দিয়ে গেল, প্রাণপণে সেটা দূর করতে চেষ্টা করছে সে।

...এরপর সপ্তাহের ওই একটা দিন কলেজ যাবার জন্য ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েও শমী যেতে পারল না। কেবলই মনে হল, বিষম কিছু একটা ঘটেছে যা ও জানতে পারছে না। আজও ডাক্তার দেখাবার দিন, অথচ মাসী বোধ হয় ওর ভয়েই বেরুলো না। খানিক ঘোরাঘুরি করে ফ্ল্যাটে ফিরে এলো আবার।

ঘর তালাবন্ধ।

এরই মধ্যে খেয়েদেয়ে স্কুলে চলে গেল। শমীর ব্যাগে দ্বিতীয় প্রস্থ চাবি। তালা খুলে ভিতরে ঢুকল। কি ভেবে পরদা-ঢাকা তাকের ওষুধপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। পাশেই ছোট একটা টিনের হাতবাক্স। সেটা খুলতে দুই-একটা ভাজ-করা কাগজ চোখে পড়ল। তার একটা খুলেই শমী থরথর করে কেঁপে উঠল।

প্রেসক্রিপশন। শমী প্রেসক্রিপশন পড়েনি, সেটার মাথায় হাসপাতালের নাম দেখেই শরীরের রক্ত জল তার। প্রেসক্রিপশনও পড়তে পারা গেল না, চোখে অন্ধকার দেখছে।

ঘণ্টা দুই বাদে ক্লান্ত জ্যোতিরাণী দোতলায় এসে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে অবাক। তারপর ঘরে ঢুকে নিশ্চিন্ত একটু, শমী ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে, তার হাতে বই একটা। বইতে কিছু একটা হাসির ব্যাপার আছে বোধ হয়, ওপাশে ফিরে শমী ফুলে ফুলে হাসছে মনে হল।

জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, এরই মধ্যে তোর কলেজ ছুটি হয়ে গেল?

জবাব পেলেন না, তেমনি কেঁপে কেঁপে উঠতে দেখলেন বারকয়েক। একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলেন, তিনিই বা এত সকাল সকাল ফিরলেন কোথা থেকে সেই জেরায় নাও পড়তে হতে পারে। বললেন, হেসেই অস্থির হলি যে, কি বই ওটা?

বই ফেলে শমী এক ঝটকায় উঠে বসল। সেই মুহূর্তে জ্যোতিরাণী হতভম্ব। শমী ফুলে ফুলে হাসছিল না ফুলে ফুলে কাঁদছিল। জ্যোতিরাণীর সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাংশু। আস্তে আস্তে পাশে বসলেন। চোখে জল নিয়েই শমী হঠাৎ তাঁর কোলে মাথা খুঁড়তে লাগল, সরোষে বলে উঠল, কেন তুমি আমাকে এতদিন কিছু বলোনি? কেন আমাকে লুকিয়েছ? কেন?

জ্যোতিরাণী তার মাথায় একখানা হাত রেখে নিস্পন্দের মত বসে।

খানিক বাদে কান্না থামিয়ে শমী উঠল। হঠাৎ তার মনে হল ক্যান্সার হাসপাতালে অন্য চিকিৎসাও তো হতে পারে। যা ভাবছে তা না-ও হতে পারে। আশায় উদগ্রীব। আঁচলে চোখ মুছে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, বলো কি হয়েছে, ঠিক ঠিক বলো শিগগীর।

খানিক চুপ করে থেকে জ্যোতিরাণী বললেন, কি হয়েছে বুঝতেই তো পেরেছিস, কিন্তু জানলি কি —

প্রেসক্রিপশনে হাসপাতালের নাম দেখে। ডাক্তার বলেছে ওই হয়েছে?

জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

আবার একপ্রস্থ কান্নার বেগ সংবরণ করল শমী। শক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তার আশা নেই বলেছে?

জ্যোতিরাণী এবারে হাসতে চেষ্টা করলেন, আশা না থাকলে যাচ্ছি কেন? চুপচাপ ভাবলেন কি একটু। তারপর ঠাণ্ডা মুখে বললেন, কালীদা এলে তাকে বা আর কাউকে কিছু বলবি না।

বলব বলব, একশবার বলব। সক্কলকে ঢাক পিটিয়ে বলব। হরিদ্বারে গিয়ে যে যোগী হয়ে বসে আছে, ছোট দাদুর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে তাকেও লিখে পাঠাব। তুমি এই শত্রুতা করলে, আমিই বা ছাড়ব কেন?

গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে জ্যোতিরাণী আবার একটু সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন তাকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তোর কাছ থেকে আমি হাত পেতে অনেক নিচ্ছি, নেবও।...শুধু তুই ছাড়া আর কেউ কিছু করতে এলে অসুবিধেয় পড়ব...বললে আমার ক্ষতি করবি।

শোক আর ত্রাস ভুলে শমী এরপর চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। নিজে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আড়ালে ডাক্তারেব সঙ্গে কথা বলেছে। না, মাসীকে ও যেতে দেবে না, মাসীকে ভালো করে তুলতে হবে—মাসী গেলে ওর আর কি থাকবে? এই শেষ ঘনাতে পারে না, পারে না—মন্ত্রের মত এই কথা অজস্রবাব নিজেকে শুনিয়েছে। শুনিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে।

কালী জেঠু এসেছে। খবর এনেছে...ছোট দাদু হরিদ্বার থেকে ঘুরে এলো।...দেখা হয়েছিল। আনন্দবাবা না কোন্ এক সাধুব আশ্রমে আছে। ভালো আছে। শমীর চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে কবছিল, বলতে ইচ্ছে করছিল, ভালো থাকুক, খুব ভালো থাকুক —শুধু মাসীর খবরটা জেঠু পৌঁছে দিক তার কাছে—তার পরেও ভালো থাকুক।

বলতে পাবেনি। মাসীর দিকে চোখ পড়তে তার চোখে নিষেধ দেখেছে। শমী টুঁ শব্দও করেনি। মাসীকে সে ভয়ই করে। এত ধৈর্য এত সহিষ্ণুতা বুঝি কোনো মানুষের হয় না। মাসী বলেছিল, কাউকে কিছু বললে ক্ষতি হবে। মাসীর মত এত নরম মানুষ আর দেখেনি শমী, আবার এত শক্ত মানুষও দেখেনি।

একে একে তিনটে সপ্তাহ কাটল। এর মধ্যে জেঠু আর আসেনি। সপ্তাহে একদিন অন্তত আসেই। এদিকে তিন সপ্তাহ ধরে মাসীও নীরবে কি বুঝি চিন্তা করে চলেছে। ছুটির দিন তাকে জেঠুর প্রত্যাশায় থাকতে দেখেছে। সেদিন বলল, কালীদাকে একবার ফোন করে আয় তো, কেন আসছেন না—

শমীর মনে হল মাসীর কিছু একটা মতলব আছে, নয় তো এভাবে তাগিদ দিত না। তক্ষুনি বেরুলো ফোন করতে। ফিরল শুকনো পাংশু মুখে।

কি হল?

শমী নিরুত্তর খানিক। তারপর আস্তে আস্তে বলল, ও-বাড়িতে মেসোমশাইয়ের একটা বড় রকমের ফাঁড়া গেল। স্ট্রোক হয়েছিল...সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, জেঠু বলল, এখন একটু ভালো আছেন, তবে উঠে বসতেও পারেন না।

মাসীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখ রেখেছে শমী। এই স্তব্ধতাও স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক ঠাওর করে উঠতে পারছে না। ও নিজেই বেশি অস্বস্তি বোধ করছে।

কবে হয়েছে?

শমী জানালো, জেঠু এখান থেকে যাবার পরদিনই, উনিশ-কুড়ি দিন হল।

স্কুল না থাকলে মাসী বাড়ির বার হয় না বড় আজকাল। স্কুলও যে আর বেশিদিন করা চলবে না শমী অনুভব করতে পারে। কিন্তু সেই দিনই বিকেলের দিকে মাসী ওকে বলল, একটু তৈরি হয়ে নে।

শমী ঠিকই সন্দেহ করেছিল। ট্যাক্সি ত্রিকোণ রাস্তার বড় বাড়ির সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল।

জ্যোতিরাণী নামলেন। পিছনে শমী।

সামনে সেই সরু বারান্দা। সামনে পাশাপাশি সেই দুটো বসার ঘর। আর তার পাশ দিয়ে অন্দরের পথ, দোতলার সিঁড়ি।

অনেকখানি শক্তি সংগ্রহ করে জ্যোতিরাণী এ পর্যন্ত আসতে পেরেছেন। সেই ধকলেই বোধ হয় এত অবশ লাগছে। পায়ে পায়ে এগোলেন।

সামনে মেঘনা। জ্যোতিরাণী দাঁড়ালেন। মেঘনার মুখে রাজ্যের বিস্ময়। কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে চেয়ে থেকে হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে আর এক দিকে ছুটে চলে গেল সে। ওধার থেকে ভোলা আর শামুব মুখও চকিতের জন্য দেখা গেল।

জ্যোতিরাণী সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠলেন। পিছনে শমী আছে কি নেই, মনে নেই।...সেই ঘোরানো বারান্দা। জ্যোতিরাণী দাঁড়িয়ে গেলেন।

বারান্দার মাঝামাঝি গৌরবিমল আর কালীনাথ দাঁড়িয়ে। তারাও নির্বাক কয়েক মুহূর্ত। কালীনাথই এগিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না।

অনুচ্চ স্বরে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ও-ঘরে গেলে ক্ষতি হবে?

সর্ব ব্যাপারে হাসতে পারেন, হালকা কথা বলতে পারেন যে মানুষ সেই কালীনাথও থমকালেন একটু। ক্ষতির সম্ভাবনা ভেবে নয়, এই পরিস্থিতির দরুন। সামলে নিয়ে বললেন, না, ক্ষতি কি হবে, ভালই আছে এখন...তবে বাঁ দিকটা ধরে গেছে, এসো।

রোগীর পক্ষে উত্তেজনা ভালো নয় ঠিকই, তবু না ডেকে পারলেন না। জ্যোতিরাণীর দিকে চেয়ে তাঁর মনে হল এই একজন ঘরে গেলে আর যাই হোক ক্ষতি কিছু হতে পারে না। জ্যোতিরাণী পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। সামনে গৌরবিমল। জ্যোতিরাণী পা স্পর্শ করলেন না, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। গৌরবিমলের মুখেও রাগ বা ক্ষোভের চিহ্ন নেই আর, তিনিও বিভ্রান্ত শুধু।

জ্যোতিরাণী দরজাব দিকে এগোলেন।

শিবেশ্বর ঠিক দেখছেন কিনা জানেন না জেগে আছেন কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তাও বুঝতে পারছেন না যেন। চেয়ে আছেন ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে, চেয়েই আছেন। তাঁর অবশ অঙ্গের ভিতর দিয়ে একটা অনুভূতি ওপরের দিকে উঠতে উঠতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। বাঁ দিকটায় সাড় নেই, ডান হাতটা তুলে আস্তে একবার নিজের চোখে আর মুখের ওপর বুলিয়ে নিলেন। তারপর হঠাৎ যেন সচেতন হলেন, স্বপ্ন নয়, তিনি জেগে আছেন, যাকে দেখছেন ঠিকই দেখছেন। উদ্ধত উত্তেজনায় মুখের চেহারা বদলাতে লাগল।

অস্ফুট মৃদুস্বরে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, বসব?

এই বিকল শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কোথায় যে এত চাপা আবেগ জমেছিল শিবেশ্বর জানেন না। জবাব দিলেন না, দিতে পারলেন না। মাথার মধ্যে কি একটা হচ্ছে। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। অপলক দু চোখের দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে আবছা হয়ে আসছে।

তেমনি মৃদুস্বরে জ্যোতিরাণী বললেন, তোমার অসুবিধে হচ্ছে, আমি যাই তাহলে...।

না, শিবেশ্বর তাও চান না। শেষ চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন বুঝি। চোখের ইশারায় সামনের চেয়ারটা দেখালেন।

জ্যোতিরাণী বসলেন। তারপর শান্ত মনোযোগে অর্ধপঙ্গু মানুষটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন একবার। এত কাছাকাছি প্রায় পনের বছর পরে দেখা। শরীর ভেঙেছে, মাথার চুল অর্ধেক সাদা, দুদিকের চোয়াল উঁচিয়ে আছে, মুখের একটা দিক বেঁকে গেছে, সর্বাঙ্গে বার্ধক্যের অপ্রসন্ন ভ্রূকুটি। চাউনিটাই শুধু নিষ্প্রভ নয় অত।

জ্যোতিরাণী বলেননি, আপনা থেকেই তাঁর মুখ দিয়ে কথাকটা বেরুলো যেন। ...শরীরটা এভাবে নষ্ট করলে...

বিড়বিড় করে শিবেশ্বর বললেন, তোমারও তো ভালো দেখছি না কিছু।

কথার সুর টানা, জড়ানো, প্রায় অস্পষ্ট বিকৃ । এই রোগে এ-রকমই হয়। উদগত অনুভূতিগুলো এবার চোখের দিকে ভিড় করতে চাইছে শিবেশ্বরের, কিন্তু তা যদি করে, তার আগে আবার স্ট্রোক হোক। তেমনি টানা বিকৃত স্বরে বললেন, কেন এলে...।

একটু চুপ করে থেকে জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে বললেন, এ-রকম হয়েছে আগে জানতুম না...আজ খবর পেয়ে মনে হল এ কদিন তুমি অনেকবাব আমাকে ডেকেছ।

অন্যদিকে মুখ ফেবাতে চেষ্টা কবলেন শিবেশ্বর। কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ ফিরিয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁর ভিতর থেকে কে বলেছে, এই বোধ হয় শেষ দেখা, বোধ হয় শেষ কথা। তাই থেমে থেমে আবার বলে গেলেন, এ বাড়ি থেকে চলে যাবার পর তুমি এত বড হয়ে উঠেছিলে যে আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই আইনের দাবি ছেড়ে দিয়ে দেখার ঝোঁক চেপেছিল তুমি কি করো--একটুও নীচে নামো কিনা। ...বিভাসের ঘরে গেছ শুনে তোমাকে ঘৃণা করতে পারার মত আনন্দ হয়েছিল আমার। কিন্তু ও মরে যাবাব পর কালীদা খটকা বাধালো আবার। সব সময় গোলমেলে কথা বলে কালীদা...বলল, সে আগেই জানত জ্যোতির এত বড় দয়া বিভাস সহ্য করতে পারবে না, ও নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনল। আমি বিশ্বাস করতে চাইনি, তোমাকে বড় দেখতে চাইনি, কালীদার ওপর রাগ হয়েছিল...কিন্তু সব আবার গণ্ডগোল হয়ে গেল দিনের পর দিন হাসপাতালে সিতুর বিছানার পাশে তোমাকে দেখে, আর থানায় সেই একদিন তোমাকে আব শমীকে দেখে। তোমাকে সেভাবে আর ঘৃণা করতে পারছিলাম না, ছোট করে দেখতে পারছিলাম না বলেই নিজে আরো বেশি জ্বলে মরছিলাম। কিন্তু আজ কেন এলে বলো...আমাকেও দয়া করতে চাও?

এত কথা বলে শিবেশ্বর হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। কপালে আবার ঘাম দেখা দিয়েছে। শেষের কথাকটা বিকৃত আর্তনাদের মত শুনিয়েছে। সম্ভব হলে জ্যোতিরাণী উঠে কাছে এসে বসতেন, সম্ভব হলে কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতেন। সম্ভব নয়। কিন্তু একসঙ্গে এতগুলো কথা আর এমন কথা জ্যোতিরাণী কি কোনদিন শুনেছেন? এক নিষ্প্রাণ স্তব্ধতার মধ্যে বাস করছেন তিনি এখন, ভিতরে ভিতরে শেষের পথে পা ফেলার

জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তবু বুকের তলায় এ-রকম কাটা-ছেঁড়া হয়ে যাচ্ছে কেন।

যাক। সহ্য করতে পারবেন। কিন্তু আর কারো বুকের তলায় কিছু হোক এ তিনি চান না। চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে তেমনি ধীর মৃদু স্বরে জবাব দিলেন, না, আমি কিছু চাইতে এসেছি।...আমি সত্যি খুব তুচ্ছ, কত তুচ্ছ প্রত্যেক দিনই টের পাচ্ছি। তুমি মন খারাপ কোরো না, শরীর নষ্ট কোরো না...ভালো হয়ে ওঠো।...আর, তুমি আপত্তি না করলে আমি একবার সিতুর সঙ্গে দেখা করতে যাব।...সে খবর পেয়েছে?

যাতনা চাপার মত করে শিবেশ্বর জবাব দিলেন, জানি না, খবর পেলেও আসবে না।

তবু আমি যাব একবার। তোমার জন্য আসা দরকার, আর ওই একটা মেয়ের জন্যেও। ওকে ফেরাতে পারলে আমার আর কিছু চাওয়ার থাকবে না। আমরা না পারি, শমী ওকে ফেরাবে...তোমার আপত্তি হবে না তো?

শিবেশ্বরের চোখে হঠাৎ বুঝি আগ্রহ দেখা গেল একটু। বললেন, শমীকে একদিন একটু পাঠিয়ে দেবে?

জ্যোতিরাণী আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। অপলক নেত্রে শেষবারের মতই বুঝি সামনের অর্ধবিকৃত মুখখানা দেখে নিলেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে দোরগোড়ায় এসে পরদা সরিয়ে দাঁড়ালেন। বারান্দার রেলিং-এর কাছে তিনজন দাঁড়িয়ে, কালীনাথ, গৌরবিমল আর শমী। ইশারায় জ্যোতিরাণী শমীকে ডাকলেন। শমী তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে খুব মৃদু সুরে বললেন, ভিতরে গিয়ে বোস একটু।

নিজে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন জ্যোতিরাণী। তারপর পায়ে পায়ে বারান্দার ওই রেলিংয়ের দিকেই এগোলেন। গৌরবিমলের উদ্দেশে অনুচ্চ স্পষ্ট সুরে বললেন, আমি একবার হরিদ্বারে যেতে চাই...আপনি দয়া করে সেখানকার গুরুদেবকে একটু লিখে দেখবেন, অনুমতি দেন কিনা?

গৌরবিমল মাথা নাড়লেন শুধু, লিখবেন।

...তিনি কি সিতুর সম্পর্কে সব জানেন?

গৌরবিমল আবারও মাথা নাড়লেন। জানেন।

দুই-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে জ্যোতিরাণী কালীনাথের দিকে তাকালেন—আমি নীচে অপেক্ষা করছি, শমী বেরুলে পাঠিয়ে দেবেন।

কালীনাথ বা গৌরবিমল কেউ বলতে পারলেন না, নীচে কেন, এখানেই বসতে পারে, এখানেই অপেক্ষা করতে পারে। বলার কথা ভাবার আগেই জ্যোতিরাণী ধীর শান্ত পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেছেন।

কালীনাথ পিছন থেকে দেখছেন। গৌরবিমল দেখছেন। এই জ্যোতিরাণীর স্বাস্থ্য আগের তুলনায় ভেঙেছে, দেহ শীর্ণ হয়েছে, গায়ের রং এত সাদাটে হয়ে গেছে যে মুখের গলার নীল শিরা ফুটে উঠেছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও কিছু যেন দেখলেন তাঁরা, যা আগে কখনো দেখেননি। একদিনের এ-বাড়ির বউ জ্যোতিরাণী আজ অনেক খুইয়েছে অনেক হারিয়েছে, তবু এই জ্যোতিরাণী বুঝি এমন কিছু পেয়েছে যা ওই অনেক খোয়ানো অনেক হারানোও ছাপিয়ে উঠেছে।

কি সেটা দুজনের কেউ ঠাওর করে উঠতে পারলেন না।

পঁয়তাল্লিশ

শমী বেঁকে বসেছিল। মাসীকে নিয়ে হরিদ্বারে রওনা হতে চায়নি। তার কেবলই মনে হয়েছে মাসীর এত তাড়া তার জন্যে। তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে। কিন্তু বাপের এত বড় অসুখের খবর পেয়েও যে ছেলে এলো না, তারা গেলেই সে ফিরবে মনে হয় না। সে চেষ্টা একমাত্র ছোট দাদু করতে পারতেন। ও-বাড়ির লোকেরা এ ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট দেখে শমী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

মাসী ওকে নিয়ে হরিদ্বারে যেতে চায় শোনামাত্র মেজাজ বিগড়েছে।—এই শরীর নিয়ে তুমি যেতে পাবে না।

জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করেছেন, তুই কলেজ থেকে কবে ছুটি নিতে পারবি বল।

ছুটি নিতে পারব না, ছুটি পাওয়া যাবে না।

ছুটি না নিলে তো আমায় একাই যেতে হবে রে।

এইখানেই মাসীকে ভয় শমীর। জানে সঙ্কল্প যদি করে থাকে, তার নড়চড় হবে না। তবু বাধা দিতে চেষ্টা করেছে, তুমি যাবে কেন?

যাওয়া দরকার। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

কেন, ও-বাড়ির ওঁরা কেউ গেলে পারতেন না?

ওঁদের যাওয়ার সঙ্গে আমার যাওয়ার অনেক তফাৎ। পারিস তো দিন সাতেকের ছুটি নে।

অনেক তফাৎ শমীও জানে। কিন্তু তাব মন সায় দিচ্ছে না। ভাবনা মাসীকে নিয়ে। একে শরীরের এই অবস্থা, গিয়ে যদি আরো দুঃখ পায়, আঘাত পায়। ওদিকের রাগ যে কার ওপর সব থেকে বেশি, শমী ভালই জানে। দুশ্চিন্তা গোপন করতে পারেনি, মাসীকে বলেওছে কথাটা। কিন্তু মাসীর জবাব শুনে মুখে কথা সরেনি। মাসী বলেছে, ও আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে, এখনো না গেলে পরে আরো বেশি দুঃখ পাবে।

কলেজ থেকে শমী ছুটি না নিয়ে পারেনি। রওনা হবার পরেও ভিতরটা দুশ্চিন্তায় ছেয়ে ছিল। ডাক্তারের মুখে শুনেছিল, এ রোগের যন্ত্রণা শুরু হলে সহ্য করা শক্ত হয়। শমীর বিশ্বাস, যন্ত্রণা শুরু হয়েইছে। মাসী তা মুখ বুজে সহ্য করছে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এক-একদিন ঘরে আর ভিতরের বারান্দায় পায়চারি করতে দেখে তাকে। পাছে ও টের পায়, সেজন্য ঘরের আলোটা পর্যন্ত জ্বালে না। জিজ্ঞাসা করলেও, খুব একটা যন্ত্রণা হচ্ছে বলে না। এজন্যেই শমীর আরো বেশি ভয়।...তবে কি সময় এগিয়ে এলো? এই জন্যেই ছেলেকে ফেরাবার তাড়া? এই অসুখ জানবার পর থেকে শমীর মুখের হাসি গেছে, আনন্দ গেছে। সর্বক্ষণের ত্রাস। মাসী নেই ভাবতে চেষ্টা করলেও দম বন্ধ হতে চায়।

হরিদ্বারে পা দিয়েই ভালো লাগল। প্রকাশ পাক আর নাই পাক, কটা বছরের প্রত্যাশার জ্বালা-পোড়া ছিল, রোমাঞ্চও ছিল। স্টেশনে আশ্রমের লোক এসে পরম সমাদরে নিয়ে গেল তাদের। ছোট দাদু আগেই খবর দিয়ে রেখেছেন বোঝা গেল। সব থেকে ভালো লাগল এখানকার প্রধান যিনি তাঁকে। আনন্দবাবাকে। হাসি-খুশি, প্রিয়জনের মত ব্যবহার। মাসীর পর শমী প্রণাম করে উঠতে কাঁধে হাত দিয়ে কাছে বসালেন। যেন

কত কালের চেনা। মাসীকে দেখে বললেন, খাসা মা দেখি আমার, অ্যাঁ? পাগলটা এই মাকে ছেড়ে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে! শমীর দিকে ফিরেছেন, আর এই বুঝি শমী? এও তো খাসা সুলক্ষণা মেয়ে। কেমন যোগীপুরুষ দেখলি বেটি, দেখেই ধরেছি। তারপরেই অট্টহাসি, আঙুল তুলে অপরাপরদের দেখিয়ে মন্তব্য করলেন, ভণ্ডর কথা শুনে ওরা সব মনে মনে হাসছে—এঃ, গৌরের চিঠির খবরটা কাউকে না বললেই ভালো হত দেখছি।

সব ভুলে শমী তাঁকেই দেখছিল আর হাসছিল মুখ টিপে। সাধু-সন্ন্যাসী সম্পর্কে মনে মনে কি রকম একটা ভয় ছিল, সেটা এখানে আসামাত্র গেল। শিশুর হাসি সুন্দর। বৃদ্ধ শিশুর মত হাসতে পারলেও কম সুন্দর নয়। হঠাৎ তার আশা হল, এই লোকের দয়ায় মাসীর অসুখটা সেরে যায় না!

সকলকে বিদায় দিয়ে, এমন কি শমীকেও তাদের নির্দিষ্ট ঘরে পাঠিয়ে মাসীর সঙ্গে খানিকক্ষণ কি কথা বললেন, জানে না। পরে মাসীর মুখ দেখেও কিছু বোঝা গেল না। এখানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো স্থির আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যেন।

শমী উদগ্রীব সারাক্ষণ। নতুন জায়গায় আসার আনন্দ বা রোমাঞ্চও অনুভব করছিল না আর। যে তাগিদে আসা, তার সঙ্গে দেখা হয়নি এখনো।...তারা যে এসেছে না জানার কথা নয়। জানে বলে ঘর থেকে বেরোয়নি।

দেখা হল দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর। একজন লোক এসে খবর দিল, আনন্দবাবা সাত্যকি ভাইয়ের ঘরে যেতে বলেছেন তাদের।

শমীর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল কেমন। কিন্তু মাসী তেমনি নির্বিকার। বললেন, চল্—

সেই লোকটিই ঘর দেখিয়ে দিল। বিচ্ছিন্ন ঘরগুলোর একেবারে শেষের ঘরটা। কলের মূর্তির মতই শমী মাসীর পাশে পাশে সেদিকে চলল।

ছোট তক্‌তকে ঘর। এক কোণে পরিচ্ছন্ন ভূমিশয্যা। শয্যা বলতে পাতলা কম্বলের ওপর চাদর পাতা। বালিশের মত পাতলা একটা তুলোর বস্তুও আছে। এ ঘরে সিতু একাই থাকে। মাঝে ছোট দাদু এসে দিনকতক তার সঙ্গে ছিল। কম্বলের আসনে বসে, সামনে ছোট জলচৌকিতে মোটা ইংরেজী বই একটা। সিতু পড়ছিল।

না, একবর্ণও পড়ছিল না। বইয়ের দিকে চেয়ে ছিল শুধু। দোরগোড়ায় কারা এসে দাঁড়ালো টের পেয়েছে। টের সকালেই পেয়েছে। গত রাত্রে আনন্দবাবা জানিয়েছেন কারা আসবে। শোনামাত্র সিতু হৃষিকেশ বা লছমনঝোলার আশ্রমে চলে যেতে চেয়েছিল। অনুমতি মেলেনি।

রাতে ঘুমোয়নি। সকাল থেকেও নিজের সঙ্গে যোঝার বিরাম নেই। গত প্রায় চার বছরের বিস্মৃতির নিবিষ্টতা ঘুচতে চলেছে। সংযমের বাঁধ বার বার ভাঙার উপক্রম হয়েছে। এক অন্ধ আদিম মানুষ বার বার জেগে উঠতে চেয়েছে তার মধ্যে। আর প্রাণপণে সে তার কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করে চলেছে।

এখনো পারেনি উদ্ধার করতে। দোরগোড়ায় ওই দুজন এসে দাঁড়ানো মাত্র পুরনো ক্ষতর মুখ দিয়ে বুঝি রক্ত ঝরতে শুরু করল। জ্বালা—বিষম জ্বালা। সেই জ্বালা সহ্য করার চেষ্টায় সিতুর পাষাণমূর্তি। মুখ তুলল না, তাকালো না, ডাকল না। দু চোখ বইয়ের পাতায় আটকে আছে।

শমী আধাআধি ঘরে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ ভারি ভালো লাগছে তার। সঙ্কোচ আছে, শঙ্কা উবে গেছে। ঘর দেখছে, ঘরের মানুষকে দেখছে। অদ্ভুত লাগছে। কোটিপতির ছেলের এই ভূমিশয্যা, ভূমিআসন। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে ধপধপে সাদা থান, গায়ে পরিষ্কার গেঞ্জির ওপর তেমনি সাদা চাদর জড়ানো। কৃচ্ছ্রসাধনের উগ্রতা নেই, আবার আরামও দূরে সরে আছে।

নিষ্পলক চেয়ে আছেন জ্যোতিরাণীও। শুষ্কতার বুকে প্রথম বন্যার মত একটা অনুভূতি কিছুতে আর প্রতিরোধ করতে পারছেন না তিনি। ভিতরটা থর-থর করে কাঁপছে তাঁর। ভয়ে নয়, শঙ্কায় নয়। কেন কাঁপছে তাও জানেন না। থেকে থেকে এক পাগল শিল্পীর আঁকা একখানা ছবি চোখে ভাসছে তাঁর। সেই ছবি আজও প্রভুজী ধামে টাঙানো আছে। ওই ছবির সঙ্গে আজ এই মুখের বড় বেশি মিল দেখছেন তিনি। দেখছেন আর কাঁপছেন।

চেয়েই আছেন। নিজের অগোচরে ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

সিতু উঠল। একপাশে দুটো আসন পেতে দিয়ে আবার বসল। মুখ তুলে একবারও তাকায়নি। দু চোখ বইয়ের দিকে।

বোসো।

জ্যোতিরাণী আত্মস্থ হলেন একটু। বসলেন। শমী আর একটু এগিয়ে এলো শুধু, দাঁড়িয়েই থাকল।

অস্ফুট মৃদু স্বরে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছিস?

ভালো। দৃষ্টি বই থেকে সরল না।—তুমি কেমন আছ?

জ্যোতিরাণী চট করে জবাব দিতে পারলেন না। বিহ্বল দু চোখ ওই মুখখানা বেষ্টন করে আছে। আস্তে আস্তে বললেন, কেমন আছি একবার দেখ্ না চেয়ে।

সিতু মুখ তুলল না, তাকাল না। উদগ্রীব মুখে শমী দাঁড়িয়ে। একালের এম. এ. পাস মেয়ে, কলেজে পড়ায়, কিন্তু ভিতর থেকে একটা কান্না ঠেলে উঠছে কেন জানে না।

খানিক বাদে বইয়ের ওপর চোখ রেখে তেমনি শান্ত গম্ভীর স্বরে সিতু জিজ্ঞাসা করল, তোমরা এখানে কেন এসেছ?

জ্যোতিরাণীর মুখ সাদা হচ্ছে আবার। তেমনি মৃদু স্বরে বললেন, তোকে নিয়ে যাবার জন্য।

কোথায় নিয়ে যাবে...তুমিই বা কে?

শমীর বুকে একটা আঘাত এসে লাগল যেন। জ্যোতিরাণী আরো স্থির, কিন্তু মুখ আরো ফ্যাকাশে। বললেন, কেউ না হলে বসতে বললি কেন?

এখানকার মালিকের হুকুমে।

কয়েক নিমেষের ব্যথাতুর নীরবতা, জ্যোতিরাণী তার থেকে টেনে তুললেন যেন নিজেকে। বললেন, আমি তোর কেউ হতে চাইব না।...কলকাতায় একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, প্রতি মুহূর্তে তোকে আশা করছেন।

ভালো করে চিকিৎসা করাবার জন্যে ছোট দাদুকে লিখেছি।

এর বেশি আর কিছু করার নেই তোর?

না।

কিন্তু এখানকার বাবাও বলেছেন তোর যাওয়া উচিত। তাছাড়া শমী কি দোষ করেছে, ওর কি হবে?

ঈষৎ ঝাঁঝালো সুরে শমী বাধা দিয়ে উঠল, আঃ মাসীমা! আমার জন্যে তোমাকে কারু কাছে ভিক্ষে করতে হবে না।

আস্তে আস্তে মুখ তুলে সিতু তার দিকে তাকালো। শুধু শমীর দিকে। বলল, দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।

শমী বসল না, গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিতুর খরখরে দৃষ্টি আবার বইয়ের পাতায় নেমে এলো। একটু থেমে আগের প্রশ্নের ঠাণ্ডা জবাব দিল, আমি কারো দোষ-গুণের বিচারে বসিনি, শমীর কি হবে তা জানি না। এই দিনে কেউ কারো পথ আগলে বসে থাকে না, থাকতে পারে না—এই শিক্ষা ও এখনো পায়নি কেন তা ভাববারও সময় পাইনি।

শমীর মুখ লাল হতে লাগল আস্তে আস্তে। ঘর ছেড়ে সবেগে প্রস্থান করার ইচ্ছে, কিন্তু পা দুটো পাথরের মত আটকে আছে মেঝের সঙ্গে। এই অপমানের সবটুকুই মাসীর উদ্দেশ্য নয়। ওই ঠাণ্ডা মুখেও মেয়েদের প্রতি ঘৃণা আর আক্রোশ পুঞ্জীভূত দেখছে শমী।

ঠিকই দেখছে। সিতুর এত আয়াসে গড়া সংযমের বাঁধ ভাঙছে একটু একটু করে। মৌন স্তব্ধতায় ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। বইয়ের থেকে চোখ ফেরায়নি, নিশ্চল গম্ভীর। ভিতরে ভিতরে আরো দূরে সরে যেতে চেষ্টা করছে, গলার স্বরও তাই আরো ধীর স্থির। খানিকক্ষণের স্তব্ধতা ভেদ করে সেই কণ্ঠস্বর কানে এলো, আমার দাদুকে মনে আছে তোমার, না ভুলেছ?

প্রশ্ন জ্যোতিরাণীর উদ্দেশে। অস্ফুট জবাব দিলেন, ভুলব কেন...

ভোলার কথা। ভুললেও আমি মনে করিয়ে দিতে পারি। মুখ না তুলে সিতু তেমনি নির্মম গাম্ভীর্যে কেটে কেটে বলে গেল, শুনেছি দাদুর বাবাও অত্যাচারী ছিল, আর দাদুর জন্মের আগে তার মা বিধবা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেও দাদুর মা রুখে দাঁড়িয়েছিল, রুখে দাঁড়িয়ে দাদুর বাবার পাপই দূর করতে চেয়েছিল। যা চেয়েছিল তা পেরেছিল। ভিটে ছেড়ে চলে যায়নি। বিধবা হবার পরেও তার রূপ ছিল, আনন্দের সময় ছিল, টাকা ছিল।...সব থাকা সত্ত্বেও দাদুর মা শুধু দাদুকে মানুষ কবার সাধনা করে গেছল। দাদু তার সেই মায়ের আদর্শ আর স্মৃতি বুকে নিয়ে চোখ বুজেছে। কিন্তু তুমি আমার জন্যে কি রাখলে?

গম্ভীর যাতনাতপ্ত দু চোখ এই প্রথম জ্যোতিরাণীর মুখের ওপর বিদ্ধ হল। অনেক অনেক দিনের অসহ্য দহনে দৃষ্টি আচ্ছন্ন, নইলে এই মূর্তি দেখে সিতুর আঁতকে ওঠার কথা। আগের চোখ নিয়েই তাকিয়েছে, আগের চোখ নিয়েই দেখছে। তেমনি চেয়ে থেকেই শেষ মর্মান্তিক আঘাত করে বসল। বলল, আমার বাবা এখনো বেঁচে, আর আমার মা বিধবা, বড় চমৎকার যুগে বাস করছি! আজ তুমি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এত পথ ছুটে এসেছ?

সিতুদা! শমীর অস্ফুট আর্তনাদ।

সিতুর জ্বালা-ধরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা আস্তে আস্তে সামনের খোলা বইয়ের ওপর ফিরে এলো আবার। জ্যোতিরাণী পাথর। শেষ রক্তবিন্দুও বুঝি সরে গেছে মুখ থেকে, ভয়াবহ

রকমের সাদাটে নিষ্প্রাণ মূর্তি। দুই ঠোঁট নড়ল একটু, অস্ফুট স্বরে বলতে চেষ্টা করলেন, আমি চলে যাচ্ছি...

তোমরা আনন্দবাবার অতিথি, তাঁকে বলে যাও।

সিতুর মুখের ওপর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শমী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মাসীকে টেনে তুলল। তাঁরই ওপর ঝাঁজিয়ে উঠল, ছেলের কাছে আসার সাধ মিটেছে তো—চলো এবার। তারপরেই মনে হল, ধরে নিয়ে গিয়ে এক্ষুনি বিছানায় শুইয়ে দেওয়া দরকার।

ধরে বাইরে নিয়ে এলো। দূরের উঠোনে দাঁড়িয়ে আনন্দবাবা তামাক খাচ্ছেন আর জনাকয়েক ভক্তের সঙ্গে কথা কইছেন। জ্যোতিরাণীকে এভাবে ধরে নিয়ে আসতে দেখে হুঁকোটা একজনের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন।—কি হল, মায়ের শরীর খারাপ নাকি?

শমীর হাত থেকে জ্যোতিরাণী নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন। কিন্তু শমী রাগ আর চেপে রাখতে পারল না, বলে উঠল, আপনার ওই মস্ত জ্ঞানী পুরুষ তার মাকে একলা পেয়ে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে, বুঝলেন? আমরা রাতের গাড়িতেই চলে যাচ্ছি—

আনন্দবাবার দুই চক্ষু বিস্ফারিত। দুজনকেই দেখলেন একটু, কি বলবেন ভেবে না পেয়েই যেন নিজের টাক মাথায় হাত বুলোলেন একবার।—আমার মা-কে অপমান করেছে...বলিস কি রে! মা-কে আবার ছেলে অপমান কবে কি করে? তাছাড়া ঘরে তো তুই ছিলি—একলাই বা পেল কি করে? অপমান করল আর তুই কিছু বললি না?

জ্যোতিরাণী নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে। আর রাগে শমীর মুখ তেমনি লাল। আনন্দবাবা আর এক পলক তাকে দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে আঙুল তুলে সিতুর ঘর দেখিয়ে বললেন, মা, আমি তোকে হুকুম দিচ্ছি, বলে আয়, যা মুখে আসে তাই বলে আয়—মা-কে অপমান করে এত সাহস! এই ফাঁকে আমি মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি, কি অপমান করল।

মাসীর কাঁধে হাত রেখে বারান্দা ধরে তাকে ওদিকে নিয়ে চললেন তিনি। শমী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। একলা কথা বলতে চান বুঝেছে।

বারান্দার শেষাশেষি এসে আনন্দবাবা দাঁড়ালেন। খুব কোমল গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, পাগলটা বড় দুঃখ দিয়েছে, না মা?

জ্যোতিবাণীর মুখে রক্ত নেই এখনো, আত্মস্থ হতে চেষ্টা করে সামান্য মাথা নাড়লেন। দুঃখ দেয়নি। বলতে পারলে বলতেন, যা পাওনা তাই পেয়েছি।

আনন্দবাবার ঠোঁটের হাসি গালের ভাঁজ ধরে সমস্ত মুখে ছড়াতে লাগল। গলার সুরেও অনাবিল আনন্দের রেশ।—দেখো মা, একটা কথা বলি, অনেক দুঃখ পেয়েছ, কতজনে তোমাকে কত কি বলেছে ঠিক নেই। কিন্তু আমি বলি, যা হয়েছে তার সবটুকুই দরকার ছিল—পাইপয়সা পর্যন্ত দরকার ছিল—এর এতটুকু বাকি থাকলে তোমার ছেলের পাওনায় ঘাটতি পড়ত।

জ্যোতিরাণীর বুকের তলায় কি যাতনানাশী প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে কেউ? নির্বাক ঠাণ্ডা দু চোখ তুলে তাকালেন তাঁর দিকে।

তেমনি খুশি-ঝরা মিষ্টি গলায় আনন্দবাবা বলে গেলেন, ভক্তদের উপদেশ দিই, আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ থেকেই সব কিছুর জন্ম। তেমন আধার পাইনে বলে এর থেকেও বড় কথাটা বলিনে, বলিনে—স তপোহ-তপ্যত—তপস্যা থেকে দুঃখ থেকে সব কিছুর সৃষ্টি। সুখের সাধনার থেকেও দুঃখের সাধনার একটা মহৎ দিক আছে, তুমি যে এই সৃষ্টি আর এই সাধনার মধ্যে একেবারে ডুবে আছ গো মা!...মানুষের, শুধু মানুষের কেন, গোটা মানব সমাজের যে কোনো মঙ্গলের গোড়াতে আধ্যাত্মিক শক্তি আছেই, তোমাব ছেলে এই শক্তির দিকে এগোচ্ছে দেখার পরেও দুঃখ?

জ্যোতিরাণী কাঁপছেন অল্প অল্প, সর্বাঙ্গ দুলছে। চোখের সামনে আনন্দবাবার মুখখানাও বুঝি আলোয় আলোয় ঝাপ্‌সা হয়ে যাচ্ছে এক-একবার। এই অনির্বচনীয় অনুভূতিটুকুর আর কোনো ভাষা নেই, আর কিছু প্রকাশ নেই।

দূরে দাঁড়িয়ে শমী মাসীকেই লক্ষ্য করছিল বটে, কিন্তু মন এদিকে ছিল না। ভিতর জ্বলছে এখনো। চলে তো যাবেই, সম্ভব হলে আজই যাবে, কিন্তু এত অপমান আর উপেক্ষার একটা জবাবও দিয়ে যাবে না? মাসীকে নিয়ে আনন্দবাবা দূরে সরার সঙ্গে সঙ্গে শমীর পা-দুটো আবার ওই ঘরেব দিকেই ফিবতে চেয়েছে। নিজেকে সংযত না করে যেতে পারছিল না।

সিতুর সামনে বইটা তেমনি খোলা পড়ে আছে। জানালা দিয়ে দু চোখ দূরের দিকে উধাও—ওই মনসা পাহাড়ের দিকে। ঘরে কাবো পদার্পণ ঘটেছে টের পেয়ে এদিকে ফিরল।

শমী। তার দিকেই চেয়ে আছে, তাকেই দেখছে। বলল, মাসীকে নিয়ে তোমাদের আনন্দবাবা ওদিকে গেলেন, বোধ হয় সান্ত্বনা-টান্তনা দিচ্ছেন। তুমি যে অপমান করেছ সেটা কিছু নয় তাই বোঝাচ্ছে বোধ হয়। তা বোঝান, কিন্তু আমিও তোমাকে একটু কিছু বুঝিয়ে যাবার দরকার বোধ করছি।

দুই-এক মুহূর্ত মাত্র চেয়ে থেকে সিতু বইয়ের দিকে চোখ ফেরালো। নির্লিপ্ত, নিস্পৃহ।

শোনো, আজ যাকে এভাবে অপমান করে তাড়ালে আর তার দেখা পাবে না বোধ হয়। সময় ফুরিয়ে এসেছে বলেই এভাবে ছুটে এসেছিল। মাসীর ব্রেস্ট ক্যানসার হয়েছে, এখন সেটা বাড়তির দিকে—বুঝলে?

শোনার পরেও সিতু তেমনি নির্লিপ্ত, তেমনি নির্বাক খানিকক্ষণ। তারপর নিস্পৃহ গোছের মন্তব্য করল, অনেকেরই হয়—এ রোগ সারেও না বড় একটা।

তপ্ত বিদ্রূপে শমী ঝলসে উঠল তক্ষুনি, এত জানো? তাহলে তো অনেক জ্ঞানলাভ হয়েছে দেখছি তোমার!

সিতুর ঈষৎ অসহিষ্ণু স্থির দৃষ্টি শমীর দিকে ফিরল আবার। শমীর অস্থির দুচোখ সমান তালে তার মুখের ওপর ঝাপ্‌টা দিয়ে গেল আর এক প্রস্থ। বলল, ছেলে হয়েও এই মা-কে চিনলে না, এই মায়ের ভিতর দেখতে পেলে না—তোমার দুঃখ ঠেকাবে কে? হরিদ্বার ছেড়ে হিমালয়ের মাথায় গিয়ে বসলেও তোমার শোক ঘুচবে না, বুঝলে?

যা বলতে এসেছ, বলা হয়েছে?

না, হয়নি। মস্ত সাধু হয়ে বসেছ এখানে এসে—ওই মা যাক থাকুক কিছু যায়

আসে না, কেমন? তোমার ভণ্ডামি আমি জানি না? তোমাকে আমি চিনি না? সেই দশ বছর বয়েস থেকে তুমি যে কি আমার জানতে বাকি?

আমিও জানি। ঠাণ্ডা গলায় সিতু জবাব দিল, নিজের এই ভণ্ডামি ছাড়তেই চেষ্টা করছি।

করো করো, খুব ভাল করে করো। কিন্তু না পারলে তখন আবার শমীর কাছে ছুটে যেও না, মাসী চলে গেলে শমী তোমাকে চিনতেও পারবে না, দয়া করে এটুকু মনে রেখো।

জ্বলন্ত ক্ষোভে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই শমী স্থির হঠাৎ। বারান্দার ওমাথায় আনন্দবাবা দাঁড়িয়ে হাসছেন মিটি-মিটি। আর তাঁর দু পায়ের ওপর মাথা রেখে নিশ্চল পড়ে আছেন জ্যোতিরাণী।

কতক্ষণ এভাবে পড়ে আছে মাসী, শমী জানে না। মনে হল অনেকক্ষণ, আর মনে হল, আবো কতক্ষণ এভাবেই পড়ে থাকবে তারও ঠিক নেই।

সেই সন্ধ্যায়ই শমীরা কলকাতায় রওনা হল আবার। আনন্দবাবা বাধা দেননি। যত রাগই হোক, আজ এসে আজই আবার কলকাতার গাড়িতে উঠতে হবে শমী ভাবেনি। দু দিনের পথ, মাসীর এই শরীর।

ঘরে এসে ঘন্টাখানেক চুপচাপ বসে থাকার পর জ্যোতিরাণীই বলেছেন, রাতের গাড়িতে ফিরবেন।

শরীরের কথা বলে বাধা দেবার আগে চাপা ঝাজে শমী বলে উঠেছিল, কেন? বড় না বলেছিলে, ছেলে তোমার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে, না এলেই নয়?

জ্যোতিরাণী চুপচাপ খানিক চেয়েছিলেন তার মুখের দিকে। তারপর শান্ত মৃদু জবাব দিয়েছেন, ঠিকই বলেছিলাম...না এলে ওর আমার দুজনেরই কত ক্ষতি হত জানিস না।

না, শমী আর কিছু বলতে পারেনি। দুই-একদিন অন্যত্র থাকার প্রস্তাব করেছিল। মাসী তাও নাকচ করেছে। তার দিকে চেয়ে চেয়ে শমীর মনে হয়েছে, এ-রকম ঘটবে জেনেই যেন এসেছিল, কাজ শেষ, এখন ফেরার তাড়া।

আনন্দবাবাকে প্রণাম করে সন্ধ্যের পরই রওনা হয়েছে। শমীর সব থেকে অবাক লেগেছে যে, আনন্দবাবাও একটি বার থাকতে অনুরোধ করলেন না তাদের। মাসীর সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছে জানে না। যাই হোক, সকালের দিকে তাঁকে দেখে যতটা ভক্তি শ্রদ্ধা হয়েছিল, এখন আর অতটা নেই। থেকে থেকে মনে হয়েছে, এমনই যদি মহাপুরুষ, মাসীর এত বড় অসুখটা টের পেলেন না কেন? এই শরীরে দুদিনের পথ ভেঙে এসে এ-রকম আঘাত নিয়ে আজই আবার ফিরে চলল মাসী, তবু এতটুকু তাপ উত্তাপ নেই কেন, উল্টে ওর মাথায় হাত রেখে পলকা ঠাট্টা করেছেন, তুই বেটী এই মেজাজে ফিরে চললি কেন—একটু হাস্ দেখি।

তারা চলে যাবার পরেই আনন্দবাবার মুখের হাসি মেলাতে দেখল ভক্তরা। উঠে পড়তেও দেখল।

সিতু ঘর ছেড়ে একবারও বেরোয়নি। মেরুদণ্ড শক্ত করে মূর্তির মতই বসে ছিল। সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

আনন্দবাবা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। অনুচ্চ কঠিন গলায় বললেন, যারা এসেছিল তারা চলে গেল।

সিতু দাঁড়িয়ে আছে। বিমূঢ়। এতদিনের মধ্যে আনন্দবাবার এমন থম্‌থমে মুখ আর দেখেনি। এই কণ্ঠস্বর শোনেনি। নিঃশব্দে আরো ভালো করে দেখার তাড়না, যে দুর্বলতার দরুন দাস মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সে কি এঁর মধ্যেও বাসা বেঁধে আছে।

বোস। আনন্দবাবা হুকুমই করলেন।

সিতু আস্তে আস্তে বসল আবার। চেয়েই আছে।

কদিন ধরে পাঠ নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলি না? আজ একটা পাঠ দেব, লেখ্ কলম নে—

প্রায় নিজের অগোচরেই সিতু কলম তুলে নিল। তেমনি ভারী থম্‌থমে গলায় আনন্দবাবা বলে গেলেন, লেখ্—ধৈর্যশূন্য তেজ শুধু দম্ভায়, নম্রতাশূন্য নীতির বোঝা শুধু ভার বাড়ায়, বিনয়শূন্য সামর্থ্যের নাম দাম্ভিকতা আর বুদ্ধিশূন্য পৌরুষের নাম অত্যাচার।...হয়েছে লেখা? তীব্র চোখে চেয়ে আছেন, বললেন, কথাগুলো যখন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ওঠা-নামা করছে টের পাবি, তখন আবার মুখ দেখাস আমাকে।

চলে গেলেন। সিতু মূর্তির মত বসে। চোখে ঝাপ্‌সা দেখছে।

আঙিনা পেরিয়ে আনন্দবাবা নিজেব ঘরের দিকে চলেছেন। এই মুখের চেহারা আর একরকম। আবছা অন্ধকারে তাঁর ভারী গালের খাঁজে খাঁজে একটা হাসির ধারা নিঃশব্দে লুটোপুটি খাচ্ছে যেন।

* * *

দিন যায়, মাস যায়। একে একে তিন মাস গত হল।

সিতুর এক-একসময় রাগ হয়, রাগের থেকেও অভিমান দ্বিগুণ। আনন্দবাবা আর তাকে ডাকেনও না, কথাও বলেন না। সিতু তাঁর চোখের আড়ালেই থাকে। তবু দৈবাৎ এক-আধসময় দেখা হয়ে গেলে চেনেনও না যেন। এই অবজ্ঞার আশ্রয় সিতু আর বরদাস্ত করে উঠতে পারছে না। এক-একসময় ঝোঁক চাপে যেদিকে দু চোখ যায় আবার বেরিয়ে পড়বে—দরকার নেই কাউকে তার। কিন্তু তাও পারে না। কি এক অদৃশ্য শক্তি যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে তাকে। যত নির্লিপ্ত কঠিনই হোন, এখানকার এই একজনকে ছেড়ে যাবার নামেও বুকের ভিতরটা একেবারে খালি খালি মনে হয়।

সব সত্ত্বেও এই আখড়া আঁকড়ে থাকার আরো একটা সঙ্গোপন কারণ আছে। দুরাশার মতই একটুখানি লোভ। প্রেমভাই তাকে মন খারাপ করতে নিষেধ করেছে। চুপি চুপি বলছে, তাদের বিশ্বাস সিতুভাইয়ের মহাসৌভাগ্যের দিন এলো বলে। বাবা যার ওপর সব থেকে বেশি সদয় হন, তাকেই শুধু ও-রকম করে শাস্তি দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেন। এ-রকম পরীক্ষায় পড়ার সৌভাগ্য ক্বচিৎ কখনো দুই-একজন ভক্তের হয়। এমন সৌভাগ্য এযাবৎ গৌরবিমলবাবুরও হয়নি। পরীক্ষার কাল কাটলেই বাবা হঠাৎ একদিন মাঝরাতে ডেকে পাঠাবেন, অন্তরের সমস্ত দুর্লভ ঐশ্বর্য ঢেলে দেবেন—তার পর দিন থেকে আর তাকে এই আখড়ায় দেখা যাবে না। সে যে কোথায় কোন্ ঊর্ধ্ব সাধনার পথে চলে যায় কেউ জানে না। এখানে সকলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, সিতুভাইয়ের এই গোছের একটা সৌভাগ্যের দিন এলো বলে।

সিতু বিশ্বাস করেনি। করেনি কারণ, এ-রকম সৌভাগ্যলাভের কোন হেতু সে খুঁজে পায়নি। তবু নিভৃতের সপ্তস্তরের তলায় একটুখানি আশা, একটু লোভ।...অহেতুক কৃপাও তো পায় কেউ কেউ। কেন পায় কে জানে।

সত্যি হোক না হোক, প্রাণপণে আশাটুকু আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে এক-এক সময়। রাতে ঘুমোতে পারে না। মন্ত্রের মত জপ করে, ডাক আসুক, ডাক আসুক, ডাক আসুক—প্রভুজী, একবার ডাক আসুক। চমকে ওঠে, বুকের তলায় কাঁপুনি ধরে—সে-রকম আকুতির মুখে নিজের সম্পূর্ণ অগোচরে এ কাকে স্মরণ করে সে, কাকে ডেকে বসে? সমস্ত রাত্তি ধরে কার পায়ে মাথা খোঁড়ে আর জপ করে, ডাক আসুক, ডাক আসুক—

ডাক এলো।

রাত্রি সেদিন গভীর। সিতু ঘুমুচ্ছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। তার নাম ধরে ডাকছে কেউ। হ্যাঁ, প্রেমভাই। ভারী গলায় বলল, বাবার ঘরে যাও, তিনি অপেক্ষা করছেন।

প্রেমভাই বেবিয়ে গেল। সিতু হতভম্ব, বিমূঢ়। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখল কিনা সেই সংশয়।...স্বপ্ন নয়, বারান্দায় প্রেমভাইয়ের মৃদু খড়মের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে।

কয়েক নিমেষ ধরে বুকের ভিতরে তুমুল দাপাদাপি চলল। তারপর স্তব্ধ। কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। সামনের আঙিনা পেরিয়ে চলল। মাথার ওপব থালাব মত চাঁদটা জ্যোৎস্না ঢালছে।

আয়, ঘুমুচ্ছিলি নাকি?

দরজার কাছে থেকে আনন্দবাবা মিষ্টি গলায় ভিতরে ডেকে নিলেন তাকে। তিন মাসের বিচ্ছিন্নতার কোনো দাগ নেই। যেন রোজই দেখা হয়, কথা হয়। আসনে বসে আছেন। পায়ে পায়ে সিতু কাছে এসে দাঁড়ালো।

বোস্।

বসল। বোবা, নির্বাক। ভিতরটা শুধু কাঁপছে একটু একটু।

আনন্দবাবাও তাব দিকে ঘুরে বসলেন, ঈষৎ কৌতুকে দেখলেন। তারপর বললেন, একেবারে যে ফাঁসির দড়ি গলায় পবার আগের মুখ দেখি তোর...ঘাবড়ে গেলি নাকি?

সিতু মাথা নাড়ল। ঘাবড়ায়নি।

বেশ, আনন্দবাবা খুশি, এবারে তোকে এক কাজ করতে হবে, যা বলব করবি তো?

সিতু আবারও মাথা নাড়ল, করবে।

মনে থাকে যেন কথা দিলি।...কালই কলকাতায় যাবি, এখান থেকে আপাতত তোর ছুটি।

সিতু বিমূঢ়, হতভম্ব। এ-রকম আদেশ হতে পারে কল্পনাও করেনি। বুঝতেও সময় লাগছে যেন। মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কলকাতায় কোথায় যাব...।

কোথায় আবার, তোর নিজের বাড়ি-ঘরে। কালই যাবি।

একটা প্রচণ্ড আঘাত খেল যেন সিতু। বিবর্ণ স্তব্ধ। হঠাৎ কান্নার মত কিছু যেন গুমরে উঠছে ভিতর থেকে। প্রাণপণে সংবরণ করতে চেষ্টা করল নিজেকে। জিজ্ঞাসা করল, এই শাস্তি কেন?

আনন্দবাবার মুখে কৌতুক ঝরল, শাস্তি কি রে বোকা, এখন যাওয়া দরকার বলেই যেতে বলছি।...নিরিবিলির কবরে ঢুকে তোর প্রতিভা খুলতে পারে, কিন্তু বাপু, চরিত্র তৈরি করতে হলে ওই সংসার-সমুদ্রের দু-চারটে ঝড়-ঝাপটা খাওয়া চাই। আগে, সেইটাই দরকার। ফুর্তি করে যা, সব দেখ, শোন, ভিতরে যে কত কি চাই-চাই করছে সেগুলোর দাসত্ব ঘোচা...এ কি কম দরকার নাকি!

এক অজ্ঞাত বিষণ্ণ আবেগ সামলানোর চেষ্টায় সিতু ঘামছে অল্প অল্প। তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল খানিক। আনন্দবাবার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, ওই পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদলেও হুকুমের নড়চড় হবে না। অনুচ্চ স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, আবার কবে ফিরতে পাব?

কি মুশকিল, তোকে কি বনবাসে পাঠাচ্ছি নাকি আমি! যখন খুশি তখন আসবি।

আমি আসার কথা বলছি না, আবার কবে তোমার কাছে ফিরতে পাব?

কি বলতে চায় সেটা ওর চোখে-মুখে লেখা। আনন্দবাবা দেখছেন। হাসছেন মৃদু মৃদু। সেই হাসির রূপ বদলাতে লাগল, রঙ বদলাতে লাগল। হাসি মিলিয়ে মিলিয়ে তাঁর মধ্যেই ছড়াতে থাকল। দেখছেন। কত কাছ থেকে যে দেখছেন ঠিক নেই যেন। সেই দৃষ্টিতে সিতুর ভিতর জুড়িয়ে যাচ্ছে, বাইরেটাও জুড়িয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টির এমন দুর্লভ স্পর্শের স্বাদ আব বুঝি কখনো অনুভব করেনি।

খানিক বাদে আনন্দবাবা কথা বললেন। এই কণ্ঠের স্বরও বুঝি আলাদা—একটা মজাব কথা বলি শোন। কেউ দূরে সরে নেই, সব তোর হাতের নাগালের মধ্যেই আছে। কিন্তু একটা সময় আসে যখন আর হাত বাড়াবার কথাও মনে থাকে না। ভাবে সব পেলাম, আর পাওয়ার কিছু নেই। একদিন যদি তোর মনে হয় যা হারিয়েছিলি তার দ্বিগুণ ফিরে পেলি সব—কানায় কানায় সমস্ত দিক ভরে উঠেছে, আর কিছু করার নেই, আর কিছু পাওয়াব নেই—তখনো যদি ভাবতে পারিস সুন্দরের সেখানেই শেষ নয়, সুন্দরের পূজায় ত্যাগের আরো সাদা নজির রেখে যেতে হবে, সুন্দর খোঁজার আরো সাদা নজির কিছু দিয়ে যেতে হবে—সর্বসুন্দরের জন্য আরো কিছু পেতে বাকি—তখন যেদিকে তাকাবি, যেদিকে ফিরবি, দেখবি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আনন্দবাবারা তোর চারদিকে ছেয়ে আছে।

কি এক দূরের নিবিষ্টতা থেকে যেন আগের সহজতার মধ্যে ফিরলেন আনন্দবাবা। হেসেই বললেন, সে যাঁর ব্যবস্থা তাঁর, ও নিয়ে তোর এখন মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই—এখন পালা, কালই যেতে হবে মনে থাকে যেন, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে।

ছেচল্লিশ

সিতু কলকাতায় ফিরল চার বছর বাদে। একভাবে চললে চারটে বছর কিছু নয়, কিন্তু ওর এই ফেরাটা এক জীবন থেকে আর এক জীবনে ফেরার মত। ফলে চার বছরের বিচ্ছিন্নতাটুকু বড় বেশি স্পষ্ট।

স্টেশনে পা দিয়ে দেখে কালী জেঠু দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ তার ফেরাটা অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। সে আসছে এ খবরটা আনন্দবাবার আখড়া থেকে বাড়িতে আগেই এসেছে বোঝা গেল। এমনও হতে পারে, এখানকার অনুরোধে উত্যক্ত হয়েই আনন্দবাবা দুটো

মিষ্টি কথা বলে তাকে ফেরত পাঠালেন। যাক, যা হবার হয়েছে। এগিয়ে এসে হাসিমুখে জেঠুকে প্রণাম করল।

কালীনাথের হাবভাবে ছদ্ম ত্রাস—করলি কি রে, সাধুসন্ন্যেসী মানুষ, পায়ে হাত দিয়ে আরো পাপের ভাগী করলি?

গাড়িতে উঠেও ছদ্মগাম্ভীর্যে নিরীক্ষণ করলেন একটু, হিমালয়ের বাতাসে মাথা বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, না আবার ঝামেলা বাধাবি?

কি মনে হতে সিতু পাল্টা ঠাট্টাই করল, কোন্‌টা চাও বলো।

পল্‌কা নিবিষ্টতায় দু চোখে ওকে খানিক ওজন করে কালীনাথ বললেন, শোন্, আমারও ভিতরে ভিতরে একটু সাধু-সাধু ভাব এসেছে। তাই কোন্‌টা চাই মিথ্যে বলব না। হয় একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় সব দায়-দায়িত্ব নিয়ে বাড়িতে থাকবি, নয়তো রাঁচির গারদে একটা ঘর ঠিক করে দেব—নিশ্চিন্ত মনে সেখানে থাকবি। এই দুয়ের মাঝখানে থেকে আর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি চলবে না, আমার হাতে এখন অনেক ক্ষমতা মনে থাকে যেন।

সিতু হাসতে লাগল। জেঠুর বাইবেটা অন্তত কিছুই বদলায়নি। জিজ্ঞাসা করল, ক্ষমতা তো বরাবরই দেখে আসছি, এখন আরো কি বাড়ল?

কালীনাথ এবার হাসতে লাগলেন। পরে মন্তব্য করলেন, তোকে দিয়ে আশা আছে দেখছি।

বাবাকে দেখে সিতু চমকেই উঠেছিল। এক অতি চেনা মহীরুহ যেন প্রাণের সমস্ত ইশারা খুইয়ে শুধু কাঠামোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেটাই বোঝার মত। সিতু প্রণাম করল। তিনি নিঃশব্দে ওর মাথায় হাত রাখলেন একটু, তারপর দেখলেন চুপচাপ।

সিতুর আগের সেই বিরূপ অনুভূতিটা গেছে, কিন্তু আগের থেকেও বেশি বিচ্ছিন্ন লেগেছে নিজেকে। শামু আর ভোলা এসে তাকে প্রণাম করেছে। মেঘনা দু চোখ বড় করে খানিক দেখেছে তাকে, তারপর মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছে। সিতু ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করেছে, হেসেই জিজ্ঞাসা করেছে, কি হল, তোরও এত ভক্তি কেন?

মেঘনার স্বভাব বদলায়নি খুব, জবাব দিয়েছে. তোমার আগের দাপটে মনে মনে কত দণ্ডবৎ হয়েছি ঠিক নেই, এখন সামনাসামনিই, ধন্যি ছেলে বাপু তুমি!

এদের সকলের চোখ দিয়েও নিজেকে দেখতে পাচ্ছে সিতু। যে মানুষ বাড়ি ছেড়ে গেছল, আর যে ফিরে এলো, তারা যে এক নয়, সকলের হাবভাবে এ বড় বেশি স্পষ্ট। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের পর বিকেলের দিকে সিতু আবার বাবার ঘরে এসে বসল। টুকটাক কথাবার্তা হল দু-চারটে। বাবার অসুখ আর চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নিল। কিন্তু সেও নিজের কানেই শুকনো কর্তব্য করার মত শোনালো। শিবেশ্বর জানালেন, এখন ভালই আছেন, হাঁটতে-চলতেও পারেন একটু-আধটু, তবে ডাক্তার বাড়ি থেকে বেরুবার অনুমতি দেননি...আর দেবেও না হয়ত।

জেঠু ঘরে আসতে স্বস্তি। কথাবার্তার ধারা সহজ হল একটু। এইভাবে এখানে কতদিন কাটাতে পারবে ভেবে সিতুর হাঁপ ধরার দাখিল।

সেই রাতেই কালীনাথ শুতে যাবার আগে শিবেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন, দলিলটা বদলাবার ব্যবস্থা করবে কিনা।

স্ট্রোক হবার পর একটু সুস্থ হয়ে শিবেশ্বর খুব ভেবেচিন্তে আর আটঘাট বেঁধে যে কাজটি করেছেন সেটা এই দানপত্রের দলিল। মনের ওপর তখন মৃত্যুর ছায়া ঘন হয়ে এঁটে বসেছে। দ্বিতীয় স্ট্রোকে সব শেষ হবে ধরে নিয়েছেন। ফলে এত অর্থ, এত বিষয়-সম্পত্তির মায়া তাঁকে উতলা করেছে, উত্ত্যক্ত করেছে। জীবনের এই সার্থকতাটুকুও কোনো কাজে আসবে না ভাবতে বুকের ভিতরটা টনটন করেছে, রক্তচাপ বেড়েছে। শেষে এই দানপত্র করেছেন তিনি। নিজের যেটুকু প্রয়োজন হতে পারে, সেটুকু শুধু আলাদা রেখেছেন। বাকি সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ আর কর্তৃত্বের ভার কালীনাথের হাতে তুলে দিয়েছেন, ছেলের জন্য যা দরকার তিনিই খরচ করবেন। ছেলে সুস্থচিত্তে ঘরে ফিরলে আর সম্পত্তি নষ্ট হবে না বুঝলে সব তার হাতে তুলে দেবার নির্দেশ। এক কথায় দলিলে কালীনাথকেই পুরোপুরি ছেলের সম্পত্তির অভিভাবক করে রাখা হয়েছে। ছেলের ভালো-মন্দ বিবেচনা করে সম্পত্তিরক্ষার সমস্ত দায়িত্ব তাঁর।

শিবেশ্বর চুপচাপ ভাবলেন একটু। তারপর ক্ষুদ্র জবাব দিলেন, এখন যা আছে তাই থাক...পরে ওর সঙ্গে কথা বলে যা ভালো বুঝবে করবে।

কালীনাথ চলে এলেন। ঠোঁটের ডগায় হাসির আভাস। নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। ছেলেটার মতিগতি খুব ভালো লাগছে না তাঁর। ওদিকে এক চাপা আবেগের মুহূর্তে হাসপাতালে জ্যোতিরাণীকে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, শমীর জীবন শূন্য না হয়ে দম বন্ধ হবার মত ভরাটও হতে পারে—হয় যাতে, সেই চেষ্টা অন্তত তিনি করবেন। মাসখানেক হল জ্যোতিরাণী হাসপাতালে আছেন। অবস্থা এখন সমূহ আশঙ্কায় দাঁড়িয়েছে। শিবেশ্বরকে এখনো ভালো করে কিছু জানানো হয়নি। মামুকে দিয়ে হরিদ্বারের আখড়ায় কালীনাথই চিঠি লিখিয়েছিলেন। মামুকে এখনো কাপুরুষই ভাবেন তিনি। সময় ঘনিয়েছে টের পেয়েই কাজের নাম করে বাইরে পালিয়েছে। অত যন্ত্রণার মধ্যেও জ্যোতিরাণীকে সারাক্ষণ শমীর ভাবনাতেই অস্থির দেখে আসছিলেন তিনি। তারপর মামুকে দিয়ে হরিদ্বারে চিঠি পাঠিয়ে জ্যোতিরাণীকে ওই আশ্বাস দিয়েছিলেন।...আশ্বাস খুব পেয়েছে মনে হয়নি। উল্টে সংশয় দেখেছেন। কেন তাও অনুমান করতে পারেন। সংশয়ের হেতু সেই কালো নোটবই—কালো ডায়েরীতে তাঁর সেই শকুনির প্রতীক্ষা ঘোষণা।

কালীনাথের ঠোঁটের হাসি আরো বিস্তৃত হয়েছে। ছোঁড়াটার ভিতরে ভিতরে বড়গোছের কিছু পরিবর্তন এসেছে মনে হতে যা একটু ভাবনা তাঁর। দেখা যাক।

এবারে আবার ঠাকুরমার ঘরটাই বেছে নিয়েছে সিতু। বাড়ির মধ্যে ওটাই সব থেকে নিরিবিলি ঘর। কম্বলের ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে নিজেই ভূমিশয্যা পেতেছে। মেঘনা কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এসেছিল। কিন্তু ছোট মনিবের হাসি দেখে আর কথা শুনে তার এমন গা জ্বলেছে যে সেখান থেকে পালিয়েছে। সিতু বলেছিল, বেশি গণ্ডগোল করলে ওধারে আর একটা কম্বল পেতে ওকেও এ-ঘরেই শুতে হুকুম করবে, তারপর চোখে সরষের তেল লাগিয়ে দিয়ে একসঙ্গে পাঁচ ঘন্টা মুখ সেলাই করে আর শিরদাঁড়া সোজা করে বসে থাকতে শেখাবে।

পায়ে পায়ে কালীনাথ এই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। কৌতুক গাম্ভীর্যে ঘরের ভিতরটা দেখলেন একটু। সিতুর ঠোঁটেও হাসির আভাস।

ভিতরে ঢুকে কালীনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, এখানেও তাহলে ব্রহ্মচর্য পালন করা হবে?

সিতু হেসেই জবাব দিল, হ্যাঁ, তোমার মত।

কালীনাথ গম্ভীর, বয়েস কত হল তোর?

—উনত্রিশ, কেন?

এখনই এত বর্জন শুরু করলে উনসত্তর বা উনআশীর জন্য কি থাকবে?

ওই বয়েস আমার থেকে তোমার আগে আসবে—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

কালীনাথ হেসে ফেলেও ভ্রূকুটি করলেন, ক'বছরে বেশ লায়েক হয়েছিস দেখছি। ভাবলেন কি, তারপর খুব সাদাসিধেভাবে বললেন, শোন্, কাল একবার হাসপাতালে গিয়ে জ্যোতিকে দেখে আয়...কি হয়েছে জানিস তো? অবস্থা ভালো না—

সিতু হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে নির্বাক একেবারে। খবর দেবার ফাঁকে কালীনাথের সজাগ দৃষ্টি। জানালেন, মাসখানেক হল ওমুক হাসপাতালের ক্যাবিনে আছে। খরচের ব্যাপার। শমীই সব চালাচ্ছে, কি করে চালাচ্ছে সেই জানে, কারো কাছ থেকে এতটুকু সাহায্য নেয়নি।

এবারে ওকে নিরিবিলিতে থাকাব অবকাশ দিয়ে কালীনাথ চলে গেলেন।

সিতু স্থির, নিশ্চল বসে।...আসার আগের রাতে আনন্দবাবা পরদিনই কলকাতায় রওনা হতে হুকুম করেছিলেন. বলেছিলেন, কাল যেতে হবে, এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। কেন দেরি, কিসের দেরি এখন অনুভব করতে পারছে। সেই সঙ্গে আনন্দবাবার কটা কথা কানের পরদায় বিঁধছে।...ধৈর্যশূন্য তেজ শুধু দম্ভায়, নম্রতাশূন্য নীতির বোঝা শুধু ভার বাড়ায়, বিনয়শূন্য সামর্থ্যের নাম শুধু দাম্ভিকতা, আর বুদ্ধিশূন্য পৌরুষের নাম অত্যাচার।

কলেজ ছুটির পর শমী সোজা হাসপাতালে চলে আসে। সন্ধ্যে পর্যন্ত থাকে। সকালেও কলেজ যাবার আগে দেখে যায়। ছুটির দিনে সারাক্ষণই মাসীর কাছে থাকে। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

ওয়ার্ডের সামনে আসতেই তার পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল হঠাৎ! অদূরে যে মানুষটা বোবার মত দাঁড়িয়ে, তার দিকে চোখ গেছে।

সিতুও দেখেছে তাকে। কি এক অব্যক্ত বাধা ঠেলে কাছে এগিয়ে আসতে পারছে না। দাঁড়িয়েই আছে।

শমী আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে গেল। সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল।...দেখামাত্র তার কাছে আসতে ইচ্ছে করছিল। বলতে ইচ্ছে করছিল, দেরিই হয়ে গেছে, আর এসে কাজ নেই—এখন সে হরিদ্বারে বা হিমালয়ের মাথায় বসে মনের সাধে সাধন-ভজন করতে পারে। কিন্তু মাসীর মুখ চেয়েই বলার ইচ্ছে দমন করেছে। কার আসার আশায় মাসী সারাক্ষণই উন্মুখ, ও সেটা ভালই জানে।

হরিদ্বার থেকে ফেরার পরেই মাসী বড় অদ্ভুত কথা বলা শুরু করেছিল। ফাঁক পেলেই প্রভুজীর গল্প করে, প্রভুজীর কথা বলে। আর প্রভুজীর গল্প থেকে ছেলের কথায় চলে আসে। কালী জেঠুর থেকে চাবি চেয়ে নিয়ে তালাবন্ধ প্রভুজী ধামের সেই প্রভুজীর বড় ছবিটা তিন-চারদিন দেখে এসেছে। কালী জেঠু ছবিটা মাসীকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মাসী ওখান থেকে ওটা খুলে আনতে রাজী হয়নি। তারপর এক পাগলাটে শিল্পীকে দিয়ে ওই ছবিটা আঁকানোর গল্প করেছে মাসী। আর প্রায় চুপি

চুপি জিজ্ঞাসা করছে, দেখ তো, ছবির মধ্যে কার আদল সব থেকে বেশি চোখে পড়ে? শমীর চোখে তেমন কিছু পড়ে না বলে বিরক্ত যেন, তার চোখের হল কি—হরিদ্বার থেকে ঘুরে এসে আমি তো আরো বেশি স্পষ্ট দেখছি! মাসী দু-দুটো শক্ত কড়ার করিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। বলেছে, আমি থাকি না থাকি, তোরা কান্নাকাটি করতে পাবি না। প্রভুজী কান্না পছন্দ করতেন না। তাই আনন্দবাবাকে দেখেই আমার প্রভুজীর ভক্ত মনে হয়েছিল! আর, সিতু ফিরলে—ফিরবেই তো, না ফিরে থাকবে কি করে—রাগ করে কক্ষনো আর তাকে দুঃখ দিবি না। সে কত দুঃখ পেয়েছে জানিস না। আশায় আনন্দে অদ্ভুত দেখতে হয়েছিল মাসীর মুখখানা, বলেছিল, আসার আগে আনন্দবাবা কি বলেছিলেন জানিস? বলেছিলেন, ওই অত দুঃখ না পেলে ও যা হয়েছে তা হতে পারত না—সবই দরকার ছিল। ওই কথা শুনেই তো আমি বেঁচে গেছি, নইলে ওর দুঃখের কথা ভেবে তো আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম!

এই ধরনের সব কথা শুনে শমী অনেক সময় হকচকিয়ে গেছে। সেই জন্যেই দেখা হওয়ামাত্র তাকে চলে যেতে বলতে পারেনি। আবার রাগ সামলে ডেকে আনতেও পারেনি।

জ্যোতিরাণী শয্যায় বসে ছিলেন। বসতে কষ্ট। কিন্তু শমী আসবে জেনে চেষ্টা করে উঠে বসেন। এক নজর তার দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, মুখখানা এ-রকম কেন?

শমী জবাব দিল, আমার ভালো মুখ আবার কবে দেখলে। ভালো মুখ এক্ষুনি দেখতে পাবে।

কিছু না বুঝে অবাক হয়ে জ্যোতিরাণী দরজার দিকে তাকালেন। তারপর শমীর দিকে। শমী গম্ভীর, চার্ট দেখছে, ওষুধপত্র দেখছে। উদগ্রীব মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কে এসেছেন, মামাবাবু নাকি?

শমী নিরুত্তর। একটু বাদে জ্যোতিরাণী সচকিত। তারপরেই বুকের ভিতরটা বিষম দুলে উঠল, ফুলে উঠল। বুকের ক্ষতয় অসহ্য যন্ত্রণা একটা, তারই ওপর তেমনি ঠাণ্ডা প্রলেপ। চোখে ঝাপসা দেখলেন কয়েক নিমেষে, তারপর সব স্বচ্ছ পরিষ্কার। চেয়ে আছেন। সিতুও চেয়েই আছে।

ডাকলেন, আয় ভিতরে আয়—

এক পা দু পা করে সিতু শয্যার সামনে এসে দাঁড়ালো। জ্যোতিরাণী এবারে ভালো করে দেখলেন তাকে, চোখ দিয়ে বুক দিয়ে সমস্ত সত্তা দিয়ে দেখলেন। ঠোঁটে হাসি, খুব সহজ মৃদু গলায় বললেন, রাগ করে মায়ের কাছে না এসে থাকতে পারলি?

সিতু স্থির, নির্বাক। শমী ওদিক ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। দু চোখ ভেঙে জল আসতে চাইছে বলে নিজের ওপরেই রেগে আগুন হচ্ছে।

বোস্, ওখানে নয়—এখানে বোস্। হাত দিয়ে শয্যায় নিজের পাশটা দেখালেন জ্যোতিরাণী।

সিতু বসল। দু হাত তুলে জ্যোতিরাণী তার মাথায় বোলালেন, তারপর মুখে, গালে। হাসি-মাখা অনুযোগের সুরে বলে উঠলেন, দু-তিন দিন দাড়ি কামাসনি বুঝি, হাতেও খোঁচা-খোঁচা লাগছে! শমীর দিকে তাকালেন, এই মেয়ে, এদিকে ফের বলছি! তাকেও শয্যা দেখালেন, এখানে এসে বোস্।

শমী ঘুরে দাঁড়ালো শুধু, এগিয়ে এলো না। কিন্তু মাসীকে বড় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তার। সেই আগের দিনে ফিরে গেছে যেন। অল্প অল্প হাসছেন জ্যোতিরাণী, দুহাতের আদরে ছেলের মুখখানা কেমন হচ্ছে লক্ষ্য করলেন, তারপর শমীর দিকে চেয়ে বললেন, ওর দশ বছর বয়সে কোনো সময় ওকে কাছে টেনে একটু-আধটু আদর করলে ও খুব লজ্জা পেত। হাসছেন, দু চোখ ছেলের দিকে ঘুরল, আর শমী এখনো কি করে জানিস, ঘরে কেউ না থাকলে চট করে একটু কোলে শুয়ে নেয়—

অনির্দিষ্ট ঘোরাঘুরির কালে সিতু মরুভূমির মত জায়গাও দেখছে। জলের অভাবে সব জ্বলে যেতে দেখেছে। তখন মনে হত, একটু জল পেলেই তো সব অন্যরকম হতে পারত, জল নেই কেন? আজ নিজের ভিতরটাও ঠিক সেইরকম লাগছে—একটুও জল নেই কেন?

কবে এলি?

কাল।

সেখানকাব বাবা ভালো আছেন?

সিতু মাথা নাড়ল, ভালো আছেন।

এসে প্রভুজী ধামে গেছলি? প্রভুজীকে প্রণাম করেছিস?

সিতু হঠাৎ চমকে উঠল কেন জানে না, মাথা নাড়ল, যায়নি।

কালই গিয়ে প্রণাম করে আসবি। হাসিমুখে শমীব দিকে তাকিয়েই চোখ রাঙালেন, তুই এই মুখ করে থাকলে এবারে মাব খাবি আমার কাছে। ঘরে চায়েব ব্যবস্থা রেখেছিস, একটু চা-ও করলি না এখনো। চা কর, সিতুকে দে, নিজে খা, আমাকেও একটু দিস। তার পরেই তো আবার ঘড়ি দেখে ছুটতে চাইবি—আজ আর তোর কোথাও যাওয়া চলবে না, কাল বলে দিস। হাসির ওপরেই রাগ ছড়িয়ে সিতুর দিকে ফিরলেন, আমাকে এই রাণীব হালে রাখার জন্য নিজে খেটে খেটে আধখানা হয়ে গেল—কলেজের পর সন্ধ্যায় সপ্তাহে তিন দিন করে দুটো টিউশনি করে, এক জায়গায় একশ পঁচিশ টাকা পায়, আর এক জায়গায় একশ। কলেজ ছাড়াতে না পারিস, ওর এই দুটো বন্ধ কর তো এখন—আমি এত বারণ করি, আমাকে কেয়ারই করে না।

...ভিতরটা খাঁ-খাঁ করে জ্বলছে সিতুর, একটুখানি জলের লেশমাত্র নেই কেন। শমী ওদিকে ফিরে চা করতে বসেছে।

রাত্রি।

জ্যোতিরাণী চোখ বুজে শুয়ে আছেন। ঈষৎ শ্রান্ত। কিন্তু সমস্ত মুখ তৃপ্তিতে ভরা। এই আনন্দের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন বুঝি। ওরা দুজনেই ঘরে আছে। তাঁর ইচ্ছে বুঝে কালীদা হাসপাতালের লোকের সঙ্গে কথা বলে এই রাতটা ওদের দুজনেরই এখানে থাকার ব্যবস্থা করে গেছেন। ভোলাকে দিয়ে বাড়ি থেকে রাতের খাবার পাঠিয়েছেন। জ্যোতিরাণীর কথামত সিতু আর শমী পাশাপাশি বসে খেয়ে নিয়েছে। তিনি নির্নিমেষে দেখেছেন।

রাত বাড়ছে। ঘরে সবুজ আলো। সিতু শয্যার পাশে ইজিচেয়ারে বসে। শমী ওপাশের মেঝেতে একটা বিছানা করে নেবে বলেছিল, এখনো নেয়নি। মাসীর শিয়র ঘেঁষে বসে আছে।

জ্যোতিরাণী আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। ঠোঁট দুটো একটু একটু নড়ছে। সিতু চেয়েছিল। তার মনে হল তন্দ্রার মধ্যে প্রভুজীর নাম জপ চলেছে।

কতক্ষণ কেটেছে বা কটা বেজেছে রাত্রি খেয়াল নেই। সিতু চমকে উঠল একসময়। মায়ের নিষ্পলক দুই চোখ তার মুখের ওপর আটকে আছে। ওদিকে শমীও বাহুতে মাথা রেখে বসে আছে।

চোখাচোখি হতে জ্যোতিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুমুবি না একটু?

ঘুমুব, তুমি ঘুমোও।

শমী চমকে সোজা হয়ে বসল। জ্যোতিরাণী চোখ বুজলেন আবার। মুখখানা হাসি-হাসি। কোনো এক স্মৃতিতে বিভোর হয়ে আছেন যেন।

সিতু!

সিতু সামনের দিকে ঝুঁকল। জ্যোতিরাণী বললেন, অত দূরে বসে আছিস কেন, কাছে আয়।

সিতু ইজিচেয়ারটা সামনে এগিয়ে আনল।

ছোটবেলার কথা সব মনে আছে তোর?

সিতু মাথা নাড়ল। আছে।

তোর ছোট দাদু সেই যে এক জলের জীবের গল্প বলেছিল—কত জাহাজ বাঁচিয়েছিল, কত লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছিল...তার নামটা কি রে?

পোলোরাস্ জ্যাক।

আমি কিছুতে মনে করতে পারছিলাম না। অদ্ভুত চকচকে দেখাচ্ছে দুই চোখ। ঠোঁটের মৃদু হাসি সমস্ত মুখে ছড়াচ্ছে। শমীর দিকে তাকালেন। গল্পটা শুনেছিস? ওর কাছে শুনে নিস।...ওর তখন বছর বারো-তেরো হবে বয়স। ছোট দাদুর গল্প বলা শেষ হতে ওর দিকে চেয়ে কি দেখলাম জানিস? দেখলাম বড় বড় দুটো মুক্তোর মত ওর দু চোখ ভরা জল। আমার কাছে ধরা পড়ে ও ছুটে পালালো...

ওধার থেকে দু চোখ তুলে শমী সিতুর দিকেই চেয়ে আছে, তাকেই দেখছে।

সিতু কি করবে? সেদিন চোখে জল এসেছিল বলে ছুটে পালিয়েছিল, আজ আসছে না বলে পালাবে? একটুখানি জলের জন্য ভেতরটা সেই থেকে জ্বলছে। মরুভূমির জায়গাগুলো যেমন জ্বলতে দেখেছিল।...একটু জল নেই কোথাও?

ছদিন বাদে সকালের দিকে হাসপাতালের ডাক্তার আর নার্সরাও অদ্ভুত শান্ত এক মৃত্যু দেখল।

সেই মৃত্যুর পাঁচ মিনিট আগেও জপের মত দুই ঠোঁট নড়েছে। মিনিট দুই আগেও প্রসারিত দুই চোখ ঘরের সকলের মুখের ওপর ঘুরেছে। ঘরে কালীনাথ আছেন, গৌরবিমল আছেন। সিতু আর শমী আছে।...আর জনা-দুই ডাক্তার...আর দু-তিনজন নার্স...

তারপরে প্রশান্ত নিরতি...চির ঘুমের কোলে স্নিগ্ধ বিশ্রাম।

মাসীমা গো!

শমী আর্তনাদ করে উঠেছিল। পরমুহূর্তে নিজেই বিষম চমকে উঠেছে। মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে দিয়ে সামলাতে চেষ্টা করেছে। শান্তির ব্যাঘাত ঘটে গেল বুঝি।

মাসী যেন স্পষ্ট নিষেধ করল, বারণ করেছি না...!

কোথাও এতটুকু জলের লেশমাত্র নেই বলে ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে সিতুর। গত দু দিন ধরে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই এখানে আছে। মাঝে দুবার করে তাকে খেতে পাঠানো হয়েছে। সিতু কিছুই খায়নি, অনির্দিষ্টের মত খানিক ঘোরাঘুরি করে, পেয়ালা দুই চা খেয়ে আবার ফিরে এসেছে। আনন্দবাবা বলেছিলেন, সব দেখ্ শোন—ভিতরে কত কি চাই চাই করছে. সেগুলোর দাসত্ব ঘোচা। সিতুর মনে হয়েছিল, না খেলে কি হয়, কতখানি কষ্ট হয়? দাসত্ব ঘোচাবার তাগিদে নয়, এই কষ্ট কি তাকে কিছু বিস্মৃতি দিতে পারলে? টানা আটচল্লিশ ঘন্টা চলে গেছে, কয়েক পেয়ালা চা ছাড়া আর কিছু খায়নি।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। চোখের সামনে ঝাপসা দেখছে থেকে থেকে, অন্ধকার দেখছে। কিন্তু সব খর্খরে। একটু জলের লেশমাত্র নেই কোথাও। একটুখানি জলের জন্য ওর ভিতরটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল বুঝি। বন্যায় ভেসে যায় না কেন সব?

শ্মশানে এলো বেলা একটা নাগাদ। নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে সিতু দেখছে। শমীর স্তব্ধ মুখ দেখছে। জেঠু আর ছোট দাদুর তোড়জোড় দেখছে। আর চিরনিদ্রায় শয়ান একজনের হাসি-হাসি মুখ দেখছে। সিতু চমকে উঠল।...কবে এক রাণী নজন ফাঁসীর আসামীকে ক্ষমা করে হেসেছিল। তার থেকেও অনেক বড় ক্ষমা করে এক রাণী হাসিমুখে ঘুমুচ্ছে। তার নাম জ্যোতিরাণী...।

ওই গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। সিতু এগিয়ে গেল সেদিকে।...ডুব দিয়ে আসবে গোটাকতক? একটু বাদে ফিরে এলো আবার। ওই শুকনো গঙ্গার সব জল ঢাললেও এই তাপ জুড়োবে না।

হঠাৎ সচকিত সকলে। লাঠি ভর করে এদিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে। এলেন। খাটের পাশে দাঁড়ালেন। নির্নিমেষে যাত্রিণীকে দেখলেন চেয়ে চেয়ে। এই ঘুম ডাকলেও আর ভাঙবে না, এ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

লাঠি ভর করে প্রথমে শমীর কাছে এলেন। তার মাথায় হাত বুলোলেন একটু। তারপর সিতুর দিকে ফিরলেন, তুই কাজ করবি?

সিতু কলের মত মাথা নাড়ল।

কালীনাথের ইশারায় গৌরবিমল এগিয়ে এসে ধরলেন তাঁকে। বললেন, তুমি আবার এই শরীর নিয়ে চলে এসেছ...বাড়ি চলো।

চলো। লাঠি ভর করে আস্তে আস্তে আবার চোখের আড়াল হয়ে গেলেন তিনি।

চিতা সাজানো হয়েছে। শমী আবার মুখে শাড়ির আচল গুঁজে দিয়েছে। আবার বাধা পড়ল একটু। মাঝবয়সী অপরিচিত মহিলা চিতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে লালপেড়ে শাড়ি, ঘোমটার ফাঁকে তামাটে কাল্চে মুখখানা শুধু দেখা যাচ্ছে। কপালে আগের দিনের বড় পয়সার মত জ্বলজ্বলে সিঁদুর। পিঠের ওপর তেল-জলশূন্য শণের মত লালচে পাকানো খোলা চুল। ওদিক ফিরে একাগ্র চোখে শবদেহ দেখছে, আর বিড়বিড় করে বলছে কি। উদ্‌ভ্রান্ত হাবভাব।

শ্মশানের পুরুত তাকে অন্যদিকে সরিয়ে দিয়ে জানালো, মহিলার মাথা খারাপ, রোজ শ্মশানে আসে আর চিতা নিভলে কলসী কলসী জল এনে ঢালে। কোথায় কার এক বউ নাকি তার জন্যে আত্মহত্যা করেছিল। সেই থেকে নিভন্ত চিতা দেখলেই

জল ঢেলে ঢেলে, আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করে করে নিজের পাপ ক্ষয় করে।

এই চিতাও জ্বলে জ্বলে নিভল একসময়। সিতুর দু চোখ বুজে বুজে আসছিল। ষাট ঘণ্টা হয়ে গেল কিছু খায়নি মনে নেই, শুধু মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে কি-রকম যেন হচ্ছে। চোখের সামনে যা দেখছে তার সবটা সত্যি কিনা জানে না।

জ্যোতিরাণীর দেহ ভস্মে বিলীন হয়ে গেল। এদিকে সবে সন্ধ্যা পেরুল। ঘড়া ঘড়া জল এনে চিতা নিভানো হল। সেই বিকৃত-মস্তিষ্ক ঘোমটা দেওয়া মহিলাও কোমরে শাড়ির আঁচলটা জড়িয়ে একে একে তিন-চার ঘড়া জল ঢালল। পরক্ষণে অবাক কাণ্ড। মুঠো মুঠো ভিজা চিতার ছাই কপালে বুকে ঘষতে লাগল। ফলে মাথার কাপড় খসে গেছে। সিতু চোখ টান করে দেখতে চেষ্টা করল তাকে। রাতের আলোয় সব কিছু আরো বেশি ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে এখন।...মহিলার অপ্রকৃতিস্থ মুখ্, অপ্রকৃতিস্থ চাউনি, তবু মুখের আদল হঠাৎ চেনা চেনা লাগল কেমন। কিন্তু ভাবতে গিয়েও ভাবা গেল না, মাথাটা বড় বেশি ঘুরছে। আর, সব মুখের আদল এইমাত্র যে দেহ ভস্ম হয়ে গেল, তার মুখের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

বাড়ি। গাড়ি থেকে নামল সকলে। জেঠু শমীকেও ধরে এনেছে। শমী আপত্তি করেনি। আপত্তি করার শক্তিও নেই।

থানের আঁচল কামড়ে মেঘনা আগুন, লোহা, পাটপাতা স্পর্শ করালো। সিতু সোজা একতলার চানঘরে গিয়ে ঢুকল। গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসেছিল, এবারে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চান করে শেষে বেরুলো।

দোতলায় উঠল। থমথমে বাড়ি। কি একটা চেনা স্মৃতির স্পর্শ অনুভব কবল সর্বাঙ্গে। খুব কাছের, খুব চেনা স্মৃতি। ও কে? ও মেঘনা। ওই কোণের ঘবেব দরজার বাইরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। পায়ে পায়ে সিতু এগিয়ে গেল। আগে বাবার ঘর...ওই তার পরেরটা।

মেঘনার পাশ কাটিয়ে ওই কোণের ঘরেই ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে সেই চেনা স্মৃতির স্পর্শ আবার। পনের বছর আগে একদিন যেমন হয়েছিল। পনেব বছর আগে নয়, মাত্র আজই কেউ সমস্ত ভবা-স্মৃতি একপাশে সরিয়ে রেখে বিদায় নিল যেন। সিতুর বয়েস কত এখন, ঊনত্রিশ না চৌদ্দ? চারদিকে তাকালো...সেই খাট, সেই আলমারি, সেই ড্রেসিং-টেবিল, সেই আলনা...সব ফেলে কবে গেল? মাত্র আজ। জোরে নিঃশ্বাস টানল। সেই তেলের গন্ধ, চুলের গন্ধ, গায়ের গন্ধও তো পাচ্ছে। আলনায় শাড়ি নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ খুলল একটা। থাকে থাকে শাড়ি। একে একে অনেকগুলো নামালো, স্পর্শ করল, কোন্ শাড়িটা পরলে সব থেকে ভালো দেখাতো।...সবগুলোই সব থেকে ভালো দেখাতো...এটা...এটা...এটা কি?

বাঁধানো খাতা একটা। খুলল। গোটাকতক গান লেখা। ভাবতে চেষ্টা করছে...গান কখনো শুনেছে? মনে পড়ছে না। কোনো একসময় গাইত নিশ্চয় নইলে গান লেখা থাকবে কেন? গোটা গোটা মুক্তোর অক্ষরের মত এই লেখা তো কত চেনা ঠিক নেই।

...এ আবার কি রকম গান? একই চেনা হাতের লেখা। পড়তে পারছে না, কিন্তু এ কি হল, শরীরটা এত কাঁপছে কেন সিতুর? লেখাগুলোও ভালো দেখতে পাচ্ছে না? এ কার স্তব? যাঁরই হোক, চেনা লেখার মধ্য দিয়ে চেনা গলা কানে আসছে!

“...জগতের প্রভু আলো পাঠিয়েছে। তোমরা এসো, এ আলোয় বুক ভরে নাও। সমস্ত সত্তা ভরে এই আলো পান করো। এই আলোয় সকলে মিলে আর একবার অন্তরের জগৎ সৃষ্টি করো। যে যেখানে আছো এসো। আলো থেকে এসো, অন্ধকার থেকে এসো, গৃহ থেকে এসো, গুহ্যকন্দর থেকে এসো। বাবারা এসো, মায়েরা এসো, যতো ভাইয়েরা এসো, বোনেরা এসো। হে সুখীজন, তোমরা এসো। হে বেদনাহত, তোমরা এসো! হে শক্তিমান, তোমরা এসো। হে পদানত, তোমরা এসো। হে ভোগশ্রান্ত, তোমরা এসো। হে কর্মক্লান্ত, তোমরা এসো। হে জীবন-তাড়িত, তোমরা এসো। হে মরণ-পীড়িত, তোমরা এসো। জগতের প্রভু আলো পাঠিয়েছে।...”

মা! মা! আমার মা।

বাড়িটার স্তব্ধতা চিবে হঠাৎ মেঘনার চিৎকার শোনা গেল, কালীদাদা, মামাবাবু শিগ্‌গীর এসো—ছোট মনিবের কি হল দেখো।

সাতচল্লিশ

...প্রথমে অপরিচিত মুখ একখানা, তারপর ছোট দাদু আর জেঠুর মুখ...আর বাবার উদগ্রীব মুখ...আর ওধারে শমীর মুখ, তার পিছনে মেঘনা। সিতুর চোখের সামনে থেকে একটা ধোঁয়াটে কুণ্ডলী সরে যাচ্ছে, মুখগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিভ্রান্ত বিস্ময়ে চারদিকে তাকাতে লাগল সে।

শরীরের কয়েক জায়গায় ছুঁচ বেঁধার অনুভূতি। গোটাকয়েক ইনজেকশান করা হলে যেমন লাগে। তাই করা হয়েছে জানে না।...কিন্তু কি ব্যাপার, এরা এভাবে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

সামনের অপরিচিত মানুষটি নামী ডাক্তার। তিন ঘণ্টা ধরে বসে থেকে চিকিৎসা করছেন। তিনি সামনে ঝুঁকলেন। কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর এই কদিনের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া কি হয়েছে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। সিতু প্রথমে চুপ করেই ছিল, পরের জেরায় প্রকাশ পেল গত তিন দিনের মধ্যে পেয়ালা-কয়েক চা ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয়নি।

ডাক্তারের অনুমানে ভুল হয়নি। সামনে বসে এক গেলাস গরম দুধ খাওয়ালেন। তারপর বাইরে এসে কালীনাথ আর গৌরবিমলকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

আচ্ছন্নতার ঘোর কাটেনি ভালো করে। ঘরে যারা আছে সিতু তাদেরই দেখছে চেয়ে চেয়ে।...মেঘনা, শমী, বাবা। সকলকে ছেড়ে দু চোখ বাবার মুখের ওপর আটকালো। কে চলে গেল, কার দেহ চিতায় ভস্ম করে এসেছে, এইবার মনে পড়ছে।

ছেলের দিকে চেয়ে আছেন শিবেশ্বর চাটুজ্যে। নির্বাক, অসহায়। জীবনের শুরু থেকে এই প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত এত মাথা খোঁড়াখুঁড়ির সার ফল দেখছেন। কি পেলেন তার শেষ চিত্র দেখছেন। বিত্ত আর বৈভবের বিশাল স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে নিষ্ফল সঞ্চয়ের এক দম-বন্ধ-করা শূন্য দৃশ্য দেখছেন বুঝি তিনি। কিন্তু দেখতে পারছেন না। তাঁর শরীর ভেঙে আসছে। ঘুম পাচ্ছে। কালীনাথ আর গৌরবিমল ঘরে ঢুকতে প্রায়-অথর্ব দেহটা টেনে টেনে ঘরের বাইরে এলেন তিনি, দেয়াল ধরে ধরে নিজের ততোধিক

...ন বিবরে এসে আশ্রয় নিলেন।

নির্দেশমত মেঘনা ছোট মনিবের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে ছুটেছে। কালীনাথ সিতুর বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। শমীকে বসতে বলে সিতুর দিকে ফিরলেন—তুই তাহলে এই কটা দিন উপোসীবাবা হয়ে ছিলি? শমী পুণ্যি করতে চাস তো উপোসীবাবাকে দেখে নে ভালো করে...আর মামু, তুমি তোমাদের আনন্দবাবাকে খবর দাও একটা, হরিদ্বার ছেড়ে এখানেই এসে একটা আশ্রম খুলে বসুক।

কথাগুলো কালীনাথ খুব গম্ভীর মুখেই বলেছেন। শোনার পরেও হাসেনি কেউ। এই বাতাসে হাসি বেমানান। শমী বসেনি, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। গৌরবিমল ঘরের মধ্যেই পায়চারি করছেন। একটু বাদে কালীনাথ চলে গেলেন। সিতু চোখ বুজে শুয়ে আছে। কিছু ভাবতে চেষ্টা করছে। শ্মশান থেকে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে চান করেছিল, তারপর দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকেছিল...তারপর কি এক ভর-ভরতি স্পর্শের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল।...ডুবে গেছল। মাঝের পনেরটা বছর মিথ্যে হয়ে গেছল।

চোখ মেলে তাকালো সিতু। সেই ঘরেই শুয়ে আছে। মায়ের ঘরে। মায়ের বিছানায়। মাঝের পনেরটা বছর এখনো সরিয়ে দিতে পারছে। তাই আবেশে চোখ বুজে আসছে।...একদিন মা তাকে এই ঘরে টেনে এনে, এই বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আর নিজেও শুয়ে তাকে বুকের কাছে টানতে চেষ্টা করেছিল। সিতুর অস্বস্তির একশেষ সরে যেতে চেষ্টা করেছিল আর বলেছিল লজ্জা করছে।

সচকিত। মায়ের কি একটা সম্পদ যেন হাতে পেয়েছিল...পড়ছিল। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। শমী এগিয়ে এলো আর একটু। গৌরবিমল কাছে এসে মাথায় হাত বোলালেন একবার।—কিছু চাস?

...একটা বাঁধানো খাতা ছিল।

গৌরবিমল তক্ষুনি বুঝলেন কোন খাতা খুঁজছে। মেঘনার চিৎকারে ছুটে এসে খাতা বুকে নিয়ে ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। ড্রেসিং-টেবিলের ওপর থেকে বাঁধানো খাতাটা তুলে নিয়ে শেষের সেই লেখাটা দেখতে দেখতে কাছে এলেন আবার।—এটা পড়ছিলি বুঝি?

সিতু জবাব দিল না।

গৌরবিমল বললেন, তোর মায়ের বাবা রোজ সকালে এই স্তোত্র পড়তেন, গলা ছেড়ে সকলকে আলোয় আসতে ডাকতেন।...তোর মা লিখে রেখেছিল দেখছি।

লেখাটা শমীর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। শমী পড়ল। চোখের জলে ঝাপসা দেখছে লেখাগুলো। সময় লাগল পড়ে উঠতে। বুকের-তলায় কান্নার সমুদ্র। তবু কাঁদতে পারছে না। মাসী কাঁদতে বারণ করেছিল। এই দিনে এই আলোর ডাক শুনেও প্রাণভরে কাঁদতে না পারা যে কত বড় শাস্তি, এ কি মাসী এখন জানতে পারছে, দেখতে পাচ্ছে?

ওকে বসতে বলে গৌরবিমল ওর খাওয়ার ব্যবস্থা দেখতে গেলেন। খাতা হাতে শমী শয্যার পাশেই বসল। ঘাড় ফিরিয়ে সিতু এবার তাকে দেখছে।

বিষণ্ণ দু চোখ তুলে শমী চেয়ে রইল একটু তারপর আহত মৃদু সুরে বলল, তিন দিন ধরে খেতে বেরিয়ে না খেয়ে ফিরে এসেছ?

সিতু নিরুত্তর। যে অনুভূতির মধ্যে ভাসছে তাতে ছেদ পড়ুক, চায় না। ছেদ

পড়ল না, ববং অদৃশ্য এক পাওযাব স্পর্শ কত যে নিবিড় হতে লাগল ঠিক নেই। ও সব হাবিযেছিল, সব হাবিযে সর্বস্বান্ত হযেছিল। যে গেল সে আব আসবে না। কিন্তু তাব সত্তাব নিভৃতে বড বিচিত্রভাবে ফিবে এসেছে সে। তাকে ঘিবে বেখেছে, তাকে কোলে নিযে বসে আছে যেন। সিতু যেন ধবতে ছুঁতে পাবছে তাকে। বাইবে তাকে আব পাবে না ভাবতে বুক ভেঙে যাচ্ছে, ভিতবটা ভবাট। এত বড শোকেব মধ্যেও সেখানে পাওযাব উৎসব লেগেছে—সিতু সেই জোযাবে ভাসছে। তাই সব ভালো লাগছে। ওই একজন ছিল না তাই জগৎ বিবর্ণ হযে গেছল, ঊষব মরুভূমি হযে গেছল। কিন্তু এক মুহূর্তে যেন বঙ বদলে গেছে, সবেতে ফল ধবেছে। সিতু সব ফিবে পেযেছে, সকলকে ফিবে পেযেছে। নিজেকে, বাবাকে, ছোট দাদুকে, জেঠুকে, মেঘনাবে শমীকে। শমীব দিকে নিষ্পলক চেযে আছে। মা যেন তাব নিজেব অনেকখানি ওব মধ্যেই ছড়িযে বেখে গেছে।

এই শমীকে কোনদিন ভালো কবে দেখেনি কেন সিতু?

কান পেতে শুনতে হয এমনি অস্ফুট স্ববে বলল, শমী, আমাব মা শুধু বাণী নয়, আমাব মা জ্যোতিবাণী।

কান্না বোধেব শেষ চেষ্টা কবছে শমী। বিষণ্ণ গভীব দুই চোখে আশা আগ্রহ আকুতি উপচে উঠল। নিজেব অগোচবে সামনে ঝুকল, তপ্ত হাতখানা তাব হাতেব ওপব বাখল। অধীব ব্যাকুল দু চোখ মুখেব ওপব স্থিব মুহূর্তেব জন্য। তাবপব আবো ঝুকে ধবাগলায ফিসফিস কবে জিজ্ঞাসা কবল, তোমাব মা জ্যোতিবাণী তুমি বুঝতে পাবছ? পাবছ?

সেই বাতেই দ্বিতীযবাব স্ট্রোক হল শিবেশ্বব চাটুজ্যেব। বাত্রিতে শামু তাঁব ঘবেব দবজায শোয। প্রথমবাবেব স্ট্রোকেব পব অনেকদিন পর্যন্ত কালীনাথ নিজেই তাব ঘবে থাকতেন। এটা পবেব ব্যবস্থা। ভোবেব দিকে শামু অস্বাভাবিক একটা শব্দ শুনে জেগে উঠেছিল। দেখে—বাবু মেঝেতে পড়ে আছেন। তক্ষুনি ছুটে গিযে কালীনাথকে আব ছোট দাদুকে খবব দিযেছে।

একটা মৃত্যুব চাপা প্রতিক্রিযা অনুর্ভূতেব বাস্তব জুড়ে বসতে না বসতে জীবন-মৃত্যুব আব এক খেলা শুরু। এ খেলায জীবন জিতবে কি মৃত্যু, সেটা অনিশ্চিত ছিল না খুব। মৃত্যুব দখল প্রতি মুহূর্তে প্রতি পলে স্পষ্টতব হযে উঠছিল। সিতু নির্বাক দ্রষ্টা, শমীও। কিন্তু সমস্ত শক্তি দিযে এই মৃত্যু প্রতিবোধ কবতে চেযেছেন একজন। কালীনাথ।

আশ্চর্য, এবাবেও তিনি জিতলেন। শহব কলকাতাব চিকিৎসা জগৎটাকে তিনি যেন ত্রিকোণ বাস্তাব বড বাড়িব এই একটা ঘবেব মধ্যে এনে ফেললেন। তাবপব টানা পাঁচ সপ্তাহ দুর্বহ নীববতাব মধ্যে চলল জীবন মৃত্যুব সেই যুদ্ধ। তাবপব একসময মনে হল মৃত্যু সবে দাঁড়াচ্ছে। সবেই দাঁড়াল। কিন্তু যা বেখে গেল, তাও জীবন কি মৃত্যু বোঝা ভাব। জীবনেব সর্বাঙ্গে মৃত্যু এবাবে যে থাবাটা বসিযে গেল, দেখলে চোখ ফেবাতে ইচ্ছে কবে।

শবীবেব অর্ধ-বিকল দিকটা সম্পূর্ণ বিকল হযেছে। ডান হাতটা আব ডান দিকটা সম্পূর্ণ পঙ্গু অসাড়। বাঁ-দিকেবও খানিকটা কবে। মুখ বেঁকে দুমড়ে এক অদ্ভুত আকাব নিযেছে। জিভ আড়ষ্ট, কথা বলাব শক্তিও সম্ভবত চিবকালের মত গেছে।

এ দৃশ্য শমী দেখতে পারে না, ঘরে ঢুকলে ছুটে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে। নির্বাক স্থির চোখে সিতু দেখে চেয়ে চেয়ে। বিরাট শক্তি, বিরাট দম্ভ, বিরাট ক্ষোভের শেষ পরিণাম দেখে—ভাঙা দুমড়ানো ভয়াবহ একটা আকার শুধু। সব থেকে মর্মান্তিক, ওতে জীবনের স্পন্দন আছে, অনুভব-শক্তি আছে! সিতুর মনে হয় মৃত্যু এর থেকে অনেক সুন্দর, অনেক—অনেক বেশি কাম্য।

আশ্বাস দিয়ে বড় ডাক্তার যেদিন নিয়মিত আসা ছাড়লেন, কালীনাথ সেই রাতে সিতুর ঘরে এসে বসলেন। সিতু আবার তার ঠাকুমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। মায়ের ঘরে শমী থাকবে, এটা তারই ব্যবস্থা।

কালীনাথ শ্রান্ত, কিন্তু নিশ্চিন্ত কিছুটা। সত্যিকারের ঝড়টা যেন তাঁর ওপর দিয়েই গেল। বললেন, এযাত্রাও ফাঁড়া কাটল—

কথাটা কানে যাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে সিতু সচকিত হয়ে তাকালো জেঠুর দিকে। যা দেখতে চাইল, তা দেখা গেল কিনা সে-ই জানে। জেঠু অনেক করেছে, যা করেছে, তাব জন্যে যে কোনো ছেলেব কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু এই করাটা কতখানি প্রীতি-ভালবাসার তাগিদে আর কতখানি শকুনির প্রেরণায়, হঠাৎ সেই সংশয়। জীবনকে জিইয়ে রেখে মৃত্যু দেখার তুষ্টি কিনা, সিতু তাই বুঝে নিতে চায়। কিন্তু জেঠুর মুখে মনের ছায়া পড়ে না বড়। জিজ্ঞাসা করল, ফাঁড়া কাটল বলে তুমি খুশি?

কালীনাথ থমকালেন একটু। সেটা প্রশ্নের ধরন দেখে। সন্দেহ কিছু করলেন না, ভাবলেন এমন জীবন্মৃত অবস্থায় বাঁচার মত নয় বলেই বলছে। জবাব দিলেন, কি করবি বল, ধরে বাখবার চেষ্টা তো কবতেই হবে।

সিতু আর কিছু বলল না। প্রশ্নটা একটা অস্বস্তিব মত মনের তলায় থেকেই গেল।

সর্বরকমের পরিস্থিতি দখলে আনার চেষ্টাটা স্বাভাবিক। এই চেষ্টার ফলে বাবা এই বাড়ির মধ্যে থেকেও এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার ওধারে চলে গেল। রোজ একজন ডাক্তাব এসে পরীক্ষা করে যায়। পাকা-পোক্তভাবে তিনজন অভিজ্ঞ নার্স ঠিক করা হয়েছে। পালা করে চব্বিশ ঘণ্টাব ডিউটি তাদের। টাকা ঢালতে পারলে সহিষ্ণু সজাগ সেবা কেনার অসুবিধে নেই। মোটা পাবিশ্রমিকের বিনিময়ে চির-শয্যাশ্রয়ী গৃহস্বামীর যাবতীয় দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেছে। এছাড়া, আর একজন বাড়িতে কর্মঠ চাকর বহাল করা হয়েছে—সারাক্ষণ ওই ঘরেব দরজায় মোতায়েন থাকা কাজ তার।

এই সমস্ত ব্যবস্থাই জেঠু করেছে। তবু সিতুর ধারণা এসব ব্যবস্থা বাবার ইচ্ছেতেই হয়েছে, নিজেই এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সরে গিয়ে ওদের স্বস্তি দিতে চেয়েছে। কথা বলতে পারে না, হাতের আঙুল পর্যন্ত নাড়ার শক্তি নেই—এমন অথর্ব দেহের প্রতি আপনজনেরও বিমূঢ় উদ্বেগ সর্বদা কাম্য নয় বোধ হয়। এক জেঠু ছাড়া সকলের যখন-তখন ওই ঘরে ঢোকাও কমে এলো। সিতু সকালে আর সন্ধ্যায় একবার করে যায়, চুপচাপ খানিক বসে থাকে, তারপর বাবাব নীরব অস্বস্তি অনুভব করেই উঠে চলে আসে আবার।

তিন-তিনজন নার্স আসার আগে দুই-এক দিন শমী ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঘরে কাটিয়েছে। শেষে তারও মনে হয়েছে, বসে থেকে সে যেন সুবিধের থেকে অসুবিধেই বেশি সৃষ্টি করেছে। এখন কালী জেঠু সন্ধ্যার দিকে একবার ডাকলে ঘরে যায়, তার

ইঙ্গিতে আবার উঠে চলে আসে। এখান থেকেই কলেজে যাতায়াত করছে।

ফ্ল্যাটবাড়িতে যাবার প্রস্তাব করে শমী জেঠুর কাছে ধমক খেয়ে কিছুদিন চুপ করেছিল। শেষে সিতুর কাছেই কথাটা তুলল একদিন, বলল, এবার ফ্ল্যাটে ফেরা দরকার তো...।

খানিক অপেক্ষা করে সিতু জিজ্ঞাসা করল, দরকার কেন?

শমী মুশকিলে পড়ল একটু। আমতা-আমতা করে বলল, দিনকতক থেকে আসি...মাসী তো হাসপাতালে থেকেই চলে গেল, তার ঘর, জিনিসপত্র সব তেমনি পড়ে আছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সিতু শান্ত মুখে বলল, শমী, আমার মন বলছে তোমার মাসী এখানেই ছিল, এখান থেকেই গেছে, তার যা-কিছু পড়ে আছে এখানেই পড়ে আছে...আর, তুমি তার ঘরেই আছ। এরকম ভাবতে তোমার খুব অসুবিধে হবে?

ঘাবড়ে গিয়ে শমী তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, অসুবিধে হবে না।

বাড়ির মধ্যে এই একজন কথা এত কম বলে আজকাল যে শমীর ভয়ই করে। মাসী তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিল, আর সাবধান করেছিল, ও ফিরে এলে দুঃখ দিবি না, অবাধ্য হবি না, আমার কথা ভেবে কক্ষনো একটুও রাগ পুষবি না, দুঃখে জ্বলে জ্বলে ও কি যে হয়ে গেছে জানিস না, ভাবলে আমার আনন্দ হয় আবার ভয়ও করে।

শমী জিজ্ঞাসা করেছিল, ভয় কেন। মাসী বলতে পারে নি কেন। বলেছিল, কি জানি কেন ভয়। মাসীর সেই অজানা ভয়ের সুরটাই শমীর মনে লেগে আছে কিনা জানে না।...ফিরেছে বটে, কিন্তু যে গেছল সে ফেরেনি। মানুষটা সর্বদাই যেন খুঁজছে কিছু, কিছু একটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে, আর নিঃশব্দে কি এক অপরিপূর্ণতার ভার বইছে। খুব কাছে থাকলেও কাছে মনে হয় না। শমী এক-একসময় খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে। সেই বারো-তেরো বছর বয়েসের অপরিণত তৃষ্ণায় ওর দেহটার ওপর কত রকমের হামলা যে করেছে ঠিক নেই। আঠারো বছর বয়সের নৃশংস তাড়নায় ওকে ভুলিয়ে স্কুল থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়দানের বেঞ্চিতে টেনে এনে রাক্ষসের মত ওকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে চেয়েছিল। কলেজে বা য়ুনিভার্সিটিতে যাতায়াতের বাস-স্টপের উল্টোদিকে গাড়ি থামিয়ে দিনের পর দিন ওকে শুধু দুটো চোখ দিয়েই নিঃশেষে গ্রাস করতে চাইত, আর সবশেষে গ্রাসের সেই নিষ্ঠুর মত্ততায় পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে গাড়িতে টেনে তুলেছিল—সেই সব প্রবৃত্তির ছিটে-ফোঁটাও আর চোখে পড়ে কিনা শমী খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে। লক্ষ্য করতে গিয়ে শমী নিজে অপ্রস্তুত হয়েছে, নিজের উদ্দেশে ভ্রূকুটি করেছে, তবু লক্ষ্য না করে পারেনি।

নিস্পৃহতা নয়, বরং সব থেকে বেশি টান এখন তারই ওপর, অনুভব করতে পারে। তবু শমীর ধারণা, কাছে আছে বটে, কিন্তু ভিতরের মানুষটা অনুপস্থিত নিরুদ্দিষ্ট। কোথায় কোন্ দূরে বিচরণ করছে, চেষ্টা করেও শমী তার হদিস পায় না। মাসীকে নিয়ে হরিদ্বার ছেড়ে আসার আগে বাগের মাথায় তীব্র শ্লেষে মুখের ওপর যে কটূক্তি করে এসেছিল মনে আছে। বলেছিল, তার ভণ্ডামি সে চেনে. দশ বছর বয়স থেকে সে যে কি তা ওর জানতে বাকী নেই।...বলেছিল যখন তখনো ভাবতে পারেনি মানুষটা কত বদলেছে।

সেদিন শিবেশ্বরের ঘর থেকে বেরিয়ে কালীনাথ সিতুর ঘরে এলেন। শমীও তখন সেই ঘরে। মেঘনা তার হাত দিয়ে ছোট মনিবের জন্য গরম দুধ পাঠিয়েছিল, খাওয়া হলে গেলাসটা নিয়ে যাবে বলে শমী দাঁড়িয়ে আছে।

দুজনকেই এক পলক দেখে নিয়ে কালীনাথ গম্ভীর মুখে বসলেন। সিতুকে বললেন, তোর সঙ্গে একটা দরকারী আলোচনা আছে...লজ্জা না পেলে শমীও শুনতে পারে।

জেঠুর তাজা ভাবটুকু বজায় আছে বলেই বাড়ির বাতাস সর্বদা গুমরে মরছে না এখনো। শমী আর সিতু জিজ্ঞাসু।

কালীনাথ ধীরে-সুস্থে আবার মুখ খুললেন।—তোর বাবা বলছিল আর দেরি না করে বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়া দরকার।

পায়ে-পায়ে শমীর সরে পড়ার মতলব। কিন্তু ওদিকে আর একজনের দিকে চোখ পড়তে যেতেও পারল না। দুধের গেলাস রেখে সিতু সোজা হয়ে বসেছে।—বাবা বলছিল!

মুখে না বলতে পারলেও তোর বাবা কখন কি বলতে চায় আমি বুঝতে পারি।

সিতুর মুখে বিরক্তির আঁচড় পড়তে লাগল, যা আজকাল সচরাচর পড়ে না। বলল, দেড় মাস হয়নি মা মারা গেছে, এর মধ্যে বিয়ে!

কালীনাথ দ্বিধান্বিত, বললেন, কিন্তু এদিকের যা অবস্থা, দেরি করা ঠিক হবে?

তা তো বুঝলাম, এক বছর না গেলে বিয়ে হয় কি করে?

এই সমস্যায় পড়বেন কালীনাথ ভাবেননি। শমী মনে মনে চাইছে, জেঠু এ নিয়ে যেন আর কথা না বাড়ায়। কালীনাথও অনুভব করলেন কিছু, কথা না বাড়িয়ে প্রস্থান করলেন।

দিনকতক বাদে শমী আবার এক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ল। সন্ধ্যার পর পাশের ঘরে ডাক পড়তে গিয়ে দেখে মেসোমশায়ের সামনে জেঠু বসে, আর তার সামনের ছোট টেবিলের ওপর বেশ বড়সড় সুটকেস একটা। জেঠু সেটা খুলতে বলল ওকে। খুলে শমী অবাক। সুটকেস ভর্তি লাল-নীল-সবুজ গয়নার বাক্স। জেঠু জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কার ছিল বুঝতে পারছিস?

শমী সামান্য মাথা নাড়ল, পারছে।

তোর শ্বশুরের খুব ইচ্ছে এগুলো তুই পরিস, এখানেই বসে পর দেখি খানকয়েক।

বিমূঢ় শমী বিছানায়-শোয়া মানুষটার দিকে তাকাল একবার। নির্বাক দুটো চোখে শুধু অনুরোধ নয়, আকুতি দেখল যেন। প্রথম যেটা হাতে ঠেকল শমী সেই বাক্সটাই খুলল আস্তে আস্তে। বড় হার একটা। পরল। জেঠু তাগিদ দিল, ও কি, হাত গোটালি কেন, আরো পর।

একে একে আর এক ছড়া হার, দুল, গোছা করে চুড়ি আর তার ওপর মোটা মোটা দুটো বালা পরার পর নিষ্কৃতি। খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে জেঠু মন্তব্য করল, থাক, আর পরলে তোকে আবার টেনে তুলতে হবে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরিস, সুট-কেসটা নিয়ে যা।

দুজনকে প্রণাম করে সুটকেস হাতে শমী ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা সিতুর ঘরে। দরজা আবজে দিয়ে সুটকেসটা ধপ করে তার সামনে রেখে বলল, দেখো কাণ্ড—

কি?

নতুন কিছু দেখছ না?

আর একবার চোখ বুলিয়ে সিতু বলল, গয়নাগাঁটি পরেছ দেখছি।

হ্যাঁ জেঠুর মারফত বাবার হুকুম মাসীর এসব গয়না আমাকে পরতে হবে। এগুলো তাঁদের সামনে পরেছি, এখন তাঁদের ইচ্ছে বাদবাকীগুলো তুমি পরিয়ে দাও, তারপর আমাকে একটা ঠেলাগাড়িতে তুলে ঠেলে নিয়ে বেড়াও।

সহজ হবার চেষ্টায় বলা। সিতুব ঠোঁটেও হাসি, চোখে দেখার আগ্রহ। নিষ্পলক চেয়ে আছে। খুশি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। শমী আবার বলল, এ গয়না পরে মাসীকে কি দেখাতো আর আমারই বা কি রূপ খুলেছে!

সিতুর আনন্দ-উপচানো দু চোখে কি যেন তন্ময়তা। সুটকেসের গয়নার বাক্সগুলো নাড়াচাড়া করল খানিক। স্পর্শ অনুভবের চেষ্টা। ছোট একটা বাক্স খুলল। তার মধ্যে বড় ঝকঝকে একটা হীরের আংটি। শমীব হাত টেনে নিয়ে আঙুলে পবিয়ে দিল সেটা। লজ্জারক্ত শমী চকিতে পিছন ফিরে ভেজানো দরজার দিকে তাকালো একবার।

সিতুব চোখে-মুখে দূরের তন্ময়তা। শমীর হাত তার হাতে তখনো। নিজের মনেই বলল, মা-কে পেয়ে আমি কত পেলাম ঠিক নেই...

কি-চ্ছু পাওনি, ছদ্মগাম্ভীর্যে শমী বলল, তোমাকে দেখলে মনে হয় হরিদ্বারের কোন্ পাহাড়ের মাথায় বসে আছ এখনো।

শমীকে ভালো লাগে, কত যে ভালো লাগে সিতুই শুধু জানে। যখন কিছু ভাল লাগে না, কাউকে ভাল লাগে না, তখন বাড়িব মধ্যে শুধু ওকেই খোঁজে। মায়ের গযনা পরার দরুন আজ আরো ভাল লাগছে। স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও স্বাভাবিক কৌতুকের একটা মিষ্টি লোভ উঁকিঝুঁকি দিল। হেসে বলল, বিয়ের তো বেশ দেরি এখনো, পাহাড় থেকে বেশী নামলে তোমাব পক্ষে ভাবনার কথা হবে না?

শমীর চোখে-মুখে আনন্দেব ছটা। প্রত্যাশার অতিরিক্ত কিছু শুনল যেন। তার হাত তখনো ওই হাতের মুঠোয়, ভিতবটা বিহ্বল। এই তরল সহজতাটুকু ধরে রাখার চেষ্টা। সম্ভব হলে বলত, সত্যি নেমে এলে ভাবনা বরং ঘোচে। বলল না তাও কম নয়। ঠোঁটে হাসি, চোখে চোখ।—ভাবনায় তো পড়ে আছি সেই ন বছর বয়েস থেকে, আজ আংটি পবানো পর্যন্ত সারা, ভাবনাবই বরাত। তা পাহাড় থেকে নামোই যদি কি রকম ভাবনার কথা হবে? ভুলিয়ে স্কুল থেকে বার করে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলে, সে বকম...না বি-এ পাস মেয়েকে দিনে-দুপুরে চড়ের চোটে গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে গাড়িতে টেনে তুলতে চেয়েছিলে, সে রকম—নাকি, তার থেকেও বেশি?

সিতু হাসছে। অদ্ভুত লাগছে। কথাগুলো পুরনো ক্ষত মনে করিয়ে দেবার মত নয়, উল্টে ক্ষত মুছে দেবাব মত। এক পলক দেখে নিয়ে আরো গম্ভীর মুখ করে শমী আবার বলল, তবু নেমেই এসো তো, বেশী ভাবনায় ফেলতে চেষ্টা করলে আমার হাতেও ব্যবস্থা আছে।

কি ব্যবস্থা?

মেয়েদের খাতা একগাদা জমে আছে, হাতে পেন্সিল দিয়ে খাতা দেখতে বসিয়ে দেব।

গয়নার বাক্স ফেলে রেখেই উঠে চলে এলো। লজ্জাই করছে। ঘরে ঢোকার সঙ্গে

সঙ্গে মাসীর চোখে চোখ—দেয়ালের ছবির মধ্যে মাসীও মুখ টিপে হাসছে তার দিকে চেয়ে। ভুরু কুঁচকে বলতে ইচ্ছে করল, ওভাবে না বলে এসে করি কি, নিজের ছেলের ভাবখানা তো দেখছ!

ভিতরে ভিতরে সিতু কি যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে নিজেই ঠাওর করতে পারে না। সদা বর্তমানের এই বাস্তবের দিকেই ফেরাতে চায় মনটাকে। বাড়ির দিকে, বাবার দিকে, বাড়ির অন্য মানুষদের দিকে, শমীর দিকে। সকলের ভিতরে থেকেও এই মন কোথায় উধাও হয়ে যায় আর অবিরাম কি যে খোঁজে, জানে না। কালের আঘাতে গড়া এই শূন্যগর্ভ স্বপ্ন থেকে সত্য কিছু ছেঁকে তোলার তাগিদ।

প্রভুজী ধামের চাবি এখন তার কাছে। মাঝে মাঝে সেখানে যায়। লোক রেখে ওখানকার পরিত্যক্ত চেহারাটা বদলানো হয়েছে আবার। কেন জানে না, চোখে খারাপ লেগেছিল তাই বোধ হয়। সামনের হলঘরে খেয়ালী শিল্পীর আঁকা প্রভুজীর সেই বড় অয়েল-পেণ্টিং টাঙানো। তার সামনে এসে দাঁড়ায়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক নেই। কখনো ভাবে, ওখান থেকেই নির্দেশ আসবে কিছু? হরিদ্বারে এক-একটা সঙ্কটের মুখে হঠাৎ হঠাৎ ভিতরটা এঁরই শরণাপন্ন হত কেন?

এক-একসময় শমীও সঙ্গে থাকে। কোথায় যাচ্ছে টের পেলেই সঙ্গে আসে। ওই ছবির সামনে তাকে অমন নির্বাক নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কি এক অদ্ভুত আশঙ্কায় ভিতরটা অস্থির হয়ে ওঠে। এই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রক্ত-মাংসের একটা মানুষ এ-রকম স্থির হয়ে যায় কি করে ভেবে পায় না। সঙ্গে সঙ্গে মাসীর এক-একদিনের গল্প মনে পড়ে। সব থেকে বেশি মনে পড়ে এগারো দিনের এক শিশুর ঝাঁকড়া কালো চুলের মধ্যে ধপ্‌ধপে একটা পাকা চুল দেখে তার ঠাকুমার চিৎকার করে ওঠার গল্পটা। আর তক্ষুনি এম. এ. পাস কলেজে-পড়ানো মেয়ের বুকের ভিতরটা দুরদুর করে ওঠে কেমন।

সেদিনও বহুক্ষণ অমনি স্তব্ধ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে সিতু একসময় নিজেব মধ্যে ফিরে এলো। হেসে উঠে বলল, যত পাগলের ব্যাপার—

কি?

সচকিত হয়ে সিতু তাকালো তার দিকে, কাউকে শোনাবার জন্য ও-কথা বলেনি। শমী আবার জিজ্ঞাসা করল, পাগলের ব্যাপারটা কি?

কিছু না, চলো।

শমী লক্ষ্য করল, গাড়িতে উঠে বসতে না বসতে মানুষটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল আবার। ও পাশে বসে আছে, তাও আর হুঁশ আছে কিনা সন্দেহ।

আনন্দবাবা সংসারে ফিরতে বলেছিলেন সিতুকে, সব দেখতে বলেছিলেন, শুনতে বলেছিলেন। সিতু দেখে, শোনে। কিন্তু দেখার কি আছে, শোনার কি আছে ভেবে পায় না। দুনিয়াটা যেন কি এক অনড় বোঝা ঘাড়ে নিয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের ছেলেবেলায় যেমন দেখেছিল তেমনি।...ছেষট্টি সাল এটা। এর মধ্যে কত কি ঘটে গেছে, রোজ কত কি আলোড়ন উঠছে। দু-দুটো সংঘর্ষের বন্যা পার হয়েছে দেশের ওপর দিয়ে—একবার চীনের সঙ্গে হামলা, আর একবার পাকিস্তানের সঙ্গে

ছোটখাটো যুদ্ধ একটা। একে একে কজন দেশনেতা চোখ বুজল—বিধান রায়, জওহরলাল, লালবাহাদুর। মাসের পর মাস ধরে চতুর্দিক থেকে একটা নেই-নেই রবে কানে তালা লাগার উপক্রম—চাল নেই, ডাল নেই, তেল নেই, চিনি নেই, পরনের কাপড় নেই, মাথা গোঁজার জায়গা নেই। অথচ এত কাণ্ডর মধ্যেও মানুষের ভেতর বদলায়নি। সেই একভাবে, এক সুরে চলছে। চলছে না, থিতিয়ে আছে।

সিতু চেয়ে চেয়ে দেখে।...সেই চালিয়াত দুলুর সঙ্গে দেখা হয় কখনো-সখনো। দুলু সাগ্রহে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফ্যাক্টরীর ফোরম্যান হয়েছে এখন দু-দশ কথার পর কোন্ ওপরঅলার সঙ্গে খাতির আর কার ওপর রাগ—আগের মত এখনো ঠিক সেই কথাই এসে পড়ে। নীচে এসে দাঁড়ালে কখনো-সখনো গলির মুখ থেকে ভীতু অতুল এগিয়ে আসে। পাঁচ মিনিট কথা বললেই ও এখন কোন্ অসুখে ভুগছে আর কোন্ অসুখের ভয়ে তার ভিতরটা মুষড়ে আছে বোঝা যায়। নেশা-গর্বী সজারুমাথা সুবীর আগের মতই বড়লোকের ছেলেকে খাতির করার জন্য সাগ্রহে এগিয়ে আসে। দু-চারটে কুশল প্রশ্নের পরেই হেসে বলে, তোমাকে তো এখন ভাল নেশায় ধরেছে শুনছি, আধ্যাত্মিক নেশা—আমরাই মরলাম। ভাল-মন্দ দুই-ই তার কাছে নেশার ফল। কি ভেবে ক্লাসের সেই ভাল ছেলে সমরের বাড়িতে গেছল একদিন—উত্তর বলাব জন্যে হাত তুলে যে ঘোড়ার মত লাফাত—আর সর্বদা বোঝাতে চেষ্টা করত, সকলের থেকে কত বেশি জানে। সে এখন কোন্ পরিকল্পনা বিভাগে বড় চাকরি করছে। দেখা হতে খাওয়ালো, আদর-অভ্যর্থনাও করল। আর বলল, কারো মগজে কিছু নেই, এ দেশের হবে কি। হাতে ক্ষমতা থাকলে দেখিয়ে দিতে পারত, মাথা খাটিয়ে কত কি করা যায়। এবারে একটা চমকপ্রদ প্ল্যান নিয়ে মেতে আছে সে, দেখা যাক কর্তাদের টনক নড়ে কিনা।

কয়েক বছর আগে নীলিদি নাকি কার সঙ্গে চলে গেছে কোথায়। সিতু ভাবে, নীলিদির আগেও তো অনেকে ওইভাবেই গেছে। গলিতে ভরা-বয়স আর উঠতি-বয়সের নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে আবার—একদিন যাদের ছোট দেখেছিল, তারা। গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, মানুষ-জন দেখে, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে, গল্প করে।...সেই একই চিত্র। এদের মধ্যে কারো কারো বিয়ে হবে, দুই-একজন নীলিদির মত নিখোঁজ হবে, মিত্রামাসী আর হেলেন জোন্স-এর মতও হতে পারে কেউ কেউ—এক-আধজন হয়ত বা রঞ্জুদির মত হবে। রঞ্জুদিকেও দেখেছে লক্ষ্য করেছে। ওই গলিতেই থাকে এখনো। সাড়ে নটায় বেরুতে দেখে, সাড়ে পাঁচটা-ছটায় ফেরে। কোথায় চাকরি করে এখন সিতু জানে না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত—গোটা রঞ্জুদি একটা কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়েছে যেন? দু-দিকের চোয়ালের হাড় উঁচিয়ে উঠেছে, মাথায় চুল কমে গেছে, শরীর শুকিয়েছে। আসা-যাওয়া করে যখন, গলির মুখের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের হাসিগল্প বন্ধ হয়ে যায়।

...ছোট ছোট ছেলেরা বাইরের রকে বসে বা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ঠিক তেমনি করেই আড্ডা জমায়। যা ওরা করত। সেই রকমই হুটোপুটি করে, অশ্লীল কটূক্তি করে ওঠে, মেয়েদের দেখলে ভিতর চঞ্চল হয়, নিজেদের মধ্যে টীকা-টিপ্পনী কাটে। ওদের কেউ সুবীর হবে, কেউ সমর হবে, কেউ দুলু হবে, কেউ বা ভীতু অতুল হবে...আর কেউ বা ওর মত হবে।

সিতু চমকে ওঠে। না ওর মত হয়ে কাজ নেই।

দম বন্ধ হবার উপক্রম হঠাৎ। এ কি স্রোতশূন্য ধারাশূন্য জীবনের বদ্ধ জলার মধ্যে পড়ে আছে তারা? কত দিন ধরে পড়ে আছে? কতকাল ধরে? আর কত কাল এমনি থাকবে? এই একটা পাড়ার আয়নায় যেন গোটা দেশটাকে দেখা যাচ্ছে, চেনা যাচ্ছে। এ কি কাণ্ড!

একটা ছোট আলো জ্বলে উঠলে একরাশ অন্ধকার দূর হয়ে যায়। চেতনার কোন্ গভীর থেকে তেমনি একটা আলো জ্বলে উঠল বুঝি। কতকালের সঞ্চিত অন্ধকারের স্তূপ দীর্ণ-বিদীর্ণ করে সেটা কাছে এগিয়ে আসতে পারল। ছোট একটা প্রশ্নের আকারে মগজের সুপ্ত কোষগুলো সব জাগিয়ে দিয়ে যেতে লাগল। যা হয়ে আসছে, তা যদি আর না হয়? ওই মেয়েগুলোর কেউ যদি নীলিদি, রঞ্জুদি, হেলেন জোন্স, মিত্রামাসী না হয়? ওই ছেলেগুলোর অনাগত মুখগুলো যদি সুবীর সমর দুলু অতুল বা সিতুর মত না হয়? অস্তিত্বের এই শোকটুকু শুধু যদি ঘোচানো যায়? তাহলে?

তাহলে কি হয় সেই চিত্রটা কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করছে সিতু। দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যাচ্ছে। নিভৃতের ছোট আলোর ছটা বড হয়ে হয়ে কাছে থেকে দূরে, দূর থেকে আরো কত দূরে ছড়িয়ে পড়ছে ঠিক নেই। এই তন্ময়তার মধ্যে তিন-চার দিন কেটে গেল। বাড়ির সকলে লক্ষ্য করছে, তন্ময়তাব এই রূপটা নতুন ঠেকছে সকলের চোখে। এই ভাবনার তলায় যাতনা নেই, অস্থিরতা নেই—শুধু যেন গভীর থেকে গভীরতর কিছুতে ডুব দেবার প্রশান্তি আছে।

সেদিনও সিতু নিজের ঘরের মেঝের আসনে বসেছিল। রাত তখন আটটা হবে। শমী কাছেই ঘুর-ঘুর করছিল। সিতু লক্ষ্যও করেনি। হঠাৎ সে ভাবছিল আনন্দবাবার কথা। থেকে থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল, আনন্দবাবা শুধু মা-কে দেখার জন্যে তাকে ঠেলে পাঠাননি। ওকে সংসারে পাঠিয়েছেন আর সব দেখতে বলেছেন, শুনতে বলেছেন, শুধু এই জন্যে। এই আলোটুকু দেখার জন্যে. আলোর এই সেতুপথে কানে অবিরাম যে বার্তা আসছে তাই শোনার জন্যে। তার ভাবনা সঙ্কল্পের যে মোহনার দিকে ধেয়ে চলেছে, শুধু সেদিকে ছোটার জন্যে।

কি হল হঠাৎ কে জানে। শশব্যস্তে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।...চিন্তার আনাচ-কানাচেও যার অস্তিত্ব ছিল না, হঠাৎ সে আবার কোথা থেকে এলো? আগে মনে পড়েনি কেন? এই কদিন মনে পড়েনি কেন?

গায়ের চাদরটা টেনে নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সামনে শমী। ব্যস্ততা দেখে অবাক।—কি হল? কোথায় যাচ্ছ?

মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরুলো শুধু, কি বলল বোঝা গেল না। দাঁড়িয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করার মত সময়ও হাতে নেই যেন। চোখের পলকে নীচে নেমে গেল। সিঁড়ির সামনে বড় গাড়িটা দাঁড়িয়ে। কে বেরুবে, কার জন্যে দাঁড়িয়ে, জানে না। ড্রাইভারকে ডাকার ধৈর্যও নেই। উঠে বসে অনেক বছর বাদে নিজে কলকাতার রাতের রাস্তায় গাড়ি ছোটালো সিতু।

শ্মশান। এক পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামল। ত্রস্ত পায়ে ভিতরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। সাদাটে আলোয় রাত বোঝা যায় না। গোটা দুই-তিন চিতা জ্বলছে, গোটা দুই নিভে এসেছে। যে চিতায় মায়ের দেহ ভস্ম হয়েছিল আগে সেদিকে চোখ গেল।

সেটা জ্বলছে না। সন্ধানী দু চোখ চারদিকে ঘুরে ঘুরে কাউকে খুঁজতে লাগল। পেল না। গঙ্গার ঘাটের দিকে এগলো।

এক কোণে বসে আছে একজন।...মেয়েছেলে। লালপেড়ে শাড়ি দেখে মনে হল সে-ই। সেই বিকৃতমস্তিষ্ক রমণী, যে চিতাভস্মে জল ঢালে—তারই জন্যে কোন্ এক বউ আত্মঘাতিনী হয়েছে বলে যার মাথা খারাপ। পায়ে পায়ে সিতু তার পিছনে এসে দাঁড়াল। মহিলা টের পেল না, তন্ময় হয়ে রাতের আকাশ দেখছে।

বীথিমাসী!

বিষম চমকে ঘুরে বসল। বিস্ফারিত দুই চোখে রাজ্যের বিভ্রম। চেয়ে আছে। কপালের বড় সিঁদুরের টিপটা জ্বলজ্বল করছে।

...কে তুমি?

আমি তোমাদের জ্যোতিরাণীর ছেলে সিতু, আমাকে চিনতে পারছ না?

সময় লাগল, কিন্তু চিনতে পারল। চেয়ে আছে। চেয়েই আছে। অনেকক্ষণ বাদে চাপাগলায় বলল, দিদির দেহ সেদিন তোমরা ওই ওখানে এনে ছাই করে দিয়ে গেলে না?

হ্যাঁ, দেহ...।

বিহ্বল চোখে শুকনো টান ধরেছে। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, আজ আবার কাকে নিয়ে এলে?

কাউকে না, আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

আবারও সেই বিস্ময়, বিভ্রম।...আমাকে। আমার কত পাপ জানো?

সিতুর ঠোঁটে হাসি, দেখছে তাকে। হাল্কা কৌতুকের সুরে বলল, যে আগুনে তোমাদের জ্যোতিরাণীর দেহ ছাই হয়ে যায়, তার থেকে ডবল আগুনে জ্বলে জ্বলে তোমার ও পাপটুকুও ছাই হয়নি বলছ? আগুনকে অত অবিশ্বাস কোরো না বীথিমাসী।

নিজের অগোচরে বীথি উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে। কাছে এগিয়ে এলো। দু চোখে আশা, ভয়, অবিশ্বাস। সত্যি তার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে কিনা নিঃসন্দেহ হবার জন্য হাত বাড়িয়ে সিতুর গা, মুখ স্পর্শ করল।—আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

প্রভুজী ধামে।

চমকে উঠল প্রথম তারপরেই আর্ত আকুতিতে ফিসফিস করে বলে উঠল, সত্যি? সত্যি সেখানে নিয়ে যাবি? ওরে, তোকে কে পাঠাল? আমাকে নেবার জন্য তোকে কে পাঠাল?

সিতুর গলার স্বর ভারী, একটু থেমে জবাব দিল, বোধ হয় প্রভুজী নিজেই। এসো।

আটচল্লিশ

রাত মন্দ নয় তখন। কালীনাথ আর গৌরবিমল এক-একবার বাইরের বারান্দায় ঘোরাফেরা করে যাচ্ছিলেন, আবার ঘরে গিয়ে বসছিলেন। শমী লক্ষ্য করছে, মেঘনারও মুখ ভার। রাত আটটার পরে চোখের ওপর দিয়ে লোকটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল, সাড়ে এগারটা বাজে, ফেরার নাম নেই, অথচ কোথায় গেল জানে না—এ যেন তারই দোষ। জেঠুর

সামনেই একবার ওর গজগজানি কানে আসতে পালাতে হয়েছিল। মেঘনা বলেছিল, বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে-বুকিয়ে ফেলাই ভালো—রকম সকম ভালো লাগছে না।

বারোটার কিছু আগে নীচে গাড়ি থামার শব্দ কানে এলো। একটু বাদে সিতু ওপরে উঠে এলো। সামনে সকলকে দেখে অপ্রস্তুত।—সবাই ভাবছিলে বুঝি?

জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে কালীনাথ কাছে এগিয়ে এলেন। গায়ের চাদরটা সরিয়ে দেখলেন ভিতরে কি আছে। শুধু গেঞ্জি একটা। দুটো ট্যাকই হাতড়ে পরীক্ষা করে নিলেন একবার। তারপর গৌরবিমলের দিকে ফিরলেন। সাধু-টাধুদের ঠাণ্ডা লাগে না শুনেছি, মাঝরাস্তায় গাড়ির তেল ফুরিয়ে গেলে সেটা কিনতে পয়সাও লাগে না নাকি? ড্রাইভার বলছিল—গাড়িতে তেল বেশি ছিল না! শমীর হাসি-মুখখানা চড়াও করলেন কালীনাথ, হাসছিস কি, মেঘনার প্রেসক্রিপশনটা ওকে শুনিয়ে দিস—

শমীর মুখ লাল হওয়া সার। সিতু ততক্ষণে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেছে। সে যেন অদৃশ্য জ্যোতির তর্জনীর স্পর্শ পেয়েছে একটা। তার শিহরণে ভিতরটা কাঁপছে। কে কি বলছে কানে এলেও ভিতরে পৌঁছুচ্ছে না।

শমী ঘরেই খাবার এনে দিল। হাত-মুখ ধুয়ে সিতু খেতে বসল। রাতের আহার নামমাত্র। বাইরে কটা বছর কাটানোর ফলে এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তবু শমী কিছু বেশিই আনে, একথা-সেকথায় ভুলিয়ে খাওয়াতে চেষ্টা করে।

আজ সিতু খেয়াল না করেই খাওয়া সারল। মুখ-হাত ধোয়ার ফাঁকেও মাঝে মাঝে শমীকে দেখছে। ঝকঝকে। শমী অস্বস্তি বোধ করছে, আবার এ-মুখ অদ্ভুত ভালোও লাগছে। তাকালে মনে হয়, ভিতরের কি এক ভাবনার বোঝা সরে গেছে। চোখে-মুখে আনন্দ আর উদ্দীপনার ছটা, অথচ শান্ত কমনীয়।

সিতুর খেয়াল হল, কেউ একটি কথাও বলছে না। জিজ্ঞাসা করল, তোমার তো এখনো খাওয়া হয়নি বোধ হয়?

কই আর হল, দুজনেরটা একসঙ্গে এনেছিলাম, তুমি একাই শেষ করে দিলে।

অপ্রস্তুত মুখে সিতু শূন্য থালার দিকে তাকালো একবার।—সত্যি নাকি?

শমী হেসে ফেলল, তোমার আজ হল কি? আমার কি তোমার মত সাত্ত্বিক খাওয়া নাকি! হবে'খন। জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল কোথায় যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এক্ষুনি আবার অন্য চিন্তায় ফেরাতে চায় না। বলল, ছোট দাদু আর জেঠু মনে মনে সারাক্ষণ বকছিল আমাকে, তাদের ধারণা, তুমি কোথায় গেলে না গেলে আমার না জানাটা দোষের। আর মেঘনা তো রেগেই আগুন, বলছিল, বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকেবুকে যাওয়া দরকার, তোমার রকম-সকম ওর ভালো লাগছে না। জেঠুরও সেই মত দেখলাম...

সিতু চেয়ে আছে শমীর দিকে। দু চোখ ঝকঝক করছে তেমনি। বলল, মা যে কি করে গেছে ওরা জানে না, মন্ত্রটাকে তাই বড় করে দেখছে।

শমীর হাবাগোবা মুখ।—বিয়েটা হয়েই গেছে বলছ?

হ্যাঁ। আগ্রহে উদ্দীপনায় সিতু কাছে ঝুঁকল।...শমী একটা কাজ করবে?

শমী আরো ভালো করে অনুভব করছে—এই রাতের মধ্যেই কিছু একটা ঘটে গেছে। ভালো কিছু তাতেও সন্দেহ নেই—কিন্তু ওই চোখ-মুখ এত ঝকঝক্ করছে দেখেই অস্বস্তি বাড়ছে তার। লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে তাই কৌতুকের সহজ রাস্তা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা। ঘাবড়ে যাবার মত মুখ করে বলল, বিয়ে হয়েই গেছে বলছ, রাতে

এ ঘরে থাকতে-টাকতে বলবে নাকি?

ঝোঁকের মুখেও সিতু না হেসে পারল না। দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালো। এ ঘরেও জ্যোতিরাণীর একখানা ফোটো টাঙানো। আঙুল তুলে দেখালো শমীকে, তোমার দুষ্টুমি দেখে মা হাসছে। তারপর হাসিমুখে নিজের বুকটা দেখিয়ে আবার বলল, যে ঘরেই থাকো সর্বদা এখানেই আছো।

ভিতরে আনন্দের ঢেউ একটা সামলে নিয়ে শমী হাল্‌কা সুরেই জবাব দিল, তাহলে যা বলবে না করে আর পারি কি করে!—কি কাজ?

তোমার ওই কলেজের চাকরি-টাকরি ছাড়তে পারবে?

এ আর এমন কি পারা, কোটিপতির ছেলের বউ আমি, চাকরি করতে যাবই বা কেন? তা কি করতে চাও, আমাকে সন্ন্যাসিনী-টন্ন্যাসিনী বানাবে নাকি?

সিতুর চোখ-মুখ আগের মতই জ্বল্‌জ্বল্ করছে আবার। জবাব দিল না।

হন্তদন্ত হয়ে কোথায় গেছলে, প্রভুজী ধামে?

প্রথমে শ্মশানে, সেখান থেকে প্রভুজী ধামে।

শ্মশানে শুনে শমী অবাক। সিতু বীথিমাসীর কথা জানালো তাকে। শোনার পর শমী স্তব্ধ খানিকক্ষণ। তারপর বলল, বীথিমাসীকে ওখানে একলা রেখে এলে।

একলা কোথায়, যাঁর ডেরা তিনিই আছেন, তাছাড়া দরোয়ান মালীরাও তো আছে।

খানিক চুপ করে থেকে শমী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, আবার প্রভুজী ধাম গড়তে বসবে?

তার চোখে চোখ রেখে সিতু মাথা নাড়ল, তাই। বলল, তবে আগে যে রকম দেখে এসেছ, সে রকম নয়, অন্য কিছু।

হরিদ্বার থেকে ফেরার কিছুদিন বাদে কালীনাথ বিশ-বাইশ হাজার টাকার একটা পাসবই সিতুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দরকাবে চাইতে না হয়। তাই দিয়েই সিতু প্রভুজী ধামের আর একদফা সংস্কার শুরু করে দিয়েছিল। পরে ভার দিয়েছে ছোট দাদুকে। বলেছে টাকা যা লাগে জেঠুর কাছ থেকে চেয়ে নেয় যেন।

গৌরবিমল অবাক।—আবার কি হবে ওখানে?

* * *

কি হবে বলেছে। গৌরবিমল শুনেছেন, শমী শুনেছে, শুনেছেন কালীনাথও। কিন্তু আদর্শের পরিকল্পনা শোনা এক আর তার আলো সমস্ত সত্তায় জ্বলতে দেখা আর এক। সিতুর মুখের দিকে চেয়ে তাই দেখেছে সকলে। কালীনাথেরই শুধু নির্লিপ্ত বিরস মুখ।

প্রভুজী ধামের এই নতুন চিত্রটা সিতুর চোখের সামনে এত স্বচ্ছ আর স্পষ্ট যে সেটাই বিভ্রমের কারণ। তার বক্তব্য, কাঁচা বয়সের ছেলেরা পরিণত বয়সে যা হয়ে ওঠে, আর তা হবে না। প্রভুজী ধাম আবার জেগে উঠবে এই ছেলেদের নিয়ে। তাদের চরিত্রের ধাতু বদলে দিতে হবে। তারা সুন্দর হবে, অসুন্দরের সঙ্গে তারা আপস জানবে না। তারা জ্ঞানী হোক বিজ্ঞানী হোক, যা খুশি হোক, আর তারপর যেখানে খুশি যেদিকে খুশি ছড়িয়ে পড়ুক—বাধা নেই। কিন্তু সব কিছুর আগে আনন্দের মধ্য দিয়ে আর শুচিতার মধ্য দিয়ে অভিশপ্ত কালের লোভ হিংসা ভয় আর অশুভ বাসনার জঠর থেকে মুক্ত করতে হবে তাদের। এই অভিশাপ অনায়াসে জয় করতে পারার

মত চরিত্রের পাকাপোক্ত ভিত গড়ে দিতে হবে। নতুন ভিত। প্রভুজী ধামের সেটাই হবে একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র শিক্ষা।

ধ্যানী ভারতের যে চিত্রটা সিতুর চোখে ভাসছে, সেটা বিচিত্র বটে। তার মতে ভারতের প্রথম আর্যরা ছিল বিরাট স্রষ্টা। ছিল কবি-মানস, জ্ঞান-মানস রস-মানসের পূজারী। দেহ-নগরের মধ্যেই সার্থক রূপ-নগরের ফসল ফলাতে চেষ্টা করত তারা। তারা গান গাইত, স্তব করত, মন্ত্র পড়ত, ছড়া কাটত, নাটক করত। আকাশের ঝড় দেখে বজ্র দেখে স্তবস্তুতির মধ্য দিয়ে তারা প্রকৃতির রহস্যের মূলে পৌঁছুতে চাইত, আগুন বৃষ্টি রোগ শোক সংসার-জটিলতার অন্তর্মূলেও ঠিক একইভাবে দৃষ্টিপাত করত তারা। তাদের সেই সব গান স্তব মন্ত্র ছড়ার সমষ্টিই বেদ। কারণ বেদ মানে তো জ্ঞান। কালে এই জ্ঞানের শাখা যত বেড়েছে, বেদের শাখাও তো বেড়েছে। চিকিৎসা-শাখা হয়েছে আয়ুর্বেদ, যুদ্ধশাস্ত্র হয়েছে ধনুর্বেদ। সংসার-বৈচিত্র্যের হাসি-কান্না চাওয়া-পাওয়ার সংহত রূপ প্রতিফলিত যে 'ঋক'-এ অর্থাৎ মন্ত্রে, সেটা ঋক্‌বেদ সংহিতা, যজ্ঞের জন্য যে কাব্যমন্ত্র দরকার সেটা যজুর্বেদ, আর যজ্ঞের সুরের গান সামবেদ। ভূত-ব্যাধি মানুষকে অথর্ব করে ফেললে যে মন্ত্র-তন্ত্র-টোটকা দরকার, তার হদিস দেবার জন্য অথর্ববেদ।

মানুষের সব থেকে বড শোক তার এই কবি-মন ক্ষয়ের শোক। ক্ষয় যত বেড়েছে, তার সমূহ স্বার্থের দেহ-নগর ততো বড় হয়ে উঠেছে, রূপ-নগর ততো দূরে সরেছে। যত ক্ষয় হয়েছে, প্রক্ষিপ্ত জটিলতায় বেদ ততো দুরূহ হয়ে উঠেছে। তখনই দেখা দিয়েছে বেদ-শাখার উপর কায়েমী অধিকার লাভের মোহ, অধিকার লাভের গরিমা। বেদাধিকার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির শ্রেণীর গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়েছে। অধিকার ভেদের রেষারেষির সেটাই সম্ভবত সূচনা।

এরই মধ্যে রাজর্ষিরা ধ্যানের ভাবতের স্বপ্ন দেখেছিল। রূপনগরের বাস্তব স্বপ্ন। তাদের ধ্যানের সঙ্গে কর্মের নিগূঢ় যোগ ছিল। এমন কি, শ্রীরামচন্দ্রের সত্যযুগকেও কৃষিপ্রসারের কর্মযুগ বলে কল্পনা করা যেতে পারে। জনকের পেশা ছিল চাষবাস। রামচন্দ্র অহল্যা উদ্ধার করেছিল অর্থাৎ পূর্বভারতে হাল পড়েনি এমন বন্ধ্যা জমি উদ্ধার করেছিল ভাবলে ভুল হবে কেন? আর চাষের জমিতে সীতা অর্থাৎ লাঙলের ফাল কুড়িয়ে পেয়েছিল ভাবলে' সেই সীতা বা ফাল সে নিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে, তার মানে সে দেশে কৃষি প্রসার লাভ করেছিল। বানর আর রাক্ষস বলতে অনার্যরা বাস করত তখন সে দেশে।

রূপনগর কল্পনার বড় অন্তরায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বর্গের অধিকার রক্ষার লোলপুতা, তাদের দম্ভ মোহ শাসন পোষণ। তাদের হৃদয় থেকে নির্বাসিত হয়ে পড়েছিল বৃহৎ জনতা। এরই বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা শ্রীকৃষ্ণের। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও সে নীচু বর্ণের মানুষ। জনতার মরুহৃদয়ের উত্থানের বন্যা নিয়ে এসেছিল সে। ধর্মরাজ্য বলতে তারও ছিল আপামর সকলকে নিয়ে রূপনগর প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অন্ধতা মূঢ়তা স্বার্থপরতানাশী রূপনগর প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ নয় কেন? সর্বস্তরের মানুষকে জ্ঞানে কর্মে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া গীতার আর কি লক্ষ্য?

নজীর আরো আছে। ঘৃণা লোভ বিভেদের অন্ধকার দূর করার জন্য আপামর সকল মানুষকে মানুষ বলে ডাক দিল সিদ্ধার্থ গৌতম। তার রূপনগরে উঁচু-নীচু সকলের

একাসনে বসার অধিকার। সিদ্ধার্থ নির্মূল করতে চেয়েছিল মানুষের অহংবোধ, তাকে সৎ হতে বলেছিল, স্বাভাবিক হতে বলেছিল, অহিংস হতে বলেছিল।

তার এই রূপনগরের ধ্যান বহন করেছে কত রাজাধিরাজ—অশোক, কণিষ্ক, হর্ষ। এই ভারতের বুকে বিজয় পতাকা পুঁতেছে সাম্রাজ্যগ্রাসী পাঠান, দর্পোদ্ধত রথের চাকা ঘুরেছে মোগল বাদশাহদের, বহু তেজ বিকীর্ণ হয়েছে ইংরেজের শাসন পতাকায়। যুগে যুগে তখনো আধ্যাত্মিক ভারতে রূপনগরেব ধ্যান করেছে বিচ্ছিন্ন সাধকেরা—শ্রীচৈতন্য থেকে বিবেকানন্দ গান্ধী পর্যন্ত। জনতাকে ডাক দিয়ে দিয়ে গেছে তারাও, বুকের তলায় রূপনগরের আলো জ্বালাতে চেয়েছে।

তারপর?

তারপর ইংরেজ গেছে। অশোকের ভারতচেতনার প্রেরণা আড়ম্বরের বুদবুদে মিলিয়েছে। জনতাকে কে ডাকবে? কে বলবে বেদাহম? শুধু জনতার নয়, ডাক দেবার দায়িত্ব আর নেতৃত্ব যাদেব—শত সহস্র বছরের লোভ ব্যভিচার হিংসা দ্বেষ দ্বিধা দ্বন্দ্বের আঘাতে আঘাতে তারা ভ্রষ্ট বিভ্রান্ত বিমূঢ়। রূপনগর গড়ার প্রেরণা শুধু শব্দ আর অনুষ্ঠানের আবর্তে বিকৃত হয়ে উঠেছে, হৃদয়ের অন্তঃপুরে আলো ফেলেনি। রূপনগর নয়, একের পব এক শুধু নগর পুষছে আর পুষ্ট করছে মানুষ। বিকৃত আশা আকাঙ্ক্ষার নগর, বিলাস ব্যসন ব্যভিচারের নগর, হিংসা দ্বেষ হানাহানির নগর, স্বার্থ ভয় অবিচারের নগর।

এই নগরের জঠর থেকে রূপনগব উদ্ধাব হবে কেমন করে? এই নগরেব আলো নিভেছে, বাতাস বিষিয়েছে। যা জ্বলছে সেটা লোভেব চিতা, যা বইছে তা ওই বিষাক্ত চিতাব বাতাস। তাই এই নগরে বসে রূপনগর হবে না, দূরে যেতে হবে, দূরে সবতে হবে—নগর পারে যেতে হবে।

প্রভুজী ধাম এই নগর থেকে দূরে নয় বটে, কিন্তু সিতুর স্থির বিশ্বাস, প্রভুজী ধামের হৃদয় অনেক অনেক দূরে সরানো সম্ভব হবে—যদি দু-পাঁচজনও গড়ার লোক মেলে, ডাক দেবার লোক মেলে। দশ বছর বাদে বছবে যদি পাঁচ-সাতটি করেও লোভমুক্ত বিকৃত স্বার্থমুক্ত ছেলে বেরোয় প্রভুজী ধাম থেকে তাদের শুভ শক্তিতে দূর-ভবিষ্যতে এই গোটা দেশের চেহাবা বদলে যাবে। ওই রূপনগরের আলো তখন নগরেব দিকে ধেয়ে আসবে, সেই আলোয় নগর শুচিস্নান কববে।

এই ভাবনা সিতু একদিনে বা কোন এক তপ্ত উচ্ছ্বাসের মুখে ব্যক্ত করেনি। অস্থির আবেগে মুখর হয়ে ওঠেনি। সত্তার ধীর গম্ভীব গভীবতম উৎস থেকে দিনে দিনে প্রকাশের আলোয় এসেছে। গৌরবিমলের মুখে কথা সরেনি। শমীর চোখের পলক পড়েনি...বিপুল অন্ধকার দূর করাব অটুট সঙ্কল্প নিয়ে মশাল হাতে একলা বেরিয়ে পড়েছে এক মানুষ, সেই মশালের আলোয় শুধু তাবই মুখখানা দেখা যাচ্ছে নিষ্কম্প, স্থিব। থেকে থেকে শমীর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

* * *

মুখ একদিন কালীনাথ খুলেছিলেন শুধু। পরিবেশ অনুযায়ী ঠাণ্ডা গম্ভীর মুখে গৌরবিমলকে বলেছিলেন, মণ পাঁচেক বরফের অর্ডার দাও।

সিতু রাগ করেনি, তর্ক করেনি, ঠাট্টা কানেও তোলেনি। কাগজ কলম নিয়ে একমনে প্ল্যান করেছে, ছক কেটেছে, শমী আর ছোট দাদুর সঙ্গে আলোচনা করেছে, ছুটে ছুটে প্রভুজী ধামে গেছে বীথিমাসীর সঙ্গে পরামর্শ করতে। সিতুর চোখে বীথিমাসী

দিনে দিনে প্রায় মায়ের মতই সুন্দর হয়ে উঠছে যেন। ওদিকে যাদের নিয়ে জেগে উঠবে আবার প্রভুজী ধাম, তাদেরও খোঁজ চলেছে। কাদের চাই, কাগজে-কাগজে তার পুরো বিবরণ বেরিয়েছে। গোছা গোছা চিঠি আসা শুরু হয়েছে, ব্যক্তিগত আবেদন-নিবেদনও কামাই নাই। এ ছাড়া সরকারী বেসরকারী আশ্রয়-কেন্দ্রগুলোতেও ঘোরাঘুরি করছে সিতু, কার মুখে প্রতিশ্রুতির স্ফুলিঙ্গ চাপা পড়ে আছে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে। যাদের চাই তার, তাদের অভাব এদেশে অন্তত হবে না তাও বুঝে নিয়েছে।

সেদিন শমী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তুমি এসব যে করছ, জেঠুর মত নিয়েছ?

সিতু লিখছিল কি, ঈষৎ বিস্ময়ে মুখ তুলল।—জেঠুর মত নেব কেন?

একটু চুপ করে থেকে শমী বলল, তুমি আবার প্রভুজী ধাম নিয়ে মেতে উঠেছ সেটা জেঠুর পছন্দ নয়, এজন্যে সেদিন আমাকেই বকছিল।...আর বাধা না দিয়ে সায় দিচ্ছে বলে ছোট দাদুর ওপরেও বিরক্ত। এখন যা খবচপত্র হচ্ছে সে-সব বোধ হয় ছোট দাদুর পকেট থেকেই যাচ্ছে, এই ব্যাপাবে এক পয়সাও দেবে না জেঠু তাকে জানিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না...।

সিতু হতভম্ব খানিক।—জেঠু টাকা দিচ্ছে না বা দেবে না তোমাকে কে বলল?

আমার সামনেই জেঠু ছোট দাদুকে বলছিল।

এ প্রসঙ্গে শমীকে সিতু আর কিছু বলল না। কলম তুলে চুপচাপ আবাব লেখায় মন দিল। হরিদ্বারে প্রেমভাইকে চিঠি লিখছে। প্রভুজী ধামের কাজে হরিদ্বার ছেড়ে আসা সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসা। একটু অপেক্ষা করে শমী চলে গেল। খববটা যাকে দেওয়া হল তার চোখে-মুখে এতটুকু উদ্বেগের ছায়া দেখল না।

শমী প্রমাদ গুণল সেই সন্ধ্যায়। সিতুকে জেঠুর ঘরের দিকে যেতে দেখে পায়ে পায়ে সেও দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। জেঠু দেখলেও সঙ্কোচের কারণ নেই, তবু ভিতরে ঢুকতে পারল না।

ঘরে ঢুকে সিতু জেঠুর খাটে তার কাছ ঘেঁষে মুখোমুখি বসল। বলল, মায়ের প্রভুজী ধাম আবার নতুন করে শুরু হবে জানো তো?

কালীনাথ হাল্কা জবাব দিলেন, তোড়াজোড় দেখছি তো। দরজার দিকে চোখ ফিরিয়ে গলা চড়ালেন, এই মেয়ে, আড়ালে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভিতরে আয়।

ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে শমী ঘরে এসে দাঁড়াল। ভিতরে অস্বস্তি।

সিতু জিজ্ঞাসা করল বাবা তার টাকা আর বিষয়সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করেছেন?

আমাকে ট্রাস্টি করে সব রক্ষা করার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে।

কার জন্যে রক্ষা করতে বলেছেন?

তোর জন্যে।

সব মিলিয়ে কত টাকা হতে পারে?

কালীনাথ ভাবলেন একটু।—নগদ সত্তর-পঁচাত্তর লক্ষ হবে আর বাড়ি ঘর জমিজমার দাম ধরলে আরো লাখ চল্লিশেক হতে পারে।

দুই-এক মুহূর্ত ভেবে সিতু শান্ত মুখে বলল, সব প্রভুজী ধামের নামে ট্রান্সফার করার ব্যবস্থা করো।

মনে মনে কালীনাথও প্রস্তুত ছিলেন। আরো ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন, আমার তাতে আপত্তি আছে।...শমী, ওই চেয়ারটা টেনে বোস্ না।

শমী কাঠ, নড়তেও পারল না।

সিতু জেঠুর দিকে চেয়ে আছে। একটা অসংযত রেখাও পড়েনি মুখে, ঠোঁটের কোণে বরং হাসির আভাসের মত একটু।—তুমি আপত্তি করার কে?

লেখাপড়া অনুযায়ী ভালো-মন্দ বিবেচনা করে সম্পত্তি রক্ষার সমস্ত দায়িত্ব আমার—তুই সুস্থ চিত্তে ঘরে ফিরলে আর সম্পত্তি নষ্ট হবে না বুঝলে তোর হাতে তুলে দেবার কথা।

আমি সুস্থ চিত্তে ফিরিনি বা সম্পত্তি নষ্ট হবে মনে হচ্ছে তোমার?

হ্যাঁ।

কালীনাথ গম্ভীর। সিতু নিষ্পলক চেয়ে আছে তাঁর দিকে। অনুচ্চ স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, তা হলে?

বিয়ে-থা হয়ে যাক, চাল-চলন দেখি। ভালো বুঝলে দিয়ে দেব।

আর তারপরেও যা করতে যাচ্ছি তাই যদি করি?

তখন আর আমার কিছু কর্তব্য থাকবে না। এখনো যদি কথা দিস—পাগলামি না করে ঠাণ্ডা হয়ে বসবি, বিশ্বাস করে সব তুলে দিতে রাজী আছি।

প্রভুজী ধামে সব দিয়ে দিলে পাগলামি করা হবে?

হ্যাঁ।

এতেও সংযমে চিড় খেল না বটে, কিন্তু সিতুর গলার স্বর বদলালো একটু। বলল, তোমার বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ।..বিশ্বাস ভঙ্গ না করেই সব পাবার ইচ্ছে। তাই পেতে হলে এখন বোধ হয় বাবাকে বলতে হবে?

ট্রাস্টি হয়ে যাবার পর তার আর কিছু বলার অধিকার নেই। তার ওপর কথা বলা ছেড়ে হাতের আঙুলও নাড়তে পারে না যখন।...তবে বললে আর একটা স্ট্রোক হয়ে সব শেষ হয়ে যেতে পারে অবশ্য।

তাহলে তাঁকেও কিছু না বলা ভালো বলছ?

তোর টাকা পাওয়ার ব্যাপারে তাকে কিছু বলা না বলা সমান, তাই বলছি।

জেঠুর মুখের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরেনি সিতুর। বলল, বাবাকে এর মধ্যে টেনে কাজ নেই তা হলে, তুমিও বোলো না...টাকা পেতে হলে আর কি করা যেতে পারে?

একটু ভেবে কালীনাথ পরামর্শ দেবার সুরে বললেন, আমার ট্রাস্টিশিপ নাকচ করার জন্যে কোর্টে একটা কেস্ করে দেখতে পারিস।

শমীর ব্যাকুল মুখ, কাকে থামাতে চেষ্টা করবে জানে না। জেঠুর সমস্ত মুখ ঘোরালো কঠিন আর ওদিকের স্থির দুটো চোখ যেন ঝকঝক করছে।

সিতু খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে, দৃষ্টিটা জেঠুর মুখের ওপর আটকে আছে তেমনি। ধীর প্রত্যয়ে বলে গেল, শোনো, বাবার প্রতিটি কপর্দক প্রভুজী ধামে যাবে।...মা যেদিন প্রভুজী ধামের দরজা খুলেছিল সেই তারিখের আর পাঁচ মাস সতের দিন বাকি। সেইদিন সেই তারিখে সেই সময়ে আবার প্রভুজী ধামের দরজা খোলা হবে জেনে রাখো...এর নড়চড় হবে না।

ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কয়েক মুহূর্তের জন্য জেঠুর অস্থির মুখ দেখল শমী। অস্থির, কঠিন। উঠে পায়চারি

করছে ঘরের মধ্যে, ও আছে এও খেয়াল নেই বোধ হয়। শমীর ভয় ধরেছে। চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠল, এ আবার তোমরা কোন্ রাস্তায় যাচ্ছ জেঠু?

কালীনাথ দাঁড়িয়ে গেলেন। কাছে এলেন। তুই কি করতে বলিস?

করবেই যখন যা চাইছে দিয়ে দাও, গণ্ডগোল করে লাভ কি?

থাম্! যা কখনো করেন না তাই করলেন কালীনাথ, চাপা গর্জনই করে উঠলেন। তারপর কঠিন স্বরে বলেন, বুদ্ধি থাকে তো আমাকে না বলে ওকে বোঝাওগে যাও।

ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনিও। শমী কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। বুঝতে কোথায় যেন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে তার।...হাসপাতালে মাসীকে জেঠু কি যেন কথা দিয়েছিল মনে পড়ছে। কথা দিয়েছিল, ওই একজনকে ঘরে ফেরাবে, শমীর জীবন শূন্য না হয়ে যাতে দম বন্ধ হবার মত ভরাট হয় সেই চেষ্টাই করবে।...তাহলে এরকম করছে কেন জেঠু? শমী টাকা চায় না পয়সা চায়?

এরকম মনে হওয়ার পরেও জেঠুকে বোঝার গণ্ডগোল থেকেই গেল যেন।

দিনকয়েকের মধ্যে কালীনাথ কোর্টের শমন পেলেন। সিতু তার সম্পত্তির মালিকানা দাবি করেছে। নোটিশটা হাতে করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সামনে শমীকে দেখে হাসিমুখে বললেন, সিতু কোর্টে কেস ঠুকে দিয়েছে, আমার হাত থেকে সব আদায় না করে ছাড়বে না।

সিতুর ঘরে এলেন, ঠোটের কোণ থেকে তখনো হাসির আভাস মেলায়নি। পাংশু মুখে তাঁর পিছনে শমীও এসে দাঁড়িয়েছে।

কালীনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কেস করাই ঠিক করলি তাহলে?

তাঁর দিকে চেয়ে সিতু তেমনি হালকা জবাব দিল, হ্যাঁ, ও ছাড়া আর রাস্তা নেই তুমিই তো বললে।

কালীনাথ আবার রসিয়ে মন্তব্য করলেন, কিন্তু এও তো দূরের রাস্তা—

ঠিক বোধগম্য হল না। সিতু জিজ্ঞাসা করল, এতেও সুবিধে হবে না বলছ?

হবে, তোর কেস তো জোরালো। তিন-চার বছর সময় লাগতে পারে, পাঁচ মাস কদিনের মধ্যে প্রভুজী ধামের দরজা খোলা হবে বলছিলি না...তারও তো আবার কটা দিন চলে গেল।

জবাবে সিতু চেয়ে রইল একটু, তারপর নিরুত্তাপ সুরে বলল, যেদিন বলেছি দরজা সেই দিনই খোলা হবে।...ততদিনে তোমার শকুনির কর্তব্যবোধ চলেও যেতে পারে।

এইবার অবাক হবার পালা শুধু শমীর। উক্তির তাৎপর্য বুঝল না, প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট। জেঠুর ঠোটের হাসি গেছে, সহজতা গেছে। সবিস্ময়ে তাঁকে চেয়ে থাকতে দেখেছে খানিক। তারপর ঘর ছেড়ে চলে যেতে দেখেছে।

শমী উদ্‌গ্রীব, জেঠুকে ও আবার কি বলে বসলে?

সিতু হাসছে অল্প অল্প। বলল, তুমি বুঝবে না, ঘাবড়াবার মতো কিছু নয়।

দিনকে-দিন শমীর ভয় তবু বেড়েই চলেছে। শুধু ভয় নয় অজ্ঞাত অস্থিরতাও।

একে একে কটা মাস কেটে গেল। এক জেঠু বদলেছে বলেই বাড়ির বাতাস বদলে গেছে। প্রত্যেক দিনের থেকে, প্রত্যেক দিন বেশি গম্ভীর মনে হয় জেঠুকে।

বাড়ির অথর্ব মালিকের ঘরে শুধু নিয়মিত ঢুকতে দেখে তাকে। আর কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই তেমন তেমন। মাসে দুই-একদিন কেস-এর তারিখ পড়লে বাদী-প্রতিবাদী দুজনকে একসঙ্গে একই গাড়িতে কোর্টে যেতে দেখে। ফেরেও একসঙ্গে। শমী হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখে দুজনকেই। অস্বস্তিতে মন ছেয়ে যায়।

ওদিকে প্রভুজী ধামের বিস্তৃত আয়োজন থেমে নেই। টাকার অনিশ্চয়তার দরুন প্রাথমিক অনুষ্ঠানের কোথাও এতটুকু রদবদল হয়নি। ইদানীং এই জন্যেই ছোট দাদুকে বেশ উতলা দেখছে শমী। তাঁকেই বলেছে, কি হবে ছোট দাদু, শেষে বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার হবে না তো কিছু?

গৌরবিমল ওকে আশ্বাস দিয়েছেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়াবে ব্যাপারটা নিজেই ভেবে পাচ্ছেন না। সিতুকে বাধা দিচ্ছেন না বলে কালীনাথ তাঁর ওপরেই বেশি অসন্তুষ্ট। কিছুদিন আগেও গৌরবিমল তাঁকে ডেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, বলেছিলেন, জ্যোতির প্রভুজী ধাম করার সময় শিবুর থেকে তুই-ই তো টাকা আদায় করে দিয়েছিলি, এখন একেবারে বেঁকে বসলি কেন?

ঝাঁঝালো শ্লেষে কালীনাথ জবাব দিয়েছেন, তখন আদায়ের প্রশ্ন ছিল, এখন দেবার —লক্ষ লক্ষ টাকা আর সম্পত্তির লোভ এত সহজে ছাড়া যায়? তোমার মতো সাধুপুরুষ তো নই।

অস্বস্তি গোপন করে গৌরবিমল হেসেই বলেছিলেন, এক পয়সাও দিবি না শুনে বিগড়ে গিয়ে সব চেয়ে বসেছে, যা আছে তার মধ্যে কত আর লাগত। একটা ফয়সালা করে কাজটা শুরু হতে দে না, এতটা এগিয়ে গেছে—

আরো চাপা তপ্ত অসহিষ্ণুতায় কালীনাথ বলে উঠেছে, এগিয়ে যেতে দিলে কেন? বার বার তোমাকে নিষেধ করিনি?

গৌরবিমল আর কিছু বলেননি। কালীনাথের এই মেজাজ দেখে অবাক তিনি। নিষেধ করা হয়েছিল মনে আছে। কিন্তু আনন্দবাবার সায় পেয়েই হাল ধরতে এগিয়েছেন তিনি। সমস্যার কথা তাঁকে লেখা হয়েছিল, তিনি জবাব দিয়েছেন, সব ওপর অলার ইচ্ছে, উল্টোদিকে সাঁতার না কেটে তার ইচ্ছের স্রোতে বরং গা ভাসাও। আনন্দবাবার এই নির্দেশ কালীনাথকে জানিয়েছিলেন, আর তার ফলে শুধু মামুর ওপর নয়, বাবাটির ওপরেও বিলক্ষণ চটতে দেখা গেছে তাকে।

শমী কলেজের চাকরি ছাড়ার নোটিস দিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো ছাড়া পায়নি। সেশনের শেষ ভাগে ছেড়ে এলে মেয়েদের অসুবিধে। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে কটা মাস কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রভুজী ধামের আসন্ন অনুষ্ঠানের দিন তিনেক আগে ও ছাড়া পাবে। সিতু তাতে আপত্তি না করে বরং সায় দিয়েছে।

সেই অনুষ্ঠানের আর দিন কুড়ি বাকি। এর মধ্যে সিতু দুদিনের জন্য একবার হরিদ্বারে এলো। শমীকে বললে, আনন্দবাবাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। শমীরও সঙ্গে আসার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একাই যাওয়ার বাসনা দেখে জোর করল না। দুটো দিন আনন্দবাবা যেন বুকে করে রাখলেন সিতুকে। তাঁর হাসিখুশি আনন্দ ধরে না। ঢালা ফতোয়া দিলেন, তোর যাকে খুশি, যত জনকে খুশি নিয়ে যা এখান থেকে, তোর কাজ হয় তো গোটা আখড়াটাকেই তুলে নিয়ে যেতে পারিস।

সিতুর এই মতলবেই আসা। প্রেমভাই ছাড়া আখড়ার আরো জনা পাঁচেককে সঙ্গে

নিয়ে কলকাতায় ফিরল। আনন্দবাবাও দুই-একদিনের জন্য এসে সব দেখে শুনে যেতে চেষ্টা করবেন কথা দিয়েছেন। পথে প্রেমভাই সিতুকে জানালো, গত রাতে আনন্দবাবাকে যত গম্ভীর দেখা গেছে তেমন আর কখনো দেখেনি। শুধু গম্ভীর নয়, বিমর্ষও মনে হয়েছে তার।

সিতু অবাক।—সে কি! আমি তো সারাক্ষণ খুব খুশি দেখলাম!

প্রেমভাই জানিয়েছে, মাঝরাত্রি থেকে একেবারে অন্য রকম দেখা গেছে তাঁকে।

সিতু প্রথমে ভেবে পায়নি কি হতে পারে। প্রেমভাই ভুল করার মানুষ নয়। পরে মনে হয়েছে, জেঠু যা করছে সেই কারণেই উতলা হয়েছেন তিনি। এই একজনের দুশ্চিন্তার ফলেই সিতু জেঠুর ওপর দ্বিগুণ বিরূপ।

মায়ের মৃত্যুর একটা বছর পার হয়ে গেল। পয়ষট্টির শেষে চোখ বুজেছিল, এটা ছেষট্টির শেষ। শমীর সেদিন মন খারাপ। কেঁদেছে। মাসীর ছবিতে মালা পরিয়েছে। সিতু হেসে বলছে, আমি তো প্রভুজী ধামের কথা ভাবলেই মা-কে দেখতে পাই।

অনুষ্ঠানের তোড়জোড় একটুও শিথিল হয়নি। কোথা থেকে এত জোর পাচ্ছে সিতু জানে না। প্রভুজী ধামে সাড়া জাগছে। বাছাই করা গুটি পঁচিশেক কাঁচা বয়সের ছেলে এসে গেছে—একদিন রূপনগরের মশাল হাতে নিয়ে বেরুবে যারা। আরো আসছে, আরো আসবে। হরিদ্বারের কর্মী যারা এসেছে তারা ব্যস্ত, গৌরবিমল ব্যস্ত, বীথির নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। সিতু সমস্ত দিন এখানে কাটিয়ে রাতে বাড়ি ফেরে। ফাঁক পেলে শমীও আসে, বীথিমাসীকে সাহায্য করে। কিন্তু এখনো জেঠুকে অটল অনড় দেখে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

তারিখ এগিয়ে আসছে। আর আট দিন মাত্র বাকি। সকালে সত্যিই আনন্দবাবা এসে হাজির। একাই বেরিয়ে পড়েছেন। দিন তিনেক কলকাতায় থেকে আবার কোথায় যাবেন। প্রভুজী ধামে উঠেছেন। তাঁর আসাটা অপ্রত্যাশিত আশাবাদের মত ভাবছে সিতু। দিনতিনেকের বেশি থাকবে না শুনে রেগেই গেল।...কষ্ট করে আসতে পারলে আর বাকি কটা দিন থেকে যেতে পারবে না।

শমীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আনন্দবাবা হাসিমুখে জবাব দিলেন, তুই এবার হরিদ্বারে গিয়ে মাত্র দুদিন ছিলি, আমি তো তবু একদিন বেশি থাকব।

সিতুও তেমনি হেসে ভয় দেখালো, আগে যেতে চেয়ে দেখো, পা খোঁড়া করে দেব।

হা-হা শব্দে হেসে উঠে আনন্দবাবা গৌরবিমলের দিকে ফিরলেন, দেখলি? একেই বলে প্রাণঘাতী ভক্তি। সিতুকে বললেন, পা খোঁড়া করতে খুব বাকি রেখেছিস নাকি?

রাতে গাড়ি নিয়ে শমী একাই ফিরেছে। জ্যোতিরাণীর গাড়িটা এখন ওর দখলে। অন্য দুজন ওখানেই থেকে গেছে। সিতু সকালে বাড়ি এলো। বীথিমাসীর হাতে কিছু টাকা দিতে হবে। বীথিমাসীর হাত খালি, ছোট দাদু আনন্দবাবাকে নিয়ে ব্যস্ত, তাকে বলার ফুরসত মেলেনি, তাই সিতুকে বলেছে।

জেঠু যে পাসবইটা তার হাতে তুলে দিয়েছিল, তাতে বিশ-বাইশ হাজার টাকা আছে এখনো। তার থেকেই তুলবে ঠিক করেছিল। আগামী অনুষ্ঠানের খরচও তার থেকেই চলে যাবে। সমস্যা তার পরে। কিন্তু তা নিয়ে সিতু আগেও মাথা ঘামায়নি,

এখনো মাথা ঘামাতে রাজী নয়। সঙ্কল্পে বাদ সাধতে পারে এত শক্তি কারো আছে ভাবে না। তবু বাড়ি ফেরার পর কি খেয়াল মাথায় চাপল তার। জেঠু বাবার ঘরে, সেও ঢুকল। নার্স তখন বাইরের বারান্দায় বসে। বাবা নড়তে পারে না বা কথা বলতে পারে না জেনেও তাকেই জিজ্ঞাসা করল, সিন্দুকের চাবিটা কোথায়?

নির্বাক শিবেশ্বরের চোখে বিস্ময়। তার পরে ব্যস্ততার আভাস। দৃষ্টিটা কালীনাথের দিকে ঘুরল, ব্যগ্র মুখে তাঁকে কিছু যেন বোঝাতে চাইলেন তিনি। ঠাণ্ডা মুখে কালীনাথ সামনের দেরাজ থেকে চাবি বার করে সিতুর হাতে দিলেন।

সিন্দুকে আগের মতই নোটের পাঁজা সাজানো। একশ টাকার একটা বাণ্ডিল তুলে নিয়ে সিতু সিন্দুক বন্ধ করল। চাবিটা জেঠুর হাতে ফেরত দিয়ে বাবার দিকে ফিরল। তখনো তার বিস্মিত চাউনি দেখে খুব সহজ সুরেই বলল, সিন্দুকে আছে ভেবেই আর ব্যাঙ্কে দৌড়লাম না...ঘরে এত কাঁচা টাকা রাখা ঠিক নয়। হেসে নোটের তাড়াটা দেখালো। অবশ্য আমিই হয়ত হালকা করে দিতে পারব, আপাতত এই নিলাম।

নিল বলেই শিবেশ্বর কৃতজ্ঞ যেন। টাকা জেঠুর কাছ থেকে না নিয়ে এখান থেকে নেওয়া হল কেন সে প্রশ্নও মনে এলো না। ছেলের এই সহজ কথার সুরটুকু যেন চোখ দিয়ে আর দু কান দিয়ে আস্বাদন করলেন তিনি। সিতু আবার বলল, আর ঠিক সাত দিন বাদে ঘটা করে আবার মায়ের প্রভুজী ধামের দরজা খোলা হবে, জানো তো?

জানেন কি জানেন না বোঝা গেল না। ছেলের দিকে চেয়ে আছেন। দেখছেন। ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করছেন।

সিতু বেরিয়ে এলো। যেখান থেকে এসেছে, এক্ষুনি আবার সেইখানেই ছুটতে হবে। শমীকে বলতে হবে তার অপেক্ষায় না থেকে কলেজ ফেরত ওখানে চলে যায় যেন। শমীর দেখা পেল না, বোধ হয় চানে গেছে। অপেক্ষা কবার ফুরসত নেই, মেঘনাকেই বলে যাবে ভাবল।

সামনে কালীনাথ। ঠাণ্ডা নিস্পৃহ চোখে দেখলেন একটু।—বেরুচ্ছিস?

হ্যাঁ।

কালীনাথ বললেন, আজ কেস-এর তারিখ ছিল। সাড়ে নটা বাজে—

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময়। সিতু জবাব দিল, আচ্ছা।

নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। খানিক বাদে একসঙ্গে বেরুলো দুজনে। যেমন যায়। কোর্টের কাজ শেস হতে বিকেল। কালীনাথ গাড়ির সামনে অপেক্ষা করছেন। সিতু এসে বলল, তুমি গাড়ি নিয়ে যেতে পারো. আমি অন্য দিকে যাব।

একটু থেমে কালীনাথ বললেন, আমি এখন তোদের প্রভুজী ধামে যাচ্ছি। তুই কোন্ দিকে যাবি?

...প্রভুজী ধামে কেন?

ফোনে মামু বলছিল, তোদের আনন্দবাবা আমাকে একবার দেখতে চাইছেন খুব, একবার দেখা দিয়ে আসি।

দ্বিতীয় কথা না বলে সিতু গাড়িতে উঠে বসল।

পাশাপাশি বসে দুজনে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করল। আর একটিও কথা হল না। প্রভুজী ধামে পৌঁছে সিতু অদূরের বড় ঘরটা দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ বাবা ওই

ঘরে। সে বীথিমাসীর খোঁজে চলে গেল।

আনন্দবাবার কাছে গৌরবিমল বসেছিলেন আর শমী বসেছিল। দরজার সামনে জেঠুকে দেখে শমী চমকেই উঠেছিল। সকৌতুকে আনন্দবাবাও তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন একটু। তারপর হাসিমুখে ডাকলেন, এসো কালীনাথ এসো, তোমার অপেক্ষাতেই বসেছিলাম, সিতু কোথায়?

কালীনাথ মৃদু গম্ভীর জবাব দিলেন, ওদিকে গেল—

হাসিমুখে আনন্দবাবা বললেন, বোসো। শমীর দিকে ফিরলেন, যা কাজকর্ম দেখ্‌গে, সেই থেকে তো কেবল আড্ডাই দিচ্ছিস—আমি নতুন মানুষের সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করি।

দুরু-দুরু বক্ষে শমী উঠে গেল। তার কি যেন আশা, আবার ভয়ও। এই আশা-আশঙ্কার মধ্যেই ঘণ্টাখানেক কাটল। কোনদিকে মন দিতে পারেনি, ঘুরে ফিরে এই দরজার দিকেই চোখ রেখেছে।

এক ঘণ্টা বাদে জেঠুকে আর তার পিছনে ছোট দাদুকে বেরুতে দেখে আশার থেকেও এবারে শঙ্কা বেশি। জেঠুর মুখ ভয়ানক গম্ভীর। তারা গাড়িতে উঠে চলে যেতে পায়ে পায়ে শমী আনন্দবাবার ঘরের দিকে না এসে পারল না।

তেমনি হৃষ্টমুখে আনন্দবাবা ডাকলেন, আয়, ঘরে কেউ নেই, এই ফাঁকে তোর সঙ্গেও একটু জমিয়ে নিই।

লজ্জা পেলেও শমী তাঁর কাছ ঘেঁষে বসল। ঝুঁকে আনন্দবাবা ওকে ভালো করে দেখলেন একটু। তাঁর হাসিমাখা চোখের দিকে চেয়ে শমীর হঠাৎ একবার মনে হল, ওই হাসির নীচে বিষণ্ণ ছায়ার মত কি যেন দেখল একটু। তারপরেই ভাবল, ভুল দেখছে, শুধুই হাসছেন।

আনন্দবাবা গলা খাটো করে জিজ্ঞাসা করলেন, তোদের ওই জেঠু এভাবে বাদ সাধছে কেন তুই জানিস?

শমী আস্তে মাথা নাড়ল, জানে।

আনন্দবাবার দৃষ্টি তার মুখের ওপর স্থির একটু।—তোর ভয় করছে?

শমী থমকালো একটু, তারপর তেমনি করেই মাথা নাড়ল আবার। ভয় করছে না।

আনন্দবাবার চোখে হাসি ঝরল, কথায়ও। ওর পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন তুই একটা মেয়ের মত মেয়ে রে বেটা।

সন্ধ্যার পর সকলের সামনেই আনন্দবাবা বললেন, কাল রাতের গাড়িতে তো যেতে হবে, তার আগে সন্ধ্যায় একটু ক্রিয়াকলাপ সেরে যাব। সিতুকে নির্দেশ দিলেন, তুই আবার দিনের বেলায় ভাত-টাত গিলে বসে থাকিস না। শমীর দিকে ফিরলেন, তুইও না।

পরিবেশ-গুণে ব্যক্তিগত আনন্দের দিকটা এত দূরে সরেছে যে কেউ আর এ উক্তি নিয়ে মাথা ঘামালো না। এই রাতেও গাড়ি নিয়ে শমী একাই বাড়ি ফিরেছে। গাড়িতে বসে ভাবছে, বিকেলে আনন্দবাবাকে সত্যি কথা বলেনি। চারদিকের এত আনন্দের মধ্যে কেন যেন তার ভয়-ভয়ই করছে।

সকাল।

ঘুম ভাঙার পর থেকে এই দিনটা সিতুর অন্যরকম লাগছে কেন জানে না।

সিতু দরজার সামনে এসে চারদিকে দেখেছে চেয়ে চেয়ে। প্রভুজী ধামে জাগার সাড়া পড়েনি তখনো। সকালটা যেন এইমাত্র শুচিস্নান করে উঠল। আঙিনার ঘাসে ঘাসে শিশির-জলের স্নানব্রত চলছে এখনো। বাগানের আধ-ভেজা টাটকা জুঁইগুলোকে কচি কচি ছেলেমেয়ের নিষ্পাপ হাসিমুখের মত দেখতে লাগছে।

সিতুর মনের তলায় অদ্ভুত একটা পরিপূর্ণতার স্বাদ। এই স্বাদ নিয়ে ভরা উদ্যমে সে দিনের কাজ শুরু করল। অন্য সকলেও ব্যস্ত, উদ্দীপনায় ভরপুর।

ছোট ছেলেদের জড়ো করে তাদের চোখের সামনে সোৎসাহে তখন এক মজার দিনের ছবি তুলে ধরছিল। হঠাৎ সচকিত একটু। কান খাড়া করে এদিক-ওদিক তাকালো। মনে হল কেউ যেন ডাকল তাকে। কাছ থেকে না দূর থেকে ঠিক ঠাওর করতে পারল না। আশ্চর্য মিষ্টি ডাক। আনন্দবাবা কিনা দেখার জন্য বাইরে এলো। কেউ নেই। সত্যি শুনল কিনা বুঝে উঠল না, অথচ সেই ডাকার রেশ সমস্ত দিন ভিতরে লেগে থাকল আর আনন্দ ছড়ালো।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দবাবার কাণ্ড দেখে অবাক যেমন খুশিও তেমনি। পাওয়ার দিন বটে একটা আজ। দুটো আসন পেতে শমী আর ওকে মুখোমুখি বসিয়ে সকলের আনন্দের হাটের মধ্যে দুজনের হাতে হাত মিলিয়ে দিলেন আনন্দবাবা। মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেন। শমীর কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন। একসঙ্গে অনেক শাঁখ বেজে উঠল।

শমী আনন্দে কাঁপছে। এত লোকের মধ্যেও সিতু চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। চোখ ফেরাতে পারছে না এমন সুন্দর লাগছে তাকে।

এর খানিক বাদে আনন্দবাবা বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। দুজনে শেষবার তাঁকে প্রণাম করে উঠতে তিনি সিতুকে বললেন, তোকে আর স্টেশনে আসতে হবে না, এরাই পৌঁছে দেবে'খন—শমীকে নিয়ে তুই বাড়ি যা, বাবাকে প্রণাম কর।

এই আনন্দের দিনে ড্রাইভার খুশিমুখে বাড়ির দিকে গাড়ি ছুটিয়েছে। পিছনে শমী আর সিতু বসে। সিতুর বাঁ হাতে শমীর ডান হাতখানা ধরা। এ কি খুশির জোয়ারে ভাসছে সিতু জানে না। মুখে কথা নেই. এই পাওয়ার তলায় তলায় সকালের সেই আশ্চর্য ডাকের রেশও রিনরিন করছে যেন। শমীর মনের ডাকই সে কল্পনায় শুনেছিল কিনা কে জানে।

কথা শমীও বলছে না। নীরবতায় ভরাট করে রাখার মতই এ বিহ্বলতা। এমন আনন্দের বরাত এ যেন বিশ্বাস হয় না। তাই অগোচরের ভয়ও একটু। ভয় তাড়িয়ে মনে মনে নিজেই আবার হাসছে।

বাড়ি। দুজনকে দেখে মেঘনা প্রথমে হকচকিয়ে গেল একটু। তারপরেই ব্যাপার বুঝে আনন্দে চেঁচামেচি করে উঠল। ভোলা আর শামুও খুশিতে আটখানা।

বাবার ঘরে জেঠু বসে। শমীর পিঠে হাত দিয়ে তাকে নিয়ে সিতু হাসিমুখে ভিতরে ঢুকল। শিবেশ্বরের দু চোখ বিস্ফারিত হঠাৎ। শমীর মাথায় ঘোমটা কপালে সিঁথিতে সিঁদুর। দুজনে তাকে প্রণাম করে উঠতে চেতনা ফিরল যেন। উদ্বেলিত মুখখানা আনন্দে স্তব্ধ।

বাবার পরে জেঠুকে প্রণাম করল দুজনে। শমীর মনে হল অনেক দিন পরে

জেঠুর গম্ভীর মুখে চাপা হাসির রেশ দেখল একটু।

বাবার দিকে ফিরে সিতু বলল, আনন্দবাবা নিজে বসে বিয়ে দিয়ে তবে রওনা হয়ে গেলেন।

শিবেশ্বরের নির্বাক্ দুই চোখে হাসি ঝরছে, আশীর্বাদ ঝরছে, আর সেই সঙ্গে একটা আনন্দের কান্নাও বুঝি উথলে উঠতে চাইছে।

ঘরে এসে দুজনে মায়ের ছবিতে প্রণাম করে এদিক ফিরতে দেখে দরজার কাছে জেঠু দাঁড়িয়ে। সিতু ডাকল, এসো—

কালীনাথ এগিয়ে এলেন একটু। খুব সাদাসিধে ভাবে বললেন, কোর্ট থেকে আজ কেস তুলে নেওয়া হয়েছে।...টাকা আর বিষয়-আশয় সব কবে বুঝে নিবি?

জবাব দিতে সময় লাগল। জেঠুর মুখখানা শমী নতুন করে দেখছে আবার। আনন্দে কিনা জানে না, বুকের ভিতরটা ধড়াস ধড়াস করছে তার।

সিতু হাসছে। বলল, তাড়া নেই, সময় হলেই জানাব।

কালীনাথ চলে গেলেন।

রাত্রি।

ইচ্ছেমত কিছু মেয়েলি অনুষ্ঠান পালন করে দুজনকে একসঙ্গে বসিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে মেঘনা খানিক আগে তাদের অব্যাহতি দিয়েছে।

বিছানায় আধশোয়া হয়ে সিতু জেঠুর কথা ভাবছিল। হঠাৎ এই পরিবর্তন আশা করেনি। জেঠুর সঙ্গে আনন্দবাবার গত কাল কি কথা হয়েছে জানে না। সিতু হাসছে আপন মনে। আবারও মনে হচ্ছে, সকাল থেকেই আজ পাওয়ার উৎসব লেগেছে। সেই আনন্দের মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে সে।

শমী লক্ষ্য করছে। এই তন্ময়তা দুচোখ ভরে দেখার মত। দেখছে। এত সুন্দর বলেই কি যেন ভয়। সেই অগোচরের ভয়।...তন্ময়তার এই সৌন্দর্য কাছের নয়।

কাছের নয় মনে হতে ভিতরটা সজাগ হয়ে উঠল শমীর। নিঃশব্দে দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে এসে পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল আবার। তারপরে কাঁধে বেশ জোরেই একটা ধাক্কা, সঙ্গে ছদ্ম অনুশাসন-ভ্রূকুটি।—এই।

তন্ময়তায় ছেদ পড়ল, সিতু অপ্রস্তুত।—কি হল?

কোথায় ঘুরছিলে, হিমালয়ে না প্রভুজী ধামে?

সিতু হাসতে লাগল। পাওয়ার এক সুরে বিভোর হয়েছিল, এ আর এক সুর। —তোমার কোন্‌টা পছন্দ?

একটাও না।

প্রভুজী ধামও না?

শমী অনায়াসে কথা ঘোরালো।—সেটা পছন্দ না হয়ে আর উপায় কি, আমার প্রভুজী ধাম মানে তো তুমি।

সিতুর ভালো লাগছে, মজা লাগছে।—এই যে বললে একটাও পছন্দ না?

ঠিক বলেছি। তুমি নিজের মধ্যে ঘুরবে সেটা পছন্দ না।

বুঝলাম। তুমি কোথায় ঘুরতে বলো?

শমী গা ঘেঁষে বসল। তার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের বুকে ঠেকালো।

—আপাতত এইখানে।

...জীবনের এই বুঝি এক পরম লগ্ন, পরম ক্ষণ। ওর চোখে আমন্ত্রণ ছিল। বুকের তলায় আকুতি ছিল। সেই আমন্ত্রণ আর আকুতি দিয়ে অনেক দূরের এক দুর্লভ সুন্দরকে কাছে টানতে পেরেছে। খুব কাছে। নিজে হারিয়ে যাবার মত কাছে। অধরস্পর্শে, বাহুবন্ধনে সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠছে। ন বছর বয়েস থেকে বি. এ. পাস করা পর্যন্ত এই দেহের ওপর এই মানুষই কতবার হামলা করতে চেয়েছে। শমী তখন ত্রাসে কেঁপেছে। আজও কাঁপছে! আনন্দে কাঁপছে, এই নিবিড় বন্ধন শিথিল হওয়ার শঙ্কা মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল বলেও কাঁপছে।

চোখের ওপর আলোটা ফটফট করে জ্বলছে। কুমারী তনু বিমুখ ওটার প্রতি। তবু ওটা দূর করাব ইশারা অব্যক্ত থাকল। অন্ধকারের পরদা টেনে চোখের আগলটুকুও ঘোচাতে চায় না। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভবের তৃষ্ণা, আগলে রাখার ব্যাকুলতা। এই অতনুবন্ধনে ও নিঃশেষে হারিয়ে যেতে চায়, নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। ...হারিয়ে গেছে। বিলীন হতে পেরেছে। দেহের অণুতে অণুতে অনাগত সৃষ্টির শিহরণ লেগেছে, অস্তিত্বের প্রতি কণায় ছড়িয়ে ছড়িযে শেষে ান্ত বিলয়ে তটে এসে পৌঁছেছে।

রাত্রি তখন গভীর।

সিতু চমকে উঠল। কে ডাকল? সেই সকালের মত। আরো স্পষ্ট। ও ঘুমিয়েছিল কি তন্দ্রাবেশে এক ভরা প্রাপ্তির স্রোতে ভেসে চলেছিল জানে না। এই ডাক যেন চেতনার কোন্ অন্তঃপুরের এক বন্ধ দরজাব কড়া নেড়ে দিয়ে গেল।

আশ্চর্য...কে ডাকল?

শমী তার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে। নড়াচড়ার ফলে তার গভীর সুখসুপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কা সিতুর। একহাতে তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখল খানিক। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল। শমীর মুখখানা দেখল একটু। ভারী সুন্দর লাগছে, ভালো লাগছে। সকাল থেকে সবই তো সুন্দব লাগছে, ভালো লাগছে।

...কিন্তু ডাকল কে?

সিতু স্পষ্ট শুনেছে। সকালের থেকেও স্পষ্ট। ভুল হবার নয়। কোন্ নামে কোন্ ভাষায় ডাকল ঠাওর করতে পারছে না। ওই ডাকের একটা তরঙ্গ শুধু স্নায়ুতে স্নায়ুতে ওঠানামা করছে এখনো।

শয্যা থেকে নেমে দাঁড়াল। ঘরের আলোটা নেভালো। সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে একটা জ্যোৎস্নার স্রোত বিছানার ওপব আর শমীর পায়ের ওপর লুটোপুটি খেতে লাগল। সন্তর্পণে দরজার ছিটকিনি খুলে সিতু সামনের ঘোরানো বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

জ্যোৎস্নার এই বন্যা বড় চেনা চেনা। হরিদ্বারে মাঝরাত্তিরে আনন্দবাবার ডাক শুনে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে এমনি জ্যোৎস্নায় স্নান করতে করতে তাঁর ঘরের দরজায় পৌঁছেছিল। সেদিন আনন্দবাবা ডেকেছিলেন, আজ কে ডাকল তাকে?

স্তব্ধ, উৎকর্ণ। তারই অন্তস্তলে কানাকানি চলেছে কি। পাওয়ার ভরপুর আনন্দে পরিতৃপ্ত আত্মা...তারই কলধ্বনি। কিন্তু নিভৃতের আর এক তটে বসে তারই দিকে হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে ও কে? নিশ্ছিদ্র এই প্রাপ্তির উৎস থেকে হাত ধরে

এবারে তাকে উঠে আসতে বলছে। বিপুলতর কোনো আনন্দ সাগরের হদিস দিতে পারার মত প্রতিশ্রুতির ইশারা দেখছে ওই হাতে।

সর্বাঙ্গে আবার সেই রোমাঞ্চ। আলো-আঁধারি সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আশা-প্রত্যাশার সব কোলাহল ছাড়িয়ে এ কোন্ সিন্ধুপারের আরতি শঙ্খ কানে আসছে তার? সকালে আর রাতের গভীরে এই ডাকই কানে এসেছিল? নিজের অভ্যন্তরে চেতনার বিদ্যুৎ ঝলসে গেল বুঝি আর একপ্রস্থ। মনে পড়েছে কি।...যখন মনে হবে সমস্ত দিন কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আর কিছু করার নেই, আর কিছু পাওয়ার নেই, তখনো ভাবা দরকার সুন্দরের সেখানেই শেষ নয়, সুন্দরের পূজায় ত্যাগের আরো সাদা নজির রেখে যেতে হবে, সুন্দর খোঁজার আরো সাদা নজির কিছু দিয়ে যেতে হবে, সর্বসুন্দরের জন্য আরো কিছু পেতে বাকি—

আনন্দবাবার কথা।...হরিদ্বারের সেই এক গভীর রাত্রিতে নিজের ধ্যানের আসনে বসে আনন্দবাবা কি সত্যিই মন্ত্র দিয়েছিলেন তার কানে!

দ্রুত, খুব দ্রুত চিন্তা করে চলেছে সিতু। চিন্তা ঠিক নয়, মগজের কোষে কোষে ঝলসে ঝলসে আলো পড়ছে যেন।...যা হারিয়েছিল তার দ্বিগুণ করেই সব আবার ফিরে পেয়েছে বটে। পাওয়ার সমস্ত দিক কানায় কানায় ভবে উঠেছে, উপচে উঠেছে! মা-কে পেয়েছে, শমীকে পেযেছে, হৃদয় নামে এক দুর্লভ জাদুবস্তুর সন্ধান পেয়েছে। ওই হৃদয় দিয়ে অন্তরপুরুষের কাছ থেকে রূপনগর গড়ার নির্দেশ পেয়েছে। চোখের সামনে কচিমুখ ভাসছে কতগুলো। তারা রূপনগরের অভিযাত্রী! তারা এসেছে, আরো আসছে।...আর প্রেমভাইয়ের সঙ্গে সাবি সারি আরো অনেকের মুখ চোখে ভাসছে। প্রেমভাই-এর সঙ্গীদের মুখ, বীথিমাসী আর শমীর মুখ, ছোট দাদুর মুখ...অভিযাত্রীদের গড়ে গড়ে তোলা কারিগরদের মুখ। তারা এসেছে, আরো আসবে। এদের সকলের মুখ, এমন কি শমীরও উজ্জ্বল মুখ ছাপিয়ে আবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে এ কার হাসি-হাসি ঝকঝকে কালো একখানা মুখ?

...জেঠুর মুখ। যার নাম কালীনাথ। কালো মুখের এত আলো আর কি কখনো দেখেছে?

এই এদের মধ্যে এরপর সিতুর কি কাজ? সে কি করবে? কি দেবে? রূপনগর গড়ার নামে এদের সকলের মধ্যে বসে থেকে শ্রদ্ধা কুড়োবে, ভক্তি কুড়োবে, প্রীতি-ভালবাসা কুড়োবে? এরা যা করবে যা দেবে রূপনগরের ছেলে-মেয়েদের জন্য তার বেশি ওর আর কিছু করার নেই? দেবার নেই? সুন্দরের ওখানেই শেষ, সর্বসুন্দবের জন্য আরো কিছু পেতে হবে না? সুন্দবের পূজায় ত্যাগের আরো সাদা নজির কিছু রেখে যেতে হবে না? সুন্দর খোঁজার আরো সাদা নজির কিছু দিয়ে যেতে হবে না? ওই প্রভুজী ধামের ছোট-বড় সকলে যদি অনুভব করে, যদি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারে, তাদের সিতু রূপনগরের জন্য আরো কিছু আলোর খোঁজে গেছে—সেটা সাদা নজির হবে না?

সিতু স্থির নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে। পূবের আকাশ সাদা হয়ে আসছে।

পায়ে পায়ে ঘরে এসে দাঁড়াল। ঘুমন্ত শমীর মুখখানা দেখল। নির্নিমেষে দেখতে লাগল।

শয্যায় উঠে বসে ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে শমী লজ্জা পেল। বেলা সাড়ে সাতটা। শয্যা ছেড়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। সর্বাঙ্গে একটা সুখের স্পর্শ জড়িয়ে আছে মনে হতেই মুখ লাল। বাইরে এসে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে যাকে দেখবে আশা করেছিল, তার দেখা পেল না। হাত-মুখ ধুতে গিয়ে একেবারে স্নান সেরে ঘরে ফিরল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে কপালে সিঁথিতে সিঁদুর পরল। এই সিঁদুরের কৌটোটা কাল আনন্দবাবা দিয়ে গেছেন ওকে।

ঘুরে দেখে মেঘনা দাঁড়িয়ে। পরিতৃপ্তি আনন্দে তাকেই দেখছে। শমী আর একপ্রস্থ লজ্জা পেল।—কি?

হাসি চেপে মেঘনা বলল, কি আর, ছোট মনিব নেই, সাতসকালে প্রভুজী ধামে চলে গেছে—এ বাড়িতে কেউ কথা শোনে নাকি আমার!

শমী থমকালো একটু, তারপর হেসেই বলল, যাবেই তো, আর চারটে দিন বাদে কত বড় কাজ ওখানে।

কলেজ থেকে ফিরতে বিকেল। আর মাত্র দুদিন, তারপরেই কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ! বাঁচা যায়। মেঘনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দায়, একরাশ খাইয়ে তবে ছাড়ল। গাড়ি নিয়ে শমী ছুটল প্রভুজী ধামের দিকে।

সেখানে এসে বীথিমাসীব কাছে শুনল, সকাল থেকে ওই সামনের ঘর বন্ধ। সামনের ঘর মানে যে ঘরে প্রভুজীর বড় অয়েলপেন্টিং টাঙানো। বলল, ঘর বন্ধ করে সিতু সকাল থেকে কি যে এত লিখে চলেছে ও-ই জানে। দুপুরে একবার ধরে এনে চারটি খাইয়ে দেওয়া গেছে শুধু—

শমীর সঙ্গেও দেখা হল না। শমীর মন খারাপ হল বটে, তবু দরজা ঠেলে কাজে ব্যাঘাত ঘটাতে মন সরল না।

পরদিন বিকেলে এসে একই ব্যাপার শুনল। অবিরাম লিখেই চলেছে। বীথিমাসী লেখার কথাই বলল শুধু, কিছু একটা খবর গোপন করে গেল। শুধু লেখা নয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রভুজীর ওই মূর্তির সামনে পাথরের মত যে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখেছে, এ খবরটা বলল না।

কিন্তু এইদিনে শমী দেখা না করে ফিরতে পারল না। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। বারকয়েক মৃদু আঘাত করতে দরজা খুলে গেল।

শমীর বুকের ভিতরটা কি রকম করে উঠল প্রথম। আনন্দে কি শঙ্কায় জানে না। বোধ হয় দুইয়েরই মিশেল। পরশুও কি এত সুন্দর দেখেছিল? নাকি ওরই চোখে ঘোর লেগেছে! কাছে এসে দরজা খুলেছে বটে, কিন্তু এখনো কোন্ দূরের তন্ময়তায় বিভোর হয়ে আছে যেন।

ঘরের মেঝের আসনে এক পাঁজা লেখা কাগজ। সহজ হবার চেষ্টায় ছদ্মগাম্ভীর্যে শমী ঘরের চারিদিকে একবার দেখে নিল। পরে চোখে চোখ রাখল।—ডিসটার্ব করলাম?

...দূর থেকে এবারে কাছে আসছে যেন মানুষটা। সিতু হাসল। আসনে ফিরে বসে বলল, না, বোসো।

শমী তার মুখোমুখি মেঝেতে বসে পড়ল।—এত সব লিখছ কি?

সিতু জবাব দিল, প্রভুজী ধামের খসড়া...কম ব্যাপার নাকি?

তা শেষ হল?

আরো একটু বাকি।

তার মানে আজও বাড়ি ফেরা নেই। কিন্তু আমি আমার প্রভুজী ধাম ছেড়ে থাকি কি করে?

সিতুর মনে পড়ল, পরশু রাতে বলেছিল ও-ই তার প্রভুজী ধাম। হাসছে মৃদু মৃদু। তেমনি হালকা সুরে জিজ্ঞাসা করল, অঙ্ক করেছ কোন কালে?

সেই স্কুলে পড়ার সময় করেছিলাম। ভুলে গেছি।

আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। তোমার প্রভুজী ধাম আমি, আবার আমার প্রভুজী ধাম এটা—তাহলে দাঁড়ালো তোমার প্রভুজী ধাম এটাই। বুঝলে?

বুঝলাম। তাহলে আমিও রাতে এখানেই থেকে যাই।

সিতু হাসছে, কিন্তু নিষ্পলক চেয়েও আছে তার দিকে।—তাড়া কি, থাকবেই তো। কিন্তু ওই সাদামাটা অঙ্কটা মনে থাকবে তো?

শমী ফিরে চোখ রাঙালো, তোমার পাল্লায় পড়লে কিছু ভোলার জো আছে?

এই জবাবের ফলে ওই চোখে-মুখে যে আনন্দের ছটা দেখল তাতেই ভরপুর হয়ে শমী বাড়ি ফিরল।

পরদিন।

কলেজের এটা শেষ দিন। আজ হলেই অব্যাহতি। মেয়েরা আবার বিদায় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছে। ফিরতে দেরিই হবে হয়ত। শমী একটু আগেই কলেজে বেরিয়ে গেল।

সাড়ে দশটায় কালীনাথও অফিসে চলে গেলেন।

তার একটু বাদে সিতু উপস্থিত। মেঘনা আনন্দে কলকল করে বকে উঠল তাকে। হাসিমুখে সিতু বাবার ঘরে এলো। তার সামনে খানিক বসে আবার বেরিয়ে এসে মেঘনাকে বলল, খিদে পেয়েছে, খেতে দে।

শশব্যস্তে মেঘনা খাবার যোগাড় করতে ছুটল। তারপর নিজে সামনে বসে পরিপাটি করে খাওয়ালো তাকে। যা খায়, সিতুকে তার দ্বিগুণ খেতে হল। মুখ-হাত ধোয়া হতে মেঘনা তাকে ঘরে শুতে পাঠালো। বলল, দু-দণ্ড জিরোও দেখি, আমি চট্ করে কাজ সেরে নিই—

সিতু ঘর থেকে বেরুলো যখন, বেলা তখন দেড়টা। পায়ে পায়ে বাবার ঘরের সামনে দাঁড়াল। ভিতরে ঢুকল না। দরজায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

অদূরে মেঘনা। অবাক মুখ। সিতু অপ্রস্তুত একটু কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসি। কাছে এগিয়ে গেল।

মেঘনা জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ বাবার দরজায় প্রণাম করলে যে?

হাসিমুখে তার একটা হাত সিতু দুই হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে বলল, এমনি। তোর খাওয়া হয়েছে তো?

এই তো হল। মেঘনার দু চোখ সজল, মুখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি কি ছিলে ছোট মনিব, আর কি হয়েছ! আ-হা, আজ যদি তোমার মা বেঁচে থাকতো গো...

দু চোখ একবার বুজে কথাগুলো যেন আস্বাদন করল সিতু। তারপর আবার তাকালো তার দিকে। চোখে হাসি ঝরছে? বলল, তুইও তো এ-বাড়ির একটা মা-ই রে।

খুশির মুখে উদ্‌গত কান্নার ঢেউ একটা, হাত ছাড়িয়ে মেঘনা তাড়াতাড়ি সামনের

ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সিতু হাসছে। পায়ে পায়ে সিঁড়ি পেরিয়ে নিচে নেমে গেল।

* * *

শমী বাড়ি ফিরল সন্ধ্যার একটু আগে। দোতলায় পা দিতেই সামনে মেঘনার উদ্বেগভরা মুখ। তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এলো মেঘনা।

চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে শমী শুনল কিছু।

শুনল, সকাল সাড়ে দশটার পরে মেঘনার ছোট মনিব এসেছিল। নিজে চেয়ে খাওয়া-দাওয়া করেছে। বেলা দেড়টার পরে প্রভুজী ধামে চলে গেছে। যাবার আগে বাবার ঘরের দরজায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেছে. আর মেঘনাকে এ-বাড়ির একজন মা বলে গেছে। ছোট মনিবের মুখের সেই সুন্দর হাসি দেখে মেঘনার চোখে জল এসেছিল।...তারপর প্রভুজী ধাম থেকে এক লোক এসে জেঠুর হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল। সেই চিঠি পড়েই জেঠুর মুখ একেবারে যেন কেমন হয়ে গেল। চিঠি হাতে তক্ষুনি জেঠু শমীর খোঁজে তার ঘরে গেল। ওকে না পেয়ে সেখানেই হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকল খানিক। তারপর ধড়মড় করে উঠে নীচে নেমে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদে হুঁশ ফিরল যেন শমীর। ঢুকেই থমকে দাঁড়াল আবার।

টেবিলের ওপর খোলা চিঠি, পাশে খাম। এগিয়ে এলো। চিঠিটা তুলে নিল। পড়তে চেষ্টা করল। ঝাপ্‌সা দেখছে চোখে। শক্ত হয়ে বারকয়েক চেষ্টা করার পর অক্ষরগুলো স্পষ্ট হল যেন একটু।

জেঠু,

শকুনির স্বর্গলাভ এত সহজে হয় না। বিষয়-আশয়ের ওপর প্রভুজী ধামেরও সব বোঝা ঘাড়ে নিয়ে থাকো এখন বসে। আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই সামনের উৎসবে প্রভুজী ধামের আসল মঙ্গলঘণ্টাটি তুমিই হাতে নিয়েছ। যেমন জ্বালিয়েছ, তার ফল বোঝ এখন। তবে একটা কথা চুপি চুপি স্বীকার করে যাই, তোমার মত সাধকও কম দেখেছি আমি। কিন্তু বড় দুর্বলও—এত নরম মন কেন তোমার জেঠু?

প্রভুজী ধাম থাকল, প্রভুজী ধামের সকলে থাকল, আর সকলের উপর তুমি থাকলে। আমার সমস্ত চিন্তা আমি লিখে রেখে গেলাম, দরকার মনে করলে দেখে নিও। তা ছাড়া কি হবে না হবে, ছোট দাদুও জানে সব। আমার যে না বেরিয়ে উপায় নেই জেঠু। রূপনগরের জন্যে আরো যে সাদা নজির চাই, আরো জ্যোতি চাই, আলো চাই। আমি তোমাদের জ্যোতিরাণীর ছেলে, সেই আলোর খোঁজ জ্যোতির খোঁজ আমি পাব না তো কে পাবে? ওই আলোর খবর জ্যোতির খবর অষ্টপ্রহর আমার কানে আসছে।

তুমি মন খারাপ কোরো না, কাউকে মন খারাপ করতে দিও না। তাদের বোল, সিতু আরো কিছু আলোর খোঁজে গেছে, আবার ফিরবে। আর শমীকে মনে করিয়ে দিও, অঙ্কটা যেন না ভোলে। তাকেও মন খারাপ করতে বারণ কোরো, আবার তো ফিরবই আমি—

তোমাদের সিতু

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। দেয়ালে প্রভুজীর বড় ছবিটার সামনে সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন কালীনাথ। দীর্ঘদিন বাদে হরিদ্বার থেকে ফিরে সিতু স্টেশনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে দূরের ছায়া দেখেছিলেন তিনি। প্রায় ওই ছবির মতই দূরের। ধরে রাখার, আগলে রাখার সব বেড়া ভেঙে আবার পালালো...।

এখন ওই ছবির দিকেই চেয়ে আছেন তিনি। এগার দিনের শিশু কোলে ওর ঠাকুমার সেই আর্ত পুলকিত চিৎকার কানে বাজছে, তার হাতে পাকা চুল একটা। —ওরে কে আছিস কর্তাকে ডাক শিগগীর। দেখো দেখো বউমা, ঘরে কে বুঝি এলো —শিগগীর দেখো।

দরজা ঠেলে ঘরে পা দিয়ে প্রথমেই ওই ছবির দিকে চোখ পড়তে শমীও স্তব্ধ। মাসীর মুখে শোনা এই একই দৃশ্য তারও মনে এলো। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে শমী জেঠুর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। ওই ছবির দিকে চেয়ে রইল।

কালীনাথ ফিরে তাকালেন। আস্তে আস্তে শমীর মুখখানাও তাঁর দিকে ঘুরল। শান্ত কমনীয়, কালীনাথের নিজেরই দু চোখ জলে চিকচিক করছে। একখানা হাত ওর কাঁধে রেখে হাসতে চেষ্টা করে তবু ওকেই যেন সান্ত্বনা দিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, মন খারাপ করিস কেন, আবার তো ফিরবেই বলে গেছে রে...।

দ্বাদশ খণ্ড সমাপ্ত

গ্রন্থ-পরিচিতি

আশুতোষ রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে একখানি বৃহৎ উপন্যাস 'শত রূপে দেখা' এবং 'নগর পারে রূপনগর' উপন্যাসের শেষাংশ।

'শত রূপে দেখা' ষাটের দশকে দীর্ঘদিন ধরে মাসিক 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় ধারাবাহিক কাহিনী আকারে প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থ হিসেবে উপন্যাসটির আত্মপ্রকাশ ঘটে ভাদ্র, ১৯৬৫ সনে। প্রকাশনা-সংস্থা 'মিত্র ও ঘোষ'।

অপর বৃহৎ উপন্যাস 'নগর পারে রূপনগর' এবার এই দ্বাদশ খণ্ডে সমাপ্ত হচ্ছে। পুস্তক আকারে 'মিত্র ও ঘোষ'-এর প্রকাশনায় এর প্রথম প্রকাশ চৈত্র, ১৯৬৫-এ।

এই প্রসঙ্গে জানাই, মুদ্রণের ত্রুটিবশত আশুতোষ রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে 'নগরপারে রূপনগর' উপন্যাসটির প্রারম্ভে এবং গ্রন্থ-পরিচিতিতে দ্বিতীয়াংশের জায়গায় 'শেষাংশ' শব্দটি ছাপা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে আমরা সহৃদয় পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি তাঁরা নিজগুণে আমাদের মার্জনা করবেন।

॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী ॥

কোন্ খণ্ডে কি আছে